Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ১ম সংখ্যা।
১লা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭ সাল, ১৮৫২ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
15th January, 1931.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, তুমি আনন্দময়ী। তোমার সন্তান যিনি, আনন্দ-জাত ব্রহ্মানন্দ তিনি। তোমার ধর্ম্ম-বিধান যাহা, তাহাও আনন্দের বিধান। নিত্য আনন্দের উৎসব-সম্ভোগ দান করিবার জন্যই, তুমি বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধান নব-বিধান পাঠাইয়াছ। তাই বুঝি, এই বিধানাশ্রিতদিগকে তুমি উৎসবের পর উৎসব দিয়া এতই আনন্দিত করিতেছ। আর উৎসব ছাড়িয়া থাকিতে দিতে চাও না। আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া একটু একটু এক একদিন উৎসবের আনন্দ ভোগ করিয়া কতই আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতাম; কিন্তু এখন নববিধানের ভিতরে আনিয়া, নবভক্তের সঙ্গে মিলাইয়া, আমাদিগকে নিত্যই নব নব উৎসবের জন্য তুমি এমনই পিপাসিত করিয়াছ যে, এখন যেন একদিনের একটু উৎসবে আর আমাদের পোষায় না। সংসারে যাহারা এক একটা নেশা করে, তাহাদের মাত্রা যেমন ক্রমেই চড়িয়া যায়, একটু আধটুকু নেশায় আশা মেটে না; নববিধানে আনিয়া আমাদিগকে উৎসব সম্বন্ধেও যেন কতকটা সেই ভাবে উৎসব-পিপাসু করিয়া তুলিয়াছ। অথবা আমাদের আচার্য্য নেতাকে স্বর্গের নিত্যোৎসবে মাতাইয়া, তাঁহারি অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে তাঁহারই অনুগমনে ব্রহ্মানন্দময় করিয়া লইবার জন্যই বুঝি, এই উৎসবের পর উৎসবে আমাদিগকে মাতাইতেছ। ধন্য তোমার মহিমা! আশীর্ব্বাদ কর, এবার তোমার এই মহা মহোৎসবের প্রভাবে পড়িয়া, আমরা যেন দলবলে সকলে সেই নিত্যোৎসবের অধিকারী হই এবং তদ্দ্বারা তোমার নববিধানকে যথার্থ গৌরবান্বিত করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উৎসবের আহ্বান।

ধন্য মা নববিধান-বিধায়িনী জননী! আবার আমাদিগকে তাঁহার পবিত্র নববিধানের নবোৎসব সাধন ও সম্ভোগের জন্য ডাকিয়া আনিয়া, নববর্ষ দিন হইতে প্রস্তুত করাইতেছেন। অদ্য হইতে মহা মহোৎসব ব্রহ্মারতি-যোগে আরম্ভ হইবে। এই উপলক্ষে নববিধানাচার্য্য সঙ্গে আমরা স্বদেশস্থ ভাই ভগ্নীদিগকে তাঁহার মহাবাণীতে আহ্বান করিয়া বলি—"আমার স্বদেশবাসী, স্বদেশবাসিনী-গণ, আমার পিতার সন্নিধানে আগমন কর। এস সকলেই, ধনী কি নির্ধন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান, যুবা কি বৃদ্ধ, নর কি নারী, পাপ ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত সকলে এস; এস,

আমার পিতার শান্তিনিকেতনে, বিনম্র এবং প্রার্থনাশীল অন্তরে আগমন কর। তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ কৃপাগুণে দরিদ্র ধনী হইবে, দুর্ব্বল বলীয়ান্ হইবে, অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হইবে, মূক বাক্শক্তি লাভ করিবে, মৃত পুনর্জীবন পাইবে।"

আর বিশ্বজনকেও আমরা ব্রহ্মানন্দের সহিত সমস্বরে ডাকিয়া বলি, "পৃথিবীর সমুদয় প্রধান জাতি, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়, মুষা-ঈশা-বুদ্ধ-কন্‌ফিউসস্, জোর-আস্তার, মোহম্মদ ও নানক-শিষ্যগণ, বিস্তৃত ভারতবর্ষ-মণ্ডলীর প্রশস্ত বহু শাখা এবং সেই সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু, ঋষি, প্রধান ধর্ম্মযাজক, জ্যেষ্ঠ ও আচার্য্য, আপনাদের উপর দেব-প্রসাদ ও চিরশান্তি বর্ষণ হউক।

"পুণ্যময় ঈশ্বর পৃথিবীতে শান্তি, প্রেম, মিলন ও একতার শুভবার্ত্তা প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তাঁহার অপরিমেয় করুণায় প্রাচ্য দেশীয় আমাদিগের নিকটে তাঁহার নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির নিকটে ইহার সাক্ষ্যদানের জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন।

"ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'আমার নিকট সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত ঘৃণিত, আমি ভ্রাতৃ-বিরোধ সহ্য করিব না। আমি প্রেম এবং একতা চাই। যেমন আমি এক, তেমনি আমার সন্তানগণও একহৃদয় হইবে।'

"হে ভ্রাতৃগণ, এই বিশ্বজনীন নব সংবাদ আপনারা গ্রহণ করুন। সর্ব্বোপরি আপনারা পরস্পরকে ভাল বাসুন এবং আপনাদের সর্ব্বপ্রকার ভিন্নতা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিসর্জ্জন দিন।

"প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আপনারা আমাদের প্রেম গ্রহণ করুন এবং আপনাদের প্রেম আমাদিগকে দান করুন। এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম একহৃদয় হইয়া নববিধানের আনন্দগীত সঙ্গীত করুক।

"এসিয়া এবং ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে নববিধানের গৌরব ঘোষণা করুক এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব গান করুক।"

নববিধানের নিত্যোৎসব।

উৎসবের পর উৎসব, মহা মহোৎসব। নববিধান এই মহা মহোৎসবের বিধান। যেখানে উৎসব নাই, সেখানে নববিধান নাই। নববিধান-বিধায়িনী যিনি, আনন্দময়ী জননী তিনি। নিত্য আনন্দোৎসবদানই তাঁহার বিধান। যিনি উৎসব দেন না, তিনি আনন্দময়ী কেমন করিয়া হইবেন? এজন্য আমাদের আনন্দময়ী মা সদানন্দে নিত্যানন্দে মাতাইয়া রাখিবার জন্যই, আমাদিগকে তাঁহার এই উৎসবের বিধান নূতন বিধান দিয়াছেন, এবং আমাদিগকে তাঁহার নবভক্ত ব্রহ্মানন্দের অঙ্গে গাঁথিয়াছেন। তাই আমাদের উৎসবের আর শান্তিবাচন নাই।

পূর্ব্বে আমাদের মাঘোৎসব একটি দিনের উৎসব ছিল, তাহার পর ভাদ্রোৎসব সংযুক্ত হইল। তখন বৎসরে দুইটি উৎসবই আমাদের যথেষ্ট আনন্দোৎসব বলিয়া মনে হইত। ক্রমে শারদীয় উৎসব, বসন্তোৎসব, দুর্গোৎসব, খ্রীস্টোৎসব, বুদ্ধোৎসব, চৈতন্যোৎসব, মহামহোৎসব জন্মোৎসব ইত্যাদি কতই উৎসবের মাত্রা চড়িতে চড়িতে, হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ ও খ্রীষ্টবাদীর, মুসলমানের এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর সকল প্রকার উৎসবই আমাদিগের পরম সম্ভোজনীয় উৎসবরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

এখন আর কোন উৎসবই আমরা বাদ দিতে পারি না। এমন কি, রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদও আমদিগের নিকট এক একটি উৎসব আনিয়া দেয়। এই সকল উৎসবের ভিতরেই আমরা আনন্দময়ীর আনন্দ-মুখ দেখিয়া, আনন্দলীলা সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই। তাই আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের নববিধান সত্যই ব্রহ্মানন্দবিধান, নিত্য মহোৎসবের বিধান।

গতবৎসর ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিকী মহোৎসব এবং নববিধান-ঘোষণার পঞ্চাশত্তম মহা মহোৎসব আমরা মার কৃপায় যে কি অলৌকিক ভাবেই সম্ভোগ করিয়াছি, তাহা কেহই আমরা ভুলিতে পারি না। তাহার পর সম্বৎসর ধরিয়া আমরা যে শোকোৎসব, সঙ্গ-উৎসব এবং আর আর যে সমুদায় উৎসবের পর উৎসব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সঙ্গে সম্ভোগ করিলাম, তাহা যে আমাদের আত্মার কতই কল্যাণপ্রদ, তাহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি?

আবার নববর্ষের আরম্ভ হইতে প্রতিদিন এক একটা নব নব উৎসব সাধন ও সম্ভোগ করাইয়া, মা অদ্যকার ব্রহ্মারতি-সহকারে যে মহা মহোৎসব বিধান করিবার জন্য উৎসবের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছেন, তাহাতে স্বর্গের স্বর্ণ কলস ভরিয়া আমাদিগকে কি আনন্দ-সুধা পান করাইবেন এবং কি মত্ততায় মাতাইবেন, আমরা তাহা কিছুই জানিনা, তিনিই জানেন।

আমাদের প্রিয়তম আচার্য্য প্রার্থনা করিলেন—"যে সাধক অষ্ট প্রহর হরি হরি বলে, তার পাপ করিবার ছুটি কোথায়? সেতো চায় পাপ করিতে, কিন্তু অবকাশ কই? হরি, তুমি তার চব্বিশ ঘণ্টা আপনি অধিকার করেছ, তোমার সাধক কি করিবে? সময় তো আর হইলনা, অবকাশ হোলনা বলে সাধক পাপ করতে পারলেন না। তাঁর প্রেমের ঘোর আর গেলনা। তোমার ধর্ম্মের ভেতর যদি তোমার সন্তানদের এনেছ, এরা ধন মানের দিকে যাবে, তার যেন আর সময় না থাকে। তোমাকে মা মা বলে ডাকতে ডাকতে, যেন প্রমত্ত হয়ে যাই। দয়ালু পরমেশ্বর, যেন অচেতন হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকি। সংসারের ভাসা ভাসা ধর্ম্ম হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া, ঘোরতর নববিধানের ভিতর ফেলিয়া দাও। যেন পাপ করিতে আর অবকাশ না পাই।"

বাস্তবিক এই উৎসবের পর যে উৎসব, ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। আমাদের উৎসব করিতে করিতে এই উৎসবের নেশা এমনি জমিয়া যাইবে যে, পাপ করিবার, অসার সংসারের বিষয়-কোলাহলে ভুলিয়া থাকিবার আর অবকাশই থাকিবে না। এই ভাবে মত্ত করিবার জন্যই আমাদিগের এই উৎসবের পর উৎসব। ইহারই জন্য মা আমাদিগকে এই উৎসবের বিধান নববিধান দান করিয়াছেন।

তাই এবারকার উৎসবে কেবল প্রেরিত প্রচারক কিংবা সাধকগণই যে ভাগীদার হইবেন এবং উৎসবের মত্ততা সম্ভোগ করিবেন তাহা নহে। নববিধানের বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী মাত্রেই নববিধানে প্রেরিত বা পবিত্রাত্মার দ্বারা আহূত। প্রচারক হউন, সাধক হউন, সেবক হউন, কর্ম্মী হউন, নারী হউন, বালক হউন, শিশু হউন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া, পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদান এবং গ্রহণ প্রতিগ্রহণ দ্বারা, যাহাতে একই নববিধান-দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া আমরা পরিচয় দিতে পারি, তাহারই জন্য মা আমাদিগকে এই নববিধানে স্থান দান করিয়াছেন। বিশেষভাবে এই উৎসবে যেন আমরা সেই মার হাতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া, আপনাপন জীবনের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা এই উৎসব-সাধনের উদ্দেশ্য-সম্ভোগে ধন্য হইতে পারি ও সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নববিধানের গৌরব ঘোষণা করিতে পারি।

আচার্য্য সঙ্গে প্রার্থনা করি, "মা, উৎসবের উপলক্ষে একবার তোমার কাছে সকলে আসে, আর একটু মধু খেয়ে পালায়; কিন্তু ঐ গোলাপে চির গোলাপী হওয়া, ঐ রাঙ্গা চরণের মধু-পানে চিরকাল মত্ত থাকা, মুখ আর না সরান, এটা আর হয় না। মা আদ্যাশক্তি, এবার পূরামাত্রায় বিহ্বল হইয়া, যেন সকল প্রকার পাপকে অসম্ভব করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।"

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নবদেবালয়।

যেখানে দেবদেবীর মূর্ত্তি-পূজা হয়, তাহাকেই দেবালয় বলা হয়। যেখানে নিরাকারা চিন্ময়ী মা অমূর্ত্ত হইয়াও দেবদেবীর ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন দান করেন বলিয়া তাঁর পূজা হয়, তাহাই নবদেবালয় নামে অভিহিত। নববিধানাচার্য্য দেহের মায়া ত্যাগ করিয়া, জরাজীর্ণ দেহে, স্বর্গারোহণের সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বে, এই নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শেষ প্রার্থনায় বলিলেন, "মা, তুমি এই ঘর অধিকার করেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর। এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয় দ্বারা এই বাড়ীর পল্লীর কল্যাণ হইবে, এই সহরের কল্যাণ হইবে এবং সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজেলাম। এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? আমার আশা পূর্ণ কর। তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন।" তিনি আমাদিগকেও শেষ উপদেশ দিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে কিছু কিছু দিয়ে মার ঘরখানি সাজিয়ে দিও, কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও। মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মায়ের পূজা করিও না। আমার মা বড্ড ভালরে বড্ড ভাল, মাকে তোরা চিনিস না। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে ভাইগণ তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন।" নবভক্তের এই শেষ মহামন্ত্রবাণী আমরা

যেন না ভুলি, কিন্তু ইহা স্মরণ করিয়া ইহার প্রত্যেক কথার গভীর মর্ম্ম হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি ও এই সর্ব্বমিলন-তীর্থের মর্য্যাদা-রক্ষায় কৃত-সংকল্প হই। নববিধানের নবদেবালয় সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।

কৃতজ্ঞতা-স্মরণ।

আমাদের উৎসবের প্রস্তুতি-সাধন বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা-সাধন। যাহার নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হই, তাহা স্মরণ করাই কৃতজ্ঞতা। যাঁহার নিকট যে উপকার পাইয়াছি, তাহা যদি স্মরণ ও স্বীকার না করি, আমরা কখনই নববিধানের উপযুক্ত নই। নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান। এই বিধান-সাধনে, পবিত্রভাবে সবার ভিতর ভাল যাহা, তাহা দর্শন করিতে হইবে, অবিচারে ভাল স্বীকার ও গ্রহণ করিতে হইবে। কাহারও বিচার করিবার কিম্বা কালো দিক দেখিবার অধিকার নববিধান-বিশ্বাসীর নাই। তাই সহস্র মতভেদ থাকিলেও, সহস্র দোষ ত্রুটি থাকিলেও, যাঁহার নিকট যতটুকু উপকার বা ভাল ভাব পাই, তাহা অবনত-মস্তকে যেন গ্রহণ করিতে পারি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি; নতুবা আমরা নববিধানের প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হইব। তাই এই উৎসবের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞতা স্মরণের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই নববিধানের যে পূর্ব্বাভাস আমরা আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন ও ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট লাভ করিলাম, নববিধান-প্রবর্ত্তক ও প্রেরিতগণের নিকট যে উপকার পাইলাম, জন্মভূমির নিকট, নিজ গৃহে, শিশুদের নিকট, ভৃত্যদের নিকট, দীন জনের নিকট, মহাজনদের নিকট, জনহিতৈষীদিগের নিকট, উপকারীদিগের নিকট, এমন কি বিরোধীদিগের নিকটও যে ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তা ও উপকার পাইয়াছি, তাহা স্বীকার পূর্ব্বক আমরা উৎসবের জন্য প্রস্তুত হই।

স্বর্গারোহণোৎসব।

স্বর্গ হইতে যে আনন্দ অবতীর্ণ হয়, তাহারই নাম উৎসব। স্বর্গের অমরাত্মাগণ যে নিত্য উৎসব করিতেছেন, তাহারই প্রভাব বা সমীরণ যখন পৃথিবীতে বহমান হয়, তখনই যথার্থ উৎসব হয়। তাই আমাদের উৎসব-ক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গীত "চল ভাই যাই সবে, মহা মহোৎসবে, অমরধামে যোগবলে।" বাস্তবিক যোগ-বলে অমরাত্মাদলে মিলন বিনা মহোৎসব হয় না। আশ্চর্য্য নববিধান-বিধায়িনীর অনির্ব্বচনীয় লীলা! এই জন্যই বুঝি, এই মহোৎসবের প্রাক্কালিক সময়ে আমাদের প্রিয়তম আচার্য্য নব-বিধান-প্রবক্তাকে যেমন তিনি স্বর্গারূঢ় করিয়াছেন, তেমনই নববিধানের সুসমাচার-লিপিকরকেও তাঁহারই অনুগামিরূপে স্বর্গে তাঁহার সহিত মিলিত করিয়াছেন। আমরা যেন জীবন্মুক্ত হইয়া, অমরাত্মাগণ সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগ-বলে যথার্থ মহা মহোৎসবে মত্ত হইতে পারি। ধর্ম্মপিতা মহর্ষিদেবেরও স্বর্গারোহণ এই উৎসব কাল মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে।

শ্রীদরবারের মিলন।

নববিধান মহামিলনের বিধান। বিশ্বমানব ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবনে এই মিলনের প্রমাণ দান করিয়াছেন। আবার সতী ব্রহ্মনন্দিনী সঙ্গে যুগলসাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া "দুজনে একজন" কেমন করিয়া হইতে হয়, তাহারও সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

নববিধানে কিন্তু পাঁচজনে একজন না হইলে নববিধান-মণ্ডলীর একত্ব প্রমাণিত হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই শ্রীদরবার প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শ্রীদরবারের মিলন না হইলে, নববিধানের মিলন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না। যাহা একজনে বা একটি পরিবারে সংসাধিত হইয়াছে, তাহা যদি দলে প্রমাণিত হয়, তবেই নববিধানের মহামিলনে যে বিশ্বমানব এক পরিবার হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। অতএব এ সম্বন্ধে শ্রীদরবারের গভীর দায়িত্ব অনুধাবন করা এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীদরবারের প্রথম সংগঠন সময়ে নির্দ্ধারণ হয় যে, "এই সভার সভ্যগণ এক শরীরের অঙ্গরূপে কার্য্য করিবেন।" একজন বিধান-প্রবর্ত্তক বার বার প্রার্থনা করিয়াছেন, "এখানে কেউ আমি আর আমার হতে পারে না, সব এক।" "যেখানে যিনি প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন।" "আমাদের পাঁচ গুরুর দরকার নাই।" "একখানি ধর্ম্ম আমরা রাখিব, একখানি মানুষ হয়ে, একখানি ভক্ত হয়ে তোমার পাদপদ্ম সাধন করিব।"

এইজন্য আরো বলেন, "পাঁটী পরিত্রাণের ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। একজন এদেশে, একজন অন্য দেশে থাকলই বা, এক-প্রাণ হবে।" "নববিধান আসিলে ইহা হবে, আসল নববিধান এখনও আসে নাই।" "সব মুখ একমুখ হবে, যে যেখানে থাকুক, সকলের নাড়ি এক নাড়ি হবে, সকলের প্রাণ এক হবে।"

ইহার উপায় সম্বন্ধে আচার্য্যদেব বলিলেন, "একজন লোকে কয়জন মিলিত হইয়া যাইবে, এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য।" "একজন মধ্য বিন্দুতে দশজন সাতজন মিলিত হইবে। গুরু বলে, মধ্যবর্ত্তী বলে মানতে হয় না, কিন্তু ভগবানের লীলা বলে, অভিপ্রায় বলে ইহা মানতে হয়। নব-বিধানের ব্যবস্থা তুমি এই রকম করেছ। আমরা তাহা মানলাম না বলে মিলন হলো না।"

এই বিষয়টীই আমাদের বিশেষভাবে প্রার্থনা ও সাধনের বিষয় এখন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান বিধানে শ্রীদরবারের হাতেই নববিধান প্রচার ও রক্ষার ভার প্রধানতঃ ন্যস্ত, ইহা নববিধান-বিশ্বাসী হইয়া আমরা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? হইতে পারে, শ্রীদরবার এখনও শ্রীদরবার হয় নাই, বা যাঁহারা ইহার সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য, অনুপযুক্ত; কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীদরবাররূপ প্রতিষ্ঠান যে যথার্থ নববিধানের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত, ইহা মানিতেই হইবে।

নববিধানে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহাদের মধ্যে দৃশ্যতঃ নববিধানের পূর্ণ আদর্শ জীবনে প্রদর্শন করিতেছেন, এমন এখন হয় ত কেহ নাই; তাই বলিয়া নববিধান সত্য নয় বা নববিধানের আদর্শ মিথ্যা, ইহা কি বলা সঙ্গত? তেমনি শ্রীদরবারের বর্ত্তমান সভ্যগণ অনুপযুক্ত বলিয়া, শ্রীদরবার যে নববিধানের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান নয়, তাহা বলিতে পারি না।

অবশ্যই আমরা যাহারা শ্রীদরবারের অঙ্গরূপে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছি বা তৎসাধনে ব্রতধারী হইয়াছি, আমরা তাহার আদর্শ অনুরূপ মিলন ও একাত্মতা প্রদর্শন করিতে যে পারিতেছি না, এজন্য আমরা যে কেবল শ্রীদরবার সম্বন্ধে ঘোর অপরাধী তাহা নয়, নববিধান সম্বন্ধেও আমরা অপরাধী।

এক্ষণে সে অপরাধ আমরা স্বীকার করিয়া, অনুতপ্ত-চিত্তে যাহাতে শ্রীদরবারের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে পারি, তাহারই জন্য যেন আমরা একান্তহৃদয়ে কৃতসংকল্প হই।

নববিধান-ঘোষণার একপঞ্চাশত্তম বর্ষও পূর্ণ হইতে চলিল। শ্রীদরবার যাহাতে ইহার নির্দ্দিষ্ট স্থান নববিধানে গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্য সভ্যগণ আপনাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া বিশেষ সাধন গ্রহণ করুন। পরস্পরের সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস ও অপ্রেম আছে তাহা পরিহার করিয়া, পরস্পরের বিশেষত্ব স্বীকার ও গ্রহণ পূর্ব্বক, যাহাতে একাত্মতা সাধন করিতে পারি, পরস্পরকে অযথা আক্রমণ না করিয়া, সহস্র মত-ভেদ সত্ত্বেও ভাই বলিয়া শ্রদ্ধা ও আলিঙ্গন দিতে পারি ও ভ্রাতৃ-ভাবে প্রেমভাবে পরস্পরের দোষ বা ভ্রম অপনোদনের চেষ্টা করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে একমত, এক বিশ্বাস, এক সাধন দ্বারা শ্রীদরবারের একত্ব স্থাপন করিতে পারি, তাহা যেন আমাদের বিশেষ সংকল্প হয়। একত্র সাধন ভজন, এক যোগে সময়ে সময়ে প্রচার এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে যাহাতে ভাবের বিনিময় হয়, তাহারও জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হই।

নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বানিয়ে বলি না"; সুতরাং নববিধানে যাহা কিছু তাঁহার শ্রীমুখাৎ উক্ত হইয়াছে এবং তিনি যে নববিধান-মূর্ত্তিমান জীবন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পবিত্রাত্মার আলোকে, ব্যক্তিগত আলোকে ও দলগত সমবেত আলোকে মিলাইয়া, যাহাতে শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ অনুসরণ-পূর্ব্বক, মত, বিশ্বাস, সাধন, প্রচারাদি সংসাধন করিতে পারি এবং নববিধানাদর্শরূপ জীবন-যাপনে সক্ষম হই, তৎসাধনে স্থিরসংকল্প হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

এ সম্বন্ধে নববিধান-বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী সাধক সাধিকাগণের প্রাণগত সহায়তা আমরা ভিক্ষা করি। আচার্য্য যেমন বলিয়াছেন, "মা, তোমার সন্তানদের জানাও, ইঁহারা সকলে চেষ্টা করে একজনকেও সাজান। বিধানকে নির্ব্বংশ করে না যান।"

সে "একজন" "পাঁচজনে একজন" এই শ্রীদরবারে যদি হয়, তবেই "নববিধানের বাতি" জ্বলিবে, বিধান যথার্থ নির্ব্বংশ হবে না। নববিধানে কোন একব্যক্তি একজন নয়। "সদল অখণ্ড একজনই" নববিধানের "একজন"। তাই নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য শ্রীদরবারকে জীবন্ত রাখা।

এই জন্যই প্রস্তাব হইয়াছে, শ্রীদরবারস্থ প্রচারকদিগের সহিত মণ্ডলীস্থ গৃহস্থ প্রচারক, সাধক সাধিকা ও ব্রতধারী ধারিণীগণের সহযোগিতায় শ্রীদরবার বর্ত্তমানে পরিচালিত হয়।

নববিধানে সকলেই প্রেরিত। কেননা, বিধাতার ডাকে বা প্রেরণাতেই আমরা এই বিধানের আশ্রয়লাভ করিয়াছি এবং ইহাকে জীবনের অন্ন পান করিয়াছি। আমাদের পুরুষকার বলে তাহা হয় নাই। তবে তাহার উপলব্ধির ও সাধনের তারতম্য অনুসারে বিভিন্নতাও যে আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহারা বিষয়-কর্ম্ম পরিহার করিয়া সমস্ত জীবন মন বিধানের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন শ্রীদরবারের সভ্য। এক্ষণে যাঁহারা বিষয়-কর্ম্ম-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচার বা মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রকার সেবায় নিরত, তাঁহারা শ্রীদরবারের সহযোগী সভ্য হইয়া, তাঁহাদের সমবেত প্রেরণা-সহযোগে শ্রীদরবারের উচ্চ আদর্শ অনুরূপ কার্য্য সম্পাদনে ও নির্দ্ধারণে সহায়তা করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। এইরূপে শ্রীদরবার নববিধান-মূর্ত্তিমান ব্যক্তি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, নববিধান জগতে স্থিতিস্থাপকরূপে প্রতীয়মান হইবে। মা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাহাই হয়।

সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

মহাপ্রয়াণ-যোগ।

সুগম্ভীর ৮ই জানুয়ারীর পূর্ব্ব রজনী শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের মহাপ্রয়াণ-প্রকোষ্ঠে কেহ কেহ রাত্রি জাগরণ করেন। প্রত্যুষে ৭টার সময় সমস্বরে ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ ও ৯টার সময় উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ নিম্নলিখিত ভাবে উপাসনা করেন। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন ও ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র সেন আচার্য্য-দেবের প্রার্থনা ও আচার্য্য-পত্নীর প্রার্থনা উচ্চারণ করেন। সন্ধ্যা ৬টায় আলবার্ট হলে স্মৃতি-সভা হয়।

উদ্বোধন।

সেই কালভৈরবীর উপত্যকায় যখন "এলি, এলি, লামা সবক্থানি"—"বাবা বাবা, তুমিও কি আমায় ত্যাগ কল্লে" বলে

ব্রহ্মনন্দন ঈশা ক্রুশোপরি কেঁদে উঠলেন, তখন নাকি ধরা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল। যখন বিশাল শালতরুতলে কুশি-বনে শ্রীশাক্যমুনি মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়ে ধরাধাম ত্যাগ কল্লেন, তখনও নাকি সে বনের পশু পক্ষীরাও কাঁদিয়া আকুল হয়েছিল। আর কালকার দিনে গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, আমার ব্রহ্মানন্দ যে "বাবা বাবা মা মা" বলে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ কত্তে কত্তে, এ দীন সেবকের বুকে পা রেখে, আবার হাসিভরা মুখে আজকার মহাদিনে স্বর্গে আরোহণ কল্লেন, তখনও যে এ সহরের পথ "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" ধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিত হয়েছিল, শ্মশান-ভূমি লোকে লোকারণ্য হইয়া মহা উৎসব-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। আজ আমাদের নেতা, আমাদের পিতা, আমাদের আচার্য্য, অগ্রজ ভ্রাতা, আমাদের প্রাণের ব্রহ্মানন্দ কি আমাদের ত্যাগ করে গেলেন? হায়! সেই শ্মশান-ভূমির প্রজ্বলিত চিতানলে যে দেবকান্তি আমরা বিসর্জ্জন দিয়ে, চারটী ভস্ম বুকে করে এনে এখানে রাখলাম, সেই ভস্ম দেখে আজ তেমনি করে আমাদের পাপ অপরাধ ও আত্মবিস্মৃতির জন্য "বাবা বাবা, মা মা বলে" আর্ত্তনাদ করি। ব্রহ্মনন্দনের সঙ্গে ক্রুশাহত দস্যুর ন্যায়, আমরাও আজ আমার ব্রহ্মানন্দের ভস্ম বুকে রেখে, তেমনি করে তাঁর সঙ্গে হাসতে হাসতে সানন্দে স্বর্গের যোগে মগ্ন হই। যদি আনলেন মা আমাদের আজ এই মহাপ্রয়াণ-তীর্থে, মা দয়া করে তবে সেই মহা যোগ-সাধনায় আমাদের প্রবৃত্ত করুন, সিদ্ধি বিধান করুন।

আরাধনা।

সত্যং "আমি আছি"। এ কি তোমার ভয়ঙ্কর রূপ? তুমি আছ আমাদের? তবে এমন অন্ধকার রূপ ধরে এলে কেন? সত্যই কি "বজ্রমুদ্যতম্"—বজ্রধারী আমাদের একেবারে চূর্ণকারী হয়ে আছ? ভয়ানক সত্য, ডাকাতে সত্য, সর্ব্বস্ব-হরণকারী সত্য হয়ে তুমি যে আজ প্রকাশিত!

তোমাকে চিনি না বলে ব্রহ্মানন্দ বল্লেন, "আমার মাকে তোরা চিন্‌নি নে।" তোমাকে কিছুই আমরা চিনলাম না বলেই কি, আমাদের কাছ থেকে সে সোণার দেহকে ভস্ম করে নিরাকার চিন্ময় করে তুমি নিলে? তোমাকে চিনিনি। তোমাকে দেখতে শুনতে হয় বল্লেন, তা দেখলাম না। তোমার কথা শুনলাম না, তাঁরও কথা শুনলাম না বলে কি তাঁকে তুলে নিলে?

কোথায় লুকালে তাঁকে? তোমারও নাগাল পাই না, তাঁকেও ধত্তে পারিনে। কোথায় তোমার অনন্ত বক্ষের ভিতর, অনন্ত আঁধারের ভিতর সে আঁধার ঘরের মাণিককে লুকালে? অনন্ত তুমি, তোমার লীলা কে বুঝবে?

অনন্ত তোমার ভালবাসা। কেমন করে সন্তানকে ভালবাসতে হয়, আদর কত্তে হয়, তা তুমি জান। সে ভালবাসার আমরা কি জানি? তাই কি তোমার বুকের ভিতর তাঁকে তুলে নিলে, আমরা ভালবাসলাম না বলে, যথার্থ আদর কল্লাম না বলে? তুমি যে বড্ড ভাল মা, তিনি বল্লেন। তাই যত্ন করে সে তোমার সন্তান-রত্নকে রাখবে বলে কি তুমি কোলে নিলে?

তাই চিন্ময়ের কোলে চিন্ময়, জ্যোতির কোলে জ্যোতি কে দেখবিরে আয়। অদ্বৈত, তোমাতে একাকার করে নিয়েছ। এক অখণ্ড অদ্বৈত তুমি, তোমাতে তোমার সন্তানকে এক করে রেখেছ। তিনি যে আমাদেরও তাঁর সঙ্গে গেঁথে নিয়েছেন। হিমালয়ে বড় বড় শৃঙ্গ আছে বটে, আবার উচ্চ পাহাড়ের উপর তৃণ মাটীও আছে; তাই আমার মত তৃণ মাটীকেও সে অখণ্ড দেহে গেঁথে, মর্ত্তে এক অদ্বৈত মানব যে তাঁকে করেছিলে।

তাই আজ বুঝি, তোমার সোণার অঙ্গে তাঁকে সোণা করে নিলে, আমার মত লোহাকেও সোণা করে, পরিবর্ত্তিত নূতন করে, স্বর্গীয় করে নেবার জন্য। সোণা হয়ে গেলাম বল্লেন। হে পুণ্যময়, আমরাও মাটী হয়েও সোণা হয়ে যাবো, তাই কি তোমার এই চিতাগ্নি পুণ্যাগ্নি জ্বেলেছ?

তোমার হাসা-মুখ দেখে সে মুখে এত হাসি! সে হাসি মৃত্যুকে জয় কল্ল। তাই শ্মশানেও যে সে মুখে অপূর্ব্ব হাসি! আনন্দ-ময়ী হাস্যময়ী মা তুমি; তাই তিনি বল্লেন, "আমার আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইরে, তোরা সুখী হোস, আমার মাকে ছেড়ে আর অন্য সুখ অন্বেষণ করিসনি।" আনন্দময়ী, পরিপূর্ণ "আনন্দম্" তুমি। নিরানন্দ, শোক, তাপ, বিচ্ছেদ ভুলিয়ে, নিত্যানন্দে ব্রহ্মানন্দে ভরে দেবার জন্যই, তুমি আনন্দময়ী মা হয়েছ। আজ তোমারই শরণাপন্ন হই। একান্তমনে তোমারই উপর নির্ভর করি। ভক্তিভাবে সবে মিলে তোমারই চরণে আজ লুণ্ঠিত হই।

ধ্যান।

মহাপ্রয়াণের সময় আগত। আর কথা সরে না। বাক্য বন্ধ হও, মন স্তম্ভিত হও, আত্মা এখন ধ্যানস্থ যোগস্থ হও। যদি পারি ডুবতে সেখানে, ডুবলেন তিনি যেখানে। "ডুবিলাম ডুবিলাম প্রাণারাম-সাগরে। পেয়েছি সন্ধান, রত্নের ভাণ্ডার, ফিরিব না আর।" আর যেন মন না ফেরে। অনন্ত সরবতে জল অবগাহিত। ঢাল, উপর কর্ত্তে কর্ত্তে তদ্গত ও তন্ময় হয়ে যাই। সে রূপ-সাগরে ক্ষণকাল ডুবে যাই।

ভাই গোপালচন্দ্রের প্রার্থনা।

হে অনন্তলীলাময়ী জননী, তোমার কোন্ ভক্তকে কে কবে চিনেছে? ঈশাকে, বুদ্ধকে, মহম্মদকে তাঁদের শিষ্যগণ কই তেমন চিনেছিলেন? তোমার ব্রহ্মানন্দকেও কই কেউ চিনতে পাল্লেন না, তেমনি করে গ্রহণ কর্ত্তে পাল্লেন না। আমরাও চিনতে পারি নাই। তাঁকে কে চিনবে, কে ধরবে? কত বড় তাকে করেছ! সকল ধর্ম্মের স্রোত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সকল স্রোত আবার তিনি খুলে দিলেন, অনন্ত ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত কল্লেন। সে ধর্ম্ম ভবিষ্যতে গৃহীত হবে। হবেই হবে। আমরা যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ জীবন গ্রহণ কর্ত্তে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিবাচন-প্রার্থনা।

মা জীবন্ত জাগ্রতরূপিণী জননী এখানে জীবন্তরূপে বর্ত্তমান থেকে, তাঁর ভক্তের প্রার্থনা ও ভক্ত-সতীর প্রার্থনা শ্রবণ করালেন। আশীর্ব্বাদ করুন, যদি তাঁর সন্তানের মহাপ্রয়াণ-যোগ-সমাধিতে আজ আমাদিগকে মিলাইলেন, তবে আমরাও যেন তাঁহার সহিত পুনরুত্থান করতে পারি। মা, তাঁহাকে তুমি জগতের পুনরুত্থান-মূর্ত্তিমান করে প্রেরণ করেছ। তাঁতে ঈশার পুনরুত্থান, মুষার পুনরুত্থান, সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির, সমস্ত পৃথিবীর পুনরুত্থান সমাধান করেছ। আর আমাকে এবং আমাদিগকে তুমি তাঁরই অঙ্গে গেঁথেছ। আমাদের প্রাণ-পাখীকে যদি উড়ালে, খাঁচাকে কেন ভেঙ্গে ফেলবে? আমরা কেন পড়ে থাকবো? আমাদেরও জীবনের গতি ঐ দিকে ফিরিয়ে দাও, আমাদের মন-পাখীকে উড়িয়ে নিয়ে যাও ঐ স্বর্গে, তাঁর সঙ্গে আমরা আজ পুনরুত্থিত হই। আমাদের শোক, তাপ, নিরানন্দ আজ নির্ব্বাণ কর। ভক্ত-অঙ্গে ভক্ত-সঙ্গে গেঁথেছ যদি, ভক্ত-অঙ্গচ্যুত আমাদের করোনা, যোগানন্দে ব্রহ্মানন্দে আমাদের মগ্ন কর। তোমার চরণে কাতর-প্রাণে এই ভিক্ষা করে, সর্ব্বজন-সঙ্গে মিলে তোমাকে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

সংঘোৎসবের শান্তিবাচন।

(ভাই প্রিয়নাথের নিবেদন)

নববিধান-সংঘে সমাগত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই ভগ্নীগণ,

নববিধান-বিধায়িনী জননীর শুভাশীর্ব্বাদ আপনাদের মস্তকে বর্ষিত হউক। আপনারা বিভিন্ন স্থান হইতে নানাপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যে এখানে শুভাগমন করিলেন এবং নববিধান-সেবা-সাধনায় আপনাদের সহযোগিতা ও আধ্যাত্মিক সঙ্গ দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন, এজন্য শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

আপনাদের উপাসনা, উপদেশ, সংকীর্ত্তনাদিতে যোগ দান করিয়া সত্যই আমরা যথেষ্টই উপকৃত হইয়াছি। নববিধান-জননী যে এমনই করিয়া পরস্পরের ভাবের বিনিময় করিবার সুযোগ দিয়া আমাদিগকে ধন্য করিলেন, এজন্য তাঁহার চরণে বারবার লুণ্ঠিত হইতেছি। এক্ষণে নববিধান প্রচার, নববিধানের গৃহ-পরিবারে শিক্ষা-সঞ্চার এবং পুস্তকপ্রচারাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় আলোচনা হইল, তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত করিবার যাহাতে ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীদরবার আপনাদিগের সহযোগ ভিক্ষা করিতেছেন।

শ্রীদরবারের সভ্যসংখ্যা বাহ্যতঃ হ্রাস হওয়াতে আমরা যথেষ্টই বলহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং যে কয়জন আছি সে কয়জনও বার্দ্ধক্য-জরাগ্রস্ত হইয়াছি। নববিধান-বিশ্বাসী বিশ্বাসিনীগণ, আপনারা যেমন আমাদের অন্নদাতা এবং প্রতিপালক, তেমনি বিধান-সাধনের সহায় ও পৃষ্টপোষক। নববিধানাচার্য্য শ্রীদরবারকে নববিধানের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে এখনও সেইভাবে ইহা রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনাদের প্রাণগত প্রার্থনা ও সহায়তা আমরা ভিক্ষা করি।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া নববিধানের সেবায় জীবন-মন ও সর্ব্বস্ব দান করিয়া প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিতে প্রেরণা অনুভব করিবেন, তাঁহারা আসিয়া শ্রীদরবারকে পরিপুষ্ট করুন। সাদরে আহ্বান করিতেছি, যাঁহারা বিষয়-কর্ম্ম-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচার-কার্য্য করিবার জন্য ব্রতধারী হইতে চান, তাঁহারাও শ্রীদরবারের সহযোগী সভ্যরূপে আমাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া শ্রীদরবারে বল সঞ্চার করুন।

স্ব স্ব স্থানে পুনর্গমনের পূর্ব্বে, যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নববিধান-সেবায় নিরত রহিয়াছেন, বিশেষভাবে ব্রতগ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহারা শ্রীদরবারের অঙ্গরূপে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্য্য করিলে যথার্থই আমরা কৃতার্থ হইব।

"নববিধান যে একটি অখণ্ড দেহ, ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষ" আচার্য্যদেবের শ্রীমুখাৎ ব্রাহ্মবাণীতে আমরা ইহাই শিখিয়াছি। তাই আমরা যে যেখানে থাকি, একই দেহের অঙ্গরূপে থাকিয়া, নববিধানের সেবায় বাঁচিয়া থাকি ও পরস্পরকে সঞ্জীবিত করি, ইহাই যেন এখন হতে আমাদের সংকল্প হয়।

সংঘের উদ্যোক্তা ভাইভগ্নীদিগকেও এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা-ভিবাদন করি।

—•—

সংঘোৎসব।

নববিধান যে পবিত্রাত্মার বিধান, নববিধানের পঞ্চাশত্তম মহোৎসবে এবং গত সংঘোৎসবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। নববিধানের পঞ্চাশত্তম উৎসবের পূর্ত্তি সম্পাদনের জন্য সংঘোৎসবের আয়োজন হয়। যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া ইহা আরম্ভ করেন, তাঁহারা ধন্য।

১৬ বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌয়ে যে সংঘ হয়, সে সময় নব-ভক্ত-কন্যা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সভানেত্রী হইয়া, সংঘের মিলন-সম্পাদনে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এবং প্রেরিত প্রচারক-দিগের মধ্যে অনেকেই সদেহে উপস্থিত থাকিয়া ইহার সাফল্য-সাধনে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু এবার প্রধানতঃ আমাদের মণ্ডলীর স্নেহের কন্যা শ্রীমতী নির্ঝরপ্রবাই প্রধান উদ্যোগী হইয়া, কতিপয় উৎসাহী সহযোগীর সহায়তায় এই সংঘের আয়োজন করেন। এবার

পবিত্রাত্মার বিশেষ কৃপাতেই, অতি জমাট ভাবে এই সংঘোৎসব সম্পাদিত হইয়া, নববিধানের জয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভক্ত-কন্যা ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারুদেবী শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সভানেত্রী হইয়া, তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক জীবন-প্রভাবে, এই উৎসবের সফলতা-সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা বিধান করিয়াছেন।

নিখিল ভারতবাসী নববিধান-বিশ্বাসী বিশ্বাসিনীগণ সমবেত হইয়া এই সংঘে ব্রতী হইবেন, উদ্যোগিগণের ইহাই আশা ছিল। কিন্তু সকলে না আসিতে পারিলেও, সকল স্থান হইতেই সহানুভূতি-লিপি আসিয়াছিল। প্রধানতঃ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, লক্ষ্ণৌ, পঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে প্রতিনিধিগণ শুভাগমন করিয়া উৎসবে যোগ দান করেন। উৎসবের কার্য্য-প্রণালী সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা গেল।

২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর শান্তিকুটীরে খ্রীষ্টোৎসবের দ্বারা সংঘের উদ্বোধন হয়। ২৪শে খ্রীষ্টমাসডের পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যায় কয়েকটী খৃষ্টীয়ান বন্ধু যোগদান করেন। ২৫শে প্রাতে ময়ূরভঞ্জের দেওয়ান শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন উপাসনা করেন, এবং কথায় ও অনুষ্ঠানে কিছু হবে না, জীবন চাই, প্রেম ও ভালবাসা চাই, এই বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ "সাধুচরিত্র গ্রহণ" প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যায় খ্রীষ্টমাসট্রী প্রদর্শিত হয়, এবং খৃষ্টের জীবন সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন।

২৬শে প্রাতে নবদেবালয়ে আচার্য্য-পত্নী সতী ব্রহ্মনন্দিনী দেবীর জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, এবং মহারাণী সুচারু দেবী, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীমতী হেমলতা চন্দ বিশেষ প্রার্থনা করেন; ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র আচার্য্যদেবের ও সতী দেবীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে সঙ্গীতের মধ্যে মধ্যে অংশবিশেষ পাঠ করেন এবং বাঙ্গলা, ইংরাজী ও হিন্দী সঙ্গীত যোগে আরতি হয়।

২৭শে প্রাতে, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন, আচার্য্যদেবের "অভিন্নহৃদয় পরিবার" সম্বন্ধীয় প্রার্থনা যোগে শান্তিবাচন করেন। তৎপর সংঘের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভ্রাতা ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, আচার্য্যদেবের প্রার্থনাযোগে সমাগত যাত্রীদিগকে আহ্বান ও অভ্যর্থনা করিয়া, নববিধানের মহোচ্চ আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে ইংরাজীতে সুন্দর অভিভাষণান্তে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুচারুদেবীকে সভানেত্রীর পদে বরণ করেন। শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ এবং সিন্ধুদেশবাসী রায় বাহাদুর দেওয়ান প্রভুদাস অন্তরের সহিত তাহা সমর্থন করেন। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া, অন্তরের কয়েকটী মধুময় কথায় স্বীয় অভিভাষণ ব্যক্ত করিয়া সংঘের অধিবেশন আরম্ভ করেন। শ্রীমতী ভক্তিসুধা হেমরাজ লক্ষ্ণৌএ প্রথম সংঘের বিবরণ হিন্দিতে বলিলে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় যে সমুদয় সহানুভূতি-সূচক তার পাইয়াছেন, তাহা পাঠ করেন। তাহার পর ভাই প্যারী মোহন, ভাই প্রমথলাল, শ্রীমতী মুক্তকেশী দত্ত ও শ্রীমতী কুমারী সত্যবতী রায়ের পরলোকগমন হেতু শোক-সম্মান-প্রকাশ-সূচক নির্দ্ধারণ হয় এবং জ্যেষ্ঠদের মধ্যে প্রধানতঃ সিন্ধুর দেওয়ান তারাচাদ, ডাঃ রুমেন, ভাই মহিমচন্দ্র, ভাই দুর্গানাথ, ভাই বিহারীলাল এবং ডাঃ পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করা হয়।

অপরাহ্নে শান্তিকুটীরে, সান্ধ্য-সম্মিলন হয়। এই উপলক্ষে বালকবালিকাগণ নববিধান-নিশানের জয়গান করে, নববিধানের মাহাত্ম্য বিষয় মহারাণী সুচারুদেবী, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বক্তৃতা করেন এবং ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র একটী পদ্য পাঠ করেন। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন যোগে উপাসনা ব্রহ্মমন্দিরে হয়।

২৮শে রবিবার, প্রাতে, ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। পরে দেওয়ান প্রভুদাসের সভাপতিত্বে সংঘের অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকার, ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার, ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসু, মিসেস ভক্তিসুধা হেমরাজ, মিসেস প্রমীলা জগ্তিয়ানী, ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় এবং সভাপতি দেওয়ান সাহেব বিভিন্ন-স্থানীয় সমাজ সমূহের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত দেওয়ান প্রভুদাস হিন্দিতে মন্দিরে অ[illegible] সুন্দর হৃদয়গ্রাহী উপাসনা করেন।

২৯শে প্রা[illegible] ডাঃ সুরেশচন্দ্র বসু মন্দিরে উপাসনা করেন। [illegible] শ্রীম[illegible] জগ্তিয়ানীর সভানেতৃত্বে সংঘের অধিবেশন [illegible] শ্রীমতী মণিকা মহলানবিস একটী প্রবন্ধ [illegible] পাঠ [illegible], তৎপর মিসেস ভক্তিসুধা হেমরাজ, প্রফেসার [illegible] মিস সুশীলা সেন, মিস বনলতা দে, শ্রীমতী [illegible] অশোকলতা দাস, শ্রীমতী সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] সেন এবং সভানেত্রী ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে বলেন। সন্ধ্যায় শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন "নবযুগের নূতন ডাক" সম্বন্ধে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আরম্ভে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রার্থনা করেন।

৩০শে প্রাতে, মিসেস ভক্তিসুধা হেমরাজ হিন্দিতে উপাসনা করেন। আচার্য্যের "সহজ বিশ্বাস" ও ভাই প্রমথলালের সাধারণ প্রার্থনা হিন্দিতে ভাষান্তরিত করিয়া পাঠ করেন। প্রার্থনান্তে শ্রীমতী বীণা রায় ও শ্রীমতী তৃপ্তি হেমরাজ ধর্ম্ম-প্রবেশ-ব্রত নেন। প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের উপস্থিত করেন এবং ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ব্রতদান করেন।

পরে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর সভাপতিত্বে সংঘের অধিবেশন হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র "জুবিলী ও শতবার্ষিকী পুস্তক" প্রচারের আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু বলিলে, অধ্যাপক নিরঞ্জন

মিস্যোগীর ও দেওয়ান তারাচাঁদের লিখিত প্রস্তাব ডাঃ সত্যানন্দ পাঠ করেন। অতঃপর ভাই অক্ষয়কুমার লধ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু, মিসেস হেমরাজ, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই চন্দ্র মোহন দাস, শ্রীযুক্ত ভক্ত বসু, দেওয়ান প্রভুদাস, কুমারী নির্ভর প্রিয়া ঘোষ ও সভাপতি মহাশয় পুস্তকাদি প্রচার বিষয়ে কিছু কিছু বলেন।

১১-৩০ মিনিটে সংঘের অধিবেশন স্থগিত করিয়া, শান্তি-কুটীরে অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়কে সাদর অভিনন্দন করা হয়। শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ প্রার্থনা করিলে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ ভাই চন্দ্রমোহন দাস রৌপাপদক দান করেন; তৎপর সংঘের সভানেত্রী মহারাণী সুচারু দেবীর প্রদত্ত খদ্দরের ধুতি ও চাদর প্রদত্ত হয়। অধ্যাপক দ্বিজদাস বাবু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আত্মনিবেদন করেন।

মন্দিরে অপরাহ্ণ ৪টার সময় শ্রীমান্ ক্ষুপেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে যুবকদিগের সংঘের অধিবেশন হয়। "কেশবের ব্রহ্মদর্শন" বিষয়ে শ্রীমতী বাণী বোসের ইংরাজী প্রবন্ধ শ্রীমতী সুহাসি ঘোষ পাঠ করিলে, শ্রীমতী শোভা সেন "মহাপুরুষ" বিষয়ে স্বীয় বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর যুবকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুধীর খাস্তগির, বিজয়মোহন সেন, যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস, ডাঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্র সেন, দেওয়ান প্রভুদাস ও মিসেস হেমরাজ কিছু কিছু বলেন।

শ্রীমতী মণিকা দেবীর কাছে নিম্নলিখিত চারিটী বালিকা ব্রত গ্রহণ করেন:—কুমারী চিত্রা জগ্‌ওয়ানী, কুমারী ঋতা, শ্রীমতী মণিকা বসু ও রেণুকা বসু।

সন্ধ্যা ৬টায় অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে আবার সংঘের অধিবেশন হয় ও একটী সংঘ কমিটী গঠিত হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও অদ্যকার সভাপতি সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দান করেন। তৎপর ভাই অক্ষয়কুমার লধ সংঘের প্রাণস্বরূপ শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষকে ধন্যবাদ দান করিলে, শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, মণ্ডলীর পক্ষ হইতে ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ সেন সংঘের উদ্যোগ-কর্ত্তা ও আগন্তুক যাত্রী এবং সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দান করেন।

ভাই প্রিয়নাথ শান্তিবাচনের উপাসনা করিয়া উৎসবান্ত করেন, ভাই চন্দ্রমোহনও প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথের নিবেদন স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

—০—

ব্রহ্মানন্দকে কি ভুলিতেছি?

(২)

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ যে আলোক ধরিয়া নববিধানে আসিয়া পৌঁছিলেন, সে আলোক বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়মতন্ত্র হইতে সমুদ্ভূত। তাঁহারই নিয়মে সূর্য্যালোক আসিতেছে। সূর্য্য তাঁহারই নিয়মতন্ত্রে নিয়মিত। বিধাতার মঙ্গল বিধানে তাঁহারই আলোক ব্রহ্মানন্দের ভিতরে আসিল। সূর্য্য যেমন বিঘ্ন বাধা না মানিয়া, উপযুক্ত সময়ে আকাশের অন্ধকার ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আলোক বিধান করে, সেইরূপ তন্ত্র, মন্ত্র, গ্রন্থ প্রভৃতির বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মানন্দের ভিতরে ব্রহ্মালোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মানন্দ কেশবের ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই পূর্ব্বতন ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদমন্ত্র, বেদগ্রন্থ, পৌরোহিত্য প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া প্রভাত-সূর্য্যের মত প্রকাশিত হইল। আমরা কি সেই ব্রহ্মানন্দের ভিতরে ব্রহ্মের মহাশক্তির প্রকাশ ভুলিয়া যাইব? ভিতরে যদি ব্রহ্ম-শক্তির প্রভাব অনুভূত না হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল না। নববিধান আর কিছুই নহে, সেই ব্রহ্ম-শক্তির নবীন প্রভাবই নববিধান। সরোবর যদি জলশূন্য হইয়া যায়, তবে আর সে সরোবর নহে। সূর্য্যমুখী যদি আর সূর্য্যের দিকে মুখ না ফিরায়, তবে আর সে সূর্য্যমুখী নহে। রজনী-গন্ধা যদি আর গন্ধ বিস্তার না করে, তবে আর সে রজনীগন্ধা নহে। আমাদের নববিধান কি ব্রহ্মশক্তিবিহীন হইয়া সেইরূপ হইবে? ব্রহ্মানন্দ যখন নববিধানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন এত লোক মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলেন কেন? তাঁহারা কি তাঁহার সেই বাহিরের মূর্ত্তি দেখিতে আসিয়াছিলেন? তাঁহারা কি আকর্ষণে কোন্ ভাব লইয়া, তৎকালীন জাতীয় গৌরব মান সম্ভ্রম ভুলিয়া গিয়া, মেষ-শিশুর মত ভগবানের নিকট অবনত হইলেন? এখন আর সে ভাবে মেষ-দলে নবীন মেষের প্রবেশ নাই।

আজ পরিবার ব্রহ্মোপাসনাবিহীন। ভীষণ পার্থিব বাসনা ও দুর্দ্দমা স্বার্থ মুখ ব্যাদান করিয়া, সেই "স্বার্থনাশন্ত বৈরাগ্যং" বিনির্মিত পারিবারিক জীবনকে গ্রাস করিতেছে। মাঠ তৃণশূন্য হইলে সে মাঠে তৃণভোজী মেষ আর আসে না। ব্রহ্মোপাসনা-বিহীন ব্রাহ্মসমাজ যে প্রাণহীন কঙ্কালের মত দণ্ডায়মান, আজ সে জন্য কে দায়ী? আমরা কি আমাদের এ দায়িত্ব অনুভব করিব না? গৃহে যদি উপাসনা না রহিল, ব্রহ্মমন্দিরের সঙ্গে যদি যোগ না থাকিল এবং পরিবারের নরনারী যদি ভগবানের নামে প্রতিদিন মিলিত না হইলেন, তবে আমাদের পরিবারত্ব কোথায় রহিল? ভাই ভগ্নী! একবার চাহিয়া দেখ, এখনও হিন্দু-পরিবারের পুরুষ ও নারী পূজার ক্ষেত্রে কত ব্যস্ত। এখনও পরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণও পূজার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে দেবতার সম্মুখে মস্তক অবনত করিতেছে। এখনও প্রাণের নূতন আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া, কত সুদূর প্রদেশ হইতে তীর্থ-যাত্রী তীর্থ-স্থানে উপস্থিত হইতেছেন। এইত সে দিন প্রয়াগ-তীর্থে কুম্ভ-মেলায়, নবীন উদ্যম নবীন উৎসাহ ও নবীন প্রাণ লইয়া, সমুদায় শারীরিক কষ্ট ভুলিয়া গিয়া, চল্লিশ লক্ষ তীর্থ-যাত্রী ভারতের নানাদিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপ তীর্থ-

প্রভাবের দৃশ্য কি নববিধানভক্ত নবীন সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের সময়ে ফুটিয়া উঠে নাই? সেই সহস্র সহস্র শ্রোতৃবর্গপূর্ণ টাউনহল এখন কোথায়? এখন সেই নানাধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্ম-পিপাসুদিগের জনতাপূর্ণ ব্রহ্মমন্দির কোথায়? এখন সেই কলিকাতা-নগরীর প্রশস্ত রাজপথে সেই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্তদলের প্রবাহ কোথায়? কেশবের পথ না ধরিলে ব্রাহ্মসমাজ কি দাঁড়াইতে পারিবে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশব না হইলে, নববিধানে আমাদের স্থান কোথায়? কেশব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্‌ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশা হইতে বলিয়া গেলেন; আজ সে পলত্ব ও সে ঈশাত্ব কোথায়? লোক-মণ্ডলী কেবল মত শুনিবেনা, উপদেশেও আসিবেনা; তাহারা মানুষ দেখে, মানুষ চায়। একজন পাশ্চাত্য ভক্ত শিষ্যকে এই বলিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, "Be a book." "They do not read the Bible much. They read us."—"একখণ্ড পুস্তক হও। তাহারা বাইবল্‌ পড়ে না। তাহারা আমাদিগকে অধ্যয়ন করে।" তাই নববিধানে জীবনবেদের মাহাত্ম্য।

"নববিধান" ব্রহ্মানন্দের জীবনবেদ। ইহা বিধাতার বিশেষ বিধান। যে দেশে কোন্‌ অচিন্তনীয় অতীত হইতে ভারতীয় প্রভু ঋষি, মুনি ও তপস্বীদিগের সাধনস্থান্‌ অভ্রভেদী হিমালয় দাঁড়াইয়া আছে, যে দেশে পঞ্চদিক্‌ হইতে পঞ্চনদ আসিয়া এক বিশাল জলরাশিতে মিলিত, যে দেশে মানব-জীবন-প্রসূত বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম ও পুণ্যের পঞ্চপ্রদীপে দেবতার আরতি, যে দেশে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিধারা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার মিলন রূপে মহাসঙ্গমে সম্মিলিত এবং যে দেশে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম-বিধান এক সুবিস্তৃত ও সুবিশাল ভূমিতে এক অসাম্প্রদায়িক সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই দেশে সময়ের পূর্ণতায় এই মহামিলনের আদর্শরূপ ভক্ত ব্রহ্মানন্দের অবির্ভাব। ব্রহ্মানন্দের প্রাণের গভীর অন্তস্তল হইতে "সকল ধর্ম্ম সত্য" এই মহা ভাবের স্রোত উত্থিত হইয়াছিল। একাধারে সমস্তের সমন্বয়।

ব্রহ্মানন্দের পথ কি আমরা ধরিয়াছি? সে মহাভাব কই? কই আমাদিগের ভিতর বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম ও পুণ্যের মিলন? কই ভিতরে পঞ্চনদ ও ত্রিবেণী? কই সে প্রেমভক্তির "নববৃন্দাবন"? নববিধান কি আমাদিগের ভিতরে এক সাম্প্রদায়িক স্বল্প ধারায় প্রবাহিত হইবে? কই আমাদিগের ভিতরে সেই ভারতীয় ঋষিভাব? নববিধানে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানব-পরিবারের সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃত্ব প্রত্যক্ষ করিলেন। আমাদিগের সে দর্শন-শক্তি কই আসিল? সে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কথা দূরে থাকুক, আমরা এক পরিবারেও ভাই ভগ্নী মিলিতে পারিলামনা। "যে ভাইকে ভালবাসিতে পারেনা, সে আমাকেও ভালবাসিতে পারেনা।" এই মহা সত্য ও সাধনা হইতে আমরা কতদূরে গিয়া পড়িতেছি! বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, প্রেম ও পুণ্য যেন একটা মন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে! আমাদের জীবন যদি এই সমস্ত উপাদান-বিহীন হল, তবে আমাদের ভিতর নববিধানের গৃহ রচিত হইবে না। কেবল শুষ্ক ইষ্টক খণ্ড লইয়া গৃহ রচিত হয় না। পাঁচটা মস্‌লা মিলাইয়া ইষ্টকের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

ব্রহ্মানন্দ বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম ও পুণ্য এই পঞ্চ ভাবের পঞ্চপ্রদীপে ব্রহ্মারতি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিদিনের জীবনে নববিধানের মহামিলনের এ আরতি হইত।

আজ ব্রাহ্মসমাজে কত প্রেমের অভাব! পারিবারিক আদান প্রদান ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিষয়েও ধনী ও দরিদ্রের বিচার চলিতে-তেছে! এই উভয়ের মধ্যে এমন ব্যবধান পড়িয়া যাইতেছে যে, এই দুই শ্রেণীর ভিতর একটা জাতিভেদের আভাস ক্রমে ক্রমে দেখা দিতেছে! কোথায় জাতি ও সম্প্রদায় আমরা ভুলিতে আসিলাম, এখন দেখছি, ভেদবুদ্ধি ভিতরে ভিতরে উচ্চনীতি ও উচ্চভাবকে অন্তঃসার-শূন্য করিয়া, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে শুষ্ক তরুর ন্যায় বিশ্রী করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব নববিধান-বিশ্বাসী ভাই ভগ্নীগণ! তোমরা ব্রহ্মানন্দের পথ ভুলিও না। নববিধানের নবীনত্বকে ভিতরে জাগ্রত রাখিয়া চলিতে থাক। ফুল শুকাইয়া গেলে, আর সৌন্দর্য্য থাকে না। শুকনো ফুলে পূজা হইবে না। সরোবরে নিত্য নূতন পদ্ম ফোটে। ভাই! ভক্তির সরোবরে নববিধান-পদ্ম নিত্য নূতন থাকুক।

নামকুম, রাঁচি। সেবক—গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সংবাদ।

জন্মোৎসব—গত ১৭ই ডিসেম্বর, ৮৪নং অপারসার্কুলার রোডে, নববিধানাশ্রমে, আমাদের প্রিয়তম শ্রদ্ধেয় ভাই নালুদার জন্মোৎসবে অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত উপাসনা করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ২রা জানুয়ারী, হাওড়া—উত্তরবাঁটরায়, ১৯নং কুচিল সরকারের লেনে, স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার দাসের দৌহিত্র, লক্ষ্ণৌপ্রবাসী স্বর্গীয় নীলমণি ধরের পৌত্র, শ্রীমান্‌ শর্ব্বরীকান্ত ধরের নবজাত পুত্রের শুভজাতকর্ম্মানুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ৬ই নবেম্বর, উক্ত গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান্‌ নবজাত শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নামকরণ—গত ৫ঠা জানুয়ারী, হাজারিবাগে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষের গৃহে, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রেমাদিত্য ঘোষের চতুর্থ সন্তান দ্বিতীয় পুত্রের শুভনামকরণ অনুষ্ঠানে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন এবং শিশুকে "সৌমেন্দু" নাম প্রদান করেন। ভগবান্‌ শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহাশীর্ব্বাদ—গত ২রা, জানুয়ারী, ১০নং নারিকেল বাগান লেনে, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের

পৌত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বীণার সহিত, লাহোর-প্রবাসী স্বর্গীয় মধুসূদন সরকারের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অশোককুমার সরকারের শুভবিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। ভগবান্ শুভাশীষদানে তাঁহার পুত্র কন্যাকে নবীন জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা জানুয়ারী, ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউট ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে, তাঁহাদের মাতৃদেবী স্বর্গগতা স্বর্ণলতার সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন; শ্রীমতী অশোকলতা দাস বিশেষ প্রর্থনা করেন, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে মাতৃজীবনের কথা বলেন :—

প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দের সহধর্ম্মিণী গৃহলক্ষ্মী মাতৃদেবী স্বর্ণলতা ১৬ বৎসর হইল, শুভদিনে উৎসবের আরম্ভে, নববর্ষের প্রথম উষায়, দিব্যধামের অনন্ত উৎসবে গিয়া মিশিলেন। মিলনই তাঁর প্রাণের সর্ব্বস্ব ছিল। মণ্ডলীর সঙ্গে তিনি যাবজ্জীবন এক যোগে যুক্ত ছিলেন। নববিধানের সকল গুণের সমন্বয় দেবীর জীবনকে প্রস্ফুটিত করেছিল; কিন্তু আজ এই সম্বৎসর হওয়ার দিনে বেশী করে মনে পড়ছে, মাতৃদেবী কেমন করে আপনাকে ভুলে মণ্ডলীকে বেশী করে ভালবেসেছিলেন। যখন শ্রীআচার্য্যদেবের তিরোধানের পর একটা অসম্মিলনের ভাব আসে, তখন দেবী স্বর্ণলতা প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। প্রাণের প্রিয় ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত আবার কিরূপে মিলন হবে, যে ধর্ম্ম-মিলন, প্রাণের বন্ধন চির সুখের ছিল, সেই সকল চিন্তা আলোচনায় নিমজ্জিত হয়ে সেই বৎসরেই কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। মাতৃদেবী ভারতাশ্রমের সেই সুখের ধর্ম্ম, ভাই ভগিনীর মিলনের কথা চিরদিন আমাদের কাছে বলিতেন। সেই স্বর্গীয় মিলনের ছবি তাঁর জীবনকে চির শোভিত রেখেছিল। আজ তাই তিনি স্বদলে মিশে স্বর্গবাসে চির উৎসব সম্ভোগ করছেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ মাঘোৎসবে ১৲ টাকা দান করেন।

নামকরণাদি—ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস লিখিয়াছেন :—তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বেথুন কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ সুধেন্দুকুমার দাসের প্রথম পুত্রের নামকরণ, গত ৩১শে ডিসেম্বর, কলিকাতাস্থ বাস-ভবনে, ৯।১ এইচ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, সম্পন্ন হইয়াছে; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করিয়া শিশুকে "দেবব্রত" নাম প্রদান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে গিরিধিতে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার দাস, আই, সি, এসের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল; প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু রামলাল বাবু উপাসনা করিয়া শিশুকে "মিহিরকুমার" নাম প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দাসের বিলাত হইতে গৃহে প্রত্যাগমন উপলক্ষে, ২১শে ডিসেম্বর, তাঁহার ঢাকাস্থ বাসভবনে বিশেষ উপাসনা হয়েছিল; শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই সকল শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবানের শুভাশীষ সকলের মস্তকোপরি বর্ষিত হউক।

—•—

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থ।

(আবেদন পত্র)

মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের কম্পাউণ্ড মধ্যে ভক্তিতীর্থযাত্রীদিগের জন্য একটী দুই কুঠারী পাকা গৃহ নির্ম্মাণের বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও তীর্থযাত্রি-সমিতি স্থির করিয়াছেন। নবভক্ত ব্রহ্মানন্দের প্রাণের মুঙ্গেরকে সোণার মুঙ্গেরে পরিণত করিবার জন্য বিশেষভাবে সরলভক্ত স্বর্গীয় ভাই প্রমথলাল সেন প্রাণপণে যত্নবান্ ছিলেন। তাঁর প্রাণগত সাধনায় ও যত্নে মুঙ্গের তীর্থ পুনরুদ্ধার হইয়া, নবভক্তিসাধনার্থীদিগের একটী সাধনার স্থান হইয়াছে। উপরোক্ত দুই কুঠারী পাকাগৃহ নির্ম্মাণে অনুমান ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা ব্যয় হইবে। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণ এই যাত্রি-নিবাস নির্ম্মাণ জন্য সহৃদয় দাতাগণের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি, দাতাগণ কৃপা করিয়া এই পরিত্রাণপ্রদ শুভকার্য্যে সাহায্যদানে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। দাতাগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে কোষাধ্যক্ষের নামে, অথবা যে কোন ব্যক্তির নামে সাহায্য প্রেরণ করিলে, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে অবনত-মস্তকে তাহা গৃহীত হইবে। ইতি। ১লা জানুয়ারী, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।

১। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন, ট্রষ্টি, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির; ৬০এ, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

২। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ৮৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। কুমারী সুনীতি ঘোষ, ইজাবেলা থোবর্ণ কলেজ, লক্ষ্ণৌ।

৪। ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র, কোষাধ্যক্ষ, যাত্রিনিবাস-ফণ্ড—মুঙ্গের ভক্তিতীর্থ; নারায়ণ ফার্ম্মেসী, ১০৪নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৫। শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু, "লীলালয়", আদমপুর, ভাগলপুর।

৬। কুমারী শান্তিপ্রভা মল্লিক, লেডীডাক্তার, সদর হস্‌পিটাল; মুঙ্গের।

৭। সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়, সহকারী সম্পাদক, মুঙ্গের নববিধান ব্রাহ্মসমাজ; নববিধান আশ্রম, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

—•—

শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি।

শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তির বাঙ্গালা অনুবাদ মাঘোৎসবের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়। মাঘ মাসের মধ্যে যাঁহারা নগদ মূল্যে শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্ত্তি গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা ৫৲ টাকা মূল্যের স্থলে ৪৲ টাকা মূল্যে পাইবেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৫ই মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

একাধিকশততম মাঘোৎসব।

আহ্বান।

নববিধানের দেবতা, আনন্দময়ী মাতা,
ডাকিছেন সবে স্নেহ আদরে।
তোরা আয়রে আয় ভাই, মায়ের কাছে যাই,
গিয়ে প্রাণ জুড়াই ;
গাই আনন্দে মা নাম সমস্বরে।
মা নামে পাষাণ গলে, তুফানে ভাসে জলে,
উথলে হৃদয়ে প্রেম পাথার ;
নিরাশার অন্ধকারে, মা ব'লে ডাকলে তাঁরে,
অন্তরে হয় আশার সঞ্চার।

বিপদে সম্পদে, জননীর অভয় পদে,
একান্তে যে জন লয় শরণ ;
থাকে সে সদানন্দে, নির্ভয়ে নিরাপদে,
করে সুখ-সাগরে সন্তরণ।
মাতৃপ্রেম সহজ সাধন, সহজে করে যে জন,
সহজে যায় সে শান্তিধামে ;
যোগ যাগ কর্ম্ম জ্ঞানে, শান্তি না হয় প্রাণ,
মা নাম ভরসা পরিণামে। (কেবল)

কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে এই কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১লা মাঘ, ১৩৩৭, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩১, বৃহস্পতিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬॥০টায় আরতি।

২রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, শুক্রবার*—অপরাহ্ণ ৪।০টায় গোলদিঘী প্রান্তরে বক্তৃতা ; সন্ধ্যা ৬॥০টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে (৭৮বি, আপার সার্কুলার রোড) মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিশান বরণ।

৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, শনিবার*—অপরাহ্ণ ৪।০টায় বিডন-স্কোয়ার প্রান্তরে বক্তৃতা ; সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় ও সন্ধ্যা ৬॥০টায় উপাসনা।

৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, সোমবার*—অপরাহ্ণ ৪॥০টায় ওয়েলিংটন প্রান্তরে বক্তৃতা ; সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা।

৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক ; ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬॥০টায় স্মৃতিসভা।

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বুধবার*—সন্ধ্যা ৬॥০টায় শান্তিকুটীরে "আমাদের সঙ্ঘের" উৎসব।

৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণে ৯টায় শান্তি-কুটীরে (৮৪নং আপার সার্কুলার রোড) ব্রাহ্মিকা উৎসব।

৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, শুক্রবার*—ব্রহ্মমন্দিরে অপরাহ্ণ ৩—৫টা মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিষ্ঠান-গুলির সুব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও উপায় নির্দ্ধারণের জন্য নববিধানবিশ্বাসিগণের সভা (Conference)। সন্ধ্যা ৬॥০টায় সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা।

১০ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, শনিবার—বালক বালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮॥০টায় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪টায় কলিকাতা ইয়ুনি-ভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে পুরস্কার বিতরণ ও বালক বালিকা-সম্মিলন। (প্রবেশের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র প্রদর্শন আবশ্যক হইবে।)

১১ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭॥০টায় কীর্ত্তন, ৮॥০টায় উপাসনা। মধ্যাহ্নে ৩টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ, আলো-চনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা ; ৫॥০টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬॥০টায় উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, সোমবার—নববিধান-ঘোষণার দিন। প্রাতে ৭॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে।

১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—কমলকুটীরে পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব ও সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্ম-মন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, বুধবার—ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীদরবারের উৎসব।

১৫ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার*—৩নং রমানাথ মজুম-দারের ষ্ট্রীটে অপরাহ্ণ ৫টার সময় প্রচার কার্য্যালয়ের উৎসব।

১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শুক্রবার*—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬॥০টায় হিন্দী ভজন।

১৭ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, শনিবার*—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬॥০টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা।

১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণে উদ্যান-সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী, সোমবার*—সন্ধ্যা ৬॥০টায় কমল-কুটীরে নবদেবালয়ে শান্তিবাচন।

* চিহ্নিত দিনে প্রাতে ৮টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে উপাসনা হইবে। সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

ভক্তির অঞ্জলি।

সবিনয় নিবেদন,

মায়ের আহ্বানে তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সমাগমে যে মহোৎসব হয়, তাহাই ভক্তির পরম তীর্থ ও পবিত্র সেবার ক্ষেত্র। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সকলের সেবা করার মত সৌভাগ্য আর কি আছে? ভক্তির ও সেবার ভাবে যথাসাধ্য শক্তি ও অর্থদান এখানেই সম্যক্ সার্থক হয় এবং অনন্ত স্নেহময়ী জননীর প্রচুর আশীর্ব্বাদও লাভ হয়। ভক্তির অঞ্জলীরূপে এই মহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৯৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে, সম্পাদকের নামে অথবা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধের নামে যিনি যাহা পাঠাইবেন, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ১লা, ৯ই ও ১১ই মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে ঝুলি ধরা হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০।

বিনীত
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

Keshub Chunder Sen—Correct statement of some disputed facts in his life.	0 8	6

ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রণীত :—

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা	১৲	৸০
ব্রহ্মগীতা (সম্পূর্ণ)	১৷০	১৶০
ঈশাচরিতামৃত ১ম ও ২য় ভাগ প্রতি খণ্ড	৸০	৷০

Rev. P. M. Choudhury's works :—

সত্য-রত্ন (নূতন পুস্তক)	১৲	৸০
সুনীতি কুসুম	১৲	৸০
প্রতিমা (নূতন সংস্করণ)	৷০	
England & India	1 0	0 12
God's Treasury Part I	0 8	0 6
The Apex of Man	2 0	1 8
God and Man	1 0	0 12

Minister K. C. Sen's works :—

Lectures in India (Published in England by Cassell & Cassell & Co.) Part I and II (Cloth) each	3 0	2 8
Lectures in England—in one Volume	2 8	2 0
True Faith—(English Edition)	0 4	
The Missionary Expedition 1879	0 1	
A Brief Reminiscence	0 1	
Keshub Chunder Sens Portrait	1 0	0 8
Minister in the Attitude of Prayer	0 8	0 4
The New Sambita (In English)—(Pocket Edition)	0 4	0 3
Prayers—A complete record of all the Prayer's Arranged in chronological order. Part II.	1 0	0 12
Essays. Theological and Ethical—in one Volume.	1 8	1 0
Discourses and Writings—Part I	0 8	0 6
The New Dispensation—The Religion of Harmony—Vol. I. & Vol. II. Arranged in chronological order. Revised and enlarged,—each	1 8	1 0
Navavidhan Diary—1931 (Cloth)	0 6	
" " (Paper)	0 4	
প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ	১৶০	৷০
আচার্য্যের উপদেশ ১ম হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড		৶০
দৈনিক প্রার্থনা—(কমলকুটীর) ১ম হইতে ৮ম খণ্ড (প্রতি খণ্ড)	৶০	
হিমালয়ের প্রার্থনা ১ম খণ্ড (নূতন সংস্করণ)	১৶০	
হিমালয়ের প্রার্থনা ২য় ও ৩য় (প্রতি খণ্ড)	৶০	
মাঘোৎসব (নূতন সংস্করণ)	৷০	৶০
সাধুসমাগম (নূতন সংস্করণ)	৷০	৶০
ঐ (পরিশিষ্ট)	৵০	
সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড (নূতন সংস্করণ) সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত	১৲	৸০
ঐ ঐ ৩য় খণ্ড	১৲	৸০
ঐ ঐ ৪র্থ খণ্ড	৸০	৷৶০
ঐ ঐ ৫ম খণ্ড	৷০	৷৶০
দৈনিক প্রার্থনা ১ম ও ২য় খণ্ড (নূতন পুস্তক) প্রতি খণ্ড	৸০	৷০
আচার্য্যের উপদেশ ১ম খণ্ড (নূতন সংস্করণ)	৸০	৷০
ঐ ২য় খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৩য় খণ্ড ঐ	৸০	৷০
ঐ ৪র্থ খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৫ম খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড ঐ	১৷০	১৲
ঐ ৭ম খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৮ম খণ্ড ঐ	১৲	৸০
ঐ ৯ম খণ্ড ঐ	১৷০	১৲
ঐ ১০ম খণ্ড ঐ	১৷০	১৶০

দৈনিক উপাসনা (নূতন প্রকাশিত)	১৶০	৷০
সঙ্গত—(সঙ্গত সভার আলোচনা)	১৲	৸০
জীবনবেদ	৷০	১৶০
প্রার্থনা—(ব্রহ্মমন্দির)	১৶০	৷০
কালানুক্রমিক সূচীপত্র	৶০	
পরিচারিকাব্রত	৵০	
অধিবেশন—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ)	৷০	১৶০
উপাসনা প্রণালী	⁄০	৵০
নবসংহিতা (নূতন সংস্করণ)	৸০	৷০

Rev. P. C. Mozoomdar's works :—

আশীষ (নূতনসংস্করণ)	১৲	
The Silent pastor	0 8	
The Spirit of God (New Edition)	2 0	

Messages and Ministrations of Sri R. Venkata Ratnam in 3 Vols. each	1 8	
The Spiritual of Brahmoism by M. N. Roy, M.A., B.L.	1 8	
নগর-সঙ্কীর্ত্তন	৷০	৷০

নববিধান ট্রাষ্ট।

Life of Protap Chunder Mozumdar Vol. I & II (Bound together)	2 0	1 0
Life of Benoyendranath Sen (In English)	3 0	2 0
" " (In Bengali)	2 0	1 0
উপদেশ ১ম খণ্ড (ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কৃত)	৷০	৶০
উপদেশ ২য় খণ্ড ঐ	১৶০	৷০
উপদেশ ৩য় খণ্ড ঐ	৷০	৶০
Intellectual Ideal (By Prof. B. N. Sen)	1 0	
Lectures and Essays Vol. I. (Literary)	1 8	1 0
Vol. II. (Theological)	1 0	0 12
Vol. III. (Sermons)	0 12	0 8
আরতি	৸০	৷০

JUBILEE PUBLICATIONS

Behold the Man—Prof. Dwijadas Dutt M.A.	Re. 1/8
Keshub as seen by his Opponents—G. C. Banerjee	Re. 1/-
The Way to Prakriti Land—Sujata Devi	-/6/-
Why New Dispensation—Sujata Devi	-/1/-
পরলোকের সন্ধান—সুজাতা দেবী	-/4/-
কেশব-সমাগম—Matilal Das	Re. 1/-
সত্যের সন্ধান—Birendra Maitra	-/1/-
The New Veda—Translated Version of Keshub's Jeevan Veda—J. K. Koar	As. -/8/-
In the Sanctuary of Silence—Nandalal Sen	-/8/-
বৌদ্ধধর্ম্ম ও নববিধান—Bimal Chandra Ghosh	-/6/-
Max Muller on Ramkrishna and Keshub—U. K. Gupta	-/1/-
Faith and Culture of the New Dispensation—Part I	-/2/-
Yoga—Subjective and Objective—By Keshub Chunder Sen	-/4/-
The Evolution of Navavidhan—By Miss N. Ghosh	Re. 1/-
Sloka Sangraha—(Translated in Hindi)—By Late Hari Sundar Bose—	-/8/-
ভক্ত-কেশব—(অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী)	-/2/-
হিন্দী শতগান—(শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ)	-/8/-

শ্রীঅক্ষয়কুমার লধ
কার্য্যাধ্যক্ষ।

নববিধান প্রেস—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আগামী ১লা মাঘ, ১৩৩৭, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩১ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৯শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মসমাজের একাধিকশততম মাঘোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল নগদ স্বল্পমূল্যে, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব-দিনে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ও অন্যান্য দিনে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ প্রচারকার্য্যালয়ে বিক্রয় করা হইবে। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলেও ভিঃ পিঃ যোগে বই পাঠান হইবে।

পুস্তকের তালিকা।

পুস্তক		
ব্রহ্মসঙ্গীত, ১ম ভাগ (নূতন সংস্করণ)	২॥০	২৲
ব্রহ্মসঙ্গীত, ২য় ভাগ (১২৮টী সঙ্গীত)	।০	৶০
অনুষ্ঠান-সঙ্গীত ১ম (ভাই কালীনাথ ঘোষ)	॥০	।৵০
ঐ ২য় ঐ	।০	৶০
নামসুধা ঐ	।০	৶০
আত্মদান ঐ	।০	৶০
বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত (স্বর্গীয় ভাই প্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত)	১৲	৸০
উপদেশাবলী (প্রেরিতগণের উপদেশ)	১।০	১৲
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ (৪ ভাগে সমাপ্ত) (স্বর্গীয় কালীশঙ্কর দাস কৃত)	১৲	॥০
যোগ (রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবিশ)	।০	৶০
বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয় (ভাই মহিমচন্দ্র সেন)	/০	‹১০
অখণ্ড জীবন (স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার)	/০	‹১০
কার্লাইল ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম (By N. C. Mitter.	৵০	/১০
নিবেদন ঐ	।০	।৵০
নববিধান অপরিহার্য্য	৵০	/১০
ব্রহ্মময়ীচরিত (তৃতীয় সংস্করণ)	।০	৶০
প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস (জীবনচরিত)	॥০	।৵০
উপাসনার স্বাভাবিকত্ব (স্বর্গীয় ডাঃ পরেশরঞ্জন রায়ের বক্তৃতা)	/০	‹১০
খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মসমাজ (স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন)	/০	‹১০
শাক্যমুনিচরিত (সাধু অঘোরনাথ কৃত)	১।০	১৲
গোস্বামী রঘুনাথ দাস ঐ	৶০	৵০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ ঐ	॥০	।৵০
দেবর্ষি নারদের নবজীবনলাভ ঐ	‹১০	
নানকপ্রকাশ ১ম ও ২য় ভাগ (স্বর্গীয় ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত) প্রতি খণ্ড	৸০	॥/০
যুবকদের প্রতি উপদেশ (স্বর্গীয় ভাই বঙ্গগোপাল নিয়োগী কৃত)	৶০	৵০
বুদ্ধদেবের জ্ঞান	৵০	/১০
ব্রহ্মোপাসনা	।০	।৵০
নিত্যভিক্ষা	।০	৶০
জীবনবেদের পরিচয় (অধ্যাপক অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)	৵০	
শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু (শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার প্রণীত) ১ম ও ২য় (প্রতি খণ্ড)	১৲	৸০
নবতত্ত্বামৃতম্ (সংস্কৃত) (নূতন পুস্তক) ঐ	১৲	
সতী জগন্মোহিনী দেবী	১৲	৸০
ঐ (কাপড়ে বাঁধা)	১।০	১৲
সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বা নববিধান (অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্তের অভিভাষণ)	।০	৶০
নববিধানের নূতন বেদ—জীবনবেদ (ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের অভিভাষণ)	৶০	/১০
ঋগ্বেদ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ— (অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত) প্রতি খণ্ড	২॥০	২৲

	Rs.	As.	Rs.	As.
Order of Service	o	1		
G. P. Mazumder's works :—				
Life of Bhai Balodeb Narayan	o	4	o	3
The Echoes from Within	o	8	o	6
A Glimpse of the life of Keshub Chunder Sen	o	8	o	4
Keshub Chunder Sen	1	o	o	8

[স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত ।]

পুস্তক		
ধর্ম্মতত্ত্ব (বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন) প্রথম খণ্ড (নূতন পুস্তক)	॥৵০	॥০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ (প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ) প্রতি অংশ	॥০	।৶০
শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম	১॥০	১৵০
গীতাসমন্বয়ভাষ্য (বাঙ্গালা)	৫৲	
বেদান্তসমন্বয় (বাঙ্গালা, কাপড়ে বাঁধাই)	৫॥০	৪॥০
গীতাসমন্বয়ভাষ্যম্ (নূতন সংস্করণ) (সংস্কৃত, দেবনাগর বড় অক্ষরে)	৩৲	২৲
বেদান্তসমন্বয়ঃ ঐ (কাপড়ে বাঁধাই)	৪॥০	৩॥০
গীতাপ্রপূর্ত্তিঃ ঐ	৩৲	২॥০
নববিধানম্ ঐ	/০	‹১০
নবসংহিতা ঐ	৸০	॥০
ভাষাসঙ্গমনী (১ম খণ্ড) ঐ	১৲	৸০
বিশ্বাসবিবৃতিঃ (টীকা ও বাঙ্গলা সহিত)	।০	৶০
কেশবচন্দ্র ১ম ভাগ—বক্তৃতা (কাপড়ে বাঁধাই)	১॥০	১৵
কেশবচন্দ্র ২য় ভাগ—বক্তৃতা (কাপড়ে বাঁধাই)	৸০	॥০
উপাসনাপ্রণালীর ব্যাখ্যা	৶০	৶০
শ্রোতাচারের পুনরাবৃত্তি	/০	‹১০
ত্রিবিধ জন্ম	/০	‹১০
কেশবচন্দ্রের আরূঢ়াবস্থা	/০	‹১০
বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্ব	/০	‹১০
আগাদম ও তত্ত্বাখ্যাতৃগণ	৶০	৵০
গায়ত্রীমূলক ষট্‌চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন	/১০	/০

[স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত]

পুস্তক		
রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন ও উক্তি	৶০	৵০
মহালিপি	।৵০	।০
ধর্ম্মসাধন-নীতি	।৵০	।০
চারিটী সাধ্বী নারী (নূতন সংস্করণ)	।৵০	।০
দম্পতীর প্রতি কর্ত্তব্য	৶০	/১০
মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তৎপ্রবর্ত্তিত এস্লামধর্ম্ম	৸০	॥৵০
হদিসের বঙ্গানুবাদ (পূর্ব্ব বিভাগ)	৪৲	৩৲
হদিসের বঙ্গানুবাদ—(উত্তর বিভাগ চারি খণ্ড)	২৲	১॥০
প্রতি খণ্ড	॥০	।৵০
তত্ত্বসন্দর্ভমালা (নূতন সংস্করণ)	।৵০	।০
এমাম হসন ও হোসয়নের জীবনী (নূতন সংস্করণ)	১৲	৸০
চারিজন ধর্ম্মনেতা (নূতন সংস্করণ)	॥৵০	
হাফেজের বঙ্গানুবাদ (প্রথম ভাগ) (নূতন সংস্করণ—ভাল বাঁধাই)	১৲	৸০
হিতোপাখ্যানমালা ১ম ভাগ (গোলস্তান হইতে সঙ্কলিত)	॥৵০	।০
হিতোপাখ্যানমালা ২য় ভাগ (বোস্তান হইতে সঙ্কলিত)	৸০	॥০
হিতোপাখ্যানমালা ১ম ও ২য় ভাগ (মনোনীতাংশ) প্রতি খণ্ড	।০	৶০
নীতিমালা (কিমিয়ায় সাদত হইতে সঙ্কলিত)	।৵০	।০
তাপসমালা (৬ ভাগে সমাপ্ত)	৩৲	২॥০
তত্ত্বরত্নমালা (মন্তেকোত্তয়র ও মওলানা রোম হইতে সঙ্কলিত)	॥৵০	॥০
মহাপুরুষ চরিত প্রথমভাগ (মহাপুরুষ এব্রাহিম, মুসা ও দাউদের জীবনচরিত) নূতন সংস্করণ	॥৵০	॥০
দরবেশী	।০	৶০
তত্ত্বকুসুম	/০	‹১০
আত্মজীবন	১৲	৸০

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ২য়।৩য় সংখ্যা।

১৬ই মাঘ, ও ১লা ফাল্গুন ১৩৩৭ সাল, ১৮৫২ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
30th January & 13th February. 1931.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, ধন্য হও! তুমি যে আবার মহা উৎসবরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে তোমার উৎসবানন্দ বিধান করিলে। পাপী, তাপী, সংসারাসক্ত, দুর্ব্বল অধম সন্তান আমরা; সর্ব্বদাই পাপ-প্রবণতাবশতঃ আমাদের জীবন রাগ, দ্বেষ, হিংসা স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা এবং বিশেষ ভাবে জঘন্য দুর্নীতি ও পাপের অধীন। সেই পাপের অধীনতা হইতে মুক্ত কারবার জন্যই তোমার এই নববিধানে অবতরণ। "তুমি আছ" "তুমি আছ" সদাই আমরা বলি, কিন্তু আবার মোহের অধীন হইয়া, তোমায় ভুলিয়া পাপে পতিত হই; তাই তুমি কেবল 'আমি আছি' 'আমি আছি' বলিতেছ, তাহা নয়, 'আমি এসেছি' বলিয়া স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিয়া, সকল প্রকার পাপের মলিনতা ধৌত করিয়া, সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া, স্বর্গের আনন্দ ব্রহ্মানন্দ বিধান করিতেই এই মহা মহোৎসব আনিলে। শুদ্ধতা বিনা যথার্থ আনন্দ-সম্ভোগ হয় না। তাই তোমার ভক্তবৃন্দ এবং ব্রহ্মানন্দদল সঙ্গে স্বয়ং যদি অবতীর্ণ হইলে, এবং প্রতিদিন যদি এক একটী নূতন সাধনা দিয়া, স্বর্গের দ্বার খুলিয়া তোমার নবদেবালয়-দ্বারে প্রবেশ করাইলে, আমাদের ধর্ম্মপিতৃপিতামহের প্রতি, নববিধানের প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি, গৃহের প্রতি, শিশুসন্তানদিগের প্রতি, ভৃত্যদিগের প্রতি, দীন দরিদ্রের প্রতি, আমাদের প্রিয় আচার্য্যদেবের প্রতি, ভক্তবৃন্দের প্রতি, দেশহিতৈষিগণের প্রতি, উপকারী বন্ধুদিগের প্রতি, বিরোধী ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি, আমাদের আত্মার প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া, বিশুদ্ধ-চিত্ত করিয়া, তোমার প্রেম-মুখ আরতি-যোগে দেখাইলে, তোমার নববিধান-নিশান আমাদিগের গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করিয়া, সতীভাবে তাহা বরণ করাইয়া তোমার মহামহোৎসব সম্ভোগ করাইলে, তোমার স্বর্গের দেবদেবীদের সঙ্গে নাচাইলে, মাতাইলে স্বর্গের পরমান্ন তোমারি আনন্দবাজার হইতে খাইতে দিলে, তবে আর যেন আমরা পাপের বাড়ী, সংসারের বাড়ীতে না যাই, যেন সত্যই তোমার নববিধানের মঙ্গলবাড়ীতে নিত্য বৃন্দাবন-বাসী হইয়া, সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া, নিত্যানন্দ ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগেই মজিয়া থাকিতে পারি। তুমি একেবারে আমাদের আমিত্ব স্বামিত্ব হরণ কর, সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধাত্মা মুক্তাত্মায় আত্মস্থ কর, এবং নিত্য শান্তি সপরিবারে, সদলে এবং সমগ্র জগদ্বাসী সঙ্গে সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইতে দাও। আর যেন আমরা পাপের

অধীন হইয়া এই স্বর্গচ্যুত না হই, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানের নব মহোৎসবে নব জীবন।

নববিধানের সকলই নূতন। ধর্ম্মও যেমন নবধর্ম্ম, ইহার উৎসবও নব মহামহোৎসব। স্বর্গ এবং মর্ত্তের মিলনই আমাদের মহোৎসব। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ে ও মিলনে যেমন এই ধর্ম্মবিধান, তেমনি স্বর্গের এবং পৃথিবীর সকলকে লইয়া এই উৎসব। কাহাকেও ছাড়িয়া, কাহাকেও বাদ দিয়া এই উৎসব হয় না। তাই এক একটি করিয়া সকল প্রকার সাধনানুষ্ঠান করিয়া প্রস্তুত হইতে পারিলে, তবে এই মহোৎসবে আমরা যোগ দিবার উপযুক্ত হই। বিনা সাধনে, বিনা প্রস্তুতিতে আমরা কেমন করিয়া উৎসব সম্ভোগ করিব এবং উৎসবের স্থায়ী ফল লাভ করিব?

বাস্তবিক উৎসব আর কিছুই নয়, স্বর্গের অবতরণ পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর আরোহণ স্বর্গেতে। স্বর্গের দেবদেবীগণ আনন্দময়ীর ক্রোড়ে স্বর্গে নিত্য উৎসব করিতেছেন, তাঁহাদিগের উৎসবের বিরাম নাই। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গের বিরাম নাই, তেমনি স্বর্গের উৎসবের বিরাম নাই। কেন না, স্বর্গ যে নিত্য আনন্দের রাজ্য, নিত্য উৎসবের রাজ্য; সেখানে সদানন্দ, সদা উৎসব। আনন্দময়ী জননী যেমন নিত্য আনন্দে মগ্ন, তেমনি তাঁহার স্বর্গবাসী দেবদেবী বা অমরাত্মাগণ তাঁহারই প্রভাবে তাঁহারই সঙ্গে নিত্য উৎসব করিতেছেন।

সেই উৎসবের প্রভাব বা হাওয়া যখন পৃথিবীতে বয়, তখনই উৎসব হয়; তাই স্বর্গের অবতারণাতেই উৎসব। যেমন সমুদ্র হইতে ঝড় উঠিয়া পৃথিবীতে বয় এবং পৃথিবীকে তোলপাড় করে, তেমনি স্বর্গের উৎসবের তোলপাড়েই পৃথিবী আন্দোলিত হয়। তাই যথার্থ উৎসব আমাদের চেষ্টায় বা সাধনায় হয় না, কেবল ব্রহ্মকৃপায় হয়। ব্রহ্ম কৃপা করিয়া তাঁহার উৎসবের আনন্দ প্রবহমান করিয়া, আমাদিগকে সেই উৎসবানন্দ-সম্ভোগদানে ধন্য করেন।

উৎসব কেবল বাহিরের আড়ম্বর নয়, কেবল লোকসমাগম নয়, কেবল বাহিরের আহার পান ও আমোদ প্রমোদ নয়। যথার্থ উৎসবানন্দ দিয়া মা আনন্দময়ী আমাদিগকে স্বর্গের নিত্য আনন্দ সম্ভোগের জন্য প্রলুব্ধ করেন এবং নিত্য সুখের জন্য পিপাসিত করেন।

স্বর্গস্থ অমরাত্মাগণ কেমন নিত্য উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়া চিরসুখী হইয়া রহিয়াছেন, তাহাই দেখাইবার জন্য যেন মা তাঁহাদিগকে লইয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গে উৎসবানন্দে আপনি মাতিয়া, আমাদিগকে মাতাইবার জন্য প্রলুব্ধ করেন। কবে আমরা তেমনি তেমনি করিয়া মা আনন্দময়ীর সঙ্গে, ব্রহ্মানন্দ-সঙ্গে ব্রহ্মানন্দে মাতিয়া থাকিব?

বাস্তবিক অমরাত্মাগণ নিত্য উৎসব করিতেছেন কেমন করিয়া? তাঁহারা দৈহিক জীবন হইতে মুক্ত হইয়া পৃথিবীর পাপ প্রলোভনের অতীত হইয়াছেন বলিয়া। পাপ থাকিতে, শারীরিক মোহমায়ার অধীনতা থাকিতে যথার্থ উৎসব, যথার্থ আনন্দ হইতে পারে না। যেমন রোগ থাকিতে সুস্থতা হয় না, সুখ হয় না, মনের আরাম হয় না, তেমনি পাপ থাকিতে, কোনরূপ জড়ীয় বন্ধন থাকিতে, যথার্থ উৎসব হয় না, প্রকৃত আনন্দ স্ফূর্ত্তি পায় না।

পাপই আমাদের রোগ, সংসারে জড়তা এবং পাপপ্রবণতাই আমাদিগের পতনের কারণ। উৎসবে আমরা সংসার ভুলিয়া, পাপের প্রবৃত্তি হইতে সাময়িক ভাবেও যে মুক্ত হই এবং স্বর্গীয় আনন্দে উৎফুল্ল হই, তাহা আমরা কেহ কখনই অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু সে অবস্থা আমাদের নিত্য হয় না, স্থায়ী হয় না। কেননা আমাদের জীবন পাপের অধীন।

অমরাত্মাগণ সংসারের পাপ-বন্ধনের অতীত হইয়া, আত্মস্থ আত্মক্রোড় হইয়াছেন বলিয়া, নিত্য উৎসবে নিত্যানন্দ-সম্ভোগে নিরত রহিয়াছেন। তাই আমাদিগকেও যথার্থরূপে সেই ভাবে পাপ-মুক্ত এবং জড়ীয় দৈহিক জীবন হইতে মুক্ত করিবার জন্যই, মা উৎসবের পর উৎসব দিয়া আমাদিগকে মাতাইয়া রাখিতে চাইতেছেন, যেন আমরা পাপ করিতে আর অবকাশ না পাই ও পাপ করিতে আর রুচি না থাকে। সুধা পান করিতে অভ্যস্ত হইলে আর কি তিক্ত আস্বাদ লইতে ইচ্ছা হয়?

বাস্তবিক এবার যেন যথার্থ এই মহোৎসবের প্রভাবে আমাদের পাপ-প্রবৃত্তি একেবারে বিনষ্ট হয়। তাই

নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "শুদ্ধ না হইলে উৎসব করা বৃথা। উৎসবে যেন পাপ অসম্ভব হয়।" এবার উৎসবান্তে যেন তাই হয়, যেন পাপ প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া আমরা নিত্য শান্তি-সম্ভোগের অধিকারী হই ও নবজীবন-লাভে ধন্য হই।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

শ্রীঈশার মূর্ত্তি।

ছবিতে বা প্রস্তর-মূর্ত্তিতে বিভিন্ন খৃষ্টসম্প্রদায় শ্রীঈশার যে যে মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, তাহা সকলই চিত্রকরগণের চিত্রনৈপুণ্যে কল্পিত। শ্রীঈশার যথার্থ ছবি বা আলেখ্য নাই। রাফেল, লুইনি, জর্জ্জিয়োন প্রভৃতি সুনিপুণ চিত্রকরগণ বাইবেলের বর্ণনা হইতে কল্পনা-যোগে ঈশার মুখের ভাব যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ খৃষ্টবাদিগণ তাহাই প্রচার করিতেছেন। এখন নাকি চিত্রকরদিগের মধ্যে ইহা লইয়া বিশেষ বাদানুবাদ চলিতেছে যে, কোন ছবিতেই ঈশার ঠিক মুখের ভাব রক্ষিত হয় নাই। কল্পনা যাহা কল্পনা, কল্পনা কখনও সত্য হইতে পারেনা, যতই কেন সুনিপুণতা তাহাতে আরোপিত হউক না। এই জন্য এসলামধর্ম্মাবলম্বিগণ মোহম্মদের মূর্ত্তি-গঠন বা চিত্রাঙ্কন ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া তাহার প্রশ্রয় দেন না। বাস্তবিক ভগবানের মূর্ত্তি-কল্পনা যেমন অসত্য, ভক্তেরও মূর্ত্তি-কল্পনা তেমনি অসত্য।

—

ভাইকে ভালবাসা।

ভালবাসা অহৈতুকী। কেন ভালবাসি, তাহা জানি না। ভালবাসা কেমন করিয়া জন্মায়, কোথা হইতে আসে, বিচার বুদ্ধি করিয়া নিরূপণ করা যায় না। ভালবাসা আপনা আপনি আসিয়া থাকি। দৃষ্টিমাত্র ভালবাসা উদ্দীপন হইয়া থাকে। ভালবাসা যেখানে, বিচার নাই সেখানে। যাই বিচার আসিল, অমনি ভালবাসা চলিয়া গেল। কদাকার সন্তানও মার ভালবাসার চক্ষে সোনার চাঁদ। স্বামী স্ত্রীর প্রণয় স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়। ভাই বন্ধুর প্রতি ভালবাসা যদি সেই ভাবে উৎপন্ন হয়, তবেই তাহা প্রকৃত ভালবাসা। অবিচারে ভাইকে ভালবাসাই যথার্থ ভ্রাতৃপ্রেম।

—

শবেবরাত।

এসলামধর্ম্মাবলম্বিগণের শবেবরাত পর্ব্ব এক বিশেষ পর্ব্ব। গত ৪ঠা জানুয়ারী সমগ্র জগদ্বাসী মুসলমানধর্ম্মাবলম্বিসাধকগণ এই পর্ব্ব সুগম্ভীর ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। "শবেবরাত" অর্থ ক্ষমা-লাভের রজনী। অর্থাৎ সমস্ত বৎসর ধরিয়া এসলাম-বিশ্বাসিগণ যেমন ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহা খোদার খাতায় স্বর্গে লেখা হয়। রোগ বা সুস্থতা, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, জীবন মরণের সমুদয় তালিকা সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লার খাদাঞ্চি এইদিন লিপিবদ্ধ করেন, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসীরা পরলোকগত আত্মীয় স্বজন, পরিচিত কুটুম্ব, ভৃত্য ইত্যাদিকে স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের নামে অন্ন ভাল সুখাদ্য রুটী হালুয়া তৈয়ারী করিয়া উৎসর্গ করেন। পুরোহিত মোল্লা বা তদভাবে বাড়ীর কর্ত্তাই কোরাণ পাঠ করিয়া পরলোকগতদের আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। তাঁহাদের গোরস্থানেও প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। এরূপ করিলে তাঁহাদের স্বর্গের পথে আলো জ্বলিবে, ইহাই তাঁহারা মনে করেন। সুন্নিসম্প্রদায়স্থ মুসলমানগণ কিন্তু এরূপ বাহ্য অনুষ্ঠান না করিয়া, প্রার্থনাপাঠাদির দ্বারাই পরলোকগত আত্মাদের শুভকামনা করেন। এসলাম-বিশ্বাসী মাত্রেরই সংস্কার, এই রাত্রে বিশেষভাবে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। হিন্দুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা মহালয়ার তর্পণেরও ভাব কতকটা এই পর্ব্বে লক্ষিত হয়। পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ যে সকল ধর্ম্মেরই একটি সাধনের প্রধান অঙ্গ, ইহা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

—

নিবেদন।

[প্রস্তুতি-সাধন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহের প্রদত্ত]

১লা জানুয়ারী—মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর :—

এই বঙ্গ ও ভারত বহুদিন হইতে রাজকীয় ভাবে, সামাজিক এবং ধর্ম্ম বিষয়ে নিতান্ত পরাধীন হইয়া, অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধাবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল। রাজকীয় ভাবে বহুদিন হইতে এদেশ বিদেশীয় রাজার অধীন, সমাজ ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে গুরু পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণশ্রেণীর অধীন। স্বাধীন ভাবে চিন্তা, স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজকীয় বিষয়ে তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ এ দেশের সর্ব্বসাধারণের অধিকারের বাহিরের ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন আপনার জীবনের কার্য্য ও আচরণ দ্বারা এরূপ অধীনতার বন্ধন হইতে এ দেশকে মুক্ত করিলেন। তাঁহার জীবন দ্বারাই নব যুগের দ্বার উন্মুক্ত হইল। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার অন্তরে স্বাধীন চিন্তাধারা যোগে সিদ্ধান্ত হইল, নিরাকার সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত যথার্থ উপাসনা। তিনি সেই ১৬ বৎসর বয়সে এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া আত্মীয় স্বজনের এবং তৎসঙ্গে পিতার নিতান্ত বিরক্তি-ভাজন হইলেন। তাঁহার জীবনের এই সিদ্ধান্ত বিষয়ে কাহারও সহানুভূতি না পাইয়া, তিনি সেই বয়সেই গৃহ

ছাড়িয়া ভারতের অনেক প্রদেশ ভ্রমণ করেন; ক্রমে এদেশ ছাড়িয়া কত কঠিন পথ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে চলিয়া যান। তিনি ২০ বৎসর বয়সে আবার পিতা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের কার্য্য হইতে কে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিতে পারে? পিতা মাতার স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ অথবা ভয়-প্রদর্শন, কিছুই তাঁহার জীবনের কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। দেশ বিদেশে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি কত পাঠ করিলেন, কত প্রসঙ্গ করিলেন, হিন্দু পণ্ডিতদিগের সহিত, খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রীদিগের ও মুসলমান মৌলবীদিগের সহিত কত বিচার করিলেন, কত পুস্তক ও পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান সকল সম্প্রদায় মধ্যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ-প্রতিষ্ঠা এবং এ সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে প্রচলিত নানা প্রকার অন্ধ সংস্কার হইতে মুক্তিদান তাঁহার জীবনের সংকল্প ছিল। তিনি তাঁহার জীবনের উচ্চ কর্ত্তব্য নানাভাবে সাধন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। স্বাধীনতার অগ্নি তাঁহার প্রাণে এমন প্রজ্জলিত হইয়াছিল যে, অন্য জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ ভারতে ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের রামমোহন-প্রণীত ট্রাষ্টডীড্ পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ট্রাষ্টডীড্ই রামমোহনের জীবনের ধর্ম্মকে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করে। হিন্দুগণ রামমোহনকে হিন্দু বলেন, মুসলমানগণ রামমোহনকে মৌলবী বলেন, খৃষ্টানগণ রামমোহনকে খৃষ্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতে চান; কিন্তু রামমোহন ইহার কিছুই নন। পূর্ণ উদার সার্ব্বভৌমিক একেশ্বরবাদ তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম। তাঁহার প্রণীত ট্রাষ্টডিডের মধ্যে নববিধানের অঙ্কুর নিহিত রহিয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ যুগের ঋষি আত্মা। তাঁহার জীবন ও আচরণ দ্বারা তিনি ঋষি-জীবনের উচ্চ আদর্শ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষগণ আসেন সর্ব্বসাধারণকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে, মুক্তির পথে অগ্রসর করিতে। একটী বিশেষ কার্য্য দ্বারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুধু যে এদেশের নরনারীর বন্ধন-মুক্তির কারণ হইলেন তাহা নহে, সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বন্ধন-মুক্তির কারণ হইলেন। বেদ অভ্রান্ত বলিয়া চিরদিন এ দেশের বদ্ধমূল ধারণা, বাইবেল অভ্রান্ত বলিয়া খৃষ্টসম্প্রদায়ের ধারণা, কোরাণ অভ্রান্ত বলিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ধারণা। দেবেন্দ্রনাথ বেদের পূর্ব্বাপর মধ্যে অনৈক্য প্রদর্শন করিয়া বেদ যে অভ্রান্ত নয়, ইহা তর্ক বিচারের অতীতরূপে প্রমাণ করিলেন ও প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই কার্য্য দ্বারা, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রও যে অভ্রান্ত নয়, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার জন্য পৃথিবীর সকল নরনারীর সহায়তা করিলেন। ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্স্ মূলার সাহেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই কার্য্যের উল্লেখ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "It is most heroic act of the Devendranath's life."

দেবেন্দ্রনাথ আমাদের নিকট ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ জীবনের বিশেষ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গৃহস্থ জীবন আমাদের নিকট বিশেষ শিক্ষার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। তিনি পিতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্য যে নৈতিকবল ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। তিনি বড় ধনীর ঘরের সন্তান কত ভোগ বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত। কিন্তু তিনি ধন ঐশ্বর্য্যের সম্পর্কে পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া, গৃহে গৃহ-কার্য্য সকল, পারিবারিক কর্ত্তব্য সকল ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া, অতি শৃঙ্খলার সহিত, নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরের হিতার্থে প্রচুর দান করিয়া, পরের অভাব আশাতীত ভাবে মোচন করিয়া তিনি আপনি তৃপ্তিলাভ করিতেন। সন্তানসন্ততিদিগের সুশিক্ষা-দানে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সুব্যবস্থা ছিল। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" এই শ্লোকের সার্থকতা আমরা মহর্ষির জীবনে দেখিতে পাই।

২রা জানুয়ারী—"নববিধান, শ্রীমদাচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ":—

নববিধান নিত্য আমাদের সাধনের বিষয়, শ্রীমদাচার্য্যদেবের জীবন নিত্য আমাদের অনুধ্যানের বিষয়, গ্রহণের বিষয়। আজকার দিনে এ সকল বিষয়ে বলা অপেক্ষা শুনা ও শুনিয়া গ্রহণে আকাঙ্ক্ষাই বেশী। তবে শ্রীনববিধানকে প্রণাম করিতে যাইয়া, শ্রীমদাচার্য্যদেবকে ও তাঁহার সহকর্ম্মী প্রেরিতগণকে প্রণাম করিতে যাইয়া তৎসম্বন্ধে অল্প কিছু উল্লেখ করিব।

নবযুগের এই নব ধর্ম্ম নববিধান কত প্রকাণ্ড ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম কত উচ্চ, কত মহিমাময়, গৌরবময়, কে তাহা বর্ণনা করিতে পারে, কে তাহা ধারণা করিতে পারে? আমরা এ ধর্ম্মের মহিমা গৌরব যাহা কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছি, ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে অবাক্ হইতেছি। আমাদের জীবনে এ ধর্ম্ম অল্পই সঞ্চয় হইয়াছে। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে। একটী কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয়। পাঠ প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া আমরা নববিধানকে অনেক বুঝিয়াছি, মনে করি। আমার নিজেরও এক সময় মনে মনে ইহা গৌরবের বিষয় ছিল যে, পাঠ প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া এবং জীবনে সামান্য ভাবে হইলেও উপাসনাদি সাধনের ভিতর দিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে নববিধান বেশ বুঝা হইয়াছে, জানা হইয়াছে; কিন্তু এখন ধারণা হইয়াছে যে, পাঠ প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া যে জানা ও বুঝা, তাহার একটা মূল্য খুবই আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মকে জীবনের বস্তু করিবার পক্ষে পাঠ প্রসঙ্গ তো যথেষ্ট নয়। কেশবচন্দ্র আপনার ধর্ম্মজীবন বলিতে গিয়া বলিলেন, "আজ আমি যেখানে আছি, যাহা

আছি, তাহা বলিতে পারি, কিন্তু আগামী কল্য কি হইব, কোথা থাকিব, তাহা বলিতে পারি না। তাহা জীবনে ধর্ম্মদাতা যিনি, তিনিই জানেন।" ধর্ম্ম-সাধনের পথে, জীবনে ধর্ম্মলাভের পথে, আমাদের প্রতিজনেরই সেই কথা। এই যে নববিধানের ধর্ম্ম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, ব্রহ্ম-কৃপা-বলে এই ধর্ম্মের যতটুকু জীবনে আয়ত্ব করিতে পারিলাম, বা ধারণ করিতে পারিলাম, ততটুকু মাত্র এ ধর্ম্ম আমার জীবনের ধর্ম্ম হইল। আবার আগামী কল্য যতটুকু গ্রহণ করিতে পারিব, ততটুকু এ ধর্ম্ম আমার হইবে। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম আয়ত্ব করিতে হইবে। যতটুকু আয়ত্ব বা জীবনস্থ হইল, তাহাই আমার আপনার। পড়াশুনা করিয়া অনেক বুঝিয়াছি, কিন্তু তাহা আমার জীবনের ধর্ম্ম-সম্পদ নহে।

শ্রীমদাচার্য্যদেবের জীবন আমাদের নিত্য ধ্যান, চিন্তন ও সাধনার বিষয়। তাঁহার জীবন সম্বন্ধীয় গভীর সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আজ আর কি বলিব? আজ দুই একটী বাহিরের কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জীবন এবং তাঁহার সহপ্রেরিতদিগের জীবনের কথা উল্লেখ করিব।

এক সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মুসুরী ও দেরাদুন অঞ্চলে দীর্ঘ দিন বাস করিয়াছিলেন। সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-জীবনের আকর্ষণে কয়েকটী বাঙ্গালীবাবু তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। একটী উচ্চ সাহেব কর্ম্মচারীও যাতায়াত করিতেন। একদিন সেই বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া সেই সাহেবটী বলিলেন, "বাবু, তুমি যখন কলিকাতা যাইবে, তখন সেখানে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারিবে? Kesubchandra is a wonderful man." মহর্ষির জীবন-চরিত পাঠ করিতে করিতে ইহা পাঠ করিয়াছিলাম। সেই হইতে প্রায়ই আমার প্রাণে ঐ কথা উঠে, Keshubchandra is a wonderful man.' কেশবচন্দ্র wonderful কোন্ অর্থে, আজ যাহা মনে আসিতেছে, আপনাদের নিকট বলিতে চাই।

এযুগে কেশবচন্দ্র Wonderful man বিশেষভাবে এই অর্থে যে, তিনি প্রত্যেক কথা ঈশ্বরের নিকট শুনিয়া এবং ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সকলের নিকট তাহা প্রকাশ ও প্রচার করিতেন। এমন করিয়া অগ্নিময় ব্রহ্মের অনুপ্রাণনে অনুপ্রাণিত হইয়া ঈশ্বরের কথা সকলের নিকটে বলা, স্বর্গীয় বলে ঘোষণা করা একমাত্র কেশবচন্দ্রই প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান। ঈশ্বর হইতে সমাগত সত্য সকল, নব নব সত্য সকল এমন স্বর্গীয় বলে তিনি বলিতেন, এমন পরিষ্কার তিনি ব্যাখ্যা করিতেন, স্বদেশের লোক, বিশেষভাবে বিদেশের লোক শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। ব্রহ্মানন্দ যখন বিলাত গিয়াছিলেন, তখন কোন এক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলা এ সময়ে কোথাও দেখিতে চাও, তবে ভারতে যাও। পৃথিবীর মধ্যে এখন একমাত্র ভারতবর্ষে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মধ্যে জীবন্ত লীলা হইতেছে।" বলা বাহুল্য, সেই ব্রাহ্মমণ্ডলীর মুখ-পাত্র একমাত্র তিনি। যিনি ঈশ্বর হইতে স্বর্গের নব নব তত্ত্ব-কথা শুনিয়া, তাঁহার দ্বারাই দিব্য অনুপ্রাণনে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বর্গীয় বলে সেই সত্য স্বদেশের বিদেশের সকলের নিকট ঘোষণা ও প্রচার করিতেন, তিনি Wonderful man হইবেন না, তো কে হইবে? তিনি স্বর্গের কথা স্বর্গীয় বলে তেমন করিয়া বলিতেন বলিয়াই তিনি Wonderful man.

তাঁহার সম্বন্ধে আর একটা কথামাত্র বলিব। আমি বিষয়-কর্ম্মে থাকা উপলক্ষে দেখিয়াছি, গবর্ণমেণ্ট কোর্টে এক হাকিম বিচার নিষ্পত্তি করেন, কিন্তু আমলা, উকীল, বহু লোক সেই হাকিম-টীকে সত্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে সহায়তা করেন। প্রথমে পেস্কার মোকদ্দমার নামগুলির সেই দিনের অবস্থা বুঝাইয়া প্রয়োজনীয় নামগুলি হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করেন, উকীলগণ উপস্থিত মোকদ্দমা সংক্রান্ত আইন, নজির চর্চ্চা করিয়া, হাকিমের সম্মুখে তাহা বর্ণনা করিয়া, হাকিমকে সত্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে সহায়তা করেন। নববিধানের পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে ব্রহ্মানন্দকে ক্রমাগত অতীত বর্ত্তমানের কত ধর্ম্মবিধান বিষয়ে, অতীত বর্ত্তমানের কত সাধুভক্ত মহাজনগণের জীবন-ভাগবত বিষয়ে কত সত্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। সেই সকল সিদ্ধান্তে উপ-স্থিত হওয়ার জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত, ঈশ্বর-নিয়োজিত তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন প্রেরিত প্রচারকগণ। কেহ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া, কেহ খৃষ্টীয় শাস্ত্র মন্থন করিয়া, কেহ বৌদ্ধ শাস্ত্র, কেহ মহম্মদীয় শাস্ত্র মন্থন করিয়া, নানা সত্যের সংবাদ অথবা সত্যাভাস কেশব চন্দ্রকে যোগাইতেন। ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক প্রতিভা সত্যই এই যুগে অদ্ভুত সামগ্রী ছিল। একটু সত্যাভাস তাঁহার প্রাণে কোন সূত্রে স্ফূর্ত্তিলাভ করিলেই, সেই সত্যাভাস অথবা সত্যের সামান্য অঙ্কুরটুকু তাঁহার প্রাণে ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইয়া, তাহার যতদূর বিকাশ সম্ভব ততদূর বিকাশ লাভ করিত, এবং যতদূর প্রকাশ করা সম্ভব তিনি তাঁহার মহাশক্তিশালী কণ্ঠভেরী নিনাদিত করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন। সে সত্য স্বদেশে, দূরতম বিদেশে, ঘরে ঘরে, কণ্ঠে কণ্ঠে, হৃদয়ে হৃদয়ে নিনাদিত হইয়া আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িত।

ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভাগবতাদি গ্রন্থ তিনি আপনার ভাবে পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে পাঠে শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ জীবন তাঁহার অন্তরে স্ফূর্ত্তি পায় নাই। কিন্তু ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের অন্তরে স্ফূর্ত্তি লাভ করে, এবং ব্রহ্মানন্দের জীবনের সহায়তা পাইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম তাঁহার প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ-চরিতে" অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আজ শ্রীনববিধান, শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র ও প্রেরিতবর্গের স্মরণের দিনে শ্রীনববিধানকে প্রণাম করি, শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে প্রণাম করি এবং সমস্ত প্রেরিতবর্গকে প্রণাম করি। সর্ব্বোপরি লীলাময়ী পরম জননীকে প্রণাম করি।

৪ঠা জানুয়ারী—গৃহ :—

১লা জানুয়ারী, আমরা ধর্ম্মপিতামহ মহাত্মা রামমোহন রায়, এবং ধর্ম্মপিতা মহাত্মা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়াছি, ২রা জানুয়ারী, শ্রীনববিধান, শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র ও প্রেরিতবর্গকে প্রণাম করিয়াছি, ৩রা জানুয়ারী, মাতৃভূমিকে প্রণাম করিয়াছি, আজ ৪ঠা জানুয়ারী "গৃহ"কে প্রণাম করিবার দিন। গৃহ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, ইহার অতীত ইতিহাস আলোচনা করা ভাল। গৃহের একটা প্রাথমিক ঐতিহাসিক যুগ আছে, ইতিহাসের পূর্ব্বকালের গৃহের কথা উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এ দেশে আর্য্যজাতি যখন প্রথম সমাজ সংস্থাপন করেন, সামাজিক জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন, তখন হইতে গৃহের ইতিহাসের আরম্ভ বলা যায়। সে সময়ে আর্য্য-পরিবারে, আর্য্য-জীবনে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের পূজা আরম্ভ হয় নাই। সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি নৈসর্গিক দেবতার পূজা তখন আর্য্য-সমাজে প্রবর্ত্তিত ছিল। আর্য্য-সমাজের প্রত্যেক গৃহে যজ্ঞবেদী স্থাপিত হইত। যজ্ঞ-বেদিকার দুই ভাগ। এক অংশে সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ লাভ জন্য সে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দেওয়া হইত, অপর অংশে পিতৃ-মাতৃকুলের পরলোকগত গুরুজনদিগের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ লাভ জন্য তাঁহাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য দেওয়া হইত। এই যজ্ঞ-বেদি করিয়া আর্য্য-সমাজের প্রতি গৃহে এইরূপ পূজাবন্দনা উপলক্ষে অর্ঘ্যদান প্রতি গৃহস্থের বাধ্যকর কর্ত্তব্য ছিল। গৃহস্থ আপনার সহধর্ম্মিণী সহ মিলিত হইয়া, এই গৃহ-যজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই ছিল অলঙ্ঘনীয় বিধি। যিনি দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহী না হইবেন, তিনি সমাজের একজন বলিয়া-গণ্য হইতে পারিতেন না। ইহাই সেই আদি যুগের গৃহ সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত। গৃহস্থ স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন লইয়া বাস করিবেন। গৃহে কতরূপ রোগ শোক, অভাব অনটন, পরীক্ষা বিপদ্ আছে, দেব-প্রসন্নতা দেবাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা না করিয়া, গ্রহণ না করিয়া, পরলোকগত গুরুজন ও পিতৃ-মাতৃ লোকেরও প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা এবং গ্রহণ না করিয়া, কে আর পারিবারিক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সাহসী হয়? তাই এই ধর্ম্মভীরু ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির সামাজিক জীবনের আদিস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত, গৃহে গৃহে গৃহের নিত্য অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে কোন না কোন আকারে দেবতার পূজা বন্দনা দেখিতে পাই। কাল-ক্রমে আর্য্য-সমাজে সাধন-নিষ্ঠ, ধ্যানশীল ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিলেন, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতা বলিয়া কোন উপাস্য দেবতা নাই, হইতে পারে না, সকল শক্তির মূলে "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" অনন্ত ভূমা পরব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য দেবতা। তাই তাঁহারা গাথায় গাহিলেন—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" "আধ্যাত্মিকরাজ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, তারাগণ আলোক দান করেনা, বিদ্যুৎও তথায় আলোক দান করে না, অগ্নি আর সেখানে কিরূপে আলোক দান করিবে? এক ব্রহ্মালোকেই সকল আলোকিত, এক ব্রহ্মপ্রকাশেই সকলের প্রকাশ।" ক্রমে গৃহ পরিবারে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং আর্য্যসমাজে গৃহস্থের পক্ষে বিধি হইল, "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, এবং যে কিছু কর্ম্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।" ব্রহ্ম-পূজা ও ব্রহ্মেতে কর্ম্মার্পণ প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য রূপে পরিণত হইল। ভারতের সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ উন্নতি এই স্তরে। পরবর্ত্তী কালে ভারতের সামাজিক জীবনের, গৃহস্থ ও পারিবারিক জীবনের কতই অবনতি হইল, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা গৃহ পরিবারে কতই প্রবেশ করিল। কিন্তু তথাপি নানা কুসংস্কার ও পতনের অবস্থায়ও ভারতের বঙ্গের গৃহ পরিবারে প্রাণ ছিল, হৃদয় ছিল। ভারতের সামাজিক ও গৃহ-জীবনের পূর্ব্ব গৌরবের অনেক অমূল্য সামগ্রী তখনও গৃহ পরিবারের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। আমাদের ব্রাহ্ম পরিবারের অনেকেই এখন সহরবাসী। এই সকল সহরের গৃহ কি সেরূপ গৃহ নামের উপযুক্ত? আকাশের পাখীগুলি যেমন আপনাদের সন্তানাদি সহ বাসের জন্য বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, আমাদের সহরের বাড়ীগুলি অনেক পরিমাণে পাখীরই বাসার মত। আপনার সন্তান সন্ততি লইয়া থাকিবার মতন যে কয়েকখানা ঘরের প্রয়োজন, তাহা লইয়াই আমাদের সহরের বাড়ী বা বাসা। তাহার অতিরিক্ত স্থান আর সহরের বাড়ীতে কয়জন রাখিতে পারেন? তাই এ সব গৃহে না আছে অতিথি-সেবা, না আছে দূর নিকটের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের সমাদর ও আতিথ্যের স্থান।

এ দেশের পল্লীর গৃহই আদর্শ গৃহ। আমরা গতকল্য মাতৃভূমিকে প্রণাম করিয়াছি। বঙ্গ, ভারত আমাদের মাতৃ-ভূমি। আমাদের মাতৃভূমি যেমন সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, আমাদের পল্লীগ্রামের গৃহমাতাও সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা। আমাদের পল্লীগ্রামের গৃহের আদর্শ ছবি কি? প্রতি গৃহের সান্নিধ্যে জলাশয় থাকিবে, গৃহের দক্ষিণ দিক রৌদ্র ও পরিষ্কার বায়ু-সমাগমের জন্য খোলা থাকিবে এবং গৃহ আম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল, প্যায়ারা, কদলী, কুল প্রভৃতি নানাবিধ রসাল ফলবান্ বৃক্ষে, পুষ্প-বৃক্ষ ও পুষ্পাদিতে পূর্ণ থাকিবে ও শোভিত থাকিবে। মানব-জীবন পোষণ ও রক্ষার প্রয়োজনীয় বিবিধ সামগ্রী গৃহ-মাতাই যোগাইয়া থাকেন। গৃহের মহিমা কত! গৃহের মহিমা স্মরণ করিলে চক্ষে জল রাখা যায় না। ছোট বড় আমরা সকলেই গৃহে লালিত

পালিত এবং বর্দ্ধিত। করুণাময় ঈশ্বরের অপার করুণার রচনা এই গৃহ। মাতৃ-গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়া আমরা এই গৃহমাতার বক্ষে ভূমিষ্ঠ হই এবং ইহার আশ্রয় প্রাপ্ত হই। মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে গৃহে সকল প্রকার আয়োজন আমাদের জন্য প্রস্তুত থাকে। মঙ্গলময় বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলাভূমি গৃহ, কি প্রেমের মূর্ত্তি গৃহ! বক্ষভরা স্নেহ-প্রেমের জলন্ত দিব্য মূর্ত্তি পিতামাতা, স্নেহভরা ভাই ভগ্নীর জীবন, স্নেহভরা আত্মীয় স্বজন, চাকর ও চাকরাণীর জীবন শিশুদেরই প্রয়োজনে স্নেহে প্রেমে পূর্ণ। শিশুর জঠরানল মাতৃ-স্তন্যে এবং একটু বয়োবৃদ্ধি সহকারে গোদুগ্ধে নিবারিত হয় বটে, কিন্তু শিশুর প্রধান পোষণ-সামগ্রী স্নেহ। সে চায় সকল হইতে স্নেহ, সে পায় ছোট বড়, দূর নিকট সকল হইতে স্নেহ; সে পোষিত হয়, পরিপুষ্ট হয় স্নেহেতে। ক্রমে শিশু বড় হয়। অন্ন পানীয়, ফল মূল, আকাশ বাতাস, জল অগ্নি এবং প্রাথমিক শিক্ষা দীক্ষার সকল আয়োজন শিশুর জন্য যোগায় গৃহ। আমাদের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনও এই গৃহমাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত; আজ আবার দেশের গৌরব, দেশের অলঙ্কার যাঁহারা, সেই সকল মহজ্জীবনের লালন পালন ও পোষণের স্থানও এই গৃহ। আমাদের মাতৃভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের মত কোন দেশের সম্পদ? আমাদের দেশের সূর্য্য চন্দ্র কত বড়, আমাদের দেশের আকাশ কত বিস্তৃত, কত উচ্চ, আমাদের দেশের নদ নদী কত বড়, আমাদের দেশের পাহাড় পর্ব্বত কত বৃহদায়তন! এমন প্রাকৃতিক মহিমা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কোন দেশের? কিন্তু শুধু কি ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের জন্য ভারত গৌরবান্বিত? ভারতের প্রকৃত গৌরব ভারতের আর্য্য-জীবন। অতীতের যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি আত্মা, প্রহ্লাদ নানক প্রভৃতি ভক্তাত্মা, রাম যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সাধু আত্মা, বর্ত্তমানে রামমোহন, দেবেন্দ্র নাথ, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহাজন আত্মা, ইঁহাদের জীবনই ভারতের প্রকৃত গৌরব। এই সকল গৌরবের জীবন, মহজ্জীবন গৃহজাত সামগ্রী, গৃহই ইঁহাদেরও ধাত্রী এবং জননী। তাই মনে হয়, গৃহের গৌরব কত!

বঙ্গ ভারতের পল্লীর গৃহগুলিই সকল বিষয়ে আদর্শ গৃহ। সে গৃহ যেমন মানবের আবাল্য পোষণ-সামগ্রীতে পূর্ণ, তেমনই সে গৃহ জনক জননীর সেবা, আত্মীয় স্বজনের আদর অভ্যর্থনা, অতিথি-সেবা, নিত্য ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা, দরিদ্র-সেবা, সাধু-সেবা ইত্যাদি সেবা-ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট স্থান; তাই ভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা, দয়া প্রভৃতি বৃত্তিগুলির চরিতার্থতা ও উৎকর্ষ লাভের বিশিষ্ট স্থান গৃহ, পল্লীর গৃহ। পল্লীর গৃহ ঈশ্বরের পূজা বন্দনা ও উৎসব মহোৎসবের জমাট ক্ষেত্র।

দেশের নানা অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এখন পল্লীর গৃহগুলিরও সে গৌরব তেমন নাই। কিন্তু নববিধানের দেবতা প্রকৃত ভারতোদ্ধার, দেশের উদ্ধার কার্য্যে লাগিয়াছেন। যেমন অন্যান্য বিষয়ে নববিধান পূর্ব্ব বিলুপ্ত গৌরব নব ভাবে উদ্ধার করিতেছেন, গৃহের বিলুপ্ত মহিমাও উদ্ধার করিতে তিনি ব্যস্ত।

লীলাময়ী, স্নেহময়ী, বিধান-জননী এখন আমাদের প্রতি-গৃহের গৃহ-জননী, গৃহ-দেবতা। তিনি আমাদের জীবনে গৃহ বিষয়ে নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিতেছেন। গৃহ-পরিবারে সকলের সঙ্গে স্বর্গের নূতন সম্পর্ক জাগাইয়া তুলিতেছেন, স্বর্গের সম্বন্ধে সম্বন্ধ করিতেছেন। গৃহ-কর্ত্তব্যের নূতন ব্যবস্থা তাঁহার প্রিয় পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। নববিধানে গৃহ বিষয়ে যেমন ভারতের অতীত আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে, তেমনই এই জাতীয় আদর্শ মধ্যে, কি খৃষ্ট সম্প্রদায়ের, কি মুসলমান সম্প্রদায়ের, কি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের, অন্যান্য বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গৃহ বিষয়ে যাহা কিছু বিশিষ্টতা আছে, তাহাও নববিধানের নব গৃহে সন্নিবেশিত হইয়া, নবযুগে নববিধানে গৃহের এক নূতন গৌরবান্বিত পূর্ণতর আদর্শ প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। লীলাময়ী পরম জননীর স্বর্গীয় ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

পুণ্যতীর্থ।

বিগত ৯ই অক্টোবর, ১৯৩০, সরল শিশুপ্রকৃতি-সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় মহাশয়কে সহযাত্রী রূপে লইয়া দীর্ঘ ১৬ বৎসর পর আমাদের জন্মস্থান ও পুণ্যস্মৃতি আরা নগরে যাত্রা করিলাম। পথে আসানসোল ষ্টেশনে আমার স্ত্রী ও কন্যা সম্মিলিত হইলেন। পাটনা হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রের পরিবার আমাদিগের সঙ্গে একত্রে আরায় যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার শিশুসন্তানদিগের অসুস্থতা হেতু তারা জুটিতে পারিল না; রাঁচি হইতে তৃতীয় ভ্রাতা অখিলচন্দ্র সপরিবারে ও ইহারা পরে যাইবে স্থির হইল। আরায় যথাসময়ে আমরা পৌঁছিলাম ও ষ্টেশনে মধ্যম ভ্রাতা ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র আমাদের চির আরাম-নিবাস "Sweet home" এ লইয়া গেলেন। পুরাতন স্মৃতিগুলি হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। বগীচায় সমাধি-প্রাঙ্গণে ছুটিয়া গিয়া আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ও প্রাতঃস্মরণীয়া জননীদেবী, শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র এবং ভক্ত অমৃতলালের পবিত্র সমাধি স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ১১ই অক্টোবর, পিতৃদেবের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক তর্পণে আমরা সপরিবারে অখিলদার প্রাণস্পর্শী উপাসনায় যোগ দিয়া পরম তৃপ্ত বোধ করিলাম। জেলার কালেক্টার শ্রীযুক্ত সুধেন মজুমদার মহাশয় সস্ত্রীক উপস্থিত থাকিয়া, অতীতের স্বর্গগত শ্রোরিত দীননাথ মজুমদার ও ভক্ত অমৃতলালের প্রভাব ও তাঁদের আত্মার অবতরণ সূচনা করিয়াছিলেন। পিতৃ-তর্পণে আমার নিবেদন ছিল, "২৫ বৎসর পূর্ব্বে আজিকার দিনে এই কুটীরে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় যখন সুচিকিৎসায় তাঁহার যন্ত্রণার উপশম কিছু হইতেছে না দেখিয়া

বাবা বলিলেন, 'আর কেন, আমায় ছেড়ে দাও,' তখন ভক্তিভাজন গোঁসাই মহাশয় (ভক্ত অমৃতলাল) বাবার ললাটে 'দয়াময় হরি' মন্ত্র লিখে দিতে লাগিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আরাম বোধ হইতে লাগিল। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, ইহাকেই Faith cure বলে। For me is to live in Keshub and my Mother. এখানে তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন অথবা পরলোকের পানে আত্মদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। বাবার আত্মাপক্ষী সেই চিন্ময় রাজ্যে ব্রহ্মানন্দ-সাগরে বিলীন হইয়াছিল। আমরাও পতিতজনে কবে তেমি করে বলিতে পারিব, For me is to live in my father. সেই দৃষ্টি কবে খুলিবে, শুদ্ধচিত্তে তোমার ভক্তমণ্ডলীতে সর্ব্বদা বিচরণ করিব ও তোমাকে পাইয়া ধন্য ও সুখী হব।"

কয়েকদিন প্রত্যহ দুইবেলা নাম-পাঠ, উষাকীর্ত্তন, প্রাতঃকালীন উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ, রাত্রে সমাধি-প্রাঙ্গণে ধ্যান, আকুল প্রার্থনা ও পরে সংকীর্ত্তনাদি সম্পন্ন করা হইত। এইরূপে পারলৌকিক সাধনের ভিতর নিমজ্জিত থাকিয়া আমাদের মাতৃ-তীর্থ-সমাগম হইল। শ্রদ্ধেয় অখিলদা ১৬ই অক্টোবর মাতৃদেবীর একত্রিংশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাণস্পর্শী উপাসনা করিলে আমি দেবতার চরণে যে নিবেদন করি তাহার সারাংশ—"মার মুখে সদা বিকশিত কুসুমের মত হাসিটী আজ কল্পনার চক্ষে দেখে কত সম্ভোগ হচ্ছে, মৃতপ্রাণে জীবন-সঞ্চারিণী সে অমৃতময়ী বাণী আজও কর্ণকুহরে সুধারাশি ক্রমাগত ৩১ বৎসর কাল ঢালছে। বাবা তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে যে কতকগুলি বিশেষত্বের উল্লেখ করেছিলেন, সেইগুলি এই সুদীর্ঘকাল আমাদের আত্মা ও মনপ্রাণের অন্নজল রূপে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। সেই স্বর্গীয় আত্মা দুইটী আমাদের ধর্ম্ম জীবনের প্রধান সহায় এবং সংসার-সমুদ্রে ধ্রুবতারা হউন।" এই দিন সন্ধ্যার সময় শ্মশান দর্শন করিতে সপরিবারে গিয়াছিলাম। যে স্রোতস্বিনী পুণ্য-সলিলা গঙ্গাতীরে বাবার ও মার নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছিল, তাহা সুদীর্ঘকালের পর পুনরায় দেখিয়া, এ সংসারের মায়া-মরীচিকার পরপারে যে জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য আছে, তাহা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছিল। এক সপ্তাহ পরে আমাদিগের পরমারাধ্যা প্রতিপালিকা তপস্বিনী যোগিনী পিসিমাতার প্রথম সাম্বৎসরিক বিগত ২৩শে অক্টোবর উপস্থিত হইল। ঘটনাচক্রে ইঁহাদিগের তিনজনের মহাপ্রস্থান একই মাসে এক এক সপ্তাহ অন্তর সংঘটিত হইয়াছিল। ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ সৌহার্দ্দ এ পৃথিবীতে ছিল, স্বর্গেও সেই আত্মাত্রয়ের মহামিলন অবশ্যম্ভাবী। অমরধামে যাত্রার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পিসিমা আমাদের সপরিবারে একত্রিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহার সতী সাধ্বী কন্যার সে অভিলাষ পূরণের কিঞ্চিৎ বাকী রাখিয়াছিলেন, এবার তাহা আশ্চর্য্য কৌশলে পরিপূর্ণ হইল। আমরা চারি ভাই সপরিবারে তাঁহার অমরাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে সমুপস্থিত। পিতৃদেবের সমাধি পার্শ্বে তাঁহার পবিত্র ভস্মাবশিষ্ট অতি যত্নে শ্বেতমর্ম্মর-স্তম্ভে সংরক্ষিত হইল এবং তৎসহ আমাদের আদরের ভাই শ্রদ্ধাস্পদ নানুদার অস্থি শ্রীমদাচার্য্য-দেবের সমাধি অঙ্গে সংযুক্ত হইল। এই অনুষ্ঠানোপলক্ষে অখিলদা শ্রীব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা-পাঠান্তে, একটী ক্ষুদ্র নিবেদন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। এই দিনে কালেক্টর মজুমদার মহাশয় সস্ত্রীক এবং কলিকাতা ও পাটনা হইতে আগত কতিপয় মহিলা ও পুরুষ ঘটনাচক্রে মিলিত হইয়া ব্রহ্মের অর্চ্চনা সম্ভোগ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিলেন। পিসিমাতা ঠাকুরাণীর আদ্যশ্রাদ্ধে যে আত্মজীবনী পাঠ করিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ পুনরায় পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিলাম,—"কত যত্ন ও চেষ্টা করিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা করিয়া, এই দেবকন্যার শরীর সুদীর্ঘ চারি বৎসর কাল আঁকুড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। এক বৎসর কাটিয়া গেল, অদৃশ্য রাজ্যের সম্পত্তি, তাঁর চিন্ময় আত্মা এখন তোমাতে আমাদের পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। এ জগতে তাঁদের ঋণ অপরিশোধনীয়। তাঁরা আজ এখানকার সকল সম্বন্ধের অতীত হইয়া তোমার বক্ষে আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টিতে সর্ব্বদা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমরা প্রাণে প্রাণে একাঙ্গ হইয়া, তোমার বিধানের উদ্দেশ্য এ জীবনে প্রতিপালন করিয়া, সন্তানত্বের অধিকার সম্ভোগ করি।" ঐ দিন অপরাহ্নে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্রের শিশু কন্যার নামকরণ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইল, এবং শিশুর নাম "আরতি" দেওয়া হইল। পরদিন ডুমরাওনের মহারাজার উদ্যানে অখিলদার সঙ্গে সেই বিটপীর তলদেশে কমল-সরোবরের তীরে গিয়া বসিলাম। এখানে শ্রীব্রহ্মানন্দ সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে "একটী পক্ষী উড়িয়া গেল" প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আবার এখানেই ভক্তিভাজন প্রেরিত দেব অমৃতলাল বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, কয়েকটী মহিলা সহ এই ঘাটে দাঁড়াইয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গে সঙ্গে আমার পিসিমার তৃষিত প্রাণকে "সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য, পশ্চাতে চাহি না ফিরে" এই নবজাগরণের মোহিনী শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। এই সেই পবিত্র তীর্থ যাহার স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত ও প্রাণ পুলকে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ভারতে পুণ্য তীর্থের মাহাত্ম্য যুগযুগান্তরে চির প্রসিদ্ধ।

আমরা ২৮শে অক্টোবর আরা হতে পাটনার গঙ্গানিবাসে শ্রীমান্ নির্ম্মলের বাড়ীতে যাত্রা করিলাম, বাড়ীর সম্মুখে একখণ্ড বাগীচায় পিসিমা বিরাজিত। তিনি অতিশয় ফুল ভাল বাসিতেন। কলিকাতাস্থ আমাদের পৈত্রিক ভবনে ছাদের উপর টবে ও গামলায় তাঁর অসামান্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে এত প্রচুর ফুল ফুটিত যে, তাহা উপাসনা-গৃহ ও ব্রহ্মমন্দিরের বেদী সুনিপুণে পরিশোভিত করিত। নির্ম্মলের যত্নে ও পারিপাট্যে সুন্দর ছাসামন্ডী বাগানখানি প্রচুর ফুল ও ফলে নয়নমুগ্ধকর শ্রী ধারণ করিয়া

রহিয়াছে দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। পাটনা ও বাঁকিপুর প্রবাসী আমাদের মণ্ডলীর প্রায় অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদার কথা-প্রসঙ্গে আমাদের মণ্ডলীর নিৰ্জ্জীবতা বিষয়ে উল্লেখ করিলেন যে, ইদানীং আমাদের মণ্ডলীর মুষ্টিমেয় প্রচারকগণ দেশবিদেশে প্রচার-কার্য্যে যাতায়াত করিতে একেবারে অনিচ্ছুক এবং অক্ষম; যদিও এক আধ জন কোথাও যান, তবে দেখে শুনে বিশেষ আত্মীয় কিংবা বন্ধুর বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার বাড়ীতে একটী উপাসনা অথবা আলোচনা কিম্বা অনুষ্ঠানান্তে বিদায় গ্রহণ করেন ও প্রচার-কর্ম্মের নাতিদীর্ঘ বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন। বস্তুতঃ তাঁহারা জনসাধারণের সুখে ও দুঃখে সহানুভূতি আরত প্রকাশ করেননা, কিংবা দেশের ভাবস্রোতের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উত্তাল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত কেবল মাত্র নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা করেন, তাঁহারা পতিত নরনারীর নিকট যাইয়া তাদের পাপ প্রলোভন হইতে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করেন না, অথবা আত্মার কল্যাণ কামনা করিবার তরে ভগবচ্চরণে অনুতপ্ত-হৃদয়ে দীন অকিঞ্চনের বেশে অগ্রসর হইতে যুক্তি দেন না, অভাবগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদিগের দুঃখ-মোচনের জন্য কিছুই ভাবেন না, পাঠ আলোচনা উপাসনা যোগে পারিবারিক অথবা মণ্ডলীগত জীবন গঠনে তিলার্দ্ধ অনুরাগ প্রদর্শন করেন না ইত্যাদি। তবে কি বিশেষ কেন্দ্রে বসিয়া থাকিয়া, কেবল সাপ্তাহিক উপাসনার বেদী অধিকারের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, প্রচারক-জীবনের মহৎ ব্রত সাধিত হইবে? বিষয়াসক্ত মানব-চরিত্র গঠনের অন্তরায় ইহা সম্যকরূপে অবগত থাকিয়াও, কে নিঃস্বার্থভাবে পদ্মপত্রে জলবিন্দু সদৃশ উহা হইতে অব্যাহতি পাইতে সংযম করেন? আর কত বলিব! যেমন প্রচারকের দুর্দ্দশা, তেমনি মণ্ডলীর উদাসীনতা, এবং ইহার শেষ কবে ও কোথায়, কে বলিতে পারেন? বাহিরে ঘুরিলে এ প্রকারের অভিযোগ ও অনুযোগ সচরাচর পাঠক ও পাঠিকাবর্গ শুনিতে পাইবেন এবং শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, ইহার উপায় অনুধাবন করুন। আমাদের স্কন্ধে গুরু দায়িত্বের ভার চাপাইয়া অগ্রণীগণ চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া নববিধানের বৈজয়ন্তীকে তুলিয়া ধরিয়া রাখিবার প্রতিশ্রুতি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পালন করিতে কে অগ্রগামী হইবেন? বৌদ্ধদিগের ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা, যথা "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" কি আমাদিগকে লজ্জা দিতেছেনা? মুসলমানের নিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগ আমরা কেবল কি দূরে থাকিয়া প্রশংসা করিব ও তাহাদিগের কার্য্য-প্রণালীকে সমালোচনা করিব? খৃষ্টানদিগের বিশ্বপ্রেম ও নিঃস্বার্থতাকে সাম্প্রদায়িকত্বের প্রাচীরে বেষ্টিত বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিব? এজগতে কিছুই দোষশূন্য নহে, এই উদার নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সবার মধ্যে রত্ন লুক্কায়িত আছে জানিয়া, শ্রদ্ধা-পূর্ণ হৃদয়ে আমাদের গন্তব্য রাজ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ।

আমরা পাটলিপুত্র-নগর ত্যাগ করিয়া রাজ-গৃহ অভিমুখে ১লা নভেম্বর যাত্রা করিলাম। বক্তিয়ারপুর ষ্টেসনে বেলা ১০টায় গাড়ী বদল করিয়া, ছোট গাড়িতে আরোহণপূর্ব্বক, অপরাহ্ণ ৩।০ টায় আমরা রাজগৃহে পৌঁছিলাম; তৎপর বৌদ্ধ আশ্রমে আশ্রয় পাইলাম এবং আশ্রমাধ্যক্ষ ভিক্ষু V Kundanuaর সহিত আলাপ হইল। তিনি শাক্যসিংহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে আত্মহারা হইতে লাগিলেন এবং মানবজাতির আদিভাষা সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে পালি, ইহাই তাঁহার স্বভাবোচিত যুক্তি ও তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। আমরা শ্রীনব-বিধানের বিশেষত্ব ও সার্ব্বভৌমিকত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ বর্ণনা করায় তিনি মোহিত হইলেন এবং ভবিষ্যতে ইহাই জগতের একমাত্র গ্রহণীয় মত হইবে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। আমরা রাজগৃহে পৌঁছিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাবগাহন করিয়া, গুহার শিরোপরি বসিয়া, প্রকৃতির বক্ষে গভীর উপাসনা ও ধ্যানে মগ্ন হইলাম। সে যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের খনি! দিনমণি অস্তাচলচূড়া অবলম্বনে চলিয়াছেন। চারিদিকে অবিচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে মহর্ষি যোগী গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ-সাধন সম্ভোগ করিলাম। সন্ধ্যার আগমনে আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট আশ্রমে পাণ্ডার সাহায্যে ফিরিলাম। পরদিন প্রত্যূষে রাজা বিম্বিসারের বিপুলাচল পর্ব্বত-শিখরের নিকটবর্ত্তী চূড়ায় আমরা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীচিরঞ্জীবের সংগীত গাহিলাম, "প্রকৃতির অন্তরালে দেখ পুরুষ প্রধান, নব নটবররূপে অনন্ত ভূমা মহান্।" আমাদের মত ঘোর সংসারাসক্ত জীবের প্রাণায়াম-সাগরে ডুবিতে হইলে তীর্থ-পর্য্যটন আবশ্যক। শ্রীহরি আমাদের লইয়া, "গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন" সম্পাদনার্থ, নিয়ত আমাদিগকে অপূর্ব্ব কৌশলে পরিচালিত করিতেছেন। সময়ে সময়ে প্রকৃতির মধ্যে তাঁর অরূপ-রূপ-লাবণ্য দর্শন করিতে সুযোগ ও সুবিধা অন্বেষণ করা উচিত।

পিসিমাতাঠাকুরাণীর এই রাজগৃহতীর্থে সকল বাসনার নির্ব্বাণ হইয়াছিল ও আর্য্য ঋষিদিগের স্নাত পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে অগ্নিময় দেবতাকে সাক্ষাৎ দর্শন ও স্পর্শ করিয়া তিনি কতই পরিতৃপ্ত হইতেন। এখন তিনি অমরধামে ব্রহ্মানন্দদলে আমাদের স্বর্গস্থ পিতামাতার সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া আমাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করুন। জয় জয় মা আনন্দময়ীর জয়!!! রাজগৃহ ছাড়িয়া নলন্দা অভিমুখে যাত্রা করিলাম ও তথায় অশোক রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কারুকার্য্য ভগ্নস্তূপ হইতে প্রকাশিত ও আবিষ্কৃত হইতেছে দেখিলাম। তাহার বিবরণ প্রবাসী মাসিক পত্রে সঙ্কলিত হইয়াছে, অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।
২৮নং যুগীপাড়া লেন।

নূতন সঙ্গীত।

(১)

বৈজয়ন্তী সঙ্ঘ উপলক্ষে রচিত।

("সম্মুখে অমর-ধাম"—সুরে গেয়)

দেশে দেশে কালে কালে, অপরূপ লীলাচ্ছলে,
পাঠালে হরিহে, কত সঙ্ঘ !
সঞ্চারিতে মহাশক্তি, বিনাশিতে মোহাসক্তি,
করিতে হে ভব-ভয়-ভঙ্গ। হরিহে !
দেখাতে সত্যের মার্গ, আনিতে সংসারে স্বর্গ,
দিলে কত সাধু-জন-সঙ্গ ; হরিহে !
হ'ল তাহে উচ্ছ্বসিত, অমূল্য-বিধান-তত্ত্ব,
অভিনব ভক্তির তরঙ্গ। হরিহে !
প্রকাশি প্রেমের রবি, দেখালে স্বর্গের ছবি,
পুণ্য-আত্মা পূত-অন্তরঙ্গ ; হরিহে !
বিশ্ব-কবি-রূপ ধরি, নর-কণ্ঠে অবতরি,
বর্ণিলে হে বিচিত্র প্রসঙ্গ। হরিহে !
ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন প্রাণ,
দিলে কত মিলনের মন্ত্র ; হরিহে !
কতই মহতী আশা, জাগাইলে বিজিগীষা,
আনন্দ ও প্রকৃতির তন্ত্র। হরিহে !
নবযুগে সেই জ্ঞান, বিজ্ঞানে হ'ল স্ফুরণ,
কর্ম্মিগণ জাগিল অসংখ্য ; হরিহে !
চতুর্দ্দিক মহারবে, পুরিয়া ত্রিদিব ভবে,
বাজিল সে বিজয়ের শঙ্খ। হরিহে !
বিচিত্র আলোক চিত্র, বিরচি সবার চিত্ত,
করিলে মোহিত মন্ত্র-মুগ্ধ ; হরিহে !
বিধান-বর্ত্তকগণে, দেখাতে সে রঙ্গাঙ্গণে,
সর্ব্বজনে করে দিলে শুরু। হরিহে !
ধন্য ! ধন্য ! ধন্য ! তুমি, ধন্য এই বঙ্গভূমি !
ধন্য ! নববিধানের ধর্ম্ম ! হরিহে !
এই ধর্ম্ম-সমন্বয়, করি হরি ! সর্ব্বময়,
সার্থক করহে নব জন্ম। (মোদের)
যেথা যত আছে ধর্ম্ম, সবারায় এক মর্ম্ম,
যুগ-ধর্ম্মে মিটাওহে দ্বন্দ্ব ; (সবাকার)
সবে আশীর্ব্বাদ করি, ডেকে নিয়ে চল, হরি !
(মিলাইয়া দাও হরি !)
চলুক ধরিয়া তব ছন্দ। (সবে)

শ্রীদামোদর পাল

(২)

(মাঘোৎসবে সঙ্ঘের উৎসবে রচিত ও গীত)

কথা—শ্রীসুধীরকুমার খাস্তগীর   সুর—শ্রীশুচিংমোহন দাস।

আজিকার দিনে কে কোথায় আছ বিধান-মন্ত্র-পূজারী,
সঙ্ঘ-শঙ্খ বাজায়ে এসেছি সঙ্ঘের ব্রতধারী।
সঙ্ঘের পূজা বিধানের পূজা এ পূজা মিথ্যা কভু কি হয়,
যুগে যুগে যত সাধু মহাজন সঙ্ঘ-পূজারি মহিমা গায়।
(কোরাস) এস ভাই বোন বন্ধু বিরোধী করহে সঙ্ঘ বলীয়ান,
বিশ্বের মাঝে সঙ্ঘের কাজে করগো সবে আত্মদান।

সঙ্ঘের ঘন মিলিত জীবন মুক্তি আঁকা যে তাহারি মাঝে,
যুক্ত সাধনে আদর্শের ধ্যানে নবীন উষারি আভাস রাজে।
নূতন এ শিশু জনম ইহার ব্যর্থ হবার কখন নয়,
প্রাচীনে নবীনে আজিকার দিনে গাও সঙ্ঘের জয় জয়।
(কোরাস) এস ভাই বোন বন্ধু বিরোধী করহে সঙ্ঘ বলীয়ান,
বিশ্বের মাঝে সঙ্ঘের কাজে করগো সবে আত্মদান।

(৩)

প্রাণের নিদান তোমার বিধান মানিয়ে যানাও।
তোমার কাজেই থাকব তাজা, জানাও জানাও।
ধন্য মোরা কর্ম্ম-ভারে—
নয় সে ভূতের বোঝা ঘাড়ে ;
সইতে বোঝা শক্ত করে আমায় বানাও।
সেবা-যাগের অনুরাগে—
চিত্তে নববিধান জাগে,
সেই কাহিনীর আশার বাণী শোনাও শোনাও।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(৪)

(বৈজয়ন্তী সঙ্ঘ উপলক্ষে রচিত ও বিতরিত)

দেবতার প্রেমতৃষ্ণা মানবের নেশা,
সব চেয়ে হবে না কি সে বড় পিপাসা ?

পৃথিবী পরিধি বেষ্টন করি
ফিরিছে নাচিয়া সংখ্যাহীন তরী,
বাষ্পীয় রথ উড়ায়ে হাওয়ায়
জাতিরা ফিরিছে দিগ্বিজয়,
করিল শান্ত সুহাসি সেবিকা বিজলী সর্ব্বনাশা ;
বিধান আদর্শ জাগাবে না কি মা এরও চেয়ে বড় সিদ্ধি পিপাসা ?

চির শুভ্র ঐ পবিত্র তুষারে,
সুমেরুর পরে, কুমেরুর পারে,
নিশান আপন করিল নিখাত,
না মানিয়া শীত করকাসম্পাত,

আকাশে ছড়াল জগত সন্দেশ করি পরাজয় বিস্ময়ের ভাষা ;
বিধান প্রেরণা এ সবারও বড় জয়ের হবে না শ্রেষ্ঠ পিপাসা ?

প্রাণের প্রেরণা যেথা কর্ম্মেরে
করে না উত্থিত অধ্যাত্মের স্তরে,
শুধু হীন লাভ ক্ষতির গণনা
মানবে জাগায় এমন সাধনা,

স্বর্গের অনুপ্রাণনা তবে কি পারে না জাগাতে দিব্য ভালবাসা,—
বিধান-বিশ্বাসী মানব-হৃদয়ে এ সবারই বড় সিদ্ধির আশা ?

শুভ বিধানের বারতা বহিতে
ক্লান্তিহীন পায়ে হবে যে ছুটিতে,
ধরণীর দূর পারাপারে,
মহাদেশে দেশে সাগরে সাগরে,

দ্বীপে উপদ্বীপে নগরে নগরে, যেখানেই নর বেঁধেছে বাসা :
সকল উদ্যম পিছে ফেলি কি গো বিধানের নয় শ্রেষ্ঠ পিপাসা ?

আঁকিয়ে তিলক তোমার হাতের,
দাও বীর বেশে সাজায়ে এদের
মাথায় রাখিয়া মা তোমার হাত
আজিকার দলে কর আশীর্ব্বাদ,

তোমার মন্ত্র বুকে লয়ে এরা যাক্ দিকে দিকে প্রীতিতে বিবশা ;
স্বর্গের নববিজ্ঞানে মিটুক নব পৃথিবীর সর্ব্ব পিপাসা।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

[ভারতে নবযুগের উদ্বোধন-কর্ত্তা]

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিবার নিমিত্ত গতকল্য (৮ই জানুয়ারী) কলিকাতায় এ্যালবার্ট হলে ডাক্তার পূর্ণানন্দ চ্যাটার্জ্জীর সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় অনেক মহিলা এবং বিশিষ্ট জনগণের সমাবেশ হইয়াছিল। সময়োপযোগী একটি সঙ্গীত গীতি সহকারে সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

অধ্যাপক রাধাকিষণ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনী কিংবা তাঁহার কার্য্যের সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য আমি এই সভায় আগমন করি নাই, সে ক্ষমতা আমার নাই ; আমি তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। জগৎকে ভারতের যদি কিছু দান করিবার থাকে, ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সে তাহা দান করিতে সক্ষম হইবে। সভ্যতা এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ আর বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নাই। মানবজাতির মধ্যে নৈকট্য এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রেম, মৈত্রী এবং বিশ্বজনীন সাম্যভাবকে অবলম্বন করিয়া মহতী মানবসভ্যতা গঠন করিতে হইবে। এই প্রেম, মৈত্রী এবং পরমতসহিষ্ণুতার বাণীই কেশবচন্দ্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণও ঐ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ডাক্তার সরোজ দাস প্রভৃতি বক্তাগণ ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেন।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষকে একশতাব্দী আগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে আদর্শ এবং যে ভাব তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করেন, তাহা এদেশে যুগান্তর ঘটাইয়াছে ; কেশবচন্দ্রের চিন্তাধারা বর্ত্তমান ভারতের আদর্শ এবং চিন্তাধারাতে পরিণত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র তাঁহার আদর্শ চরিত্র এবং বিশ্বজনীন প্রেম প্রভাবে এদেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

(২৪শে পৌষের, আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

—০—

প্রান্তরে বক্তৃতা।

(২রা মাঘ, কলেজ স্কোয়ারে ভাই গোপালচন্দ্র গুহের নিবেদন)

হে বন্ধুগণ, আজ আমরা স্বর্গের বিশেষ সুসংবাদ আপনাদিগকে দিবার জন্য এখানে উপস্থিত। আপনাদের সম্মুখস্থ এই নিশান সেই সুসংবাদ ঘোষণা করিতেছে। আমরা কি সংবাদ আপনাদিগকে দিব ? জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলার সংবাদ। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতে ধ্যান-পরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণ ঈশ্বরকে কত বিচিত্র ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, কত বিচিত্র পরিচয় তাঁহারা ঈশ্বরের লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পরিচয়ের কথা তাঁহাদেরই নিবদ্ধ গাথায় প্রকাশ করি। "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।" ঋষিগণ জীবনে প্রত্যক্ষ করিলেন, যিনি জগতের স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, মহান্ ঈশ্বর, তিনি জীবের সুনির্ম্মল পদপ্রাপ্তি, আরাম ও আনন্দ বিধান জন্য মঙ্গলপ্রদ সত্যধর্ম্মের আপনি প্রবর্ত্তক। সেই মহান্ ঈশ্বর প্রত্যেক মানবের অন্তরে স্থিতি করিয়া সত্য মঙ্গলপ্রদ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা আপনি দান করেন। আপনারা অনেকে জানেন, গায়ত্রী-মন্ত্রে সেই ত্রিলোকপ্রসবিতা পরম দেবতাকে শুভবুদ্ধি-দাতা, মঙ্গলবুদ্ধি-দাতা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" তিনিই আমাদিগকে ধী-শক্তি, শুভ বুদ্ধি প্রদান করেন। তিনি কি জানেন না, আমরা সংসারে কত অসহায়, কত দুর্ব্বল, জ্ঞানহীন ও শক্তিহীন ? তিনি আমাদিগের অসহায় অবস্থা জানিয়াই, আমাদিগের জীবনের

সহায় হইতে, আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিয়া মঙ্গলের পথে পরিচালন করিতে সদাই প্রস্তুত। কিন্তু একটি অবস্থার প্রয়োজন। লোকে বলে, "মা লক্ষ্মী, দয়া কর"। লক্ষ্মী বলেন, "তুমি একটু নড় চড়"। অর্থাৎ মা লক্ষ্মী দয়া করিতে প্রস্তুত, কিন্তু সেই দয়া পাইতে হইলে আমাকেও কিছু করিতে হইবে। আমি অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে দয়া পাইব না। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিতে প্রস্তুত; ধর্ম্মের পথে, মঙ্গলের পক্ষে পরিচালন করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমাদিগকে কিছু করিতে হইবে। তিনি যেমন আমাদিগের সহায়তা করিতে ব্যস্ত, আমাদিগকেও তাঁহার সহায়তা লাভ জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তাঁহার সহায়তা ভিক্ষা করিতে হইবে। "আমরা তাঁহার নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিব, তিনি সহায়তা দান করিবেন," এইটী স্বর্গের বিধি। আমরা ব্যাকুল হইয়া সহায়তা চাহিব, তিনি আমাদিগকে সহায়তা-লাভে উন্মুখীন করিবেন, ইহাই অকাট্য বিধি। আমাদিগের প্রতি জীবনে ঈশ্বরকে, জীবন্ত ঈশ্বরকে পাইতে হইলে, সেই জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা প্রয়োজন। সংসারে কাহার অভাব নাই? এই যে এখানে কত যুবক, কত প্রৌঢ়, কত বৃদ্ধ, নানা বয়সের ব্যক্তি সকল দাঁড়াইয়া আছেন, ইঁহাদের কাহার অভাব নাই? যুবকগণের কেহ পড়াশুনার চাপে ক্লিষ্ট, কেহ বিষয়-কর্ম্মের অভাবে বা চাপে ক্লিষ্ট, হয়তো কোন ব্যক্তি সংসারের নানা অভাব অনটনে, কেহবা রোগে, শোকে, দুঃখ দৈন্যে ক্লিষ্ট। অন্তরে বাহিরে আমাদের কত শত্রু। কত শত্রু দ্বারা আমরা যখন তখন আক্রান্ত। অভাবে পড়িলেই প্রার্থনা ভাল হয়। এই সম্মুখস্থ নিশান যে "নববিধান" ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছে, এই নববিধান রূপ স্বর্গের নব ধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগে যাঁহার জীবন-যোগে বিশেষ ভাবে এই ধরাধামে অবতীর্ণ, সেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন প্রার্থনার জীবন। তাঁহার জীবনে এই নবযুগে প্রার্থনার অপূর্ব্ব মহিমা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাঁহার জীবন অতি সুন্দর ভাবে এই প্রার্থনা শিক্ষা দান করে। প্রার্থনার অবস্থা অতি সহজ অবস্থা।

আপনারা এখানে যত লোক উপস্থিত আছেন, অদ্য হইতে প্রত্যেকে প্রার্থনা করিয়া, নিজ নিজ জীবনে প্রার্থনার ফল প্রত্যক্ষ করুন। প্রার্থনার ভিতর দিয়াই সহজে জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহাতেই সাক্ষাৎ ভাবে সেই জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত পরিচয় আমরা লাভ করিতে পারি। আপনার মনটা অবস্থার চাপে যদি দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তবে ঈশ্বরের নিকট বল ভিক্ষা করুন, ব্যাকুলভাবে বলের জন্য প্রার্থনা করুন; দেখিবেন, ব্রহ্মবল আসিয়া প্রাণকে সবল করিবে, জীবনকে অগ্নিময় করিবে। আপনি কোন্ পথে চলিবেন, কোন্ কাজ করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না, কি মোহ অন্ধকারে চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়াছে, প্রার্থনা করুন ঈশ্বর হইতে আলোক লাভের জন্য, প্রার্থনা করুন কর্ত্তব্য-বুদ্ধি লাভের জন্য; দেখিবেন, ব্রহ্মালোক আসিয়া প্রাণকে আলোকিত করিবে, মোহ মেঘ কাটিয়া যাইবে, স্বর্গের দিব্য জ্যোতিতে প্রাণ জ্যোতিষ্মান হইবে। এইরূপেই আমরা ব্রহ্ম-পরিচয় সাক্ষাৎভাবে লাভ করিব, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিব।

আমরা সংসারে আসিয়া সংসারের ধনে জনে, নিজেদের জ্ঞান-গৌরবে এত আসক্ত হইয়া পড়ি এবং তাহা লইয়া এত মাতিয়া যাই যে, ঈশ্বর প্রকৃত ভাবে কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহা আমরা একটু ভাবিয়া দেখিবারও যেন অবসর পাই না। লোক-সমাজে অনেকে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন, প্রতিমা দেখিয়া ঈশ্বর-দর্শনের পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের দর্শন-পিপাসা মিটে না। তাঁহারাই আবার ঈশ্বর-দর্শন-লাভের জন্য তীর্থে তীর্থে যান, অথচ বলেন, কৈ ঈশ্বর-দর্শন তো হইল না।

এই শরীরের মধ্যে যেমন অগ্নি আছে, এই কাষ্ঠখণ্ডের ভিতরে যেমন অগ্নি আছে, বাহিরে দেখা যায় না, বাহিরে প্রকাশ নাই; কিন্তু এই কাষ্ঠখণ্ডে অপর কাষ্ঠখণ্ড ঘর্ষণ করিলেই অগ্নি নির্গত হয়, দুইখানা হাত ক্রমাগত ঘর্ষণ করিলেই তাহা হইতে অগ্নি উদ্গীরণ হইতে থাকে। তেমনই ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, আমাদের প্রাণে তাঁহার জন্য একটু সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলেই, আমাদের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ হয়। ব্যাকুল ভাবে অন্তরের প্রার্থনাই সেই সংঘর্ষণ। আমরা যখন এই প্রার্থনাদি যোগে অন্তরে ঈশ্বরের বল লাভ করি, তখন আমাদের প্রাণ দুর্জ্জয় বলে বলী হয়; যখন আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ উপস্থিত হয়, তখন আমাদের চিত্ত কেমন দিব্যালোকে আলোকিত হয়। ঈশ্বরের বল এবং তাঁহার স্বর্গের আলোক লাভ করিলেই আমরা স্বাধীন হই, নির্ভয় হই, মুক্ত হই। আমরা রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিতর দিয়া স্বাধীন হইতে চাই, ব্যবসায় বাণিজ্যের বিষয়ে স্বাধীন হইতে চাই; সংসারে সে স্বাধীনতা প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু সে স্বাধীনতা যথার্থ স্বাধীনতা নহে। মানব-জীবন তাহা পাইয়া যথার্থ স্বাধীন হয় না। তুমি বাহিরে স্বাধীন হইলেই কি তুমি স্বাধীন হইলে? তোমার অন্তর যে কত আসক্তির অধীন হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের স্বর্গীয় বল ভিন্ন তো অন্তরের আসক্তি ছিন্ন হয় না। ঈশ্বরের দুর্জ্জয় বলে বলী হও, জীবনে যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিবে। কিন্তু যদি জীবনে ধর্ম্মবল, ব্রহ্মবল স্থায়ী করিতে চাও, তবে মন্দ সঙ্গ, কুসঙ্গ ছাড়িতে হইবে, সাধু-সঙ্গে বাস করিতে হইবে। মন্দ সঙ্গে ধর্ম্মের তাপ, ব্রহ্মের বল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্ম-জীবন রক্ষা পায় না। ধর্ম্মবল রক্ষা করিতে হইলে সাধু-সঙ্গ চাই। নববিধান-ধর্ম্মের বাহক যিনি, সেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সকল অবস্থায় সাধু-সঙ্গে কিরূপে বাস করা যায়, তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি শরীরধারী সাধুদিগের সঙ্গ করিলেন, যে সকল সাধু পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও জীবন্ত সঙ্গে তিনি বাস করিলেন। শরীরধারী পাহাড়ী বাবা, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি জীবিত

সাধুদের যেমন তিনি সঙ্গ করিতেন, তেমনি স্বর্গীয় ঈশা, চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি সাধু মহাজন ভক্তদিগেরও তিনি সঙ্গ করিতেন। তিনি ধর্ম্ম-জীবন জমাট রাখিবার জন্য শরীরী অশরীরী সকল সাধুদিগের জমাট সঙ্গে বাস করিতেন। সাধু-সঙ্গে পূজা, বন্দনা ও ধর্ম্ম মিষ্ট হয়, জমাট হয়, ধর্ম্ম-জীবন অক্ষুণ্ণ থাকে, ধর্ম্ম-জীবন নিরাপদ্ হয়; আমরা গৃহে, পরিবারে ধর্ম্মধন লাভ করিয়া, শান্তি, আরাম ও আনন্দে বাস করিতে পারি।

আপনাদের মঙ্গলের জন্য নবযুগের এই স্বর্গের সুসংবাদ আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম। ঈশ্বর কৃপা করুন, আপনাদের জীবনে এই নবধর্ম্ম জয়যুক্ত হউক।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(৮ই জানুয়ারী, শিলচর, নর্ম্মালস্কুলে স্মৃতি-সভায় পঠিত)

কেশবচন্দ্রের অনুগামী, গীতার সমন্বয়-ভাষ্যকার, বেদান্ত-সমন্বয় এবং ভাগবতের সংস্কৃত ব্যাখ্যাকার, সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, নববিধানে হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যাপক উপাধ্যায় শ্রীমৎ গৌরগোবিন্দ রায় কেশবচন্দ্রের জীবন-চরিত ক্ষুদ্র মহাভারতের ন্যায় একাদশ খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই জীবন-চরিত পাঠ করিলে কেশবচন্দ্রের জীবনের সমস্ত গূঢ়তত্ত্ব পাঠকের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইবে। তিনি যে প্রকার ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত আচার্য্য-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা জীবন-চরিতের প্রথম পৃষ্ঠায় একটী শ্লোক দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন :—

"দরস্য বারো বিপুলস্য পুসাং
সংসারজস্যাস্য নিদেশনঞ্চ।
আনন্দ্য তৎস্বৈরর্তিচিত্রমেত—
চ্চরিত্রমার্য্যস্য নিবদ্ধমগ্র॥"

প্রতি বৎসর ৮ই জানুয়ারী, কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ভারতের নানা স্থানে ও নানা ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য সভা সমিতি হইয়া থাকে। মহাজনদিগের জীবনী আলোচনা করিলে, আমাদের স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র জীবন উন্নত হয়, আদর্শ দৃঢ় হয় এবং পরলোক অভিমুখ হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন এত উচ্চ, এত গভীর যে, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা না করিলে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা অসম্ভব। যে সকল মহাপুরুষ তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের সহিত চিরকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে,—কেশব চন্দ্রের জীবনের ধর্ম্মবিকাশ এমনই গভীরতম যে, তাহা সম্যক্-রূপে অনুভব করা বড়ই কঠিন। জীবনের ঊষাকালে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান হইতে আরম্ভ করিয়া পরলোকগমন পর্য্যন্ত, তাঁহার জীবন প্রতিদিনই নবভাবে বিকশিত হইত। তাঁহার দৈনিক প্রার্থনা এবং উপদেশ স্বর্গীয় ভাবে বিভূষিত হইয়া ভক্তগণের নিকট সৌরভ বিতরণ করে। তাই তাঁহার জীবন-চরিত লেখক স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার রচিত ইংরাজী জীবন-চরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন—"His life scenes presented a garden of real romance. Every day they were blooming fragrant and fresh." "ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র" পুস্তকে গুজরাটী গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেক লিখিতেছেন, "These prayers are unique in the religious literature of the world. Th y reach indeed the high water mark of religious eloquence in the vernacular so much so that some of the best Bengali writers who had little sympathy with Keshub's spiritual ideals would go at times to hear the wonderful eloquence and the exquisite language of his extempore Sermons."

তাঁহার জীবন প্রতিদিনই নূতন ভাবে ভূষিত হইয়া ধর্ম্ম-পিপাসুদের নিকট বিকশিত হইত। তাঁহার দৈনিক প্রার্থনা যেন অনাঘ্রাত কুসুম সদৃশ—মনে হয়, যেন স্বর্গীয় উদ্যান হইতে কুসুমরাশি চয়ন করিয়া কেশবচন্দ্র প্রার্থনার আকারে ভক্তগণের নিকট বিতরণ করিতেছেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জীবিত অবস্থায় অনেক প্রকার মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এই সকল দুঃখপ্রদ ঘটনাবলী আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মৃত্যুর পর সভাসমাজে তাঁহার স্বর্গীয় জীবন কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর চিন্তনীয়। সভ্য ইউরোপ এবং আমেরিকার জ্ঞানিগণ কেশবচন্দ্রের জীবনের গূঢ়তত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে সেই সময়ের একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের জীবনী শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত অধ্যয়ন না করিলে, তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন।

কেশবচন্দ্র কলিকাতার টাউন হলে এবং ইংলণ্ডে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞানিগণ—শিশিরো, ডিমস্থেনীস, বা গাম্বেটের ন্যায় বিখ্যাত বাগ্মী বলিয়া উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন। The Rev. Dr. Cheyne one of the Editors of the Encyclopedia Biblica নামক পুস্তকে Reconciliation of Races and Religions নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন :—"The greatest Religious teachers and reformers who have appeared in recent time are *Bahaullah* the Persian and the *Keshub Chandra* the Indian. The one began by being a reformer of Mohomedan Society, the other by acting in some capacity for the Indian community and more especially for the Brahmo Samaj founded by Raja Ram Mohan Roy."

কেশবচন্দ্র নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে ধাবিত হইত। তাঁহার জীবনবেদের এবং True Faithএর প্রত্যেকটী বাণী তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র তাঁহার জীবনে যে সকল তত্ত্ব এবং নিগূঢ় ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে পাঠ করিয়া উঠা অসম্ভব। কেশবচন্দ্র কে এবং তাঁহার জীবনের কি উদ্দেশ্য এবং ভারতকে তিনি কি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার রচিত জীবনবেদ এবং True Faith পাঠ করিলে সম্পূর্ণ অবগত হওয়া যায়। জীবনবেদের এক এক অধ্যায় পাঠ করিলে, মনে হয়, যেন কেশবচন্দ্র এ জগতের মানুষ নন। স্বর্গের নূতনতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম। জীবনবেদের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক অলৌকিক স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ। True Faith একখানি সামান্য ক্ষুদ্র পুস্তিকা; কিন্তু ইহার প্রত্যেক অক্ষরের পশ্চাতে যে সকল গভীরতত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, তাহা উদ্ঘাটন করিলে কেশবচরিত্র কি উপাদানে গঠিত, তাহা একটু উপলব্ধি করা যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র True Faithএ বলিতেছেন :—"Faith is the direct Vision. It beholdeth God and it beholdeth immortality. It is no dogma of books, no tradition of Venerable antiquity. It relyeth upon no evidence but the eyesight and will have no mediation." এই প্রকৃত বিশ্বাস তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। সাধু পল Episoles to the Corrinthianএর একস্থানে বিশ্বাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"We walk by faith not by sight." এই উক্তির সহিত কেশবের বাণী তুলনা করিলে, মনে হয়, যেন ব্রহ্মানন্দ বিশ্বাসভূমির অতি উচ্চগ্রামে অবস্থিতি করিয়া, তিনি True Faith লিখিয়াছেন এবং জগদ্বাসীকে বলিলেন—"যদি তোমরা বিশ্বাস-ভূমির উপর স্বীয় স্বীয় জীবন স্থাপন কর, তবে সংসারের ঝঞ্ঝাবাত তোমাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না।"

মহর্ষি ঈশার নাম যেমন Man of sorrows বলিয়া কথিত হয়, সেই প্রকার কেশবকেও আমরা Man of faith বলিতে একটুও দ্বিরুক্তি করিতে পারি না। কেশবচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে এক মহাপুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত হন। তিনি আধ্যাত্মিক যোগে বুঝিতে পারিলেন যে, এই কেশবই স্বীয় অসাধারণ মনীষা দ্বারা ভারতে নূতনত্ব প্রকাশ করিবেন। তাই তিনি যোগবলে উপলব্ধি করিয়া কেশবকে আচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে "ব্রহ্মানন্দ" নামে বিভূষিত করিলেন। ভগবান্ বলিলে যেমন পুরুষোত্তমকে বুঝায়, ত্র্যম্বক বলিলে যেমন মহাদেবকে বুঝায়, শতক্রতু বলিলে যেমন ইন্দ্রকে বুঝায়, সেই প্রকার ব্রাহ্মজগতে ব্রহ্মানন্দ বলিলে কেশবকে বুঝায়। এই শব্দ আর দ্বিতীয়গামী হয় না। ভারত কেশবের নিকট কত ঋণী, যাঁহারা তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

আমাদের প্রিয় ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র-মোহন সেন।

আমাদের বিধান-পরিবার আর একটি ভ্রাতৃবিয়োগ-শোকে আহত হইল। ঢাকা-নিবাসী শ্রদ্ধেয় গোপীকৃষ্ণ সেনের পুত্র এবং শ্রদ্ধেয় জয়কৃষ্ণ সেনের জামাতা ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন গত ১লা ফেব্রুয়ারী, রবিবার, রাত্রি ১১টা ৫০মিনিটের সময়, এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া, নিত্য শান্তিধামে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি অতি শান্তস্বভাব, দৃঢ়নিষ্ঠ, বিধান-বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বেশী বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা অতি দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতেন। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় ও সভাসমিতিতে যোগদান করিতে এবং দীনবিনীত ভাবে সকল অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিত রূপে যোগ দিতে, তাঁহার মত অতি অল্প লোককেই দেখা যাইত। বিধান-বিশ্বাসী পিতার প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেও, তাঁহার সম্পত্তির গরিমা ছিলনা এবং উপাসনাদিতে প্রায় সকলের পশ্চাতে বসিয়া যোগ দিতে ভাল বাসিতেন। বাস্তবিক তিনি বহুগুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় দেহত্যাগের শেষ কয়দিন যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না।

দেহত্যাগের দুই তিন দিন পূর্ব্বে যখন রোগের প্রকোপ খুব বৃদ্ধি হইল, যখন তিনি প্রায় অৰ্দ্ধসংজ্ঞাশূন্য, যখন তাঁহার চিরসঙ্গিনী সতী-সাধ্বী সহধর্ম্মিণী দেবী অসীম ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া, সেই ভীষণ অবস্থায় স্বামীর যথার্থ ধর্ম্ম-সঙ্গিনীর কর্ত্তব্য অনুসরণ করিয়া, কেবল মধুর সঙ্গীত শুনাইয়া তাঁহাকে পরলোক-যাত্রার জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন যাই আমরা ভাই জ্ঞান বলিয়া ডাকিলাম, আর বলিলাম, "দেখছ না, আনন্দময়ী মা এই তোমার কাছে বসে আছেন", অমনি তার উত্তরে "হাঁ! এই যে মা" বলিয়া হাত বাড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন, আর বলিলেন, "মা নাও কোলে নাও," এই বলিয়া শিশুর মত হাত বাড়াইয়া দিলেন। তাহার পর প্রার্থনা ও মাতৃ-স্তোত্রে বেশ চক্ষু মুদিয়া যোগদান করিলেন। পরে সংক্ষিপ্ত উপাসনাতেও যোগ দিলেন। পরদিনও প্রার্থনা ও ব্রহ্মস্তোত্রে যোগ দেন। তাঁহার সতী সহধর্ম্মিণী দেবী, আদরের পুত্র-বধূ ও কন্যা সন্তান যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহার

রোগের সেবা করিয়াছেন, তেমনি শেষ কয়দিন বিশেষ ভাবে দিবারাত্র সঙ্গীতাদি করিয়া যেরূপ তাঁহার আত্মার সেবা করিয়াছেন, এমন করিতে সচরাচর অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক ভগ্নি সরলা দেবী সরলা স্বামি-ভক্তি ও অতুলনীয় ধৈর্য্য সংকারে সঙ্গীত শুনাইয়া, স্বামীর আত্মাকে কয়দিন ধরিয়া যেরূপে রোগ-যন্ত্রণা ভুলাইয়া স্বর্গগমনে উৎফুল্ল ও প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এমন কাহাকেওত প্রায় করিতে দেখি নাই।

ভ্রাতা দুই তিন মাস ধরিয়া রোগ-শয্যায় শায়িত ছিলেন। অজীর্ণতা-জনিত কণ্ঠনালীতে একপ্রকার ক্ষত হয়, তাহাতেই ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়, আর দেহভার বহন করিতে পারিলেন না। উচ্চশিক্ষিত কৃতী সন্তান, মণ্ডলীর সকলের আদরের "জিতু" (জিতেন্দ্রমোহন সেন) এবং তাঁহার প্রিয় সঙ্গিনী মা সুধা আপনার শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া ও রাত্রি জাগরণাদি করিয়া, কতই চিকিৎসা ও সেবা করিয়াছেন। শেষ সময়ে যখন আহারে অরুচি হয়, তখন মা সুধা "বাবা" বলিয়া ডাকিয়া যাই কিছু আহার করাতেন, অমনি "মা" বলিয়া উত্তর দিয়া স্নেহ-বশে আহার পান করিতেন। কন্যারা দূরে থাকিতেন, তাই মা সুধাই তাঁর মার মত হইয়াছিলেন। পরলোকগমনকালে ভগিনী, সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ, কনিষ্ঠা কন্যা ও জামাতা এবং বহু আত্মীয় স্বজন কয়দিন ধরিয়া সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিয়া, যাঁহার যেমন সাধ্য, নানা প্রকারে সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শেষ দিন অর্থাৎ ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি একটু সুস্থ হইতেছেন সকলে মনে করিয়া, একটু জীবনের আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু কালের নিয়তি কে খণ্ডন করিবে! রাত্রি ১টা ৫০ মিনিটের সময় ভাই আমাদের যে চির যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন, আর উঠিলেন না।

প্রত্যুষে বন্ধু বান্ধবগণ সংবাদ পাইয়া সমবেত হইলে, ভাই চন্দ্রমোহন এবং ভাই প্রিয়নাথ সমযোগে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও আচার্য্যদেবের প্রার্থনাযোগে প্রার্থনা করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। নিমতলার শ্মশানে প্রিয় পুত্র যখন চিতাগ্নি প্রজ্বলন করেন, তখনও বোধ হইল, যেন সে দিব্য আত্মা গভীর যোগনিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। যাহা নশ্বর তাহা চিতাগ্নিতে ভস্ম হইল, যাহা অবিনশ্বর তাহা নিত্যধামে, মা আনন্দময়ীর ক্রোড়ে স্বর্গস্থ পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং ব্রহ্মানন্দ-সঙ্গে সমুত্থিত হইল।

নববিধান আশ্রম।

নববিধান-জননীর কৃপায় নববিধান আশ্রমের জন্য "মঙ্গল পাড়ার" মধ্যেও একটী স্থান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভক্তি-ভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতি-মন্দিরের সংশ্লিষ্ট হইয়া যে আশ্রমের কার্য্য আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রিয় দাদা আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই পার্শ্বে স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথের বাস-ভবন। যাহা একদিন এই সাধুর যোগ তপস্যার স্থান ছিল, যে স্থানে আমাদের আচার্য্যদেব একদিন এই সাধুর সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই গুহ ও পবিত্র সমাধি নববিধান-বিশ্বাসীর নিকট একটী পরমতীর্থ স্বরূপ—বিগত ১লা মাঘ, তাহা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সাধু অঘোরনাথের পুত্রদ্বয়কে অন্যলোক যে মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারা তা প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক মূল্যে -- দুই সহস্র টাকায়—ইহা আশ্রমের জন্য দিয়াছেন। ইহার জন্য মোট ২২০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে—মূল্য ২০০০৲ টাকা, রেজিষ্ট্রি খরচ ১০০৲ টাকা ও মেরামত খরচ ১০০৲ টাকা। তন্মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ১৮৩৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে, প্রতিশ্রুত আছে ২৮৫৲ টাকা এবং অভাব ৮০৲ টাকা। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই জন্য অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাঁদের নিকট ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্তের নিকট আশ্রমের ট্রাষ্টীগণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। নিম্নে প্রাপ্ত ও প্রতিশ্রুত টাকার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রাপ্ত—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন	১০০৲
„ ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	১০০৲
„ ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ	৫০৲
„ ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ	২০৲
শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র	২৲
„ চিত্তবিনোদিনী ঘোষ	৫৲
„ নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ	২০৲
„ অকিঞ্চনবালা বসু	১০০৲
রায় সাহেব হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	১০০৲
প্রিন্সিপ্যাল দেবেন্দ্রনাথ সেন	১০৲
প্রফেসার আশুতোষ মুখার্জ্জী	৫০৲
„ নিরঞ্জন নিয়োগী	৫০৲
„ রাজেন্দ্রনাথ সেন	১৫০৲
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার দাস	১০০৲
লেঃ কর্ণ্যাল জ্যোতিলাল সেন	১০০৲
শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমানবিহারী দে	২০৲
„ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫০৲
„ প্রশান্তকুমার সেন	১০০৲
„ ডাঃ কৃপাসুন্দর বসু	২০৲
„ হরিপ্রসাদ মজুমদার	২৫৲
„ ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র	১০০৲
„ ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়	১০০৲
মোট	১৮৩৫৲

প্রতিশ্রুত—শ্রীযুক্ত ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০৲
,, রাজেন্দ্রনাথ সেন ৫০৲
,, বেণীমাধব দাস ২৫৲
,, ডাঃ বিমলচন্দ্র দাস ১০৲
,, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ ২৫৲
,, ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫০৲
,, হরিপ্রসাদ মজুমদার ২৫৲

মোট ২৮৫৲

নববিধান আশ্রমের অন্যতম ট্রাষ্টী
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়।

—•—

একাধিকশততম মাঘোৎসব।

প্রস্তুতি।

১লা জানুয়ারী হইতে নববিধান-মহোৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ। নববর্ষাগমে কমলকুটীর ও নবদেবালয়ের উপর নববিধানের নিশান উত্তোলন-পূর্ব্বক উৎসবারম্ভের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়।

প্রত্যূষে নবদেবালয়ের রোয়াকে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া, নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। আচার্য্য-পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সেন এই উপলক্ষে আচার্য্যদেবের শেষ প্রার্থনা গম্ভীর ভাবে আবৃত্তি করেন।

প্রায় ৯টার সময় নবদেবালয়ে 'পাস্তৃতিক সাধন'—ধর্ম্ম-পিতামহ রাজর্ষি রামমোহন এবং ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্মরণের উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যদেব-লিখিত সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি নিবেদন-পত্র পাঠ করেন এবং শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র ধর্ম্মপিতামহ এবং ধর্ম্মপিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক উপদেশ পাঠ করেন।

সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনা হয় ও ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রভৃতি কিছু কিছু বলেন।

২রা জানুয়ারী, নববিধানের প্রতি, ৩রা জন্মভূমির প্রতি, ৪ঠা গুরুর প্রতি, ৫ই শিশুগণের প্রতি, ৬ই ভৃত্যগণের প্রতি, ৭ই দীনজনের প্রতি কৃতজ্ঞতার্পণ-সূচক উপাসনা-সাধন নিয়মিত-রূপে এবার নবদেবালয়ে সাধিত হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ অধিকাংশ দিন উপাসনা সম্পাদন করেন। প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হয়। প্রধানতঃ ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই চন্দ্রমোহন দাস, শ্রীযুক্ত আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এই সকল দিন প্রসঙ্গ করেন। ৪ঠা রবিবার, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তাঁহার প্রদত্ত নিবেদন স্থানান্তরে দেওয়া গেল। ভৃত্য-সেবার দিনে ৩নং প্রচার-কার্য্যালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভৃত্যদিগকে, ভাই প্যারীমোহনের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ, সমাদরে ভূরিভোজন করাইয়া সেবা করেন।

৭ই জানুয়ারী, রাত্রে জাগরণ, ধ্যান, চিন্তনাদি হয়।

৮ই জানুয়ারী, মহাপ্রয়াণ দিন যে ভাবে সাধিত হয়, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সেদিন সন্ধ্যায় আল-বার্ট হলে সজ্জন-সমাগমে স্মৃতি-সভা হয়। আমাদের পুরাতন বন্ধু ডাঃ পি, চাটার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং অধ্যাপক রাধাকিষণ, ডাঃ সরোজকুমার দাস, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ও সভাপতি আচার্য্য-জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ভাব উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন।

৯ই জানুয়ারী, মহাজনগণের প্রতি, ১০ই দেশহিতৈষিগণের প্রতি, ১১ই জানুয়ারী উপকারিগণের প্রতি, ১২ই জানুয়ারী বিরোধি-গণের প্রতি, ১৩ই আত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্মরণে নবদেবালয়ে উপাসনা হয়, এবং ব্রহ্মমন্দিরেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ হয়। ১১ই রবিবার, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। ১৩ই বিজ্ঞানবিৎদিগের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদান বিষয় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ প্রসঙ্গ হয় এবং ১৪ই চিত্তশুদ্ধির জন্য সাধন নবদেবালয়ে প্রাতে হয়, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনায় শ্রীমতী শকুন্তলা সেন উপাসনা করেন এবং রাত্রে ব্রহ্মমন্দিরে কেহ কেহ রাত্রি জাগরণ করিয়া ধ্যান ও প্রার্থনাদি করেন। এই কয়দিন প্রধানতঃ ভাই চন্দ্রমোহনই নবদেবালয়ে উপাসনা করেন এবং ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ ঢাকার বিমলচন্দ্র ও ভাই গোপালচন্দ্র প্রভৃতি করেন। দুই একদিন প্রিয়নাথও উপাসনা ও প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হন।

মহোৎসব।

১লা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, ব্রহ্মারতি সহকারে উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশ হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সুর লয় সহকারে আরতির কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মারতি হয়। দীপালোকে আরাধনা বা দর্শন করাই আরতি। হিন্দু মৃন্ময় দেবদেবীরই আরতি করিয়া থাকেন। নিরাকার পর-ব্রহ্মের আরতি নববিধানে বিশেষ সাধন। গুরু নানক সর্ব্ব প্রথমে ভবখণ্ডনের আরতি প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মারতি নবভাবে সাধন ও প্রবর্ত্তন করিয়া, বাহ্য আলোক-যোগেও ব্রহ্মারতি বা ব্রহ্মদর্শন কেমন সহজসাধ্য ও উচ্চ অধ্যাত্ম-ফলপ্রদ হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহিরের দীপালোক আত্মিক পঞ্চ প্রদীপ পুণ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও

বিবেকের নিদর্শন করিয়া, তৎসহযোগে ভূমা মহান্ বিরাট ব্রহ্মকে উজ্জ্বলরূপে দর্শন সাধন ও তাঁহাকে মাতৃরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া, ভাবযোগে তাঁহার আরতি করা নববিধানের মহা নব সাধন-সম্পদ্। উৎসবের প্রারম্ভে এই সাধন-যোগে ব্রহ্মদর্শন করিয়া, উৎসব-দ্বারে প্রবেশ করার অধ্যাত্ম উপকারিতা যে কত, যাঁহারা সত্যভাবে এই আরতিতে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারাই সাক্ষ্য দান করিবেন। স্বয়ং আচার্য্যদেবকে যাঁহারা এই আরতি করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহারও তাৎকালিক রূপান্তরিত মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। এবারও তাঁহার আত্মায় আগ্রহ হইয়া আমরা ব্রহ্মারতি করিয়া ধন্য হইয়াছি।

ভাই প্রিয়নাথ ভাবযোগে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সুগম্ভীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। উপস্থিত প্রচারকগণ, মণ্ডলীর সাধক সাধিকা ও বালক বালিকাগণ সমযোগে বাতি হস্তে ব্রহ্মারতি করেন। প্রার্থনান্তে শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গীত করেন।

২রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, প্রাতে ৭॥টায় কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে উপাসনা, অপরাহ্ণে কলেজ স্কোয়ার প্রান্তরে বক্তৃতা হয়। কীর্ত্তনান্তে ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রার্থনা করিলে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম স্থানান্তরে দেওয়া গেল। তৎপর শ্রীযুক্ত আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন। সন্ধ্যায় কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ের রোয়াকে শ্রীমতী মহারাণী সুচারুদেবী প্রমুখ মহিলাগণ কর্ত্তৃক নববিধান-নিশান-বরণ সম্পাদিত হয়। নববিধান-নিশান বরণ নববিধান বিশ্বাসিনী ব্রহ্মকন্যাগণের এক বিশেষ সাধন। ইহার আধ্যাত্মিক শিক্ষা অতি উচ্চ। নববিধান নিশান নববিধানের নিদর্শন। রাজার রাজপতাকা যেমন রাজার বিজয়ের নিদর্শন, তেমনি নববিধান-নিশানও নববিধানের রাজরাজেশ্বরের জয়-স্থাপনের নিদর্শন। যেখানে এই নিশান নিখাত হয়, সেই স্থান রাজার অধিকার-ভুক্ত হয়। তাই নববিধান যাহাতে আমাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং গৃহলক্ষ্মীগণ, সতী দেবীগণ সেই নববিধাননিশানকে আদর করিয়া বরণ করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাই সাধনের জন্য এই নিশান-বরণের অনুষ্ঠান। নিশানের নিম্নে সমুদয় গৃহদ্রব্য, অলঙ্কার, ঘর বাড়ী, ঘোড়া গাড়ী ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থের মূর্ত্তি আলপনা দ্বারা মহিলাগণ অঙ্কিত করেন এবং দীপালোক জ্বালিয়া যেমন বরকে বরণ করেন, সেই ভাবে নববিধান নিশান বরণ করেন। ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে সকলেই বুঝিবেন, চিত্রযোগে যেমন শিশুদের শিক্ষাদান করা হয়, ইহা তাহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নববিধানের রাজার জয় গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলে, গৃহদ্রব্য, সমুদয় অলঙ্কারাদি, গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি যে পিটুলীর আলপনা মাত্র অকিঞ্চিৎকর, ধর্ম্মই একমাত্র বরণীয় ও স্তবনীয়, ইহাই ইহার শিক্ষা। ইহা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান নয়, কেননা ঈশ্বরের মূর্ত্তি নিশান নয়। এই উপলক্ষে মহারাণী দেবী শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের "বিজয় নিশান" সম্বন্ধীয় উপদেশ পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথও সিঁড়ির নিম্ন দেশ হইতে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "নববিধানের জন্মদর্শনে" আবৃত্তি করিয়া, নিশান বরণের গভীর আধ্যাত্মিক প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন।

৩রা মাঘ ১৭ই জানুয়ারী, প্রাতে নবদেবালয়ে, ভাই চন্দ্রমোহন ও ভাই প্রিয়নাথ সমযোগে উপাসনা করেন। নববিধানের নৌকা পালভরে চলেছে, মানুষকে দাঁড় টেনে আর যেন তরী চালাতে না হয়, কৃপাপবনে চলেছে, ইহা যেন অনুভব কর্ত্তে পারি। নববিধানের দুঃখের দিন, কষ্ট-সাধ্য সাধনের দিন চলে গেছে, স্বয়ং মা জীবনের ভার নিয়ে চালাচ্ছেন, ইহা যেন বিশ্বাস হয়। এই ভাবে প্রার্থনা হয়।

ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধে ভাগবতাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া সুন্দর ভাবে বক্তৃতা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দেব-মানবত্ব প্রতিপাদন করাই বক্তৃতার সার কথা।

৪ঠা মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, রবিবার, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন ও সন্ধ্যায় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। এই দিন উপাসক-মণ্ডলীর সম্পাদক ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া সাধু অঘোরনাথের মঙ্গলবাড়ীস্থ গৃহ নববিধানাশ্রমান্তর্গতরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করেন।

৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন উপাসনা করেন ও ভাই প্রিয়নাথ পাঠাদি করেন, প্রার্থনায় ব্রহ্মানন্দের খাটী প্রেম ভিক্ষা করা হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

(ক্রমশঃ)

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৬ই মাঘ, প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দের চতুর্থ পুত্র শ্রীমনোগত ধন দের জন্মদিন উপলক্ষে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষে বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং বলেন, উৎসবের মধ্যে যারা জন্ম পায়, নববিধানে তারা ধন্য। দিদি শ্রীমতী হেমলতা চন্দও বিশেষ প্রার্থনা করেন।

শুভবিবাহ—গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, পূর্ণিমাতে, লেডী ডাক্তার শ্রীমতী সুনীতিবালা দাসের উদ্যোগে, ঢাকানিবাসী স্বর্গীয় শশিভূষণ মল্লিকের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ভক্তিকণার সহিত, শান্তিপুরনিবাসী স্বর্গীয় বীরেশ্বর প্রামানিকের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারীর শুভ বিবাহ নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ এই বিবাহে

আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। ভগবান্ এই নব দম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

প্রস্তুতি—গত ১লা জানুয়ারী, শিলচর ব্রহ্মমন্দিরে, রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দান করিয়া উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়।

উৎসব—উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ২৪শে ডিসেম্বর, দিনব্যাপী উৎসব দিনে প্রাতে ৬॥টায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ উষাকীর্ত্তন করেন, প্রাতে ৮॥টায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, ১০॥টায় স্বর্গীয় কানাইলাল সেনের স্মৃতিসভা, অপরাহ্ণ ২॥টায় বার্ষিক সভা, ৩॥টায় বালকবালিকাদের উৎসব হয় ও ৪॥টায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও তাহার ব্যাখ্যা হয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ সঙ্গীত করেন এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ উহার ব্যাখ্যা করেন। ২৫শে মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী-ভোজন হয়, অপরাহ্ণ ৫টায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ উপাসনা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন। ২৬শে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দের নেতৃত্বে কীর্ত্তন হয়।

গত ১৯শে ডিসেম্বর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী হইতে চারিদিন গাজিপুরেও উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। এই দুই উৎসবের বিবরণ আমাদের হস্তগত হইলে পরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

ঢাকা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন:—আমরাও এখানে দশদিন জমাট উৎসব (একাধিকশততম মাঘোৎসব) ভোগ করিয়াছি। ললিতবাবু, উমাপ্রসন্নবাবু, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি বিশেষ উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে উৎসবে যোগ দেওয়াতে, মা আনন্দময়ীর উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া সকলকে প্লাবিত করিয়াছে। সন্তানের উৎসাহ দেখিলে আনন্দময়ী মার উৎসাহ আর ধরে না। ইহাকেই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, "উৎসবের ঝড়"। ধন্য! ধন্য! ধন্য! উৎসবের দেবতা। তিনি কল্পতরু হইয়া উৎসবে সকলকে অজস্র দান করেন।

নবগৃহ-প্রতিষ্ঠা—শিলচরের সিভিল সার্জ্জন লে: কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন, গত ১৭ই জানুয়ারী, শিলচর হইতে সপরিবারে রওনা হইয়া, ১৮ই জানুয়ারী, রবিবার, রাত্রি ৮টার পর কলিকাতায় ২৫০ নং নিউপার্ক ষ্ট্রীটস্থ নবনির্ম্মিত সুন্দর গৃহে উপস্থিত হইয়াই, দেবতার চরণে নবগৃহ উৎসর্গ করেন। পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন উপাসনা করেন, জ্যোতিলাল বাবু নবসংহিতানুসারে গৃহ ও গৃহজাত সমস্ত দ্রব্য ভগবচ্চরণে অর্পণ করেন এবং এই নূতন গৃহ ভগবান্ স্বয়ং রচনা করিয়া দান করিয়াছেন, তজ্জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতা সপরিবারে তাঁহার চরণে দান করেন। ২৪শে জানুয়ারী, ১০ই মাঘ, শনিবার ভক্ত-সেবা হয়। সেই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। জ্যোতিলাল বাবুর শ্বশুর রায় সাহেব লালবিহারী রায়চৌধুরীও এই ভক্ত-সেবায় উপস্থিত ছিলেন। এই গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রাহ্মরিলিফ ফণ্ডে ১০ টাকা দান করা হইয়াছে। গৃহখানি মা লক্ষ্মীর গৃহ, পরিবারটী মা লক্ষ্মীর পরিবার হউক।

বিশেষ উপাসনা—ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের পরলোক-গমন দিন হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৭টার সময় তাঁহার আলয়ে বিশেষ উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়াছে। একদিন বিশেষ-ভাবে শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সংকীর্ত্তন হয়।

হাওড়ায় সেবা—গত নবেম্বর মাসে, ভাই প্রিয়নাথ দুই সোমবার হাওড়ায় ভ্রাতা জগবন্ধু পালের পারিবারিক দেবালয়ে পরিবারস্থ মহিলাগণ ও গৃহকর্ত্তাকে লইয়া উপাসনা করেন। একদিন স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎকুমার দাসের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে প্রার্থনাদি করেন ও স্থানীয় অন্য দুই বন্ধুর পরিবারে ও দোকানে প্রার্থনা করেন, স্বর্গীয় ভ্রাতা লোকনাথের সহধর্ম্মিণীকে লইয়াও দুই দিন প্রার্থনা করেন।

শুভবিবাহাশীর্ব্বাদ—গত ১৮ই জানুয়ারী, ৬৪ই ইনষ্টিটিউসন ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত, স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ললিতার শুভবিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার মাতামহ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল আরাধনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করেন। ভগবান্ শুভাশীর্ব্বাদানে তাঁহার পুত্র কন্যাকে নবব্রতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন।

স্বর্গারোহণোৎসব—বিগত ৮ই জানুয়ারী, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজে, অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটের সময়, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "ভারতে কেশবচন্দ্রের প্রভাব" বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ডা: ডি, এন, মল্লিক কলেজে মিটিং করার অনুমতি দেন এবং তিনি ও কয়েকটী প্রফেসার এবং প্রায় শতাবধি ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস সায়ংকালে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরেও শ্রীযুক্ত মহেশ বাবু এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন; স্থানীয় কয়েকটী ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

গত ৮ই জানুয়ারী, সন্ধ্যাকালে, ভাগলপুরে, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর গৃহে, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। নববিধানে ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু পরকাল-কথাটার বিশদ ব্যাখ্যা করেন, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু কেশবের জীবন ও বাণী

পুস্তক হইতে পাঠ করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ ও কয়েকটী হিন্দু মহিলা শ্রদ্ধাসহ উক্ত উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ৮ই জানুয়ারী, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে, শিলচর ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে উপাসনা এবং সন্ধ্যায় নর্ম্মালস্কুলে, স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবারিধির সভাপতিত্বে স্মৃতি-সভা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন আচার্য্যের জীবনী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের কতকাংশ স্থানান্তরে দেওয়া গেল। জিলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়েত অতি সুন্দর ভাবে ব্রহ্মানন্দের জীবন অঙ্কিত করেন এবং উকীল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শ্যাম আচার্য্যজীবনের ভগবৎপ্রেরণার কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

আমাদের প্রিয়তম আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে, গত ৮ই জানুয়ারী, কটকে ও পুরীতে বিশেষ উপাসনা ও স্মৃতি-সভা হইয়াছিল।

দান—জলপাইগুড়ির উকীল শ্রীযুক্ত মতিলাল বড়ুয়ার পুত্র আশীষকুমার গত ১৬ই জানুয়ারী সাত মাসের ম্যাট্রিকের বৃত্তির টাকা পাইয়াছে। এই উপলক্ষে তাহার প্রতিপালক শ্রীরামচন্দ্র ছুবে মাঘোৎসবের জন্য ২৲ টাকা এবং ব্রহ্মানন্দাশ্রমের জন্য ১৲ দান করিয়াছে।

পারলৌকিক—গত ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯শে মাঘ, কলুটোলায়, আচার্য্যদেবের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী নিকুঞ্জমোহিনী দেবী জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী, তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী চারুবালা হালদার ৯১।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে স্বীয় ভবনে মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে কন্যা শ্রীমতী চারুবালা হালদার ৫৲ টাকা এবং দৌহিত্রী শ্রীমতী সুষমাবালা বাক্‌চি ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে অনন্ত শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত কন্যা ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ১৮ই জানুয়ারী, নবদেবালয়ে, স্বর্গীয় গৃহস্থ সাধক যদুনাথ ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষের স্ত্রীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। হৃদয়নাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শোককারীর প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ভাই চন্দ্রমোহন দাস ও ডাঃ বি, সি, ঘোষের সহযোগিতায় উপাসনা করেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে ও শোকার্ত্ত পরিবারকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই ডিসেম্বর, আচার্য্য-মাতা মা সারদা দেবীর স্বর্গদিন স্মরণে এবং গত ২০শে ডিসেম্বর স্বর্গীয় মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের জন্ম ও স্বর্গদিন স্মরণে কোচবিহারের কল্যাণার্থ শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৩০শে ডিসেম্বর, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর যোগীন্দ্রলাল খাস্তগীরের প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার স্কট্‌লেনস্থ ভবনে, ডাক্তার জগন্মোহন দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কলুটোলায় "কৃষ্ণভবনেও" ৩১শে ডিসেম্বর ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

গত ১লা জানুয়ারী, হাওড়া দক্ষিণ বাঁটরায়, ৫৩নং কালী-প্রসাদ ব্যানার্জি লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় হরকালী দাসের সাম্বৎসরিক দিনে, রাঁচির শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার উপাসনা করেন।

গত ৪ঠা জানুয়ারী, হাওড়ায়, সমাধি-পার্শ্বে, স্বর্গীয় জহরলাল দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

গত ৫ই জানুয়ারী, ১০নং নারকেল বাগান লেনে, স্বর্গগত ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন।

গত ৬ই জানুয়ারী, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে, নববিধানের প্রত্যাদেশ-লেখক ও নববিধানের ভৃত্য স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই চন্দ্রমোহন দাস, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ সমযোগে উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। রাত্রে এই উপলক্ষে ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচার-কার্য্যালয়ে ভৃত্যসেবার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বিগত ৯ই জানুয়ারী, প্রাতে ৮৷৷০টায়, ভাগলপুরে, স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে, তাঁহার পঞ্চম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু গভীর ভাবের সহিত উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত এস, সি, মুখার্জ্জি, জামাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত মথুরা নন্দী ব্যক্তিগত ভাবে পরলোকস্থ আত্মার কল্যাণ ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী দীনতারিণী মুখার্জ্জি সময়োচিত কাতর প্রার্থনা করেন। প্রাচীন হিন্দু বন্ধু শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সাংসারিক ও ধর্ম্ম-জীবনের কয়েকটী কথা বলিয়া দুঃখিত অন্তরে প্রার্থনা করেন। স্থানীয় অনেকগুলি বন্ধু ও মহিলা উক্ত উপাসনায় শ্রদ্ধা সহ যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১৫ই জানুয়ারী, ১লা মাঘ, শিলচরে, তত্রত্য সিভিল-সার্জ্জন লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেনের গৃহে, তাঁহার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা অনাথ আশ্রমে ৫৲ টাকা দান করা হয়।

গত ১৮ই জানুয়ারী, ১৫ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর শ্বশ্রুমাতার সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ এবং ৩১শে জানুয়ারী, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী শেষ দিনে বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, শ্রদ্ধাস্পদ সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন দাস বিশেষ উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীমতী হেমলতা চন্দ বিশেষ প্রার্থনা করেন, জ্যেষ্ঠা কন্যা "পথের সম্বল" হইতে কিছু পাঠ করেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনার শেষাংশে ভাই ত্রৈলোক্যনাথকে ব্রতদান উপলক্ষে আচার্য্যদেব যে প্রার্থনা করেন, তাহা অবলম্বনে শান্তিবাচন করেন। উপাসনান্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে মঙ্গলবাড়ীতে স্বর্গস্থ ভাইর সমাধি-প্রকোষ্ঠে গিয়া, ভাই প্রিয়নাথ আচার্য্যদেবের মঙ্গলবাড়ী প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা আবৃত্তি করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করেন।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর দাসের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন ও ভাই প্রিয়নাথ সমযোগে উপাসনা করেন এবং উপাসনান্তে স্বর্গীয় ভাইর সমাধিস্থলে আসিয়া উভয়েই বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাইর সহধর্ম্মিণী ও পুত্রবধূ এবং পল্লীস্থ কেহ কেহ যোগদান ও সঙ্গীতাদি করেন।

১লা ফাল্গুন, ১এ, মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট, স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদি পাঠ করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲, ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ১৲ ও অনাথ আশ্রমে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

নিবেদন।

একটী কথা আমার মনে বড় জাগিতেছে। শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের পুস্তক সকলের মধ্যে যাহা যাহা এখন আর ছাপা নাই, তাহা ছাপিবার জন্য আমাদের সকলের একান্ত ভাবে ও সমস্ত হৃদয় মন দিয়া চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার কীর্ত্তি যেন লোপ না পায়। সকল শুভকর্ম্মে তাঁহার পুস্তকাবলী পুনঃ মুদ্রণের জন্য কিছু কিছু দান করা সকলেরই বিধেয়। তাহা হইলে অনায়াসে ও সহজ ভাবে এই কার্য্যটী সমাধা হইতে পারে। ব্রহ্মগীতোপনিষৎ ও শ্লোক-সংগ্রহ এই দুইখানি গ্রন্থ এখনই মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমি যথার্থ সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে ইহার জন্য খাটিতে প্রস্তুত আছি।

এই সঙ্গে ইহাও নিবেদন করিতেছি যে, আমি যে সামান্য এক সহস্র টাকা এই কাজের জন্য দিয়াছি, তাহা হইতে "Keshub and His Opponents" বইখানা মুদ্রিত হইয়াছে। "পরমহংস রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র" নামক আর একখানি বইও মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই দুইখানি বইর মুদ্রণ-ব্যয় ব্যতীত যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা অন্য বইয়ের মুদ্রণের জন্য ব্যয়িত হইতে পারিবে। এই দুইখানা বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থও পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কণের জন্য ব্যয়িত হইবে। আমার দেওয়া টাকার ও বিক্রয়-লব্ধ অর্থের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

জমা—		খরচ—	
আমার দেওয়া—	১০০০৲	"Keshub and His Opponents বইর মুদ্রণ ব্যয়—	৩৭০৲
পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ	৪১৲	ডাকমাশুলাদি ক্ষুদ্র ব্যয়—	১১৲
মোট জমা—	১০৪১৲	"গীতাপ্রপূর্ত্তির" বঙ্গানুবাদের জন্য শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেনের হস্তে—	১০০৲
বাদ খরচ—	৪৮১৲		৪৮১৲
হস্তে স্থিত—	৫৬০৲		

"জ্ঞানকুটীর"
কাট্রা, এলাহাবাদ
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেরিত পত্র।

(বন্ধুগণের প্রতি)

(১) আমার ১৮ বছর বয়সে যখন ধর্ম্মজীবনের প্রথম আলোক-রশ্মি অনুভব করিলাম, তখনই ব্রহ্মানন্দের জীবন ও সাহিত্য আমার জীবনকে অত্যন্ত গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করে।

(২) প্রায় ৮ বছর পরে আমি এই অনুভব করিলাম যে, কেশবের মন্দিরই ব্রাহ্মসমাজে আমার বাড়ী ও আমার গৃহে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু তেমন যেন সাহসে কুলাল না।

(৩) ১৯২৮ সালে আমার কেশব-মন্দিরে যোগ দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিলাম ও যোগ দেওয়ার সমস্ত আয়োজন করেও আবার সন্দেহ হওয়ায় থেমে গেলাম।

(৪) এবার আবার সেই আহ্বান—এবার কিন্তু বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, দুঃখ দৈন্য, অপমান নির্য্যাতনের সঙ্গে ঐ বাণী। স্বয়ং ব্রহ্ম বজ্ররূপে অবতীর্ণ ও বন্ধুগণের হস্তে দৈন্য, অপমান, নির্য্যাতন। অহঙ্কার চূর্ণ, জীবন ধূলিসাৎ। কেশব-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করি। সকলের মঙ্গল হোক, আমার সব অপরাধ দোষ সকলে ক্ষমা করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯শে মাঘ, ১৩৩৭।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৫ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩৭ সাল, ১৮৫২ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 28th February, 1931. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুর প্রকোপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আত্মজন, প্রিয়জন, যাঁহাদের সঙ্গ সহবাসে কতই আমোদ আহ্লাদ করিতেছি, যে প্রিয় আত্মার মধুর আলিঙ্গন, চুম্বন, স্নেহ-সম্ভাষণ সম্ভোগে বা নানা প্রকার ধর্ম্ম-সাধনে সহায়তা-লাভে কতই কৃতার্থ হইতেছি, হায়! পরক্ষণে তাঁহার দিব্য দেহ ভস্ম করিয়া, তাঁহার বাহ্য সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া, কতই মন বিষাদিত ও শোকে আচ্ছন্ন হইতেছে। বল, কেমনে আমরা এই বিরহ-শোক হইতে মুক্ত হইব? কেমনেই বা ইহলোকে থাকিতে থাকিতে পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গ-সাধনে আবার ধন্য ও আশ্বস্ত হইতে পারি? সত্য বটে, তুমি আমাদের প্রিয়জনগণকে দেহ-পুরবাস হইতে মুক্ত করিয়া অমরপুরে লইয়া গিয়াছ। তাঁহাদিগের বাহ্য সহবাসে আমরা এখন বঞ্চিত, কিন্তু তাঁহাদিগের আত্মা ত অবিনশ্বর, তোমাতে চির জীবিত; তবে তাঁহাদিগের আত্মিক সঙ্গ সহবাস হইতে কেন আমরা বঞ্চিত হইব? তুমি যেমন আছ, তাঁহারাও তেমনি তোমাতে আছেন, ইহা বিশ্বাস-চক্ষে দর্শন করিয়া, যাহাতে তোমার সঙ্গে তাঁহাদিগকে লইয়া তোমারই মধ্যে একত্রে বাস করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারি, এমন সাধনায় আমাদিগকে নিরত থাকিতে দাও। ইহলোক পরলোক যে তোমাতেই একই লোক, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহলোকে থাকিতে থাকিতেই যেন পরলোকবাসীদিগের সঙ্গ সম্ভোগ করিতে পারি এবং তাঁহারা যেমন দৈহিক জীবন ত্যাগ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরাও যেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের অনুগামী সঙ্গী হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০—

পরলোকগত আত্মাদের সহিত মিলন কেমনে সম্ভব হয়?

"পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গে মিলন হয় কেমনে?" গভীর চিন্তা ও আন্তরিক প্রার্থনা-যোগে এবং ঈশ্বরালোকে ইহা আমাদিগের সিদ্ধান্ত করা উচিত। কল্পনা, জল্পনা বা আন্দাজে যদি আমরা এ সম্বন্ধে কিছু নির্দ্ধারণ করি, নিশ্চয়ই প্রবঞ্চিত হইব।

পরলোক ও পরলোকগত আত্মাদের বিষয়ে কতই যে কল্পিত মত বা সংস্কার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, তাহা বলা যায় না।

নববিধান কোন প্রকার কল্পিত সংস্কারের প্রশ্রয় দেন না। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-সঙ্গত যাহা নয়, তাহা নববিধানের মত নয়। কারণ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-সঙ্গত দর্শনই আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি।

নববিধানাচার্য্য বলেন, "Faith is direct vision, it beholdeth God and beholdeth Immortality."—বিশ্বাস প্রত্যক্ষ দর্শন, ইহা ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং পরলোককে প্রত্যক্ষ করে।

বাস্তবিক এই বিশ্বাস-চক্ষে যখনই ঈশ্বরকে দর্শন করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরলোকও দৃষ্ট হয়, কারণ পরলোক ত ঈশ্বরেই অবস্থিত। সুতরাং ঈশ্বর-দর্শন ও পরলোক-সাধন একই, অতএব ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে যাহা ইতিপূর্ব্বে নিবেদিত হইয়াছে, তাহা যদি হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, পরলোকতত্ত্ব বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

এক্ষণে যে লোকে আমরা বাস করিতেছি, ইহাকেই আমরা ইহলোক বলি এবং এই দেহ অন্তে যে লোকে আমরা যাইব বা আমাদের আত্মজনগণ পূর্ব্বে গিয়াছেন বা এখন অবস্থান করিতেছেন, তাহাকেই পরলোক নামে অভিহিত করা হয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসী মাত্রেই বিশ্বাস করিবেন, ইহলোক পরলোক নহে পৃথক, উভয়ই একই অনন্ত ঈশ্বরে অবস্থিত।

এই মানবাত্মা অবিনশ্বর। যতদিন এই আত্মা দেহে অবস্থিত, ততদিন ইহা ইহলোকে; যখনই আত্মা দেহমুক্ত হয়, তখনই ইহা পরলোকস্থ হয়। সুতরাং একই জীবনের একাংশ ইহলোক, অপরাংশ পরলোক। মৃত্যু মাত্র ব্যবধান হইয়া এককে দ্বিধা করে।

এ সম্বন্ধে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলেন, "যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সেই জীবনের জীবন ঈশ্বরের ক্রোড়ে বাঁচিয়া আছেন। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাদের অন্তরে এই জ্ঞান দিয়াছেন যে, ইহলোকে আমি যাঁর কাছে বাঁচিয়া আছি, পরলোকে আমার সমুদয় বন্ধুরাও তাঁহারই কাছে বাঁচিয়া আছেন। সকলেই এক ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহ পরলোক দুইই আমার কাছে।"

বাস্তবিক যেমন অসীম সাগরের কতকাংশ চক্ষুর্গোচর হয়, কতক হয় না, তেমনি এই জীবন-সাগরের যে অংশ চক্ষুর্গোচর হয়, তাহাই ইহলোক, এবং যাহা চক্ষুর অগোচর, তাহাই পরলোক। তাই ব্রহ্মানন্দ বলেন, "ইহলোক পরলোক এ ঘর ও ঘর।"

ঈশ্বর আমাদিগকে এই দেহপুরে জন্ম দিয়া, এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্যই রাখিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং নানা প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া শিক্ষা সাধন করিয়া তাঁহারই উপযুক্ত হইব, তিনি যেমন পূর্ণ, তেমনি পূর্ণতা লাভ করিব, ইহাই আমাদের জীবনের নিয়তি। বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনা ও পরীক্ষা দ্বারা আমরা এ জীবনে গঠিত হইব, এই জন্যই এখানে আনিয়াছেন। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, মান অপমান, জরা মৃত্যু, সৎসঙ্গ ও অসতের ভয় বিভীষিকার ভিতর দিয়া বিধাতা আমাদের জীবন-গঠনের বিধান করিয়াছেন, এবং ইহজীবনের শিক্ষার অন্ত হইলে মৃত্যুর দ্বারা এ দেহকে মুক্ত করিয়া, আত্মাকে পরলোকে তাঁহারই ক্রোড়ে রাখিয়া অনন্ত জীবনের পথে লইয়া যাইবেন। স্বর্ণকার যেমন গহনা গড়িতে কখনও তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করে, কখনও হাতুড়ির ঘা মারিয়া সরল করে, কখনও জলে ডুবায়, ঘসিয়া মাজিয়া তাহার মনের মত গড়ে, তেমনি বিধাতাও এ জীবনকে বিভিন্ন গঠন পিটনের ভিতর দিয়া তাঁহার মনের মত করিতেছেন।

সুতরাং আমাদের জীবনদাতা ঈশ্বরকে আমাদের প্রত্যক্ষ পিতামাতা, গুরু জ্ঞানদাতা ও জীবন-পথের সারথি জানিয়া, তাঁহার ইচ্ছাধীন হওয়াই আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনিয়া জানিয়া তাহার সহিত যোগ-সমাধান করিতে হয়। তাহার সহিত যোগ-সমাধানেই ইহপরস্থ সবার সহিত যোগ-সমাধান বা মিলন হয়।

বিশ্বাস-চক্ষে যখনই দেখি, ঈশ্বর আমার প্রাণের প্রাণ, তখনই দেখি, তিনি সবারই প্রাণের প্রাণ এবং সকলেই আমরা তাঁহাতে একপ্রাণ।

ঈশ্বরেতে যে [illegible] আছে, এই দর্শন, এই উপলব্ধিই আমার জীবন; [illegible] দর্শন বা জ্ঞানের অভাব বা মোহই আমার মৃত্যু। [illegible] মৃত্যু আর অন্য কিছু নয়। এই মোহ যতদিন আছে, ততদিন জীবিত হইয়াও আমি মৃত। সেই জীবনের জীবন যিনি, পাপ অবিশ্বাস বশতঃ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্রতাই আমার আসল মৃত্যু। দেহের মৃত্যু কেবল মৃত্যুর ছায়া মাত্র।

ইহলোকবাসী ও পরলোকবাসী উভয়েই একই ঈশ্বরেতে অবস্থিত হইলেও পার্থক্য এই যে, দেহধারী ইহলোকস্থ আমরা পাপ মোহ মৃত্যুর অধীন, আর যাঁহারা অদেহী পরলোকস্থ, তাঁহারা আত্মস্থ এবং অমর। তবে এই দেহী ও অদেহীর, ইহলোকস্থ পাপী মানব এবং পরলোকস্থ অমরাত্মাদের মিলনের সম্ভাবনা কোথায়?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরেই পরলোকবাসিগণ অবস্থিত, সুতরাং যখন জীবন্ত চিন্ময় ঈশ্বরকে আত্মিক বিশ্বাস-চক্ষে দর্শন করি, তখনই তাঁহার অভ্যন্তরস্থ যে পরলোক, তাহাও স্বভাবতই দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্ফটিক-স্তম্ভ যখন দেখি, তখনই যেমন তাহার অভ্যন্তরস্থ "যাহা কিছু আছে" দেখা যায়, তেমনি "ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম, অপূর্ব্ব শোভন, ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়" কেন না বলিতে পারিব?

অতএব যাই বিশ্বাস-চক্ষে দেখি, আমার সম্মুখে "জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান", অমনি আমার পরলোকগত অমরাত্মা প্রিয়জনগণও যে চির জীবিত হইয়া তাঁহাতেই রহিয়াছেন, কেননা প্রত্যক্ষ করিব? তবে আমরা কায়াস্থ, আর তাঁহারা আত্মস্থ; এই কায়ার মায়া ছাড়িয়া আমরাও আত্মস্থ হইতে পারিলেই, তাঁহাদিগের সহিত প্রকৃত মিলন সম্ভাবিত হয়।

তাই বলি, ব্রহ্মের সহিত যোগ সমাধান করিতে আমরা যে যে সাধন অবলম্বন করি, তাহা করিলেই পরলোকস্থ আত্মাদের সহিতও যোগ-সমাধান বা মিলন সহজে সাধিত হয়।

তাঁহারাত দেহত্যাগ করিয়াই অমর হইয়াছেন, অর্থাৎ মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা পার হইয়া অমর হইয়াছেন, অথবা মৃত্যু দ্বারা দেহমুক্ত হইয়া অমরলোকে গিয়াছেন। এখন আমরা জড় দেহে নিবদ্ধ, মায়ার মোহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, পাপ মৃত্যুর অধীন, তবে কেমনে তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইব? বিলাতস্থ আমাদের কোন আত্মীয়ের সঙ্গে যদি দেখা শুনা করিতে চাই, সে দেশে না গেলে কেমনে তাহা সম্ভব? তেমনি ব্রহ্মপুরে যাইতে পারিলেই আমরা সে অমরধামবাসীদিগের সহিত মিলিতে পারি।

ঐ অমরাত্মাগণ মৃত্যুর ছায়ার ভিতর দিয়াই সে ধামে গমন করিয়াছেন। সে মৃত্যু সত্যই একটা ছায়া বা প্রহেলিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই জীবনের মৃত্যু নাই, কেন না জীবনের জীবন যিনি, তাঁহার ত মৃত্যু নাই; তাঁহাতে যাঁহারা জীবিত, তাঁহাদের উপর মৃত্যুর অধিকার কোথায়? ইহলোকস্থ আমরা যেমন, পরলোকস্থ আত্মারাও তেমনই জীবিত। তবে মৃত্যু কেবল জড় দেহের বিনাশ মাত্র।

গীতা বলেন, "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥" এই দেহে থাকিতে দেহী ব্যক্তি যেমন কৌমার, যৌবন এবং জরা প্রাপ্ত হয়, তেমনি দেহের অন্তে কেবল দেহের রূপান্তর মাত্র হয়, এজন্য ধীর ব্যক্তি মুহ্যমান হন না। বাস্তবিক এই দেহ যেমন বাল্য হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে পরিণত হইলেও, সে আমি সেই আমিই থাকি, তেমনি এই দেহের জীবনীশক্তি শেষ হইলে দেহমাত্র নষ্ট হয়, কিন্তু দেহস্থ আত্মা চিদাত্মা হইয়া অমরলোকবাসী হয়।

বৃক্ষের পত্র অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে কোমল আকার ধারণ করে, ক্রমে পরিপক্ক হয়, তাহার পর রসশূন্য শুষ্ক হইলে পতিত হয়, কিন্তু তাহাতে বৃক্ষের জীবন নষ্ট হয় না। এই দেহের মৃত্যুও কতকটা সেই রকম; তাই মৃত্যুকে যে আমরা এত ভয়ঙ্কর মনে করি বা ভয় করি, তাহা আমাদের অজ্ঞানতা বা মোহ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিধাতা বরং আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্যই এই মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন।

কেন না, এই মৃত্যুই যে যথার্থ অমৃতের সোপান। এই দেহের মৃত্যুতে আমাদের দৈহিক পাপ-জীবনের মৃত্যু সংসিদ্ধ হয়, জীবনে নূতন পাপোদ্গমের সম্ভাবনা বন্ধ হইয়া যায়। দেহ থাকিলেই পাপ তাহাতে লাগিয়া থাকে, যেমন শরীর থাকিলেই শারীরিক ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই আমরা বিশ্বাস করি, এই আত্মা একবার দেহ-মুক্ত হইলে, আমাদের অনন্ত প্রেমময় জীবনদাতা বারবার তাহাকে দেহে আবদ্ধ করিয়া, আর দৈহিক পাপের পর পাপের ভাগী করিয়া অনন্ত নরকগামী করেন না। বরং এই দেহে বারবারই নব নব জন্ম জন্মান্তর সম্ভোগ করাইয়া, অনন্ত অমর জীবনে সমুন্নত করেন। ইহজীবনে জন্ম জন্মান্তর বা দেহ হইতে দেহে নিবদ্ধ করিয়া পাপের পর পাপে ডুবাইয়া নরকগামী করেন না।

তাই দেহমুক্ত হইলেই শরীরের সঙ্গে শরীরের রোগ

তাপ, জরা দুঃখ যেমন শেষ হয়, তেমনি পাপ-প্রবণতারও ধ্বংস হয়। ম্যালেরিয়ার দেশেই ম্যালেরিয়া হয়, উর্দ্ধলোকে ত তাহা হয় না; তেমনি দৈহিক জীবনেই পাপরূপ রোগের আক্রমণ ভোগ করিতে হয়, দেহান্তে আত্মা আত্মলোকের মুক্ত বায়ু সম্ভোগ করিয়া, ক্রমে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া আত্মিক জীবনে অগ্রগামী হয়। মৃত্যু হইলেই আত্মা পাপশূন্য হয় তাহা নহে, কিন্তু নূতন পাপের পথ স্থগিত হয় এবং পূর্ব্বকৃত পাপ ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মসহবাসে ক্ষয় হয়।

সুতরাং শরীরের মৃত্যু শরীরের পাপ-প্রবণতা ধ্বংস করে বলিয়াই ইহাকে অমৃতের সোপান বলা হইয়াছে। এই সোপানে উঠিলে আত্মা অমৃতত্ব লাভ করে।

পরলোকগত আত্মার সমাগম সাধন।

আমরা দেহে থাকিতে থাকিতেই যদি মনের প্রবৃত্তির মৃত্যু সংসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ইহজীবনেই আমরা অমরত্ব বা দ্বিজত্ব লাভ করি। যাঁহারা দেহে থাকিতে থাকিতেই দ্বিজত্ব বা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া অমর হইয়াছেন, তাঁহারা এই দৈহিক প্রবৃত্তির মৃত্যু-সংসাধন দ্বারাই তাহা হইয়াছেন।

শিব দেহের শবত্ব-সাধনেই মহাযোগী মহাদেব হইয়াছেন। সক্রেটিস সম্পূর্ণ আমিত্ব-বিনাশেই আত্মজ্ঞান-লাভে ধন্য হইয়াছেন। শ্রীবুদ্ধ মহানির্ব্বাণ-সাধনেই প্রজ্ঞালাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গও আত্মনিগ্রহ ও মহাবৈরাগ্য অবলম্বনেই বিশুদ্ধ প্রেমোন্মত্ততা লাভ করিয়াছেন। শ্রীঈশাও ক্রশারোহণে আত্মদান করিয়াই উজ্জীবন বা Resurrection লাভ করিয়াছেন। আর শ্রীব্রহ্মানন্দও "আমি নাই আমি নাই" বলিয়া, আমি-পাখীকে দেহপিঞ্জর হইতে চিরতরে উড়াইয়া দিয়া, মৃত্যুকে জয় করিলেন ও হাসিতে হাসিতে মার কোলে উঠিয়া ব্রহ্মানন্দত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পাপই যথার্থ আমাদের মৃত্যু। বসন্তের বিষ নষ্ট করিতে যেমন বসন্তেরই টিকা দিতে হয়, তেমনি আমাদের পাপ আমিত্ব বিনাশের উপায় আত্মিক ভাবে মনঃপ্রবৃত্তির মৃত্যু-সাধন।

আমাদের উপাসনা আর কি? আমাদের বাহিরের চক্ষু বন্ধ করিয়া, মনের চিন্তা নিরোধ করিয়া, দৈহিক প্রবৃত্তি-নিচয় সংযত বা মৃত করিয়া, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের নিকটস্থ হওয়াই উপাসনা। এই উপাসনা যথার্থ দেহে থাকিয়াও অদেহিরূপে আত্মস্থ হইতে চেষ্টা করা বা সাধন করা। চিন্ময়যোগে দেহমুক্ত হইয়া ব্রহ্মসহবাসে ব্রহ্মলোকে উত্থানই যথার্থ উপাসনা।

যাঁহারা দেহপুরবাস ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মাময় হইয়াছেন, তাঁহারাত দেহমুক্ত হইয়াই ঈশ্বরস্থ বা পরলোকস্থ হইয়াছেন, বা যেমন সাধারণ কথায় বলে, তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা গঙ্গালাভ হইয়াছে। অতএব তাঁহাদিগের সহিত মিলিতে হইলে, আমাদিগকেও দেহ থাকিতেই দেহমুক্ত হইতে হইবে।

এক ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করিলেই পরলোকস্থ আত্মাদের সহিত মিলন হয়। তিনিই আমাদিগকে প্রিয় আত্মাদের সহিত মিলিত করিয়া দেন। ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তিতাতেই আমরা পরলোকগত আত্মাদের সহিত মিলিতে পারি। পূর্ব্বে প্রাচীন বিধিবাদিগণ ভক্তদিগকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে চাহিতেন, এখন ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তিতাতেই আমরা পরলোকগত আত্মাদের নিকট যাই। যখন দার্জ্জিলিং যাইবার বরাবর লাইন খোলা হয় নাই, তখন একটা মধ্য ষ্টেসনে গাড়ী বদলাইতে হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। তেমনি নববিধান ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ-সমাধানের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাই এই বিধানে ইহপরস্থ সবার সহিত যোগই এক ব্রহ্মের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে। এখানেও আমরা পরস্পরের সহিত নিগূঢ় মিলনে মিলিতে চাহিলে, এক ব্রহ্মযোগেই এই ক্ষণিক দৈহিক সম্বন্ধের অতীত মনের মিলনে, প্রাণের মিলনে, প্রেমের মিলনে, চিরমিলনে মিলিতে পারি।

তাই এক ব্রহ্মোপাসনা-যোগেই ভক্ত ও প্রিয় আত্মাদের সহিত যোগ সংসাধিত হয়। স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে যেমন অপর দিকে যাহা কিছু আছে স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি চিন্ময় ঈশ্বরের ভিতর দিয়াই পরলোকস্থ সকলকে স্পষ্ট দেখা যায়। তবে তাঁহাদের সহিত যথার্থ অবাধ মিলনে মিলিতে হইলে, আমিত্বে মৃত হইতে হয়। শোক তাপের বন্ধ এই জন্য বিশেষ সহায়। তাহা আমাদিগকে আমিত্ব-বিহীন ধূলিসদৃশ করিয়া থাকে।

কবীর বলেন, "কবীর যা দিন হউ মুয়া পাছে ভইয়া আনন্দ। মোহি মিলিউ প্রভু আপনা সঙ্গী ভজহি গোবিন্দ॥" "যেদিন আমার আমিত্বের মৃত্যু হইল, সেইদিন মৃত্যুর পর আনন্দ হইল। প্রভু আমার সহিত মিলিত হইলেন এবং আমার সঙ্গীরাও স্বর্গদাতা ঈশ্বরের ভজনা করিতে লাগিল।" সত্যই আমিত্বের মৃত্যু হইলে ঈশ্বর এবং সকল মানবাত্মার সহিত মিলন হয়।

তাহার পর যে আত্মার সহিত যতটা আত্মিক প্রেমযোগ ঘনিষ্ঠ হয়, সেই আত্মার সহিত তত পরিমাণে নৈকট্য অনুভূত হইয়া থাকে। স্মৃতির সাহায্যে দিয়া আত্মাদিগের গুণাবলী আমাদের প্রাণে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাদের সহিত আমাদের আত্মার যোগ ঘনীভূত ভাবে সমাধান করে। তাঁহাদের কায়া নাই, সুতরাং কায়িক সম্বন্ধ এখন আর কিছু নাই। ব্রহ্মস্বরূপের প্রভাব যেমন আত্মাকে বিশুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের সহিত যোগ সমাহিত করিয়া

দেয়, তেমনি ব্রহ্ম-স্বরূপের ভিতর দিয়া পরলোকস্থ সাধু ভক্ত এবং প্রিয়জনদিগের আত্মার সহিত বিশুদ্ধ আত্মার মিলন সমাধান হয়। আত্মায় আত্মায় একভাব হইলেই প্রকৃত মিলন হয়, ইহারই নাম একাত্মতা বা একপ্রাণতা-সাধন।

আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রগণের জড় ভাগ যেমন চক্ষে দেখা যায় না, কেবল তাহাদের জ্যোতিষ্ক ভাগই দৃষ্ট হয়, তেমনি পরলোকস্থ আত্মাদের জড় ভাগ তাঁহাদের দেহের সহিত যখন ভস্ম হইয়াছে, তখন তাঁহাদের আত্মিক জীবনই আমাদিগের দর্শনীয়। ব্রহ্ম-সূর্য্যের স্বরূপ-জ্যোতিতে তাঁহারা যে কেমন জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছেন, তাহাই আমরা দেখিব। নিরাকার ঈশ্বরে তাঁহাদের জড় দেহ নিরাকার চিন্ময় হইয়া গিয়াছে, তবে, এখন জড়দেহ দেখিতে চাহিলে পাইব কেন? শিশু যখন বৃদ্ধ হয়, তাহাকে শিশুরূপে দেখিতে চাহিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? মানবাত্মা যখন চিদ্বেশ ধরে, তখন সেইরূপেই দেখিতে হইবে। এইজন্য প্রেতাত্মবাদী বা দেহান্তরবাদিগণ পরলোকগত আত্মাদের সম্বন্ধে যে সমুদয় কল্পনা জল্পনা করেন, তাহা কখনই আধ্যাত্মিক সত্য নহে।

শ্রাদ্ধ ও তর্পণ অনুষ্ঠান কেবল অমরাত্মাদের সম্বন্ধেই সাধনীয়। পিতৃগণ আত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন, এই বিশ্বাসেই আমরা তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করি, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ জাগ্রৎ করি ও আত্মিক মিলন সংসাধন করি। তাঁহারা এখন যে প্রেমান্ন, পুণ্য বসন ও যোগানন্দ-সম্ভোগে নিরত, ব্রহ্মকৃপায় যাহাতে তাঁহাদের আত্মা তাহা লাভ করেন, তাহাই যদি আমরা প্রার্থনা করি, তাহাতেই তাঁহারা তৃপ্ত হন এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ জীবন-যাপনে আমরা আকাঙ্ক্ষিত হইলেই যথার্থ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করা হয়। তাঁহাদের সহিত একভাবাপন্ন হইলেই তাঁহাদের সহিত একত্ব বা মিলন হয়।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ তাই বলেন, "মত, বিশ্বাস ও ভক্তি যাঁহাদের পরস্পরের সহিত মিলে, তাঁহারা ক্রমে অভিন্ন-হৃদয় ও অভিন্ন-প্রাণ হইয়া যান। এরূপ অবস্থাপন্ন লোকেরাই এক স্থানে বাস করেন। এইটী মূল বিশ্বাস করিয়া আমাদের মধ্যে যদি যোগ নিবদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আশা হয় যে, পরলোকে একত্র থাকিতে পারিব।"

বাস্তবিক এই আত্মিক যোগই পরলোকগত অমরাত্মাগণের সহিত আমাদিগের মিলন। ইহ জীবনে থাকিতে থাকিতেই যেন এই মিলন সংসাধন করিয়া আমরা সকল শোক, তাপ ও বিচ্ছেদ হইতে মুক্ত হইতে পারি।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে তাই প্রার্থনা করি :—

"প্রিয় পরমেশ্বর, পৃথিবীর অনিত্য সুখ এবং সম্মান হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্যের দিকে লইয়া চল। আশা-বচনে এই প্রবোধ দাও যে, যে সকল ব্যক্তি এই জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তোমারই আলয়ে একত্রিত হইয়াছেন, এবং যখন সময় আসিবে, তখন আমরাও সেই সুখ-নিকেতনে অমরাত্মাগণের সহিত গিয়া পুনর্ম্মিলিত হইব। আমাদের জীবনকে পবিত্র করিয়া দাও এবং গৌরবের রাজ্য সেই নিত্যধামে চিরকাল বাস করিবার জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত কর।"

"হে নিত্যদেব, তোমার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, যাহা আধ্যাত্মিক এবং নিত্য, সেই সকল বিষয়ে আমাদের হৃদয়কে বদ্ধ করিয়া রাখ। পরলোক সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসকে ঘনীভূত কর এবং অনন্ত জীবনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লও। পরলোকগত আত্মাদের সহিত যদিও আমরা বাহ্য ভাবে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আমরা যেন আধ্যাত্মিক যোগে চিরকাল তাঁহাদের সহিত অবস্থিতি করিতে পারি। তোমার অপার করুণাগুণে এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হউক এবং আমরা এখানে থাকিতে থাকিতেই যেন তাহার পূর্ব্বাস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তোমার সুখী অমরাত্মা সাধু পরিবার সঙ্গে তোমারই মধ্যে বাস করিতে পারি।"

প্রসঙ্গ।

ঈশ্বর-দর্শন।

যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহা ভরিয়া ঘিরিয়া ঈশ্বর বর্ত্তমান; সুতরাং আমার চারিদিক ঘিরিয়া বায়ু-মণ্ডল যেমন আছে দেখিতেছি, উপলব্ধি করিতেছি, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-দর্শনও করিতেছি। তাহা যদি না হয়, তাহাতে যদি অণুমাত্র সংশয় মনে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর-দর্শন হইল না। চেষ্টা করিয়া, চিন্তা করিয়া যে ঈশ্বর-দর্শন, তাহাতে কল্পনা আসিবার আশঙ্কা। আমার পুরুষকার ও চেষ্টা-সম্ভূত ব্রহ্ম-নিরূপণও মূর্ত্তি-পূজা বিশেষ। আমার নিশ্বাস যেমন সহজে আপনাপনি পড়িতেছে, তাহা চেষ্টা-সাপেক্ষ নয়, তেমনি ঈশ্বর-দর্শনও চেষ্টা-সাপেক্ষ নয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস অপেক্ষাও সহজ-সাধ্য ঈশ্বর-দর্শন। ঈশ্বর এই আছেন, এই বিশ্বাসই ঈশ্বর-দর্শন।

প্রকৃত সত্যগ্রহ।

সত্য যাহা, ঈশ্বর তাহা। নববিধান মতে ঈশ্বর দ্বারা গ্রস্ত বা অধিকৃত হওয়াই যথার্থ সত্যগ্রহ। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের প্রাণ মন জীবনকে অধিকার করিয়া, তাঁহার পরিচালনায় যখন তাঁহার কার্য্য সংসাধন করান, বা তাঁহার ইচ্ছা পালন করান, তখনই আমরা যথার্থ সত্যগ্রাহী বা সত্যগ্রস্ত হই। ভূত-গ্রস্ত হইলে যেমন অবস্থা হয়, আমার হাতে আমি থাকি না, ঠিক তেমনি অবস্থা সত্যগ্রস্ত হওয়া বা ব্রহ্মগ্রস্ত হওয়া। সেই

ভাবে যদি সকল অবস্থায়, সকল কার্য্যে, সকল সময়ে ব্রহ্মগ্রস্ত হইতে পারি, তবেই আমরা সত্যাগ্রাহী। প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের দ্বারা প্রাপ্ত না হইলে তাঁহারা সত্যাগ্রাহী বলিয়া পরিচিত, সে সত্যাগ্রহ নববিধানের নয়।

নববিধানের স্বরাজ্য।

"স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চারিদিকেই কত আন্দোলন হইতেছে। স্বরাজ-লাভের আকাঙ্ক্ষা অবশ্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ যাহাকে স্বরাজ বলিতেছে, তাহা কি প্রকৃত স্বরাজ? স্বরাজের সাধারণ অর্থ স্বাধীনতার রাজ্য, কিন্তু জগতে কোন স্বাধীন রাজ্য কি যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে? কোন্ স্বাধীন রাজ্য পাপ দুর্নীতি, মানবীয় অত্যাচার, অনাচার, দ্বেষ, হিংসা, অসহযোগিতা, বিষয়-লালসার অধীনতা হইতে মুক্ত? কেবল বাহ্যতঃ রাজার অধীনতা হইতে মুক্ত হইলেই স্বরাজ হয় না। দাসত্বের পরিবর্ত্তে কত প্রকারের দাসত্বের অধীন যাহারা, তাহারা কেমনে স্বরাজ লাভ করিয়াছে বলিব? তাই নববিধান জগতে যথার্থ স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ, কেন না তাহা পার্থিব স্বরাজ নয়, তাহা স্বর্গের স্বরাজ, স্বর্গরাজ্য, ইহাতে একমাত্র রাজরাজেশ্বর মানবাত্মাকে সকল প্রকার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ স্বাধীনতা বিধান করিতে কৃতসংকল্প। অপ্রেম, অসহযোগিতা, দেশ-ভেদ, জাতি-ভেদ ইহাতে স্থান পায় না। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, রাজা প্রজা, ইংলণ্ড ভারত, পূর্ব্ব পশ্চিম কেহ কাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। সমস্ত দেশ এখানে একদেশ, সকল মানব এখানে এক পরিবার, সকলে এক অদ্বিতীয় রাজরাজেশ্বরের একচ্ছত্রাধীন। তাই সকলে এবং প্রত্যেকে পূর্ণ স্বাধীন।

পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের জীবনী।

(১৫ই ফেব্রুয়ারী, ব্রহ্মমন্দিরে পঠিত)

আজ এই দেবমন্দির ব্রহ্মমন্দিরে পিতাকে শ্রদ্ধা জানাইয়া কি নিবেদন করিব, তাহা ভাষায় জ্ঞাপন করা কঠিন। তিনি দীর্ঘ কাল নীরবে আমাদের পরিবারের সকলকে স্নেহের অঞ্চলে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আজ প্রতি মুহূর্ত্ত ও প্রত্যেক কাজে তাঁহার অভাব আমরা বোধ করিতেছি। তাঁহার বাল্য জীবনের কথা আমরা বেশ ভাল করিয়া জানি না, কেবল এই মাত্র জানি যে, প্রায় [illegible] বৎসর পূর্ব্বে তিনি মাণিকগঞ্জ মহকুমার মত্তগ্রামে তাঁহার পিতামহগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালে আমাদের পিতামহ স্বর্গগত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় ময়মনসিংহে রাজস্ব-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। সেই জন্য পিতৃদেবের প্রথম শিক্ষা ময়মনসিংহ জিলাস্কুলে হয়; সেইখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন ও সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের সময়েই আমাদিগের পিতামহ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং পিতার বাল্য জীবনেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল এবং সেই প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কলেজে শিক্ষা-লাভের জন্য কলিকাতায় আসিয়া, প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময়ে স্বর্গগত কান্তিচন্দ্র মিত্র, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, গিরিশচন্দ্র সেন ও কালীশঙ্কর দাস মহাশয় প্রভৃতিদের সহিত পরিচিত হন, এবং তাঁহাদিগের সহায়তায় আচার্য্যদেবের তিরোধানের পূর্ব্বে তাঁহার সহিতও সামান্য পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ফার্ষ্টআর্টস পরীক্ষা দিয়া ঢাকায় ফিরিয়া যান ও সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের নিকট রীতিমত নববিধানধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। পিতৃদেবের সহিত একই সময় স্বর্গগত মনোমোহন দে, মোহিতচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন, সত্যানন্দ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবক ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র কমলকুটীরে নবদেবালয়-গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াই পরলোকে চলিয়া যান ও তাহার কিছু পূর্ব্বেই ইংরাজীতে নবসংহিতা লেখা সমাপ্ত করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর প্রেরিত প্রচারকবর্গ ইংরাজী নবসংহিতার বাংলা অনুবাদ করেন। ঐ সময় নবদেবালয়-গৃহের নির্ম্মাণ-কার্য্যও সমাপ্ত হয়। ইহার পরই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথমে আমাদিগের পিতৃদেব ও স্বর্গগত মনোমোহন দে প্রভৃতি অপর পাঁচজন একই দিনে উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রথম নবসংহিতানুসারে দীক্ষালাভ করেন।

দীক্ষালাভের কিছুদিন পরেই পিতার বিবাহিত জীবন আরম্ভ হয়। ঐ সময় হইতেই তিনি স্বর্গগত মাতামহ জয়কৃষ্ণ সেন, মাতুল মোহিতচন্দ্র সেন, মাতৃদেবীর পিসেমহাশয় স্বর্গগত প্যারীমোহন রায়, স্বর্গগত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, প্রমথলাল সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়লাভের যথেষ্ট সুযোগ পান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পর যখন স্বর্গগত বিনয়েন্দ্রনাথ, মোহিতচন্দ্র ও প্রমথলাল যুবকদিগের প্রার্থনা-সমাজ স্থাপনা করেন, তখন পিতৃদেব, স্বর্গগত প্রচারক কালীনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস প্রভৃতি তৎকালীন যুবকবৃন্দ ক্রমে ক্রমে তাহাতে যোগদান করেন এবং সকলে একত্র মিলিত হইয়া নববিধান-মণ্ডলীর উন্নতির জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থাদির বিষয় বিশদভাবে আলোচনা

করিতেন। কথনও কথনও যুবকদিগের প্রার্থনা-সমাজের দলের সহিত চট্টগ্রাম, অমরাগড়ী, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি কোনও কোনও জায়গায় উৎসবাদি উপলক্ষে যাইতেন। কিন্তু কলিকাতার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা সত্বেও বেশী যাইতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার সরকারী কর্ম্মস্থল কলিকাতায় ছিল। তিনি ত্রিশ বৎসরের অধিককাল খুব সুখ্যাতির সহিত "বোর্ড অফ রেভেনিউ" অফিসে কর্ম্ম করিয়া, ১৯২২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে অবসর গ্রহণ করেন।

পিতৃদেব খুব স্পষ্টভাষী ছিলেন এবং এরূপ তেজী ছিলেন যে, তাঁহার সহিত মতের মিল না হইলে তিনি আপনার আত্মীয়দিগকে ত্যাগ করিয়া আসিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কি কারণে জানি না, প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে ভগিনী ইন্দিরার জন্মের কিছুদিন পরেই, পিতামহের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, ঢাকার সকল আত্মীয়দিগের সঙ্গ ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। আর্থিক কষ্ট বা ভবিষ্যতের ভাবনা কিছুই তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করাইতে পারে নাই। এই সময়ে অনেক বৎসর তাঁহাকে কষ্টের সহিত সংসার চালাইতে হইয়াছে। তিনি যখন সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন, তখন কিছুদিনের জন্য পটুয়াটোলা প্রচারাশ্রমে স্বর্গগত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বাস করেন। প্রচারাশ্রমে বাসকালে স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়দিগের সহিত যোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়। যুবকদিগের প্রার্থনা-সমাজের সহিত তাঁহার যোগ কোনও দিন বিচ্ছিন্ন হয় নাই এবং সেই কারণে স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। মণ্ডলীর সকল প্রচারকই পিতৃদেবকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি পূর্ব্বে উপাসক-মণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, কিন্তু প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে যখন মণ্ডলীর ভিতর প্রচারক ও সাধারণ সভ্যদিগের মতবাদ আরম্ভ হয়, তখন তিনি স্পষ্টভাষায় সকল পক্ষকে তাঁহার মনোগত ভাব জ্ঞাপন করিয়া, উপাসক-মণ্ডলীর সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন ও তৎপরবর্ত্তী কালে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতেন।

গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মাতুল মোহিতচন্দ্র সেন পরলোক গমন করেন। সে আঘাত পিতৃদেবের মনে খুবই লাগিয়াছিল। তাহার পর দেখিতাম, আমাদিগের ১১নং নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ারের বাটীতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তৎকালীন যুবকবন্ধুদিগের সমাবেশ হইত। পিতৃদেবের মণ্ডলীর ভিতর দলাদলিতে কোনওরূপ যোগ না থাকাতে, সকল দলের বন্ধুদিগের সমাবেশে আমাদিগের গৃহখানি সর্ব্বদাই আনন্দে পূর্ণ থাকিত। তিনি কোনওরূপ দলাদলিতে যোগ দিতেন না বলিয়াই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শশিভূষণ দত্ত, বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রভৃতি সকলে তাঁহার বন্ধু ছিলেন ও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

সাংসারিক কার্য্যে পিতৃদেব কখনও একটুকুও অবহেলা করেন নাই। "গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন" এই ব্রত তিনি সম্পূর্ণভাবে উদযাপন করিয়া গিয়াছেন। গৃহের প্রত্যেক কার্য্যের শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিত এবং সেদিকে আমাদিগের দৃষ্টি রাখিবার জন্য বলিতেন। তাঁহার নিকট সময়ের যথেষ্ট মূল্য ছিল এবং সে জন্যই প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত দৈনিক কার্য্য যাহাতে ঠিক সময়মত হয়, তাহার দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। সংসারের দাস দাসীদিগের প্রতি তাঁহার পুত্র কন্যার সমতুল্যই স্নেহ ছিল এবং তাহাদিগের কল্যাণার্থে রোগ-যাতনার ভিতরও চিন্তা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সচ্চরিত্রের মাধুর্য্যে সকলকে যে কতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা আজ পরিচিত আত্মীয় বন্ধুদিগের সমবেদনা জ্ঞাপনার দ্বারা আরও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

প্রথম জীবনে পিতৃদেব বেশী শোক পান নাই। মধ্য জীবনে কনিষ্ঠা কন্যাকে হারাইয়া ছিলেন ও পরে শ্রদ্ধেয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ বন্ধু-বিয়োগের সহিত তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। প্রায় সাতবৎসর পূর্ব্বে পিতামহী ঠাকুরাণী স্বর্গারোহণ করেন—সে সময় তাঁহার বয়স অশীতিবৎসর ছিল। সেজন্য এ শোক পিতৃদেবের নিকট ততটা দুর্ব্বিষহ হয় নাই। কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যখন পিতৃদেব তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ও আমাদিগের একমাত্র খুল্লতাতকে হঠাৎ হারাইলেন, তখন তাঁহার শরীর ও মন দুই একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। গত দুই বৎসর বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কয়েকবার কলিকাতার বাহিরেও গিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও স্থানেই স্থায়ী উপকার কিছু হয় নাই। গত বৎসর পুরী হইতে প্রত্যাগমনের পরই শ্রদ্ধেয় প্রমথলাল সেন স্বর্গারোহণ করেন। শ্মশান-যাত্রী বন্ধুদিগের সহিত শান্তি-কুটীর হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত পথই গমন করেন এবং তাহার পর আর বেশী কোথাও বাটীর বাহিরে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক বন্ধুদিগের সকলকে একে একে হারাইয়া, এই সময় হইতে নিজেও পরলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পূজার পর একমাসের জন্য বকুনারে গঙ্গাতীরে কিছুদিন থাকেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহার স্বভাবের রোগবৃদ্ধি হওয়াতে, মাতৃদেবী তাঁহাকে লইয়া চলিয়া আসেন। প্রায় আড়াই মাস কলিকাতায় রোগ-যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি শারীরিক কষ্টের কথা বিশেষ কিছু কাহাকেও বলিতেন না। কিন্তু মনে মনে পরলোক-যাত্রার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইতেছিলেন। যখন ঢাকা হইতে পিসিমাতা ঠাকুরাণী দেখা করিতে আসেন, তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "অনেকেই ত ভাই দেখা হইল, তুমি আর আমি আছি, তা আর বেশী দিন থাকা-পড়া নয়।" বড়দিনের ছুটীতে জ্যেষ্ঠা কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতি

দেখিবার জন্ম বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এবং যে পনের দিন তাঁহারা কলিকাতায় কাটাইয়া গিয়াছিলেন, সে কয়দিন পিতৃদেব বেশ মনের আনন্দে ছিলেন। তাঁহারা লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া যাইবার পরই পিতৃদেবের রোগের বৃদ্ধি হয়। তথাপি আমরা কেহই ২৮শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মনে করিতে পারি নাই যে, তিনি এত শীঘ্র আমাদিগের মায়া কাটাইয়া চলিয়া যাইবেন। ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে তিনদিন মাত্র তিনি খুবই রোগ-যাতনা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে যাতনার ভিতরেও ব্রহ্মানন্দদেব তাঁহাকে ডাকিতেছেন ও সেই অমৃতময় রাজ্যের আলোক তিনি দেখিতে পাইতেছেন, এবং তাঁহার নৌকা ইহলোক পার হইয়া গেল, এই সকল কথাই স্পষ্টস্বরে সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। তখনই আমরা বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, যদিও তাঁহার দেহ এ পৃথিবীতে রহিয়াছে ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামে নাই, কিন্তু তাঁহার আত্মা সেই অমরদলের সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছে। ১লা ফেব্রুয়ারী, প্রাতঃকাল হইতে রোগের সমস্ত যাতনা লয় হইয়া যায়, এবং তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, তিনি সেই বিশ্বজননীর সহিত যোগে যুক্ত রহিয়াছেন এবং সেই ভাবেই রাত্রি ১১-৫০ মিনিটের সময় তাঁহার আত্মা দেবতার ক্রোড়ে স্থানলাভ করে।

সন্তান সন্ততির প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসার পরিচয় আমরা আর কি দিব? তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, সকলকার সুখ দুঃখের ভাবনা একাই বহন করিতেন। তিনি যে শুধু আমাদিগের জন্যই ভাবিতেন তাহা নয়, নববিধান-মণ্ডলীর জন্য অনেক সময়ই ভাবিতেন। নববিধান-প্রচারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, গিরিশচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেগুলির পুনর্মুদ্রণের ভাল ব্যবস্থা সকল সময় হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। পরলোকগমনের চারিমাস পূর্ব্বেও তিনি আমাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার নামে এক হাজার টাকার একটী স্থায়ী ফণ্ড করিয়া, তাহার উপস্বত্ব শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়, বিজয়কুমার সেন প্রভৃতি কয়েকজন ট্রাষ্টী নববিধান-মণ্ডলীর গ্রন্থপ্রচারের জন্য প্রতিবৎসর খরচ করিবেন।

আজ আমাদের স্নেহময় পিতাকে বিশ্বপিতা তাঁহার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন, তাঁহার নিকট আমরা আর কি নিবেদন জানাইব? পরলোক হইতেও আমাদিগের পিতা আমাদিগকে এখনও স্নেহ করিতেছেন ও তাঁহার আত্মা বিশ্বপিতার ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে, এই বিশ্বাস স্পষ্ট করিয়া দিন। সচ্চিদানন্দ হরি, "তাঁহার ভিতরে আমরা সকলে, রয়েছি জীবিত ইহ পরকালে" এই কথা অন্ধকার দিনে উপলব্ধি করিতে দিতেছেন। তাঁহারই নাম ঘোষিত হউক।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে!

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(৮ই জানুয়ারী, শিলচর, নর্ম্মালস্কুলে স্মৃতি-সভায় পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিশেষ ভক্তির সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঈশার চরিত্র তাঁহার জীবনে আশ্চর্য্যরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তিনি খৃষ্ট সম্বন্ধে "Jesus Christ, Europe and Asia" নামক বক্তৃতা কলিকাতাতে প্রথম করেন। এই বক্তৃতা এক নূতন আলো প্রদান করিল। সেই বক্তৃতায় তিনি একস্থানে বলিতেছেন, "I assure you my brethren, nothing short of self-sacrifice of which Christ has furnished so bright an example will regenerate India. Let my European brethren do all they can to establish and consolidate the moral kingdom of Christ in India. Let them preach from their pulpits and exhibit in their life the great principles of charity and self-sacrifice. May England, Europe and Asia be in dissolubly united in charity, love and self-denying devotion to truth."

বর্ত্তমান সময়ে Dr. Stanley Jones তাঁহার নব প্রকাশিত "The Christ on Indian Road" নামক পুস্তকে মহর্ষি ঈশাকে প্রাচ্যভাবে প্রচার করিবার যে মহতী চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই নূতন নহে। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাঠ করিলে ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়:—

"It seems that Christ has come to us as an Englishman with English manners and customs about him, with temper and spirit of an Englishman in him. Hence it is that the Hindu people shrink back to say who is this revolutionary reformer who is trying to sap the very foundation of native society and bring about outlandish faith and civilisation. When they feel that Christ means nothing but denationalisation, the whole nation must certainly repudiate and banish this acknowledged evil. When we hear of the lily and the sparrow as well as hundred other things of Eastern countries do you not feel we are quite at home in the holy land? Go to the rising Sun in the East not to the setting Sun

in the west if you wish to see Christ in the plentitude of his glory and in the fullness and freshness in the primitive dispensation. Why do I speak of Christ in England and Europe as the setting Sun. Because there we find apostolical Christianity almost gone there we find the life of Christ formulated into lifeless form and antiquated Symbol, but if you go to the true Christ in the East and his apostles you are seized with inspiration."

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে "India asks who is Christ" এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে—"That Marvellous Mystery The Trinity নামক বিখ্যাত বক্তৃতা প্রদান করেন। এই দুই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব এমন বিশদভাবে প্রকটন করিয়াছেন যে, গোড়া খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ এই সকল অধ্যয়ন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। এই সকল বক্তৃতা খৃষ্ট জগতে এক ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। এই জন্য সেই সময়ের Statesman পত্রিকার সম্পাদক R. Night সাহেব বলিয়াছেন যে—"when Keshub speaks the world listens." খৃষ্টকে তিনি যে ভাবে ভারতে শিক্ষিত-সমাজে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু খৃষ্টার্থী সংসঙ্গের ধর্ম্মপ্রচারকগণও আমাদের নিকট এই ভাবেই প্রচার করিতেছেন। Logos, Trinity সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের উক্তি আমি মাননীয় Dr. Stanley Jones সাহেবকে দেখাইয়াছিলাম। তিনি যেভাবে তাঁহার বক্তৃতাতে প্রচার করিয়াছেন, Stanley সাহেব তাহা পাঠ করিয়া খুব গভীর শ্রদ্ধার সহিত বলিলেন যে, কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা গভীর সত্যে পরিপূর্ণ এবং তিনিই এই ভাবে ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত।

ইয়োরোপীয় এবং আমেরিকার ধর্ম্মপ্রচারকগণ খ্রীষ্টকে Indianised করিবার নূতন চেষ্টা এবং উদ্যোগ করিতেছেন। আমার মনে হয়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টকে যেরূপ ভাবে ভারতে প্রচার করিয়াছেন, পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মযাজকগণ ইহা হইতে বেশী প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে অনেকদিন হইতে একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ইংলণ্ডে যাইয়া খ্রীষ্টের ধর্ম্ম এবং নীতি অধ্যয়ন করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি England গমন করেন। England এ তিনি যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয়। সে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি Gladstone, John Stuart Mill, Martineau, Dr. Pussi, Dean Stanley এবং Maxmuller প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে যেভাবে সম্মান করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিলাতে এমন কোন সভা সমিতি ছিল না, যেখানে কেশবচন্দ্র স্বীয় অসাধারণ বাগ্মিতা দ্বারা উপস্থিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ না করিয়াছেন। St. James Hall প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতার সম্মুখে সুরাপান-নিবারণ সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া অনেক ইংরাজ পুরুষ তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, England এবং Scotlandএ এমন কোন সহর ছিল না, সেখানের লোকেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে একটু দ্বিধা বোধ করিয়াছে। ইংরেজীতে একটী কথা আছে "Lionising" করা—ঠিক কেশব বাবুকেও তাহারা "Lionise" করিয়াছিল। তাঁহার সুবিমল যশোরাশি চতুর্দ্দিকে এমন ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, স্বয়ং ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া Windsor রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই প্রকার ছয় মাস কাল London, Liverpool, Manchester, Scotland প্রভৃতি নানা স্থানে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া ভারতের অভিমুখে রওনা হইলেন। Englandএর প্রতি তাঁহার এই শেষ বাণী—"Farewell dear England, with all thy fault, I love thee still. Farewell country of Shakspeare, Newton, land of liberty and charity. Farewell temporary home where I realised, tasted, enjoyed sweetness and brotherly and sisterly love. Farewell my father's western home."

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

একাধিকশততম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরাজীতে যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া সুন্দর বক্তৃতা দান করেন।

৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে বিশেষ উপাসনা ভাই চন্দ্রমোহন দাস দ্বারা সম্পাদিত হয়। মহর্ষিদেব ও ব্রহ্মানন্দের নিম্নলিখিত পত্র-বিনিময় এবং মহর্ষিদেব সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ যে ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহারও অনুবাদ ভাই প্রিয়নাথ পাঠ করেন।

হিমালয় দার্জ্জিলিং,
৭ই জুলাই, ১৮৮২।

ভক্তিভাজন মহর্ষি,

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ,

সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চনাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন "ব্রহ্মানন্দ" নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয়, তদপেক্ষা অধিক ধন মনুষ্যের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন। বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আরো অধিক শান্তি ও আনন্দ তাঁহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়, হরি কি সুধাময় পদার্থ। সে মুখ দেখিলে আর কি দুঃখ থাকে, প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তগুলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

***

আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ,

৩০শে আষাঢ়ের প্রাতঃকালে একপত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরোনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে, সত্য সত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্য মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম। আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি, এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ্ অনুশোচ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "কাহাকেও এমন পাই না যে, আমার কথায় সায় দেয়।" তোমাকে সে পাগল যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মত্ত হয়ে উঠ্‌ত, আর খুসি হয়ে বলতে থাকিত—"কিমতি জানি না যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।" তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি, এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকট কোন কথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগ বন্ধন হইয়াছিল, নানাপ্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তগুলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন। সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্নত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেননি, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অবতরণে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। "তত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতা অমাতা"—সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান, উঁচু নীচুর কোন খিরকিচ নাই। ইতি—

২রা শ্রাবণ, ৫৩ ব্রাঃ সং। তোমার অনুরাগী
মসূরী পর্ব্বত। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

***

তারাভীউ
শিমলা, ২৭শে সেপ্টেম্বর,
১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

পিতৃচরণ-কমলে ভক্তির সহিত প্রণাম—

গত বর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এবর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শুনিলাম, আপনার শরীর অসুস্থ। ইচ্ছা হয়, নিকটে থাকিয়া এ সময় আপনার চরণ সেবা করি। বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? হৃদয়ের যোগ আত্মার যোগ তো আছেই, তথাপি মন চায় যে শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করি। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রায় হয় যে মনের ভাব মনেই থাকিবে, তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর মনোহর ব্রহ্মলীলা দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে। যতদিন যাইতেছে, তত ব্রহ্মসূর্য্যের কিরণ, ব্রহ্মচন্দ্রের জ্যোৎস্না অন্তরে বাহিরে দেখিয়া অবাক হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার মনে হয়, পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখন হয় নাই। আমাদের সৌভাগ্য, এই সকল আনন্দলীলা আমরা পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাহা দেবতাদের লোভের বস্তু। নিরাকারের এমন খেলা, যিনি ভূমা মহান্ তাঁহার এমন সুন্দর প্রকাশ কে বা জানিত, কে বা ভাবিত? এখন তাঁহারই প্রসাদে এ সমুদয় দুঃখী কৃপাপাত্র ভারতবাসীদিগের নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। অনাদানন্ত করতলন্যস্ত। হইল কি? ছিল কি? হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, গঙ্গা ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নূতন বস্ত্র পরিয়াছেন, চারিদিকে নূতন শোভা! কোথাও গম্ভীর নিনাদে, কোথাও মধুরস্বরে ব্রহ্মনাম ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে আনন্দধ্যান না করিয়া থাকা যায় না। এ সকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি। এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই চায় না। আসুন গভীর যোগে সেই পুরাতন পানপাত্রে প্রেমরস পান করি ও প্রেমময় নাম গান করি।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী
সেবক—শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

***

হিমালয় পর্ব্বত;
১০ই আশ্বিন, ব্রাঃ সং ৫৪।

প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ—

আর আমি অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছুদিন পরে কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের

সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই শুভ সময়ে প্রেমসহকারে একটী শ্লোক উপহার দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। "কবিং পুরাণমনুশাসিতারং অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ। সর্ব্বস্য ধাতারম-চিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যাযুক্তযোগবলেনচৈব ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥"

"নিম্নে বসুন্ধরা উর্দ্ধে দেবলোক
সর্ব্বত্র ঘোষিত মহিমা তাঁর:
আনন্দময়ের মঙ্গলস্বরূপ
সকল ভুবন করে প্রচার।"

তাঁহার প্রসাদে তুমি দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার কথা আশ্চর্য্য। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রহ্মনাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা যাও তাঁর নাম প্রচারে, তাঁর আনন্দজনন সুন্দর আনন দেখ রে নয়ন সদা দেখ রে।

তোমার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুনশ্চ—এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিলে আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব।

পাঠান্তে আচার্য্যের প্রার্থনা অবলম্বনে উপদেশ ও প্রার্থনা বেশ ভাবোপযোগী হইয়াছিল।

সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতি-সভা হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীমান্ আশাকুমার মহর্ষির জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। ভাই প্রিয়নাথ মহর্ষির সঙ্গে কেমন করিয়া পরিচয় হয় ও তাঁহার সঙ্গে কিরূপ কথাবার্ত্তা হয় ইত্যাদি বলিয়া মহর্ষির ব্যাখ্যান হইতে কিছু পাঠ করেন।

(ক্রমশঃ)

—•—

সংবাদ।

শুভবিবাহ—গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শ্রীমৎ আচার্য্যদেব-পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী শ্রীলতার শুভবিবাহ ১নং হ্যারিংটন রোড ভবনে, অবসর-প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। নৈসর্গিক দুর্বিপাক সত্ত্বেও বহু গণ্য মান্য নরনারী বিবাহ-বাসরে যোগদান করিয়াছিলেন। এই শুভ অনুষ্ঠানে মঙ্গলময়ী জননীর শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষার জন্য পরদিন প্রাতে ১০টার সময় কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে বরকন্যাকে লইয় কন্যার পিতামাতা, ভগ্নীগণ ও কতিপয় আত্মীয় সমবেত হইয়া বিশেষ উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করিয়া আচার্য্যদেবের উক্তি পাঠে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করেন, ভাই চন্দ্রমোহনও বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে বরকন্যাকে কয়েকখানি পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়। ভাই প্রিয়নাথের পত্নী ও উপস্থিত মহিলাগণ চন্দন ও ধান্য দূর্ব্বা দিয়া বর কন্যাকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করেন। এই অনুষ্ঠানটি অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হয়।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ঢাকা গেণ্ডেরিয়াস্থ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দীর ভবনে, তাঁহার পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুজিতানন্দের সহিত, বাণীগাঁ (মৈমন সিং) নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মিনতির শুভবিবাহ নবসংহিতা-নুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

ভগবান্ নবদম্পতিযুগলকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, সন্ধ্যায় মঙ্গলবাড়ীস্থ সাধু অঘোরনাথের সমাধি-প্রাঙ্গণে, মঙ্গল বাড়ীর কয়েকটী পরিবারের মহিলা ও শিশুদিগের সম্মিলনে, ভাই প্রিয়নাথ সংক্ষেপে উপাসনা ও মঙ্গলবাড়ী সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা উচ্চারণে প্রার্থনা করেন। মহিলাগণ মধুর সঙ্গীত করেন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ পত্রিকাস্থ করিতেছি:—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ প্রায় ১টার সময়, স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাস গুপ্তের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিকুমার দাস গুপ্তের পুত্রবধূ, বার্ডকোম্পানির "ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট ষ্টোন ফ্যাক্টরীর" ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী উমা দেবী, বেলেঘাটায় ৫৫নং কানাল ইষ্টরোডে, স্বামী, একমাত্র শিশু কন্যা, শ্বশুর শাশুড়ী, সহোদরা, দেবর, ননদ প্রভৃতি বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ছাব্বিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ চিন্ময়ী মায়ের কোলে প্রস্থান করিয়াছেন। শ্রীমতী উমাদেবী বহু সদ্গুণে ভূষিতা ছিলেন। সংসারে প্রেমের প্রতিমা লক্ষ্মীরূপে, সাহিত্য জগতে উদীয়মানা মহিলাকবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিরূপে খুব সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁর ছোট ছোট গল্প, কবিতাদি বহু বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকাদিতে উচ্চ প্রশংসার সহিত সমাদর লাভ করিয়াছে। গত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত "বাতায়ন" নামক কবিতার বই, যাহা মুটে মজুরদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ প্রাণের দরদী ভাষায় লিখিত এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত ও তাঁহার ভূমিকা-সম্বলিত, তদ্দারা সাহিত্যজগতে অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এ হেন সদ্গুণালঙ্কৃতা উমাদেবীর অকাল মৃত্যুতে পরিবার, সমাজ ও দেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বাঁকিপুরে, শ্রদ্ধেয় ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন কুমার চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ বৃদ্ধ পিতা, সহধর্ম্মিণী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি

বহু আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে মাতৃক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন।

অদ্য ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী মণ্ডলীর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কিশোরগঞ্জ-নিবাসী, শ্রীযুক্ত জগন্মোহন বীর প্রায় শতবর্ষ বয়সে, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বীরের গৃহে, ৭নং বজ্‌ বজ্‌ রোডে ইহলোক হইতে অমরধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

আমরা শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি প্রাণের গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাসকলকে তাঁহার স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

পারলৌকিক—গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ৯১।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী চারুবালা দেবীর মাতা নিকুঞ্জমোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণের দ্বাদশ দিবসে ভাই অক্ষয়কুমার লধ বিশেষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যা প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, ১নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে, স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের পবিত্র আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন, কন্যাদ্বয় শ্রীমতী ইন্দিরা রায় ও শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] প্রারম্ভে কীর্ত্তনের [illegible] শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থনা করিলে, পরলোকগত আত্মার চিতাভস্ম পুত্র কর্ত্তৃক সমাধি-প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হয়। তৎপরে উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস শ্লোকাদি পাঠে সাহায্য করেন। পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন পিতৃদেবের সুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠান্তে প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। পঠিত জীবনী স্থানান্তরে দেওয়া গেল। অনুষ্ঠানটী সুগম্ভীর ভাবে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। গণ্যমান্য বন্ধু বান্ধব অনেকে উপস্থিত হইয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার স্নেহবক্ষে অনন্ত শান্তিতে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

এই পবিত্র অনুষ্ঠানে তাঁহার পুত্র ও কন্যাগণ মিলিত হইয়া প্রচারক ও অন্যান্য বন্ধুদের [illegible] বস্ত্র ও স্মৃতিচিহ্ন ব্যতীত নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করিয়াছেন :—

কান্তিচন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার ২৫৲, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের যাত্রি-নিবাস জন্য ২৫৲, নববিধান প্রচার আশ্রম ২০৲, নববিধান জুবিলী উৎসবের ফণ্ডে ২০৲, পুরী ব্রহ্মমন্দির ফণ্ডে ২০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, ময়মনসিংহ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দির ১০৲, করাচি নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, ভবানীপুর সম্মিলনী সমাজ ১০৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ড ১০৲, ভগ্নী-সমিতি ১০৲, "পুণ্যাশ্রম" ১০৲, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ১০৲, বালকদিগের রবিবাসরীয় বিদ্যালয় ১০৲, নবদেবালয়—(ফুলের জন্য) ১০৲, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মগীতোপনিষদ ছাপাইবার ফণ্ডে ২০৲, উপাধ্যায়ের "গীতা-প্রবৃত্তি" ছাপাইবার ফণ্ডে ১০৲, কালা বোবা স্কুলে ১০৲, অন্ধ-বিদ্যালয় ১০৲, কলিকাতা দর্শন-চতুষ্পাঠী ১০৲, কলিকাতা অনাথাশ্রম ১০৲, চিরঞ্জীব শিল্পাশ্রম ১০৲, আতুরাশ্রম ১০৲, "গোবিন্দ কুমার" আশ্রম ১০৲, গোবরা কুষ্ঠাশ্রম ১০৲, বিরাটি প্রেমেন্দ্র-বিদ্যালয় ১০৲ টাকা; মোট ৩৫০৲ টাকা।

সাম্বৎসরিক—গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, নবদেবালয়ে উপাসনান্তে শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে প্রার্থনাদি হয়। মঙ্গলবাড়ীস্থ শ্রদ্ধেয় ভাইএর গৃহস্থিত সমাধি-প্রকোষ্ঠেও গিয়া ভাই চন্দ্রমোহন ও ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনাদি করেন। গত ২২শে, ফেব্রুয়ারী নবদেবালয়ে ভাই মহেন্দ্রনাথের পত্নীর স্বর্গদিন-স্মরণেও প্রার্থনা হয়, এই দিন রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের সাম্বৎসরিক স্মরণেও এখানে ভাই চন্দ্রমোহন উপাসনান্তে প্রার্থনা করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ৫১।১নং রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটে, ভক্ত অমৃতলালের কনিষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে ভাই চন্দ্রমোহন দাস বিশেষ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী ভক্তিদেবী ও শ্রীমতী চিত্ত দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ময়ূরভঞ্জাধিপতি রাজর্ষি শ্রীমৎ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক তাঁহার শিলিগুড়ি পুরের রাজবাগ-প্রাসাদস্থ সমাধি-মণ্ডপে অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হয়। কলিকাতার প্রচারকগণ ও মণ্ডলীর এবং আচার্য্য-পরিবারস্থ অনেক আত্মীয় বন্ধু যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথ ভাবযোগে উপাসনা করেন এবং মহারাণী সুচারুদেবী আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী হেমলতা চন্দও বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মধুর সঙ্গীত করিয়া অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করেন। উপাসনান্তে হবিষ্যান্ন প্রীতিভোজন হয়. অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন কথকতা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী মহারাণী দেবী শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ৫৲ টাকা দান করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৮ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ৫ম সংখ্যা।
১লা চৈত্র, বরিবার, ১৩৩৭ সাল, ১৮৫২ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
15th March, 1931.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

অনন্তরূপা, করুণাময়ী, সুখশান্তিদায়িনী জননি! সকলদুঃখনিবারণ হয়, স্বর্গের পরম সুখ শান্তির উৎস উৎসারিত হয়, যখনই তুমি আপনার অযাচিত কৃপাতে তোমার তৃষিত, ক্ষুধিত, ব্যথিত পুত্র কন্যাদের জীবনে পূজা বন্দনা প্রার্থনার ভিতর দিয়া আপনার শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত কর। তুমি কৃপা করিয়া এই নবযুগে তোমার সত্য পূজার অধিকার আমাদিগকে দান করিয়াছ এবং সজনে নির্জ্জনে এই পূজা বন্দনা, প্রার্থনা ও ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া তোমার নব নব শ্রীমূর্ত্তি আমাদের চিদাকাশে প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিতেছ। ভবিষ্যতে আরও কত ধন্য করিবে, তাহারও পূর্ব্বাভাস দিয়া আরও অধিকতর আশান্বিত করিতেছ। ভারতের আত্মা পূজা বন্দনার ভিতর দিয়া তোমাকে চায়, তোমাকে পায়। তোমাকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন এবং তোমার সেই অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্যময় দর্শনের ভিতরেই যে তাহার ইহকাল পরকাল, তাহার স্বর্গ মোক্ষ, তাহার এখানকার আশাময়, উৎসাহময়, আনন্দময় ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং অনন্ত জীবনে অনন্ত মিলনে লোকলোকান্তরের অদৃশ্য লোকের স্বর্গীয় জীবন, তাহারও যথেষ্ট আভাস দিতেছ। প্রাচীন ঋষি-যুগে ভারতের আত্মা কত ভাবে তোমাকে দর্শন করিলেন, কতরূপে আত্মাতে তোমাকে ধারণা করিলেন, কত ভাবে তোমাতে ডুবিয়া, তোমাতে মজিয়া আত্মহারা হইলেন, ঋষিযুগের উপনিষদাদিতে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা অবাক্ হই। ভক্তি-যুগ-পরম্পরায় ভক্তগণ এই পূজা বন্দনার ভিতর দিয়া কত তোমার আস্বাদন লাভ করিলেন, কত দর্শনানন্দে ডুবিলেন, আত্মহারা হইলেন, ভগবৎ-গাঁথা সকল তাহা প্রকাশ করে। নব নব পূজায়, তোমার অযাচিত কৃপাজনিত প্রকাশের নবত্বই মানব-প্রাণকে উৎসবময় করিয়া তোলে। তোমার এই পূজা-বন্দনা-জনিত সুখ শান্তি আনন্দই ভারতীয় আত্মিক জীবনের পরম সম্পদ, পরম সম্বল; ভারতীয় জাতীয় জীবনের উপর ইহাই তোমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ। জগতের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে তোমার পূজা বন্দনা হইতেছে। তাঁহারাও তোমার পূজার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু বল, মা, ভারতীয় জীবনে তোমার পূজা বন্দনার যে সরলতা, মধুরতা, গম্ভীরতা ও বিচিত্রতা, তার তুলনা আর কোথায় মিলে? ভারতের আত্মায় যেরূপ তোমার প্রকাশ

হইয়াছে ও হইতেছে, সে প্রকাশের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের তুলনা আর কোথায় সম্ভবে? দেখিতেছি, এ পূজা মানবাত্মার দিক্ হইতে একমাত্র নির্ভর, বিশ্বাস, ব্যাকুলতা ও আত্মসমর্পণ এবং তোমার দিক্ হইতে অযাচিত কৃপা এই দুয়ের উপরই নির্ভর করে। এই বিশুদ্ধ পূজায় ও তোমার বিশুদ্ধ স্বর্গের শোভা-সৌন্দর্য্যময় দর্শনে ভারতের আত্মার যে বিশিষ্ট অধিকার, তাহা তুমি নবযুগে নববিধানে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ। কিন্তু দেখ, মা, আমাদিগের দিক্ হইতে সেরূপ নির্ভর, আত্মসমর্পণ, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা তোমার পূজা বন্দনাতে অল্পই সম্ভব হইতেছে। তাই, মা, সকল সময় তোমার স্বর্গের ভাবে স্বর্গের পূজার অধিকারী হইতেছি না, সম্ভোগ করিতে পারিতেছি না। সময় সময় আবার আমাদের আত্মচেষ্টা, আত্মচিন্তা, আত্মরুচি পূজা বন্দনায় মিলিয়া মিশিয়া নিখুঁত স্বর্গের পূজাকে মলিন করিয়াও ফেলিতেছে। তুমি যখন এই স্বর্গের পূজা-বন্দনা-সম্পাদনে স্বয়ং আমাদের পুরোহিত, আচার্য্য এবং পরিচালক হইয়াছ, তখন তোমাতে একান্ত নির্ভর, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর আমাদের অন্য উপায় নাই। তাই তোমার চরণে ব্যাকুল প্রার্থনা, আমাদিগকে তোমার পূজা বন্দনায় খুব নির্ভরশীল কর, খুব সরল, সহজ ভাবাপন্ন কর, খুব আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত কর। আমাদিগের মধ্যে তোমার স্বর্গের পূজা বন্দনা তোমারই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রত্যাদেশ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন, আমরা চলিয়া গেলে প্রত্যাদেশের সময় চলিয়া যাইবে, প্রত্যাদেশের সময় আর থাকিবে না। প্রত্যাদেশের দিন চলিয়া গেলে, এই নববিধানের ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপ দিন আসিবে? আবার শুষ্ক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার যুগ আসিবে, ধর্ম্মরাজ্যে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্ভূত সিদ্ধান্তের সময় আসিবে, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত অনুপ্রাণনা ও জীবন্ত পরিচালনার দিন আর থাকিবে না। ধর্ম্মনদীতে আর জীবন্ত জোয়ারের তরঙ্গ খেলিবেনা। শুধু ধর্ম্ম-নদীতে ভাঁটা পড়িবে তাহা নহে; অপিচ প্রাকৃতিক নদীতে স্রোত বন্ধ হইলে যেমন ঊর্দ্ধ হইতে আর নূতন জল-সমাগম হয় না, স্থানে স্থানে নদীবক্ষ একবারে শুখাইয়া যায়, স্থানে স্থানে নদীবক্ষে সামান্য জলরাশি বদ্ধ হইয়া থাকে এবং মানুষ ও পশু পাখীর ব্যবহারে শীঘ্র তাহাও সমল হইয়া যায়, ধর্ম্মনদীতেও তেমনই ঊর্দ্ধ হইতে আর নূতন প্রত্যাদেশের পরিত্রাণপ্রদ স্রোত প্রবাহিত হয় না, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ও সাধুভক্তদিগের জীবনলব্ধ স্বর্গীয় সুসমাচার যাহা গ্রন্থবিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাও মানুষ আপনার মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তি-যোগে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া গ্রন্থস্থিত নির্ম্মল সামগ্রীকে সমল করে, গ্রন্থবদ্ধ নির্ম্মল সামগ্রী আর তখন তেমন করিয়া সাধারণ লোক-মণ্ডলীর পরিত্রাণ-পথে সহায় হইতে পারে না।

সত্য সত্যই কি বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রেরণা, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের বন্যা মন্দীভূত হইয়া যায় নাই অথবা অন্তর্হিত হয় নাই? এ প্রশ্নের উত্তর কথায় কে দিবে? আমাদের জীবন সরবে নীরবে, জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা একটু আলোচনা করি।

নব যুগে সমন্বয়-ধর্ম্মের বিরাট ও বিচিত্র স্বর্গের সুসংবাদ আমরা সকলে পাইয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে কত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার! সেই সুসংবাদ পাইতেছি গ্রন্থের ভিতর দিয়া; নবযুগের প্রেরিত সাধু মহাজন ও ভক্তমণ্ডলীর জীবন পাঠ করিতেছি, তাঁহাও গ্রন্থের ভিতর দিয়া। এই বর্ত্তমান যুগ বিশেষ ভাবে পাঠ প্রসঙ্গেরই যুগ, জ্ঞানপ্রধান যুগ। মানুষ এ যুগে স্কুল কলেজে পাঠ করে, আপনাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অনেক সামগ্রী সঞ্চয় করে, এবং তাহা লইয়াই আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্রে কারবার আরম্ভ করে। সেই শিক্ষা-ক্ষেত্রে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠে যেমন শিক্ষার্থিগণের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অনেক কিছু সঞ্চয় হয়, তেমনই তাহাতে একটা সম্ভোগ হয়, একটা তৃপ্তি হয়, আনন্দ হয়।

আমরা নববিধানের মহা সমন্বয়ক্ষেত্রে কত বিচিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠ ও প্রসঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছি। নববিধানের জীবন্ত লীলাক্ষেত্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ইংরাজি, বাঙ্গালা বক্তৃতা, উপদেশ, প্রার্থনা ইত্যাদি যেন অফুরন্ত ও অগাধ শাস্ত্র-ভাণ্ডার! যত পাঠ করি, ফুরায় না, পাঠ করিয়াও তৃপ্তির

শেষ হয় না। এখানে কত জ্ঞানের তৃপ্তি ও ভাবের তৃপ্তি, কত কত সঞ্চয়। ইহা ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম অবস্থার ব্যাপার। পাঠের উপকার পাঠে হইবেই। কিন্তু পাঠ অত্যাবশ্যক হইলেও, জীবনের পক্ষে বিশেষ সহায় হইলেও, মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সাক্ষাৎ পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে পাঠই যথেষ্ট নহে।

পাঠ প্রসঙ্গ যোগে আমরা ধর্ম্মরাজ্যের অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারি, পাঠ প্রসঙ্গের সহায়তায় অতীতের সাধু ভক্ত মহাজনদিগেরও পরিচয় পাইতে পারি; কিন্তু মানবাত্মাতে জীবন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ভিতর দিয়াই মানব-জীবনের পরিত্রাণের ব্যাপার আরম্ভ হয়। অনুতাপ-সংযুক্ত উপাসনা প্রার্থনা যোগেই মানবাত্মাতে ঈশ্বরের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পাপ-বোধ, অনুতাপ, প্রার্থনা-যোগে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ হইলে, ঈশ্বর এরূপ জীবনে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সুযোগ পান। অল্প কথায় ধর্ম্মজীবন-পথে, কি অন্তরের নীচতা, হীনতা দূর করিতে, কি বাহিরের বিপদ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে, যতই আমরা নিজের জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধির অকর্ম্মণ্যতা প্রত্যক্ষ করি, যতই অসহায় ও অসম্বল হইয়া অনুতাপ সহকারে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করি, ততই উপাসনা প্রার্থনাদি যোগে তাঁহার দর্শন শ্রবণ ও প্রত্যাদেশ-লাভের অধিকারী হই।

যে মন দীর্ঘ দিন বাহিরের অর্জ্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধি বিচার-যোগে পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সে মন কি সহজে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে পারে? সকল অবস্থায় ঈশ্বরের পরিচালনে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে? আমরা ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া এবং বহুদিন ধর্ম্মক্ষেত্রে বাস করিয়া, উপাসনা প্রার্থনা ধরিয়া জীবন যাপন করিলেও দেখিতে পাই, তেমন করিয়া আমরা সকল অবস্থায় ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছি না, তেমন করিয়া আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ও অনুপ্রাণনের মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না। আমাদের ধর্ম্ম-জীবন অনেকটা বদ্ধ নদীর সমল বদ্ধজলরাশির ন্যায় স্বর্গের প্রত্যাদেশের বিমল-স্রোতোধারা-বর্জ্জিত, মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি ও পাঠ-প্রসঙ্গ-সম্ভূত ধর্ম্মের বদ্ধ সংস্কার ও বদ্ধ ধারণায় আবদ্ধ। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রভাবাধীন না থাকিয়া মানব-মন যখন আপনার শিক্ষা রুচি ও ভাবের অধীন থাকে, সয়তান কত আকার ধারণ করিয়া সে মনে ক্রিয়া প্রকাশ করে; তাই আমরা সয়তানের হাত আর সহজে এড়াইতে পারি না, সয়তানকে সয়তান বলিয়া ধরিতেও পারি না, ধরিলেও পদে পদে সয়তানের নিকট পরাস্ত হই। সয়তান তো আর কিছু নয়, ঈশ্বর-বিরোধী রুচি, ভাব ও প্রবৃত্তি। তাই ধর্ম্ম-জীবনে আমাদের কত অবিশ্বাস, কত অবাধ্যতা, কত ত্রুটী ও দুর্ব্বলতা। সময় সময় ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিয়াও, অবাধে কৃপাস্রোতে নিজকে ভাসাইয়া দিতে পারি না; তাই নিজ দোষে জীবনে ঈশ্বরের কৃপার স্রোত, অনুপ্রাণনের স্রোত বদ্ধ হইয়া যায়। এরূপ জীবনে প্রত্যাদেশের মুক্ত বায়ু কিরূপে প্রবাহিত হইবে? প্রত্যাদেশের ঝড় আর সেখানে কিরূপে তরঙ্গ তুলিয়া স্বর্গের ক্রিয়া প্রকাশ করিবে?

এ অবস্থায় প্রবল অনুতাপ ও ব্যাকুল প্রার্থনা এবং স্বর্গস্থ ও ইহলোকস্থ সাধুভক্তদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, জীবনে সজনে ও নির্জ্জনে পূজা বন্দনা আমাদের একমাত্র সম্বল। স্বর্গের নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসরণেই পরিত্রাণের পথ, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়ার মুক্ত পথ জীবনে খুলিয়া যায়, অনুপ্রাণন ও প্রত্যাদেশের অনুকূল অবস্থা সম্ভব হয়।

এই বুদ্ধি ও বিচার-প্রধান-যুগে করুণাময় ঈশ্বর আমাদিগকে পরের বিচার ও পরচর্চ্চা হইতে রক্ষা করুন। নিজ নিজ ত্রুটী ও অপরাধের প্রতি দৃষ্টি খুলিয়া দিন। মানবীয় উপার্জ্জিত জ্ঞানে অনাস্থা উপস্থিত হউক। পূর্ণ আত্মসমর্পণে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়ার স্রোত প্রবাহিত হউক। যেমন ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবনে, যেমন তাঁহার সমসাময়িক ভক্তবৃন্দের জীবনে, তেমনই আমাদের জীবনে পবিত্রাত্মার মুক্ত ক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রত্যাদেশের ঝড় প্রবাহিত হউক। পবিত্র নববিধান আমাদের জীবনে নিত্য স্বর্গের নববিধানে পরিণত হউক। সেই শুভ দিন করুণাময় ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আনয়ন করুন।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের নব অভিধান।

মৃত্যু শব্দের অর্থ সাধারণ অভিধানে দেহের মরণ, নব অভিধানে মৃত্যুর অর্থ দৈহিক জীবনের মুক্তি। পাপেই মৃত্যু

মানুষের, দেহের মৃত্যুতে মৃত্যুর মৃত্যু। ব্রহ্মানন্দ বলেন, "মৃত্যুর অর্থ পরলোকের অবস্থা. তাহার আর এক নাম ঈশ্বরের সহিত বাস করা।" তবে সে মৃত্যুকে আর ভয় কি? কাহার তাহা লোভনীয় নয়?

উপাসনা।

উপাসনার সাধারণ অর্থ ব্রহ্মের কাছে বসা। ভাইকেও যথার্থ কাছে পাইতে হইলে উপাসনা চাই। উপাসনার ভিতর দিয়া যেমন পরস্পরের আত্মার কাছাকাছি হওয়া যায়, আর কিছুতে তেমন কাছাকাছি হওয়া যায় না। বাহিরের দেহের নৈকট্য নৈকট্য নয়। এক সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিলেও নৈকট্য হয় হয় না। ব্রহ্মানন্দ বলেন, "একজন এদেশে একজন ভিন্ন দেশে থাকিলই বা, একপ্রাণ হবে. নববিধান আসিলে ইহা হইবে।" নববিধানে উপাসনাই যেমন ব্রহ্মের সহিত নৈকট্য আনয়ন করে, তেমনি ভাইর সহিতও করে।

"পড়ে মরতে উপাসনা।"

না বুঝিয়া, না জানিয়া, হয় ত বিরক্ত হইয়া অনেকের মুখে এই কথা শুনা যায়। কথাটা খুবই সত্য। উপাসনা-সাধনই যথার্থ মৃত্যু-সাধন। উপাসনা আর কি? জীবনের জীবন যিনি, তাঁহার সঙ্গ-সমাগম। দৈহিক জীবনের মৃত্যু সংসাধন বিনা ব্রহ্মসমাগম হয় না। এই জড়দেহে যতক্ষণ আমার মন বাস করে, ততক্ষণ আমি জড় জীবনে থাকি, যথার্থ জীবনের জীবনে থাকি না। যখনই তাহা ত্যাগ করি, তখনই ব্রহ্ম-সহবাস লাভ করি। এই ব্রহ্ম-সহবাস-লাভই ত উপাসনা, তাই তাহাতে পড়িয়া মরাতেই উপাসনা সাধন হয়। এই জন্যই কবীর বলিলেন, "যে দিন আমার আমিত্বের মৃত্যু হইল, সে দিন আমার আনন্দ হইল, আমার সমীরাও সর্বদাতা ঈশ্বরের ভজনা করিতে লাগিল।" সমীর অর্থ আমার প্রবৃত্তি-নিচয় বুঝিলেই ঠিক হয়।

"মলে বাঁচি।"

সংসারে শোক তাপে অনেকের মুখে প্রায়ই এই কথা বলিতে শুনা যায়, "মলেই বাঁচি।" এ কথার প্রকৃত তথ্য বুঝিয়া যে সকল সময় সকলে এ কথা বলে, তাহা মনে হয় না। মৃত্যুতে আপাততঃ জ্বালা যন্ত্রণার বিরাম হইবে, ইহা মনে করিয়াই এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকে। কিন্তু নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহার মত গভীর সত্য কথা আর কিছুই নাই। সত্যই আমরা জগতে মরিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই। "মৃত্যুই অমৃতের সোপান" শাস্ত্রকারও ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কেন না, এই দৈহিক জীবনে বাঁচা আমাদের যথার্থ বাঁচা নয়, জীবনের জীবন যিনি, তাঁহাতে বাঁচাই প্রকৃত বাঁচা। সে বাঁচা বাঁচিতে হইলে এ দেহের মৃত্যুই একমাত্র উপায়। তাই মানুষ যখন মরে, তখনই বাঁচে; কেন না, তখনই জীবনের জীবন যিনি, তাঁহাতে প্রবেশ করে। দৈহিক জীবন যতদিন, মানুষ মৃত্যুর অধীন ততদিন। পাপের অধীনতাই মৃত্যুর অধীনতা। দৈহিক জীবন মৃত বা মুক্ত হইলেই মানুষ যথার্থ বাঁচে বা চিরজীবী হয়।

নারীজাতির বৈশিষ্ট্য।

(৮ই মাঘ, শান্তিকুটীরে, ব্রাহ্মিকা-উৎসবে নিবেদিত)

মাতৃগণ! শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রত্যাদেশের অমৃতধারা শ্রীপ্রতাপ-চন্দ্রের গভীর ভাবধারার সহিত যখন মিলিত হইল, তখন গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের মত এই স্থানকে পবিত্র তীর্থে পরিণত করিয়াছিল। এই মহাতীর্থের কুসুম-সৌরভ কালের সীমা অতিক্রম করিয়া এখনও উৎসবের মলয়পবনে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহাদের উভয়েরই অন্তর্দৃষ্টি নারীজাতির বৈশিষ্ট্যকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিল। শ্রীবুদ্ধদেবের সূক্ষ্ম দৃষ্টিও নারী-বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া তাহার বিশেষ স্থান জগতে অর্পণ করিয়া গিয়াছে। তাই আজ প্রাচীন যুগের একটী নারীর আখ্যায়িকা আপনাদের নিকট বলিব।

পাটলীপুত্র নগরে একটী নারী বাস করিত। তাহার নাম আমরা জানিনা। লোকে তাহাকে "আম্রপালিকা" বলিত, কিন্তু "আম্রপালিকা" তখন কন্যাদিগের সাধারণ নাম ছিল; কেননা, কন্যাগণ বৃক্ষ রোপণ করিতেন, বৃক্ষে জল সেচন করিতেন, গ্রীষ্মকালে পথিকগণ যখন আমতলায় সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতেন, তখন গৃহস্থের কন্যাগণ তাঁহাদিগকে সুমিষ্ট ফল ও শীতল জল দিয়া তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। যাহা হউক, এই কন্যা মগধ রাজ্যের ভিতর অদ্বিতীয়া রূপসী ছিলেন, এবং সংগীত ও নৃত্য-বিদ্যায় সকলের নিকট অপূর্ব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাজদরবারে সংগীত ও নৃত্যাদির অদ্ভূতপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া অত্যন্ত ধনশালিনী হইয়াছিলেন। ধনধান্যে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ থাকিত, জনসাধারণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের যশো-গান করিয়া তাঁহার কর্ণে সর্ব্বদা সুধা বর্ষণ করিত। একদিন শ্রীবুদ্ধদেব সশিষ্যে তাঁহার একটী আম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার তপস্যার যশঃ সৌরভে দিগ্-দিগন্ত পরিপূর্ণ হইল, এই কন্যাও কৌতূহল-পরবশ হইয়া সাধন-কাননে আকৃষ্ট হইলেন। দেখিলেন, এক সৌম্যমূর্ত্তি সশিষ্য স্তিমিত-লোচনে ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার মুখ জ্যোতির্ম্ময়, কান্তি গৌর-বর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুল্লহরী খেলা করিতেছে, দেবতা বলিয়া

তাঁহার ভ্রম হইল। স্থানটী লোকে লোকারণ্য; ধনী, পণ্ডিত, রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণে সাধন-ক্ষেত্র পরিপূর্ণ। এই নারী করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কতক্ষণে দেবতার ধ্যান ভঙ্গ হইবে এই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে শ্রীবুদ্ধদেবের জ্ঞাতিভ্রাতৃগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন খাওয়াইবার জন্য সকরুণ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীগণ সুমিষ্টফল ও সুশীতল জল দিয়া শিষ্যদিগের তৃপ্তির জন্য সভামধ্যে গতায়াত করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই নারীও শ্রীবুদ্ধদেবকে কিছু বলিবার জন্য যেই মুখব্যাদান করিলেন, অমনি রাজগণ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। সিদ্ধার্থের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি কোমল হৃদয়ে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তোমরা নারীকে নির্য্যাতন করিতেছ? রাজগণ উত্তর করিলেন যে, "নারী পতিতা"। শ্রীবুদ্ধদেবের নিকট নারী অভয়প্রাপ্ত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "হে ভগবন্ বুদ্ধ! আমি যথার্থই পতিতা, আমার কি উদ্ধার হওয়া সম্ভব?" শ্রীবুদ্ধদেব বলিলেন, "হে মাতঃ! পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্যই ধর্ম্ম যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষই পতিত। বিলাস-বাসনার সহস্র বৃশ্চিক যখন আমার হৃদয় মনকে জর্জ্জরিত করিল, তখনই আমি পরিত্রাণের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম।" নারী আশ্বস্ত হইলেন। সশিষ্য শ্রীবুদ্ধদেবকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। আহার পান শেষ হইলে নারী মস্তক মুণ্ডন করিলেন, পীতবর্ণ কৌপীন ধারণ করিলেন; স্বর্ণ থালে পরিপূর্ণ করিয়া সমস্ত সুবর্ণ মুদ্রা, হীরক-খচিত স্বর্ণালঙ্কার, বহুমূল্য বস্ত্র সঙ্ঘের জন্য ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেবের পদে নৈবেদ্যরূপে অর্পণ করিলেন। আর একটি সুবর্ণ পাত্রে সুকেশীর কৃষ্ণ কেশদাম দেবতার চরণে সমর্পণ করিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের নিকট নির্ব্বাণ-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেব তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিযোগে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কয়লার মলিন আবর্জ্জনা মুক্ত করিয়া যেমন হীরকখণ্ড লাভ করা যায়, সেইরূপ নারীর বাহিরের মলিনতার অন্তরালে যে মহান্ আত্মা লুক্কায়িত আছে, তাহার স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম গৌরবান্বিত হইবে।

শ্রীবুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। নারী দেব চরিত্র লাভ করিয়া অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন হইলেন। দেশে দেশে গমন করিয়া নব ধর্ম্মের সুসমাচার ঘোষণা করিলেন। শ্রীবুদ্ধদেব নারীজাতির জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিলেন। শিক্ষা, সাধনা ও সেবার বিভিন্ন ধারার ভিতর দিয়া নারীজাতির বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং ঋষি প্রতাপচন্দ্রও নারীশক্তি জাগাইবার জন্য, বিশেষ শিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া সেই বিশিষ্টতাকে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক মানুষই দুই হস্ত ও দুই পদবিশিষ্ট, প্রত্যেকেরই দুটী কর্ণ ও দুটী চক্ষু আছে। মোটামোটী ভাবে দেখিতে গেলে সকল মানুষই এক; কিন্তু যখন আমরা সূক্ষ্মভাবে মানবের আকার ও অবয়ব আলোচনা করি, তখন দেখি যে, প্রত্যেকের মুখের অবয়ব পৃথক, দৃষ্টি পৃথক, কণ্ঠস্বর পৃথক, হস্তের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত পৃথক, এবং অঙ্গুলির উপরিভাগে যে সকল সূক্ষ্মরেখা আছে, তাহাও প্রত্যেকের এক প্রকারের নয়। প্রত্যেকের হস্তাক্ষরও পৃথক। যাহারা নিরক্ষর, তাহাদের সনাক্ত করিবার জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ লওয়া হয়; ইহার অর্থ এই যে, অঙ্গুলিস্থিত রেখাগুলি একজনের আর একজনের মত নয়। এই ব্যক্তিগত পার্থক্যই ব্যক্তিগত শারীরিক বিশিষ্টতা। নরনারীর আকার অবয়বের যে ভিন্নতা আছে, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাহাদের শারীরিক বিভিন্নতার ন্যায় মনের শক্তি ও গুণের বিভিন্নতা দৃষ্টি-গোচর হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। নারী স্নেহপ্রবণা, নারীর হৃদয় কোমল, সন্তান-পালনের জন্য এই কোমলতা নারীর স্বভাবসিদ্ধ দান। সৌন্দর্য্য-বোধ, সঙ্গীত, কবিতা, কল্পনা, শৃঙ্খলা, বিনয়, বাধ্যতা, লজ্জাশীলতা ও নির্ভরশীলতা নারীর প্রকৃতিগত ভূষণ। আবার বীর্য্য, সংকল্প, স্বাবলম্বন, সাহস, চিন্তাশীলতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি পৌরুষভাব পুরুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। শিক্ষা ও সাধনার ভিতর দিয়া এই উভয় প্রকৃতির বিকাশ সাধন করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। এই উভয় প্রকৃতির সমন্বয়-সাধনার ভিতর দিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না, কেহ কাহারও স্বভাবকে বিনাশ করিয়া অপ্রকৃতিস্থ হইবে না। ইহাই বিধাতার বিধান। নববিধান আসিয়াছে কাহারও বিশিষ্টতাকে বিনাশ করিবার জন্য নয়, কিন্তু প্রত্যেকের বিশিষ্টতা পূর্ণ করিয়া তাহার সমন্বয় সাধন করিবার জন্য। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, যাহাতে নর নারীর ভিতর সাম্য ও স্বাধীনতার অপব্যবহার না হয়, ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রকৃতি আমাদের মঙ্গলের জন্য যে বিধান দান করিয়াছেন, তাহারই পূর্ণতা সাধন করিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিবে। নারীর যথার্থ স্থান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

আত্মিক মানুষ।

(১১ই মাঘ, দিনব্যাপী উৎসবে, প্রাতঃকালীন নিবেদন)

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ ও শ্রদ্ধেয়া মাতৃগণ! আজ এই উৎসবের দিনে আমি আর কি নিবেদন করিব? যাহা বলিবার নয়, তাহাই বলিবার জন্য প্রবল প্রয়াস! ভাষার লিকার যাহাতু

অঙ্কিত করা দুঃসাধ্য, তাহাই আঁকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা! যাহাকে রূপ দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব, তাহারই রূপ ফলাইবার জন্য অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা! আজ সেই অব্যয়ের অভিব্যক্তির জন্য প্রাণের সমগ্র ব্যাকুলতা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে! সেই অব্যয়কে কি নামে অভিহিত করা যায়? সেটা চিৎ কি অচিৎ? সেটা শরীর কি অশরীর? সেটা মন কি আত্মা? সেটা হ্রস্ব কি দীর্ঘ? এই গুরুতর প্রশ্নের সঠিক সিদ্ধান্ত বড়ই সুকঠিন। যদি তাহাকে শরীর বল, তবে তাহা যে স্থূল শরীর নয়, ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। যদি তাহাকে সূক্ষ্ম শরীর বা কারণ শরীর বল, তাহাতেও প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না; কেননা, সেটা এ সকলের অতীত সত্তা অথচ একটী নূতন। প্রাণের উজ্জ্বল অনুভূতি আমাদের বলিয়া দেয় যে, সেটী দেহের ভিতর যেন আর একটী নূতন দেহ, মানুষের ভিতর আর একটী নূতন মানুষ, জীবনের ভিতর আর একটী নূতন জীবন, অথবা আত্মার ভিতর আর একটী নূতন প্রাণের বিকাশ! ইহা শরীরের প্রবৃত্তি, মনের ভাব ও আত্মার অনুভূতির সমবায়ে একটী স্বতন্ত্র সত্তার স্পষ্ট উপলব্ধি!

বাহ্য বিষয়ের বিচার, মীমাংসা ও অভিজ্ঞতার সহিত আত্মিক জীবনের যতটা যোগ উপলব্ধি করা সম্ভব, তাহারই সাহচর্য্যে ভাষার ভিতর দিয়া নূতন জীবনের চিত্র যতদূর অঙ্কিত করা যায়, আমরা তাহারই প্রয়াস করিব।

ভৌতিক জগতে আমরা যে সকল জ্ঞান উপার্জ্জন করি, সেই সকল জ্ঞানই বিকসিত হইয়া আমাদের আত্মিক জীবনের জ্ঞানকে পরিস্ফুট করে। এ জন্য শারীরিক জীবনের সহিত আত্মিক জীবনের যে একটী ধারাবাহিক যোগ আছে, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। শারীরিক জীবনের ক্ষয় বৃদ্ধির ন্যায় আত্মিক জীবনেরও ক্ষয় বৃদ্ধির একটী ক্রম আছে। শরীরের পুরাতন উপাদানগুলি (বা tissue) যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, নূতন উপাদানগুলি (বা tissue) তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপ একদিকে পুরাতন উপাদানগুলি যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত বা মৃত হইতেছে, তাহার স্থান নূতন উপাদানগুলি আসিয়া অধিকার করিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, কয়েক বৎসর পরে মানব পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। সাধনার পথে চলিতে চলিতে দেখা যায় যে, ভিতরের নূতন মানুষটীর জন্ম একদিনের আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহাতে অল্পে অল্পে পুরাতন মানুষের ভিতর নূতন মানুষ নিজের নূতন উপাদান সঞ্চার করে এবং যে পরিমাণে পুরাতন মানুষ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে নূতন মানুষ আপনার সত্তা বিস্তার করে। তবে আমরা সকল সময়ে শরীর-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া আত্মিক জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিতে পারি না। এ জন্য নূতন জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতে হইলে, আমাদের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নূতন ভাবই নব জন্মের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। ভাবের একটী রাজ্য আছে। যে রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা আত্মা। প্রেমের ভিতর দিয়াই নূতন জীবনের সত্তা হৃদয়ঙ্গম হয়। ভাবের লীলা-লহরী প্রেমের স্পর্শ পাইয়া চৈতন্যময় হইয়া উঠে। এই চৈতন্যের মধ্য দিয়াই নূতন জীবন গঠিত হয়। একটী ইংরাজ কবি দুটী আত্মার প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া ভাষার তুলিকায় তাহাকে এইরূপে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, "Love was born with them, in them, so intense, it was their very spirit, not a sense" প্রেমই তাহাদের আত্মার আত্মা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের নূতন জীবন গঠন করিয়াছিল, সে জীবন ইন্দ্রিয়ময় নয়, তাহাতে কামনার লেশমাত্র নাই, প্রবৃত্তির দুর্গন্ধ নাই; একটী প্রাণের সঙ্গে আর একটী প্রাণ, একটী আত্মার সঙ্গে আর একটী আত্মা মিলিয়া মিশিয়া একেবারে নূতন মানুষ বা নূতন আত্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুরাতন মানুষের ভিতর নূতন মানুষের অনুভূতিই আমাদের আলোচনার বিষয়।

বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে যে প্রেমের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিন্ময়; অথচ সেই নূতন জীবনের চিন্ময় প্রতিমূর্ত্তিখানিকে আমরা বাহিরের ভাবের ভিতর দিয়া স্পর্শ করিতে পারি, আদর করিতে পারি, সেই চিন্ময় জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনটী আমাদের শরীর মনের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহারই একটী চিত্র আজ আপনাদের উপহার দিতেছি :—

"নয়নে নয়নে আমায় পিয়ে।
আপনা পাসরি আমি তুমি হয়ে।"

প্রেমাস্পদ প্রেমিককে বলছেন যে, তুমি আমাকে তোমার নয়ন দিয়া পান কর, যেন আমি আপনাকে ভুলিয়া গিয়া তোমাময় হই। আমার পৃথক সত্তা যেন আর অনুভূত না হয় ইহাই আত্মিক জীবনের তন্ময় ভাব। এই তন্ময় ভাবই যোগের মূল সূত্র। এই তন্ময় ভাব যেমন ব্রহ্মের সহিত জীবকে মিলিত করে, তদ্রূপ প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমিককেও মিলিত করে। এই মিলন আত্মিক জীবনের বিশেষ লক্ষণ। মহর্ষি ঈশা এক দিন এই যোগের মধ্য দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, আমি ও আমার পিতা এক। শ্রীচৈতন্যদেবও সমাধিস্থ হইয়া "মুই সেই" "মুই সেই" মাত্র উচ্চারণ করিতেন। এই নব জন্মের আবির্ভাবে মানুষ পুরাতন দেহ মনের কথা ভুলিয়া যায়; কেবল ভুলিয়া যায় বলিলে ঠিক বলা হয় না, পরন্তু এমন করিয়া জীব রূপান্তরিত হয় যে, তাহার নূতন জীবনের উপলব্ধি তাহার প্রত্যেক কর্ম্মে ফুটিয়া উঠে। তখন নিজের প্রতি নিজের ভক্তিভাব জাগিয়া উঠে। তখন "নিজ পদধূলি, নিজ মাথে তুলি, লইব ভকতি করি" এই মহাবাক্য জীবনে সপ্রমাণ হয়।

এই নূতন জীবন শরীর নয়, অথচ ইহাতে শরীরের প্রবৃত্তি আছে, স্পর্শের অনুভূতি আছে, প্রাপ্য বস্তু পাইবার জন্য শরীর ও মনের চাঞ্চল্য আছে। ইহা দেহের প্রবৃত্তি লইয়াও অদেহী।

ইহা সম্পূর্ণ চিন্ময় সত্তা, ইহা বর্ণনার অতীত। এই চিন্ময় জীবনের দৃষ্টি একটী অপূর্ব্ব প্রহেলিকা। ইহার রহস্য ভেদ করা আমাদের সাধ্যাতীত। দৃষ্টির ভিতর রাবণের শক্তিশেল লুকান আছে। ভাবুক দৃষ্টির ভিতর দিয়াই নূতন জগৎ সৃষ্টি করে, দৃষ্টির ভিতর দিয়াই কথাবার্ত্তা চলে, ভাবের আদান প্রদান হয়। কার্লাইল ও এমার্সন দুইজনের ভাবরাজ্যের অধিপতি, দুইজনেই প্রেমের স্পর্শ পাইয়া নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন। যে দিন তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল, সে দিন তাঁহারা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কাহারও মুখ দিয়া একটী শব্দও বাহির হইল না, কাহারও চক্ষু দিয়া একটী পলকও পড়িল না, কাহারও প্রাণের গভীর নিস্তব্ধতার প্রতিবাদ করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাসও বহিল না। কেবল পরস্পর পরস্পরকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দৃষ্টি দৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিল, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিলিত হইল। দুটী প্রাণ মিলিয়া একটী হইল। এই দর্শনের ভিতর দিয়া কত ব্রহ্মতত্ত্ব, কত ধর্ম্মতত্ত্ব, কত শিক্ষাতত্ত্ব, কত সমাজতত্ত্বের গভীর প্রশ্নের সমাধান হইল, তুমি আমি কি তাহার সন্ধান রাখি? বেতার সংবাদের মত আত্মিক জগতের কত সংবাদ এরূপে যোগিগণ শ্রবণ করেন, তুমি আমি কি তাহা জানি? আত্মিক জীবনে দৃষ্টিটা সব চেয়ে বড় জিনিষ। এই দৃষ্টির ভিতর দিয়া আত্মার একটা অজ্ঞেয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই নব জন্মের বিশেষ লক্ষণ।

মানুষের শরীরে যখন বজ্রপাত হয়, তখন বজ্রের বৈদ্যুতিক শক্তিটা মানুষের বৈদ্যুতিক শক্তিটাকে যেমন নিজের ভিতর টানিয়া লয়, সেইরূপ একটী প্রাণ আর একটী প্রাণকে দৃষ্টির আকর্ষণে চিরদিনের জন্য নিজের করিয়া লয়। যে দিন আচার্য্যদেবের সহিত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দর্শন শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত আসামের ভক্তিধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করদেবের সাক্ষাতের মত হইয়াছিল; উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কাষ্ঠপুত্তলিকার মত উভয়ের চক্ষু পলকবিহীন। উভয়ের চক্ষু দিয়াই X Rayর আলোক ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। উভয়েই শরীরের অস্থি মাংস ভেদ করিয়া ভিতরের মানুষটীকে দেখিতে লাগিলেন। নূতন মানুষ না হইলে তাহার দৃষ্টি নূতন হয় না। নূতন জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা ভাব কর্ম্ম ভাষা ও দৃষ্টি সব রূপান্তরিত হয়। আত্মিক জীবন এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইলে জীব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় যে, শরীর ছাড়া আমি আরও কিছু, ইন্দ্রিয়ময় জীবন ব্যতীত আমি একটী স্বতন্ত্র সত্তা; তাহাকে দেবমানুষ বল, আত্মাই বল, আর নব জন্মই বল, যে কোন নামে তাহাকে অভিহিত করিতে পার। এই অনুভূতির মধ্য দিয়াই আত্মার স্বরূপ বোধগম্য হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মিক জন্ম বা আত্মিক জীবনের স্বরূপটী অন্যের নিকট ব্যক্ত করিতে হইলে, বাহিরে তাহার যে ভাবের প্রকাশ, বা জীবনের পরিবর্ত্তন হয়, তদ্দ্বারা তাহা অন্যকে বুঝাইতে হয়। ইহা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই।

নব জন্মের নূতন ভাবধারা যখন প্রাণে উদ্বেলিত হয়, তখন মানুষ আপনি আর আপনাকে সামলাইতে পারে না। তাহার পুরাতন দেহটা নূতন দেহের অধীন হইয়া চলে। বন্যার প্লাবন নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যেমন গ্রাম নগর ভাসাইয়া লইয়া যায়, ভাবের বন্যাও তাহার পুরাতন দেহ মনকে সেইরূপ ভাসাইয়া লইয়া যায়। পুরাতনের ভিতর নূতন মানুষ তাহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

ভাবের মানুষ ব্রাহ্মসমাজেও একবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাবের আবেগে তাঁহাদেরও পুরাতন দেহটা টলমল করিয়াছিল। তাঁহারাও পুরাতন জ্ঞানের পাষাণময় পথ অতিক্রম করিয়া ভক্তির স্নিগ্ধ সরোবর প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরাতন মানুষের বিচার মীমাংসা, যুক্তি তর্ক নূতন মানুষের প্রাণকে আর জ্ঞানের সীমার ভিতর বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। জ্ঞানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। ভক্তির বন্যায় পাষাণ হৃদয় ভাসিয়া গেল। সকলে দিশাহারা হইয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মুঙ্গেরের ধূলিকণা স্বর্ণরেণু বলিয়া সকলে মাথায় তুলিয়া লইলেন। ব্রাহ্মসমাজের মূর্ত্তি ফিরিয়া গেল। মরুভূমির উপর দিয়া সহস্র নদীর উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই নূতন ভাবই নব জন্মের অভিব্যক্তি।

পুরাতন দেহের পুষ্টি বা ক্ষীণতার সহিত নূতন দেহের সম্পর্কটা যে খুব ঘনিষ্ঠ, একথা স্বীকার করিতে আমরা অনেক সময়েই কুণ্ঠিত হই। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে, আমাদের আলোচিত বিষয়টী একটু পরিষ্কার হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতেন, তখন মহা সংকীর্ত্তনের সুধা পান করিতে করিতে তাঁহার দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া যাইত। মানবের স্বভাব-সুলভ ক্ষুৎপিপাসার অধিকার তাঁহার শরীরের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না; মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া, শরীরের প্রবৃত্তি বা সহজ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া, যেন কোন অতীন্দ্রিয় লোকে বাস করিতেন। সেই অবস্থায়, শরীর আছে কি নাই, একটু চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে হইত। এমন সময় যখন তাঁহার প্রিয় শিষ্য হরিদাস দেহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার শব দেহ স্কন্ধে লইয়া দিবা রাত্র উন্মত্তের ন্যায় সমুদ্রতীরে হরি-সংকীর্ত্তন করিয়া কাটাইলেন। এত শক্তি কোথা হইতে আসিল? ক্ষীণ দেহে সহস্র হস্তীর বল কেমন করিয়া সঞ্চারিত হইল? নূতন দেহে জোয়ার আসিলে পুরাতন দেহটাকে জীর্ণ পত্রের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়, শ্রীচৈতন্যদেব তাহার সাক্ষী। আত্মার বলের নিকট শরীরের বল যে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর, এই কথাই পৃথিবীতে সপ্রমাণ করিয়া মহাপ্রভু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নূতন জন্মের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটাও নূতন হয়। শ্রীবুদ্ধদেব স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিলেন, অর্থ বিত্ত রাজ্যপাট জলাঞ্জলি দিলেন, বৃদ্ধ পিতার সকরুণ ক্রন্দন ও অজস্র অশ্রুজলের প্রতি যিনি দৃক্‌পাতও করিলেন না, তিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দের মুহূর্ত্ত মাত্র অদর্শনও সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীচৈতন্যদেব যিনি মাতা শচীদেবীর দ্বাদশ দিবস উপবাস অগ্রাহ্য করিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা ও অচৈতন্য অবস্থার দিকে না তাকাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, তিনি যখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দ দুদিনের জন্য শান্তিপুরে এলেন, কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

আমাদের আচার্য্যদেবও প্রেমের নূতন সংজ্ঞা পৃথিবীকে প্রদান করিলেন। একদিন একজন প্রচারক যখন তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, তাহার উত্তরে আচার্য্যদেব তাঁহাকে বলিলেন, যিনি সকল প্রচারককে ভালবাসেন, তিনিই আমাকে ভালবাসেন; আমার ব্যক্তিত্ব কেবল আমাকে লইয়া নহে, পরন্তু যাঁহাদের প্রাণের সহিত আমার প্রাণ এক হইয়াছে, তাঁহাদের লইয়া আমার আমিত্ব। এই প্রেমের স্পর্শ পাইয়াই, বোধ হয়, মণ্ডলী একদিন গান গাহিয়াছিলেন, "ভাবের ভাবুক পথের পথিক সেই ত আপনার।" রক্ত মাংসের সম্পর্ক অপেক্ষা প্রেমের সম্বন্ধ বা ভাবের সম্বন্ধটাকে বড় করিয়া গ্রহণ করাই নবজীবনের আর একটী বিশেষ লক্ষণ।

একটী স্বজাতীয় অণুর সহিত তাহার সমজাতীয় অণুগুলি যখন মিলিত হয়, তখনই একটী দ্বীপ নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ ভাবের সহিত ভাব মিলিত হইলেই মহাভাব আবির্ভূত হয়। এই মহাভাবই ধর্ম্ম-জগতে নূতন সৃষ্টির বীজ।

এক একটী মহাপুরুষ এক একটী মহাভাবের প্রতিনিধি। এক একটী মহাভাব হইতে এক একটী ধর্ম্ম, এক একটী সভ্যতা ও এক একটী জাতি সৃষ্ট হইয়াছে। এই মহাভাবই সৃষ্টির সৃজনী-শক্তি। ভাবকে অস্বীকার কর, সৃষ্টি লোপ পাইবে; আত্মাকে অস্বীকার কর, ধর্ম্ম লোপ পাইবে; নবজন্মকে অস্বীকার কর, সাধুতা লোপ পাইবে।

বন্ধুগণ, তোমার আমার ভিতরও এই নূতন মানুষ কি জন্ম গ্রহণ করে না? নিশ্চয়ই করে। তবে পাষাণময় স্থানে বীজ পতিত হইলে তাহার বৃদ্ধি যেমন অসম্ভব হয়, অথবা শিশিরস্নিগ্ধ কোমল কুসুমের অঙ্গে সূর্য্য-রশ্মি পড়িলে তাহা যেমন শুখাইয়া যায়, আমাদের ভিতরও নবশিশুর অঙ্গে সংসারের উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িলে সেইরূপ শুখাইয়া যায়। সাধনার ভিতর দিয়াই নবজন্ম সম্ভব হইবে। নবজন্মের লীলা-তরঙ্গে প্রাণ টলমল না করিলে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে না, নূতন সমাজ ও নূতন মণ্ডলী গড়িবে না।

এখন আমাদের প্রাণের উদ্বোধন করিতে হইবে। স্বর্গ হইতে যে প্রাণ অবতীর্ণ হইবে, সেই প্রাণ অকাতরে পরার্থে বলিদান করিতে হইবে। জীবনের লক্ষণই এই যে, একবার শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়, আবার তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। এই গ্রহণ ও ত্যাগের মধ্য দিয়াই মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হয়, শরীর পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। আত্মিক জীবনেরও এই একই বিধি। আমরা যে পরিমাণে নূতন জীবন লাভ করিব, সেই পরিমাণে সেই নবজীবন যদি অন্যের ভিতর সঞ্চারিত হয়, জীবন সার্থক হইবে। নূতন জীবনের নূতন আশীর্ব্বাদ হইতে মণ্ডলীর ভিতর নূতন প্রাণের প্রতিষ্ঠা হউক।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্ম-সমাজের ত্রিধারা।

(১১ই মাঘের সন্ধ্যায় ভাই প্রিয়নাথের নিবেদন)

১১ই মাঘ সেইদিন, যে দিন আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং সেই দিনের সাম্বৎসরিক স্মরণার্থই এইদিনে আমাদিগের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথম মাঘোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। তখন হইতেই এই মাঘোৎসব ব্রাহ্মসমাজ বর্ষের পর বর্ষে মহামহোৎসব রূপে সাধন ও সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইহা বর্ত্তমানযুগে ভারতে প্রথম সেই পরব্রহ্মের গৃহ-প্রতিষ্ঠার মহোৎসব।

হিন্দুগণ বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের পূজা ভুলিয়া মৃন্ময় দেব-দেবীর পূজায় বহুদিন নিরত ছিলেন। তাই আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ ভগবৎ-প্রেরণায় বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্ম যে এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন, তাহাই প্রতিপাদন করিয়া, এমন একটি স্থানের প্রতিষ্ঠা করিলেন, যেখানে আর অন্য দেবদেবীর পূজা হইবেনা, কেবল একই ঈশ্বরের আরাধনা হইবে এবং যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী সেখানে একেশ্বরের স্তুতিবন্দনা করিতে পারিবেন।

ইহাই নবযুগধর্ম্মের প্রথম বীজ বপন। পৌরাণিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া একেশ্বরের পূজা যখন আরম্ভ হইল, তাহা সামান্য ব্যাপার নয়। ইহা যে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা, কে অস্বীকার করিবে? বিশ্বাসী মাত্রেরই ইহা বিশেষ আনন্দপ্রদ ঘটনা। সীমাবদ্ধ দেবদেবীর স্থানে অনন্ত দেব-দেবীর পূজা-প্রবর্ত্তন, এ কি সামান্য?

ধন্য আমাদিগের ধর্ম্মপিতা, যে তিনি এই মহা ঘটনার স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগের জন্য এই মহোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই আত্মার সহিত একাত্মতা অবলম্বনে এই মহোৎসব সাধন করিতেছি। আমরা সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনের পূজা সহকারেই মাঘোৎসব করিতে আহূত হইয়াছি। তাই এই উপলক্ষে যেখানে যত ব্রাহ্ম আছেন ও ব্রাহ্মসমাজ আছে, সকলের সহিত বিশেষ ভাবে আত্মিক যোগে মিলিত হই।

নববিধান কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই, নববিধান সকলকেই আপনার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, কেননা ইনি সকলকেই পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। অতএব যে বীজ হইতে এই বিশাল বৃক্ষ উদ্গত, তাহাকে কি আমরা ভুলিতে বা অস্বীকার করিতে পারি?

আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই দিনের মহোৎসব কেন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে সাধিত হইতেছে? যদি সকল ব্রাহ্মসমাজ এক হইয়া এক অখণ্ড মণ্ডলীতে পরিণত হইত এবং এক অখণ্ডদেহ হইয়া ১১ই মাঘের দিন সাধন করিত, তাহা হইলে কতই আরো আনন্দ হইত! কিন্তু আজ নাই হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, একদিন সকল ব্রাহ্মসমাজ এক নিশান ধারণ করিয়া নবযুগধর্ম্ম নববিধানের মহামহোৎসব করিবেই করিবে।

ব্রাহ্মসমাজ যে ত্রিধা হইয়া এই ১১ই মাঘের উৎসব সম্পাদন করিতেছেন, ইহা কেন হইতেছে এবং এই বিভিন্নতা কিরূপে মীমাংসিত হইবে, বিশ্বাসী মাত্রেরই কি ঈশ্বরালোকে অনুধাবন করা বিধেয় মনে হয় না?

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার প্রত্যেক ঘটনার ভিতর প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের হস্ত প্রথম হইতেই প্রতীয়মান হয়। রাজর্ষি রামমোহন ঈশ্বরের প্রেরণাতে প্রেরিত হইয়াই, বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়া, জড়বাদ ও পৌত্তলিক পূজার অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা বিধাতা যাহা করাইবার করাইয়াছেন এবং তখনকার অবস্থায় যতদূর করিবার তাহা তিনি করিয়াছেন।

তাহার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বিধাতাই স্বয়ং প্রণোদিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্যপদে বরণ করিলেন। তিনিই তাঁহাকে প্রেরণা দান করিয়া, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহা দ্বারা প্রবর্ত্তন করাইলেন। রাজা রামমোহন কোন সমাজ গঠন করেন নাই; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই যেমন একেশ্বরের পূজা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তেমনি একটী একেশ্বরবাদী হিন্দুসমাজও গঠন করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের আলোক অনুভব করিয়াই, বেদান্ত হইতে স্বাধ্যায়-মন্ত্র সংগ্রহ করেন। তাহার মধ্যে ঈশ্বরালোকে যাহা গ্রহণীয় বোধ করিলেন না, তাহা গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে কে না স্বীকার করিবেন যে, ঈশ্বরালোকই তাঁহারও পরিচালক। ধর্ম্মপিতার সহিত শ্রীকেশবচন্দ্রের মিলন হইল। তাহা বিধাতারই অনির্ব্বচনীয় কৌশল। মহর্ষি স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরাদেশেই কেশব-চন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া "ব্রহ্মানন্দ" নাম-করণ করেন। এবং শুধু তাই নয়, কেশবচন্দ্রের ঐশ্বরিক নিয়োগে এতদূর বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন যে, তাহার পর হইতে কেশবের আগমন বলিয়া, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে যে তাঁহার নিজের আর কোন হাত নাই, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। তাই তাঁহার আত্মজীবনী সেই পর্য্যন্ত লেখাইয়া শেষ করিলেন।'

ধর্ম্মপিতা মহর্ষিদেব যদিও শ্রীকেশবকে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার গঠিত ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে স্বীকার ও গ্রহণ করিলেন না। তাই শ্রীকেশবচন্দ্র যখন ঈশ্বর-প্রেরণা অনুভব করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মত কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন তাঁহাকে সে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন; কাজেই আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই একেশ্বরবাদের ভূমি হইতে আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না বলিয়া সেখানেই রহিলেন।

তাহার পর যাঁহারা শ্রীকেশবের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহারাও কতকদূর তাঁহার সহিত চলিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদিতে ও সংস্কার-কার্য্যে যতদূর পারেন, ততদূর তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। এইরূপে মতে, পদ্ধতিতে, বিচার, বুদ্ধি, অনুষ্ঠানে ব্রাহ্ম-মণ্ডলী কতকদূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বিধাতা যখন তাঁহাকে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বলিলেন, যখন সকল ধর্ম্মমত, ধর্ম্মানুষ্ঠান বা সমাজ-সংস্কারের অতীত অবস্থায় টানিয়া লইয়া গিয়া সমস্ত জীবনটা ব্রহ্মের হস্তে সমর্পণ করিতে, আত্মমত বলিদান করিতে বিধাতা আদেশ করিলেন, তখন তাহাতে মাথা দিতে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ কই চাহিলেন? তখন দলপতিকে তাঁহারা অবিশ্বাস করিলেন, আচার্য্যপদ হইতেও তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে চাহিলেন। তাই সেই অবস্থা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মসমাজ আর অগ্রসর হইলেন না; এবং এই স্থানেই আবদ্ধ হইয়া শুধু রহিলেন, তাহা নয়, বিধাতার আদেশকেও সন্দেহ করিয়া বিধাতার বিধাতৃত্ব অস্বীকার করিলেন। তাই কেশব দেখিলেন, ইহারা ব্রাহ্মসমাজের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পারিল, তাহার পর পারিল না।

কিন্তু বিধানের স্রোত অনন্ত, তাহা মানুষের মুখাপেক্ষা করে না, তাহা শতদ্রুর স্রোতের ন্যায় বেগবতী। যেখানে আটকাইল, সেখানে দ্বিধারা ত্রিধারা হইতে পারে, কিন্তু সাগর-সংগমে তাহা মিলিবেই।

এই যুগধর্ম্ম-বিধান ব্রাহ্মসমাজ ধারণ করিতে পারিলেন না, চাহিলেন না। মত, সংস্কার ও বাহ্য অনুষ্ঠানে ইহাকে আট-কাইয়া রাখিতে গিয়া এক সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে আবদ্ধ হইলেন শুধু নয়, বিধানকে প্রপীড়িত করিতেও উদ্যত হইলেন।

মাতা গর্ভবতী হইলে প্রথমাবস্থায় যেমন বমনাদি লক্ষণাক্রান্তা হন, কিন্তু তাহাতে গর্ভস্থ শিশু আরো পরিপুষ্টি লাভ করে এবং সন্তান প্রসূত হইবার অনতিকাল পূর্ব্বেও মাতাকে যথেষ্টই প্রসব-বেদনা সহ্য করিতে হয়, এবং যত বেদনার প্রকোপ অধিকতর হয়, ততই শীঘ্র সন্তানের প্রসব হয়, তেমনি ব্রাহ্মসমাজে যে আন্দো-লনের পর আন্দোলন, তাহা যুগধর্ম্ম বিধান নববিধান অভিব্যক্ত বা প্রসূত হইবার জন্যই হইয়াছে।

গর্ভবতী মাতার যেমন গর্ভস্থ শিশুর পরিপুষ্টির বিভিন্ন অবস্থা হয়, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের এই যে ভিন্ন ভিন্ন

শাখা, তাহা যুগধর্ম্ম-বিধানের বিভিন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল অবস্থার ভিতরেও বিধাতার হস্ত আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

গর্ভবতী মাতার গর্ভ-যন্ত্রণা যে সন্তান-প্রসবের সহায় এবং বিধাতারই বিধান, বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই ইহা স্বীকার করেন; তেমনি বিধান-বিজ্ঞান-বিশ্বাসী হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের পর আন্দোলন যে বিধান-শিশুর পরিপুষ্টির সহায়, যদি আমরা ইহা স্বীকার না করি, তবে আমরা বিধাতাকে যে বিশ্বাস করি, কেমনে তাহার প্রমাণ দিব?

ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অবস্থার সাধনক্রম পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি, আদি ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞানবিচার-সিদ্ধ নিরাকার ব্রহ্মকে, সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জন বা দুর্জ্ঞেয় অজ্ঞেয়কে "তিনি" বলিয়া স্তব স্তুতি বন্দনা যোগে উপাসনা করিয়াছেন। তাহার পর মধ্যযুগে তাঁহাকে "তুমি" সম্বোধন করিলেও, "দয়াল এসহে, দয়াল এসহে" বলিয়া যে আরাধনা করিয়াছেন, বা এখনও সাধারণ ব্রাহ্মগণ করিতেছেন, তাহাতে বুদ্ধিবিচার-সিদ্ধ ঈশ্বরেরই পূজা নিষ্পন্ন হইতেছে, তিনি এখনও দূরস্থ বা সাধকের পুরুষকার-সাধন-সাপেক্ষ হইয়া রহিয়াছেন।

কিন্তু এই ডাকের ফলে, তিনি "আমি আছি, আমি আছি" বলিয়া সাধকের নিকট যখন ক্রমে আত্মস্বরূপ আপনি প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বিধাতা বা বিধান-কর্ত্তারূপে অভিব্যক্ত হইলেন। তখনই তাঁহার সহিত সাধকের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনই তিনি মা হইয়া সাধককে দেখা দিলেন। মা যেমন আপন সদ্যপ্রসূত বা স্তন্যপায়ী শিশুকে স্বয়ং লালন পালন করিয়া গঠিত করেন, তেমনি মা সাধককে লইয়া করিতেছেন, ইহাই উপলব্ধ হইল। তাই ব্রাহ্মসমাজের তিন সাধনক্রম যে তিনটী সাধনের অবস্থা, ইহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে। সাধক মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, ধর্ম্মসাধনের ক্রম-বিকাশ আছে, অবস্থার তারতম্য আছে।

ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা তিন অবস্থার সাধনায় নিরত, প্রত্যেক সাধক যদি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া শিক্ষার্থীর ভাবে জীবন্ত ঈশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হন এবং বিধানের অধীন হইয়া দীনভাবে পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান করেন, তবে ক্রমে আপনাদের অনুদারতা, সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি ও অহংজ্ঞান ত্যাগ করিতে পারিবেন। যথার্থ ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, তিনিই সত্য আলোক প্রকাশ করিবেন। তখন পুরাতন মানবীয় ভাব দূর হইবে বা জ্ঞানাভিমান-সম্পন্ন ভাব বিনাশ পাইয়া, শিশু-প্রকৃতি বা শিশুর প্রকৃতি, নববিধান বা নবশিশুর জন্ম লাভ হইবে। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার ভিন্নতা এক নববিধানে মিলিয়া যাইবে।

ব্রহ্ম যে বিধাতা হইয়া জীবন্তরূপে আছেন, "আমি আছি, আমি আছি" বলিয়া আসিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে আর পুরাতন 'তিনি' 'তুমি' বা জ্ঞান-বিচার-বুদ্ধি-সিদ্ধ ব্রহ্ম থাকিবেন না, নববিধানের মাকে তখন মানিতেই হইবে, ১১ই মাঘ ১২ই মাঘে পরিণত হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ নববিধানে মিলিয়া যাইবে।

পরলোকগতা কবি উমা দেবী।

জন্ম—৩০শে আগষ্ট, ১৯০১।

মৃত্যু—২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১।

গতকল্য (৮ই মার্চ্চ) রবিবার প্রাতে, "বাতায়নের" কবি স্বর্গীয়া উমা দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধক্রিয়া তদীয় স্বামী শ্রীযুক্ত শিশির কুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক তাঁহার বেলেঘাটাস্থ বাসভবনে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

সুশুভ্র আস্তরণে সজ্জিত, শুভ্র সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপবাসে আমোদিত শ্রাদ্ধবাসর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে পরম আনুকূল্য করিয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লোধ মহাশয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্রহ্মোপাসনা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও উপদেশ দান করেন। শিশিরবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত সুকুমার দাস গুপ্ত, ভ্রাতৃবধূর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠের পর, চক্রবর্ত্তী মহাশয় উমা দেবীর জীবন ও "বাতায়ন"-এর কবিতার বিশিষ্টতার উল্লেখ করেন। সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথ-প্রেরিত একটি মর্ম্মস্পর্শী আশীর্ববাণী পঠিত হয়। কবি লিখিয়াছেন—

"বীণার তার হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে গান যদি অকালে স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে তার অন্তঃ-প্রবাহ শ্রোতার মনে নীরবে সমাপ্তির মুখে চল্‌তে থাকে। উমার অসম্পূর্ণ জীবন তেমনি করে অকাল মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার প্রিয়জনদের মনের মধ্যে একটি অন্তর-তর গতি লাভ করেচে। সংসারে স্নেহ দেবার এবং স্নেহ পাবার ইচ্ছা তা'র জীবনে সব চেয়ে একান্ত ছিল। ফুল যেমন আলো চায় এবং গন্ধ দেয়, সে তা'র অল্পায়ু জীবলীলায় তেমনি করেই প্রীতি দিয়েচে এবং নিয়েচে। সেই দেওয়া নেওয়ার অবসান হোলো এখন একথা মনে করে যেন বিলাপ না করি। জীবিত কালেই সে অনুভব করেছিল যে, তার স্পর্শশক্তি মৃত্যুর অন্তরাল অতিক্রম করেচে; আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন মনে করি যে, তা'র আত্মিক শক্তি ইহলোক পরলোকের মাঝখানে আত্মীয়তার সেতু রচনা করে আছে এবং আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে শোকস্মৃতির অর্ঘ্য গ্রহণ করে এই মুহূর্ত্তেই তা'র হৃদয় স্নিগ্ধ হোলো। তা'র আত্মা শান্তি লাভ করুক, তৃপ্তি লাভ করুক, মর্ত্ত্য জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা থেকে মুক্তি লাভ করুক এই কামনা করি।"

শ্রাদ্ধক্ষেত্রে বহুজন-সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শিশির

কুমার গুপ্ত মহাশয়ের কয়েকটি ইংরাজ বন্ধুও সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন।

(২৫শে ফাল্গুনের "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত)

সংবাদ।

শুভবিবাহ—গত ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, বাঁকিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত দামোদর পালের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মলিকার সহিত শ্রীহট্টের জলসুকা-নিবাসী স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ রায়ের মধ্যম পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ রায়ের শুভবিবাহ শ্রীহট্টে দামোদর বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র তত্রত্য স্বাস্থ্যবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর ডাঃ সচ্চিদানন্দ হোসেন পালের গৃহে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাগলপুরের অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু এই শুভবিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। ভগবান্ এই নব দম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

নামকরণ—গত ৮ই মার্চ্চ, শ্রীহট্টে, তত্রত্য স্বাস্থ্যবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর ডাঃ সচ্চিদানন্দ হোসেন পালের শিশুপুত্রের শুভনামকরণ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন এবং শিশুকে "সুবীর" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

দানপ্রাপ্তি—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

আলিপুর পশুশালার ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসু ভ্রাতৃগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, গত ১১ই জানুয়ারী, গিরিডীতে যে মাতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তদুপলক্ষে নববিধান প্রচারাশ্রমে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (I. C. S. Re ired) পুত্রের শুভবিবাহে নববিধান প্রচারাশ্রমে ২৫৲ টাকা এবং নববিধানের পুস্তক-মুদ্রাঙ্কণ ফণ্ডে ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বার্ডকোম্পানির ইণ্ডিয়ান্ পেটেণ্ট ষ্টোন ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্ত পত্নী উমা দেবীর শ্রাদ্ধে নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ৩০৲ টাকা, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ১০৲ ও ব্রাহ্মরিলিফ ফণ্ডে ১০৲ টাকা এই ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

পরলোকগমন—গত ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, অপরাহ্ণ আড়াইটার সময়, ময়মনসিংহের অন্তর্গত শেরপুর-নিবাসী ডাক্তার বনওয়ারীলাল চৌধুরী অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হওয়াতে, পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে, অদৃশ্য লোকে পরম মাতার ক্রোড়ে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি এডিনবরা হইতে বিজ্ঞানে ডাক্তার উপাধি (D. Sc.) লাভানন্তর, কলিকাতার ভারতীয় মিউজিয়মে জুলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে সুখ্যাতির সহিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়া, গত ১৯২১ সনে অবসর গ্রহণ করেন। দেশহিতকর নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ ছিল। অমায়িক হৃদয়ের সরল সুন্দর ব্যবহারে তিনি সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে অনেককেই আপনার করিয়াছিলেন। আজ সকলেই তাঁর জন্য দুঃখিত। আজ আমরা তাঁহার সহধর্ম্মিণী, কন্যা, ভ্রাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি আমাদের হৃদয়ের শোকসহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। অদ্য ১লা চৈত্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হলে তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে অনন্তশান্তিধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত জনের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ৮ই মার্চ্চ, রবিবার, ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগত স্নেহের পুত্র শ্রীমান্ অকিঞ্চন-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহাদের বাঁকীপুরস্থ বাসভবনে সুগম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভ্রাতা ডি, এন, সেন ও ভ্রাতা নিরঞ্জন নিয়োগীর সহকারিতায় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। ভ্রাতা সত্যসুন্দর বসু, শ্রীমতী বনলতা দেবী ও প্রেমলতা দেবী সঙ্গীত করেন। পুত্র শ্রীমান্ সন্ধ্যামণি চট্টোপাধ্যায় প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে একটী নূতন গান গীত হয়। স্থানীয় বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়স্থ অনেক বন্ধু বান্ধব ও মহিলা এই অনুষ্ঠানে যোগ দান করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হয় :—

বাঁকীপুর নববিধান মন্দির ১০৲, বাঁকীপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ৫৲, কলিকাতা নববিধান মিশন ফণ্ড ১০৲, কলিকাতা অনাথাশ্রম ৫৲, ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, দরিদ্রসেবার জন্য দেড়মণ চাউল, পনর সের ডাল ইত্যাদি।

অদ্য ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, কিশোরগঞ্জের স্বর্গীয় জগন্মোহন বীরের পবিত্র আত্মশ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহার পুত্রকন্যাগণকর্তৃক কলিকাতায়, ৭নং বজ বজ রোডে, রাজাবাগে, কনিষ্ঠপুত্র ময়ূরভঞ্জের মহারাজার প্রাইবেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বীরের কর্ম্মস্থলে, রাজবাটীর মুক্ত প্রাঙ্গণস্থিত সমাধিমন্দিরের নিকটস্থ সুন্দর সুসজ্জিত পটমণ্ডপে গম্ভীরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" কীর্ত্তন করিতে করিতে পবিত্র ভস্মাধার প্রার্থনানন্তর উপাসনাস্থলে রক্ষিত হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, ভাই বিহারীলাল সেন ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ শ্লোকপাঠে সহায়তা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সর্ব্বশেষে একটী প্রার্থনাও করেন। জ্যেষ্ঠ

পুত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন বীর পিতৃদেবের সুদীর্ঘ জীবনের সংক্ষিপ্ত সুন্দর জীবনী পাঠান্তে প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মধুর সঙ্গীত করেন। অমর-জননী তাঁহার অমর সন্তানের সরলবিশ্বাসপূর্ণ মিষ্ট মধুময় জীবন প্রকাশ করিয়া অনুষ্ঠানটীকে সকলের প্রীতিপদ করিয়া ছিলেন। পবিত্র অনুষ্ঠানে ময়ুরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী, রাউতরাও সাহেব শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও, আচার্য্যদেবের পুত্রকন্যা প্রভৃতি মণ্ডলীর গণ্যমান্য অনেকে উপস্থিত হইয়া মণ্ডলীর বয়োজ্যেষ্ঠ শতজমবর্ষীয় বিধান-বিশ্বাসীর প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিয়াছেন।

এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ২৫৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ২০৲, বালকদিগের নীতিবিদ্যালয়ে ১০৲, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ে ১০৲, ব্রাহ্মরিলিপ ফণ্ডে ১০৲, নববিধান ট্রাষ্টের কান্তিচন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে ১০৲, ভগ্নীসমিতি ১০৲, অনাথ আশ্রমে ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲, নববিধানের পুস্তক-মুদ্রাঙ্কন ফণ্ডে ১০৲, জনৈক বিধবা ৫৲, ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, গিরিধি নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, ময়মনসিংহ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, কানপুরে রামকৃষ্ণ আশ্রম ৫৲, অনাথ আশ্রম ৫৲, বঙ্গসাহিত্য সমাজ ৫৲, বিধবা আশ্রম ৫৲, ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, কিশোরগঞ্জ হাসপাতালে ১০৲, এবং কিশোরগঞ্জের কাঙ্গালীদিগের জন্য চারি মণ চাউল ও অন্ধ আতুরদের জন্য পাঁচ জোড়া কাপড় উৎসর্গিত হইয়াছে।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁর নিত্য স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি সান্ত্বনা ও বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা মার্চ্চ, রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণ ৭॥টায়, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচারকার্য্যালয়ে, স্বর্গগত ভক্তভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই বিহারীলাল সেন, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ও শ্রীমতী মাধম বসু বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু গীতাসমন্বয়ভাষ্য হইতে উপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের বিশেষ নিয়োগ ও কার্য্য বিষয়ে আত্মনিবেদন পাঠ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী মাধম বসু প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করেন। অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ ও আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস "ধর্ম্মদর্শ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" নামক উপাধ্যায়-প্রদত্ত বক্তৃতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কথাবার্ত্তা হয়।

অদ্য বাঁকিপুরে উপাধ্যায়ের পৌত্রী-জামাতা শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ পাড়ুলের গৃহেও বিশেষ উপাসনা হয়। পৌত্রী শ্রীমতী চিত্তভোষিনীর আগ্রহে অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। স্থানীয় কেহ কেহ উপস্থিত হইয়া যোগদান করেন।

অদ্য পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ১০টায়, নবদেবালয়ে, স্বর্গগতা আচার্য্যপত্নী সতী জগন্মোহিনী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা হয়। আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী উদ্বোধন ও মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমতী হেমলতা চন্দ, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

উৎসব—ভাগলপুরের বন্ধুগণ তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের সপ্তষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা হইতে তথায় গিয়াছিলেন। উৎসবের বিবরণ হস্তগত হইলে পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বক্তৃতা—গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, অধ্যাপক সুখেন্দুকুমার দাস এম, এ, (Ph. D) উপনিষৎ বিষয়ে অভিজ্ঞতাপূর্ণ সুন্দর বক্তৃতা দান করিয়াছেন। তাঁর বক্তৃতার মর্ম্ম পরে দেবার ইচ্ছা রহিল।

পুস্তক-সংবাদ।

গত মাঘোৎসবের সময় আমরা Thacker Spink & Co. হইতে শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ইংরাজী জীবনী (The Life and Teaching of Keshub Chunder Sen By P. C. Mozoomder) ক্রয় করিয়া লই।

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এই একমাসের ভিতর আমরা উহার ১১ খানি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যে, গত ৫। ৬ বৎসরে উক্ত পুস্তক মাত্র তিন খানি বিক্রীত হয়। আমরা চিরঞ্জীব-প্রণীত "কেশবচরিত" ছাপাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি এবং আশা করি, বৈশাখের পূর্ব্বেই ইহা সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীসত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক, নববিধান সাহিত্য-প্রচার সভা,

৮৯ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্তৃক ৪ঠা চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
১৬ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৭ সাল, ১৮৫২ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
30th March, 1931.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা।

মা, তুমি ত স্বয়ং বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধান প্রবর্ত্তন করিয়া বলিতেছ, "আমি আছি।" সত্যই সত্যরূপে তুমি আছ, জ্ঞানরূপে তুমি সকলই দেখিতেছ জানিতেছ, মনের মন পর্য্যন্ত তুমি জান, তুমি অনন্ত শক্তি হইয়া সকলই পূর্ণ করিয়া আছ; তুমি যে প্রেমের আধার, পূর্ণ প্রেম ভালবাসা বই তোমাতে ত আর কিছুই নাই; তুমিই এক সর্ব্বেশ্বরী, তোমা বই জগতের কর্ত্রী ভর্ত্রী নিয়ন্ত্রী আর কেহই নাই; পূর্ণ শুদ্ধতা-বলে তুমি সকল পাপ ধ্বংস কর, সকল পাপ মোচন কর এবং সর্ব্ব দুঃখ হরণ করিয়া নিত্য শান্তি, নিত্য আনন্দ বিধান কর। এই মানব-জীবন ব্রহ্মানন্দময় করিবার জন্যই তুমি আছ, যদি ইহাই তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দিয়াছ, তবে কেমন করিয়া আমি তোমা ছাড়া স্বতন্ত্র একজন হইয়া থাকিতে পারি বা আমি কর্ত্তা হইয়া এটা আমার ধর্ম্ম, ওটা আমার কর্ম্ম, ইহাই বলিতে পারি? কিম্বা আমি আমার পরিত্রাণের উপায়ও কি করিতে পারি? তোমাকে বিধান-কর্ত্রী বলিয়া যখন বিশ্বাস করিয়াছি, তখন আমার হাতে আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু আছে, ইহা কখনই ত বলিতে পারি না। বিধান মানার অর্থ, তোমার হাতে আমার 'আমিকে' একবারে ছাড়িয়া দেওয়া; সম্পূর্ণ আমিত্ব-ত্যাগ, আত্ম-বলিদান, আত্ম-সমর্পণ বিনা বিধান মানা হয় না। আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, আমার সাধন ভজন, আমার পুরুষকার কিম্বা কোন প্রকারে 'আমি আমার' গন্ধ পর্য্যন্ত যদি থাকে, তবে আমি তোমার বিধান মানি না, তবে আমি তোমার নববিধানের লোকই নই। তিনিই কেবল নববিধানের লোক, যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বলেন, "কোথায় আমার আমি, সে আমি নাই, এ খাঁচা হইতে সে আমি-পাখী উড়িয়া গিয়াছে, আর কখনই ফিরিবে না।" মা, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। আমার আমি-পাখী কতবার উড়িল, আবার ফিরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া আমার জীবন মন অধিকার করিয়া, আমাকে তোমার বিধান মানিয়াও মানিতে দিল না। সে আমি তোমার "আমি আছি" ধ্বনি মুখে বলিয়াও তোমার সিংহাসনে আপনাকে বসাইয়া ধর্ম্মদ্রোহী হইল। আর কেন? এবার সত্য সত্য তুমি তোমার এ প্রাণ-সিংহাসন অধিকার করিয়া, যথার্থ তুমিই আমার "আমি আছি" হও। তোমার নববিধানের বল তুমি প্রদর্শন কর। আমার 'আমি' ত সত্য আমার নয়। আমার ধর্ম্ম, আমার পরিত্রাণ ত আমার হাতে নয়, তাহা ত আমার সাধন-সাপেক্ষও নয়। আমি যে তোমার, "তোমারই চির দিন আমি হে" ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর। দোহাই তোমার

নববিধানের! যেমন তোমার নববিধান-মূর্ত্তিমান জীবনে দেখাইয়াছ, তেমনি আমার ন্যায় আমিত্বস্ফীত যাহাদিগকে তোমার নববিধানের আশ্রয়ে আনিয়াছ, সবারই "আমি-পাখী" চিরতরে উড়াইয়া, তোমারই করিয়া নাচাও, গাওয়াও, উৎসব করাও, তোমারই হাতের যন্ত্র করিয়া জীবনে নববিধান মূর্ত্তিমান করিয়া লও। ইহাই আমাদের কাতর প্রার্থনা, তুমি ইহা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

নববিধানের স্বর্গরাজ্য।

এখন মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়াই আমরা বিচরণ করিতেছি। একে একে আমাদের ধর্ম্মপিতামহ ও ধর্ম্মপিতা এবং আমাদের প্রিয় অগ্রজ ও নেতা প্রেরিত সঙ্গিগণ সঙ্গে দেহপুর-বাস ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন; আবার কত আত্মজন, প্রিয়জন, প্রাণ-প্রিয়ধন আমাদের বক্ষে বজ্র হানিয়া, আপনাদের দিব্য দেহকে ভস্মে পরিণত করিয়া, সেই অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা সকলেই কি আমাদের চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া, আমাদিগকে নয়নাশ্রুতে ভাসাইয়া, শিখাইয়া দিয়া যাইতে-ছেন না, "সেই গম্যস্থান, হেথা অবস্থান, কেবল দুদিনের তরে?" কিম্বা ঈশা যেমন ক্রুশে আত্মাহুতি দিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই বলিয়া গেলেন, "আমি আমার পিতার বাড়ীতে গিয়া তোমাদের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিব।" ইঁহারাও প্রত্যেকেই কি তাহাই আমাদিগকে বলিয়া যাইতেছেন না?

বাস্তবিক নববিধানের আলোকে আমরা বিলক্ষণ জানিয়াছি, মৃত্যু কিছুই নয়, ইহা একটী ঘটনা মাত্র, দেহ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্যই মৃত্যু বিধাতার এক বিশেষ বিধান। দৈহিক জীবনের বিনাশ সংসাধন দ্বারা মৃত্যু সত্যই আমাদের অমৃতের সোপান হইয়া থাকে। কেন না, তাহাতে দৈহিক জীবনের পাপ তাপের নূতন উদ্গম প্রশমিত হইয়া যায়, আত্মা অমরত্ব-লাভের জন্য পিপাসিত হয়। তাই মৃত্যু আপাততঃ ভয়ঙ্কর বোধ হইলেও, ইহা সত্যই বিধাতার এক বিশেষ মঙ্গল বিধান। ইহাতে দেহান্তে আত্মা অমরত্বে প্রবেশ করে ও ব্রহ্ম-সংযোগে ক্রমে অমরলোকবাসিগণের সহিত মিলিত হয়।

আমাদের এই ব্রহ্মোপাসনাও একভাবে দৈহিক জীবনের মৃত্যু-সাধন। এই উপাসনার অবস্থায় আমরা যেমন বাহিরের অবস্থা নিরোধ করিয়া ব্রহ্ম-সহবাস সাধন করি, মৃত্যু সহজে সেই অবস্থাই বিধান করে। সজ্ঞানে সচেতনে ব্রহ্ম-সহবাসে বাস করাই ত মুক্তি, মৃত্যু দৈহিক জীবনের সেই মুক্তি বিধান করিতেই নির্দ্দিষ্ট। বাস্তবিক উপাসনা-সাধন দ্বারা মন যদি এই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে যেমন আমরা প্রার্থনা করি, "অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও", এই মৃত্যুতে তাহাই আমরা লাভ করি এবং সত্যস্বরূপের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তাই বলি, আমাদের এই উপাসনা-সাধনই যথার্থ মৃত্যু-সাধন বা দৈহিক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি-সাধন। তবে আর আমরা মৃত্যুকে কেন ভয়ঙ্কর মনে করিব? আমাদের দৈহিক জীবন বা পুরাতন পাপ জীবন হইতে মুক্ত বা মৃত হইয়া নবজীবন বা দ্বিজত্ব-লাভের জন্যই আমরা উপাসনা সাধন করি। মৃত্যুও আমাদিগকে সেই দ্বিজত্ব দিবার জন্য বা আত্মাকে আত্মস্থ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট।

প্রিয়জন আত্মীয়গণের মৃত্যুও কি এ বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সহায়তা দান করেনা? তাঁহারা দেহ-মুক্ত হইয়া আমাদিগের প্রাণকেও দেহ-মুক্তির জন্য কতই আকাঙ্ক্ষিত করেন। আবার তাঁহাদের বিচ্ছেদ-শোক শেলরূপে আমাদের প্রাণে বিদ্ধ হইয়া, আমাদের শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও স্পৃহা হইতে মনকে ফিরাইয়া, পরলোকের দিকে কত সহজেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে ব্রহ্মবক্ষে তাঁহারা আরোহণ করেন, তাঁহারই দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়া যায়, সহজেই সংসারে বৈরাগ্য আসিয়া হৃদয়কে ব্রহ্ম-সহবাসের জন্য পিপাসু করে। এ সময় হাসি অপেক্ষা কান্নাতে অধিক আরাম বোধ হয়, আহার পান আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা দৈন্য-ভাবই আরামপ্রদ হয়, এবং ব্রহ্মের সঙ্গে ও ব্রহ্মলোকবাসী যত অমরাত্মা সাধু ভক্ত মহাজনগণের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রাণে উদ্দীপিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর-পিপাসাই যেমন ঈশ্বর-লাভের উপায়, তেমনি স্বর্গলোক বা অমরত্বের পিপাসাতেই স্বর্গরাজ্য আমাদের দেহে, গেহে ও মণ্ডলীতে লাভ হইয়া থাকে। তাই পৃথিবীতে এই

স্বর্গরাজ্য বা যথার্থ স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের ব্রহ্মোপাসনা এবং এই নববিধানও তাহারই জন্য অবতীর্ণ।

স্বরাজের অর্থ স্বাধীনতার রাজ্য। পৃথিবীতে যে অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, নববিধান তাহাতে সায় দেন না। নববিধান বলেন, ঈশ্বরের বিধানের অধীনতায় যে স্বাধীনতা, স্বর্গরাজ্যে সেই স্বাধীনতায়ই সকলে সম্মিলিত। ঈশা বলিলেন, "There are many mansions in my Fathers house" এই স্বর্গরাজ্যে প্রত্যেকের স্বাধীন বিশিষ্ট গৃহ আছে, অথচ পরস্পরের সহযোগিতায় সকলে এক পরিবার। বৈচিত্রে একত্ব, ইহাই নববিধানের স্বর্গরাজ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে গ্রাস করিয়া আপনাদের অনুরূপ স্বর্গ কল্পনা করিয়াছেন। অর্থাৎ খ্রীষ্টান বলেন, সকলে খ্রীষ্টান না হইলে কেহ স্বর্গে যাইতে পারিবেনা; মুসলমান বলেন, সকলে মুসলমান না হইলে কেহ স্বর্গ পাইবেনা; হিন্দুও হিন্দু ভিন্ন কাহারও স্বর্গ-লাভের সম্ভাবনা আছে, বিশ্বাস করেন না। এইরূপ সাম্প্রদায়িক স্বর্গ বা স্বরাজ নববিধানের স্বর্গরাজ্য নয়। নববিধান বলেন, প্রত্যেকের বিশিষ্টতা ও পরস্পরের সহযোগিতায় প্রকৃত স্বর্গলাভ হইবে।

হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, খ্রীষ্টানের খৃষ্টানত্ব, প্রাচ্যের প্রাচ্যত্ব, প্রতীচ্যের প্রতীচ্যত্ব সমুদয় সম্মান করিয়া, সকলকে এক রাজ্যে, এক মণ্ডলীতে, এক ঈশ্বরের বক্ষে মিলিত দেখাই নববিধানের স্বর্গ। ঈশ্বর যেমন কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, যেমন বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রাদির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সত্বেও এক আকাশ সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তেমনি নববিধান সকলকে আপন আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

তাই বলি, আমাদের পুরাতন আমিকে আমাদের মতের গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া বা তাহা মৃত করিয়া আত্মস্থ হইয়া, আত্ম-যোগে সকল সম্প্রদায়কে, সকল মানবকে যদি প্রেম-যোগে গ্রহণ করিতে পারি, তবে আমরা নববিধান-বিশ্বাসিরূপে স্বর্গে স্থান পাইব।

নববিধান কোন সম্প্রদায় বা মণ্ডলীতে আবদ্ধ নয়। আমরা যে "নববিধান সমাজ" বলি, ইহাও শব্দ-বৈষম্য মনে হয়। সীমাবদ্ধ সমাজ যেখানে, গণ্ডী যেখানে, পার্থিব সাম্প্রদায়িক বাঁধন যেখানে, সেখানে নববিধান নাই। আকাশ বাতাস যেমন সর্ব্বব্যাপক হইয়া সকলকে আপনার ভিতর স্থান দিয়া রাখিয়াছে, নববিধান তেমনি সকল সম্প্রদায়কে, সকল ধর্ম্মকে যেমন মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, তেমনি সকলকে আপন বক্ষে মিলাইয়া এক অখণ্ড স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। যেমন প্রত্যেক মানবকে পুরাতন জীবন হইতে মুক্ত করিয়া নব জীবন দিতে নববিধান আসিয়াছেন, তেমনি হিন্দু, এস্‌লাম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মকেও নবজীবন দিবার জন্য নববিধান আসিয়াছেন; আবার সকলকে স্বর্গীয় মিলনে মিলাইবার জন্যও ইহা সমাগত। ব্রাহ্মসমাজেরও নবজীবন এবং নব-সমন্বয়-মিলন বিধান জন্য নববিধান আসিয়াছেন।

এই দেহের মৃত্যুই মৃত্যু নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আমিত্ব বা অহং যেমন, সমাজের সাম্প্রদায়িকতা বিবাদ বিভিন্নতাও তেমনি আমাদের মৃত্যুরই কারণ। নববিধান সে মৃত্যু থেকেও সকলকে মুক্ত করিতে আগমন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ এই যে ত্রিধা হইয়া পরস্পরের সহিত সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা আনয়ন করিতেছেন, ইহাও এ সমাজের মৃত্যুর লক্ষণ। নদীর স্রোত শুকাইয়া গেলে তাহাতে নদী দ্বিধা ত্রিধা হইয়া মধ্যে মধ্যে চড়া পড়িয়া যায়, তখন কুকুর শৃগালও তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। তেমনি এই যে ব্রাহ্মসমাজে চড়া পড়িয়া ত্রিখণ্ড করিয়াছে, ইহাকে মহামিলন-স্রোতে প্লাবিত করিতেই নববিধান আসিয়াছেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিশিষ্টতার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া, এক নববিধানের মহামিলনে যদি মিলিত হইতে পারি, তবে পৃথিবীতে যথার্থই স্বর্গরাজ্য আসিবে।

মৃত্যু-সাধন অবলম্বনে আমিত্বের মৃত্যু সংসাধন করিয়া পরলোকগত আত্মাগণ যেমন স্বর্গধামে ব্রহ্মবক্ষে মহামিলনে মিলিত, তেমনি আমরাও যেন প্রকৃত উপাসনা-সাধনে আমাদের আমিত্ব স্বামিত্ব স্বাতন্ত্র্য সাম্প্রদায়িকতা ও ভিন্নতা হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্ব-সম্মিলন-সম্পাদনে নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন করি এবং ধরায় স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে পারি, নববিধান-বিধায়িনী জননী আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

কর্ণের রোগ।

কাণে ময়লা জমিয়া থাকিলে শ্রবণ-শক্তি যায়। বিবেক-কাণেও পাপ অবিশ্বাস জমিয়া গেলে ঈশ্বরের বাণী শুনা যায় না।

আপনার দোষ।

আলোর বিপরীত দিকে আপনারই ছায়া পড়িয়া থাকে। যখনই আয়নায় মুখ দেখি, আপনারই মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। তেমনি যখনই আমি না জানিয়া ভাইকে কোন দোষারোপ করি, অনেক সময় আমার নিজের ভিতরের দোষই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আমার আপনার ভিতর যে দোষ আছে, তাহাই ভাইয়ের উপর আরোপ করি।

ভগবানের প্রকাশ।

প্রকৃতির মধ্যে পাহাড়ে, বনে, আকাশে, সাগরে, চন্দ্রে ও সূর্য্যে ঈশ্বর অধিকতর প্রকাশমান। মানুষের মধ্যেও যিনি অটল বিশ্বাসে পর্ব্বত সমান, দয়া ক্ষমা ও পরোপকারে বনের মত সুশোভিত, উদারতা ও উন্নত মনে আকাশ সদৃশ, মহাপ্রেমে সাগরসম, ভক্তি প্রীতিতে চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল এবং পুণ্য পবিত্রতায় সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়, ভগবান্ তাঁহারই জীবনে অধিকতর প্রতীয়মান হন।

পাপ ও অবিশ্বাস।

শ্রীনববিধান-প্রবর্ত্তক বলেন, "প্রেমসিন্ধু, তুমি বলিতেছ, আমি অবিশ্বাসীকে তো ক্ষমা করি না। আমি পাপীকে ক্ষমা করি; আমি দুরন্ত পাপীকেও বুকে করি, কিন্তু অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করি না।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাপ মানুষের রোগ, মানুষের অপূর্ণতা হেতু দুর্ব্বলতা হইতেই পাপের উৎপত্তি; সুতরাং দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপে পড়িয়া যদি আমরা অনুতাপ করি, নিশ্চয়ই ঈশ্বর আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। রোগা ছেলেকে মা যেমন কোলে তুলিয়া লন তেমনি জগজ্জননী নিজ ক্ষমা ও প্রেমগুণে আমাদিগকে পাপ-রোগ হইতে মুক্ত করিয়া কোলে তুলিয়া লন। কিন্তু যদি তাঁহাকে অবিশ্বাস করি, তাঁহার বিধানকে না মানি, আমরা ক্ষমা পাইব কি প্রকারে? তাই আচার্য্য বলেন, "অবিশ্বাস বড় ভয়ানক, অবিশ্বাস করিলে নরকে যাবে, এটা নিশ্চয়।" সত্যই পাপ যে রোগ, বিশ্বাস যে তাহার ঔষধ। পাপ করিলে বিশ্বাসে তাহা আরোগ্য হয়, কিন্তু বিশ্বাস না থাকিলে পাপ-নরক হইতে উদ্ধারের উপায় কি?

ব্যক্তিগত ও দলগত সাধন।

নির্জ্জনে, বনে, মনে, কোণে একা একা ধর্ম্মসাধন আমাদের দেশে জাতিগত মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। সজনে দলগত ভাবে ধর্ম্মসাধন এ দেশে সাধারণতঃ তত উচ্চ সাধন বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। পূজা যাগ যজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান যদিও সজনে, সদলে সম্পাদিত হয়, তাহাও নিম্ন অধিকারীর বাহাড়ম্বর, ইহাই উচ্চ সাধনার্থীদিগের সংস্কার বা ধারণা। যাহা হউক, ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনই যে ধর্ম্মসাধন, এই ভাব হইতে ব্যক্তিত্বের ধর্ম্মই আমাদের যেন প্রকৃতিগত হইয়াছে। তাহা হইতেই ধর্ম্মরাজ্যে এত স্ব স্ব প্রাধান্য-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নববিধান ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-স্বাধীনতার সঙ্গে দলগত ধর্ম্মসাধনার সমন্বয় বিধান করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু এক কেশব-জীবন বিনা, এই ব্যক্তিগত ও দলগত সাধনের সমন্বয় কেমনে হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত আর কেহ ত জীবনে আমরা দেখাইতে পারিতেছিনা। অথচ ধর্ম্মসাধনের উৎকর্ষ ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বেশ দেখাইয়া ধন্য হইতেছি। বাস্তবিক দলগত মিলিত জীবন, যাহা নববিধান আমাদের নিকট চান, তাহা প্রদর্শনে আমরা কই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি? নববিধানের দল পাঁচজনের স্ব স্ব প্রাধান্যের দল নয়, কিন্তু পাঁচজনে মিলিয়া একই জন হওয়ার দলই নববিধানের দল। প্রত্যেকের ধর্ম্ম-স্বাধীনতা-সঙ্গত সাধনা সত্ত্বেও পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া, এক অখণ্ড দেহধারী মানবত্ব প্রদর্শন করাই নববিধানের উদ্দেশ্য। এই উচ্চ আদর্শ জীবন দেখাইলেন যেমন নববিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ, তেমনি তাঁহার সহিত একাত্মতা অবলম্বনে, আমরাও পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া যদি দলগত নিজ নিজ ধর্ম্ম এক ব্যক্তিতে নিমজ্জিত করিতে পারি, তবেই নববিধানের উদ্দেশ্য সাধন হয়।

কল্যাণী উমা দেবী।

(শ্রাদ্ধবাসরে, ভাসুর শ্রীযুক্ত সুকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক পঠিত)

চারিটী বৎসর মাত্র ইহলোকে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করিয়া কল্যাণী উমা দেবী, আমার ভগিনীসম ভ্রাতৃজায়া স্নেহের পুতুল, পরম পিতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিচ্ছেদ এত অকস্মাৎ হইয়াছিল যে চক্ষু তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই, মন তাহা ধারণা করিতে পারে নাই। দুইটী সপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছে, কিন্তু আজও চক্ষু তাঁহাকে এই গৃহের ঘরে ঘরে খুঁজিয়া বেড়ায়; তাঁহার সরল হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি আর দেখিতে পাইব না এই কথাটী যেন কল্পনা করিয়াই লইতে হয়।

সুখ ও দুঃখের ভিতর গৃহদেবতা নিয়তই বলিতেছেন, "সন্তান, আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যাও; যাহা মঙ্গল আমি তাহা

বিধান করিব।" তাই আজ এই পুণ্যক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলে সমবেত হইয়াছি—ইহলোক ও পরলোক উভয়ের মিলন প্রাণে অনুভব করিব; বিদেহী সকল প্রিয়জনের মধ্যে উমা এখানে আজ উপস্থিত; তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রাণে শান্তি লাভ করিব ও পরম পিতার নিকট তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া কৃতার্থ হইব। এই আশা।

ইং ১৯২০ সালের ৪ঠা জুলাই উমা আমাদের গৃহে বধূরূপে আসিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বের কথা আমার বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। তাঁহার পিসিমা, ভগিনী, বাল্যসখী ও অন্যান্য সকলের নিকট এই বিদেহী আত্মার যে স্মৃতিপূজা পাইয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

কল্যাণী উমা যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কলুটোলার বিখ্যাত সেন বংশ। এই বংশেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ পরিবারকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই জ্ঞাতি খুল্লতাত দেওয়ান মাধবচন্দ্র সেন নানা সদ্‌গুণের আধার ছিলেন; দানে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা মুক্ত থাকিত। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, উমার পিতামহ স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ দেবের প্রিয় শিষ্য হন। তিনি শেষ জীবনে কুচবিহার কলেজের প্রফেসার ছিলেন। উমার পিতামহী স্বর্গগতা নিস্তারিণী দেবী ঠাকুরাণী পতিভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত পরিবারের সকলের প্রতি সমভাবে সুমিষ্ট ব্যবহার করিয়া নিজের জীবনখানি মধুময় করিয়াছিলেন। এই পিতামাতার জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন। তাঁহার সুন্দর জীবনখানি আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ভিতর কাহারও অপরিচিত নহে। চরিত্রের পবিত্র সৌরভে, পাণ্ডিত্যের সহিত বালকোচিত সরল ব্যবহারে, দৃঢ় সত্যনিষ্ঠার সহিত অকৃত্রিম ভালবাসার মিশ্রণে মোহিতচন্দ্রের জীবন বাস্তবিক সকলের প্রাণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পত্নী স্বর্গগতা সুশীলা দেবী গৌরিভা-নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। তাঁহার জীবনও বহু সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল। ইঁহাদিগের বিবাহিত জীবন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ভাব উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিত। এই পিতামাতার গৃহে তাঁহাদের তৃতীয়া কন্যা স্নেহের উমা ইং ১৯০৪ সালের ৩১শে আগষ্ট, মঙ্গলবার, জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অল্প দিনের মধ্যেই হারাইয়া ছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী সম্প্রতি কাটিহারে তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত অজয়কুমার গুপ্তের গৃহে বাস করিতেছেন। ভগবানের বিচিত্র বিধানে তিনি আজ কনিষ্ঠা ভগিনীর পার্থিব শেষ চিহ্নটুকু ও মাতৃহারা স্নেহের পুত্তলীকে পার্শ্বে লইয়া সেই মঙ্গলময়ের চরণে উপস্থিত হইয়াছেন।

উমার বয়স যখন মাত্র এক বৎসর দশ মাস, তখন তাহার পিতৃদেব হঠাৎ পরলোক গমন করিলেন। দুঃখিনী মাতা একাধারে পিতামাতা হইয়া কন্যা দুইটীকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ কিছুকাল ভাগলপুরে থাকিয়া, তারপর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কন্যাদিগের শিক্ষার জন্য বোলপুর ও গিরিধি প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল কাটাইয়া পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং প্রায় বৎসরাবধি উমার পিসিমাতার বাড়ীতে বাস করেন। এই সময় উমার দিদিমাতা ঠাকুরাণী ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সুশীলা দেবী কন্যাদিগকে লইয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই বাড়ীতে আসিয়া সুশীলা দেবী রোগাক্রান্ত হন এবং দুই তিন মাস রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, ১৯১৫ সালের ২রা আগষ্ট স্নেহের কন্যাদিগকে পিসিমাতার হস্তে অর্পণ করিয়া পরলোকে চলিয়া যান। তখন মীরা ১৩ বৎসরের ও উমা ১১ বৎসরের।

১৯১৬ সালের প্রথমে এই পিতৃমাতৃহীন কন্যা দুইটী তাঁহাদের খুল্লতাত স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র সেন মহাশয়ের গৃহে গমন করেন এবং তাঁহাদিগের আদর যত্নে প্রতিপালিত হইতে থাকেন।

এই সময় উমা বেথুন স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার সহপাঠীর নিকট এই সময়ের যে ছবিখানি পাইয়াছি, তাহা অতি সুন্দর। আমোদপ্রিয় বালিকা সহপাঠীদের বই লুকাইয়া রাখিয়া, নিত্য নূতন উপায়ে পাণ্ডিত মহাশয়কে বিরক্ত করিয়া শাস্তি ভোগ করিতেন, আবার নানা প্রকার গল্প ও অনুকরণ করিয়া সকলকে হাসাইতেন। কবিতা ও ছোট ছোট গল্প লিখিবার শক্তি এই সময় হইতেই প্রকাশ পাইতেছিল। সহপাঠীরা হাতে লিখিয়া একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেন। এই পত্রিকাতে মাতৃহারা বালিকা-হৃদয় হইতে যে ব্যথা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা আজও বাল্যসখীর মনে পরিস্ফুট রহিয়াছে। উমা লিখিয়াছিলেন :—

"ধোপাদের ছোট ছেলে মাকে সে হারিয়ে ফেলে
কাঁদিতেছে সারাদিন ধরে।
আর তার নাহি কেহ করিবারে যত্ন স্নেহ
তুলিবারে কোলে ওগো তারে॥"

এই বাল্যরচনার বিষয়বস্তু মাতৃহারা শিশুর ব্যথা অবলম্বন করিয়াই পরিণত বয়সে উমা তাঁহার "বাতায়ন" কাব্যে কয়েকটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

অভিনয় করিবার শক্তি এই সময় হইতেই প্রকাশ পাইতে-ছিল। সমবয়সী বালক বালিকাদের লইয়া, কখনও সন্তানসম শিশুদের লইয়া, কত অভিনয় করিয়াছেন!

সুমিষ্ট কণ্ঠ, মধুর সঙ্গীতে কতজনকে তৃপ্ত করিয়াছেন! সুর সাধনা এত সহজ ও স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, একবার শুনিয়াই কত সঙ্গীতের সুর ও কথা আয়ত্ত করিয়াছেন!

ভগবানের কৃপায় ১৯১৯ সালের মে মাসে উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মীরা গৌরিভা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অজয় কুমার গুপ্তের সহিত পরিণীতা হইলেন। বিবাহের পরদিন আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় দুইটী বোন খুব কাঁদিতে লাগিলেন এবং উমা দিদির সহিত তাঁহার শ্বশুরালয়ে সমস্তদিন কাটাইয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেখানে দিদির আদর অভ্যর্থনা, বরণ প্রভৃতির বর্ণনা এরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে বলিতে লাগিলেন যে সকলে অবাক হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে পিসিমাতার কণ্ঠলগ্না হইয়া উমা বলিলেন, "পিসিমা, তুমি বুঝি এবার আমার কথা ভাববে?" তিনি "হাঁ" বলাতে উমা বলিলেন, "হাঁ, পিসিমা, তুমি নিশ্চয়ই ভেবো"। উমার বয়স তখন প্রায় ১৫ বৎসর। কিন্তু মনটি ১২ বৎসরের বালিকার মত সরল। তাঁহার মুখে এই সরলতাপূর্ণ কথা শুনিয়া পিসিমা মুগ্ধ হইলেন ও তাঁহার পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া চক্ষের জল ফেলিলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদিগকে বেশীদিন ভাবিতে হইল না। ১৯২০ সালের ৪ঠা জুলাই উমা আমার খুল্লতাত-পুত্র শ্রীমান শিশিরের সহিত পরিণীতা হইয়া আমাদের গৃহে বধূরূপে আগমন করিলেন।

এই দশটী বৎসর উমা আমাদের পরিবারের সকলকে কি আনন্দ, কি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, কাব্য ও অন্যান্য রচনার কি অপূর্ব্ব সম্পদ্ দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া পরিবারকে ধন্য মনে করিতেছি। উমা আমার পিতৃদেবের অতি প্রিয় ছিলেন। আজ পরলোকে তাঁহার "লক্ষ্মীশ্রী"-সম্পন্না বধূমাতাকে কাছে পাইয়া না জানি কত যত্ন করিতেছেন! উমা বিবাহের পর কিছু কাল আমাদের বৃহৎ পরিবারে একত্র বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় আমার দ্বিতীয় পুত্র শিশু, তাহাকে আদর করিয়া "বসেটী মণি" নাম দিলেন। তাহার ঘুমপাড়ানি গান রচিত হইতে লাগিল এবং তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া ১৯২২ সালে "দুধের আগে" নাম লইয়া প্রকাশিত হইল।

১৯২৫ সালে স্বামীর কাজের সুবিধার জন্য উমা এই কারখানায় আসিয়া সংসার পাতিলেন। স্বামী, স্ত্রী ও একটী কন্যা এই ছোট্ট পরিবার। অবসর অনেক, উমার প্রাণ নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কৈশোরের সকল ঐশ্বর্য্য। সঙ্গীতে, কাব্যে, রচনায়, নূতন ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। 'আশ্চর্য্য এই, গৃহকর্ম্ম, স্বামি-সেবা', সন্তান-পালন, অতিথি-পূজা, কিছুই ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইল না। বেলেঘাটায় আসিয়া আপন সংসার পাতিবার পর উমার স্বামীর ও তাঁহার নিজের বন্ধুবান্ধব সকলেই এই গৃহকে তাঁহাদের মিলনক্ষেত্ররূপে বিবেচনা করিতেন; এই বাস-ভবন হইল তাঁহাদের সকলের আনন্দ-ভবন, আর এই আনন্দের মূলে ছিল উমার সুন্দর মধুর স্বভাব।

আমি সাহিত্য-সেবী নহি, তাই উমার জীবনের সাহিত্য-সেবার দিকটিকে যথোপযুক্তরূপে প্রকাশ করিতে অক্ষম। পরিচিত অপরিচিত কত সাহিত্যিক আজ উমার বিচ্ছেদ-ব্যথায় ক্লিষ্ট। তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে নানা ভাবে উমা দেবীর উদ্দেশে উত্থিত হইতেছে।

আমরা শুধু উমাকে আজ সদা হাস্যময়ী, নম্র, শান্তস্বভাবা, লক্ষ্মীশ্রী-সম্পন্না বধূমাতারূপে স্মরণ করিতেছি।

উপহার সকলেরই প্রিয়; কিন্তু উমার প্রাণ এত সরল স্নিগ্ধ স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল যে, কোন আপনার জন তাঁহার প্রাণ পুত্তলি কন্যাকে স্নেহবশে ব্যবহৃত বস্ত্র বা খেলনা উপহার দিলেও অত্যন্ত পুলকিত হইতেন এবং গৌরবের সহিত স্বামীকে তাহা দেখাইতেন।

অপরের মনে কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁহার কোনও কার্য্যের দ্বারা অপরের যাহাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে সর্ব্বদা তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এইরূপ মনের ভাব ছিল বলিয়াই, বোধ হয়, ভগবান্ তাঁহাকে এমন অকস্মাৎ তুলিয়া লইলেন, যাহাতে আপনার জন কাহাকেও তাঁহার জন্য এতটুকু কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। ভাবে ভোলা কবি কিসের নেশায় মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন! কেহ বুঝিল না!

আমাদের প্রাণের শূন্যতা কে পূর্ণ করিবে? সাধু ভক্তদের আশ্বাসবাণী নিয়ত পরলোককে দুর্ব্বল মানবের নিকট পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই বাণী আমাদের শোকার্ত্ত প্রাণগুলিকে স্পর্শ করুক! মৃত্যুর ছায়া অপসারিত হউক, অমৃতের জ্যোতি, অমৃতের শান্তি আমরা প্রাণে অনুভব করি।

দয়াময় ভগবান্, মঙ্গলময়, আজ তোমাকে এই নামেই ডাকিবার শক্তি দাও। বজ্রাঘাতের মত তুমি সহসা এই ব্যথা দিয়ে তোমার কি মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করলে, তাহা তুমিই জান। আমাদের একটু বুঝতে দাও। যে প্রিয়ধনকে তুমি তোমার কোলে টেনে নিলে, তাহার জন্য আমরা আর কি প্রার্থনা করবো। সে যে এখানে কেবল মাত্র ফুটে উঠ্‌ছিলো। তুমি তাহাকে নিত্য নব সম্পদে বিকশিত কর। আমাদের প্রাণে তাহার মধুর স্মৃতি চির জাগ্রত থাকুক ও তাহার মধ্য দিয়া তোমাকে আরও একটু কাছে পাই। ভাই আমার জীবন-সঙ্গিনীকে হারিয়ে নিজেকে কত অসহায় মনে করছেন, তাঁহার তুমি সহায় হও, তাঁহাকে সান্ত্বনা দাও। ভগিনী মাতৃহারা শিশুদের তুমি মা হয়ে থাক। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

—•—

জীবন-স্মৃতি।

(স্বর্গীয় জগন্মোহন বীরের শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ত্তৃক পঠিত)

আজ যাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে আত্মীয়-বন্ধুগণ সমবেত হইয়াছেন এবং যাঁহার মুক্ত আত্মা আজ আমাদের মধ্যেই বিচরণ করিতেছে,

আমাদের সেই চিরস্মরণীয় পিতৃদেবের জীবনী সম্বন্ধে দুএকটী কথা নিবেদন করিতেছি।

পিতৃদেব যখন এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার এদেশের—বিশেষতঃ পূর্ব্বময়মনসিংহের অবস্থা কিরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নীতিবিহীন ছিল, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পিতৃদেব ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামলোচন, মাতার নাম মহামায়া। তৎকালে দেশে আরবী ও পারশ্য ভাষার শিক্ষা প্রচলন ছিল। পিতামহ রামলোচন আরবী ও পারশ্য ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। দিল্লী হইতে আগত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, দেওয়ানবংশীয় মুসলমান জমিদারদিগের তিনি প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। জমীদার বাড়ীতে বহু পণ্ডিত, মৌলবী ও মুসাফির ফকির আগমন করিতেন; তাঁহাদের সহিত নানা প্রসঙ্গ ও আলোচনায় পিতামহ দেশ-বিদেশের বর্ত্তমান ও ইসলাম ধর্ম্মের বহুতত্ত্ব অবগত হয়েন। তাঁহার স্বরচিত উর্দ্দু ও পারশ্য কবিতা শুনিয়া মনে হয়, তিনি অল্পবিস্তর সুফি-ভাবাপন্ন প্রেমিক কবি ছিলেন। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, সঙ্গীতেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমাদের পিতৃদেবও তাঁহার অনেক গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আমাদের পিতামহী অসাধারণ তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। পিতৃদেব একাধারে তাঁহার মাতার তেজস্বিতা ও পিতার মধুর ভাব ও কোমলতা লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনে পিতৃদত্ত সঙ্গীতের প্রভাব তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সংসারে কোনও অসচ্ছলতা ছিল না, অধিকাংশ সময় গীতবাদ্য লইয়া কাল কাটাইতেন। এই সঙ্গীতপ্রিয়তাই তাঁহাকে ধর্ম্মজীবনের পথে টানিয়া আনে।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের অভিনব ধর্ম্মমত ও প্রভাব যখন বাংলার ঘরে ঘরে তুমুল আন্দোলন আনিয়াছিল, তখন পিতৃদেব যুবক। সেই আন্দোলনের সাড়া তাঁহার প্রাণেও আসিয়া পৌঁছিল। সুপ্রসিদ্ধ ম্যাজিষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন তখন কিশোরগঞ্জে প্রথম মহকুমা পত্তন করেন। তাঁহার আবাস-স্থলে মাঝে মাঝে সঙ্গীত ও আলোচনা হইত। পিতৃদেব তথায় সকলকে সঙ্গীত দ্বারা মুগ্ধ করিতেন। এখান হইতেই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমত ও প্রভাব তাঁহাকে আকৃষ্ট করে।

পূজনীয় প্রেরিত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় পিতৃদেবের বাল্যকালের সহপাঠী বন্ধু ছিলেন; তাঁহারা উভয়ে একই স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পিতৃদেব রায় মহাশয় অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তিনি তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার তৎকালীন ধর্ম্মবন্ধু ইটনানিবাসী বিশ্বাসী ভক্ত কালীকিশোর বিশ্বাস, জঙ্গলবাড়ী-নিবাসী শিশুজন-সুলভ সরল সাধক স্বর্গীয় ভাই দীননাথ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমোহন, যিনি এখনও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া সমাজের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতেছেন। ইঁহাদের সকলের অভিনব ধর্ম্ম-মতে অনুরাগ দেখিয়া সমাজ ইঁহাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন। তখনকার দিনে অচলায়তনরূপ সমাজের অভ্রভেদী প্রাচীরের বাহিরে যাঁহারা একটু আলোর সন্ধানে বাহির হইতে সাহসী হইতেন, তাঁহাদের ভাগ্যে বহু নির্য্যাতন ও নিপীড়ন লাভ হইত; বিশেষতঃ সভ্যতার কেন্দ্র হইতে বহুদূরে পল্লীগ্রামে, যেখানে সামাজিক শাসনই একমাত্র প্রবলতর শাসন বলিয়া গণ্য ছিল, সেই সময়ে যাঁহারা সত্যের সন্ধানে চিরাচরিত সামাজিক রীতির একটুও বাহিরে যাইতে সাহসী হইতেন, তাঁহাদের কিরূপ মানসিক শক্তির আবশ্যক হইত, তাহা এখনকার দিনের আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। দেশের সমগ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া ইঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নির্দ্দেশ করিলেন, ইঁহারা যদি সভামধ্যে স্বীকার করেন যে, "আমরা নূতন মতে বিশ্বাসী নহি," তবে সমাজ ইঁহাদিগকে ক্ষমা করিবে। আরক্তচক্ষু রুদ্রমূর্ত্তি সভাপতি ব্রাহ্মণের সম্মুখে অনেক অল্পবিশ্বাসীই আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু পিতৃদেব ও তাঁহার উল্লিখিত বন্ধুগণ অটল রহিলেন। তখন হইতেই ইঁহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং বিধিমত ইঁহাদের উপরে সামাজিক নিগ্রহ আরম্ভ হইল। ইঁহারা সকলে একঘরে হইলেন এবং ধোপা নাপিত বন্ধ হইল। তখনকার কথা পিতৃদেব এরূপ বলিয়াছিলেন, "সমাজ তাঁহাদের উপর এরূপ বিমুখ হইয়াছিল যে, তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল এবং রাজশাসনের ভয় না থাকিলে নাকি তাঁহাদিগকে দেবীর সম্মুখে যূপকাষ্ঠে দিয়া পশুরমত বলিদান করা হইত।"

বাহিরে সমাজের এইরূপ অত্যাচার, আর গৃহে পিতামহীর গঞ্জনা, অনুরোধ, অশ্রুজল ও আত্মীয় বন্ধুগণের প্ররোচনা, কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার সত্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

এই সময় হইতেই নিজগৃহে সমবিশ্বাসী বন্ধুগণকে লইয়া কীর্ত্তন উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতি চলিতে লাগিল। পিতামহী আমাদের পিতৃ-বন্ধুগণের উপরে বিষম কোপান্বিতা হইলেন। উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে, পিতামহী মাঝখানে আসিয়া নানা প্রকার কটূক্তি করিয়া উপাসনার ব্যাঘাত জন্মাইতেন। পিতৃদেবের মাতৃভক্তি অপরিসীম ছিল, তিনি উদ্যতরোষা মায়ের সম্মুখে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিতেন—"মা, আমাকে যত ইচ্ছা মার, ভর্ৎসনা কর, কিন্তু ইঁহাদিগকে কিছু বলিও না।" এই কয়েকটী অনাচারী বিশ্বাসী বালকদিগের সঙ্গে না পারিয়া শেষে হার মানিয়া বলিতেন—"আমার এক ছেলে সমাজকে দিয়াছি, আর তোকে (পিতৃদেবকে) দীননাথ ও চন্দ্রমোহনকে দিয়াছি।"

সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক গঠনের আবশ্যকতা আসিয়া পড়িল। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও মণ্ডলীগঠনের জন্য, গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া অতি সামান্য বেতনে পূজনীয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয় কিশোরগঞ্জে

স্থায়িরূপে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার কর্ম্মময় শিক্ষক-জীবন কিশোরগঞ্জের ছাত্র-সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে নূতন উৎসাহ আনিয়া দিল। তিনি আমাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিতেন। বিশ্বাসীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, আমাদের ভগ্নিদের মধ্যে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এই সময়ে বিহারীলালের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কিশোরীমোহিনী দেবী কিশোরগঞ্জে আগমন করেন। বোধ হয়, তিনিই কিশোরগঞ্জে প্রথম শিক্ষিতা মহিলা। তৎকালীন নারীদিগকে বিদ্যাশিক্ষাদান ঘোরতর নিন্দার বিষয় ছিল। কিশোরীমোহিনী আমাদের ভগ্নিদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—তাঁহার শিক্ষা ও চরিত্রের প্রভাব আমাদের পরিবারকে উন্নত করিল। আমাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুমুদিনী দেবীই প্রথম মহিলা, যিনি কিশোরগঞ্জে প্রথম লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন।

বিহারীলালের আগমনের পূর্ব্বেই মন্দির-নির্ম্মাণের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। এই উৎসাহী নবধর্ম্মে দীক্ষিত ক্ষুদ্রদল শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। পিতৃদেব মন্দিরের জন্য একখণ্ড ভূমি দান করিলেন—তাঁহার মাতুল ভ্রাতা স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায়, ভাই দীননাথ ও চন্দ্রমোহনের অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে মন্দির নির্ম্মিত হইল এবং রীতিমত তাহাতে উপাসনা চলিতে লাগিল। পিতৃদেবের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক মন্দিরে আসিতে লাগিল।

আমাদের পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী প্রথম অনুষ্ঠান আমাদের ভগিনী কুমুদিনী দেবীর বিবাহ—তখনও আমাদের পিতামহী বর্ত্তমান আছেন—পাছে বিবাহ ব্যাপারে তিনি বাধা প্রদান করেন—সে জন্য পিতামহীর অজানিতে পিতৃদেব কন্যাকে লইয়া নৌকা যোগে ঢাকা চলিয়া যান এবং সেখানে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পিতামহী যখন জানিতে পারিলেন, তখন যে কি তুমুল ব্যাপার আরম্ভ করিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। বিবাহের পরে যখন পৌত্রী ও জামাতা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং যখন জানিলেন যে, জামাতা ভদ্রবংশজাত, তখন তিনি তাঁহার পুত্রকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

আচার্য্যদেবের উপদেশ ও বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা আসে—পিতৃদেব বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন—তখন আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে রেলপথের সৃষ্টি হয় নাই—কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতা যাওয়ার পথও অত্যন্ত দুর্গম ছিল। অতি তীব্র প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ না থাকিলে কেহ এত দূরের পথ যাইতে সাহসী হইত না। কলিকাতায় ব্রহ্মানন্দকে প্রথম দর্শনের স্মৃতি তাঁহার আজীবন স্মরণে ছিল। আমাদের নিকট কতবার বলিয়াছেন—"যেন গৌরাঙ্গ প্রভুকে দেখিলাম—উপদেশ দিতেছেন, মনে হইতেছে যেন একটী পাখী গান করিতেছে।"

তাঁহার শিশুজন-সুলভ সরলতা, প্রফুল্লতা এবং বিনয়নম্রতায়, যাঁহারা তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। জীবনে তাঁহাকে চিত্তের প্রফুল্লতা হারাইতে আমরা দেখি নাই। ভদ্র ব্যবহার ও সৌজন্যে তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিত না। অধিক বয়সে লোক অপ্রিয়ভাষী হয়, কিন্তু তাঁহার প্রায় শততম বৎসর বয়সেও শিশুদের অত্যাচারে পর্য্যন্তও বিক্ষুব্ধ হইতেন না। বৈষয়িক ক্ষতি এবং শোকে তাঁহাকে কখনও বিচলিত হইতে দেখি নাই।

দেশে যখন থাকিতেন—তখন প্রতিবেশী প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলের তত্ত্ব লইতেন, আচণ্ডাল কাহারও বাড়ীতে যাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না—ইহা তাঁহার একরূপ নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। আমরা কোনও রূপ প্রতিবাদ করিলে বলিতেন, "সকলের সঙ্গে বিনয় প্রণয় রাখা চাই।" তাঁহার পরলোকগমন-সংবাদে স্থানীয় দীনতম দীন হইতে ধনী হিন্দু মুসলমান সকলে শোক প্রকাশ করিয়া সহানুভূতি জানাইয়াছে। পিতৃদেব জীবনে বহুশোক পাইয়াছেন। পত্নী-বিয়োগ, কন্যা ও জামাতৃ-বিয়োগ এবং অর্থ ও বিষয় সম্পত্তির বিনাশ, কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত ও ক্ষুব্ধ করিতে পারে নাই। গভীর শোকের সময় বলিতেন, "বাবা, তুমি স্বাধীন, তোমার কশাঘাতের বিচার করিবার আমার অধিকার নাই।"

পিতৃদেবের ধনসম্পত্তির আসক্তি থাকিলে তিনি একজন সম্পত্তিশালী ধনী বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। তিনি পৈত্রিক ও মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা ও উদাসীনতা তাঁহার স্বভাবগত ছিল; বিষয় থাকে থাকুক, যায় যাক, কোনও আসক্তি ছিল না। একবার যখন কোনও সম্পত্তি বিক্রয় করিতে মনস্থ করেন, তখন প্রজাগণ আসিয়া কান্নাকাটি করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন না, আপনার মত দয়াল মনিবের কাছ ছাড়িয়া আমরা কোন জবরদস্ত মনিবের হাতে গিয়া পড়িব।" আমিও তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তিনি কিছুদিন ভাবিয়া আমাকে বলিলেন, "না, আমি বিক্রয় করিব মনস্থ করিয়াছি।" পরে গাহিলেন, "বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ী' উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা।"

পিতৃদেবের ধর্ম্মজীবনের সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা আমার মত সাধনা-হীনের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। এ সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক যে দুইজন ধর্ম্মবন্ধু এখনও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা আলোচনা করিলে বিশ্বাসি-মণ্ডলীর উপকারে আসিবে, আশা করি।

প্রথম জীবনে যখন শাশ্বত কিছু লাভ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত উন্মুখ হইয়াছিল, তখন ফকির সাধুদের সঙ্গ করিতে লাগিলেন। এমনও দিন গিয়াছে যে, তাঁহার কোনও একজন অন্তরঙ্গ মুসলমান ফকিরের সঙ্গে নানাপ্রকার সাধনায় বহু রজনী অতিবাহিত করিয়া দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তাঁহাকে অন্য সকল আশ্রয় হইতে টানিয়া লয়। তাঁহার সাধন-জীবনের

অবলম্বন সঙ্গীত, নীরব প্রার্থনা ও শ্লোকপাঠ। তাঁহার কণ্ঠে চিরজীবের সঙ্গীত যিনি শুনিয়াছেন, তিনি মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। আমাদের জীবনে এমন দিন যায় নাই, যে দিন প্রভাতে তাঁহার সঙ্গীতে ও শ্লোকপাঠে আমাদের নিদ্রা দূর না হইয়াছে। এই সে দিনও তিনি "ভোর ভঁয়ো পক্ষিগণ বোলে" সঙ্গীতে এবং "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" শ্লোকে আমাদের সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনার ভাষা ছিল না, কিন্তু তিনি যে ভাষায় প্রার্থনা করিতেন, সে ভাষা যে দেবাদিদেবের চরণে পৌঁছিয়াছে, আমরা তাহা বিশ্বাস করি।

আজ আমাদের পিতৃতর্পণের প্রার্থনা—জন্মমরণের নিয়ন্তা দেবাদিদেব যিনি—তাঁহার চরণস্পর্শে সার্থকতা লাভ করুক এবং তাঁহার কৃপায় অদেহী অমরলোকযাত্রী আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়া সার্থক হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

শ্রীমান্ অকিঞ্চন কুমার চট্টোপাধ্যায়।

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

(জন্ম ৬ই জুলাই, ১৮৭৯। বিবাহ ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭। পরলোকযাত্রা ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১)

অকিঞ্চনকুমার শৈশবে অতি সুশ্রী, সুন্দর, সরল-স্বভাব, সদানন্দ ও ক্রোধশূন্য ছিলেন। সবার কোলে কোলে বেড়াতেন। সবার আদরের ছিলেন, কেউ মারলেও হাসতেন। ক্রমে যৌবনে পিতার সকল কাজের সহায় হয়ে, সংসারের ভার বহন করেন। জ্ঞান-শিক্ষা অধিক না হলেও, ধর্ম্ম ও নীতি-সঙ্গত ভাবে, পিতার আজ্ঞানুসরণে ও উপদেশ-গ্রহণে সকল কর্ম্ম নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করিতে তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও যত্ন ছিল। ভুল ভ্রান্তি করিলেও সরলভাবে স্বীকার করিতেন, পিতার স্নেহপূর্ণ ধমক বিনীতভাবে গ্রহণ করিতেন।

সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা তাঁর একটা জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। পরের সেবায় তাঁর প্রধান আনন্দ হইত, তাহার জন্য আহার-পানও ভুলিয়া যাইতেন। বিবাহের পর হইতে সংসারের সামান্য সামান্য কার্য্য থেকে পারিবারিক যাবতীয় কার্য্য ও অতিথি অভ্যাগতদের আদর যত্ন সেবা অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে করিতেন, করিতে ভালবাসিতেন; আপনার শরীরের ক্লান্তি শ্রান্তি রোগতাপেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, যথার্থই আত্মহারা হইয়া সেবা সাধন করিতেন।

পারিবারিক দৈনিক উপাসনার সাধক পিতার অনুগমনে তাঁহার সহিত যোগদান করিতেন ও সঙ্গীত করিতেন। উপাসনার ঘর সাজান তাঁর বিশেষ কার্য্য ছিল। আবার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে রাত্রে ও প্রত্যূষে সঙ্গীত-যোগে সাধন ভজন করিতেন। বেশভূষার কখনও আড়ম্বর ছিল না, অনেকটা গরীবানি ধরণের চালচলন ছিল। গরীব দুঃখীদের প্রতি অশেষ দয়ার্দ্র ছিলেন। কেহ ঔষধ নিতে এলে পয়সার জন্য কাহাকেও পীড়াপীড়ি করিতেন না; শুধু তাই নয়, সন্তানকে বলিতেন, কখনও দামের জন্য দাবী দাওয়া করো না, যে যাহা দেয় নেবে, পয়সা না দিলে যে ঔষধ দেবেনা, তা করো না, রোগী আরোগ্য হইলেই যথেষ্ট লাভ। কোন রোগী ঔষধ নিতে না এলে, আসিতে দেরী দেখিলে, তার বাড়ী গিয়া ঔষধ পৌঁছিয়ে দিতেন। এমন কি, শেষ অসুস্থাবস্থায় মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব্বেও, এমনি একজন রোগীর বাড়ী গিয়ে ঔষধ পৌঁছে দিলেন। কাহাকেও কাহাকেও পিতার অজ্ঞাতে পথ্যেরও সাহায্য করিতেন।

প্রতি রবিবার নিজ হাতে গরীব দুঃখীদের বরাবর চাউল বিতরণ করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। সহধর্ম্মিণীর সহযোগিতায় মৃত্যুর পূর্ব্ব রবিবারেও তাহা করিয়াছেন। এতই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, যতক্ষণ না নিতান্ত অবসন্ন ও শয্যাশায়ী হইতেন, কর্ত্তব্য-সাধনে ব্যস্ত থাকিতেন। একটু বসিয়া থাকিতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। পরিচিত ও বন্ধু বান্ধবদের সকলকার খোঁজ খবর লওয়া তাঁহার একটি বিশেষ কার্য্য ছিল; বিদেশ হইতে আসিবা মাত্র পল্লীবাসীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া খোঁজ খবর না নিলে যেন তিনি সুস্থির হইতে পারিতেন না।

পিতৃদেবকে তিনি যেমন ভয় করিতেন, তেমনি প্রাণগত ভালবাসিতেন, যথার্থই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। অগ্রজকেও যেমন ভয় করিতেন, তেমনি ভক্তি করিতেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন বিষম রোগ-যন্ত্রণায় কাতর, তখন পিতাকে ডাকিয়া, যে সকল দেনা পাওনার হিসাব তাঁর হাতে ছিল, বুঝাইয়া দিলেন। এবং যেন পিতার ভিতরই সেই পরম পিতাকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার বাবা, মাকে যেমন এগিয়ে দিয়েছিলে, বাবা, তেমনি আমাকেও এগিয়ে দাও। বাবা, আমি তোমাকে ছাড়বোনা, এখন তুমি বলছি, ক্ষমা কর। এমন বাবা মা কে পায়?" ইহাতে পিতার দেবত্বে তাঁহার কতটা গভীর বিশ্বাস ছিল, তাহারই পরিচয় দিলেন। পিতাকে যেমন, এমনি করিয়া সহধর্ম্মিণী ও ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে কাছে ডাকিলেন। কন্যাকে বলিলেন, "তুমি আমার মা, দাদাকে দেখো, মাকে দেখো, ভাই বোনকে দেখো, ভাল মেয়ে হয়ে থেকো।" পুত্র সন্তানকে আদর করে খোকামণি ধনমণি সন্ধ্যামণি এই বলিয়া চুম খাইয়া ঐ ভাবে বলিলেন। শিশুকন্যাকেও চুম খাইয়া, স্ত্রীর কোলে একটু মাথা রাখিয়া বলিলেন, "তোমারই মা, আমার কি কেউ নয়?" প্রত্যেকের কাছে সরল ভাবে ক্ষমা চাহিলেন; বলিলেন, অনেক অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা কর। ভৃত্য ব্রাহ্মণকেও বলিলেন, তুমি আমার বড় ছেলে। পোষা পাখীকে খাবার দেওয়া হয়েছে কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা

করিলেন। তাদের যাতে কষ্ট হয়, তাও করিতে বলিলেন। শেষ সহধর্ম্মিণীকে কাছে ডাকিয়া গলা ধরিয়া বলিলেন, "তুমি আমার অনেক সেবা করেছ, আমি তোমার কিছুই করিতে পারিলাম না। তোমাকেও শীঘ্র ডেকে নেবো। দাদা এলেন না, আর দেখা হবে না।" শেষ করযোড়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করে, পিতাকে বলিলেন, আমাকে বিদায় দাও।

বুধবার প্রাতঃকালে ৮টায় মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বেও কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলেন, "দয়াময়ী মা, দয়া কর, কঠোর রোগ হতে মুক্ত কর, আর যে সহ্য করতে পাচ্ছিনা ঠাকুর, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল।" দয়াময়ী মা, দয়াময়ী মা, দয়াময়ী মা, বারবার বলিতে বলিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পিতৃদেব তখন দেখিলেন, তাঁহার মুখে স্বাভাবিক হাস্য ফুটিয়া উঠিল। ইহাতো মৃত্যু নয়, ইহা যেন তাঁহার আত্মার বিকাশ। এইরূপে হাসিতে হাসিতে প্রিয় অকিঞ্চন আনন্দলোকে আনন্দময়ীর কোলে উঠিলেন।

শ্রীনবদেবালয়।

(১)

ওগো, এই ত আমার মক্কা, কাশী,
জেরুজিলাম, বৃন্দাবন,
প্রয়াগ, পুরী, বুদ্ধগয়া—
সর্ব্বতীর্থ-সমাগম!
কুড়িয়ে নিয়ে ইঁট্ পাথরে,
গড়ল গভীর ভক্তিভরে,
বড্ড ভাল মায়ের তরে
এ সেই নবদেবালয়!
ভক্তপ্রাণের শেষ নিবেদন—
সর্ব্বতীর্থ-সমন্বয়!

(২)

আজ, নদীর কোলে পাষাণ-শোওয়া
ঘুমায় যেগো ধর্ম্মশূর,
অগ্নিবীণার অগ্নিবাণী
তাই তুলেনা বজ্রসুর!
নানান্ মুনি নানা কথায়,
নব নববিধান দেখায়,
তাই কি শেষে লজ্জা, রোষে,
শব হ'ল, মা, সদা শিব,
শ্মশান হ'ল—স্বর্গশোভা—
ধূলায় লুটে কাঁদছে জীব!

(৩)

মাগো, স্বার্থ ঘেরা, খুঁজছে যারা
সর্ব্বনাশের দলাদলি,
চিত্ত যেথা বিত্তপদে
দিচ্ছে সবাই জলাঞ্জলি!
সুদূর হ'তে নয়নজলে,
সেথায় দেখি কিসের ছলে,
বস্তু ফেলে ছায়ার মায়ায়
ছুটছে যারা পলদ্ঘাম,
মানতে তারা নারাজ আজও
নাম রয়েছে নেইক শ্যাম!

(৪)

তবু, এই জানি, মা, এই মানি মা,
যতই ভয়ে বুক্টা দুলে,
উঠ্‌বে ফুটে—ভক্ত আশা—
পদ্ম যেন পাঁকের মূলে!
এর মাটীতে মিশিয়ে আছে,
সোনা হয়ে ফল্‌বে পাছে,
এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নেবে ভাঁটার টান—
মরণমুখী আজকে যেগো
কাল পাবে সে নূতন প্রাণ!

১২ই মাঘ, ১৩৩৭। শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(৮ই জানুয়ারী, শিলচর, নর্ম্মালস্কুলে স্মৃতি-সভায় পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য জীবন সমর্পণ করিলেন। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত নরনারী যে সুলভ সংবাদ পত্রাদি পাঠ করেন, তাহার প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র। কেশব-চন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবন নববিধানে পরিসমাপ্তি হইল। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম-সমন্বয় ব্যাপার একটু উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা 'নববিধান'—'New Dispensation'—এই শব্দটী কতদূর বিজ্ঞান-সম্মত, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যদিও এক সময় এই শব্দটি উপহাসের বিষয় ছিল, কিন্তু ইহা এখন সকলেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেছেন। কেশবের এক কথায় বলিতে গেলে ইহা Synthesis of religions। কেশব-চন্দ্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "Behold the light of heaven in India" নামক এক বিখ্যাত বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতে ধর্ম্মের এক নূতন বিধান আগমন করিবে এবং তিনি তাহাকে দিব্য জ্যোতি

বিধান-নয়নে অবলোকন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"Everything proves that all the events of the age stirringly testify that the morning of India's redemption has drawn nigh. We are in the midst of it. All things around us serve to encourage animate, gladden our spirits. Who does not feel encouraged by the thought that after centuries of decadance during which hardly a ray of redeeming hope was seen athwart the sky a new dispensation full of promise has dawn on our father-land." এই নূতন বিধান পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম সকলের সমন্বয় বা মিলনে বিরাট বা বিচিত্র আকার-বিশিষ্ট ধর্ম্ম। তিনি এই ধর্ম্ম-সমন্বয় ব্যাপার যাঁদের দ্বারা আরম্ভ করাইলেন, তাঁহারা সমাজের নিম্ন-স্তরের লোক। নববিধান কি, তাহা কেশবের ভাষায় প্রকাশ করিতেছি। "রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনায় জীবন নিয়োগ করেন। ইঁহাদের সাহচর্য্যে এ হিন্দুসমাজ হিন্দু থাকিয়া যতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে। ইঁহারা হিন্দু-সমাজকে এমন উন্নত স্থানে আনয়ন করিলেন যে, ইহা আর সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। সমুদায় পৃথিবীর সঙ্গে উহার একতা উপস্থিত হইল। গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। এর সঙ্গে এখন বেদ পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ ললিত বিস্তর প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র মিশিল। জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য সমুদয় ইঁহার রাজ্যের অন্তর্গত। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসা-শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবেন। ইঁহার আগমনে পৃথিবীর আশা এবং আনন্দ হইয়াছে।"

কেশবচন্দ্রকে একজন অসাধারণ বাগ্মী এবং একজন অসাধারণ কর্ম্মী ইত্যাদি বলিলে তাঁহার প্রকৃত চরিত্র কিছুই প্রকাশ পায়না। কেশবচন্দ্রের জীবন সামঞ্জস্যের জীবন, অথবা Prophet of Harmony, an Ideal man of the New Dispensation. সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ব্যাপার নিজের জীবন দ্বারা এবং তাঁহার সহগামিগণের জীবন দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্ম, বুদ্ধ এবং খৃষ্টধর্ম্ম হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া জগতে নূতন বিধানের আলো আনয়ন করিলেন। পৃথিবী যতই জ্ঞান এবং ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিবে, ততই বিধানের সত্য নূতন ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া জ্ঞানী এবং বিদ্বান্‌দিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবে। তাই "কেশবচন্দ্র We the Apostles of the New Dispensation" নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় নিম্নলিখিত ভবিষ্যৎ বাণী বলিয়াছেন।—"Rest assured my friends, when we are dead and gone, all the events that are transpiring around us in these days shall be written and embodied in history and shall be unto future generations a new gospel of God's grace."

কেশবচন্দ্র জীবিতকালে ২২ জন সামান্য ব্যক্তিকে ধর্ম্মপ্রচার-ব্রতে নিয়োগ করেন। তাঁহাদের ধনও ছিল না, মানও ছিল না এবং পার্থিব কোন আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। মহর্ষি ঈশার নিম্নলিখিত বাণী তাঁহাদের জীবনে বিশেষ ভাবে ফলিত—"Take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall put on or what ye shall drink or wherewithal shall ye be clothed. For your heaven'y Farther knoweth that ye have need of all these things. Seek ye first the Kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you."

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

সংবাদ।

তীর্থযাত্রা ও সেবা—পরলোক-তীর্থ-সাধন ও বাঁকিপুর-নিবাসী আমাদের বর্ষীয়ান্ ঋষিকল্প সাধক ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রশোকে সমবেদনা-সাধনার্থ ভাই প্রিয়নাথ বাঁকিপুর গিয়া, ১২।১৩ দিন অবস্থান করিয়া, সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে দুইবেলা উপাসনা, প্রার্থনা, পাঠ, প্রসঙ্গাদি করিয়া কৃতার্থ হইয়া আসিয়াছেন। এই সময় মধ্যে একদিন স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরেও সামাজিক উপাসনা করেন এবং "অঘোর-প্রকাশ" নিবাসে সমাধি-পার্শ্বে পারিবারিক উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন ভ্রাতা বিনোদবিহারী ঘোষের বাড়ী পারিবারিক উপাসনা, ভ্রাতা বেচুনারায়ণের বাড়ীতে, ভ্রাতা নিঃস্বন নিয়োগীর বাড়ীতে, ভ্রাতা ভোলানাথ কুণ্ডুর রোগ-শয্যাপার্শ্বে, ভ্রাতা গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের প্রবাসে, ভ্রাতা সত্যসুন্দর বসুর বাড়ীতে ও স্নেহের কন্যা বনলতা দেবীর আবাসে প্রার্থনাদি করেন এবং ভ্রাতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ভ্রাতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়া সুসংবাদাদি গ্রহণ করেন।

লণ্ডন সহরে মাঘোৎসব—লণ্ডন হইতে জনৈকবন্ধু লিখিয়াছেন:—শনিবার, ৩১শে জানুয়ারি, সন্ধ্যা ৭টার সময় Cafe Indian Restaurant এ নিমন্ত্রিত সকলে উপস্থিত হইলাম। ম্যানেজার বাঙ্গালী, ঘরটি পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া ছিলেন। মহারাণী সুনীতি দেবী একটি ছোট প্রার্থনা করিলেন, গান হইল, বর্দ্ধমানের মহারাজা সুন্দর কয়েকটি কথা বলিলেন। গান, এস্‌রাজ এবং Sir Albion Banerjeeর বক্তৃতা হইল। প্রায় ৪৮ জন

বাঙ্গালী, ইংরাজ, পাঞ্জাবী নরনারী একত্রে আহার করিলাম। ভাই ভগিনীগণ এই উৎসবের আনন্দ বিশেষভাবে সম্ভোগ করিলাম। শ্রীযুক্ত জীবন দাসগুপ্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই উৎসবের কার্য্যটি সমাধা করিলেন। সুনীতি দেবী পৌরাণিক দুই চারিটি গল্প, যাহাতে ভারতবাসীদের জীবনের ধর্ম্মভাব প্রকাশিত, বলিয়াছিলেন। উৎসবের মিলনটি জমাট হইয়াছিল।

উৎসব—গত ১৯শে ডিসেম্বর, সায়ংকালে, সংক্ষেপে উপাসনা ও প্রার্থনা হইয়া মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসব আরম্ভ হয়। ২০শে ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতে উষাকীর্ত্তন হয় এবং ১০টায় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় প্রার্থনাদি হয়। ২১শে প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে প্রসঙ্গ, তৎপর ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ হিন্দি ভজন করেন, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় সংক্ষেপে উপাসনা করেন। ২২শে প্রাতে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় লেডি ডাক্তার শ্রীমতী শান্তিপ্রভা মল্লিকের গৃহে অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, আর্য্যঋষি-পত্নীদিগের অনুকরণে নববিধানের আদর্শ সংসার গঠনের উপদেশ দেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। ২৩শে মহর্ষিদেবের দীক্ষার সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ভাই প্রমথলালের পবিত্র জীবনী আলোচনান্তে তীর্থযাত্রি-সমিতির অধিবেশনে, যে যাত্রিনিবাস-নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে তাহার নাম "প্রমথলাল আশ্রম" রাখা স্থির হয়। সায়ংকালে মহিলা-উৎসবে ভগিনী নির্ম্মলা বসু উপাসনা করেন, ভগিনী প্রেমলতা দেব আচার্য্যের উপদেশ ও প্রার্থনা পাঠ করেন। ২৪শে সাধু অঘোরনাথের সাধন-ভূমি পীর পাহাড়ের অত্যুচ্চ শিখরে বেলা ১০টার সময় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, শ্রীমতী প্রেমলতা দেব ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় কাতরভাবে প্রার্থনা করেন। পীর পাহাড়ের জমিদার চন্দননগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত এ, কে, মণ্ডল বন্ধুগণ সহ উপাসনায় যোগ দান করিয়া যাত্রীদের সমাদর করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্তের বাগানবাটীতে প্রীতিভোজন হয়। সুকুমারবাবুর আদর যত্নে সকলে প্রীত হন। সায়ংকালে মন্দির ও সমাধিগুলিতে আলোদান করা হয় এবং ব্রহ্মমন্দিরে আরতি হয়। আরতির কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্যকৃত আরতির প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ বিষয়ে আলোচনা হয়। অদ্য রাত্রে সদর হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের বাটীতে ভূরি ভোজন হয়। শৈলেনবাবু সপরিবারে অতি ভক্তি সহকারে যাত্রিদের সমাদর করেন। ২৫শে, মহর্ষি ঈশার জন্মোৎসব। খুব প্রাতে ডাক্তার শৈলেনবাবুর সদরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, বেলা ১০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করিয়া, পূর্ণিয়ার লেডী ডাক্তার শ্রীমতী সুনীতিবালা দাসের ভগিনী কুমারী ভক্তিকণাকে নবসংহিতানুসারে দীক্ষা দান করেন। এই উপলক্ষে সুনীতি দেবী ভাই চন্দ্রমোহনের সেবার্থ ৫৲ টাকা দান করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। ২৬শে প্রাতে আচার্য্যদেবের, সাধু অঘোরনাথের ও ভক্ত দীননাথের সমাধিচত্বরে ভাই চন্দ্রমোহন উপাসনা করেন, কেহ কেহ প্রার্থনা করেন। উপাসনা প্রার্থনা বেশ ভক্তিপূর্ণ হয়। এই উৎসবে কলিকাতা, শান্তিপুর, হাওড়া, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর হইতে তীর্থযাত্রিদল সমবেত হইয়াছিলেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই মার্চ্চ, কলিকাতায়, ৬৪ই ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে তাঁহাদের পিতৃদেব, শান্ত সাধক স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা চন্দ "বৈরাগ্য" বিষয়ে আচার্য্যের উপদেশ ও আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। অদ্য পাটনায় ভাই কেদারনাথের কনিষ্ঠা কন্যা গবর্ণমেণ্ট উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়ের লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমতী বনলতা দের গৃহেও উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, জ্যেষ্ঠকন্যা শ্রীমতী প্রেমলতা দেব বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ৮ই মার্চ্চ, অপরাহ্নে ৯১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে, ডাঃ অমরেন্দ্র নাথ বসুর গৃহে, তাঁর পিসীমাতা স্বর্গীয়া চঞ্চলা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। স্বামী শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী রুগ্ন ও ভগ্ন শরীরে ক্যাম্বেল হাসপাতাল হইতে আসিয়া উপাসনায় যোগদান করেন এবং হৃদয়স্পর্শী কাতর প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করেন। অদ্য প্রাতঃকালে মধ্যম জামাতা শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের গৃহেও, ২নং ছকুখানসামা লেনে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৮ই মার্চ্চ, ৮৩১ নং অপার সার্কুলার রোডে, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কুমুদিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। ভগ্নী শ্রীমতী কমলেকামিনী বসু বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহ প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এম্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৭ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 14th April, 1931. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে চিরবর্ত্তমান, চিরসুন্দর, চিরসরস পরম দেবতা! ভারতের বাহ্য প্রকৃতি চিরদিন তোমাকে চির জীবন্ত, চির জাগ্রত, চিরসরস দেবতা রূপে প্রকাশিত করিয়া আপনারা ধন্য হইল, আপনাদের জন্ম-গ্রহণ, অস্তিত্ব-ধারণ সার্থক করিল। ভারতের ঋষিকুল তোমার পরিচয় ভাল করিয়া লাভ করিবার জন্য, ব্রহ্মদর্শন-পিপাসার সম্যক তৃপ্তি-সাধন জন্য, এই বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গ সহায়তা প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিলেন। ভারতের নির্জ্জন বনভূমি, ভারতের রসাল সতেজ সরল সুন্দর বৃক্ষ লতা, ভারতের প্রবহমাণ পুণ্যতোয়া নদ নদী আপনাদের বক্ষ বিদারণ করিয়া, তোমারই পবিত্র সুন্দর প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া, ধর্ম্ম-পিপাসু ও ক্ষুধিত ঋষি আত্মাগণকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিল, তোমার দিকে কেমন উদ্বুদ্ধ করিল! অতীতে ও বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-পিপাসু আত্মাদিগের প্রাণ ঈশ্বরোন্মুখীন করিতে, তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর করিতে ভারতের বাহ্য প্রকৃতি চির বিশ্বস্ত সহায়। যতই এই বাহ্য প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করি, যতই ইহাদের দিকে তাকাই, মন স্বীকার করে, ইহারা যেমন, হে স্রষ্টা! তোমার বাধ্য, বিশ্বস্ত এবং সেবাব্রত, ইহারা যেমন সারল্যে সৌজন্যে শুদ্ধতায় অবিকৃত থাকিয়া তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তনে ও উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়নিষ্ঠ, আমরা তো তেমন নই। এই বিচিত্র এবং অফুরন্ত সৃষ্টি-রাজ্যে আমরা মানবকুল জ্ঞানে গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও, আমাদের অহঙ্কার, অভিমান ও আমিত্ব-দোষে তোমার প্রদত্ত উচ্চ প্রকৃতিকে কত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি, আপনারা তোমার দৃষ্টিতে এবং সকলের দৃষ্টিতে কেমন হীন হইয়া পড়িয়াছি! তোমার ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, বিকৃতি হইতে প্রকৃতিতে [illegible]বর্ত্তন ও পুনর্গঠন-লাভই ধর্ম্ম-সাধনের উদ্দেশ্য। তুমি আমাদের নিজকৃত সকল প্রকার বিকৃতিকে বিনাশ করিয়া, আমাদের অন্তরস্থ গূঢ় প্রকৃতিকে স্বর্গের বিচিত্র শোভা সৌন্দর্য্যে, মহিমা গৌরবে বিভূষিত করিবার জন্যই, এই যুগ-ধর্ম্ম নববিধানে এত স্বর্গের আয়োজন সহ আপনি অবতীর্ণ হইয়াছ। এক দিকে যেমন আমাদের প্রতি তোমার অনন্ত কৃপা, অন্যদিকে তেমনই আমাদের জন্য তোমার অতীতের এবং বর্ত্তমানের কত বিচিত্র ধর্ম্মবিধানের, কত সাধু মহাজনগণের জীবন্ত সমাগম। কিন্তু দেখ, হে অন্তর্য্যামিন্! আমরা নিজকৃত অপরাধে কত হীন হইয়া পড়িয়াছি, অথচ হীনতা বিষয়ে আমাদের আত্মচেতনা নাই, কত দীন আমরা, তবু দীনতা বোধ নাই, বরং অহঙ্কার,

অভিমান আছে। আমাদের আত্মার পোষণের জন্য তোমার এত বিরাট আয়োজন, অথচ আমাদের ধর্ম্ম-ক্ষুধা নাই, ধর্ম্ম-পিপাসা নাই। তাই কাতরপ্রাণে ভিক্ষা করি, এ সময় এই সৃষ্টির বাহ্য প্রকৃতি তাহার শোভা সৌন্দর্য্য মধ্যে তোমার শোভা সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করুক, আমাদের প্রাণে ধর্ম্মের ক্ষুধা পিপাসা জাগ্রত করিয়া আমাদের চিত্তকে তোমার দিকে উন্মুখীন করুক; আমাদের জীবনের দীনতা হীনতা বিষয়ে আমাদিগকে সচেতন করিয়া, দীন অকিঞ্চন রূপে তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে আমাদের সহায় হউক। সর্ব্বোপরি এসময় তোমার বিশেষ কৃপার অবতরণ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্য বৈশাখ।

দক্ষিণায়ন শেষ হইলে উত্তরায়ণের মুখে মাঘ মাস দেখা দেয়; তাই হিন্দু আর্য্যজাতির নিকট মাঘ মাস পুণ্য মাস। আবার উত্তরায়ণের পথে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ যখন ভারতের বক্ষে পতিত হইবার সময় উপস্থিত, তখন বৈশাখের আরম্ভ; তাই বৈশাখ মাস পুণ্য মাস। উত্তরায়ণের আরম্ভে সূর্য্যের কিরণমালা যতই উত্তাপ দান করিতে থাকে, ততই উদ্ভিজ্জগতে ও প্রাণিজগতে নব জীবনের সঞ্চার ও প্রসারণ আরম্ভ হয়। সেই উত্তাপ যখন প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিয়া, কি জড়জগতে, কি ভৌতিক জগতে, কি উদ্ভিজ্জগতে, কি প্রাণিজগতে আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকে, তখন সকলের মধ্যে একটী পূর্ণ বিকাশের সাড়া পড়িয়া যায়। সূর্য্যের উত্তাপের ফল সকলেই লাভ করে। সূর্য্য আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া, জগতের ছোট বড় সকলের মধ্যে আপনার ক্রিয়া, আপনার পরাক্রম প্রকাশ করে; কিন্তু সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রগণ্য মানবই সজ্ঞানে সচেতনে বিশেষ ভাবে আপনার বিশিষ্ট অনুভূতির ভিতর দিয়া যাহা অনুভব করিতে পারে, ব্যক্ত করিয়া আপনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, অন্যকেও তৃপ্তি দান করিতে পারে।

বঙ্গভারতে বৈশাখের সূর্য্য ভূমিকে উত্তপ্ত করিয়া উর্ব্বরা-শক্তিতে ভূষিত করিতেছে, সমুদ্র-বক্ষে পতিত হইয়া বিপুল বারিরাশিকে বাষ্পাকারে আকাশ পানে উত্থিত করিতেছে, আকাশে নব নব মেঘ-মালার সৃষ্টি করিতেছে; অপর দিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-মালার মস্তকাবৃত বরফ-রাশিকে বিগলিত করিয়া জলরাশিতে পরিণত করিতেছে, ক্রমে বিপুল জলরাশি নিম্নগামী হইয়া শুষ্ক মৃতপ্রায় নদনদীগুলিকে নূতন জীবন দান করিতেছে। ভূমিতে কত নূতন শস্যের উদ্গম হইতেছে; জড়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগৎ নানা ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া নব জীবনের সাক্ষ্য দান করিতেছে। বৈশাখে সকল দিকে বিকাশের সাড়া, প্রকাশের সাড়া, নব জীবনের সাড়া; তাই সূর্য্যের এক নাম সবিতা, জনয়িতা। বৈশাখে সূর্য্যের ক্রিয়ার পূর্ণ প্রকাশ, আর প্রকৃতি-রাজ্যে নব জীবনের পূর্ণ সাড়া।

স্বীকার করিলাম, বৈশাখে সূর্য্যের শক্তি বাহ্য প্রকৃতি-রাজ্যে আপনার পূর্ণ ক্রিয়া প্রকাশ করিল, তাহার ফলে ভূমি উর্ব্বরা-শক্তি লাভ করিল, ভূমিতে নানাবিধ শস্যোদ্গমের সূচনা হইল, আকাশে নূতন মেঘের সৃষ্টি হইল, নূতন জোয়ারের আগমনে নদ নদী নূতন জীবন লাভ করিল। কিন্তু এ সকল ক্রিয়ার ভিতরে মানব-প্রাণ পুণ্যস্পর্শ লাভ করে কেন, বৈশাখ মাসকে বিশেষ ভাবে পুণ্যমাস বলিয়া নির্দ্দেশ করে কেন? একমাত্র ঈশ্বরই পুণ্য-স্বরূপ; যেখানে যতটা তাঁহার প্রকাশ, সেখানে ততটা পুণ্যেরই প্রকাশ। সূর্য্যে ঈশ্বরের সমধিক প্রকাশ। অন্য কথায়, যেখানে যত শক্তি, সেখানে ঈশ্বরের ততই প্রকাশ, কেননা ঈশ্বরই শক্তির উৎস-স্বরূপ। সূর্য্য ঈশ্বরের ঘনীভূত শক্তি, তাই সূর্য্যে ঈশ্বরের সমধিক প্রকাশ। গীতায় ঈশ্বরের বাণীর আকারে উক্ত হইয়াছে—"আকাশে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মধ্যে আমি সূর্য্য, ধরায় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে আমি বট বৃক্ষ।" অতএব বৈশাখের সূর্য্যের প্রখর উত্তাপের মধ্যে ঈশ্বরের পুণ্য প্রতাপ; তাই বৈশাখের গায়ে এত দেবত্বের সুগন্ধ, এত পুণ্য গন্ধ; তাই বৈশাখ মাস পুণ্য মাস।

বসন্তকালে প্রকৃতি-রাজ্যে প্রাণশক্তির নূতন খেলা, নূতন লীলা, সেখানে ঈশ্বরের বিশেষপ্রকাশ; তাই ভক্তগণ বসন্তের নব জীবনের মধ্যে নবজীবন-দাতা লীলাবিহারী ঈশ্বরকেই অনুভব করেন, দর্শন করেন। বৈশাখে সূর্য্যের সমধিক উত্তাপের মধ্যে ব্রহ্মেরই উত্তাপ, বৈশাখের সূর্য্যের ক্রিয়ার ভিতরে ঈশ্বরেরই সমধিক প্রকাশ; তাই, পুণ্য-পিপাসু মানবাত্মা বা পুণ্যাভিমুখীন মানবাত্মা সেখানে পুণ্য গন্ধে মোহিত হন। যেখানে ঈশ্বরের

স্বর্গীয় ক্রিয়ার প্রকাশ, সেখানে সরল ভক্তাত্মা, সাধু আত্মাগণ পুণ্য গন্ধ অনুভব করেন ও তাহাতে প্রবেশ করিয়া আরও পুণ্য লাভের জন্য ব্যস্ত হন। ঈশ্বরের গুণাত্মক হরিনামে বা গুণকীর্ত্তনে—নামকীর্ত্তনে ছোট বড় সকল মানুষ পুণ্যগন্ধ অনুভব করেন কেন? ঈশ্বরের গুণাত্মক নামেতে স্বয়ং ঈশ্বর বর্ত্তমান। নামেতে নামীতে নাহিক প্রভেদ। এমন হরিনামে, ব্রহ্মনামে জীব পুণ্য গন্ধ পাইবেনা? যেখানে গন্ধ-যুক্ত ফুল রহিয়াছে, সেখানে মানুষ গন্ধ সহজেই অনুভব করে; কেননা মানুষের নাসিকা আছে, নাসিকার স্বাভাবিক কার্য্য ঘ্রাণ-শক্তি লাভ করা। তেমনই মানুষের আত্মা আছে, আত্মার স্বাভাবিক কার্য্য ঈশ্বরের পুণ্য গন্ধ লাভ করা। নাসিকার স্বাভাবিকতা বিদ্যমান থাকিলেই ফুলের সুগন্ধ লাভ করিতে পারে, নাসিকা বিকৃত হইলে আর ফুলের গন্ধ পায় না। তেমনি আত্মা যদি সহজভাবাপন্ন থাকে, সহজেই ঈশ্বরের পুণ্য গন্ধ লাভ করিতে পারে; আর আত্মা নানা ভাবে পাপ মলিনতায় বিকৃত হইলে, ঈশ্বরের পুণ্য গন্ধের সম্ভাবনা থাকিলেও পুণ্য গন্ধ লাভ করিতে পারে না।

সূর্য্যের মধ্যে পরম সূর্য্য ঈশ্বরই প্রকাশিত। তাই এই বৈশাখের প্রখর সূর্য্যকিরণে পুণ্যময় ঈশ্বরেরই মহা প্রভাবের খেলা ও গূঢ় লীলা এবং তাঁহারই পুণ্য গন্ধ। বৈশাখের প্রখর সূর্য্যলীলায় সরল মানব-প্রাণ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে এই পুণ্য প্রভাব অনুভব করে, সম্ভোগ করে এবং তাহা দ্বারা অধিকৃত হয়। তাই এই বৈশাখ মাসে মানবের অন্তরে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভাব, নূতন নূতন পুণ্যব্রত উদ্‌যাপনের ভাব জাগিয়া উঠে। এ সময় বাহ্য প্রকৃতি সহজেই মানব-প্রাণে দেবত্বের বা ঈশ্বরের ভাব জাগাইয়া তোলে। বৈশাখের প্রভাত কত সুন্দর, কত মনোহর! প্রভাতে বিমল স্নিগ্ধ সূর্য্য-কিরণে, বিমল মধুর বায়ু-হিল্লোলে ঈশ্বর যেন মিশিয়া রহিয়াছেন। বৈশাখের নদী-জলে অবগাহন-স্নান কত জীবনপ্রদ, কত আরামপ্রদ, কত তৃপ্তিকর! বৈশাখের নদ নদীর শীতল জলে ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব, তাঁহার কোমল করুণা কত সহজে অনুভবের ও সম্ভোগের বিষয় হয়। তাই বৈশাখ মাস পুণ্য মাস। প্রাচীন সমাজে এ সময় কত অন্ন-দান, জল-দানের আকারে, কত সাধু ভক্তের সেবার আকারে কত নূতন নূতন পুণ্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নববিধানকে জাতীয় বিধানরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বৈশাখের এই জাতীয় ভাব অনুসরণ করিয়া নববিধান-মণ্ডলীর অনেক সাধ্বী মহিলা বৈশাখ মাসে পুণ্যব্রত পালন করেন। স্বয়ং মঙ্গলময় বিধাতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে বৈশাখ মাসের ১লা তারিখে আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া, স্বয়ং ব্রহ্মানন্দের জীবনে এই আর্য্যজাতীয় ভাবকে, পুণ্য বৈশাখের ভাবকে উজ্জ্বল আকারে দান করিয়াছেন। লীলাময় শ্রীহরি আমাদের অন্তরে এ সময় জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করুন, বৈশাখকে পুণ্য মাসরূপে গ্রহণ করিতে দিন, এসময় আমাদিগকে নানা ভাবে পুণ্যব্রত-পালনে তৎপর করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ক্রুশাহত দেহ।

ক্রুশাহত মানব-মূর্ত্তি দেখি! হস্ত ক্রুশকাষ্ঠে নিবদ্ধ, হস্ত আর কোন কার্য্য করিতে পারে না, পাপ কাজ করিবে কি করিয়া? পদদ্বয়ও ক্রুশকাষ্ঠে নিবদ্ধ, আর চলিবার শক্তি নাই, পাপের পথে যাইবে কি প্রকারে? মস্তক কণ্টক-বিদ্ধ, আর পাপ চিন্তা কেমনে করিবে? মৃত্যু-চিন্তা শতই মনে জাগ্রত, কাজেই "হে পিতঃ, তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ করিলে" বলিয়া ব্রহ্মকৃপা-লাভের জন্য প্রাণ আকুল, সুতরাং চক্ষের দৃষ্টি স্বর্গের দিকেই ধাবিত। এই অবস্থা কাহারও হইলে তাহার পাপ প্রবৃত্তি কি আর থাকিতে পারে? এই ভাব-সাধনে নিশ্চয়ই পাপ আমিত্বের মৃত্যু সংসাধিত হয় এবং পাপের মরণে আত্মার উজ্জীবন বা নবজীবন বা পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী হয়। ব্রহ্মনন্দন মানবনন্দন হইয়া, সমগ্র মানবকে আপন অঙ্গে, আপন দেহে আরোপিত করিয়া, এই ভাবে ক্রুশে আত্মাহুতি দিয়াছেন। তেমনি যদি আমিও দিতে পারি, আমিও পাপমৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া নব জীবন পাইব। ইহাই শিক্ষা দিতে ঈশার ক্রুশারোহণের অভিনয়। তাই গাই, "করে গেছেন যে অভিনয়, ক্রুশে হত মেরীর তনয়, হয় নাই কভু হবার নয়, তেমন রঙ্গ জগতে আর।"

প্রেমের জয়।

দণ্ডের পরিবর্ত্তে দণ্ড, রাগের পরিবর্ত্তে রাগ, যুদ্ধের পরিবর্ত্তে যুদ্ধ, ইহা প্রাচীন বিধান, ইহা মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবৃত্তি, ইহাই মানবীয় ধর্ম্ম বলিয়া বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মনন্দন শ্রীঈশা ক্রোধের বিনিময়ে ক্ষমা, নির্য্যাতন নিপীড়ন তিরস্কার লাঞ্ছনার পরিবর্ত্তে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইলেন; কেবল

যাহা নয়, ক্রুশবিদ্ধকারী শত্রুদিগের জন্যও এই প্রার্থনা করিলেন, "পিতঃ, ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না, ইহারা কি করিল।" তাহাতে তাহারা বিদ্রূপ করিল। ইহাই মহা প্রেম। নববিধানাচার্য্য এই মহাপ্রেমেই প্রণোদিত হইয়া শিখাইলেন, "Love thy brother more than thyself"—ভাইকে আপনা অপেক্ষা ভালবাস।

আমিত্বের মৃত্যু।

কবীর বলেন, "যে দিন আমার আমিত্বের মৃত্যু হইল, সে দিন আমার আনন্দ হইল, আমার সঙ্গীরাও ঈশ্বরের ভজনা করিতে লাগিল।" ইহার অর্থ অতি গভীর। সত্যই যখন আমাদের আমিত্বের মৃত্যু হয়, তখনই যথার্থ ব্রহ্মানন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মের যে আনন্দ তাহাই লাভ হয়, পার্থিব বাসনা কামনার যে আনন্দ বা সুখ তাহা আর থাকে না। আর আমার সঙ্গী যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য্য, ইহারাও আমার বিরুদ্ধতা ছাড়িয়া ঈশ্বরের ভজনায় আমার সহায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ কাম নীচ কামনা ছাড়িয়া ব্রহ্মকামী হয়, রাগ ব্রহ্মানুরাগে পরিণত হয়, লোভ ব্রহ্মলোভী করে, মোহ ব্রহ্মেতেই মুগ্ধতা আনিয়া দেয়, মদ ব্রহ্ম-প্রেমরস-মদিরা-পানে মত্ত করে এবং মাৎসর্য্য পরশ্রীতে ব্রহ্মশ্রী দর্শনের আনন্দ দান করে।

নববর্ষ-সমাগমে।

নববর্ষ নবদীক্ষা, নবশিক্ষা নবজীবন দানের জন্য সমাগত। পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়া নববর্ষকে অভিবাদনপূর্ব্বক সাদর আহ্বান করি। পুরাতন বর্ষের সহিত পুরাতন জীবন বিদায় হউক। পুরাতন পাপ, পুরাতন পরিতাপ, পুরাতন অভ্যাস, পুরাতন চিন্তা, পুরাতন কামনা, পুরাতন বাসনা, এমনকি পুরাতন ধর্ম্মসংস্কার পর্য্যন্ত বিদায় গ্রহণ করুক। বৃক্ষের পুরাতন পত্র ঝরিয়া না পড়িলে নূতন পত্রের উদ্গম হয় না, নূতন ফুল নূতন ফল দেখা দেয় না, তেমনি এ জীবনেরও পুরাতন যাহা কিছু তাহা বিনাশ প্রাপ্ত না হইলে নূতন জীবনের স্ফুরণ হয় না, নূতন ভাব, নূতন ভক্তি, নূতন বিশ্বাস, নূতন চিন্তা, নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা জীবনে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না।

পুরাতন জন্মের ত্যাগেই, নূতন জন্ম, দ্বিজত্বলাভ হইয়া থাকে। তাই পুরাতন অভ্যাস বিনাশের জন্য সব হিন্দু এ সময় সন্ন্যাস সাধন করিয়া, আত্ম-গোত্র ত্যাগ করিয়া, শিবগোত্রে প্রবেশের সাধন করেন।

ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ রোজা দ্বারা আহার পানে সংযম সাধন করিয়া, নবচন্দ্রদর্শনে নব উৎসবের জন্য প্রস্তুত হন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ "লেণ্ট" ব্রত অবলম্বনে শ্রীঈশার ক্রুশের অনুগমনে আত্মত্যাগ সাধন করেন। শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ উৎসবেও এই শিক্ষা যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে পুরাতন আমিকে বা আমার ইচ্ছাকে বলিদান করিয়া, পিতার সহিত ইচ্ছাযোগ-সমাধানে উজ্জীবন বা নবজীবন লাভ করিব।

নববিধান এই নবজীবন-বিধানেরই বিধান। নববিধান পুরাতন সমস্ত ধর্ম্ম, সমস্ত সাধু, সমস্ত শাস্ত্রকে নবজীবন দিতে যেমন শুভাগমন করিয়াছেন, তেমনি প্রত্যেক মানব, পরিবার, জাতি, দেশ এবং সমগ্র বিশ্বকেও নবজীবন দিতে আসিয়াছেন। নববর্ষদিনে তাই নববিধানাচার্য্য নব অভিষেক-লাভে যেমন নববিধান-মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দ হইলেন, তেমনি আমরাও ব্রহ্মকৃপাবলে পুরাতন জীবন-পরিহারে নবজীবন-লাভে ধন্য হই, সকলকে নবভাবে গ্রহণ করিয়া জীবনে নববিধানকে গৌরবান্বিত করি।

আমাদের দায়িত্ব।

(১লা ফেব্রুয়ারী, রবিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নিবেদিত)

আমরা গত একমাস ধরিয়া উৎসবের প্রস্তুতি ও উৎসব সাধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। আজ উৎসবের শেষদিনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আজ আমাদের হিসাব নিকাশের সময় আসিয়াছে। আমরা কি ভাবে, কি সঙ্কল্প লইয়া উৎসবে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কি ভাবে উৎসব করিলাম, উৎসবে কি পরিমাণ সত্যানুসরণ করিলাম, বাস্তবিক কতখানি দেবপ্রসাদ লাভ করিলাম, আমরা উৎসবে যাহা পাইয়াছি তাহা ধরিয়া রাখিতে বাস্তবিক মনস্থ করিয়াছি কি না এবং উৎসব-প্রসাদ অন্য সকলকে বণ্টন করিবার জন্য আয়োজন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি কিনা, এই সব নিজ নিজ মনের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত।

আমাদের কর্ত্তব্য এই হইবে যে, আজ মন্দির হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে এই প্রতিজ্ঞা লইয়া যাইব যে, উৎসব-সম্ভোগের সময় যে কিছু শক্তি সঞ্চয় হইল ও যে কিছু আশা পাইলাম, তাহা সম্মুখের সারা বৎসর যেন প্রাণে রক্ষা করি ও জীবনে সাধন করি।

নববিধান সমস্ত জগতের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছে। আমরা নববিধানাশ্রিত হইয়া আমাদের নিজেদের উদ্ধারের পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং নববিধানের সুসমাচার জগতে বিস্তৃত করিবার জন্য কতদূর যত্ন করিয়াছি, তাহা নির্দ্ধারণ করি। যে সকল ত্রুটী আমাদের আছে ও হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া ভবিষ্যতে ঐ সকল ত্রুটী মোচন করিবার উপায় উদ্ভাবন করা আমাদের একান্ত আবশ্যক। সাময়িক উৎসাহ ও উত্তেজনার কোন মূল্যই নাই, যদি আমরা স্থায়ী কোন কিছু না পাই কিম্বা পাইবার জন্য সাধন না করি।

আমরা অনেকবারই শুনিয়াছি, এবং ইহা অতি খাঁটি সত্য কথা যে, নববিধান শব্দটী বাক্যেই রাখিলে কোন লাভই হইবে

না। নববিধান সাধন ভিন্ন আমাদের পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনাই নাই। আমাদের এ বিষয়ে বড়ই দৈন্যদশা সমুপস্থিত হইয়াছে। আমাদের ভক্তিভাজন পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্রগামিগণ—যাঁহারা জীবনে নববিধানের সাধন করিয়া জগৎকে কত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহারা একে একে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। শেষ যে দীপটী ছিল, তাহাও আজ সাত মাস হইল, জগজ্জননীর কোলে আশ্রয় লইয়াছেন। এখন আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। এখন প্রাণের সহিত কার্য্য করিবার লোকের বিশেষ অভাব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা সব দিক দিয়া অত্যন্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। তাহার উপর চারিদিক হইতে শত্রুগণের প্রবল আক্রমণ; কিন্তু আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না। আমাদের মনে যদি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তীক্ষ্ণ ক্ষোভ ও মনস্তাপ উদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই। এই তো গত সোমবার শুনিলাম, কি প্রকারে স্নেহময়ী জগজ্জননী অকিঞ্চন দীন দুঃখী সন্তানদের জন্য প্রসাদ স্বয়ং পরিবেশন করেন। আমরা যথার্থই অকিঞ্চন। আমাদের নিজেদের সাধন লইয়া মার ভক্ত সন্তানদের মত তাঁর কাছে উপস্থিত হইতে পারি না সত্য, কিন্তু নিজেরা অকিঞ্চন বলিয়া ক্ষোভে নয়নাশ্রু ফেলিতে পারি, যথার্থভাবে অকিঞ্চনদের উৎসব করিতে পারি। তাহা হইলেই আমাদের দুর্দ্দশা দূর হইবার পথ হইবে। সাধনের দৈন্য আপাততঃ থাকিলেও যদি প্রকৃত বিশ্বাস আমাদের থাকে, যদি আমরা যথার্থ ই বিশ্বাস করি যে আমাদের একজন বিধাতা আছেন, ও সেই বিধাতা আমাদের ও জগতের উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রিয় নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন এবং নববিধান মানুষের মস্তিষ্কের সৃষ্টি নয়, তাহা হইলে আমাদের অকিঞ্চনতা ও মনের জ্বালা দেখিয়া অকিঞ্চননাথ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার করুণার স্রোত আমাদের মস্তকে প্রবলবেগে আসিয়া পড়িবেই পড়িবে।

সত্য বটে, আমাদের অন্তরে বাহিরে প্রবল শত্রু। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই অন্তরের শত্রুরা আমাদের সঙ্গে পরিণামে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। বাহিরের শত্রুগণ অবশ্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কেহ কেহ নবশিশু নববিধানের প্রাণ হরণ করিবার জন্য যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন ও সময়ে অসময়ে ইহার প্রতি অযথা কুবাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কেহ কেহ বা ইহার রত্ন-ভাণ্ডার হইতে রত্ন সকল অপহরণ করিয়া তাহা আপনার নিজের সম্পত্তি বলিয়া সদর্পে জগতের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং সেজন্য কত প্রকারই বা দুষ্টপ্রচারনীতির (propagandaর) অবতারণাই করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের অবশ্য স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, নববিধানের সৃষ্টি ও অবতারণায় মনুষ্যের হস্ত নাই, এবং স্বয়ং মা জগজ্জননী নববিধান ঘোষণা ও প্রচারের আরম্ভ করিবার জন্য যাঁহাকে যন্ত্রস্বরূপ মনোনীত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা করিয়া গিয়াছেন।

আবার কেহ কেহ বা স্বয়ং মার নিয়োজিত যন্ত্রের দ্বারা যে সকল সত্য বাস্তবিক জগতে প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল সত্য অন্যের মুখে দিয়া, মার নিয়োজিত যন্ত্রকে লোকের চক্ষে হীন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং সেই জন্য কত কষ্ট কল্পনা করিয়া কতই অদ্ভুত আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। আপাততঃ অসত্যের কথঞ্চিৎ জয় হইতেছে ও লোকের চক্ষে ধুলা দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা যে, পরিণামে সত্যের জয় হইবেই হইবে। চিরকাল অসত্য ঢাকা থাকিতে পারে না। অধর্ম্মের জয় প্রথমে হইলেও ধর্ম্মের জয় পরিণামে হইবেই হইবে। তরল বিশ্বাসীদিগকে অধর্ম্মের আপাততঃ জয় দেখিয়া বিচলিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু আমরা যদি দৃঢ় বিশ্বাসের শিলার উপর আশ্রয় লইতে পারি, তাহা হইলে সমুদ্রের হাজার আস্ফালনেও আমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই।

আমরা ঠিক পথে চলিলে আমাদের কোন নিরাশা আসিতেই পারে না। তবে আমাদের মধ্যে নিরাশার কথা প্রায়ই যে শুনা যায়, তাহার কারণ এই যে, আমরা নববিধানের মূলমন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছি। পূর্ব্বে যে বিশ্বাসের কথা বলা হইল, সেই "দৃঢ় বিশ্বাসই" সেই মূলমন্ত্র। এই বিশ্বাস হইতেই সবই হয়—সাধন, ভজন, কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, সবই পরে হয়। আমরা সঙ্গীতে পাইয়াছি, স্বয়ং বিশ্বাধার হরিই বিশ্বাসীর জীবন :—

"জীবনেতে মৃতোপম অবিশ্বাসী জন,
সতত সন্দিগ্ধচিত্ত মলিন বদন।
বিনা বিশ্বাসে কখন, হয় না ভজন সাধন,
সাধনে বিশ্বাস মূল ধন ;
পায় না কো প্রেমপুণ্য, হয় না যোগে নৈপুণ্য,
অবিশ্বাসীর কাছে শূন্য সকল ভুবন॥"

আমরা মা'নয়াও মানি না যে, "বলং বলং দৈববলং"—ধর্ম্মের বলই প্রকৃত বল ও সকল বলের উপর মহাবল। এই তো সেদিন অভিনয়ে দেখিলাম যে, পার্থিব বলে মহাবলশালী পরাক্রান্ত দাম্ভিক রাজ্যেশ্বর বিশ্বামিত্র—শান্ত, পৃথিবীর হিসাবে নিঃস্ব, দুর্ব্বল, নিঃসহায়, লোকবলহীন, কিন্তু ধর্ম্মবলে বলী বশিষ্ঠ মুনির নিকট পরাজিত হইয়া শেষে বশিষ্ঠদেবেরই শিষ্য হইলেন।

আমরাও যদি ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইবার জন্য আমাদের জননীর নিকট কাতর প্রার্থনা করি এবং সাধনা ও সত্যানুসরণ করি, তাহা হইলে অলৌকিক ভাবে ভগবৎ-কৃপার স্রোত আমাদের নিকট আসিয়া আমাদিগকে মহাবলবীর্য্যশালী করিবে। ইহা যদি আমরা বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে আমরা নববিধান বিশ্বাস করি না, কেবল নববিধানের মত লইয়া কাটাকাটি মারামারি করি। "নববিধান' একটী মতের সমষ্টি মাত্র নহে।

কিম্বা নববিধান শব্দটী কেবল মুখে উচ্চারণ করিবার একটী বস্তু নহে। অপর পক্ষে নববিধান শব্দটী কোন বিষধর সর্পও নহে যে, মুখে নববিধান শব্দটী আনিলেই উহা দংশন দ্বারা কাহাকেও জর্জ্জরিত করিবে।

নববিধান সাধনের বস্তু, উহা সাধন করিতে পারিলে সুফল হইবেই। দূরে যাইতে হইবে না, দেখুন না এই মণ্ডলী যে সকল সাধকদিগের দ্বারায় প্রথম গঠিত হইয়াছিল, সেই অল্প কয়েকটী লোক তাঁহাদের সত্যানুরাগ, কার্য্যানুরাগ, বাক্যের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য, প্রকৃত বৈরাগ্য, অকপটতা, গভীর উপাসনা, দৃঢ় বিশ্বাস, নিষ্ঠা, প্রেম, ভালবাসা, অন্যকে ভাল করিবার ইচ্ছা, ভগবদ্‌ভক্তি, অকাতরে পরিশ্রম, ধর্ম্মপ্রচার-নিষ্ঠা, প্রার্থনাশক্তি, ভগবানের করুণাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ, লোক-সেবা, নিজেরা আনন্দ চিত্তে দারিদ্র্যের চরম সীমায় বাস করিয়া, দিনের পর দিন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে যাপন করিয়া, ধর্ম্মের জন্য ও সমাজের জন্য সমুদায় কায বিনা বিরামে ও অকাতরে করণ, এই সকল গুণ দ্বারা কার্য্য করিয়া দেশ তোলপাড় করিয়া কি অগ্নিই প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এই সকল দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহারাই ধন্য। এই দীনেরও সেই সৌভাগ্য কতক পরিমাণে ঘটিয়াছিল বলিয়া নিজেকে অতিশয় ধন্য মনে করি। পূজনীয় আচার্য্যদেবের চরণতলে বসিয়া, তাঁহার মুখের সুমিষ্ট ও প্রেম ভালবাসাপূর্ণ বাণী শুনিবার সুযোগ এই দীনেরও ঘটিয়াছিল বলিয়াই এ দীন এ মণ্ডলীতে স্থান পাইয়াছে।

অন্যদিকে বিধাতার প্রেরণায় কয়েকজন সাধক ও কর্ম্মী সেই সময়ের রত্নস্বরূপ বাণীগুলি লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত করিয়া এবং মৌলিক রচনা করিয়া ও সেই সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া জগতের কত মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন ও আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নানা বাধা বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া এই সকল পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে কেমন পুষ্টি দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা অন্য বিষয়ে দরিদ্র হইলেও এ বিষয়ে আমরা মহাধনী।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থ কথাই বলিয়াছেন যে, "এই বিশ্বাসী সাধকদল দেখা না দিলে ব্রাহ্মসমাজকে এক্ষণে সকলে যাহা দেখিতেছেন, তাহা দাঁড়াইত কি না সন্দেহ।" (অবশ্য "দাঁড়াইতনা" ইহা বলিলেই আরও ঠিক বলা হইত) শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, "ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে, এই শক্তির পশ্চাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব প্রধানরূপে বিদ্যমান ছিল।" অন্যত্র আবার বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদারতা ও সার্ব্বজনীনতা তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান ভাব ছিল। ইহা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার আকাঙ্ক্ষাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাঁহার চিন্তাকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইহাই পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার নববিধানের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাবকে প্রসব করে। ইহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে তাঁহার একটী প্রধান কার্য্য। এ কার্য্যের গুরুত্ব ও মহত্ব প্রতীতি করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও জগতের ধর্ম্মসকল প্রাচীন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লইয়া বাস করিতেছে; ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু দিন আসিতেছে, যখন তাহা দেখিতে পাইবে। তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইবে।"

রত্ন তো আমরা পাইলাম। ইহা কিন্তু আমাদের নিজস্ব সামগ্রী নয়। ইহা জগতের; আমরা ইহার Trustees মাত্র। সে হিসাবে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে করিতেছি কি না, তাহা আমাদের নিজ নিজ অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। এখন আমাদের মণ্ডলীর বাহিরের লোকও এই সকল মহারত্নের সঙ্গে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। যাহাতে তাঁহাদের হাতে আমাদের মণ্ডলীর পুস্তক সকল আমরা দিতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। যে সকল পুস্তক ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্মুদ্রণ করিতে সচেষ্ট ও তৎপর হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করা উচিত। আমাদের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব একটী গুরুতর দায়িত্ব।

উৎসবে নববিধানের অনেক তত্ত্ব শুনিলাম, আমাদিগকে এখন তাহা জীবনে আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য নিষ্ঠার সহিত সাধন করিতে হইবে। আচার্য্যের উপদেশাবলী, সেবকের নিবেদন, দৈনিক প্রার্থনা, হিমালয়ের প্রার্থনা, ব্রহ্মগীতোপনিষদ, জীবনবেদ, True Faith ইত্যাদি অনেক অনেক পুস্তকে এই সাধনের সন্ধান দেওয়া আছে। আমাদের এগুলি ভক্তিভাবে পাঠ করিতে হইবে, আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণের দৃষ্টি ও জগতের জনগণের দৃষ্টি এই সকল পুস্তকের দিকে আকৃষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, এবং সংবাদপত্রে জনগণকে যে সকল ভ্রমে ফেলিয়াছেন, সেই সকল ভ্রম দূরীকরণেরও উপায় করিতে হইবে।

এই গুলিতে যে সকল সাধন ও সত্য আছে, তাহা চির নূতন; তাহা কখনও পুরাতন হইবার নয়। যতবার তাহা মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা যায়, ততবারই ইহা হইতে নূতন আলোক পাওয়া যায়। তবে ইহাতে প্রবেশ করিতে হইলে বিশেষ ধৈর্য্যের আবশ্যক। আমাদিগের যুবক বৃন্দের ইহাতে প্রবেশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অপরদিকে যাঁহাদের ব্রত প্রচার-কার্য্য, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যের এক অংশ গণ্য করিয়া যুবকদিগকে এবিষয়ে সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য, আমার মনে হয়।

মা দয়াময়ী আমাদিগকে আমাদের এই সকল কর্ত্তব্য-পালনের

উপযুক্ত শক্তি ও ইচ্ছা দিন। আমরা তাঁহারই চরণে মস্তক অবনত করিয়া, একান্তমনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের কর্ত্তব্য।

(লক্ষ্ণৌ ব্রহ্মমন্দিরে নিবেদন)

সাধু পল্ এক সময় ধর্ম্মপ্রচারার্থ গ্রীকদেশস্থ এথেন্স্ নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি দেখিয়া মনে বড় ক্লেশ হইয়াছিল। লোকের সত্য ধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা ও কুসংস্কারের প্রাবল্য দেখিয়াই তাঁহার এই দুঃখ। তখন এথেন্স্ নগরে মূর্ত্তি-পূজা এতই প্রবল ছিল যে, সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কোন গ্রীক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, এথেন্স নগরে মনুষ্য অপেক্ষা দেব-মূর্ত্তি অধিক। সাধু পল্ এথেন্স্বাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন :—

"হে এথেন্সবাসিগণ, আমি বুঝিতেছি যে, তোমরা কতকটা ধর্ম্মভীরু। কারণ আমি যখন তোমাদের সহরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, তখন তোমাদের পূজার বস্তু সকল দেখিতেছিলাম। একটী বেদির উপর এইরূপ লেখা দেখিলাম, 'অজানিত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে।' যাহা তোমরা না জানিয়া পূজা করিতেছ, তাহাই আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু ঈশ্বর এই জগৎ ও তদন্তর্গত সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত মন্দিরে বাস করেন না। মনুষ্য-হস্ত দ্বারা তিনি সেবিত হইতে পারেন না। তাঁহার ত কোন বিষয়ের অভাব নাই। তিনি নিজেই সকলকে জীবন ও যাহার যাহা আবশ্যক তৎসমুদয় দিতেছেন। তিনি একজন মনুষ্য অর্থাৎ আদম হইতে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য-জাতি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাদের বাসের জন্য পৃথিবীর উপর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা এক ঈশ্বরকেই অন্বেষণ করে এবং তাঁহাকে জানিতে পারে, যদিও তিনি আমাদের কাহারও নিকট হইতে দূরে নন, কারণ আমরা তাঁহার মধ্যে বাস ও চলা ফেরা করিতেছি ও জীবিত রহিয়াছি।"

একশত বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের দেশের অবস্থা কতকটা এইরূপই ছিল। সাধারণ লোকের মন হইতে শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান অনেকটা লুপ্ত হইয়াছিল। কিরূপ কুসংস্কার ও অজ্ঞানতায় তখন দেশ আচ্ছন্ন ছিল, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। আমি কেবল আমাদের দেশের সাধারণ লোকের অবস্থার কথা বলিতেছি। বেদাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ কি অক্ষয় সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা তৎকালীন সাধারণ লোকে জানিত না।

এই সময় রাজা রামমোহন রায় উত্থিত হইলেন। ঈশ্বর কর্ত্তৃক তিনি প্রেরিত হইলেন, এই কথাই বলিব। তিনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঋষিগণের অদ্ভুত ব্রহ্মজ্ঞান অবগত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশের লোকের মনে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত করা আবশ্যক। তিনি এই উদ্দেশে উপনিষদ্ শাস্ত্র বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিলেন। ইহাতে দেশীয় লোক দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠে সক্ষম হইল। ক্রমে ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মভাবের বিকাশ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বর-ভক্তির বিকাশের মধ্যে আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে পাই। ব্রাহ্ম-সমাজে যে ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমাদের পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান, এবং ভক্তির যে বিকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রভৃতি ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তগণের ভক্তিভাব দেখিতে পাই।

কিন্তু ইহা বলিলেই সব বলা হইল না। আর এক ধর্ম্ম-ভাবের মহাস্রোত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সে স্রোত ঈশ্বর-সন্তান যীশুর ধর্ম্ম-জীবনের প্রবাহ। ঈশ্বরে স্থির বিশ্বাস ও নির্ভর, সংসারের সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থায় মধ্য তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ের উপর একান্ত নির্ভর, পরীক্ষা বিপদের মধ্যে বললাভের জন্য তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকা, একান্ত সরল বিশ্বাস ও অনুরাগের সহিত ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শেখা, মনুষ্য-জীবনের অনন্ত উন্নতি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা—ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এই যে সব মহাভাবের অভ্যুদয়, এ সকলের মধ্যে খৃষ্ট-জীবনেরই প্রভাব দেখিতে পাই।

আমাদের ধর্ম্মভাব ও চরিত্রের মধ্যে পৃথিবীর ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের ভাব ও চরিত্র পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে বলিয়া, আমরা বর্ত্তমান ধর্ম্ম-সংস্কারকে যেন সামান্য ব্যাপার মনে না ক'র। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ঈশ্বরের আলোক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ঈশ্বরের একটী বিশেষ বিধান। বর্ত্তমান কালের নানা বিষয়ের চিন্তায় ইহা উপযোগী এবং নানা প্রশ্নের মীমাংসাস্থল। ঈশ্বরের সহিত প্রত্যেক মনুষ্যের যে সাক্ষাৎরূপে সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই ধর্ম্ম তাহা সর্ব্বদা শিখাইতেছে। সাধু মহাপুরুষদের ধর্ম্মভাব সকল ইহার মধ্যে পুনঃ জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মভাব সকল প্রাচীন হইলেও, যখন সে সকল ঈশ্বর-প্রসাদে কোন মনুষ্যের মধ্যে পুনঃ প্রকাশিত হয়, তখন তাহা নূতন ও সজীব রূপে প্রকাশিত হয়। সত্য ধর্ম্মজীবন একটী জীবন্ত বস্তু। যেমন প্রতিদিনের প্রভাতকাল নূতন বলিয়া মনে হয়, যথার্থ ধর্ম্মজীবনও সেইরূপ নিত্য নূতন। জগতের সকল ধর্ম্মভাবকে একটী অখণ্ড বস্তু বলিয়া অনুভব করা এবং তাহার মধ্যে ক্রমোন্নতি দর্শন করা বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানের বিশেষত্ব। পৃথিবীতে এরূপ ধর্ম্মমতের এমন সুন্দর সুস্পষ্ট প্রকাশ পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, এই জন্য ইহা নববিধান।

নববিধানের মধ্যে আসিয়া আমরা কি মহা ধর্ম্মভাবের মধ্যে

পড়িয়াছি, তাহা আজ আমাদের ভাল করিয়া স্মরণের বিষয়। এই জন্য আমি এ সকল কথার উল্লেখ করিতেছি। ব্রাহ্ম-সমাজ এখন হীনপ্রভ, আমরা শক্তিহীন, তাহা হইলেও যে মহা সম্পত্তি, যে অমূল্য ধর্ম্মধন আমরা হস্তে পাইয়াছি, তাহার গৌরব আমরা ভাল করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করি। মনুষ্য-শরীর নষ্ট হইয়া যাইবে, পৃথিবীতে এক জাতি অদৃশ্য হইবে এবং অপর জাতি প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সত্যের বিলোপ কখনও হইবে না। ব্রাহ্ম-সমাজে যে সত্য ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছে তাহা কখন নষ্ট হইবার নয়। আমরা যদি এ ধনের আদর করিতে না শিখি, তাহাতে সত্যের কখন বিলোপ হইবে না। সত্য ধর্ম্ম কোন না কোন স্থানে, কোন না কোন জাতির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবেই হইবে।

কিন্তু আমরা নিরাশ হইব কেন? ঈশ্বর-বিশ্বাস ত আমাদের মন হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহার প্রতি কোমল অনুরাগ আমাদের মনে একেবারে শুকায় নাই। সরল বিশ্বাস ও কোমল অনুরাগে তিনি লভনীয়।

এ কথা যেন আমাদের স্মরণে থাকে যে, আমাদের এই জাতীয় বিপ্লবের সময়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা কেবল আমাদের এই উদার ধর্ম্মমত ও সমুন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শেই সুসম্পন্ন হইতে পারে।

তবে আর বিলম্ব কেন? যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট হইতে কেহ ত দূরে নন। তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস আরও স্থিরতর হউক। তাঁহার প্রতি অনুরাগ আরও গাঢ়তর হউক। অনুক্ষণ ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকি। তাঁহাকে যদি হৃদয়ে পেলাম, তবে আমার অলভনীয় আর কি রহিল? সকল ধন অপেক্ষা হরি-ধন মূল্যবান্ জেনে, যাহাতে তাঁহাকে হৃদয়ে পেয়ে আমরা স্বর্গের সুখ শান্তির অধিকারী হতে পারি, পরমজননী আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(৮ই জানুয়ারী, শিলচর, নর্ম্মালস্কুলে স্মৃতি-সভায় পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত প্রচারকদিগকে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। মনীষী এবং জগদ্বিখ্যাত বক্তা প্রতাপচন্দ্র খৃষ্ট-ধর্ম্মের, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দু ধর্ম্মের, সাধু অঘোরনাথ বুদ্ধ-ধর্ম্মের, মৌলবী গিরিশচন্দ্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা নিযুক্ত হইলেন। প্রতাপচন্দ্র ঈশার জীবন এবং ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া সভ্য জগৎকে মোহিত করিয়াছেন। Oriental Christ, Heart-beat, the Spirit of God, Life and teachings of Keshub Chandra Sen এবং আশীষ ইত্যাদি পুস্তক রচনা করিয়া তিনি জগতে ধন্য হইয়াছেন। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় একজন সামান্য রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার জীবনে কেশবচন্দ্রের ছায়া পড়াতে তিনি সংস্কৃত-ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের এমন কোন বিভাগ ছিল না, যাহা অধ্যয়ন করিয়া তিনি পাণ্ডিত্য লাভ না করিয়াছেন। প্রত্যেক সংস্কৃত অভিজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার রচিত সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মহাযোগী সাধু অঘোরনাথ বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থ হইতে বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্ব এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সমন্বয়তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি পালি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মৌলবী গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রভাবে তিনি নববিধানে মৌলানা হইয়া, অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে কঠিন আরবী এবং পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া, পবিত্র কোরাণ, মহম্মদের জীবন-চরিত, তাপসমালা নামে মুসলমান তপস্বীদের জীবন চরিত, এমাম হসন ও হোসয়নের জীবনী, তপস্বিনী রাবেয়া, খদিজা, ফাতেমা ও আয়শা দেবীর জীবনী, হদিস, হাফেজ এবং চারিজন খলিফার জীবন চরিত ইত্যাদি বহুসংখ্যক গ্রন্থ আরবী এবং পারস্য ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। একজন মৌলবী বলিয়াছেন যে,—"গিরিশ চন্দ্রের নিকট সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে ঋণী। বঙ্গের কোটি কোটি মুসলমান সমবেত চেষ্টায় যাহা না করিতে পারিয়াছিল, একা গিরিশচন্দ্র তাহা সাধন করিলেন।"

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মভাবকে সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারে পরিণত করিবার জন্য সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বা চিরঞ্জীব শর্ম্মা চির বিখ্যাত। কেশব যে অদ্ভুত ভাষায় নববিধানের নব বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, সঙ্গীতাচার্য্য সঙ্গীতের শ্রুতিসুখকর ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া নিজেও অমর হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতাবলী সঙ্গীত-শাস্ত্রের এক অমূল্য ধন। লোকে কথায় বলে যে, স্পর্শমণি যে প্রকার স্পর্শ করিলে অন্যান্য দ্রব্য স্বর্ণরূপ ধারণ করে, সেই প্রকার কেশবরূপ স্পর্শমণির নিকট যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মানব-সমাজে খাঁটি সোণা হইয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের জীবনী এত বৃহৎ, এত মহান্, এত গভীর যে, এই প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ করা, বামন হইয়া আকাশের চাঁদ ধরার ন্যায় অসম্ভব। বর্ত্তমান সময়ের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করা যায় যে, ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব ভবিষ্যতে ধর্ম্মের ভিত্তি হইবে।

অদ্য এই বিশেষ দিনে ভক্ত কেশবচন্দ্রের জীবনী একটু আলোচনা করিয়া আমরা ধন্ত এবং কৃতার্থ হইলাম।

আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, কেশবের স্বর্গারোহণের দিন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে আমি কলিকাতায় ছিলাম; এবং সে দিন সমস্তকে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে, যাঁহারা ইচ্ছা করেন, কেশবকে দেখিতে পারেন। আমরা কয়েকজন কলেজের ছাত্র সহ "কমলকুটীরে" মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এখন সকলে ভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্ত প্রার্থনা করি।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।" শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া—"যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যু-পাসতে। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে তাহা সম্যকরূপে পরিলক্ষিত হয়।

কেশবচন্দ্রের জীবিত কালে হিন্দু-সমাজ তাঁহার অনেকটা বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর হিন্দু-সমাজের মুখপত্র "বঙ্গবাসী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ৪৬ বৎসর পরে আজও তাহা হৃদয়ের মধ্যে কি এক গভীর ভাব আনয়ন করে।

প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের, কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর "নির্ম্মল নীল গগনে আজ সহসা বজ্রাঘাত হইল, আজ সুমেরু শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আকাশ হইতে পূর্ণচন্দ্র খসিয়া পড়িল" ইত্যাদি স্বর্গীয় ভাষায় "বঙ্গবাসী" যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পাঠ করা উচিত।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

একাধিকশততম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২১শে জানুয়ারী, প্রাতঃকালে, যথারীতি নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। "ছোটর কাছে মা ছোট তুমি, ছেলের সঙ্গে ছেলে খেলা কর তুমি, আবার ছোটকে বড় করে কত উচ্চ আশায় তাকে আশান্বিত কর। যেমন উজ্জল কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে কত ক্ষুদ্রকেও বৃহৎ দেখা যায়, তেমনি তোমার ভিতর দিয়া দেখিলে ক্ষুদ্র ঢিপিকেও পর্ব্বত মনে হয়, তুমি কতই উজ্জ্বল দেখাও।" এই ভাবে প্রার্থনাদি হয়। সন্ধ্যায় "আমাদের সঙ্ঘের" উৎসব হয়।

আমাদের সঙ্ঘের উৎসব।

শান্তিকুটীরের প্রাঙ্গণে পত্র পুষ্প ও নানারূপ লেখা দ্বারা সজ্জিত সামিয়ানার ভিতরে সন্ধ্যা সাটার সময় বন্ধুরা সকলে সমবেত হন। সেখান হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে মঙ্গলপাড়ার সাধু অঘোরনাথের গৃহের সম্মুখে তাঁহার সমাধি পার্শ্বে যাওয়া হয়। কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় সাধু অঘোরনাথের জীবন-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন এবং তরুণ বন্ধুদের নিকট তাঁহার পরিচয় দেন। তাঁহার যোগ, বিশ্বাস, বিপদের মধ্যে ভগবানে আত্ম-সমর্পণের কথা বিশেষ করিয়া বলেন, এবং তাঁহার বাসগৃহ নববিধান প্রচার আশ্রম ভুক্ত হওয়ায় এই যে আনন্দ উৎসব, ইহাতে ঋণ স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা দান করেন। তৎপরে সাধু অঘোরনাথের সাধু যোগজীবন সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত নূতন সঙ্গীতটী মেয়েরা গান করেন:—

ধন্ত তিনি যাঁর করুণা রচিল
সাধু অঘোরের পুণ্য দেহ মন,
নমি তাঁরে যাঁর ইচ্ছায় হল
উদ্ভব নব যোগ-জীবন।

নববিধানের নববেদ আজ
ধরিছে বক্ষে নবযোগমায়া,
গভীর গম্ভীর তপস্বীর ছায়া
লভিল শোভন সুন্দর কায়া।
গাহ জয় যাচি আজি ভাই বোন
নম্র সৌম্য যোগের জীবন।

বিশ্বাস-বীর্য্যে সাধুতা-শৌর্য্যে
দিব্য মূর্ত্তি ভক্তের রক্ষা, *
নববিধানের নব ভাগবতে
সোণার অক্ষরে হইল যে লেখা;

দেবতার লীলা হয়নিক শেষ
আশা কর ভাই লভিবে বেশ
তোমাতে আমাতে নির্ব্বিশেষ
সাধু অঘোর, যোগী অঘোর,
ভক্ত অঘোর, অঘোর বীরেশ।
গাহ জয় আজ যত ভাই বোন
উৎসর্গের রাগে রঞ্জিয়া জীবন।

তাহার পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে "নিত্য পরব্রহ্ম শান্ত সাগর সমান যে" কীর্ত্তনটী করিতে করিতে সকলে উৎসব স্থলে ফিরিয়া আসিলে উপাসনা আরম্ভ হয়। সঙ্ঘের তরুণ বন্ধুগণ এবং সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ "হে মাতঃ জননী দীনহীন জনে কর শুভ আশীর্ব্বাদ দান" এই সঙ্গীতটী করেন। মধ্যে "আজিকার দিনে কে কোথায় আছ বিধানমন্ত্র পূজারী"

---

* সাধু অঘোরনাথের দগ্ধ হস্তে পড়া ও প্রাণরক্ষা জীবন-চরিতে দ্রষ্টব্য।

নূতন সঙ্গীতটী গীত হয়। এই সঙ্গীতটী পূর্ব্বে "ধর্ম্মতত্ত্বে" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় পুণ্য ভাবে তরুণতা ও নবজীবনের মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া উপাসনা, পাঠ ও উপদেশ প্রদান করেন। সে দিনকার উপাসনা, সঙ্গীতে, উৎসবে ভাই প্রমথলালের পুণ্য জীবনের উৎসাহ, প্রেরণা ও ভাব সকলের ভিতরে জাগ্রত হইয়া সকলকেই উদ্দীপিত করিয়াছিল।

উপাসনান্তে দেবালয়ের প্রাঙ্গণে শ্রীমান্ বিজয়মোহন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের সেবায় প্রস্তুত খেচরান্ন সকলে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া উৎসবকে আনন্দময় ও জয়যুক্ত করেন।

২২শে জানুয়ারী, নবদেবালয়ে যথারীতি উপাসনা হয় এবং শান্তিকুটীরে ব্রাহ্মিকা-উৎসব হয়। বিভিন্ন সমাজের অনেকগুলি ব্রাহ্মিকা এবার সমবেত হন। ভ্রাতা ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সুললিত ভাষায় ও ভাবযোগে উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশ বারান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তিভাজন প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী দেবী এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অবস্থাতেও কোন রকমে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া প্রাণস্পর্শী ভাবে বিশেষ প্রার্থনা করেন ও সকলকার আদর অভ্যর্থনা করেন। এবার আশ্চর্য্যভাবে স্বর্গীয় প্রেরিতদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী জ্যোৎস্নাভাত মহাশয়ের আত্মার প্রীতি-কামনায়, এই উৎসব উপলক্ষে প্রীতিভোজনের প্রায় সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। মহোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মকৃপার অবতরণের ইহাও এক বিশেষ নিদর্শন।

২৩শে, নবদেবালয়ে, চিন্ময়ী বাগ্‌বাদিনীর পূজা হয়। নববিধানে বিশেষভাবে বাগ্‌বাদিনী বিধান-বিবেক-বীণা বাদন করিয়া, ভক্ত হৃদয়-কমলবাসিনী হইয়া, মা যে স্বয়ং দিব্য জ্ঞান চৈতন্য ও দর্শন শ্রবণ দিয়া, মানবাত্মাকে পরিচালন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই উপাসনা-যোগে বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তন যোগে উপাসনা শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সুমধুর ভাবে সম্পাদিত হয়। এই উপলক্ষে মন্দিরে বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

২৪শে জানুয়ারী, ১০ই মাঘ, নবদেবালয়ে যথারীতি উপাসনা হয় এবং ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে নীতিবিদ্যালয়ের বালকবালিকাদিগকে লইয়া ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ বিশেষ উপাসনা করেন। আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "সহজ মাতৃরূপ" আবৃত্তি করিয়া, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ঈশা ও কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের বাল্য জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিতে বালকবালিকাদিগকে উপদেশ দেন। অপরাহ্নে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে নীতিবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বিদুষী পত্নী দেবী পারিতোষিক বিতরণ করেন। বালকবালিকাগণ আবৃত্তি ও অভিনয়াদি প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দকে প্রীত করেন। বালক বালিকাগণকে জলযোগ করান হয়।

২৫শে জানুয়ারী, ১১ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব সম্পন্ন হয়। কিছুক্ষণ সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি হইলে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাতঃকালীন উপাসনা সম্পন্ন করেন। উদ্বোধন, আরাধনা ও উপদেশে নববিধানের নবজীবন-লাভের উচ্চতত্ত্ব বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ ভাব-সহযোগে ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হয়। ব্রহ্মস্তোত্রের পরিবর্ত্তে মাতৃস্তোত্র উচ্চারিত হয়। নববিধানের মানুষের অবতারণা যাহাতে প্রতি জীবনে হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা হয়। উপদেশটী বারান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাতঃকালীন উপাসনার পর ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে সাধক সাধিকাগণের প্রীতি ভোজন হয়।

অপরাহ্ন ৩টায় ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ মধ্যাহ্ন উপাসনা করেন। উপাসনার পর আলোচনা ও পাঠ হয়। আলোচনায় ভ্রাতা বেণীমাধব দাস ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ কিছু কিছু বলেন। পরে ভাই চন্দ্রমোহন ধ্যানের উদ্বোধন করিলে কেহ কেহ ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে উন্মত্তভাবে জমাট কীর্ত্তন হয়।

ভাই প্রিয়নাথকে সন্ধ্যায় বেদীর কার্য্য করিতে হয়। তিনি উদ্বোধনে বলেন, আজ ১১ই মাঘ, আজ আমরা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজের সবার সঙ্গে একযোগে ১১ই মাঘের উৎসব সাধন করিতে আহূত হইয়াছি। আজ ১২ই মাঘ নয়, নববিধানের মহোৎসবের সাম্বৎসরিক দিন আজ নয়, আজ সবে নববিধানের সূত্রপাতের দিনটি স্মরণীয়। আজ ব্রহ্মের উৎসব করি, মার উৎসব কালকেকার দিনে সাধন করিব। তাই আজ যেখানে যত ব্রাহ্মসমাজ আছে, ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মোৎসব করি। নববিধানে যে মহা ঝড় বহিয়াছে, তাহার আরম্ভ যেখানে, তাহাও সামান্য নয়, তাহাও মানবীয় ব্যাপার নয়। ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন ব্রহ্মপ্রেরণাতেই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের আদেশেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন, ব্রহ্মোপাসনা ও ধ্যান সাধনায় আমাদিগকে প্রণোদিত করিলেন। নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়া নববিধানের পূর্ব্বাভাস দেখাইলেন। এই ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব তাঁহাদের সহিত বিশেষভাবে একাগ্রভাবে সাধন করি। আমাদের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে যেমন পূর্ব্বে আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া এই ১১ই মাঘের উৎসব সম্ভোগ করিতাম, আজ সেই স্মৃতি জাগ্রত করিয়া, ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে ব্রহ্মোৎসব করি। রাজর্ষি ধর্ম্মপিতামহের সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জন যিনি, ধর্ম্মপিতা মহর্ষিদেবের সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতম্ যিনি, তিনি আজ আমাদিগের নিকট জীবন্তরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার মহাপূজায় প্রবৃত্ত করুন, অন্যকার মহামহোৎসব-সাধনায় সিদ্ধি বিধান করুন।

আরাধনার মন্ত্র উচ্চারণান্তে—এই যে তুমি, সেই যিনি তিনি ছিলে আদিতে, মধ্যে তুমি চলে ব্রাহ্মসমাজে, আবার তার চেয়েও বিধানে 'আমি আছি' 'আমি এয়েছি' হয়ে এসেছ তুমি। কেবল আছ তা নয়, নিত্য ক্রিয়াশীল হয়ে, ঝড় হয়ে এসেছ, আর বলছ, আমি এয়েছি। কার সাধ্য তোমাকে না মেনে থাকে। এই যে তুমি আদেশ প্রত্যাদেশ হয়ে আপনার হুকুম জারী করিতেছ। এখানে বিচার-বুদ্ধির অহং চলে না। তোমার শাস্ত্র তুমি শেখাও, তোমার জ্ঞান তুমি দাও, তোমার দেখা তুমি দেখাও, তোমার কথা তুমি শুনাও। অনন্ত অসীম বিক্রম তোমার। সব 'আমি আমার' চূর্ণ করে, অহং-কুটীর চুরমার করে, কোথায় নিয়ে চলেছ, কি কচ্ছ, কে বলতে পারে? এইত তোমার প্রেমের প্লাবন প্রবাহিত কচ্ছ, সব এক হয়ে গেল, একাকার করবার জন্যই তুমি আছ। এক অদ্বৈত তুমি। একে একে এক। আজ এই একারই মাঝে একেরই মহিমা। একের পিঠে এক একার, এখানে একের ভিন্ন আর কারো পূজা চলবে না, একেতে সব একাকার হয়ে যাবে, তাই তুমি কচ্ছ। স্বয়ং পরিত্রাতা হয়ে, সর্ব্বপাপহরণকারী হরি হয়ে এয়েছ যে, সব 'আমি আমার' হরণ করে, মন প্রাণ হরণ করে, তোমার করে, নিত্য তোমাতে যে আনন্দ, হে ব্রহ্ম, তুমিই যে আনন্দ, সেই তোমাকে দিয়ে, তোমার আনন্দে ব্রহ্মানন্দ করে, নিত্য ব্রহ্মোৎসব বিধানের জন্যেই তুমি আজ সমস্ত দিন এই শ্রীমন্দিরে এবং বিশ্বমন্দিরে বিরাজিত। তোমাকেই "আনন্দম্ পরিপূর্ণমানন্দম্" ব্রহ্ম বলে দর্শন করি, পূজা করি, তোমারই চরণে সর্ব্বজন মিলে লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করি।

গম্ভীর ধ্যানান্তে জগজ্জনের জন্য সুগম্ভীর ভাবে প্রার্থনা হয়। আচার্য্যদেব আদি সমাজে ১১ই মাঘ উপলক্ষে যে উপদেশ দান করেন, তাহা পাঠান্তে "ব্রহ্মবাণী" প্রার্থনা উচ্চারণে শান্তি-বাচন হয়।

ধন্য জীবন্ত জাগ্রত পরব্রহ্ম, আজ জীবন্তরূপে বর্ত্তমান থেকে এই মহামহোৎসব যদি সম্পাদন করাইলেন, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আচার্য্যের প্রার্থনা আমাদের প্রাণে প্রতিধ্বনিত, প্রমাণিত এবং পূর্ণ হয়। এই যে তুমি। শুধু "আমি আছি, আমি আছি" বলছ তা নয়, "আমি এয়েছি, আমি এয়েছি" বলে, তুমিই রাজর্ষি রামমোহনকে ঘরের বাহির করে সত্যানুসন্ধানে দেশে দেশে ফিরাইলে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে গৃহর্ষি করে তোমারই ধ্যানে জ্ঞানে মগ্ন করিলে, তোমারই প্রত্যাদেশে প্রত্যাদিষ্ট করে ব্রহ্মানন্দকে আচার্য্যপদে বরণ করিলে। তুমিই একমাত্র প্রত্যাদেশ-কর্ত্তা হয়ে জগৎকে নববিধান দিবার জন্য আবির্ভূত হয়েছ। প্রথম অল্পে অল্পে, ক্রমে বড় হয়ে, প্লাবন হয়ে তুমি জগৎকে একাকার করবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিতেছ। আর মানুষের উপদেশের দরকার নাই, আর মানুষকে কিছু করিতে হবে না। ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মের সমাজ, তোমার বিধান, তোমার প্রমাণ হবে। স্বয়ং তুমি "আমি আমার" চূর্ণ করে তোমার করে নেবেই নেবে। তুমি এই সঙ্কল্প করে ঝড় হয়ে নেমেছ যদি, তোমার কার্য্য তুমি কর, তোমার রাজ্য তুমি স্থাপন কর, তোমার ইচ্ছা তুমি পূর্ণ কর, তোমার বিধান তুমি জয়যুক্ত কর। সমুদয় ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা চূর্ণ করে তোমার মহিমা তুমি প্রদর্শন ও প্রতিষ্ঠা কর। পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করে নিত্য উৎসবানন্দে পূর্ণ কর। এই ভিক্ষা করে বার বার তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৬ই মার্চ্চ, স্বর্গীয় ভাই কেদারনাথ দের পৌত্র, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমার দের (I.C.S.) শুভ জন্মদিন উপলক্ষে নবদেবালয়ে ভাই চন্দ্রমোহন দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই শুভদিনে শ্রীযুক্ত মনোনীত ধন দে প্রচার ফণ্ডে ২৲ দুই টাকা দান করেন। ভগবান্ তাঁহার পুত্রকে শুভাশীষ দান করুন।

নামকরণ ও বিদ্যারম্ভ—গত ৮ই মার্চ্চ, রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার পর, কলুটোলায় শ্রীযুক্ত গগণবিহারী সেনের পঞ্চম পুত্রের নামকরণ ও ষষ্ঠ পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন এবং তৃতীয় পুত্রের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে উপাসনা হয়; ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ অনুষ্ঠানের কার্য্য সম্পন্ন করেন। পঞ্চম পুত্র "আলোক-প্রকাশ" ও ষষ্ঠ পুত্র "দীপ্তিপ্রকাশ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। গগণ বাবুর তৃতীয় পুত্র গোলোকবিহারীর বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত অশোকপ্রকাশ সেনও তাঁহার পুত্রকন্যাদ্বয়কে বিদ্যারম্ভের জন্য উপস্থিত করেন। ইহাদের বিদ্যারম্ভের পর বিশেষ প্রার্থনা করিয়া অনুষ্ঠানের কার্য্য শেষ করা হয়। পরম জননীর শুভ আশীর্ব্বাদ এই পুত্রকন্যাগণের মস্তকে ও পরিবারের সকলের মস্তকে বর্ষিত হউক।

ব্রতগ্রহণ—গত ১০ই মার্চ্চ, বাঁকীপুর-নিবাসী শ্রদ্ধেয় ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পারিবারিক দেবালয়ে তাঁহার পুত্রবধূ, স্বর্গগত অকিঞ্চনের পত্নীদেবী নবসংহিতার বিধি অনুসারে পবিত্র বৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করেন। ভাই প্রিয়নাথ এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করিয়া গম্ভীরভাবে ব্রতদান করেন। শ্রদ্ধেয় পরেশবাবুও আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

উৎসব—গত ৯ই মাঘ হইতে ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত কুচবিহারে মাঘোৎসব সম্পন্ন হয়। ৯ই প্রাতে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁহার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা, অপরাহ্ণে রেভেনিউ অফিসার রায় বাহাদুর হেমেন্দ্রলাল খাস্তগীরের সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত পুষ্পোদ্যানে উপাসনা হয়। "এ জগত মাঝে, যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি

সাজিয়ে রেখেছ," এই সঙ্গীতে এবং "ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখরে মায়ের হাসি" এই গানের ভাবে সকলের প্রাণেই জীবন্ত ভগবৎ-সত্তার আলোক প্রকাশিত হইয়াছিল। মহকুমাগুলির যাবতীয় হাকিম, স্থানীয় জজ, সবজজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রধান প্রধান উকিল প্রভৃতি গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আচার্য্যদেবের "ধর্ম্ম ও নীতির সামঞ্জস্য" প্রবন্ধের ভাবগুলি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহা সকলের প্রাণে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করা হয়। উপাসনান্তে সান্ধ্যসম্মিলনের ভাবে কথাবার্ত্তা হয় এবং প্রচুর জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। ১০ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে উপাসনা ও উপাসনান্তে জলযোগ হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তীর গৃহে উপাসনা ও সঙ্গীত হয়। বহু পদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং গণ্যমান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। "গৃহধর্ম্ম নিষ্কাম পঞ্চ সাধন" সঙ্গীতযোগে উপাসনা আরম্ভ হয় এবং "ঐশ্বর্য্যমোহিতং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" এই শ্লোকটী ব্যাখ্যাত হয়। জলযোগান্তে অনুষ্ঠান শেষ হয়। ১১ই মাঘ প্রাতে ৮।০টায় সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া ১০টা হইতে ১১॥০টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসনা হয়। "ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ" বিষয়ে বিবৃতি করা হয়। মধ্যাহ্ন ১২টায় মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রায় দুইশত নরনারী পরিতোষ-সহকারে ভোজন করিয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হইয়া উপাসনা হয়। ১২ই মাঘ প্রাতে কেশবাশ্রমে পবিত্র সমাধিপার্শ্বে উপাসনা এবং সন্ধ্যা ৬।০টায় ন্যাজডাউন হলে "ধর্ম্মসমন্বয়" অনুষ্ঠানে বহুলোকের সমাগম হয়। রায় বাহাদুর হেমেন্দ্রলাল খাস্তগীর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুপণ্ডিত গোপালবাবু বেদ হইতে, কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বিদ্যাবিনোদ ভাগবত হইতে, জেবৃন্নিসা স্কুলের মৌলবীসাহেব কোরাণ হইতে, জনৈক খৃষ্টান বন্ধু বাইবেল হইতে একেশ্বরবাদের অংশ বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া সকল ধর্ম্মের একতা ও সামঞ্জস্য প্রদর্শন করেন। পরিশেষে নববিধান-সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সকল ধর্ম্মই যে সত্য, নববিধানে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে, ইহা বিবৃত করেন। সর্ব্বশেষে "কহরে আনন্দে জয় গান হয়ে একপ্রাণ; আমরা সকলে সেই এক পিতার সন্তান।" এই সঙ্গীত হয়। ১৩ই প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনা ও সন্ধ্যায় সেখানে আলোচনা এবং ১৪ই প্রাতেও সেখানে উপাসনা হয়। ১৫ই প্রাতে ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথ সেন দেব গৃহে উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যায় কেশবাশ্রমে উপাসনা ও কীর্ত্তন হইয়া উৎসবের শান্তিবাচন হয়। ১৬ই প্রাতে শ্রীযুক্ত শশধর সেনের গৃহে তাঁহার কন্যার জন্মদিনে উপাসনা হয়। এই উৎসবে আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকাতা হইতে তথায় গমন করেন এবং উপাসনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হন। উৎসবে ভগবানের প্রচুর প্রসাদ লাভ করিয়া সকলে ধন্য হইয়াছেন।

গত ২২শে মার্চ্চ, নববিধান ট্রাষ্টের সাম্বৎসরিক উৎসব উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে সম্পন্ন হয়। কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ভাইভগ্নী সম্মিলিত হন। শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনা ও সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সম্পাদক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন রিপোর্ট পাঠ করিয়া আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথও বিশেষ প্রার্থনা করেন। আমরা এই ট্রাষ্টের উত্তরোত্তর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

স্মরণীয় দিন—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের, ২২শে মার্চ্চ, নববিধানাচার্য্যদেব নববিধানের ছাত্র সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই দিন ভাই প্রিয়নাথকেও নববিধানে দীক্ষা দান করেন। এই সকল দিন স্মরণে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়।

শুভ শুক্রবার—গত শুক্রবার উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে স্থানীয় কয়েকটী বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী মধ্যে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। কলিকাতায় শান্তিকুটীরেও ভ্রাতা ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ বিশেষ উপাসনা করেন, মণ্ডলীর অনেকে যোগদান করেন।

বিশেষ উপাসনা—২১শে মার্চ্চ, সন্ধ্যায়, ভাই গোপালচন্দ্রের সাধু অঘোরনাথের গৃহে আগমন উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ বিশেষ উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র প্রার্থনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৭ই মার্চ্চ, স্বর্গগত ভ্রাতা নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের স্বর্গারোহণ স্মরণে ৫১১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী ভক্তিমতি দেবী, শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী দেবী ও ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ১৯শে মার্চ্চ, ৫ই চৈ, ব্র ভাই প্রিয়নাথের প্রথমা কন্যা শ্রীকৃপার স্বর্গদিন-স্মরণে কলিকাতায় সাধু অঘোরনাথ-ভবনে সন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা হয় ও বাগবাজার সাকড়াপ্রামে সমাধি-মণ্ডপে পুষ্প ও ধূপ ধূনাদি দেওয়া হয়। এই দিন স্বর্গীয়া কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীর স্বর্গগমন উপলক্ষে ৩নং বক্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, স্বর্গগত হরগোপাল সরকারের পরিবারবর্গের আবাসে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

গত ২৩শে মার্চ্চ, কাশীপুরে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা, অনাথ-আশ্রমে ৫৲ টাকা, আতুর আশ্রমে ৫৲ টাকা, কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲ টাকা, অন্ধস্কুলে ৫৲ টাকা, কালাবোবাস্কুলে ৫৲ টাকা, ও বিধবাশ্রমে ৫৲ টাকা, মোট ৪০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩১শে মার্চ্চ, ৯৪।১ সি গড়পার রোডে, ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" পি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৩রা বৈশাখম্ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 29th April, 1931. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, আবার যদি একটি নূতন বৎসর আনিয়া দিলে, তবে এই নূতন বৎসরকে যথার্থ নূতন বৎসর কর। নূতন বৎসরে নূতন পঞ্জিকা বাহির হয়; নূতন খাতা খোলা হয়, নূতন হিসাবে, নূতন প্রণালীতে নূতন কার্য্যোদ্যম আরম্ভ হয়। নূতন পঞ্জিকায় দেখি, যে বারে যে তারিখ ছিল, যে তিথিতে যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যে মাসে যে পক্ষ ছিল, এ নূতন বৎসরে তাহা আর নাই; তবে, মা, এ জীবনের পঞ্জিকায়, এ জীবনের সাধনায়, এ জীবনের অভিজ্ঞতায় কেন তেমনি নূতন পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে না? নববিধান যে নিত্য নববর্ষের বিধান, তুমি আমাদিগকে জানিতে দিয়াছ। পৃথিবী যেমন গতীশীল বলিয়াই বৎসরের পর বৎসরে নব নব পরিবর্ত্তন প্রকৃতিতে দেখিতে দিতেছ, তেমনি জীবনও যদি উন্নতিশীল না হয়, তাহা হইলে জীবন যে আবদ্ধ জড়াসক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই, হে জীবনদায়িনী জননি, যদি আমাদিগকে তোমার নিত্য নবনবজীবনদায়ক নব নব উন্নতি-বিধায়ক নববিধানের ভিতর আনিয়াছ, তবে এই নববর্ষে এ জীবনে নব নব জীবনের নব নব উন্নতি বিধান করিয়া, তোমার নববিধান আমাদের জীবনে সপ্রমাণ কর। আমাদের জীবনের পরিচালন-ভার ত আমাদের হাতে নয়, ইহা তোমারই হাতে তুমি স্বয়ং রাখিয়াছ। তবে আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা যাহা, তাহা সাধনে আমি অক্ষম অশক্ত হইলেও তুমি ত ছাড়িবে না, করাইয়া লইবেই লইবে। আমাদের এই প্রতি জীবনের ভার যেমন, তেমনি আমাদের পরিবারের ভার, আমাদের মণ্ডলীর, জাতির, দেশের এবং জগতের ভারও তোমারই হাতে। অতএব, তুমি তোমার নব নব জীবনদায়িনী, নব নব উন্নতি-বিধায়িনী শক্তির প্রভাবে তোমার নববিধান সর্ব্ব-জীবনে জয়যুক্ত করিবেই, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। তাই সর্ব্বত্র তোমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়, ইহাই ভিক্ষা করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানের অসাম্প্রদায়িকতা।

ঈশ্বর এক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তবে ধর্ম্ম কেন বহুধা হইল? ঈশ্বর এক হইলেও তাঁহার স্বরূপ বা গুণ অবশ্যই বহু; তাঁহার ভক্তগণ তাই নিজ নিজ ভাবে রূপ গুণ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভাষাতেও তাঁহার

নাম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া আসিয়াছে। ঈশ্বর, খোদা, জিহোভা, গড, হরি, পিতা মাতা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম তাঁহার হইলেও, তিনি যে একই, সর্ব্বজনে তাহা বিশ্বাস করেন।

তেমনি ধর্ম্মও বিভিন্ন নাম বা উপাদানে পরিচিত হইতেছে। যথা হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইহুদী, এসলাম ইত্যাদি; ইহারাও মূলতঃ কিন্তু একই ধর্ম্ম। সাধকদিগের সাধনের তারতম্য অনুসারে কিছু কিছু ভিন্নতা বাহ্যতঃ থাকিলেও, বস্তুতঃ যে ইহা ভিন্ন নয়, ইহারা প্রতিপাদন করাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান যেমন সকল শাখা-বিজ্ঞানের সমন্বয়-সাধনে এখন কৃতসংকল্প এবং সকলের মূল যে একই আবিষ্কার করিতেছেন, নববিধানও তেমনি যে সর্ব্ব ধর্ম্মকে সমন্বয় করিতে আসিয়াছেন, কেবল তাহাই নয়, সকল ধর্ম্মই যে এক বিধাতার একই ধর্ম্ম, ইহাও প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছেন।

একই বৃক্ষের যেমন বিভিন্ন শাখা কেহ বা উত্তরে, কেহ বা দক্ষিণে, কেহ বা পূর্ব্বে, কেহ বা পশ্চিমে, কেহ বা উর্দ্ধে, কেহ বা অধোতে বিস্তৃত, হিন্দু, এসলাম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী ধর্ম্মও ঠিক তেমনি বিভিন্ন দিক্ দেশ কালের উপযোগী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন বিধান বা বিভিন্ন স্বরূপের উপাসনা-সাধনার্থ ইহারা একই ধর্ম্মের বৈচিত্র্য বা বিশ্লিষ্ট ভাবের পরিচয় দিতেছে।

শিক্ষা, সাধনা ও মনের চিন্তার তারতম্য অনুসারে যেমন একই বস্তু বিভিন্ন ভাবে মানুষ দর্শন করে, এই ধর্ম্মমতের বিভিন্নতাও তাহাই। লোকে এক-দেশদর্শিতা বা আপন বুদ্ধি জ্ঞানের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতিবশতঃ অন্যের ভাবকে ধারণা করিতে পারে না, তাহা হইতেই সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধেও ভ্রম ভ্রান্তি আনিয়া ফেলে। এখন যে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ, ভারতবাসী ইংলণ্ডবাসীর দ্বন্দ্ব কোলাহল, ইহা এই কারণেই হইতেছে। নববিধান এই সকল কোলাহল বিবাদ মীমাংসা করিতেই সমাগত।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম এক মহামিলন এবং সমন্বয়-সাধনের বিধান; ইহা বিধাতার বিধান, তাই ইহা কোন ধর্ম্ম নামে অভিহিত নয়। প্রচলিত সমুদয় ধর্ম্ম ধর্ম্মনামে অভিহিত হইলেও, এক অন্যকে ধর্ম্ম বলিয়া শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতেছে না। হিন্দু বলেন, হিন্দুধর্ম্মই ধর্ম্ম, এসলাম ধর্ম্ম ম্লেচ্ছধর্ম্ম; আবার এসলামবাদী বলেন, এসলাম ধর্ম্মই ধর্ম্ম, হিন্দু কাফের; এই বিবাদ মীমাংসা করা নববিধানের উদ্দেশ্য। প্রথম ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাও ত্রিশাখায় বিভক্ত হওয়াতে, বিধাতাই ইহাকে নবযুগের ধর্ম্ম বলিয়া নববিধান নামে দিয়াছেন।

সুতরাং নববিধান কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নয়, কোন সম্প্রদায়ে ইহা নিবদ্ধ হইতে পারে না। সকল ধর্ম্মের সমন্বয় যেখানে, সেই খানেই নববিধান, তাহাই নববিধান। সংকীর্ত্তন যেমন কেবল গান নয়, যদিও গান সংকীর্ত্তনের এক প্রধান অঙ্গ, কিম্বা কেবল খোল, করতাল, বাজনা বা নৃত্যও নয়; কিন্তু সকলগুলির মিলনে যাহা, তাহাই সংকীর্ত্তন। আবার বাদ্য যেমন কেবল জয় ঢাক নয়, কেবল বাঁশী বা কেবল করতালী নয়, কিন্তু সকলকে মিলাইয়া সমতানে ঐক্যবাদনই বাদ্য। ঠিক তেমনি সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্ম্ম, সকল মত, সকল সাধন, সকল অনুষ্ঠান, সকল শাস্ত্র, সকল সাধককে একাধারে সমন্বিত করিতেই নববিধান আগমন করিয়াছেন।

তাই হিন্দুও যেমন, মুসলমানও তেমনি; খ্রীষ্টান যেমন, বৌদ্ধও তেমনি; আবার ইহাদের শাখা প্রশাখা—বৈষ্ণব শাক্ত, শিয়া শ্নি, ক্যাথলিক প্রটেষ্টাণ্ট, শ্রমণ ফুঙ্গী, শিখ জৈন ইত্যাদি যে যে নামাভিধানে ধর্ম্ম-সাধনে নিরত, সকলই নববিধানের অন্তর্ভূক্ত। ইনি কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া কাহাকেও বিশেষত্ব দেন না, কিন্তু সকলকে সমন্বিত করিয়া গ্রহণ করেন।

এমন কি, এই যে ব্রাহ্মসমাজের ত্রিশাখা, ইহারাও সকলে নববিধানেরই ভিতর; তবে কেহ তাহা স্বীকার করিতেছেন, কেহ তাহা এখনও স্বীকার করিতেছেন না, এই মাত্র প্রভেদ।

নববিধানাচার্য্য দেহত্যাগ করিবার সময় যে নববিধানের কার্য্যবিবরণী প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে ইহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, আদি ব্রাহ্মসমাজ বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও অসাম্প্রদায়িক নববিধানেরই অন্তর্গত; তাঁহারা কেবল মতবৈধ বা বৈদান্তিকভাব ও জ্ঞানপ্রধান ভাবের প্রাধান্য বশতঃ আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু সর্ব্বগ্রাহী নববিধান কাহাকেও পর বা দূর মনে করেন না। বাস্তবিক সাধনের ও শিক্ষার তারতম্য বশতঃ এই সকল ভিন্নতা।

যথার্থ সত্য-পিপাসু হইয়া বিধাতার বিধানে প্রকৃত বিশ্বাসী হইলে, বিধাতাই সকল প্রকার বিভিন্নতা দূর করিয়া ঐক্য-বন্ধনে বাঁধিয়া দিবেন। সত্যের জয় হইবেই হইবে।

তাই নববিধানের আদর্শ চরিত্রের উক্তি আমরা বিশ্বাস করি। "নববিধান সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা রূপ পাপের অতীত; ইনি বিশ্বাস করেন, সত্য এবং পবিত্রতা কোন মণ্ডলী বিশেষে নিবদ্ধ নহে; কারণ সমস্ত সত্য, সমস্ত প্রেম, সমস্ত পবিত্রতার আধার ঈশ্বরের যে অদৃশ্য রাজ্য, তাহাই নববিধানের মণ্ডলী।"

অনন্ত উদার ঈশ্বরের বিশাল বক্ষে যেমন সকলের স্থান, তেমনি নববিধানের সর্ব্বজনীন মহাপ্রেমের আলিঙ্গনে সকলেই আলিঙ্গিত। নববিধান কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, কেহই যেন ইঁহাকে পরিত্যাগ না করেন।

ইনি যে কেবল সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্ম্মকে সমন্বয়-মিলনে মিলিত করিতেই আসিয়াছেন তাহা নহে, ইনি সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়কে নবজীবন দান করিতেও আসিয়াছেন। কেননা, নববিধান জীবন্ত জীবন-দাতা বিধাতার বিধান।

গৃহদ্বার আবদ্ধ করিয়া সেই গৃহের আবদ্ধ বায়ুতে যদি কোন ফুলের গাছ রাখ, তাহা ক্রমে শুকাইয়া যাইবে; কিন্তু দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, আকাশের বাতাস ও রৌদ্রের সঞ্চালনে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে। ঠিক তেমনি নববিধানের উদার মুক্ত প্রেম পুণ্যের প্রভাবে আসিলে সকলেরই নবজীবন লাভ হইবে এবং পরস্পারের ভাবের বিনিময়ে নব নব উন্নতি ও স্ফূর্ত্তিলাভে ক্রমে অনন্ত জীবনের অনন্ত মিলন পরিণত হইবে।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

আমার আমিত্ব।

অহংজ্ঞানে আত্মম্ভরিতা সহকারে যদি আমার বুদ্ধি-প্রসূত মতের প্রাধান্য রক্ষা করিতে ও তাহা জাহীর করিতে বা অন্যের উপর চাপাইতে চেষ্টা করি, তাহাতেই আমার আমিত্ব হইল। বৈষয়িক কামনা, বাসনা বা রিপুর উত্তেজনা আমার এই আমিত্বের আনুষঙ্গিক সহচর। কিন্তু বিশ্বাস, পূর্ণ প্রেম ও দীনতা সহকারে যদি আমি পূর্ণ ধর্ম্ম রক্ষার্থ ঈশ্বরাদেশে তাহার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষিত হই এবং পরার্থ ও বিধান-প্রবর্ত্তকের গৌরবার্থে আমি তাহা দৃঢ় বিশ্বাসে ধরিয়া থাকি, তাহা আমার আমিত্ব নয়।

"নববিধান ট্রষ্ট।"

নববিধানের বিষয়-সম্পত্তি সংরক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত "নববিধান ট্রষ্ট" নামে একটি প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছে। নববিধানের নামে, নববিধানের বিধি অনুসারে যাহাতে নববিধানের বিষয়-সম্পত্তি সংরক্ষিত হয়, এই প্রতিষ্ঠানের তাহাই উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, নববিধানের বিষয়-সম্পত্তি অন্যান্য সংসারের বিষয়-সম্পত্তির মত নয়; বৈষয়িক ভাবে সে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিলে বা মানবীয় বিষয় বুদ্ধি ও বিধি অনুসারে ব্যবস্থাদি করিলে তাহা নববিধানের বিধি-সঙ্গত হইবে না। তাই নববিধান ট্রষ্ট এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধন প্রতিষ্ঠান। বাস্তবিক নববিধানই আমাদের এক বিশেষ ট্রষ্ট সম্পত্তি। স্বয়ং বিধাতা তাহা সংরক্ষণাবেক্ষণ ও সংসাধন করিবার জন্য আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাহার ট্রষ্টীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। যুগে যুগে বিধাতা কত সাধুভক্তদিগকে বিধানের বিশ্বাসী রক্ষক করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিধানে আমাদের ন্যায় অবিশ্বাসীদিগকেও বিশ্বাস করিয়া যখন নববিধান রক্ষার ভার দিয়াছেন, ইহা তাঁহার অলৌকিক নূতন বিধান, নূতন ব্যবস্থা ভিন্ন আর কি? আমরা কেবল নববিধানের বিষয়-সম্পত্তি নয়, কিন্তু আসল নববিধানরূপ মহাসম্পদ যাহাতে যথার্থ বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারি, তিনিই আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ ও বল বিধান করুন।

পাপ-বোধ।

আচার্য্য বলিলেন, "আমার অভিধানে পাপ পাপ করিবার সম্ভাবনা।" পাপের সম্ভাবনা থাকিলেই পাপ হইল। এইরূপ পাপ-বোধই জীবনের অনন্ত উন্নতির সোপান। পাপ যাহার নাই, যিনি সাধু সিদ্ধ হইয়াছেন বা স্বামী হইয়াছেন মনে করেন, তাঁহার আর অধিক উন্নতিরও প্রয়োজন নাই। তাহার সম্ভাবনাই বা থাকিবে কিরূপে? তাই নববিধানাচার্য্য আপনাকে "পাপীর সর্দ্দার" বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন, "আমার মত পাপী পাইলাম না বলিয়া এবার কিছু হইল না।" "বাস্তবিক আমাদের জীবন যে সদাই পাপ-সঙ্কুল ও পতনশীল, ইহা মনে না রাখিলে কখনই আমরা সর্ব্বদা সতর্ক ও সাবধান থাকিতে পারি না; এবং ক্ষুধা না থাকিলে যেমন আহারে রুচি থাকে না ও দেহের পুষ্টি-সাধন হয় না, তেমনি পাপ-বোধ না থাকিলে সর্ব্বদা ক্রমোন্নতি-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। অনন্ত উন্নতির পথের যাত্রী যাঁহারা, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য ও অনন্ত আনন্দ যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয় ও

লভনীয়, তাহারা কি একটু প্রেম, একটু পুণ্য ও একটু আনন্দে তৃপ্ত হইতে পারে? অনন্ত অভাব বোধই যথার্থ পাপ-বোধ, এই পাপ-বোধই নিত্য নববিধানের নব নব জীবনোন্নতির সোপান ও উপায়।

বলিদান

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, ৫ই এপ্রিল নিবেদিত)

বন্ধুগণ! আজ ১৯৩১ বছরের কথা, ১৯৩১ বৎসর পূর্ব্বে এপ্রিল মাসের প্রথম শুক্রবাসরে মহর্ষি ঈশা ঘাতকের হস্তে ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। সেই অমানুষিক অত্যাচার, সেই লোমহর্ষণ কাণ্ড, সেই রক্তরাগরঞ্জিত দেহের যাতনা খৃষ্টান পৃথিবীর প্রাণে যে আক্ষেপ ও মনস্তাপের অবিরাম তরঙ্গ তুলে ছিল, যে মর্ম্মবেদনার শক্তিশেল খৃষ্টান জগৎকে চূর্ণ করে ছিল, যে ব্যাকুল ক্রন্দনের অশ্রুজলে প্রবল বন্যার প্লাবনের ন্যায় খৃষ্টান হৃদয়কে এক অবস্থা হতে অবস্থান্তরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যে কাতরোক্তির ভীষণ ঝটিকা খৃষ্টান মর্ম্মের প্রত্যেক স্নায়ুটিকে ধূলার ন্যায় গুঁড় করে দিয়েছিল, আজও তার কথা পৃথিবী ভুলতে পারে নাই।

খৃষ্টান জগৎ সেই মর্ম্মবেদনার একটী উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করে ঘরে ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছে, সেই নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের প্রতিমা গড়ে খৃষ্টানগণ পূজা করছে, যে হাড়কাঠে ঈশাকে বলি দেওয়া হয়েছিল, তারও প্রতীক গড়িয়ে খৃষ্টানগণ গলায় পরিধান করছে, ধনীরা সোনায় ক্রুশ নির্ম্মাণ করে হীরের হারের চেয়ে অধিক আদর করে বক্ষে ধারণ করছে, গরীবেরা লোহার ক্রুশ গড়িয়ে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করছে, কত মার্টার তাঁর সেই যাতনায় পূর্ণ ক্রুশ টুকু নিজের শরীরে বহন করবার জন্য জ্বলন্ত আগুনে নিজকে আহুতি দিয়েছে, সাধুরা ক্রুশের সাধনা করতে করিতে তাঁদের দুই হাতে ক্রুশের দাগ ফুটে উঠেছে। আজ তোমার আমার মনেও সেই নির্ম্মম যাতনার তীব্র অনুভূতি টুকু জেগে উঠছে। আজ সেই যুগযুগান্তরের চিন্তা ফিরে ক্রমে তোমার আমার চক্ষু দিয়েও অজস্র অশ্রু আকর্ষণ করছে! আজ তোমার আমার রসনা থেকেও আক্ষেপের কাতরোক্তি ফুটে বেরুচ্ছে! আহা! ভগবান্ এমন নিষ্পাপ-শরীর, এমন দেবতুল্য মানুষ, এমন পবিত্রাত্মা মহাপুরুষের ভাগ্যে এমন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা কেন করলেন! বিধাতা তোমার আমার মত শত জীবনকে বলির জন্য মনোনীত করে যদি এই সাধুকে অব্যাহতি দিতেন, তাহলে পৃথিবীর কত মঙ্গল হত। এই নৃশংস ব্যাপারটা কি স্বর্গের বিচারে একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্তি হয়ে রহল? না, বন্ধুগণ! তোমার আমার শোণিতের মূল্য কত? একটা কপর্দ্দক, কি একটী কাণা কড়ি। একটী কাণা কড়ি দিয়ে পৃথিবীর বড় জিনিষ ক্রয় করা যায় না। সদাব্রত খুলিতে গেলে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়, চীন জাপান কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দূর দেশে শত শত মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অশোকের সমুদায় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন হয়, নলন্দা জগদ্দল সারনাথের প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইলে পালরাজাদের রাজকোষ শূন্য করিতে হয়, পৃথিবীর অসাধারণ পাপ দুর্নীতি দূর করিতে হইলে সাধুর রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তাই ভগবান্ মহর্ষি ঈশাকে মনোনীত করিলেন। স্বর্গের ব্যবহার কখনও ভুল হয় না।

খৃষ্টানগণ এই সময় বৎসরান্তে শ্রীঈশার তর্পণ করেন। শ্রীঈশার সঙ্গে পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের সমাধি-পার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনা করেন এবং পত্র পুষ্পে সমাধিটী সজ্জিত করেন। আমরাও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে বৎসরে একবার শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি। পরলোকগত সব জীব-মণ্ডলীর জন্য বৎসরে একবার তর্পণ করিবার বিধি আছে। তর্পণের অর্থ তাঁহাদের স্মরণ করা, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা। ইহার অর্থ যাহাই হউক, আজ ঈশার নিষ্ঠুর নির্য্যাতন, অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা স্মরণ করিতে আসিয়া, তাঁর গভীর বেদনার কথা আমাদের প্রাণকে ব্যাকুল করিতেছে। এই বেদনা-বোধ মানবের সাধারণ অধিকার। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ যে বেদনা বহন করিয়া, যে শেল বক্ষে ধারণ করিয়া, যে নির্য্যাতনের নিষ্ঠুর অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ধর্ম্মের পথে, নীতির পথে, কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই বেদনা বহন করিবার অধিকার তোমার আমারও আছে। এই বেদনার পথ ধরিয়া আমরা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছি, তাঁহাদের যুগযুগান্তরের বেদনার উত্তরাধিকারী হইয়া, আমরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; যেমন তাঁদের রক্ত মাংসের অধিকারী হইয়াছি, সেইরূপ তাঁদের মনে যত বেদনার দাগ পড়িয়াছে, যত শাণিত ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারে তাঁদের মন ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, আমরা তাহারও অধিকারী হইয়াছি। ধনের অধিকার, জ্ঞানের অধিকার, ধর্ম্মের অধিকার, শক্তির অধিকার আমরা পিতৃপিতামহের নিকট হইতে কেহ কখন কিছু পাই, কেহ কিছু কখন পাই না। ইহা মানবের সাধারণ অধিকার নয়। পর বংশ পূর্ব্ব বংশের নিকট ইহার দাবী রাখে না। ধনীর বংশ গরীব হয়, জ্ঞানীর পুত্র মূর্খ হয়, ধার্ম্মিকের সন্তান অধার্ম্মিক হয়। কিন্তু এমন মানুষ কি পৃথিবীতে কেহ দেখিয়াছে, যাহার পায়ে কখনও একটী কাঁটাও ফোটেনি? এমন লোক কি কেহ দেখিয়াছে, যাহার গায়ে কখনও একটী আঁচড়ও লাগেনি? এমন নরনারী কি পৃথিবীতে আছে, যার মনে কখনও কি দুঃখের, কি শোকের, কি মনস্তাপের, কি মর্ম্মবেদনার আঘাত কখনও পড়েনি? এমন জীব কি কেহ দেখিয়াছে, যাহার চক্ষু দিয়া কখনও একটী ফোটা অশ্রুও

পড়েনি, এবং একটী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস কখনও নাসিকা দিয়া বহেনি? পৃথিবীর অভিধানে তাহা খুঁজিয়া পাই না। এই বেদনা-বোধই মানবের সাধারণ অধিকার। পূর্ব্ব পিতামহদিগের নিকট হইতে এই অধিকার আমরা সকলেই পাইয়াছি এবং এই অধিকারের ভিতর দিয়া আমরা অতীতের সঙ্গে মিশিয়াছি, পূর্ব্ব বংশের সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছি, যে যোগের ভূমি হইতে আমাদের কেহ কখন বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। আমরা এই একটী অধিকার পাইয়াছি, আমরা এই একটী সাতরাজার ধন মাণিক পাইয়াছি, যাহা যুগযুগান্তরের মানুষকে এক করিয়াছে, যাহা বংশের সঙ্গে বংশকে মিলাইয়াছে, যাহা অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে মিলিত করিয়াছে। তর্পণ এই মিলনেরই অভিব্যক্তি। মিলনই তর্পণের যথার্থ অর্থ। এই বেদনার মধ্য দিয়া আমরা যেমন মহর্ষি ঈশার সহিত মিলিয়াছি, সেইরূপ আমাদের পিতৃপিতামহ ও সমস্ত মানব-বংশের সহিত এক হইয়াছি।

বন্ধুগণ! বেদনা-বোধ যেমন মানবের সাধারণ অধিকার, বেদনার দানও সেইরূপ মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্! এই উৎকৃষ্ট দান পাইয়াছি বলিয়াই আজ আমরা মানুষ-নামের যোগ্য হইয়াছি। হে মানব! তুমি যে দিন তোমার আত্মীয়ের শব দেহের পার্শ্বে বসিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতার অজস্র অশ্রুর সহিত একটী ফোটা চখের জল ফেল, সে দিন তুমি মিলনের সূত্র যেমন দৃঢ় কর, তেমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। যে দিন কোন নিরাশ্রয়া অনাথা বিধবার শোকোচ্ছ্বাসের সহিত তোমার ব্যাকুল ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হয়, সে দিন তুমি প্রেমের যে বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন কর, সহস্র সাধনায় তাহা সফল হয় না। কৃষক প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িয়া শস্য বপন না করিলে মানবের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না। মাতা পীড়িত সন্তানের শিয়রে বসিয়া অনাহার ও অনিদ্রায় জীবন-পাত না করিলে সৃষ্টি-রক্ষা হয় না। সতী স্বামীর চিতানলে প্রবেশ না করিলে সতীত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সাধু নিষ্ঠুর মৃত্যুকে আলিঙ্গন না না করিলে জগতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কাঁটার মুকুট না পরিলে, তাহার ললাটে ধর্ম্মের জয়-টীকা শোভা পায় না। মানুষ, তুমি যাহাই কর, তাহাতেই বেদনা আছে, বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা আছে। এই কণ্টকাকীর্ণ সংকীর্ণ পথ বাহিয়াই মানুষ সাফল্যের সৌধ অট্টালিকা দেখিতে পায়। ক্রুশের বলিদানের পরই নূতন জীবনের পুনরুত্থান। প্রলয়ের পরই নূতন সৃষ্টির আরম্ভ।

হে সন্তানগণ, আমরা তোমাদের জন্য ধর্ম্ম রাখিয়া যাইতে পারিলাম না, বিজ্ঞানের উচ্চ শিখরে তোমাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নব নব সত্যের বিদ্যুৎ আলোকে তাহা উদ্ভাসিত করিতে পারিলাম না; ধন ধান্যে ভরা বিশাল ধরণীর অধিকারী করিয়া সৌভাগ্যের পূর্ণানন্দ উপভোগ করিবার পথ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করিতে পারিলাম না; এজন্য আমাদের আক্ষেপ করিবার অবসর রহিল না, কেননা এ সকল বিশেষ অধিকার সকলের জন্য নহে, আর এ অধিকার পাইলেও সকলে চিরদিন রক্ষা করিতে পারে না। যে অধিকার মানবের সাধারণ অধিকার, তাহা বেদনার অধিকার। যে দান মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহা বেদনার সম্পদ। সেই অধিকার ও সেই সম্পদ আমরা ভবিষ্যৎ বংশকে দিয়া যাইতেছি। আমাদের মর্ম্ম-বেদনা, আমাদের অশ্রু-ক্রন্দন, আমাদের বুক-ভাঙ্গার মনস্তাপ, আমাদের ব্যর্থ জীবনের অন্তর্ভেদী অনুতাপ, আমাদের কর্ম্ম-জীবনের আকুল নিষ্ফলতা, আমাদের ভেদ-বুদ্ধির অব্যর্থ দুর্ব্বলতার উত্তরাধিকার, হে ভবিষ্যৎ বংশ, তোমাদিগকে দিয়া যাইতেছি। এই বেদনার দান লইয়াই তোমরা সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইবে, ইহাই প্রকৃতির বিধান, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। আমাদের এক ফোটা অশ্রু তোমাদের অজস্র অশ্রুজলে পরিণত হউক। ঈশার একটী বলিদান তোমাদের অসংখ্য বলিদানে পরিণত হউক। কেননা, যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন পাপ থাকিবে; যতদিন পাপ থাকিবে, ততদিন পাপের সহিত মানুষের সংগ্রাম থাকিবে; যতদিন পাপ পুণ্যের সংগ্রাম থাকিবে, ততদিন পাপের জন্য বলিদানেরই প্রয়োজন হইবে। বলিদান বেদনারই অভিব্যক্তি, বেদনারই পূর্ণ প্রকাশ। মহর্ষি ঈশার শোণিত হইতে যেমন বিশাল খৃষ্টীয় রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইল, ভারতের অজস্র শোণিতপাতে সেইরূপ নূতন বিধানের পূর্ণ রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে যেমন কেহ রোধ করিতে পারে না, সেইরূপ সত্যের বিশাল জাগরণকেও কেহ নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। ইহা কখনও ধর্ম্ম-বিপ্লব, কখনও সমাজ-বিপ্লব, কখনও রাষ্ট্রবিপ্লব, নানা আকারে পৃথিবীতে পরিস্ফুট হয়। পাপের অবসান না হইলে ধর্ম্মরাজ্য পৃথিবীতে আসিবে না। যুগে যুগে যে পথ দিয়া সাধু মহাপুরুষগণ গমন করিয়াছেন, তোমার আমার জন্যও সেই বিধি ভগবান্ দান করিয়াছেন। সেই পথই বেদনার পথ—বলিদানের পথ। আমরা ভবিষ্যৎ বংশকে এই পথেরই পূর্ণ অধিকার দান করিয়া যাইতে চাই। ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোন সম্পদ্ নাই, আর কোন সম্বল নাই, আর কোন অধিকার নাই, যাহার পূর্ণ আশীর্ব্বাদ আমাদের সন্তান সন্ততি, দেশবাসী ও মানব-বংশের হস্তে নির্ভয়ে অর্পণ করিয়া যাইতে পারি। ইহাই মানব বংশের সনাতন ধর্ম্ম ও চির প্রার্থিত অফুরন্ত সম্পদ্।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন।

(৮ই জানুয়ারী রংপুর কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস মূলতঃ তিনটী বিশেষ ব্যক্তিকে লইয়া বিরচিত হইতেছে। ইঁহারা তিনজনে এমন ভাবে এক অদৃশ্য অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন যে, একজনকে লক্ষ্য করিলে অন্য দুই ব্যক্তিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন; একজনের কথা বলিতে গেলে, অন্য দুইজনের কথাও বলিতে হয়। যেমন বীজ হইতে ফল পৃথক করা যায় না, তেমনি ভাবে রামমোহন রায় হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে পৃথক করা যায় না। রাজার ভিতরে যাহা Potentially বা Idea তে ছিল, তাহাই পরবর্ত্তী নেতৃদ্বয়ের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই তিনজনের হস্তেই তিনটি আদর্শাঙ্কিত বিচিত্র তিনটি নিশান দেখিতে পাই।

রাজা রামমোহন শুধু ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মপিতামহ নহেন, ভারতের যাবতীয় শিক্ষিতবর্গের নিকট কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, ত্রিবিধ বিষয়েই এ যুগে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলিয়া কীর্ত্তিত ও পূজিত হইতেছেন। স্বনাম-প্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঊনবিংশ শতাব্দীকে রাজা রাম-মোহন রায়ের যুগ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল, রাজা রামমোহন ১৮৩০ সনের ১১ই মাঘ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে বসিয়া, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান নির্ব্বিশেষে, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, নর-নারী সকলের একত্র মিলনের এক অভূতপূর্ব্ব, অগোচরীভূত, অপূর্ব্ব মিলন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। একেশ্বরবাদের ভিত্তির উপরে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানে কোন মানুষের বা অন্য দেবতার বা অন্য কোন সৃষ্ট পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিকৃতির পূজা হইতে পারিবে না। শুধু কোন সাম্প্রদায়িক নামে পূজা প্রতিষ্ঠিত হইবে না, কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এখান হইতে প্রচারিত হইবে না। অথচ সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া, এ জগতের স্রষ্টা পাতা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলদাতা একমাত্র পরব্রহ্মের পূজা অর্চ্চনা করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করতঃ "ব্রহ্মবাদ" উদ্ধার করিলেন; ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস-পান প্রভৃতি জীবনের সম্বল করিবার জন্য হিন্দু সাধারণকে আহ্বান করিলেন। ইহার নামকরণ করিলেন, ইহাকে গড়িয়া তুলিলেন, ইহাকে একটি আকার প্রদান করতঃ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন কালের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, বামদেব বশিষ্ঠ এবং রাজর্ষি জনক প্রভৃতি আর্য্যগৌরবগণের আসন ব্রহ্মমন্দিরে সংস্থাপন করিলেন। এমন কি ভারতের নারীকুলের গৌরব গার্গী, মৈত্রেয়ীর জন্যেও আসন সজ্জিত হইল। ইঁহাদের সকলের শিক্ষা ও সাধনা আয়ত্ত করতঃ স্বয়ং নির্লিপ্ত যোগী হইয়া পড়িলেন। এই সংসারকে তপোবন, রাজপ্রাসাদকে পঞ্চবটী করিয়া তুলিয়া গেলেন। রাজা রামমোহন বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহা অঙ্কুরিত হইতে দেখিতে পারেন নাই। সজীব ক্ষুদ্র বীজের ভিতরে বৃহত্তম বৃক্ষটি তাহার যাবতীয় শাখা প্রশাখা, ফুল ফল লইয়া অব্যক্ত থাকে এবং যথাবিধানে যথাসময়ে তাহা বিকাশ পাইয়া উঠে; বীজ-বপন-কারীর প্রাণ তাহার বিকাশের ও পরিবর্দ্ধনের অবয়ব শুধু আশার নেত্রেই দেখিয়া যায়, ভাবষ্যৎ বংশই তাহাকে ফুলে ফলে সুশোভিত পরিপুষ্ট বৃক্ষরূপে দেখিয়া থাকে, তাহার শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া ও সুমিষ্টফল আস্বাদ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। কথিত আছে যে, "অশ্রুপাত করিতে করিতে শস্য বপন করিলে, সন্তান সন্ততি হাসিতে হাসিতে শস্য সংগ্রহ করে।" ইহাই চিরন্তন বাক্য। মহাত্মা রামমোহন বীজ বপন করিয়া গেলেন, তিনি সুদূর ভূমিতে দেহ রক্ষা করতঃ যথাস্থানে চলিয়া গেলেন, আমরা তাঁহার আত্মজাত বংশধরগণ যথাকালে ফলে ফুলে সুশোভিত এ মহাবৃক্ষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি। দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়ের শোণিত সিঞ্চন করতঃ ইহাকে অঙ্কুরিত এবং পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনব্যাপী তপস্যা ও যাবতীয় শক্তি-সামর্থ-প্রয়োগলব্ধ সুমিষ্ট ফল সম্ভোগ করতঃ হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় ব্যক্তি ভক্তিভাজন আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। আজিকার এদিনে শুধু আমরা নহি, বঙ্গের সর্ব্বত্র, ভারতের সর্ব্বত্র এবং ভারতের বাহিরে কত শত নদ নদী সাগর মহাসাগরের পরপারে অবস্থিত করিয়াও কত হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতেছে। আচার্য্যের বিষয় বলিতে যাওয়া বা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে প্রয়াসী হওয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বামন হইয়া চাঁদ ধরার ন্যায় ব্যাপার। সকল দেশেই কথিত আছে যে, মহাপুরুষগণ নানা বিচিত্র ভাবের সমষ্টি লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য তাঁহাদের জীবনে ও কার্য্যে নানা বিচিত্রতা পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র মানুষ একটি ভাবেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। এজন্য আমার ন্যায় সাধারণ লোকের পক্ষে মহৎ জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশটিও আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান জ্ঞানী, মনীষী ও সাধুগণ বলিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র প্রাচ্য হিন্দু জাতির ভিতরে সেন্টপল বা জন্ দি ব্যাপ্টিষ্টের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কেশবের তিরোধানের পর হইতেই ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের মিলন সাধনে যত্নপর রহিয়াছেন। এবং তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে দিন দিনই তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। ইঁহারা সব নবযুগের ব্যক্তি, সত্যের অনুসন্ধান জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাবতীয় রত্নরাজির সংগ্রহ-কার্য্যে আপনাদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন।

Rev. Dr. Chiyne—one of the Editors of the "Encyclopedia Biblica" ১৯১৫ সনে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে Reconciliation of Races and Religions নামক পুস্তকে কেশবচন্দ্রের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন যে "আধুনিক যুগে যে সকল ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পারস্যে বাহাউল্লা ও ভারতে কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্ব প্রধান। একজন মুসলমান সমাজের সংস্কারক ও অন্য জন ভারতের হিন্দু জাতির ভিতরে বিশেষভাবে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাহা অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহারই পূর্ণতা সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। এই ব্যক্তির উভয় প্রাণই এক বিশ্বজনীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় (Universal Chruch) গঠনের প্রয়াসী ছিল।" অনেকে সন্দেহের চক্ষে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যিশু খৃষ্ট এমন কি অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন, যাহার জন্য, যাহার পূর্ণতা সাধনের নিমিত্ত ইঁহাদের প্রয়োজন ছিল? Rev. Dr. Chiyne বলিতেছেন যে, "সে প্রয়োজন এই যে, সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সম্মিলন বা সমন্বয় প্রদর্শন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় প্রদর্শন।" ভারতেও স্যার ডাক্তার নীলরতন সরকার মহোদয় বোম্বে অনেকদিন পূর্ব্বে একবার ব্রহ্মেশ্বরবাদিগণের সমিতিতে সভাপতি হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "জগতে মানবের ধর্ম্ম-জীবন সংগঠনের নিমিত্ত যে সকল মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতম। ব্যক্তি ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ ভাব (Idea) গুলিকে রক্ত মাংসের আকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এই সকল উচ্চতত্ত্বের কয়েকটির বিষয় অন্ততঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে:—মহাপুরুষবাদ বা অবতারবাদ, শব্দব্রহ্ম (Logos) বা ঈশ্বরপুত্রবাদ মহাপুরুষগণের মধ্যে খ্রীষ্টের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিতি-তত্ত্ব (Christ-centric Community of Prophets) সাধুদিগের সমীপে তীর্থযাত্রা, অদৃশ্য ধর্ম্মরাজ্য (Church invisible), মহাপুরুষগণের মিলন-ভূমি, প্রেরিতগণের দরবার (Apostolic Durbar), আদেশবাদ, অভিনব জলসংস্কার, হোমের মন্ত্র, নূতন সংহিতা, নূতন সমন্বয় পতাকা, নিখিল ভারতীয় একেশ্বরবাদ-প্রচার-সম্প্রদায়। নবভাবে সংকীর্ত্তন-প্রচার, ব্রহ্ম দর্শন ধর্ম্মে ভক্তির প্রাবল্য, যোগ ও ভক্তির মিলন, জীবন বেদ, সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা, ১৮৭২ সনের ৩ আইন বা বিবাহ-বিধি, সংস্কারক্ষেত্রে তাঁহার নববিধ বিস্ময়কর বিষয়ের উদ্ভাবন। কিন্তু তাঁহার সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের অপরূপ ঘোষণাই উজ্জ্বলতম, এবং ভবিষ্যৎ ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে এ সমন্বয় ও সম্মিলনের আলোক-রেখা উজ্জ্বল পথ-নির্দ্দেশক বর্ত্তিকার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া থাকিবে।

বঙ্গের প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত, যিনি চরিত্রে, বিদ্যা, বিনয়ে জাতীয় গৌরবস্বরূপ হইয়া আজও জীবিত আছেন, সেই Dr. P. K. Roy এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "Another Keshub will explain the Keshub."—অর্থাৎ মহাপুরুষ না হইলে অন্য মহাপুরুষকে বুঝিতে বা আয়ত্ত করিতে পারে না। আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, কেশবচন্দ্র নিজে মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়াই "Greatman" নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি খৃষ্ট, বৌদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ, মুসা প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মহত্ব, নিজের ভিতরে অনুভূতি করিয়াই তাঁহাদিগের অসাধারণত্ব ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতার অসাধারণত্ব এখন জগতের সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ষ্টেটস্‌ম্যানের প্রবীণ সম্পাদক নাইট সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, "When Keshub speaks, the world listens."—যখন কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করেন, জগতের লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিয়া থাকে। অন্য আর ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন যে, "Keshub Chandra speaks as he sees."—কেশবচন্দ্র নিজে যেরূপ ভিতরে প্রত্যক্ষ করেন, সেইটি বাহিরে প্রকাশ করেন। এ কথা খুবই সত্য যে কোন বিষয় নিজের ভিতরে প্রত্যক্ষীভূত না হইলে, অথবা নিজের রক্ত মাংসের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে, কেহ তাহা প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কেশবচন্দ্রের এই অপূর্ব্ব শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদা বলিয়াছিলেন যে, "কেশব মনে মনে যাহা চিন্তা করেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে তাঁহার শক্তি আছে, এবং যাহা কিছু নিজে করিয়া থাকেন, অন্য দ্বারাও তাহা করাইবার শক্তি কেশবের ছিল।" অন্যত্র মহর্ষি বলিয়াছিলেন যে, "পৌরাণিক বর্ণিত মহারাজা দুষ্মন্ত যেরূপ তপোবনে ক্রীড়ারত তাঁহার নিজপুত্র ভরতকে চিনিতে পারেন নাই, ব্রহ্মানন্দ এখন একজন যুবক হইয়া, যে শক্তি ধারণ করিতেছেন, আমি বলিতে পারি না, যখন কেশবের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা বিকাশ পাইবে, তখন কেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন।" অন্য সময়ে পূজ্যপাদ মহর্ষি শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার এক পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, "কেহ কেহ কেশবকে সম্মান করেন, কেহ কেহ বা তাঁহার নিন্দা করেন, এই সকল নিন্দা ও প্রশংসার ভিতরেও কেশব ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কি রাজপ্রাসাদে কিম্বা দরিদ্রের কুটীরে সর্ব্বত্রই কেশবচন্দ্র সমভাবে সূর্য্যকিরণের ন্যায় ধর্ম্মের বিমলজ্যোতি সমভাবে বিস্তার করেন। যে পর্য্যন্ত কেশব ঈশ্বরের ধর্ম্মে একনিষ্ঠ থাকিবেন, এবং যতদিন তিনি ঈশ্বরের মহিমার সঙ্গীত ঘোষণা করিবেন, যতদিন তাঁহার জীবন আছে, এমন কি সত্যের জন্য মৃত্যুকেও কেশব বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবেন। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় কেশবের পরাক্রম, তবুও তাঁহার মুখের প্রফুল্লতা, সৌন্দর্য্য,

অমায়িকতা চির পরিস্ফুট। সেই সুন্দর মুখখানি এখনও আমার হৃদয়ে জীবন্ত মূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি আমার মনের ভিতর কোন মানুষের প্রতিমূর্ত্তি থাকিয়া থাকে, তবে তাহা কেশবেরই মূর্ত্তি, তাঁহার পূর্ণ আকৃতি, এমন কি মস্তকের সেই কেশরাশি হইতে পায়ের অঙ্গুলীগুলির উজ্জ্বল নখর পর্য্যন্ত আমার প্রাণে ভাসিয়া থাকে। যদি আমার জীবনে কাহারও জন্য প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকি, তবে তাহা শুধু কেশবচন্দ্রের জন্যেই করিয়াছি। আমাদিগের স্বদেশ-প্রিয়তা আমাদিগকে ঐ সেই প্রাচীন কালের যোগী, ঋষিদিগের শিক্ষাতেই নিরত নিরত রাখিয়াছে; কিন্তু কেশবচন্দ্র অসাধারণ এবং উদার প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতীয় একেশ্বরবাদের সহিত আরব ও প্যালেষ্টাইনের একেশ্বরবাদের সম্মিলন-সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন।"

Rev. Joseph Cook of Boston বলিয়াছিলেন যে, "He is an orator born not made. He has a splendid physique, excellent quality of organisation, capacity of sudden heat and of tremendous impetuosity and lightening-like swiftness of thought and expression combined with a most iron-like self-control." কেশবচন্দ্র বাগ্মিতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাগ্মিতা তাঁহাকে অর্জ্জন করিতে হয় নাই। তাঁহার বিরাট অবয়ব, গঠন করিবার অসাধারণ ক্ষমতা, চক্ষের নিমেষ মধ্যে উত্তেজনা আনিবার অলৌকিক শক্তি এবং চিন্তার ও ভাষার প্রকাশ করিবার বিদ্যুৎ সদৃশ দ্রুতগতি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের ন্যায় দৃঢ়তা সহকারে আত্ম-সংযম ছিল। একজন প্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহার একজন ভারতীয় খৃষ্টান যুবককে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইংলণ্ডের মহাবাগ্মী গ্লাডষ্টোন এবং ব্রাইট প্রভৃতি বক্তাগণের বক্তৃতা শুনিয়াছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রকে ইঁহাদের হইতে বক্তা হিসাবে উচ্চস্থানে আসীন মনে করেন। কেশবের ন্যায় অন্য কাহাকেও তিনি বলিতে শুনেন নাই।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার ৮ই জানুয়ারী স্কটিস্ চার্চ্চে কেশবের স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন যে, "আমি যিশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, মহম্মদ ও চৈতন্যদেবকে যে শ্রেণীর লোক বলিয়া বিশ্বাস করি, মহাত্মা কেশবচন্দ্রকেও সেই শ্রেণীর লোক বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকি।" এ সভাতে বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরব কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি ছিলেন; তিনিও কেশবচন্দ্রের অসাধারণত্বের সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় জীবনের শেষ ভাগে কেশবচন্দ্র বিষয়ে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে উহা প্রায় প্রতিদিন প্রাতে পাঠ করিতেন :—

"আদেশানুগতো ভক্তঃ কেশবো ব্রহ্মসেবকঃ।
কেশবাস্তুরা ভক্তা যোগবৈরাগ্যভূষণাঃ॥
বিজয়াঘোরগৌরাশ্চ কান্তিচন্দ্রাদয়স্তথা।
প্রকাশো বিনয়ীভূতঃ প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

স্বর্গগত মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং ক্ষণজন্মা ভারত-বিখ্যাত সুপণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী উভয়েই বলিয়া গিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র হইতেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তিনি এদেশবাসীদিগকে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন, একথার সাক্ষ্যস্বরূপ এখানে ৯০ বৎসর বয়স্ক প্রাচীন ব্রাহ্ম বরিশালের গৈলানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুপ্ত মহাশয় রাঁচিতে তাঁহার পুত্রের বাসায় বসিয়া আমার এবং রায় বাহাদুর বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের নিকটে নানা গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, একদিন তাঁহাদের কোন ভোজ-সভায় রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বলিয়াছিলেন, যদি কেশবচন্দ্র সেন আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে আমাদের অনেককে খৃষ্টান হইতে হইত না।

এমন ব্যক্তির সম্বন্ধে যতই দিন যাইবে, গতিশীল নরনারী যতই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবেন, ততই কেশবচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এক একদিক ফুটিয়া উঠিতে দেখিবেন। মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে চলিয়াছে। একশতাব্দী অতীত হইল, আজও রাজা রামমোহন রায় পরিগৃহীত হইতে পারেন নাই। তাঁহার সমকালবর্ত্তী বিদ্যাসাগর তাঁহাকে "A man of thousand years" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এদিকে কেশবচন্দ্রও নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাকে বুঝিতে লোকের দশহাজার বৎসর লাগিবে।

হিন্দু জাতির প্রকৃত হিন্দুত্ব দেখাইবার জন্যই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই সুপ্রাচীন যুগপ্রচলিত বেদ-বেদান্ত-সম্ভূত আর্য্য হিন্দুগণের আরাধ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, উহাই সেই বিশাল হিন্দুজাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড-সম্ভূত নানা শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত সুপ্রাচীন হিন্দু বৃক্ষটী, প্রাচীন সময়ে যাহার মূলদেশে বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ভারতপূজ্য ঋষিগণ হৃদয়ের শোণিত সিঞ্চন করিয়া গিয়াছিলেন, যুগ-যুগান্তের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় হৃদয়ের শোণিত প্রদান করতঃ মৃতকল্প-বৃক্ষটিকে পুনরায় সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন; কেশবচন্দ্র তাহাতে নানা ধর্ম্ম হইতে নানাবর্ণে চিত্রিত, নানা ফুল ফলে শোভিত শাখা প্রশাখা সমূহ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত যেমন একটি সতেজ গোলাপ বৃক্ষে নানা স্থান হইতে সংগৃহীত নানা ভাবের গোলাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা সংযোজিত করিয়া দেন এবং সে সকল যেমন মূল বৃক্ষের জীবনী-শক্তি দ্বারাই ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে এবং যথাসময়ে এই অপূর্ব্ব সমাবেশ সঞ্জাত নানাবর্ণের গোলাপগুলি পুঞ্জীকৃত হইয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে, তেমনি ভাবে যেন কেশবচন্দ্র এই ভারতের জাতীয় হিন্দু বৃক্ষের নানাস্থানে

ধর্ম্ম-জগতের নানাস্থানের নানাভাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা সন্নিবেশিত করতঃ, ইহাকে এক অপূর্ব্ব বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাকেই এ যুগে জগতের সমক্ষে নব আদর্শ রূপে ধরিয়া প্রথমে "Young Bengal, this is for you" বলিয়া স্বদেশবাসীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে জগতে ইহা "নববিধান" বলিয়া ঘোষণা করতঃ জগদ্বাসী নর-নারী-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। এখান হইতেই প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষিত হইতেছে। এখান হইতেই জগদ্-বরেণ্য সর্ব্বত্যাগী মহাযোগী বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধদেবের সাম্য, মৈত্রী, প্রেম ও শান্তির বাণী ঘোষিত হইতেছে। এখান হইতেই ঐ আরবের মহাপুরুষের মহাবাণী "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মহাধ্বনি উত্থিত হইতেছে এবং "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার; যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।" এই মহাবাণী মহাভক্ত প্রমত্ত মাতঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আশার বাণীরূপে নিয়ত উত্থিত হইতেছে। এই সকলের সংমিশ্রণে ইহা এক নব সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া পড়িয়াছে। উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে চর্ম্ম-চক্ষে শুধু এক সাদা আলোই প্রতীত হয়, ইহার ভিতরে যে নানা বর্ণের সংমিশ্রণ রহিয়াছে, তাহার উপলব্ধি হয় না; কিন্তু স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া দৃষ্টি করিলেই কেমন সুস্পষ্ট ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণগুলি ফুটিয়া উঠে। তেমনি সমাহিতচিত্তে দিব্য দৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন, কেমন সর্ব্ব-ধর্ম্মের সারতত্ত্ব (Essence of all religions) স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সকলেই এখন বুঝিতেছেন, বলিতেছেন ও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন যে, এযুগে ইহা বিধাতার এক নূতন বিধান।

শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গাজীপুর নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

(অষ্টপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব)

গাজীপুর-তীর্থবাসিনী স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর আহ্বান ক্রমে বাঁকীপুর হইতে শ্রীযুক্ত দামোদর পাল ও হাজারীবাগ হইতে ভাই অবিনাশচন্দ্র দাস সহ আরায় মিলিয়া আমরা তিন জন ১৪ই জানুয়ারী, সন্ধ্যার সময় সাধু নিত্যগোপাল-ভবনে উপস্থিত হই। ১৫ই প্রাতে পারিবারিক দেবালয়ে উপাসনা, সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন, সংক্ষেপে উপাসনা, হিন্দি ও বাঙ্গলা ভজন হয়। ১৬ই জানুয়ারী, প্রাতে উষাকীর্ত্তন, বেলা ১০টায় সাধু নিত্যগোপাল রায়ের সমাধি-প্রাঙ্গণে তাঁর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্যে এ সেবককে ব্যবহৃত হইতে হয়। সাধু-জীবন-প্রভাবে ও মার কৃপায় আরাধনা, সঙ্গীত ও প্রার্থনা ভক্তির সহিত সুগম্ভীর ভাবেই হয়। ভ্রাতা দামোদর পাল এই উপলক্ষে একটী পারলৌকিক নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করেন। সাধু-পত্নী কাতর ভাবে প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে নিত্যগোপাল-ভবনেই বন্ধু-সম্মিলন ও স্মৃতি-সভায় সঙ্গীত, সংক্ষেপে উপাসনা, বাঙ্গলা সঙ্গীত ও হিন্দি ভজন হয়, "সাধু জীবন অনুকরণ" আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের এই প্রার্থনা অবলম্বনে কিছু বাঙ্গালায় আলোচনা হয়। অনেকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও দুই তিন জন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এবং বালক যুবকগণ যোগ দেন। ১৭ই জানুয়ারী, খুব প্রাতে সংক্ষেপে উপাসনা করিয়া ভ্রাতা দামোদর পাল আহারান্তে বাঁকীপুর প্রত্যাগমন করেন। অদ্য সায়ংকালে নিত্যগোপাল-ভবনে মহিলা উৎসব হয়, সাধু-পত্নীর আহ্বানে প্রায় ৭০।৮০ জন হিন্দু মহিলা ও বালক বালিকা সমবেত হন, বালিকাগণ দুইটী সঙ্গীত করেন, ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রও বাঙ্গালা সঙ্গীত করেন। এ সেবককে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও আর্য্য মহিলা মৈত্রেয়ী ও সীতার জীবন অবলম্বনে সতীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শ বিষয়ে কিছু বলিতে হয়। উপাসনান্তে মহিলাদিগকে মিষ্টান্ন দ্বারায় জলযোগ করান হয়। ১৮ই জানুয়ারী, রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে দুই বেলাই উপাসনা, সঙ্গীত ও হিন্দী ভজন হয়। যথাবিধি পূর্ণাঙ্গ উপাসনা ও নিবেদন, সায়ংকালে উপাসনার শেষাংশে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের একটী হিন্দি উপদেশ পাঠ করিয়া প্রার্থনা করা হয়। অদ্য দুই বেলাই মাঝে মাঝে, হিন্দুস্থানী বন্ধুগণ যোগ দিয়াছিলেন, হিন্দি ভজন আগ্রহের সহিতই শুনিয়াছিলেন। স্থানীয় একটী মুসলমান তবলাবাদক হিন্দি ও বাঙ্গলা ভজন সঙ্গীতে বাজাইয়া খুবই সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯শে জানুয়ারী, সোমবার, প্রাতেই সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও শান্তিবাচন করিয়া আহারান্তে এ সেবককে আরা যাত্রা করিতে হয়, ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র হাজারীবাগ প্রত্যাগমন করেন।

এবার আমরা তিনটী ভ্রাতায় এই বিশ্বাস ও পুণ্যের তীর্থে উৎসব করিয়া খুবই আনন্দ লাভ করিলাম, সাধু-পত্নীর অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ ভোগ করিয়া ধন্য হইলাম। মা বিধান-জননীর সাধ্বী কন্যা, প্রায় অশীতিবৎসর-বয়স্কা বৃদ্ধা এখনও স্বর্গীয় স্বামীর সাধন-তীর্থকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি দুঃখ করিয়া কত কথাই বলিলেন। তাঁর প্রধান কথা, যাঁরা এই তীর্থ-রক্ষার ভার লইয়াছেন, সেই ট্রাষ্টীগণ, কিম্বা মণ্ডলীর প্রচারক বা অগ্রণীগণ তথায় গমন করেন না বা সংবাদাদি লয়েন না। বাস্তবিকই এইরূপ কত সাধন-তীর্থই অনুরাগী বিশ্বাসীদিগের অভাবে মরুভূমি প্রায় হইতেছে। জানিনা, মণ্ডলীর এরূপ নির্জ্জীবতা ও উদাসীনতা আর কত কাল থাকিবে।

প্রার্থনা করি, মা বিধান-জননী মৃতপ্রায় মণ্ডলীতে নব জাগরণ আনয়ন করুন।

বিনীত

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

উন্মত্ত ভক্ত ডাঃ রুবেণ স্বর্গে।

"মন পাখী চল যাই ঘরে, আর কি সুখ আছে থেকে দেহ-পিঞ্জরে।" এই সঙ্গীত ভ্রাতা ডাঃ রুবেণের বড় প্রিয় গান ছিল। তাই কি তিনি এই গান গাইতে গাইতে, হঠাৎ সে গান বন্ধ করিয়া, দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া, মার ঘরে স্বর্গের পাখীর দলে চলিয়া গেলেন?

সিন্ধুদেশবাসী ভক্ত মত্ত মাতঙ্গ ভাই ডাঃ রুবেণ বর্ষাধিক কাল হইল, আকস্মিক বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। সে নৃত্য, সে কীর্ত্তন, সে উন্মত্ততা, সে শিশুদলে পরিবৃত হইয়া বিভিন্ন সুর তান লয়ে নাচিতে নাচিতে গান, আবার গাহিতে গাহিতে উন্মত্ত নৃত্য আর আমরা পৃথিবীতে দেখিতে শুনিতে পাইব না। প্রায় বর্ষকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া, গত ১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল নববিধানাচার্য্যের আচার্য্যপদাভিষেকের সাম্বৎসরিক দিনে, নির্ব্বাক রসনায় বাক্য স্ফুরণ করিয়া ভাই রুবেণ বলিলেন, "আমি ঘরে যাব।" বন্ধুগণ মনে করিয়াছিলেন, তিনি করাচি হইতে সিন্ধু হাইদ্রাবাদে তাঁহার কন্যাসন্তানের নিকট স্বগৃহে যাইবেন। তাহারই আয়োজন বন্ধুরা করিতেছিলেন। এমন সময়ে নববর্ষের সুপ্রভাতে ভক্ত রুবেণ ব্রহ্মমন্দিরে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া মার ঘরে চলিয়া গেলেন।

যাঁহার নৃত্য-সঙ্গীতে ইহুদী বিধান উন্মাদিত, সেই দাউদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, ডাক্তার রুবেণ বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৌশলে নূতন বিধানে নবজন্ম লইয়া, সর্ব্বধর্ম্ম-মিলন-বিধান নববিধানের গানে আপনি মাতিয়া ও সকলকে মাতাইয়া স্বধামে চলিয়া গেলেন। তিনি পূর্ব্বে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেন এবং শেষে করাচির কোনও চাকরী করিতে করিতে আমাদের সিন্ধুবন্ধু ভূধার বৈঠাকি প্রভাবাধীনে আসিয়া নববিধানে বিশ্বাসী হন। কর্ম্মযোগী নবলালের সহিত ভক্ত প্রেমিক রুবেণের মিলন নববিধানের অপূর্ব্ব লীলা। সোদামা ভক্ত উন্মত্ত ভাই অমৃতলালেরও প্রভাব ভক্ত রুবেণকে উন্মত্ত করিয়াছিল। নববিধানকে কেহ আমরা জীবন্ত মনে করি না কেন, এখনও নূতন বিধানে নব নব জীবন সঞ্চারিত করিয়া, ইহার মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব বিধাতা বৃদ্ধি করিতেছেন ও করিবেন। বাস্তবিক আচার্য্যদেব যে বলিলেন, নূতন নূতন জীবন-বেদ নববিধানে এখনও ছাপা হইতেছে। তাহার সত্যতার প্রমাণ ভ্রাতা রুবেণের প্রেমোন্মত্ত জীবন।

নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "মত্ততা ভিন্ন হরিভক্ত ঠিক হওয়া যায় না। শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, মানিয়াছি। অপ্রমত্ত যোগ ভক্তির পথ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বেতন হইবার রাস্তায় চলিয়া যাই। গিয়া অষ্টপ্রহর তোমাতে মত্ত হইয়া চিরকালের জন্য শুদ্ধ ও সুখী হই।" ভ্রাতা রুবেণ ইহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

তিনি যখনই যেখানে গমন করিয়াছেন, সঙ্গীতের উন্মত্ততায় বালক বৃদ্ধ যুবক মহিলা সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি নিজে মাতিয়া সকলকে মাতাইতেন। উৎসব উপলক্ষে এখানে যে কয়বার আসিয়াছেন, কেবল উপাসনা পাঠ প্রসঙ্গ বক্তৃতায় তাহার তত মন উঠিত না। মাতিব আর মাতাইব, ইহাই তাঁর জীবনের সাধনা ছিল। তাহাই তিনি কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্যদেব যে আপনার ভিতর পাগল, মাতাল ও বালকের ধাতু সংমিশ্রিত বলিয়া জীবন-বেদে আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন, ভ্রাতা রুবেণের জীবনে সেই তিন ভাবের সংমিশ্রণ যথার্থই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া দগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার রচিত ও গীত সঙ্গীতের প্রত্যেক শব্দই যেন উন্মত্ততার উদ্দীপক। রামপ্রসাদী গানের যেমন রামপ্রসাদী সুর, বাউল সঙ্গীতের যেমন বাউল সুর তেমনি নববিধানের সঙ্গীতের একটা নববিধানী সুর হয়, আচার্য্যদেব চাহিয়াছিলেন; ভক্ত রুবেণের গানের সুর কতকটা তেমনি নববিধানী সুর বলিলেও বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, তিনি আমাদের নববিধানে সত্যই একটা নূতন উন্মাদকারী ভাব সঞ্চার করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রভাবে সিন্ধু বঙ্গ প্রেমযোগে গ্রথিত হইয়া, নববিধানের উন্মত্ততায় উন্মত্ত হউক। মার কোলে নবশিশুদলে ভক্ত শিশু রুবেণও অমরত্ব-লাভে ধন্য হউন।

— ০ —

সংবাদ।

অমরধামযাত্রা—আমরা আন্তরিক মর্ম্মাহত ও অসহনীয় শোক সন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, আমাদের পরিত্যাগী ঋষি প্রতাপচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী, বর্ত্তমান নববিধান পরিবারের মাতৃস্থানীয় পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী সৌদামিনী দেবী চুরির উদ্দেশ্যে কোন অজ্ঞাত নরহন্তার পাশবিক আক্রমণে, গত ২৬শে এপ্রিল, রবিবার, গভীর রাত্রে প্রাণাহত হইয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। পতির জীবদ্দশায় তাঁর সেবার জন্য যেমন, তেমনি পতির স্বর্গারোহণের পরও পতিদেবের ধর্ম্ম ও নীতি অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ জন্য, সত্যই যেন প্রাণ মন জীবন সকলই অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। পতির স্মৃতি চিররক্ষার জন্য তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নববিধান-মণ্ডলীর সেবার্থে ট্রষ্টী নিয়োগ করিয়া উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। মা শান্তিদায়িনী তাঁহার দিব্য আত্মাকে স্বর্গস্থ পতির সঙ্গে মিলিত করিয়া নিত্য শান্তি বিধান করুন এবং আমাদের এই মহাশোক-সন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

নববর্ষ—গত ১লা বৈশাখ, নববর্ষ ও ব্রহ্মানন্দের আচার্য্য-পদাভিষেক উপলক্ষে, প্রাতে ৭টার সময়, কমলকুটীরের নব-দেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, ভাই প্রিয়নাথ

আচার্য্যের উপদেশ হইতে "প্রেরিতদিগের প্রতি বক্তচতুষ্টয়" বিষয়টী পাঠ করেন। শ্রীমতী হেমলতা চন্দ এই দিন তাঁর স্বর্গীয় শিশুপুত্রের জন্মদিন স্মরণে এবং মহারাণী সুচারুদেবী, সকলের মিলনে ব্রহ্মোপাসনাই নববিধানের উপাসনা, এইভাবে প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা এবং ভক্ত কেশবের আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করেন।

নববিধান-পাঠাগার-প্রতিষ্ঠা—গত ১লা বৈশাখ, সন্ধ্যায়, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনান্তে, ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বস্থ নবনির্ম্মিত পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, সঙ্গীতান্তে ব্রহ্মমন্দিরের সম্পাদক ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ পাঠাগার-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়া, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আহ্বান করিলে, তিনি নববিধানের আদর্শ লাইব্রেরী সম্বন্ধে আমাদের ও যুবকগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে কয়েকটী কথায় সুন্দরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তৎপর পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া মহিলাগণ "এসহে গৃহদেবতা" এই সঙ্গীতটী অতি মিষ্টভাবে করিলে, ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী মহোদয়া ভগবানের শুভাশীষ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। পাঠাগার-নির্ম্মাণে এবং মন্দিরের অন্যান্য সংস্কার ও সৌন্দর্য্য-সাধনে দুই সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। মাত্র সাত আট শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বিধান-মণ্ডলীর সকলেরই এই বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করি।

হালখাতা—গত ১লা বৈশাখ, প্রাতে, হালখাতা উপলক্ষে, ৬৮নং হ্যারিসন রোডে, ঘোষ এণ্ড সন্সে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু এবং ৭৮।১ হ্যারিসন রোডে দেব এণ্ড সন্সে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ১৫ই এপ্রিল, হাওড়া দক্ষিণ বাঁটরায়, ১৭নং বদনরায় লেনে, স্বর্গগত ভাই আশুতোষ রায়ের পুত্রগণের গৃহে, তাঁহার দৌহিত্র, বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত ভবানন্দ দাসের পৌত্র, শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র দাসের নবজাত প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ১৫ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১০ই এপ্রিল, কলিকাতায়, ২৯নং সুকীয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই বঙ্কচন্দ্র রায়ের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বীণার সহিত, লাহোর-প্রবাসী স্বর্গীয় মধুসূদন সরকারের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অশোককুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ এই নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

দীক্ষা—গত ৫ই এপ্রিল, দেউলটী গ্রামে ভ্রাতা সত্যচরণ সিংহের পুত্র শ্রীমান্ অমরচন্দ্র সিংহ নবসংহিতা অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু দীক্ষার্থীকে উপস্থিত করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ নববিধানাচার্য্যদেবের অনুপ্রাণনায় দীক্ষা দান করেন।

তীর্থযাত্রা ও সেবা—ভাই প্রিয়নাথ গত ২৬শে মার্চ্চ পুরীতীর্থে যাত্রা করিয়া সপ্তাহকাল সেখানে অবস্থান, সাধন ও সেবাদি করিয়া আসিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসুর অনুগ্রহে তাঁহার "জগন্নাথধাম" আবাসে আশ্রয় লাভ করেন। এখানে দৈনিক উপাসনায় কোন কোন বন্ধুর সঙ্গ লাভ করেন। একদিন ময়ূরভঞ্জের রাজপ্রাসাদে আচার্য্য-পুত্র সরল-চন্দ্র সেনের সহিত পারিবারিক উপাসনা করেন ও আতিথ্য গ্রহণ করেন। রবিবার সন্ধ্যায় "নববিধান মন্দির এবং সমন্বয় আশ্রমের" জন্য নির্দ্দিষ্ট উন্মুক্ত ভূমিতে বৃক্ষতলে সমাগত বন্ধু বান্ধব ও আচার্য্য-পরিবারবর্গ সহ সামাজিক উপাসনা করেন ও নববিধানের অসাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে আত্ম নিবেদন করেন। অনেকগুলি গণ্য মান্য ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা যোগদান করেন। আচার্য্য-বধূ ও তাঁর কন্যা মধুর সঙ্গীত করিয়া সকলকে সুখী করেন। একদিন পুরীর অনাথাশ্রম ও বিধবাশ্রমেও গিয়া ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হন। স্থানীয় কালেক্টর ও কয়েকজন গণ্য মান্য ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়া ধর্ম্ম-প্রসঙ্গাদিও করেন।

উৎসব—হাজারিবাগ নববিধান-মন্দির-প্রতিষ্ঠার ৬৫ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, ৩রা এপ্রিল, শুভ শুক্রবারে, শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ দিনে, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক খড়্গ সিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। নিবেদনে ওদেশের দুঃখবাদ আর এদেশের আনন্দবাদের শুভসম্মিলন যে নববিধানে হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করেন। সন্ধ্যায় কেশবহলে সংগীতান্তে ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করিলে, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ ইংরেজীতে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বার্ত্তা ঘোষণা করেন। ৪ঠা এপ্রিল, প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ মন্দিরে উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষের আলয়ে শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস উপাসনা করেন, উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। ৫ই এপ্রিল, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব; প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে "চঞ্চলা কুটীরে" প্রীতি-ভোজন হয়। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করিয়া উৎসবের শান্তিবাচন করেন। শ্রীমান্ হরিসুখ গুপ্ত এই উৎসবে মধুর সংগীত ও সংকীর্ত্তন করিয়া সকলের প্রাণে তৃপ্তিদান করিয়াছেন।

গত ১৩ই এপ্রিল, চৈত্রসংক্রান্তিতে, বাঁটরা ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, ৫৩নং কালী-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহে, প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপাসনা মধ্যে বসন্তবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রভাতকুমার দাসের শিশু কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান হয়, শিশুকে "অঞ্জলি" নাম দেওয়া

হয়। সন্ধ্যায় শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তন ও সঙ্গীত করেন এবং শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। সকালে সুন্দর কীর্ত্তনে ও উপাসনায় যোগ দান করিয়া এবং প্রীতিভোজন করিয়া দুইশতাধিক নরনারী প্রীত হইয়াছেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ২৬শে এপ্রিল, রবিবার, প্রাতে, করাচির বন্ধুগণের সহিত সমযোগে, এখানেও নবদেবালয়ে ভক্ত রুবেনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। রাত্রে ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতেও ভাই প্রিয়নাথ ভক্ত রুবেনের সুন্দর জীবনের কথা বলেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৬ই এপ্রিল, ৩৭নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

আলিপুরস্থ ২৮নং নিউরোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, গত ১০ই এপ্রিল, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন; এবং ১২ই এপ্রিল, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। ১৩ই এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে তাঁহার স্মৃতি-সভা হয়।

গত ১১ই এপ্রিল, ৬।৭।১ একডালিয়া রোডে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

ময়ূরভঞ্জ-সংবাদ—বারিপদা হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—

গত ১৫ই মার্চ্চ, বারিপদা নববিধান-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত অনুন্নতশ্রেণীর বালকদের অবৈতনিক পাঠশালার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে বালকবালিকাদের লইয়া ব্রহ্মোপাসনা হয়। মধ্যাহ্নে তাহাদিগকে খিচুড়ী খাওয়ান হয়। অপরাহ্নে ষ্টেটের স্কুল সমূহের ইনস্পেকটরের সভাপতিত্বে বাৎসরিক সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। একটী সময়োপযোগী সঙ্গীত হইলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। কয়েকটী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও উকীল মাষ্টার প্রভৃতি ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ পায়, স্কুলের গৃহ বৃহদায়তন করা এবং বালিকাদের জন্য পৃথক ক্লাস করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই পাঠশালায় সন্ধ্যার পর শ্রমজীবীদের পাঠের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কাঠের কাজ, সূতা কাটা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সকল সাহায্যকারী বন্ধুদিগের নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

নভেম্বর, ১৯৩০—শ্রীযুক্ত মতিরাম সবীরাম আদভানি মাসিক দান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত গগণবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস পিতৃ-সাম্বৎসরিকে ৫৲, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃ-সাম্বৎসরিকে ৫৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের স্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী C.I. মাসিকদান ১৫৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ভ্রাতা ডঃ বিমানবিহারী দের জন্মদিনে ১৲ ও ভগ্নী বনলতার জন্মদিনে ১৲, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পত্নীর শ্রাদ্ধে ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত মাতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী কমলেকামিনী বসু দৌহিত্রের জন্মদিনে ১৲, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন ভ্রাতৃকন্যার শ্রাদ্ধে ২৲ টাকা।

—০—

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

আমরা শ্রীমতী সরস্বতী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী (রচনা ও পত্র সম্বলিত) একখণ্ড পেয়েছি। বই খানি পড়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, একজন হিন্দুনারী, হিন্দু পরিবারের মধ্যে থেকে, কি রকম করে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে কতখানি সাহসের পরিচয় দিতে পারে। এই ঘটনাটি প্রায় ৫৬ বৎসর আগে হয়েছিল। তখনকার দিনে হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কি রকম খড়্গহস্ত ছিল, তার অনেকটা ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যায়। সেই জন্যেই বইখানি মূল্যবান। আজকাল এ রকম ঘটনা খুব বিরল। তাহলেও শ্রীমতী সরস্বতী সেনের সৎসাহস, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ধর্ম্মানুরাগ অনেক নর নারীকে আশার আলো দেবে। শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মহাশয় বইখানি প্রকাশ করে, আমাদের সকলেরই বিশেষ উপকার করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অসাবধানতায় যথেষ্ট ভুল থেকে গেছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এল, মুখার্জ্জি কর্তৃক ১৭ই বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 15th May, 1931. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

প্রার্থনা।

হে চিরকল্যাণদায়িনী জননি, শোকে, দুঃখে, বিপদ্ পরীক্ষায় আমরা তোমার শরণাপন্ন না হইয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব? এই যে আমাদের নববিধান পরিবারের মাতৃস্থানীয়া তোমার প্রিয় কন্যাটী হৃদয়-বিদারক অবস্থার ভিতর দিয়া আকস্মিক ভাবে তোমার অমৃত ক্রোড়ে স্থান লাভ করিলেন, এ ঘটনা সমস্ত নববিধান পরিবারের পক্ষে কি মর্ম্মান্তিক শোককর ঘটনা! তুমি কি শিক্ষা দিবার জন্য, আমাদের কোন্ কর্ত্তব্যের ত্রুটি দেখাইবার জন্য, অথবা কোন্ নব চেতনায় সচেতন করিবার জন্য, কি নব আলোকে আমাদের প্রাণকে আলোকিত করিবার জন্য এমন একটি শোক-দুঃখকর অভাবনীয় ঘটনা আমাদের মধ্যে ঘটাইলে, এমন করিয়া আমাদের প্রাণকে ব্যথিত করিলে, তাহা তুমি যেমন জান, তেমন আর কে জানে? হে পরম গুরু! তুমি এই ঘটনার ভিতর দিয়া আমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিবার শিক্ষা দাও, যেরূপ আত্ম-চেতনা দান করিবার দান কর এবং আমাদিগকে তোমার প্রেম-মুখের দিকে তাকাইয়া, আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া বলিতে দাও, "যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি।" আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও, এই আকস্মিক দুর্ঘটনা-টীকে নিশ্চয় তুমি তোমার সেই প্রিয় দেবী কন্যার আত্মিক জীবনের উচ্চ মঙ্গলে পরিণত করিয়াছ। তোমার নব ভক্ত ব্রহ্মানন্দের বাল্যবন্ধু ও চির সহচর, ধর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্বস্ত শ্রেষ্ঠ সহকর্ম্মী প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের ইনি তো প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী। প্রতাপচন্দ্র ইঁহার সম্বন্ধে বলিলেন, "এই ব্রাহ্মসমাজ-মণ্ডলীর কোন প্রত্যক্ষ সেবা করুন না করুন, সৌদামিনী আমার জীবন রক্ষা করিয়া মণ্ডলীর উপকার সাধন করিলেন, এবং সেজন্য আমার প্রিয়বন্ধু-দের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী হইলেন।" হে আমাদের প্রতি জীবনের ও সমগ্র পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! তুমি তোমার এই প্রিয় কন্যার অসামান্য পতি-ভক্তি, পতি-সেবা ও পতির পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ একনিষ্ঠ ভক্তি, দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা রূপ সদ্গুণরাশিদ্বারা আমাদের সমস্ত নববিধান পরিবারকে, সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে বিভূষিত কর, এবং আমাদের পূজনীয়া তোমার এই গুণবতী সাধ্বী সতী কন্যাকে যথোচিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে আমাদের হৃদয়ের উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়া, তাঁহার পুণ্য স্মৃতি অন্তরে বাহিরে যথাবিধি রক্ষা করিতে আমাদিগকে সামর্থ্য দান কর। পৃথিবীর ধন, মান, ঐশ্বর্য্যের অসারতা ও ইহ জীবনের অনিশ্চয়তা এসময় ভাল করিয়া স্মরণ করিতে

দিয়া, আমাদিগকে পরলোক-সাধনে দৃঢ়ব্রত কর। স্বর্গলোকে তোমার এই প্রিয় কন্যাকে তাঁহার প্রিয়তম পতি-আত্মার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ-দলে মিলিত করিয়া, এখন তাঁহার আত্মাকে স্বর্গের কিরূপ উৎসবানন্দে পূর্ণ করিতেছ, সেই স্বর্গের দৃশ্য বিশ্বাস-নয়নে আমাদিগকে দেখিতে দিয়া, আমাদের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান কর, তব পাদপদ্মে এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন।

নবযুগে নূতন যুগধর্ম্ম, বর্ত্তমান যুগের বিশেষ উপযোগী, বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত নবধর্ম্ম সমাগত হইয়াছে। সেই নব ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ সত্য সকল, বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করা, প্রচার করা যেমন আমাদের এক দিকের কাজ, অন্য দিকে সেই ধর্ম্ম পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কিরূপে যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা দেখা, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া, সে বিষয় লইয়া প্রাণ খুলিয়া আলোচনা করা ও তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা আমাদের বিশেষ কাজ। আমাদের ধর্ম্ম পারিবারিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম। যেমন ব্যক্তিগত জীবনের জন্য, তেমনই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্য নবধর্ম্ম নববিধান নূতন আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। নূতন আদর্শকে জীবনে, পরিবারে, মণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সেই আদর্শটী বক্ষে লইয়া, নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম ও নূতন বিশ্বাস, অনুরাগে প্রাণকে পূর্ণ করিয়া, জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে; অন্যথা সিদ্ধির আশা সুদূর-পরাহত।

আর্য্যজাতির শৈশব অবস্থা হইতে প্রাচীন ভারতে পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দেশের অতীত ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দান করে। পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই মানব-সমাজ অসভ্যতার হীন স্তর হইতে সভ্যতার উচ্চ শিখরে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

কথা আছে, ভয়েতে ধর্ম্মের আরম্ভ, প্রেম ভক্তিতে ধর্ম্মের উচ্চ পরিণতি। নিরাকার সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের পূজা যখন প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবতার পূজা বন্দনা যখন সমাজের সেই উষাকালে গৃহ পরিবারে প্রচলিত ছিল, দেবতাগণের প্রসন্নতালাভে গৃহ পরিবারের কল্যাণ, দেবতাগণের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদে জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ, দেবতাগণ অপ্রসন্ন হইলে গৃহ পরিবারে নানা অকল্যাণের সম্ভাবনা, এই ধারণায় ভয়ে ভয়ে তখন পারিবারিক যজ্ঞ-বেদীতে দৈনিক অর্ঘ্যাদি শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত দেবতা-গণের উদ্দেশে অর্পিত হইত। প্রতি পরিবারে গৃহস্থ ব্যক্তি সস্ত্রীক দৈনিক গৃহ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহা ভিন্ন সময়ে সময়ে ব্যাপকাকারে পরিবারে ও সমাজে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত। ঈশ্বর-ভয়, ধর্ম্ম-ভয় কোন না কোন আকারে সকল সময়ে সাধারণ মানব-পরিবারকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিয়াছে, ধর্ম্মপথে দৃঢ় ভাবে নিয়মিত করিয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্রত, নিয়ম, পূজা বন্দনাদি পারিবারিক ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপে প্রচলিত থাকে; প্রতি মণ্ডলী সেই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং তাহাই সে মণ্ডলার ধর্ম্ম-লক্ষণ রূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। প্রত্যেক ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে অতি অল্পসংখ্যক লোকই উচ্চ বিশ্বাস ও ভক্তি অনুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিশেষ সাধন-পথ অবলম্বন করেন। সাধারণ জনমণ্ডলী, বিশেষভাবে নারীকুল পুত্র কন্যা ও পারিবারিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে ভয়ে ভয়ে প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, পরিবারে ও সমাজে ধর্ম্ম-স্রোতকে প্রবাহিত ও অব্যাহত রাখেন।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগ মহা পরিবর্ত্তনের যুগ। স্বাধীন চিন্তা ও বিচার এবং স্বাধীন কর্ম্ম-চেষ্টার ভিতর দিয়া ভারতে নব যুগের আরম্ভ। ভয়, ভীতিকে মনের ত্রিসীমায় আসিতে দিতে হইবে না। নির্ভয়ে সত্য নির্ণয় করিতে হইবে, সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে। মানুষ কি নিরবলম্ব হইয়া, এই পরীক্ষা-সঙ্কুল সংসার-পথে, কর্ম্মের পথে, মনের মুক্ত স্বাধীনতাকে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিয়া, মুক্তালোকে সত্যের পথ নির্ণয় করিতে পারে, না সত্যকে অবাধে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে? স্বাধীনতা হইল এ যুগের মূলমন্ত্র। কিরূপ স্বাধীনতা? আত্মার স্বাধীনতা। আত্মার স্বাধীনতা মানব-জীবনের প্রকৃত স্বাধীনতা। ঈশ্বরের সঙ্গে উচ্চ যোগ ভিন্ন এই স্বাধীনতার

স্ফুরণ কোথায়, বিকাশ কোথায়? ঈশ্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক সহজ যোগে, মানব-জীবনে ধর্ম্মের উচ্চ স্ফুরণ-লাভের প্রধান উপায় নবযুগে ভয় নয়, বিশ্বাস। জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস নয়, সত্য ঈশ্বরে সত্য বিশ্বাস। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই নব যুগের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মপথের বিধি-নির্দ্দিষ্ট আচার্য্য। যিনি জীবনে আচরণ করিয়া দেখান, তিনিই আচার্য্য। কেশবের জীবন বিশ্বাসের জীবন। কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস নব যুগের আদর্শ বিশ্বাস। কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নয়, প্রকৃত বিশ্বাস, জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস। ধর্ম্ম-জীবনের মূলে এই বিশ্বাস থাকিলে প্রার্থনা ও পূজাবন্দনা সকলই ফলপ্রদ হয়। ধর্ম্ম-জীবনের মূলে সত্য বিশ্বাস থাকিলে আর সকলই লাভ হয়, কেশবচন্দ্রের জীবন তাহার সাক্ষ্য দান করে! তাঁহার যাহা ছিলনা, তাহাও হইল। তাই তিনি True Faith নামক গ্রন্থ লিখিয়া বিশ্বাসের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন এবং তাহার গোড়ায়ই বলিলেন, "হে ধর্ম্ম পথের যাত্রিগণ! তোমরা বিশ্বাসের অচল শৈলে ধর্ম্ম-জীবনকে স্থাপন কর, অন্যথা বিপদ পরীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে না।"

আমরা দেখিতেছি, প্রাচীন কালের লোক-মণ্ডলীর জীবনে যেমন ধর্ম্ম-ভয় ছিল, ঈশ্বর-ভয় ছিল, নবযুগে আমাদের পারিবারিক জীবনে ও মণ্ডলীগত জীবনে সে প্রকৃতির ধর্ম্ম-ভীতি তো নাইই, আবার বর্ত্তমান যুগের যুগাদর্শ কেশব-জীবনের জীবন্ত বিশ্বাসেরও আমাদের পারিবারিক ও মণ্ডলীগত জীবনে বিশেষ অভাব।

এ যুগ বিচারপ্রধান যুগ; আমরা শুধু পৃথিবীর পিতা, মাতা, শিক্ষক, গুরুজন ও প্রিয়জনের বিচার করিনা, আমরা পিতার পিতা, জননীর জননী, গুরুর গুরু, পরম পিতা মাতা, পরম গুরু, চিরমঙ্গল ঈশ্বরের কাজ কর্ম্মেরও বিচার করিতে ক্ষান্ত হই না। আমাদের বিচার-সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যদি প্রমাণ হয়, আমাদের বুদ্ধি-বিচারে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যদি উত্তীর্ণ হন, তবে আমাদের অনেকে তাঁহাকে কোন প্রকারে স্বীকার করেন। অনেক সময়ই তাঁহাকে প্রাণ হইতে, মন হইতে, গৃহ হইতে, বিশ্ব হইতে উড়াইয়া দিয়া, নিজেরা কর্ত্তা সাজিয়া, গৃহ পরিবারে সমাজে কর্ত্তৃত্ব করি। বর্ত্তমান সময়ে ভিতরে ভিতরে মানব-প্রকৃতির মধ্যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, ঈশ্বর বৈমুখ্য-প্রধান একটা গঠন-ক্রিয়া চলিতেছে। ইহা ধর্ম্মহীন শিক্ষার সাক্ষাৎ ফল। এ অবস্থায় কিরূপে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের আশা ভরসা বালক বালিকাদিগের জীবনে ধর্ম্ম-শিক্ষা, কিরূপে হবে পারিবারিক ও মণ্ডলীগত ধর্ম্ম-জীবনের আশানুরূপ গঠন? যেখানে সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভয় নাই, ঈশ্বর-ভয় নাই, জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস নাই, সেখানে অহঙ্কার, অভিমান নানা প্রকারে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই করিবে। তাই তো আমাদের ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে ভিতরে ভিতরে অহঙ্কার অভিমানের অগ্নিতে পারিবারিক ও মণ্ডলীগত জীবন দগ্ধ হইতেছে, ছারখার হইতেছে।

সহজ স্বাভাবিক ভাবে গৃহ পরিবারে ও মণ্ডলীতে কিরূপে ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্ম্ম-জীবন গড়িয়া উঠে, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া ইহা আমাদের ভাবিবার বিষয় এবং তাঁহারই আলোকে এ বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ প্রয়োজন।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।

(প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের "আশীষ" হইতে উদ্ধৃত)

যৌবনের প্রারম্ভে আমি এমন একটী আত্মার সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম, যিনি স্বার্থ-বিহীন প্রেমে, অসাধারণ যত্ন ও শ্রমে আমার শারীরিক ও সাংসারিক কল্যাণ সাধন করিলেন; এতদ্দ্বারা আমার জীবন-ব্রতের মহা সহায়তা হইল। আজ কালের প্রথা অনুসারে আমি মনোনীত করিয়া বিবাহ করি নাই। আত্মীয়দের নির্দ্ধারণ অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু যদি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিতাম, এমন যোগ্য পাত্রী নিশ্চয় পাইতাম না। আমার পত্নী সুন্দরী নহেন; বিদুষী নহেন; তাঁহার অনেক বিষম ত্রুটি আছে জানি, সেজন্য আমি অনেক সময় ক্ষুব্ধ হই। আমারও অনেক ত্রুটি আছে, কোন মনুষ্যের বিশেষ দোষ নাই? কিন্তু তাঁহার সাধুতা, নিষ্ঠা, কার্য্যকুশলতা, ভগবানে ভক্তি, উদ্যমপূর্ণ গৃহকার্য্য চিরদিন অতুল রহিল। আমার এই ক্ষুদ্র পরিবারে তাঁর যে স্থান ও কর্তৃত্ব

চিরদিন অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিয়াছি। বিধাতার দ্বারা মনোনীত হইয়া তিনি আমার গৃহকর্ত্রী হইয়াছেন ইহা বিশ্বাস করি। এই দৃঢ়চিত্ত নিষ্ঠাবতী সহধর্ম্মিণীকে আমার আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ইষ্ট পথে আমার চির-সঙ্গিনী করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছি। সাংসারিক কাজ কর্ম্মে আমার যেরূপ অক্ষমতা, এবং শেষ বয়সে শারীরিক অস্বাস্থ্য যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্চয় বুঝিতেছি, এমন কর্ম্মনিষ্ঠ বুদ্ধিমতী উদ্যমশালিনী পত্নীর সহযোগিতা না পাইলে আমার প্রাণরক্ষা হইত না, ধর্ম্মরক্ষা হইত না, দুরবস্থার সীমা থাকিত না। স্বীয় প্রকৃতি হইতে বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়া ইনি দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালন করিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজ-মণ্ডলীর কোন প্রত্যক্ষ সেবা করুন না করুন, সৌদামিনী আমার জীবন রক্ষা করিয়া মণ্ডলীর উপকার সাধন করিলেন, এবং সেজন্য আমার প্রিয় বন্ধুদের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী হইলেন।

—•—

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

বিধান-গঠনে আন্দোলন।

যখন কোন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হয়, তখন বাঁশের ভারা বাঁধিয়া অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, অট্টালিকা গাঁথা হইয়া গেলে আর তাহার দরকার হয় না; তেমনি বিধানের অট্টালিকা গাঁথিতে অনেক রকম সাময়িক উপাদানের প্রয়োজন হয়, সে সমুদয় স্থায়ী বা চির আবশ্যকীয় নয়। তথাপি তাহার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আন্দোলন, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই জন্য বিধানের অট্টালিকা গঠনের সময় আবশ্যক হয়; কিন্তু তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। সত্য যাহা তাহাই স্থায়ী; অসত্য ক্ষণিক মায়িক মানবীয় যাহা, তাহা অস্থায়ী।

দুঃখের আবশ্যকতা।

ঢাকের দুইটী দিক আছে। কিন্তু বাজনা হয় মাত্র এক দিকে, আর একটা দিকে বাদ্য হয় না, দেখিতেও কদাকার; তথাপি তাহা না থাকিলে চলে না, ঢাকের বাদ্য বাজে না। তেমনি জীবনের দুঃখ দৈন্য, রোগ শোক, বিপদ পরীক্ষা, নির্য্যাতন নিপীড়ন কালো অন্ধকার দিক হইলেও, জীবনের বাজনা বাজাইবার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় সহায়। তাই আচার্য্যদেব বলেন, "জীবনের গড়ন আধখানি শোকে, আধখানি সুখে।" বাস্তবিক দুঃখ বিনা জীবন সুগঠিত হয় না, জীবনের বাজনা সুস্বরে বাজে না।

নববিধানের হাওয়া।

যখন শীতকাল, তখন যে বাতাস বয়, তাহাতে আরো শৈত্য আনিয়া শরীরকে জড়সড় করে, কম্পিত করে, দুর্ব্বল করে। যখন গ্রীষ্মকাল আসে, তখন সে বাতাসের গতিই ফিরিয়া যায়, উত্তপ্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়, জীবন নব নব স্ফূর্ত্তি-লাভে ধন্য হয়। প্রাচীন বিধান ও নূতন বিধানে এমনই শীত গ্রীষ্মের পার্থক্য। প্রাচীন বিধানে বহু চেষ্টায়, বহু সাধ্য সাধনাতেও ধর্ম্মের অহং, সাধনের অভিমান যায় না, বরং বৃদ্ধিই হয়; কিন্তু নববিধান বিধাতার কৃপার বিধান, সাধ্য সাধনার বিধান ইহা নয়, সুতরাং সাধনাভিমান এখানে নাই। স্বয়ং বিধাতা "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া দেখা দেন এবং নিজ কৃপাগুণে যে সাধনের প্রয়োজন সে সাধন করান, এবং যেমন করিয়া জীবনকে পরিপুষ্ট করিতে হয় তাহা করেন। তাই এ বিধানের হাওয়ার গতিই ভিন্ন দিক হইতে, বিধাতার দিক হইতে। এ বিধানে কিছুই মানুষের হাতে নয়, ঈশ্বরের হাতে।

বখর-ঈদ।

কথিত আছে, আব্রাহামের পুত্রের প্রতি আসক্তি দেখিয়া ঈশ্বর তাঁহাকে আসক্তির বস্তু বলিদান করিতে আদেশ করেন। তাহে তিনি আপন প্রিয়পুত্রকে ঈশ্বরের নিকট বলি-স্বরূপ প্রদান করেন। সেই স্মৃতি-রক্ষার্থ মুসলমান সম্প্রদায় বখর-ঈদ পর্ব্ব সাধন করিয়া আসিতেছেন; মেষ, মহিষ, গো-বধাদি এই পর্ব্বের বিশেষ অনুষ্ঠান এবং তাহার সঙ্গে ভোজ ও নমাজ হয় এবং দরিদ্রদিগকে অর্থাদি-দানেরও ব্যবস্থা আছে। বাস্তবিক বলিদান-সাধন সকল প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম-সাধনের একটি বিশেষ অঙ্গ। তাঁহাদের সংস্কার, মানুষ পাপ করিয়া ঈশ্বরের যে বিরাগ বা ক্রোধের ভাজন হয়, ঈশ্বরের সে ক্রোধ বলিদান বিনা নিবারণ হয় না। ঈশ্বরের তুষ্টি লাভ করিতে হইলে তাঁহার নিকট বলিদান করিতে হয়। ব্রহ্মনন্দন শ্রীঈশার আত্ম-বলিদানও মানবের পাপ হেতু ঈশ্বরের ক্রোধ নিবারণ ও প্রীতি উদ্দীপন জন্য, ইহাই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন। আমরা ঈশ্বরকে ক্রোধ-পরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করি না, কিম্বা তিনি কোন বাহ্য বলিদান চান, ইহাও স্বীকার করি না; কিন্তু তিনি যে আমাদের নিকট হইতে আমাদের পাপ প্রবৃত্তি ও আত্মবলিদান চান, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কারণ তাহা দ্বারা আমরা পাপ-মুক্ত হইয়া

ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দীপন করি এবং আত্মপ্রসাদও লাভ করিয়া থাকি।

মাতৃ-চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা সৌদামিনী দেবীর শ্রাদ্ধবাসরে পাঠের জন্য লিখিত)

ভগ্ন দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া মুক্ত আত্মা অনন্তধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। সকলের অজ্ঞাতসারে, পুত্র কন্যা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন কাহাকেও না জানাইয়া, না বলিয়া, কথা কহিবার, দেখা করিবার, বিদায় লইবার অবসর না পাইয়া, তিনি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। যাবার সময় কত কষ্টই না পেয়েছেন! কি ভীষণ সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে! সেই ঘোর অন্ধকারপূর্ণ, ভীষণসংগ্রামময় মহা বিপদের সময় একাকী কি দারুণ কষ্ট যন্ত্রণা পেয়ে গেছেন, কেহ তাহা দেখিল না। ইচ্ছা হয়, একবার ছুটে তাঁর কাছে গিয়া সব কথা শুনে আসি, চিঠি লিখে তাঁর কাছে সব কথা জেনে আসি। এখন কেবল ভাঙ্গা খাঁচা, শূন্য দেহপিঞ্জর সেই নিদারুণ হৃদয়ভেদী মর্ম্মন্তুদ দুঃখের করুণ কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। মোহে অন্ধ, ঘুমঘোরে অচেতন তাঁর অযোগ্য ছেলেমেয়ে আমরা কেহ তাঁর ক্রন্দন, আকুল আহ্বান, প্রাণের ডাক শুনিতে পাইলাম না; আমরা কেহ সেই ঘোর সঙ্কট, ভীষণ সংগ্রামে এক বিন্দু সাহায্য করিবার, বাঁচাইবার, রক্ষা করিবার সুযোগ সুবিধা পাইলাম না। কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, "সেই বিষম দুর্দ্দিনে, সর্ব্বশক্তিমান্ বিপদভঞ্জন দুঃখহারী ভগবান্, তুমি তখন কোথায় ছিলে? তোমার অসহায় সন্তানের প্রাণের কাতর ক্রন্দন, আকুল আহ্বান তোমার চরণতলে পৌঁছায় নাই কি? অথবা তাঁর সেই প্রাণের ডাক শুনে, স্বর্গ থেকে ছুটে এসে, তোমার কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্তিধামে চলে গেছ, দেব?"

সকলে বলে তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু সন্তানহীন হয়েও যে তাঁদের কত শত শত সন্তান। ছেলে মেয়ে নাতি নাত্নী তাঁর অগ্রগামী স্বর্গবাসী প্রিয়তম স্বামীর ন্যায়, তাঁরও আদর যত্ন সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কাহারও সে সৌভাগ্য ঘটিল না, তিনি কাহারও সেবা লইলেন না। অন্তিমে প্রাণ ভরে সেই স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপিণী দেবীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া, পথের সম্বল হরিনাম মাতৃনাম শুনাইয়া, তাঁহাকে বিশ্বজননীর কোলে সকলে তুলিয়া দিবেন; তা না হয়ে এ কি ভীষণ কাণ্ড! সমাজের সকলে আজ নিতান্ত শঙ্কিত ব্যথিত মর্ম্মাহত, না জানি কোন মহাপাপের জন্য আজ এ ভীষণ শাস্তি আমাদের পাইতে হইল। আবার এই মহা অপরাধের জন্য, না জানি আরও কত অভিসম্পাত, কত ভীষণ শাস্তি আমাদের পাইতে হইবে।

তিনি যে কত নির্ভীক তেজস্বিনী পুণ্যবতী স্নেহপরায়ণা ছিলেন, তাহা বলা যায় না। অন্যায় অধর্ম্ম অনীতি দুর্নীতির প্রতি তাঁর কি তীব্র শাসন ছিল। কোনও অধর্ম্ম অনীতি দেখিলে তার ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। এই প্রাচীন বৃদ্ধ বয়সে, এমন অসহায় অক্ষম অবস্থায়, কি অসীম দুর্জ্জয় সাহস ছিল তাঁর প্রাণে। অনায়াসে একাকিনী এই সুদীর্ঘ জীবন যেন নীরব সাধনায় কাটাইয়াছেন। কাহারও সাহায্য সহায়তা ভিক্ষা চাহেন নাই। তবে শেষ দিনে বন্য হিংস্র সিংহশার্দ্দূল অপেক্ষা ভীষণতর কোন পাষণ্ড নরপিশাচ ঘরে ঢুকে, কি জানি কেন এমন কাণ্ড করিল!

তাঁর স্বামিভক্তির তুলনা নাই। জীবনে মরণে অচলা স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেলেন। তাঁর প্রিয়তম-প্রদত্ত স্নেহের দান বাড়ীঘর, পুষ্পোদ্যান, গৃহ-সামগ্রী, বাগানের ফুলটি অবধি অতি যত্নে সাবধানে প্রাণ দিয়া বুকে করিয়া রক্ষা করিতেন। পাছে তাঁর স্বর্গবাসী স্বামীর পুণ্যময় স্মৃতিচিহ্ন পবিত্র প্রচারাশ্রমে কোনও রকম অনীতি দুর্নীতি উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন। সকলের নৈতিক পবিত্র জীবনের জন্য বড় আগ্রহ, বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর প্রাণে।

আমাদের সকলের প্রতি তাঁর কি অসীম স্নেহ ভালবাসা ছিল, তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। তিনি আমাদের সমাজের মাতৃস্থানীয়া স্নেহময়ী জননী-স্বরূপিণী ছিলেন। আজ তাঁর অভাবে শান্তিকুটীর শূন্য। সকলের প্রাণ দুঃখ বিষাদে আচ্ছন্ন। আর হৃদয় যেন ঘোর অপরাধে ভারাক্রান্ত, অনুতপ্ত। তাঁর উপযুক্ত আদর যত্ন, সেবা শুশ্রূষা যাহা করা উচিত ছিল, তাহার কিছুই করা হইল না, এ দুঃখ জীবনে যাইবার নহে। তিনি আমাদের এত ভালবাসিতেন, আদর যত্ন করিতেন, তার উপযুক্ত আমরা তাঁর কিছুই করিতে পারি নাই। বেশী তাঁর কাছে গিয়া তাঁর একাকী সঙ্গিহীন নির্জ্জন বাসের সুদীর্ঘ জীবনে একটু আনন্দ দান করিয়াও সুখী করিতে পারি নাই। তাই আজ এই অপরাধী অভিশপ্ত জীবন এত বেশী অনুতপ্ত।

তবে যাও, মাগো, সেই আনন্দধামে, যেখানে দানব্রত ধর্ম্মব্রত দেবষিগণের চরণতলে সম্মিলিত হইয়া সেই আনন্দময়ী জগজ্জননীর স্নেহকোলে চিরশান্তিতে বাস কর। আর এই অপরাধী অযোগ্য সন্তানদের জন্য, এই দুঃখী জগতের জন্য, দয়াময়ী জননীর এক বিন্দু করুণা, মঙ্গল আশীর্ব্বাদ, শান্তিকণা ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া পাঠাইয়া দিও, এই দীন হৃদয়ের একান্ত বিনীত প্রার্থনা।

সরলা দাস।

—o—

পতিপ্রাণা সাধ্বী দেবী সৌদামিনী মজুমদারের আকস্মিক তিরোধান।

"যদিও তুমি আমাকে বিনাশ কর, তথাপি তোমাকে বিশ্বাস করিব। মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়াও যদি আমি বিচরণ করি, কোন ভয় করিব না। তোমার শাসনদণ্ড এবং যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা দান করে।"

আমাদের বিধান-পরিবারের এই দুর্বিষহ, অভাবনীয়, লোমহর্ষণ হত্যা-ঘটনায় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের এই মহান্ উক্তিই স্মরণীয়। জানিনা, আমাদের ব্যক্তিগত, পরিবারগত, মণ্ডলীগত জীবনের কোন মহাপাপ ও অপরাধে এমন ভীষণ বজ্রাঘাত আমাদের মস্তকে পতিত হইল! হায় হায়, কেন এমন ভয়ঙ্কর শোকসম্পাত আমাদের হৃদয়কে বিচূর্ণ করিল!

যিনি ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ব প্রথমাবস্থায় নারীকুলের কল্যাণার্থ দুর্ভেদ্য দেশীয় অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া, ধর্ম্মার্থে পতিদেবের অনুগমনে জীবন মন উৎসর্গ করেন, যিনি আজীবন ব্রাহ্মিকা-সমাজের সেবায় অক্লান্তভাবে আত্মদান করিয়াছিলেন, পতির জীবদ্দশায় পতিই স্বর্গ, পতিই ধর্ম্ম, পতি-সেবাই পরম তপস্যা, পতি প্রীতি লাভ করিলে সকল দেবতা প্রীতি লাভ করেন, ইহাই যাঁহার চির সাধন ছিল এবং স্বয়ং পতিদেবও যাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে বার বার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার সম্পর্কে বিধাতার এই কি বিধান!

পতির পরলোকগমনের পর হইতে আজ ২৬ বৎসর একনিষ্ঠ হইয়া, কাহারও কাহারও অপ্রীতিকর হইলেও ষোলআনা স্বামীর তীব্র নীতি সংরক্ষণে যিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন, গৃহের প্রত্যেক পদার্থে, উদ্যানের প্রত্যেক পুষ্পপত্রে, সমাজের সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে যিনি পতিদেবের আলেখ্য সন্দর্শন করিতেন এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে স্বামি-প্রদত্ত প্রায় পঞ্চাশহাজার টাকার মূল্যের গৃহ সম্পত্তি স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ গৃহহীন নববিধান-প্রচারক ও সেবকদের অধিবাসের জন্য ট্রষ্টীদের হাতে অকাতরে দান করিয়া গেলেন, তিনি বাস্তবিক হৃদয়ের কোমলতায়, পরসেবা-পরায়ণতায়, অতুলনীয় স্নেহ ও বাৎসল্য-গুণে সমগ্র ব্রাহ্ম-পরিবারের মাতৃ-স্থানীয়া ছিলেন।

দেবী সৌদামিনী এতই পতি-ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন যে, পতির পরলোক-গমন আজ প্রায় ২৬ বৎসর হইলেও, তাঁহার পতি-আত্মা তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই এই বিশ্বাসে, নির্ভীকচিত্তে এতাবৎকাল একাকী নিজকক্ষে স্বামীর শয্যায় আত্মিক সাধনায় স্বামি-সহবাসেই বাস করিতেন। এই জন্যই যেন কোন নারীকেও তিনি নিজকক্ষে শয়ন করিতে দিতেন না।

এমন অপার্থিব-ভাব-সম্পন্না পতিপ্রাণা সতীর স্বর্গীয় বিশ্বাসের সুযোগ অনুভব করিয়া, জানিনা কোন দুর্বৃত্ত নরাপশাচ গত ২৬শে এপ্রিল, রবিবার, গভীর অন্ধকার রজনীতে, তাঁহার "শান্তিকুটীরস্থ" দ্বিতল কক্ষের পশ্চিমদিকের জলের নল বাহিয়া উপরে উঠিয়া, মুক্ত জানালা পথে কক্ষে প্রবেশ করে এবং নৃশংসভাবে অশীতিবর্ষীয়া নিরাশ্রয়া বিধবাকে গলা টিপিয়া বা গলায় কাপড় বাঁধিয়া, অন্য বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া হত্যা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে চাবি লইয়া আলমারী খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, কয়েক খানি মাত্র নোট, যাহা হাত খরচের জন্য বোধ হয় ছিল ও কয়েকটী খুচরা টাকা লইয়া পলায়ন করে। সোমবার প্রাতে ৮টা পর্য্যন্ত শয্যা হইতে তাঁহাকে উঠিতে না দেখিয়া, কোন রকমে বাহির হইতে অর্গলবদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করিলে এই বীভৎসকাণ্ড দৃষ্ট হয়।

হায়! প্রাচীন বিধানে মাত্র ৩০টী টাকার জন্য জুডাস ব্রহ্মনন্দন ঈশাকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়া ক্রুশাহত করিয়াছিল; আর তেমনি কোন্ পাষণ্ড এমন ধর্ম্মনিষ্ঠা সতী সাধ্বী বৃদ্ধা নারীকে কয়েকটী মাত্র টাকার লোভে অমানুষিক ভাবে হত্যা করিল!

তিনি কতদিনই ত একাই এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে নির্ভয়ে রাত্রি যাপন করিয়াছেন, আর সে রাত্রে নিম্ন প্রকোষ্ঠে ও পার্শ্বের ঘরে কয়েকজন প্রচারক, সাধক ও তাঁহার সেবাকারীরা নিদ্রা যাইতেছিলেন; তথাপি এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল! বিধাতার এ কি বিধান, কে বুঝিবে! সতীত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য কি এই বিধান! কল্পনাতেও আমরা ভাবিতে পারি নাই, এমন হৃদয়-বিদারক ব্যাপার আমাদের বিধান-পরিবারে ঘটিবে!

এই অভাবনীয় হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ পাইয়া কলিকাতাস্থ সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বহু নরনারী তৎক্ষণাৎ অসহনীয় শোক-বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া, হাহাকার করিতে করিতে, শান্তিকুটীরে সমবেত হইলেন। পুলিশের নিয়মানুসারে শবদেহকে আমাদের যুবক বন্ধুগণ মৃতাগারে পরীক্ষার্থ লইয়া যান এবং ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত ও করোণারের দ্বারা পরিদৃষ্ট হইলে, শান্তিকুটীরে আবার তাহা আনয়ন করেন। তৎপর প্রচুর পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইলে, ভাই প্রিয়নাথ সজল-নয়নে আকুলপ্রাণে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও নবসংহিতার প্রার্থনা উচ্চারণ করেন এবং ভাই গোপালচন্দ্র গুহও প্রার্থনা করেন। অতঃপর "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে; হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ শোক দুঃখের ভিতরে"। সারা রাস্তা এই গান করিতে করিতে যুবক বন্ধুগণ ভক্তি ও গাম্ভীর্য্য সহকারে নিমতলা ঘাটে শব বহন করিয়া গমন করেন। পথে ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে শব রক্ষিত হইলে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রার্থনা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখ দিয়া শব বহন কালে সেখানকার বন্ধুগণ যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পল্লীর ভিতরে শবদেহ রক্ষিত হইলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন। শ্রীদরবারের সম্পাদক ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রধান শোককারী রূপে চিতায় অগ্নিদান করিলে, উপস্থিত প্রায় সকলেই অগ্নিদান করেন। কলিকাতাস্থ দরবারের প্রচারকগণ ও মণ্ডলীর সভ্য এবং বন্ধুবান্ধব অনেকেই পবিত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। রাত্রি প্রায় ১১৷৷টার সময় ভস্ম লইয়া আসা হয়।

শ্রীদরবার সপ্তাহকাল শোকব্রত গ্রহণ করেন এবং সপ্তাহান্তে গত রবিবার, ৩রা মে, সুগম্ভীর ভাবে আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতা অনুসারে শান্তিকুটীরে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে ট্রষ্টীদিগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন ভস্ম প্রতিষ্ঠা করেন, জ্যেষ্ঠ প্রচারক ভাই চন্দ্রমোহন দাস নবসংহিতার প্রার্থনা উচ্চারণ করেন। তাহার পর ভ্রাতা বেণীমাধব দাস, ভ্রাতা কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রাতা ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মিলিত ভাবে বেদীর কার্য্য করেন এবং শ্রীদরবারের সভ্যগণ শোককারী ভাবে যোগদান করেন। ভ্রাতা প্রশান্তকুমার নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা উচ্চারণ করেন; তাহাতে সমাগত সকল উপাসক উপাসিকা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথও উচ্ছ্বসিতভাবে আকুলপ্রাণে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিশেষ প্রার্থনা করেন।

"হায়! হায়! মা, এ কি করিলি? যিনি পতিগতি, পতিপ্রাণা, পতিহিতে নিত্য রতা ছিলেন, পতির প্রীতি-সম্পাদন বিনা যাঁর আর যেন কোন কাজ ছিলনা, যিনি পতির স্মৃতি চিররক্ষার জন্য আশ্রয়হীন প্রচারকদের আশ্রয়দিতে নিঃস্বার্থভাবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, তাঁকে কিনা নরহন্তা দস্যুর হস্তে নৃশংসভাবে হত হতে হলো! প্রাচীন বিধানে ত্রিশ টাকার লোভে ব্রহ্মনন্দন ঈশাকে ক্রুশাহত করেছিল, আর আজও কিনা সামান্য অর্থের লোভে, আমার মা, আমাদের সবার সতী সাধ্বী মা, সৌদামিনী দেবীকে মরণান্ত কি নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে গলাটিপে মারিয়া ফেলিল! ঋষি প্রতাপ বলে গিয়েছিলেন, আমার বিধবা পত্নী রইল, তাঁর পুত্রকন্যা নেই, তোমরা পুত্রকন্যা হয়ে তাঁকে দেখো, রক্ষা করো। হায়! আমরা কি দেখলাম, কি রক্ষা করিলাম? শত্রুর আক্রমণে মা আমার কি ভীষণ যাতনাই পেয়ে প্রাণ হারালেন! আর আমরা ঘুমিয়ে রহিলাম, কিছুই কর্ত্তে পারিলাম না। এ মাতৃহত্যা, নারীহত্যা, সতীহত্যার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা কেমনে করবো? আমাদের নববিধান-প্রবর্ত্তক আচার্য্য বল্লেন, যে ভাইকে না ভালবাসে, সে নরহন্তা। এমন মহা উচ্চ নীতি পেয়ে আমরা তা পালন কর্ত্তে পাচ্ছি না বলে কি, তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে এই মাতৃহত্যা হল? আমরা আমাদের মহাপাপে নববিধানের সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে পাচ্ছি না, তারই নিদর্শন কি এই লোম-হর্ষণ ঘটনা? হায়! মা আমার সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় শত্রুর আক্রমণে কি যে বেদনা পেয়েছেন, স্মরণ করিলেও প্রাণ ফাটিয়া যায়।

"আজ আমাদের এই মাতৃহত্যা, নারীহত্যা, সতীহত্যার মহা প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে দাও। গভীর অনুতাপ ও অনুশোচনায় আমাদের প্রাণকে দগ্ধ কর। আমাদের মাকে তাঁর সেই দেব পতি সঙ্গে, ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে মিলিত করে নিত্য শান্তি বিধান কর। আর সেই নরহন্তার জন্যও প্রার্থনা করি। সেও ত আমাদের ভাই। হায়! মানুষ হয়ে কেমন করে এমন কঠোর-হৃদয় হল, তার কেন এ দুর্ম্মতি হল, কোন প্রায়শ্চিত্তে তার এ পাপ মন পরিবর্ত্তিত হবে? আমাদের ভিতরও সেই মাতৃহত্যা, নারী-হত্যা, সতী-হত্যা পাপের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া প্রায়শ্চিত্ত করি। তোমার নববিধানে যাতে সবার গতি, মুক্তি ও শান্তি হয়, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। এই ভিক্ষা করিয়া কাতর প্রাণে বারবার তোমার চরণ ধরিয়া প্রণাম করি।" শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

এই পবিত্র অনুষ্ঠানে কলিকাতায় সকল সমাজের প্রায় তিনশত ভ্রাতা ভগিনী সমাগত হইয়া গম্ভীর ভাবে যোগদান করেন। অন্যান্য দান ব্যতীত ভোজ্য, শয্যা, তৈজসাদিও দান করা হয়; ইহার সকল ব্যয়ভার ঋষি প্রতাপচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও তাঁর সহৃদয় স্বামী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন বহন করেন। অনুষ্ঠানান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন হয়, ইহারও ব্যয়ভার শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বহন করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নববিধান ট্রষ্ট ১০৲ টাকা নগদ ও ফুল পাঠাইয়া শবদেহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও নববিধান ট্রষ্ট ও ভগ্নি-সমিতি শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্যরূপে ফুল প্রদান করেন।

এই নিদারুণ শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সীমলা, করাচি, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, বম্বা প্রভৃতি সকল স্থান হইতে তার বা পত্রাদি আসিয়াছে ও এখনও আসিতেছে এবং স্থানে স্থানে পারলৌকিক অনুষ্ঠানও সম্পাদিত হইয়াছে।

পরলোক-সাধন।

(শ্রীনববিধানাচার্য্যদেবের উক্তি হইতে সংগৃহীত)

ঈশ্বর ও পরকাল।

মনের প্রকৃত অবস্থায় ঈশ্বর-সাধন ও পরকাল-সাধন এক কালেই হয়। আমরা কখন জ্ঞান, কখন ভক্তি, কখন ধর্ম্মের এক অংশ, কখন অন্য অংশ সাধন করি। ইহা কেবল আমাদিগের অবস্থা প্রকৃত নহে বলিয়া। ঈশ্বরের ধ্যান, চিন্তা ও সাধনে যে আনন্দ, উন্নত সাধকদিগের পরলোকসাধনেও সেইরূপ।

আত্মার বাসস্থান পরলোক।

ব্রহ্ম-সাধনের উপায় অবলম্বন করিতে পারিয়াছি বলিয়া তাঁহাকে উজ্জ্বল আনন্দময় বলিয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। পরলোকের বিষয় সাধন করিলেও ঠিক সেইরূপ হইবে। সাধনের তারতম্যে ধোঁয়া ও উজ্জ্বলতা উভয়ই দেখা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে, কেবল তাঁহার কাছে নয়, কিন্তু তাঁহার মধ্যে বাস করি; পরলোক বিষয়েও ঠিক সেইরূপ। ঈশ্বর ও পরলোক সাধন পরস্পরের সহকারী। আত্মার বাসস্থান পরকাল, উহা ঈশ্বরেতে।

ঈশ্বরে অনন্তকাল বাস করিতেছি, তাঁহার মধ্যে ইহকাল ও পরকাল গ্রথিত রহিয়াছে। ইহকাল ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশ, তাহার পর পরকাল। মৃত্যু কিছুই নয়, একটী ঘটনা মাত্র।

ইহ ও পরজীবন।

জীবন একই, অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত। আমরা ইহ জীবনে পরকালের কেবল আভাস মাত্র পাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার এক অংশ লইয়া জীবন যাপন করিতেছি। যতবার ঈশ্বরে অবস্থান, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার সাধন, ততবার পরলোক আস্বাদন। ঈশ্বরেতে বাস সময় ও সীমা-বিশিষ্ট হইলে ইহকাল, অসীম হইলে পরকাল।

শরীর ছাড়া সাধন।

আধ্যাত্মিক সাধন করিতে হইলে শরীরকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কেন না তাহাতে ঈশ্বর ও পরকাল দুই স্বতন্ত্র থাকে ও ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে হয়। সাধন চশমা পরিলে ঈশ্বর ও পরকাল একত্র অতি উজ্জ্বল বেশে প্রকাশ পায়। সাধনহীন দুর্ব্বল চক্ষুতে উভয়ই ঝাপসা দেখায়।

নদীতে কোয়াসা হইলে তাহার অতি অল্প মাত্র অংশ দেখা যায়। অবশিষ্ট ভাগ নাই এরূপ নহে, কিন্তু তাহা কত দূর ও কিরূপ, কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।

সাধনহীন অবস্থা।

সাধন-বিহীন ব্যক্তি মৃত্যুরূপ একটী প্রাচীর গাঁথিয়া শরীর মধ্যে ও ইহ সংসারে বাস করে, ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন ভুলিয়া যায়। শরীরবাসী আত্মা ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ হইয়া, আহার পান আমোদ প্রমোদ ইহাই জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করে।

সাধকগণ যতবার মনে করেন জীবিত আছি, ততবার মনে করেন ঈশ্বর ও পরকালে জীবিত আছি।

পরলোকগত ব্যক্তিগণের সহিত মিলন।

ইহলোক ও পরলোক এক, কেননা আমাদিগের জীবন এক ভিন্ন দুই নহে। এখানে যে জীবনের আরম্ভ, সেই জীবনই অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকিবে। মৃত্যু কিছুই নহে। তাহা হইলে মৃত ও জীবিত সকলেই এক হইল, কারণ যাঁহারা মৃত তাঁহারা ত জীবিত রহিয়াছেন।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা মৃত, আর পরশ্ব যাঁহারা মৃত, সকলেই সমান ভাবে বর্ত্তমান। তাঁহারা কোথায় আছেন? নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে। উপাসনা দ্বারা আমি ঈশ্বরের নিকটস্থ হইলে তাঁহাদেরও নিকটস্থ হই। ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকিব, তাহাতে আর অসম্ভব কি?

পরলোকস্থ ব্যক্তিদের সহিত এক পরিবার হওয়া কি?

এক পরিবার কি, না এক বাড়ীতে প্রীতি-যোগে একত্র বাস করা। নিকটস্থ দূরস্থ, ইহলোকের পরলোকের সকল লোকই ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহা ছাড়া কাহারও থাকিবার যো নাই। তাঁর মধ্যে প্রবেশ করিলেই আমরা সকলকে পাই। সমুদয় জগৎ ঈশ্বরেতে আছে, এই সত্যটি সুস্পষ্টরূপে ভাবিলেই তাঁহাকে পিতা এবং পরস্পরকে ভ্রাতা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। পিতাকে ভাবিলেই ভাই ভগিনী, ভাই ভগিনীকে ভাবিলেই পিতা আসেন এবং দুই একত্র ভাবিলেই সমুদয় পরিবার সম্পূর্ণ হয়।

পরলোকগত ব্যক্তির সহিত যোগ।

ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির ধাপ আছে। পরলোকগত যে ব্যক্তি উন্নতিতে আমার সঙ্গে সমান, তাঁহার সহিত আমার যোগ দৃঢ় হয়। অধিক বিশ্বাসী, অধিক প্রেমিক, অধিক স্বাধীনতা-প্রিয় ব্যক্তিরা পরস্পরে এক শ্রেণীস্থ হন। আত্মায় আত্মায় গূঢ় আকর্ষণ আছে, আপনার ভাবের লোককে টানিয়া লয়।

একটা পাত্রে একসের জল ও আধসের তেল রাখ, আর একটা পাত্রে অল্প জলে এক ফোটা তেল রাখ; দুই পাত্রের জিনিষ একত্র করিলে জলে জল ও তৈলে তৈল মিশাইয়া এক হইবে।

স্থায়ী যোগ।

শরীরের যোগ কিছুমাত্র আবশ্যক নয়, আধ্যাত্মিক যোগে স্থায়ী ও প্রকৃত প্রণয় হইতে পারে।

বস্তুতঃ অনুরাগ হইলেই নিকট এবং রাগ হইলেই দূর। লাপল্যাণ্ডবাসীও নিকটস্থ এবং ঘরের লোকও দূরস্থিত হইয়া থাকেন। জীবিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যাহা সম্ভব, মৃত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা কেন সম্ভব হইবে না? ভাবের ভাবুক হওয়াই যথার্থ যোগের লক্ষণ।

আত্মায় আত্মায় এক ভাব হইলেই মিলিবে। তৈলে তৈল, জলে জল মিশে; সোণার পাত্রের তেল মাটীর পাত্রের তেলের সহিত একত্র হইতে অস্বীকার করে না।

পাঁচ আত্মায় ভক্তি হইলেই মিলিবে, কার সাধ্য পৃথক করিয়া রাখে? এইজন্য সমুদায় মনুষ্যাত্মা ভক্তিযোগে এক আধ্যাত্মিক পরিবারে বদ্ধ হইবে।

পরলোকগত আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ।

অনেকে ঈশ্বরের সত্তায় যেমন বিশ্বাস করেন, পরলোকের সত্তায় সেরূপ করেন না; এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বর ও পরকালকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন এবং পরকালের ব্যাপার সকল কল্পনা ও অনুমান দ্বারা চিত্রিত করিতে চান। ঈশ্বর ও পরকাল দুয়েরই বিশ্বাস যাঁহাদিগের উজ্জ্বল, দুইই তাঁহাদিগের সহজ ও স্বাভাবিক এবং এক মূল হইতে উৎপন্ন। বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা অনুমানের রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারা মিথ্যা ও কুসংস্কারে জড়িত হইয়া পড়েন। আত্মীয়দিগের সহিত দেখা হইবেই, বিশ্বাস একথা নিশ্চয় বলে না।

পরলোকে আত্মীয়দিগের সহিত পুনর্মিলন।

ইচ্ছা হইলেই যে তাহা পূর্ণ হইবে, ইহা বিশ্বাস করি না। কুপ্রবৃত্তি এবং সাংসারিক নীচ সুখাশা হইতে যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরতো পদে পদে তাহা বিফল করিয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধন করেন। অনেক সময় ধর্ম্ম-বিষয় সম্বন্ধেও আমাদিগের ইচ্ছা সম্পন্ন না হইয়া, আমাদিগের উন্নতির অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীতে যাহাকে আত্মীয়তা বন্ধুতা বলি, তাহা স্থায়ী নহে।

—•—

শোক-সহানুভূতি।

পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী সৌদামিনী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বন্ধুবান্ধবগণ যাহা তারযোগে বা পত্রে লিখিয়াছেন, তাহার সার সংকলন করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"Shocked tragic death Mrs. Mazumdar."—Mr. B. K. Haldar—Pyinmana.

"All here greatly moved join with you in mourning".—Secretary, Himalayan Brahmo Samaj.

"Grieved beyond measure."—P. K. Sen.

"We have been shocked to hear of the brutal murder of the venerable lady."—J. N. Bose, Puri.

"আমাদের ম্যাডাম গায়ন চলিয়া গেলেন? তিনি কি আমাদের জন্য ক্রুশ বহন করিতে আসিয়াছিলেন? যিনি এত-দিন তপস্যা দিয়া ভক্ত প্রতাপচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিকুটীরে' মৈত্রী গার্গীর মত সাধন করিতেছিলেন, তিনি হত হইলেন! তাঁহার ইচ্ছা কে বুঝিবে? আমাদের কিছুই বলিবার নাই।"—শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার।

"আমার পূজনীয়া দিদিঠাকুরাণী সৌদামিনী দেবী যে ভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া কঠোর মনোবেদনা সহ্য করি-তেছি। তাঁহার ন্যায় পুতস্বভাব, ধর্ম্মপ্রাণ, নিরপরাধ বৃদ্ধার প্রতি এরূপ নৃশংস ব্যবহার! বিধাতার চরণে অবিরত অশ্রুপাত ভিন্ন এই মহাপাপের আর কি প্রায়শ্চিত্ত করিব। তিনি ত সাধু ভক্তদের সঙ্গে মিলিয়া এখন স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন। তাঁর প্রাণে চির শান্তি লাভ হউক, দুর্জ্জনদিগেরও সুমতি হউক।"—শ্রীশ্রীনাথ চন্দ (ময়মনসিংহ)।

"আমি ও আমার পত্নী উভয়ে ভক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ও দেবী সৌদামিনীর অনেক স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি। ভক্ত প্রতাপচন্দ্রের অমৃতময় "আশীষ" আমার অতিপ্রিয় ধর্ম্মগ্রন্থ। তিনি দেবী সৌদামিনীকে স্বীয় জীবনে ভগবানের পরম আশীষ বলিয়া স্বীকার করিয়া ও সাক্ষ্যদান করিয়া গিয়াছেন। আজ সেই মূর্ত্তিমতী আশীষ অশরীরী মূর্ত্তিতে আবার তাঁহার পার্শ্বে।"—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সাধনা-শ্রম)।

"শান্তিকুটীরের মার বয়স হইয়াছিল, সুতরাং কোন সময় তাঁহার পরলোকগমনের সংবাদ পাইব, সে বিষয়ে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এরূপ অস্বাভাবিক ভয়ানক রূপে যে তাঁহার পার্থিব জীবন শেষ হইবে, তাহা কখন কল্পনা করিতে পারি নাই। আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন। গত রবিবার, ৩রা মে, আমাদের বাড়ীতে তাঁহার স্মরণার্থ উপাসনা হইয়াছিল।" শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, লক্ষ্ণৌ।

"সৌদামিনী দিদির খবর খবরের কাগজে পেয়ে মন বড় খারাপ হয়েছিল, কি ভয়ানক মৃত্যু! শেষটা কত যন্ত্রণাই পেয়েছিলেন! এখন ভগবানের চরণতলে বসে সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়াছেন ও কত হাসিতেছেন।"—শ্রীমতী সুজাতা দেবী, রেঙ্গুন।

"এ খবর পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছি। এ রকম হল কেন? ভগবান্ হতে দিলেন কেন?......যিনি গেলেন, আজ তাঁকে দেহের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে না। কি ভাবে মৃত্যু হল, এ ভাবনা আমাদের কাতর করছে বটে, কিন্তু তিনি যে নূতন শান্তি, নূতন মুক্তির হাওয়ায় পৌঁছেচেন, সেখানে এ ভাবনা থেকে রেহাই পেয়েছেন। তাঁর শান্তিতে আমাদের শান্তি। ও বাড়ীকে যিনি 'শান্তিকুটীর' নাম দেবার জন্যে inspired হয়েছিলেন, ঐ বাড়ীতে যিনি কত অদ্ভুত, অপূর্ব্ব দৈবশান্তি ক্রমাগত পেয়ে গেছেন, আজ সেই শান্তি উপরে নীচে, ঘরের কোণে কোণে দেখতে হবে, শুঁকতে হবে। সেই দেবদত্ত শান্তির প্রভাবে সমস্ত স্মৃতিকে মুছে ফেলতে হবে। আজ প্রতাপচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব। আশীষের Spirit এর পুনঃ প্রতিষ্ঠা। আর প্রতাপচন্দ্রের Spirit এর অবাধ স্বচ্ছন্দগতিতে জ্যাঠাইমারও আনন্দ।"—শ্রীযামিনীকান্ত কোঙার, করাচি।

"মাতৃস্থানীয়া মজুমদার মহাশয়ার পরলোকগমনের সংবাদ পড়িয়া প্রাণে বড় কষ্ট বোধ করিয়াছি। যাহা হউক, অমরধামে গিয়া তাঁহার আত্মা মাতৃক্রোড়ে শান্তিতে থাকুন, ইহাই প্রার্থনা।"—শ্রীকালীপদ দাস, বৈদ্যনাথধাম।

"একি ব্যাপার ঘটল, এ যে স্বপ্নের অগোচর!"—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ।

"I shall be with you tomorrow at prayer."—D. N. Sen, Patna.

"শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবীর শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আমরা পরিবারস্থ সকলে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার যাহা কিছু পার্থিব সম্পদ্ ছিল, তাহা তিনি তাঁর প্রিয় নববিধান-মণ্ডলীকে দান করিয়া গিয়াছেন। ডাকাতেরা মহা ভুল করিয়া সতী সাধ্বী বৃদ্ধা মহিলার প্রাণ নিষ্ঠুর ভাবে হরণ করিল! নববিধান-মণ্ডলীর ব্রাহ্মদের মধ্যে ধর্ম্মার্থে তাঁর দান সর্ব্বাপেক্ষ

বড় ও শ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার মহৎ দান পৃথিবীতে তাঁকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁর আত্মা স্বর্গে ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মবাদিনীদের সহিত মিলিত হইয়া শান্তিতে বাস করুক, এই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।"—ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার [রেঙ্গুনবাসী], দার্জ্জিলিং।

একখানি পত্র।

(ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও প্রিয়নাথ মল্লিক প্রভৃতির নিকট লিখিত)

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ কোন্ ভাষা ও কোন্ ভাব লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইব জানি না! আজ কলিকাতা নগরীর সংবাদ-পত্র সমূহ কোন্ হৃদয়-বিদারক লোম-হর্ষণ সংবাদ লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত!! মঙ্গলবারের ষ্টেটস্ম্যান পত্র কোন্ ভীষণ চিত্র লইয়া আমাদের কুটীরে সকলের হৃদয়কে এক অভূতপূর্ব্ব শোকোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত করিল!! আমাদের মাতৃ-স্থানীয়া ও পূজনীয়া তপস্বিনী আজ তাঁহার শান্তিকুটীরে কোন তপস্যায় লোক-চক্ষুর অজ্ঞাতসারে নিমগ্ন হইলেন! বিধাতার এ কোন্ বিচিত্রলীলা!! যে ভীষণ ঘটনা আমরা কোন দিন ভাবিতেও পারি নাই, আজ সেই অভাবনীয় ঘটনার চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত! জানিনা, কোন নর-রাক্ষসের নিষ্ঠুর হস্ত এই মাতৃ-আত্মাকে এভাবে বিনাশ করিল!! ইনি যে বহুদিন হইতে ঠাকুর তলায় হত্যা দিয়া পড়িয়াছিলেন। আজ সে আত্মা আবার কোন্ রহস্যের ভিতর হত হইলেন!! যাঁহার পুত্র কন্যা বলিতে আমরা বর্ত্তমান ছিলাম, যাঁহার মস্তকের প্রত্যেক কেশটী পর্য্যন্ত নববিধানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল এবং যিনি ব্রহ্মানন্দ ও স্বামিভস্ম মাখিয়া শেষ দিনের জন্য তাঁহার নিভৃত কুটীরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, আজ তিনি আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই ব্রহ্মানন্দ ও স্বামিভস্মের ভিতর প্রবেশ করিলেন! এই মহাযোগিনীর যোগ-রহস্য আমরা বুঝিতে পরিলাম না।

আজ আমরা ক্ষুদ্র অল্প-বিশ্বাসী মানুষ কোন্ অশ্রুজল ও কোন্ ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া এই আত্মার নিকট উপস্থিত! আজ কে বলিবেন, এই মাতৃ-আত্মা কোথায় চলিয়া গেলেন! আজ তিনি কোন্ লোকে আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিলেন! আজ ভগবানের এ কোন লীলা!

আজ আমরা এখানে সেই মাতৃ-আত্মাকে স্মরণ করিয়া আপনাদের বিগলিত অশ্রুজলের সহিত আমাদের অশ্রুজল মিলিত করিলাম। তিনি সেই অমরধামে সেই ভক্ত ব্রহ্মানন্দ, ভক্ত প্রতাপচন্দ্র ও ভক্তিমতী দেবী ও জননী জগন্মোহিনী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হউন।

পাটনা, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩১। শোকার্ত্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

কুচবিহারে নববিধানোৎসব।

গত ৩রা বৈশাখ হইতে ১০ই বৈশাখ পর্য্যন্ত এখানকার পঞ্চচত্বারিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ৩রা বৈশাখ আরতি যোগে উৎসব আরম্ভ হয়, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ভাব যোগে ইহা সম্পন্ন করেন। ৪ঠা প্রাতে কেশবাশ্রমে কলিকাতা হইতে আগত ভ্রাতা স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ছাপরা হইতে আগত রায় সাহেব হাজারীলাল "ধর্ম্মসমন্বয়" বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করেন। ৫ই বৈশাখ সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ বেদীর কার্য্য করেন, বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম-দুর্ভিক্ষ বিষয়ে আত্ম-নিবেদন করেন। মধ্যাহ্নে প্রীতি-ভোজন হয়, মাননীয় রেভেনিউ অফিসার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী হইতে বালক পর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন। অপরাহ্ণে পাঠ আলোচনা ও কলিকাতা হইতে আগত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে জমাট সংকীর্ত্তন হয়, পরে ভ্রাতা হাজারীলাল সন্ধ্যায় উপাসনা করেন।

৬ই বৈশাখ কেশবাশ্রমে আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দে এম, এ, এর পত্নী শ্রীমতী কিরণশশী দেবী পরিচারিকা-ব্রত গ্রহণ করেন। অনেক গুলি মহিলা ও বালক বালিকা প্রীতিভোজন করেন। অপরাহ্ণে ল্যান্সডাউন হলে ধর্ম্ম-সম্মিলন সভা হয়, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া সকল সম্প্রদায়স্থ ভ্রাতৃবর্গকে নববিধানের প্রেম সহকারে মহামিলনে আহ্বান করেন। ষ্টেটজজ মিঃ গুহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-যাজক রেঃব্রাওটু সাহেব সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করেন, হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মজুমদার ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দান করেন, ভ্রাতা হাজারীলাল হিন্দি ভাষায় ধর্ম্মাধিকার বিষয়ে বলেন; তাহার পর সভাপতি মহাশয় পাদরী সাহেবের বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া কিছু বলিলে, ভাই প্রিয়নাথ উপসংহার করিয়া সভাপতি ও বক্তাদিগকে ধন্যবাদ দেন। রাত্রে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথই উপাসনা করেন, এই উপলক্ষে রাজকুমারী ও রাজ-কুমার এবং রাজপ্রাসাদ হইতে কেহ কেহ এবং অন্যান্য অনেক উপাসক উপাসিকা যোগদান করেন। ৭ই বৈশাখ রাজর্ষি নৃপেন্দ্র-নারায়ণের সমাধিপার্শ্বে প্রাতে উপাসনা হয়, ভ্রাতা হাজারীলাল উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সং-কীর্ত্তনে উপাসনা হয়। ব্রহ্মমন্দির সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীতে পূর্ণ হয়। ৮ই বৈশাখ প্রাতে কেশবাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। কুচবিহারে সুনীতি আলোক এবং নববিধানের পরিত্রাণ সঞ্চারের জন্য শ্রীকেশবচন্দ্রের আত্মদান উল্লেখে প্রাণগত প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভ্রাতা হাজারীলাল "কর্ত্তব্য" বিষয়ে হিন্দি

ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করেন। তাহার পর উপাসক-মণ্ডলীর সভা হয়। ৯ই বৈশাখ প্রাতে প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন এবং অপরাহ্ণে কেশবাশ্রমে নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব হয়। ছেলে মেয়েরা বেশ আবৃত্তি ও অভিনয় করিয়া সকলকে প্রীত করেন। ১০ই বৈশাখ প্রাতে প্রচারাশ্রমে স্থানীয় উপাচার্য্যের দৌহিত্র কুমারী ইন্দুলেখার জন্মদিন স্মরণে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও সন্ধ্যায় কেশবাশ্রমে যথা-নিয়ম শান্তিবাচন সুগম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হয়। সমাধিতে ধ্যানান্তে উৎসবান্ত হয়। ১১ই বৈশাখ প্রাতে ভ্রাতা কেদারনাথের করুণাকুটীরে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন ও অপরাহ্ণে পুনঃ যাত্রা করেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী।

[কলিকাতায় সকল সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত]

কলিকাতায় সপ্ততিতম জন্মোৎসব।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮ (শুক্রবার, ৮ই মে, ১৯৩১) কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি যে, এই শুভঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে, তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ঐ সংবর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য, আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ (শনিবার, ১৬ই মে, ১৯৩১) সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময়, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ গৃহে একটী পরামর্শ-সভার অধিবেশন হইবে।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

সংবাদ।

কবীন্দ্রের সংবর্দ্ধনা—বিশ্বকবি রবীন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে আমরা আমাদের হৃদয়ের সাদর সংবর্দ্ধনা সানন্দে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের বরপুত্র, ঋষি-সন্তান নবযুগধর্ম্মের মহাপ্রেমমন্ত্রে, বিশ্বজনীন ভাব, চিন্তা, শিক্ষা ও সাধনার আহুতিতে, পূর্ব্ব পশ্চিমের মহা মিলনযজ্ঞে যে বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্বভারতীর উদ্বোধন করিলেন, তাহার পূর্ণসিদ্ধির অমৃত প্রসাদে তিনি বিশ্ববরেণ্য ও অমর হইয়া থাকুন, এই আমাদের প্রাণের প্রার্থনা।

নামকরণ—গত ৬ই এপ্রিল, ২৩শে চৈত্র, সোমবার, বারাকপুরে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কোয়াড্রের কন্যা ও পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পন্ন করেন। কন্যার নাম শান্তা ও পুত্রের নাম সত্যব্রত রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত প্রচারাশ্রমে ৪৲ ও ময়ূরভঞ্জে নববিধান সমাজান্তর্গত পূর্ণচন্দ্রপুর পাঠশালায় ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। বিধান-জননী কন্যা ও পুত্রটীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১৪ই এপ্রিল, বালীগঞ্জে ৬নং সানি পার্কে, শ্রীযুক্ত শিবকুমার চৌধুরীর প্রথম শিশুপুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। শিশুর নাম "প্রতাপকুমার" রাখা হয়। ভগবান্ শিশু ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১লা মে, ১৮ই বৈশাখ, শনিবার, বারিপদা-নিবাসী স্বর্গীয় সদাশিব মহারাণার কন্যা শ্রীমতী কুঞ্জেশ্বরীর সহিত বঙ্গের মুন্সিপুর নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত হরিদাস মল্লিকের পুত্র শ্রীমান্ বংশীধর মল্লিকের শুভ পরিণয় কার্য্য কলিকাতায় সম্পন্ন হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই বিবাহ তিন আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে। নববিধানের দেবতা এই নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দীক্ষা—গত ৩০শে এপ্রিল, ১৭ই বৈশাখ, শুক্রবার, কলিকাতায়, নবদেবালয়ে, বারিপদার স্বর্গীয় সদাশিব মহারাণার কন্যা শ্রীমতী কুঞ্জেশ্বরীর দীক্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ভগবান্ দীক্ষার্থিনীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পারলৌকিক—গত ৩রা মে, রবিবার, ভাগলপুরে, স্বর্গীয় হরিসুন্দর বসুর সাধন-গৃহে, স্বর্গীয়া সৌদামিনী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, কয়েকটী মহিলা সমবেত হইয়া উপাসনা করেন। শ্রীমতী মনোমোহিনী বসু উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু কাতরে প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তিনি শান্তিকুটীরে প্রচার আশ্রমে ৫৲ টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন। সায়ংকালে স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু, উপাসনার মধ্যে স্বর্গীয়া দেবীর গুণাবলী স্মরণ করিয়া, বিশেষভাবে উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন।

শিলচর ব্রহ্মমন্দিরেও, ৩রা মে, রবিবার, প্রাতে, স্বর্গীয়া সৌদামিনী মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে। ভাই বিহারীলাল সেন উপাসনা করেন এবং স্বর্গীয় আত্মার জীবন সম্বন্ধে ভাবপ্রবণ-হৃদয়ে অনেক গভীর কথা বলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা—গত ২রা মে, শনিবার, ভাগলপুরে, বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে মহিলাগণ গোলকুটীতে সমবেত হইয়া, প্রার্থনান্তর আচার্য্যদেবের দৈনিক প্রার্থনা হইতে, শাক্যের বৈরাগ্য-বিধি, শাক্যের ধর্ম্ম, শাক্য-বিরোধী ভাব পাঠ করেন এবং শাক্যমুনি-চরিত ও বৌদ্ধধর্ম্ম ও নববিধান পুস্তক হইতে স্থল বিশেষ পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ শ্রীবুদ্ধের জীবন আলোচনা করেন।

অদ্য শান্তিকুটীরেও "আমাদের সঙ্কেতের" ব্যবস্থানুসারে স্বর্গগতা সৌদামিনী দেবীর স্মরণার্থ সন্ধ্যায় শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বিশেষ উপাসনা করেন এবং বৃক্ষতলে "বৈশাখী পূর্ণিমার" ভাব সাধনার্থ ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আচার্য্যদেবের বুদ্ধ-সমাগম পাঠ করেন।

সেবা—ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন :—

শ্রদ্ধেয় অনুকূলচন্দ্র রায়ের আহ্বানে ১৮ই এপ্রিল, প্রাতে কুল-টীতে উপস্থিত হই। ঐ দিন সন্ধ্যায় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ শান্তি-সুধা রায়ের নূতন প্রবাস-ভবনে উপাসনা হয়। পরদিন ১৯শে এপ্রিল, রবিবার প্রাতে, অনুকূল বাবুর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর বিংশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা খুব গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হয়। অনুকূলবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে অনুকূল বাবুর ভ্রাতা রায় বাহাদুর ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায়ের প্রবাস-ভবনে রবিবাসরীয় মিলিত উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সতীত্ব ও মাতৃত্ব এবং ইহাই আত্মত্যাগের জীবন্ত প্রমাণ, এই বিষয়ে আত্মনিবেদন হয়। এই পারলৌকিক অনুষ্ঠানে, নিরুপমা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র মুঙ্গের ও জয়নগর প্রচার বিভাগে ২৲ টাকা এবং ২য় কন্যা শ্রীমতী সুষমা ২৲ টাকা ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুচারু বসু ২৲ টাকা নববিধান প্রচারাশ্রমে দান করিয়াছেন। দয়াময়ী বিধান-জননীর অজস্র করুণা এই পরিবারের উপর বর্ষিত হউক।

স্বর্গারোহণ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ জীবন একনিষ্ঠ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া, গত ১৭ই বৈশাখ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইদানীং কয় বৎসর একেবারে শয্যাশায়ী ছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৩ই এপ্রিল, ৪৭।১ পটারিরোডে, স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী জুবিলী উৎসব ফণ্ডে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৫শে এপ্রিল, সন্ধ্যাকালে, ভাগলপুরে নীলালয়ে, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসুর মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীমতী মনোমোহিনী বসু উপাসনার কার্য্য করেন, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু মাতৃদেবীর জীবনে ভগবৎ-ভক্তি ও অনুরাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মিকাগণ শ্রদ্ধাসহকারে যোগ দান করেন।

গত ১৭ই বৈশাখ, ৬২ একডালিয়া রোডে, বালীগঞ্জে, সাধু অঘোরনাথের পুত্রদের গৃহে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

সাম্বৎসরিক উপাসনা।

আগামী ২৭শে মে, বুধবার, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, শান্তিকুটীরে, প্রাতে ৭॥টার সময় উপাসনা হইবে। সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পুস্তকে শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল ও অন্যান্য আমাদের সমাজের গান-রচয়িতার গান লওয়া হইয়াছে। তাহার কতকগুলিকে বিকলাঙ্গ ও প্রাণহীন করিয়া কিম্ভূত কিমাকার ভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অথচ তাহাতে রচয়িতার নাম থাকায় সাধারণে ভাবিতে পারেন যে, ত্রৈলোক্যবাবু প্রভৃতি বুঝি ঐরূপ বিকৃত আকারেই উহা রচনা করিয়াছেন। এই ভুল ধারণা হওয়া বা থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পুস্তকের নূতন সংস্করণ শীঘ্রই বাহির হইবে, সেজন্য উহা revise করিবার ভার শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিয়ম করিয়াছেন যে, তাঁহার রচিত গান কেহ লইয়া মুদ্রিত করিতে কিম্বা পুনর্মুদ্রিত করিতেও চাহিলে, কিছু অর্থ বিশ্বভারতীকে দিয়া অনুমতি লইয়া ছাপিতে হইবে। ত্রৈলোক্যবাবুর পুস্তকাদি এখন আমাদের সমাজের সম্পত্তি। আমাদেরও নিয়ম করা উচিত যে, তাঁহার কিম্বা অন্য রচয়িতার গান আমাদের সমাজের অনুমতি লইয়া তবে কেহ ছাপিতে কিম্বা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিবেন। আমরা অবশ্য অর্থের কোন দাবী করিব না। আমাদের এইমাত্র condition থাকিবে যে, যিনি আমাদের সমাজের গান alter কিম্বা বিকলাঙ্গ ও প্রাণহীন না করিয়া, কিম্বা কোন অংশ বা কথা বাদ না দিয়া ছাপিতে প্রস্তুত থাকিবেন, তাঁহাকেই মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণ করিবার অনুমতি দিতে কোন বাধা থাকিবে না।

নিবেদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ১০ম সংখ্যা।
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
30th May, 1931.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, আমরা তোমার নববিধানের বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া আসিতেছি; কিন্তু আমরা কই তোমার নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক, নববিধান-মূর্ত্তিমান নববিধান-প্রবর্ত্তকের সহিত একাত্মতা অবলম্বনে, অক্ষরে অক্ষরে ইহা পালন করিতে পারিতেছি? তোমার নববিধানাচার্য্য প্রার্থনা করিলেন, "মা, তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দিয়া যেন স্বর্গের উপযুক্ত হই।" কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা আমাদের সন্দেহ-যুক্ত অর্দ্ধ বিশ্বাস দিয়া বা বুদ্ধি-যুক্তি-বিমিশ্রিত জ্ঞান গরিমা অবলম্বনে তোমার বিধানকে যে গলা টিপিয়া মারিতেছি এবং যে মহা ভ্রাতৃপ্রেম জগতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তুমি বিশেষ ভাবে পৃথিবীতে নববিধান পাঠাইলে, সে সম্বন্ধেও আমরা সাধনহীন হইয়া অপ্রেম ও ভ্রাতৃদ্রোহিতা বশতঃ তোমার নববিধানকে সুধু অপমানিত করিতেছি তাহা নয়, ভ্রাতৃ-হত্যার অপরাধেও অপরাধী হইতেছি। ভাইকে না ভালবাসাই ত নববিধানমতে ভ্রাতৃহত্যা। এই জন্যই বুঝি, আমাদের এই নববিধান-পরিবারে বর্ত্তমান আকস্মিক লোম-হর্ষণ মহাকাণ্ড সংঘটিত হইতে দিলে। এই ভীষণ বজ্রশেল আমাদের মস্তকে যদি বর্ষণ করিলে, তবে ইহা দ্বারা আমাদের সকল অহং চূর্ণ কর এবং আমাদের পাপ অপরাধ স্বীকার করিয়া পূর্ণ অনুতাপ সহকারে, তোমার পদপ্রান্তে পড়িয়া যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতে দাও। আমরা ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে একান্তহৃদয়ে তোমার পদানত হই। যাহাতে তোমার পূর্ণ নববিধান পালনে এখনও সক্ষম হই এবং সর্ব্বমানব-পরিবারে তাহার প্রতিষ্ঠায় আমরা কথঞ্চিৎ ব্যবহৃত হইয়াও সার্থক-জীবন হইতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। মা, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

দেবী সৌদামিনীর আকস্মিক লোম-হর্ষণ মৃত্যুতে আমাদের শিক্ষা।

শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বিচারপতি নর্ম্মানের হত্যা উপলক্ষে বলেন :—

"হত্যাকাণ্ডের ন্যায় আশ্চর্য্য ঘটনা আমরা কখনও দেখি নাই একজন সামান্য লোকের হস্তে অসহায় হইয়া তাঁহাকে প্রাণদান করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হইতে

পারে? এরূপ ঘটনার কেহ অচেতন থাকিতে পারেন না। সকলের মন আন্দোলিত হইতেই হইবে।

"লোকের মনে ইহা স্মরণ করিয়া কি ভাবের উদয় হইতেছে? ভয় ও সন্দেহ। ভয়—পাছে আমাদের প্রাণের প্রতি কেহ এইরূপ আঘাত করে। সন্দেহ—হত্যাকারী যে জাতির, তাহার কোন ব্যক্তিকে দেখিলে আর বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ভয় ও সন্দেহ নীচ ভাব, ইহা পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে।

"ইহাতে ব্রহ্মদের শিক্ষার কি কিছুই নাই? কোন পুস্তক বিশেষ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র নয়; ঘটনা-সূত্র ধরিয়া আমাদিগকে সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন জগতের সাধারণ কার্য্য-প্রণালী দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ দেন, আবার বিশেষ ঘটনা দ্বারা আপনার বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই রূপে ইতিহাস মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

"এখন বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, আমরা এই অদ্ভুত ঘটনা হইতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে কি উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়াছি। জীবনের অনিত্যতা ও বৈরাগ্য সাধারণতঃ অনেকের মনে উদয় হইতে পারে।

"এই মৃত্যু হইতে আমরা দুইটী বিশেষ উপদেশ পাইতে পারি। প্রথম, আমরা যখন মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা কল্পনাতেও আনিতে পারি না, তখনও মৃত্যু অকস্মাৎ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুর জন্য এখনই প্রস্তুত থাকা আবশ্যক, নতুবা অপ্রস্তুত অবস্থায় মরিতে হইবে।

অপ্রস্তুত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রায় সকলেই ঠিক করিয়া আছেন, পূর্ব্ব জীবন যেরূপে যাউক, মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছু অবসর পাইব। তখন মনের আশা মিটাইয়া লইব। এইরূপে প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় প্রস্তুত হইবার আশা। মনের গুপ্তভাব এই, অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিব। কিন্তু হায়! মৃত্যু কি প্রস্তুত হইয়া আমাদিগকে মরিতে বলিবে? আমাদের উচিত, সমস্ত জীবনের শেষ দিনের জন্য যাহা তুলিয়া রাখি, অন্ততঃ প্রত্যেক দিনের শেষ সময়ের জন্য তাহা রাখা। নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিন যেন শয্যাতে শয়ন করিতে পারি। প্রতিদিনের দেনা প্রতিদিন শোধ করিতে পারিলে অনেক স্বচ্ছন্দ।

মৃত ব্যক্তিরা আমাদের প্রার্থনার বিশেষ অধিকারী। মৃত ব্যক্তির অপ্রস্তুত অবস্থায় শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

হন্তা ব্যক্তিও আমাদের দয়ার পাত্র। এ সময় যদি তাহার ফাঁসি হয়, ঘোর পাপের মধ্যে তাহার পক্ষে মৃত্যু কি ভয়ানক অবস্থা। এরূপ অবস্থা যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। পাপের বোঝা স্কন্ধে করিয়া মরিল বলিয়া তাহার জন্য অধিক কাতরতার সহিত প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।"

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের এই গভীর উপদেশ আমাদের বর্ত্তমান ভীষণ শোকাঘাতেও কতই স্মরণীয় ও শিক্ষাপ্রদ। বাস্তবিক নববিধানে কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, বিধাতা নিত্য নিত্য নব নব ঘটনা দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন। তাই আমাদের বিধান-পরিবারে এই যে অভাবনীয় অচিন্তনীয় আকস্মিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল, ইহা আমাদিগকে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্যই বিধাতা সংঘটিত হইতে দিয়াছেন, ইহা অবশ্যই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

প্রত্যেক মৃত্যু-ঘটনা হইতেই তিনি আমাদিগকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা দিতেছেন। তাহার সঙ্গে পরলোকগত ব্যক্তির জীবনের মহত্ত্ব যাহা আমরা পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, তাহা করিতে সুযোগ দান করিলেন। বাস্তবিক মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে আমাদের যাহা চিন্তা করা উচিত ছিল—চিন্তা করি নাই, যাহা চিন্তা করা উচিত ছিলনা—চিন্তা করিয়াছি, যাহা তাঁহাকে বলা উচিত ছিল বলি নাই, যাহা বলা উচিত ছিল না তাহা বলিয়াছি, যাহা তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য ছিল করি নাই, যাহা করা উচিত ছিল না করিয়াছি, এজন্যও সর্ব্বান্তঃকরণে অনুতাপ ও অনুশোচনা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা আমাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য।

স্বাভাবিক ভাবে যাঁহারা মৃত হন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যদি এই কর্ত্তব্য হয়, যাঁহার মৃত্যু এমন অস্বাভাবিক ভাবে সংঘটিত হইল যে যাহা আমরা কল্পনাতেও ভাবিতে পারি নাই, তাঁহার এই লোম-হর্ষণ মৃত্যুতে আমাদের জীবনে কতই উচ্চ কর্ত্তব্য, তাহা আমরা স্মরণ করিব না, ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করিব না?

বাস্তবিক নববিধানে ইহা এক নব শিক্ষা। এখন প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দেবী সৌদামিনী স্বামীর তিরোধানের দিন হইতে, তাঁহার স্বামী দেবের সঙ্গে মিলনের জন্য, কি ব্যাকুল অন্তরেই নিত্য নিয়মিত নিষ্ঠার সহিত উপাসনা-যোগে প্রস্তুত হইতে ছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্বামীর জন্য রক্ষিত চেয়ারের বামপার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিতেন। এবং যখনই আমরা তাঁহার সহিত উপাসনা করিয়াছি, কি তাঁহার নিকট তাঁহার স্বামীর উক্তি "আশীষ" বা আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়াছি, তখনই

তিনি সেই অমরদলে তাঁহার স্বামী সঙ্গে যেন স্থান পান, গলদশ্রু-নয়নে সরল-প্রাণে কতই তজ্জন্য প্রার্থনা করিতেন।

শরীর দিন দিন ভগ্ন হইতে দেখিয়া বলিতেছিলেন, "হায়, তিনি যেমন দিবানিশি ভগবানেতেই ডুবিয়া থাকিতেন, আমি ত তেমন পাচ্ছিনা, আমি যেন তাঁর কাছ থেকে পেছিয়ে পড়ছি; আমি তাঁর কাছে কি যেতে পারবো?"

প্রতাপচন্দ্রের স্মৃতি সংস্থাপনার্থ তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি প্রচারাশ্রমের ভাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য দান করিয়া, প্রতাপচন্দ্রের নিষ্ঠা নীতি উপাসনা যাহাতে অক্ষুন্ন ভাবে সংসাধিত হয় এবং দিবা রাত্রি পাঠ প্রসঙ্গে উপাসনা কীর্ত্তনাদিতে জমজমাট থাকে, ইহাই তিনি চাহিতেন। তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিলে যেন তাঁহার ধৈর্য্য থাকিত না।

শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ বিনা আর কোন পুরুষ আছে, শ্রীরাধিকা যেমন জানিতেন না, সতী সৌদামিনীও শান্তিকুটীরে প্রতাপচন্দ্রের ছাড়া আর কাহারও স্মৃতি সংরক্ষিত হয়, ইহা যেন তাঁহার প্রাণে সহিত না! এভাব সকলে ধারণ করিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিতেও ত্রুটী করেন নাই। এ সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ কথা কেহ বলিলে, তিনি প্রাণে বড়ই আঘাত পাইতেন।

ব্রাহ্মিকা-সমাজ, আর্য্যনারী সমাজ প্রভৃতি নারী-প্রতিষ্ঠানেও স্বামীর আদর্শানুরূপ নীতি-সংরক্ষণে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি নূতন কিছু ভালবাসিতেন না, তাই "আমাদের সংঘ" নামধেয় নব প্রতিষ্ঠানের যে বড় একটা পক্ষপাতী হন নাই, তাহার কারণ, পাছে যুবক যুবতীদিগের অবাধ সংমিশ্রণে কোন প্রকার নৈতিক শৈথিল্য উপস্থিত হয় এবং ছেলে মেয়েরা অসার আমোদ আহ্লাদ ক্রীড়া কৌতুকে নীতিহীন হইয়া পড়ে, ইহাই তিনি আশঙ্কা করিতেন। তাহারা উপাসনা কীর্ত্তন উৎসবাদি করে, তাহাই চাহিতেন। মঙ্গল পাড়ার নৈতিক অমঙ্গল ও বিবাদ বিসম্বাদে তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রন্ধন, সেবা সকলই তাঁর ব্রহ্মকন্যার আদর্শানুরূপ ছিল। সর্ব্বোপরি স্বামী পরলোকস্থ হইলেও, তাঁহার আত্মার নিত্য সঙ্গ সহবাস সাধন, তাঁহার জীবনের এক নিভৃত উচ্চ সাধন ছিল। যে শয্যায় তাঁহার স্বামী দেহরক্ষা করেন, স্বামী আত্মার সহিত একই শয্যায় রাত্রি যাপন করিতেছেন এই বিশ্বাসে, একাই নিভৃত কক্ষে ২৬ বৎসর কাল নির্ভয়ে সেই শয্যায় রাত্রি বাস করিয়া আসিয়াছেন এবং এই জন্যই মনে হয়, আর কাহাকেও আপন কক্ষে শয়ন করিতে দিতে চাহিতেন না। হায়! তিনি এই উচ্চ সতীত্ব-সাধন প্রতিষ্ঠা করিতেই কি নরহন্তার হস্তে আত্মবলিদান করিয়া, ধর্ম্মার্থে প্রাণদান-ব্রত Martyrdom উদযাপন করিলেন?

তাঁহার মহজ্জীবনের উচ্চ সাধনতত্ত্ব যাহা আমরা এতদিন উপলব্ধি করিতে পারি নাই, এখন তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া অবাক হইতেছি। ইহার অনুসরণ করা কি আমাদের মাতৃগণ, ভগ্নিগণ ও কন্যাগণের যথার্থ আকাঙ্ক্ষণীয় নয়? প্রাচীন যুগে দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ দিয়াছিলেন, মধ্য যুগে ধর্ম্মার্থে কত সাধু সাধ্বী প্রাণদান করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে দেবী সৌদামিনীও সতীত্ব-ধর্ম্ম পূর্ণ ভাবে সাধনের জন্য স্বামীর শয্যায় ২৬ বৎসর হত্যা দিয়া যেমন পড়িয়াছিলেন, আজ পাষণ্ড নরহন্তার হাতে হত হইয়া জীবনের সেই মহাব্রত উদযাপন করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

ঈশা যখন শত্রু-হস্তে পতিত হন, শিষ্যেরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সতী সৌদামিনী দেবীও যখন নরহন্তার হস্তে হত হন, আমরাও নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম; তাঁহার সেই নিদারুণ লোম-হর্ষণ হত্যাকালে আমরা তাঁহার দেহ-রক্ষার কিছুই উপায় করিতে পারি নাই।

প্রতাপচন্দ্র নববিধানে ক্রুশাহত ঈশার ভক্ত; তাই প্রতাপচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীও আজ ঈশার ক্রুশ গ্রহণে আত্মহত্যা দান করিয়া স্বামীর ব্রত উদযাপন করিলেন, নববিধানে নব হত্যাভিনয় সংসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। আর কি এখনও আমরা মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিব? নববিধান সতীত্বের বিধান, এক অদ্বিতীয়ের স্বামিত্ব সতীভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই এই বিধান প্রেরিত। সতীভাবে নববিধান বরণ করিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, ষোল আনা বিশ্বাস সতীভাবে ইহাকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে হইবে, নববিধানাচার্য্য ইহাই ত চাহিলেন। কই আমরা তাহা করিলাম। ইহাতে নানা প্রকার ভেজাল মেশাল মত মিশাইয়া যেন ইহার

গলা টিপিয়া মারিতেছি, ইহাই কি এই হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন নয়?

আর নববিধান ভ্রাতৃত্বের বিধান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নববিধান সমগ্র মানব-পরিবারে ভ্রাতৃত্ব-প্রতিষ্ঠার জন্য সমাগত। নববিধানমতে ভাইকে যে ভাল না বাসে, ভগ্নিকে যে দ্বেষ করে, সেই ত নরহন্তা। তবে নববিধানে বিশ্বাস স্বীকার করিয়াও আমরা প্রত্যেকেই কি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হইতেছি না?

হায়, তাই বুঝি আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার জন্য, আমাদের মাতৃস্থানীয়া দেবী সতী সৌদামিনীর হত্যাকাণ্ডরূপ বজ্রশেল আমাদিগের উপর নির্ব্বোষিত করিয়া, বিধাতা আমাদের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিলেন!

আমাদের নববিধান-দ্রোহিতা, ভ্রাতৃ-দ্রোহিতার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তরূপেই এই মহা লোম-হর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল, ইহা প্রাণগত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রত্যেকে ও মণ্ডলীগত ভাবে আমরা আজ মহা প্রায়শ্চিত্ত করি ও পূর্ণ অনুতাপ ও আত্মনিগ্রহ সহকারে বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়া নববিধানের পূর্ণ মহিমা সংরক্ষণে কৃতসংকল্প হই। মা এই মহাপাপী নরহন্তা নারী-হন্তাদিগের সহায় হউন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

একত্ব।

একে একে এক হয়, দুই অর্দ্ধে এক হয়, কিন্তু দুই কখনও এক হয় না। দুই তখনই এক হয়, যখন দ্বিত্ব একে নিমজ্জিত হয়। নববিধানের একত্ব, তুমি একজন আমি একজন থাকিতে হইবে না। আমার হৃদয় তোমার হইবে, তোমার হৃদয় আমার হইবে এবং উভয়ের মিলিত হৃদয় ঈশ্বরেতে যখন সমর্পিত হইবে, তখনই যথার্থ একত্ব হইবে।

সমযোগ।

বৃদ্ধ বলেন, আমি বড় হইব; যুবা বলেন, তুমি বার্দ্ধক্য বশতঃ অকর্ম্মণ্য হইয়াছ, অবসর গ্রহণ কর, আমি নেতৃত্ব করিব। নববিধান বলেন, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহারও অবসর নাই। বৃদ্ধ বৃদ্ধের কাজ কর, যুবা যুবার কাজ কর, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিও না, কেহ কাহারও অধিকার গ্রহণ করিও না; নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য শিক্ষা অধিকার অনুসরণে পরস্পরের সমযোগী ভাবে কার্য্য কর, কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিও না, আমার কার্য্য হইবে, আমার রাজ্য বিস্তার হইবে।"

নববিধানের ভ্রাতৃত্ব।

নববিধানাচার্য্য বলেন "সংসার বলে 'আমি সুখে থাকি, ভাই দুঃখে থাকুক।' ধর্ম্ম বলেন, 'আমিও দুঃখী হই, ভাইও দুঃখী হউক। আমার ছেলেদের টাকার অভাবে লেখা পড়া হবে না', ভাইএরও ছেলেরা টাকার অভাবে মূর্খ হইবে।' কিন্তু নববিধান বলিলেন, আমি দুঃখী হই, ভাই সুখী হউন, আমি অপমান পাইব, আর সকলে মান পাইবে।" প্রাচীন বিধান বলেন, প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাসিবে, নববিধান বলেন, ভাইকে আপনার অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিবে। নববিধান-বিশ্বাসীর ধর্ম্ম কত উচ্চ, দায়িত্ব কত অধিক, যেন আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎসাধনে কৃতসংকল্প হই।

ভিক্ষা ও চাকুরী।

নববিধানাচার্য্য বলেন, "ভিক্ষুকের মর্য্যাদা এই দেশের শাস্ত্রকারেরা চিরদিন গান করিয়াছেন। ভিখারী ভিক্ষা সংসারীর কাছে হেয় নীচ, কিন্তু ধার্ম্মিকের কাছে ভিক্ষা অতি উচ্চ। ভক্তের পক্ষে ভিখারী হওয়া কত আবশ্যক। ভক্তের ব্যবসায় ভিক্ষা করা। যে স্বর্গে যাইবে, সে ভিক্ষা করিতে করিতে যাইবে।" কিন্তু চাকুরী-জীবী মনে করেন, ভিক্ষা করা অতি হেয়। বাস্তবিক যে ভিক্ষায় আত্মমর্য্যাদা নষ্ট হয়, সে ভিক্ষা দ্বারা আত্মা নীচ হয় সত্য, কিন্তু ধর্ম্মার্থীর পক্ষে ভিক্ষাই পরিত্রাণের সোপান। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ভিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দীনাত্মা হইয়া পরার্থে সেবার্থে ধর্ম্মার্থে ভিক্ষা করিলে অহংভাব তিরোহিত হয়, মানবের ভিতর ঈশ্বরের দয়ারূপ দর্শনের সহায়তা হয়। চাকুরীতেও মানবের হীনতা আসিয়া থাকে। পরসেবার চাকুরীই উচ্চ চাকুরী।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

"যেন তাঁর আঁখি দুটি নব নীল ভাসে,
ফুটিয়া উঠেছে আজি অসীম আকাশে।"

যাঁর সুন্দর প্রভাত-কুসুমের মত জীবন, যাঁর অপূর্ব্ব কবিত্ব-সৌরভে জগৎ আজ পরিপূর্ণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়-কল্পে যাঁর অমানুষিক চেষ্টা আজ ফলভারে অবনত, তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসবে আমরা আমাদের ভক্তি-অর্ঘ্য দান করছি

এবং তাঁর দীর্ঘ-জীবন কামনা করছি। তিনি একাধারে কবি, গায়ক ও চিত্র-শিল্পী। ভারত-ভাগ্যের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, ভবিষ্যৎ-বক্তা ও ভবিষ্যৎ-স্রষ্টা। যে নবীন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে এ ধরায় এসে ধরাকে আলোকিত করেছেন এবং সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে এক নূতন দৃষ্টি দিয়েছেন, তার জন্যে শুধু ভারত কেন, সারা পৃথিবী আজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর আছে অসাধারণ প্রতিভা, বিচিত্র সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, অসীম চরিত্র-অধ্যয়নের ক্ষমতা, এ সব কথা বললে তাঁর ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। যিনি যুগযুগান্তের কালীমাখা কাচ-খণ্ড-সম জীর্ণ সংস্কারের গভীর মলিনতা দূর ক'রে, এক অভিনব চিন্তা-ধারা, ভাব-ধারা, কর্ম্মসূচির অবতারণা ক'রে, জগতের দৃষ্টি একেবারে খুলে দিয়েছেন, যিনি সাহিত্যের, সূক্ষ্মশিল্পের, রাষ্ট্রনীতির, সমাজতন্ত্রের কঙ্কালদেহে দৈববলে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, যিনি মৌলিকতায় বাল্মিকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, হোমর, দান্তে, সেক্সপীর, মিল্টন প্রভৃতি কবির সামনে নিঃসংশয়ে, নির্ব্বিবাদে আসন পেয়েছেন, যাঁর গলায় পৃথিবীর বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবির জয়-মালা শোভা পাচ্চে, তাঁর সম্যক পরিচয় আমরা কি দেব? আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সাজে না। সে যাহ'ক, এই শুভ ঘটনা উপলক্ষ্যে যে সব আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্চে, তার সঙ্গে আমাদের মণ্ডলীর আন্তরিক যোগ ও সহানুভূতি ইহার দ্বারা আমরা জানাচ্ছি। বাণীর বরপুত্র, মহর্ষির শ্রেষ্ঠ-সন্তান, ভারত-মাতার একনিষ্ঠ উপাসক, ভারতবাণীর প্রধান প্রচারক, জাতীয় গৌরবের পরিপূর্ণ সূর্য্য, এই বিশ্ববরেণ্য মহাকবির মাথায় বিধান-জননীর শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করছি।

অতীতের অনেক কথা আজ মনে হচ্চে। প্রথমবারে যখন তিনি বিলেত যান, যাবার আগে, যৌবনের সেই সুপ্রভাতে, মেডিকেল কলেজের প্রশস্ত হলে, তিনি যে সুমধুর গান করেন, তার কথা মনে হচ্ছে। কি অপার্থিব সঙ্গীত-সুধা-সিন্ধু উথলিত হয়েছিল! শ্রোতারা কি অপার সুখ-স্রোতে ভেসেছিল! তাঁর য়ুরোপযাত্রীর পত্র, "ভারতী"তে মাইকেলের "মেঘনাদবধ" কাব্যের তীব্র সমালোচনা, তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী, তাঁর বিলম্বিত চুলের শোভা এবং ছাত্রদের মধ্যে তার অনুকরণপ্রবৃত্তা প্রভৃতি কত কথাই মনে পড়ছে। বোধ হয়, ১৮৮৪ কি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, "রবিচ্ছায়া" (শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের ভূমিকা-সংবলিত) প্রথম প্রকাশিত হয়। বাহির হওয়া মাত্রেই স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন আগ্রহের সাহত একখানি কিনে আনেন। বইখানির সবুজ রংয়ের চক্‌চকে মলাট ছিল। এখন মনে পড়ছে, বইখানি পড়বার জন্যে আমাদের কি অদম্য ব্যাকুলতা হয়েছিল। প্রথম প্রথম স্বর্গীয় অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন উপাসনার সময় তাঁর গান বড় পছন্দ করতেন না। বলতেন, "These are for the cox-combs of the Brahmo Somaj"। কিন্তু শেষে, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত না হলে তাঁর উপাসনাই খুলত না। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের যুগে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার কথা খুব মনে পড়ছে। চৈতন্য-লাইব্রেরীর উদ্‌যোগে, ক্লাশিক্যাল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটারের নূতন বাড়ী হয়েছে) "মেয়েলি ছড়া"র উপর তিনি একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বর্গীয় মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মনে পড়ে, বসবার যায়গা না পেয়ে, প্রায় দু'ঘণ্টাকাল দাঁড়িয়ে, মন্ত্রমুগ্ধের মত, সুমধুর সঙ্গীতসম সেই প্রবন্ধ পাঠ শুনেছিলুম। সিটি কলেজ হলে (গোলদিঘির ধারে এখন যেখানে সিটি স্কুল আছে), একেশ্বরবাদীদের সম্মিলনীতে, "ধর্ম্মশিক্ষা"র উপর, তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার কথা মনে পড়ছে। ৩৫বছর আগেকার বোলপুর শান্তিনিকেতনের দেবালয়ে তাঁর উপাসনা ও গানের সুর আজও কাণে বাজছে, এতদিন পরেও প্রাণকে স্পর্শ করছে! জানিনা, স্বর্গের কোন্ উপাদানে ঐ অমৃতময় রসনা গঠিত! রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, রবীন্দ্রনাথ ভূতলে অতুলনীয়! সৌরভে, গৌরবে তিনিই তাঁরি তুলনা এ মহী-মণ্ডলে, "যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।"

আজ প্রায় ৫৫ বছর ধরে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে অফুরন্ত অমর আশাবাণী, কাব্যের মধ্যে দিয়ে, নাটক, নভেলের মধ্যে দিয়ে, গল্পগুচ্ছের মধ্যে দিয়ে, বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে, অভিনয় ও গানের মধ্যে দিয়ে, দেশের কাছে প্রচার ক'রে আস্‌ছেন, তার কতটা দেশ নিতে পেরেছে, তার হিসেব নিকেশ কর্‌বার যোগ্যতা আমাদের নেই; তবে এই কথা বল্‌তে পারি, তাঁর জয়-গাথা দৈন্য-জীর্ণ, ত্রাস রুদ্ধ, ভয়-চকিত, নিবীর্য্য ভারতবাসীর প্রাণে পরিত্রাণের আশাবাণী জাগিয়ে দিয়েছে, ভারতবাসীকে ছায়াপথ-সম উদ্ধারের আলোকিত প্রশস্ত পথ দেখিয়ে দিয়েছে, উহার কাণে নবজীবনের তূর্য্যশঙ্খধ্বনি শুনিয়েছে, অদূরে, অলক্ষ্যে গৌরব-মুকুট ভারত-শিরের জন্যে অপেক্ষা করছে, স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে।

ভূবনডাঙ্গার (বোলপুরের) নিভৃত, নীরব, নিস্তব্ধ, নিবিড় প্রান্তরমাঝে, স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্ত, মৌন তরুচ্ছায়ে, ফুল্ল-পুষ্প-ভারাবনত লতা-কুঞ্জের অন্তরালে, স্বর্গীয় বন্ধু রেবাচাঁদকে নিয়ে, যখন বিশ্বভারতীর ক্ষুদ্র বীজ প্রথম নিক্ষিপ্ত হয়, তখন কি কেউ ভেবেছিল, সেই ক্ষুদ্র-বীজ বর্ত্তমান বিশাল, বিপুল মহীরুহে পরিণত হবে, এক বিশ্বব্যাপী মহাপ্রতিষ্ঠানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে—যার উদ্দেশ্য ও আশা, সারা বিশ্বকে জ্ঞানের নবালোক ও স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দান করা, পৃথিবীর নানাস্থান থেকে জ্ঞানের মণি মাণিক্য আহরণ করে এক রত্নসিংহাসন রচনা করা। তিনি এই ভূমণ্ডলের যত দেশ ভ্রমণ করেছেন, বোধ হয়, তাঁর আগে কোন ভারতবাসী করে নি। বিশ্বভারতীর অন্তর্গত বোলপুর শান্তিনিকেতনের শিক্ষালয়, সুরুলের শ্রীনিকেতনের শিক্ষালয়

যাতে জয়যুক্ত হয়, এক্ষণে কবির তাই একমাত্র আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের একমাত্র গভীর বাসনা, প্রাণপণ যত্ন। তাঁর সে সাধনা কি সিদ্ধ হবে না? নিশ্চয়ই হবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

—•—

আরাধনা-সঙ্গীত।

(স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক রচিত, গত ৭ই বৈশাখ, কুচবিহার নববিধানোৎসবে শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রথম গীত)

সত্য।

(তেওট)

নিত্য তুমি পাশে ব'সে, বলিছ প্রতি নিমেষে "কত সত্য চেয়ে দেখ আমি"। (রে অবোধ জীবগণ)—

তুমি আছ ফুলে ফলে, অনলে অনিলে জলে, বিশ্বপ্রাণ প্রাণাধার স্বামী। (কেবা বাঁচে হে—তোমা বিনা এ জগতে—অমৃত পরশ বিনা)

মিথ্যার কুহকে ভুলে, ফিরি আমি অকূলে, বিষয়-বাসনা অনুগামী; (যেতে যে নারি হে—বাসনার বোঝা ল'য়ে)

তোমার আদেশবাণী, হৃদয়ে তার প্রতিধ্বনি, কত কথা বল অন্তর্যামী (আমি শুনেও শুনি না—করি মিছে কোলাহল)।

(বড় দশকুশী)

যুগে যুগে তাই ভবে, পাঠালে মহা মানবে, জীবন্ত জাগ্রত সত্য-কামী। (দেখ দেখরে—কত শত ভক্তবৃন্দ)

নব নব মহাসত্য, জীবন-বেদ-মাহাত্ম্য, প্রকাশিছ নিত্য দিনযামী॥ (নূতন বিধানে—প্রতি মানব-জীবনে)

জ্ঞান।

(খয়রা)

পুরুষ-প্রধান তুমি সর্ব্বজ্ঞ মহান্, (তুমি সর্ব্বদর্শী নারায়ণ) সর্ব্ব ধর্ম্ম দেশকালে তব অবস্থান। (সঞ্জীবিত কর মৃত—দিয়ে গো জীবন নব) আমিত্বের অভিমান, হইল মহানির্ব্বাণ, অনন্ত চৈতন্য স্পর্শে পেয়ে পরিত্রাণ। (মিথ্যা মোহ ম্লান হ'ল)

যুগে যুগে দেশে দেশে করে সাক্ষ্য দান, তোমার জ্ঞানের আলো ওগো জ্যোতিষ্মান্॥ (তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ, পুরাণ—বাইবেল, গ্রন্থ, কোরাণ)।

অনন্ত।

(একতালা)

(আহা) তব বিশ্বরূপ, মধুর কিরূপ, অনন্তস্বরূপ জ্যোতি। (যে রূপ দেখাইলে—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যে রূপ দেখাইলে) (ওহে) অনন্ত বিহারী, (ওহে সুদর্শনধারী—সকল বন্ধন-মোচন-কারী) তুমি হে শ্রীহরি, ভক্তজন করে স্তুতি। (তবে) কি ভয় প্রলয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়, কিবা লাভ কিবা ক্ষতি। (তুমি নিজে যখন—বিশ্বরথ-সারথি—জীবের চরম গতি) (মরি) কত রূপ ধরি, (আহা প্রেমের ভিখারী হরি—তুমি বিনাশিছ অত্যাচারী) প্রকাশ মুরারি, ভীষণ মধুর অতি। (হ'য়ে দণ্ডধারী) (হ'য়ে) অনন্তেতে লয়, গাহি তব জয়, (যেন) খেলি খেলা বিশ্বপতি। (জীবন্মুক্ত হ'য়ে—অনন্ত লীলা-সাগরে) ঐ অরূপ সাগরে, (আমি ডুবিলাম, প্রাণারাম, কি আরাম) ডুবিলাম এবারে, ওগো অগতির গতি। (চিরদিনের তরে)

প্রেম।

(ঝাঁপতাল)

তোমার অনন্ত প্রীতি, আকাশ বাতাস গীতি,
রূপ রস গন্ধ মধুময়;
হিংসা দ্বেষ ঘৃণা পাপ, দেয় শুধু মনস্তাপ,
শুষ্ক প্রাণ পূর্ণ প্রেমে হয়। (তব প্রেম পরশে)
কল্যাণী তুমি জননী, যুগ-ধর্ম্ম-প্রদায়িনী,
তব প্রেমে হইল উদয়—
যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানে, প্রাচ্যে নববিধানে,
সর্ব্বধর্ম্ম মহা সমন্বয়। (যুগ-প্রলয় হইল রে)
মাতৃরূপ ধরি হরি, ভক্তহৃদে অবতরি,
ঘুচাইলে সকল সংশয়;
কত ভালবাস তুমি, সবাকার শির চুমি,
ডাকিতেছ আয়রে তনয়। (ছোট বড় সবারে)
স্নেহময়ী তুমি মাতা, মায়ে পোয়ে খেলা হেথা,
নাহি কোন বাধা বিঘ্ন ভয়;
ধূলো কাদা ঝেড়ে ফেলে, (তাই) এলো ছুটে কোলের ছেলে,
সবে মিলে গাহে তব জয়॥ (মা মা মা ব'লে)

অদ্বিতীয়।

(লোফা)

একের মহিমা গাহি হয়ে একপ্রাণ, (ঐ) শোন শোন মর্ত্তবাসী বিশ্ব ঐকতান। (এক সুরে সব বাঁধা যে—একের আঘাতে অঙ্গে বাজে) চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা একে হ'য়ে লয়, অনাদি অনন্ত কাল গাহে তব জয়। (শুনেও শুনি না শুনি না—ভেদ বুদ্ধি নিয়ে মরি) বাঁধিছ সতত তুমি প্রেম বন্ধ মন্ত্রে, মায়ের সন্তান লহ দীক্ষা ঐক্য মন্ত্রে। (নইলে হবে না হবে না—নব বৃন্দাবন রচনা—সফল ভক্ত প্রার্থনা) একেতে হইল সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়, নিখিল জগত বিশ্ব একব্রহ্মময়। (দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচিল রে—এক আকার হইল) এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক সিংহাসন, বিরাজে তাহাতে নিত্য, এক

নারায়ণ। (ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে—ঈশা, শাক্য, মহম্মদ—গৌর নানক কেশব আদি)।

পুণ্য।

(ছোট দশকুশী)

পুণ্যময় পরব্রহ্ম, তুমি হৃদি তুমি মন, শুদ্ধ বুদ্ধ মঙ্গল নিলয়; পাপ বুদ্ধি আবর্জ্জনা, লয়ে তব পূজার্চ্চনা, কেমনে হইবে দয়াময়।

(বল বল দেব)

গভীর কলঙ্ক ছাপ, অশুচির অনুতাপ, প্রাণ মন পুড়ে খাক হয়; তব কৃপাকণা পেলে, পাপ তাপ যায় চ'লে, শুদ্ধ চিত্ত হয় শান্তিময়।

(পতিত-পাবন হরি)

(ঠুংরি)

যুগে যুগে দেখি তাই, কত না জগাই মাধাই, সব পলে রূপান্তর হয়; (নাথ হে)

দীপ্ত পুণ্য জ্যোতি ধরে, যায় তব শ্রীমন্দিরে, তনুমনে হ'য়ে তন্ময়।

(নবীন জীবন পেয়ে)

দলিত পীড়িত যত, পতিত ঘৃণিত শত, শো'ন শোন আশাবাণী কয়; (ভাই রে)

মাতৃকোলে রূপান্তর, হইবে সব সুন্দর, স্পর্শমণি স্পর্শে সুনিশ্চয়॥

(আর নাহি ভয়, নাহি ভয়)

আনন্দ।

(দোঠুকি)

আনন্দ-সুন্দর কিবা, তোমার আনন-আভা,
দেয় প্রাণে পুলক চেতনা; (সুন্দর মূরতি তব)
ভক্তচিত্ত-মনোলোভা, ধর নিত্য নব শোভা,
তুমি শান্তি তুমিই সান্ত্বনা। (প্রেমময়ী মাগো)
আনন্দময়ীর বিশ্ব, কত নব ভাব দৃশ্য,
কত সৃষ্টি কতই রচনা! (প্রেমানন্দে হ'ল—তোমার ইচ্ছার জয়)
রচি নব বৃন্দাবন আনন্দের নিকেতন,
জুড়াইছ বিশ্বের বেদনা। (মা আনন্দময়ী—ভূভার-হরণ হরি)

(খ্যামটা)

পরম আনন্দে হেরি সাধু-সমাগম।
(কিবা) যোগানন্দে মত্ত নিত্য ভক্ত মহাজন (ইহ পরকালে নাহি ভেদ)
চিদানন্দময়ীর কোলে সদাই, হ'য়ে পূর্ণানন্দে মগ্ন সবাই,
(বন্দে) ব্রহ্মানন্দ ভক্তবৃন্দ হরি নিরঞ্জন। (কিবা শোভা মরি মরি)

পরলোক-সাধন। (২)

(শ্রীনববিধানাচার্য্যদেবের উক্তি হইতে সংগৃহীত)

পরকাল-বিশ্বাস।

বিশ্বাস ইচ্ছামূলক নহে, কল্যাণ-মূলক এবং প্রকৃত কল্যাণ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা। আমি ঈশ্বরে জীবিত আছি, তাঁর সঙ্গে আমার অনন্ত যোগ; অতএব যতদিন ঈশ্বর থাকিবেন, আমি থাকিব।

ঈশ্বর প্রাণ, আমি প্রাণী। তাঁর সঙ্গে প্রত্যেক আত্মার প্রাণগত যোগ।

"এক বস্তুর সহিত কোন দুই বস্তুর যোগ থাকিলে তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগ হয়", এই নিয়মানুসারে অন্যের সহিত আত্মার যোগ হইতে পারে।

যোগ কিপ্রকার?

আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্থান পৃথিবীর ভূমি নয়। একশত লোক এক সময়ে ঈশ্বরের চরণে যখন পতিত হই, তখন সকলের প্রেম, ভক্তি একত্র হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, সকলে এক আত্মা হইয়া যাই। এই পরিবারের ভাব যত বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইব। আমাদের স্বাধীনতা আছে বলিয়া পরস্পরের সহিত প্রেম-বন্ধনের প্রতিবন্ধকতা বা শিথিলতা হইবে না। যত বিশ্বাস ও ভক্তি যাহাদের পরস্পরের সহিত মিলে, তাঁহারা ক্রমে অভিন্ন-হৃদয় অভিন্ন-প্রাণ হইয়া যান। এরূপ অবস্থাপন্ন লোকেরা একস্থানে বাস করেন। এইটী মূল বিশ্বাস করিয়া আমাদের মধ্যে যদি যোগ নিবদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পরলোকে একত্র থাকিতে পারিব।

পরলোকগত আত্মীয়ের দর্শন-কামনা।

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কামনা অনিষ্টের কারণ। অতএব পরলোকে সদ্গতির জন্য ইহাই স্বাভাবিক ও কল্যাণকর। আমাদের এক মাত্র আশা, সেখানে ঈশ্বরকে দেখিব, আর তিনি যাহাকে আনিয়া দেন, তাহাকে দেখিব।

আমাদের পরলোক-বিশ্বাস কি?

আমাদের ইহলোক ও পরলোক এক সূত্রে গ্রথিত এবং পরলোকের আরম্ভ এখানেই। এ জীবনে যাহার আস্বাদন পাই, পরজীবনে তাহা পাইব, নিশ্চয় বলিতে পারি। যাহার পরলোকের আশা ইহলোকে নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে, পরলোকে তাহা ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে থাকিবে।

আত্মায় আত্মায় আধ্যাত্মিক যে যোগ, তাহাই বিশ্বাস-যোগ্য। কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরা (Spiritualists) শারীরিক যোগের কল্পনা করেন, তাহার উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

আত্মার স্থান।

আত্মা শরীরে আছে, অথচ স্বতন্ত্র। শরীরের সহিত তাহার তুলনা করিলে নানা কুসংস্কার আসিয়া পড়ে।

পরলোকে স্থান।

ঈশ্বর যদি জিজ্ঞাসা করেন, পরলোকে গিয়া কোন্খানে থাকিতে চাও?

'কোথাও যাইতে চাই না, তোমাতেই বাস করিতে চাই। তুমিই পরম গতি ও পরম লোক।'

আধ্যাত্মিক পরিবার।

আধ্যাত্মিক পরিবারের যে ছবি আমাদের অন্তরে আছে, তাহার অনুরূপ জীবন্ত বস্তু জগতে নাই; তাহা আমাদের প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। চৈতন্য, ক্রাইষ্ট এই পরিবার গড়িয়েছেন। আমাদিগের "আশ্রমও" এই স্বর্গরাজ্যের সূত্রপাত, স্বর্গরাজ্যে আমরা কিছু পরিমাণে বাস করিতেছি। ইহলোক ও পরলোক এক। মৃত্যু এ ঘর হইতে ও ঘরে যাওয়া মাত্র।

উপাসনার অবস্থায় পরলোক-সাধন।

ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্থই পরলোকে বিশ্বাস। গভীর উপাসনায় নিমগ্ন হইয়া যখন ঈশ্বরকে আত্মার একমাত্র অবলম্বন জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি, তখন বিষয়, সংসার ও এ পৃথিবীর অতীত এক স্বতন্ত্র স্থানে আমরা বাস করি।

তখন এই মাত্র জানি, তাঁহাতে বাঁচিয়া আছি, চিরকাল থাকিব।

অতএব উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে ধরিয়া আমরা পরলোক ধরিতে পারি। অনন্তকাল তাঁহার পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মলোক আমাদিগের অনন্তকালের বাসস্থান।

'এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমোলোক এষে ঽস্য পরম আনন্দঃ।' ইনিই আমার পরম গতি, ইনিই আমার পরম সম্পদ, ইনিই আমার পরম লোক, ইনিই আমার পরম আনন্দ।

—•—

দেবী সৌদামিনী।

১

কি শুনিনু আজ এই সুদূর প্রদেশে,
সাধ্বী মাতা "সৌদামিনী" নাহিক ধরায়!
কি শুনিনু আজ কোন্ নরদস্যু এসে,
করিয়াছে হত্যা তাঁরে গভীর নিশায়!

২

কি দৃশ্য হায়! তাঁর সাধন-কুটীরে,
কে বলিবে আজ তাঁর কোন্ তপস্যায়—
এ ক্রুশ আসিল সেই নিশায় গভীরে,
কে বলিবে তিনি আজ গেছেন কোথায়!

৩

আজি সেই সাধ্বী দেবী কোন্ সাধনায়,
স্থির সৌদামিনী মত নীরব নিশীথে,
বল আজ কোথা তিনি লুকালেন হায়,
বল আজ চলিলেন—বল কোন্ পথে!

৪

সেই দেখেছিনু তাঁরে "প্রতাপের" পাশে,
শান্ত সমাহিত হয়ে বসিতে সদাই;
সেই তাঁরে দেখেছিনু সমাধির দেশে,
মহাভাবে মগ্ন সদা মুখে শব্দ নাই!

৫

সেই ভক্তিমতী সেই "জগন্মোহিনী,"
সেই দেখেছিনু সেই আর্য্যনারী-দলে,
সেই দেখেছিনু সেই দেবী "সৌদামিনী",
আজ সেই শেষ নারী কোথা যান চলে?

৬

সেই নববিধানের নব ডাক শুনে,
এসেছিলে তুমি মাতঃ নব প্রাণ লয়ে;
এসেছিলে নবদলে নবীন বিধানে,
বল আজ গেলে চলে কোন্ নবালয়ে?

৭

কোন্ যোগে যুক্ত হয়ে চলিলে আবার?
চলিলে কি সেই ধামে "প্রতাপ" যথায়?
চলিলে কি সেই ধামে—চলিলে এবার,
এ ক্রুশ বহন করে চলিলে তথায়?

৮

ক্রুশ নিয়ে এসেছিলে এ বিধানে সবে,
ক্রুশ নিয়ে তাই তুমি চলিলে আবার;
ক্রুশ নিয়ে তাই তুমি অজ্ঞাতে নীরবে
চলিলে কি সেই ধামে চলিলে এবার?

৯

তপস্যায় তপস্বিনী তাপস-আলয়ে
নিয়োজিতা ছিলে তুমি বিধান সেবায়;
আচার্য্যের অগ্নি-দীক্ষা মহা মন্ত্র লয়ে
ছিলে তুমি মহা মগ্ন মহা তপস্যায়।

১০

"আশীষে" প্রতাপচন্দ্র বলিলেন যাহা,
মাথা পেতে লয়েছিলে তুমি সে আশীষ ;
এ ক্ষণে তোমার দেখি পূর্ণ হলো তাহা,
কে বুঝিবে ইচ্ছা তাঁর যিনি জগদীশ।

১১

দিয়ে গেলে সব তুমি বিধান-সেবায়,
দিয়ে গেলে ব্রহ্মপদে করি নিবেদন,
দিয়ে গেলে রক্ত তব মহা তপস্যায়,
দিয়ে গেলে সব তুমি ম্যাডাম্ গায়ন !

১২

যাও তুমি সেই ধামে, নবীন বিধান—
আরও নবীন যথা, যাও তপস্বিনী,
আরও নবীন হয়ে যাও সেই স্থান,
যাও তুমি সেই দেশে দেবী সৌদামিনী।

৪নং ম্যাঙ্গল্‌স্ রোড,
পাটনা।

শোকার্ত্ত-সেবক
শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

নববর্ষ দিনে।

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের
আত্ম-নিবেদন)

নববর্ষ দিনে নববিধান-বিধায়িনী জননীকে প্রণাম করি। যত ভক্ত, যত সাধু ও যত শাস্ত্রকে স্মরণ করি ও বরণ করি। ধর্ম্ম-পিতামহ রাজর্ষি, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি এবং আমাদের প্রিয়তম অগ্রজ নেতা সসতী ও সপ্রেরিতদল এই ব্রহ্মমন্দিরে মাতৃবক্ষে বর্ত্তমান দর্শন করিয়া বারবার নববর্ষের অভিবাদন করি। ভারতেশ্বর ও ভারত-মাতা এবং ভারতবাসী ও জগদ্বাসী বিভিন্ন ধর্ম্ম-মণ্ডলীস্থ ভাই ভগ্নি এবং উপস্থিত অনুপস্থিত সম-সাধক-সাধিকাদিগকেও অভিনন্দন করি।

আজ নববর্ষদিনে সেইদিন আমরা স্মরণ করি, যে দিন আমাদের অগ্রজ নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে ধর্ম্মপিতা মহর্ষিকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইলেন। মহর্ষি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিলেন, আমি ঈশ্বরের আদেশে কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে নিয়োগ করিলাম। তিনিই তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ নামে আজ অভিহিত করিলেন। তাঁকে ঈশ্বর-নিয়োজিত চির আচার্য্য জানিয়া, সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী তাঁহার অনুগমন করুন।

এইদিন আরো সেইদিন, যেদিন পঞ্চদশ-বর্ষীয়া সতী জগন্মোহিনী দেবী স্বামীর অনুগমনে, দুর্ভেদ্য হিন্দুপরিবারের দুর্গ হইতে অলৌকিক বিশ্বাস ও পতি-ভক্তি প্রভাবে, ব্রহ্মানন্দের যথার্থ সহধর্ম্মিণী কেমন করিয়া হইতে হয়, তাহার পরিচয় দিলেন এবং আত্মজনকর্ত্তৃক সীতার ন্যায় স্বামী সহ নির্ব্বাসিত হইলেন, যদ্দ্বারা নববিধানের যুগল-সাধন ও গৃহস্থ-বৈরাগ্য-ধর্ম্মের সাধন-ব্রতের সূত্রপাত করিলেন। নববিধান যে পরিবারগত ধর্ম্ম-জীবন-দানের জন্য অবতীর্ণ, তাহাও প্রমাণ করিলেন।

আজকার দিনে আবার নববিধানের প্রেরিতপ্রচারকগণ নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস সাধনার্থে, নববিধানাচার্য্যের নিকট হইতে নববিধানের বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার মহাব্রত গ্রহণ করিলেন। বর্ষের পর বর্ষ তাঁহারা এই ব্রত এইদিনে পুনঃ পুনঃ গ্রহণ ও তৎসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া আমাদিগকেও তাহার অনুসরণে আকাঙ্ক্ষিত করিয়াছেন।

নববিধানাচার্য্যদেবের সহিত একাত্মতা সাধন ও ব্রত গ্রহণের ইহা এক বিশিষ্ট দিন। নববিধানের নবজীবন মূর্ত্তিমান যিনি, তাঁহার অনুগমন বিনা কেমনে আমরা নববিধান-বিশ্বাসী হব।

এদিন এই দীন সেবকের জীবনের এক বিশেষ স্মরণীয় দিন ; কেন না, মা এ অধম সেবককে নববিধানের সেবাব্রত-গ্রহণে যেদিন ডাকিলেন, সেইদিন হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল ধর্ম্মার্থে অশেষ প্রকার পরীক্ষায় পরীক্ষিত করিয়া এইদিনে সেবাব্রতে অভিষেক দান করেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে, সাধুভক্তের জীবনে বিধাতার অনির্ব্ব-চনীয় লীলা-ভাগবত সকলেই পাঠ করিয়াছেন ; কিন্তু মহাপাপী অজ্ঞান মূর্খ নানা প্রকারে নীচ হেয় বলিয়া সকলে যাহাকে জানেন, তাহার জীবনেও যে জীবন্ত ঈশ্বর কত লীলা করেন, তাহা শুনিলে নিরাশের মনেও আশা হইবে এবং নববিধানের অলৌকিক মহিমা মহিমান্বিত হইবে। তাই নববিধানাচার্য্য বলেন, "ঈশ্বরের সাধারণ এবং বিশেষ দয়া বিস্মরণ ভক্তিশাস্ত্রমতে অতি দূষণীয় ব্যাপার। বারংবার তাহা আলোচনা কর।" অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে সকল ঘটনা, যাহাতে ঈশ্বরের দয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে, অতি আদরের সহিত সেই সকল লিপিবদ্ধ করিবে। "যা দেখেছি এ পাপ জীবনে, শুনেছি আপন কাণে," তাহা যেন বলিতে পারি।

যে দিন ঈশ্বরাদেশে সেবাব্রত-গ্রহণার্থী হলাম, সংগীতাচার্য্য দেব তখনই একটি নূতন গান রচনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পরই প্রেরিতে প্রেরিতে অনৈক্য হইল। তাহার পর আহার অনাহারের সৌভাগ্য দিয়া, একমাত্র সন্তানকে বলিদান গ্রহণ করিয়া, কন্যার মেনিন্‌জাইটীস রোগের অবস্থাতেও বরফের জন্য চারিটী পয়সাও ভিক্ষা করিতে না দিয়া, আবার অপর কন্যার জীবন রক্ষার জন্য রাত্রি ৪টাতেও স্বয়ং ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া দিয়া, রেল দুর্ঘটনায় প্রাণ রক্ষা করিয়া, যখন যেমন প্রয়োজন, কখনও নির্য্যাতন, কখনও বক্তৃতায় আদর সম্ভোগ করাইয়া, চৌদ্দ বৎসর বনবাসী রাখিয়া, পরে সেবাব্রত-গ্রহণের উপযুক্ত করেন।

আচার্য্য-দেবের তিরোধানের পরই প্রেরিত প্রচারক মহাশয়-দিগের মধ্যে পরস্পরের মতের অনৈক্য হয়, কিন্তু এ দীন সেবককে বিধাতা কাহারও পক্ষে, কাহারও বিপক্ষে যোগ দিতে দেন নাই। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্রও লিখিয়াছেন, "I have begun to think those who are not with me are against me." আবার সেই সময়েই উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দও এ সেবককে লিখিয়াছেন, তুমিত প্রতাপের দল। এই উভয় সঙ্কটের মধ্য দিয়া বিধাতা কেমন করিয়া বাঁচাইয়া রাখিলেন, ভাবিলে অবাক হই। কন্যার মৃত্যু-শয্যায় মাকে বলিলাম, "আমার বাবা যেমন আমার মৃতপ্রায় অবস্থায় আমার জন্য প্রার্থনা করিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন, আমি কি তোমার নিকট এই মেয়েটীর জীবন ভিক্ষা চাব?" তিনি স্পষ্ট বলিলেন, "আমিত তোমাকে সে ধর্ম্ম দিই নাই, আমি তোমাকে নিষ্কাম ধর্ম্ম দিয়েছি, তুমি দেহরক্ষার জন্য প্রার্থনা কর্ত্তে পার না।" এমনই প্রতি পদে পদে শিখাইয়া, এ পাপীকে হাতে ধরিয়া নিয়া চলিয়াছেন ও চলিতেছেন, ইহাব মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দান করিব।

প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে যতদিন মতভেদ ছিল, মিলন হয় নাই, ততদিন আমাকে ordination লইতে দেন নাই। চৌদ্দ বৎসর পরে তাঁদের মধ্যে মিলন সম্পাদন হইলে, তবে সকলে মিলিয়া আমার ব্রতগ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এমনই প্রতি ক্ষুদ্র জীবনেরও ভার মা স্বয়ং স্বহস্তে লইয়া, প্রতি জীবন, প্রতিপরিবার, প্রতিজাতি প্রতিমণ্ডলীকে গঠন ও সমুন্নত করিতেছেন। কাহার সঙ্গে কখন কি লীলা করিবেন, তিনিই জানেন। যুগের পর যুগ, বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন নিত্য নব নব বিধান করিয়া, তিনি তাঁহই মহিমা মহিমান্বিত করিতেছেন, ইহাই নববিধান। বস্তুতঃ নববিধান তাঁর নবসৃষ্টি; নিত্য নব নব বর্ষ, নব নব জীবন দিবার জন্য ইহা প্রেরিত, একটী যদি আমরা প্রতিজনে, এবং সপরিবারে ও সদলে উপলব্ধি ও জীবন দ্বারা সাক্ষ্য দান করিতে পারি, তবেই নববিধান সপ্রমাণ হয়। আজ নববর্ষ দিনে এই যে মা নববিধানের নব পাঠাগার-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন, ইহার প্রকৃত সাফল্য লাভ হইবে, যদি এই সঙ্গে নববিধানের শিক্ষার্থী চিরশিশুদল একটী গঠিত হয়। আচার্যদেবের শিশু-প্রকৃতির অনুসরণে, আমরা যে নববিধান সম্বন্ধে কিছুই এখনও জানি নাই, শিখি নাই, এই দীন শিশু ভাব সাধনে যদি আমরা শিশু-ব্রত লইতে পারি এবং মার নব শিশুর সহিত শিশু-প্রকৃতি হইয়া নববিধানের নূতন মানুষ হইতে পারি, তজ্জন্যই এই নববর্ষ দিন আমাদের জীবনে সার্থক হয়। নববিধান-বিধায়িনী আমাদের পুরাতন জীবন হইতে নূতন মানুষ বাহির করিয়া তাঁহার নববিধান সপ্রমাণ করুন।

— —

ধর্ম্ম-শিক্ষা।

("আমাদের সঙ্ঘের" অধিবেশনে শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাসের নিবেদনের সারাংশ)

আজ আমাদের বলবার বিষয় হচ্ছে, ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা জীবন গঠন। মানুষের প্রাণের মধ্যে সত্য নিহিত রয়েছেন। যেমন কিনা শিশুকালে সামান্য কোনও অন্যায় কর্ত্তে গেলে কে যেন প্রাণের ভিতর থেকে বলে "ও কাজ করো না।" নিরক্ষর কৃষক ব্যক্তিও বলে, "এক পরাণে বলে কর, আর এক পরাণে বলে করিস্ না।" শিশুদের মধ্যে এই সত্যের প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে দেওয়াই, আমার মনে হয়, জীবনে প্রথম ধর্ম্ম-শিক্ষা। সত্য কাজ কর্ত্তে, সত্য কথা বলতে ও সত্য পথে চলতে কিছু মাত্র ভয় পাবে না, অথবা সঙ্কুচিত হবে না—এই শিক্ষা শিশুকাল হতে হওয়াই উচিত। জীবন-পথে বিপদ্ পরীক্ষায় নিজের প্রবৃত্তিকে জয় করে সত্যের আদেশে চলতে পারলে, উপযুক্ত সময়ে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়, ইহা প্রতি জীবনে প্রমাণিত। ধর্ম্ম জিনিষটী এমন সহজ, সুন্দর, অনেক সময় নানা রকম রং ফলাতে গিয়ে আমরা তাকে জটিল করে তুলি। আমাদের নববিধান পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মকেই সত্য বলে স্বীকার করেন এবং ইহার চেয়ে সহজ ও সুন্দর ধর্ম্ম আর কি হতে পারে। আজ আমাদের পুণ্য ভারত-ভূমিতে "সত্যাগ্রহ সংগ্রাম" অবতীর্ণ। যুগে যুগে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা বলে গেলেন, "স্বর্গরাজ্য আসিবে ধরাতলে"; কিন্তু এল কৈ? আজ সত্যাগ্রহ সংগ্রাম ঐ আদর্শকে সত্য করে দেখাবার জন্য এসেছেন। যদি ইনি জয়যুক্ত হন, তবেই ঐ সকল ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের বাণী পূর্ণ হবে। পৃথিবী যুদ্ধ করে করে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর রক্তপাত সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছে না। এই সময় এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম, অহিংস-সংগ্রাম, প্রেম-সংগ্রাম অবতীর্ণ হয়ে মানুষকে অভয় দান কচ্ছেন। যখন মহাত্মা গান্ধি এই সংগ্রামের কথা বলেন, অনেকেই উপহাস করেছিলেন; কিন্তু যাই তিনি সত্যাগ্রহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, আসমুদ্র হিমাচল কম্পিত হয়ে উঠলো। এক আশ্চর্য্য উৎসাহের তরঙ্গ-হিল্লোল সমস্ত দেশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। সারা পৃথিবী বিস্মিত অথচ আশাপূর্ণনয়নে এই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর আমরা নববিধানবাদীরা এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হয়ে কেবল নিরপেক্ষ থাকব? আমরা এই যুগ-প্রবর্ত্তক ধর্ম্ম-যুদ্ধের নায়ককে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ থাকব কেন? একথা কি কাহারও প্রাণে আঘাত করে নাই? আমার তাহা মনে হয় না। যে স্পর্শে মানুষ অস্থির হয়ে একমাত্র আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করে, তাহার মোহিনীশক্তি কি আমাদের স্পর্শ করে নাই? যে স্পর্শে আমার বাবা প্রভৃতি প্রেরিতগণ, শ্রীমদাচার্য্যদেব, শ্রীমন্মহর্ষিদেব ও রাজা রামমোহন সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন

করতে পেরেছিলেন, তেমনি করে যদি প্রতিজন সন্তানকে বরণ ও গ্রহণ করতে পারেন, তবে নিশ্চয় এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য অর্থাৎ অভিনব স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আজ আশাপূর্ণ অন্তরে বলি, জয় সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের জয়"।

২৪।১০।১৩৩৭ সাল। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

"পূজা।"

দেবি!

মন্দির দ্বারে এসেছে এ দীন
পূজিতে চরণ-কমল তোমার;
সকল হৃদয় পাপেতে মলিন
বক্ষে তুলি সে খুলি-দ্বার!

বাজিছে বাদ্য মানস-মন্দিরে
অযুত শঙ্খ উঠিছে ধ্বনিয়া;
ভকত অর্ঘ্য দিতেছে তোমারে
পুলকে চিত্ত উঠিছে ভরিয়া!

সকল হৃদয় উজাড় করিয়া
গাহিছে ভক্ত তোমারি গান—
রিক্তজনের অর্ঘ্য লইয়া
কর মা আশীষ তাহারে দান!

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দত্ত।

সংবাদ।

শুভবিবাহাশীর্ব্বাদ—গত ৮ই মে, কলিকাতায় বাহির মির্জ্জাপুর রোডে, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্তের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুমিত্রার সহিত, ভদ্রক-প্রবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসুর দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অজিতকুমারের শুভবিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

গত ১৬ই মে, কলিকাতায়, বৈঠকখানা রোডে, স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ দেবের পৌত্রী, স্বর্গীয় সরোজকুমার দেবের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সান্ত্বনার সহিত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের শুভবিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন।

ভগবান্ তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন।

শুভবিবাহ—কলিকাতায়, ১৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে, কেশব একাডেমী ভবনে, গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত, স্বর্গগত শান্ত সাধক ঋষি কেদারনাথ দের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের মধ্যমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ললিতার এবং ১২ই জ্যৈষ্ঠ, হেমেন্দ্রবাবুর মধ্যম পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ দত্তের সহিত মনোনীত বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কল্যাণীর শুভবিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন ভাই অক্ষয়কুমার লধ, দ্বিতীয় দিন শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। ভগবান্ নবদম্পতিদিগকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

বৈশাখী ব্রত উদযাপন—গত ১০ই মে, রবিবার প্রাতে, বৈশাখী ব্রত উদযাপনার্থ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই চন্দ্রমোহন ও মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে মহারাণী দেবী উপস্থিত সাধক সাধিকাদিগকে ও পল্লীস্থ অনেককে ফল, পাখা ও জলের কুঁজা বিতরণ করেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ—পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের বিগত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—

"সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্নীর শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি ধর্ম্ম-সাধনায়, পাতিব্রত্যে, দানশীলতায় এবং নিঃস্বার্থ সেবায় ব্রাহ্মসমাজের সকল নরনারীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মশীলা বর্ষীয়সী মহিলার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার মুক্ত আত্মার কল্যাণ করুন।"

নব ভিক্ষুণী—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের সহোদরা সভ্য ভগ্নী শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ নববিধান-প্রচারার্থ ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা অতীব আনন্দের সহিত সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। নববিধান-জননী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং নব ভিক্ষুণীদল গঠন করিয়া নববিধানকে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত করুন।

ভস্মরক্ষা—বিশেষ প্রার্থনা করিয়া, গত ৭ই মে, সন্ধ্যায়, সাধ্বী সৌদামিনী দেবীর ভস্ম বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমের দেবালয়ে রক্ষা করা হয়।

জাতকর্ম্ম—গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ৭৫।১নং হ্যারিসন রোডস্থিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার প্রদৌহিত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

দত্তের নবজাত শিশুকন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ১১ই এপ্রিল, ২৮শে চৈত্র, কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষ শিশুর পিতা প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পারলৌকিক—গত ১০ই মে, ৪নং ময়রাষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় ডাঃ আর, এল, দত্তের ভবনে, শ্রীমতী সরস্বতী সেনের উদ্যোগে, স্বর্গীয়া দেবী সৌদামিনী মজুমদারের স্বর্গগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, শ্রীমতী সরস্বতী সেন বহুদিনের যোগ ও অনেক প্রাচীন কাহিনীর উল্লেখ করিয়া মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা করেন।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত শোক-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

গত ২রা বৈশাখ, ময়মনসিংহে স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশচন্দ্র চন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী স্নেহলতা শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। গত ১৩ই বৈশাখ, তাহার আত্মার কল্যাণার্থ ব্রাহ্মপল্লীস্থ "বাসন্তী কুটীরে" বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

গত ৬ই মে, হাওড়ায়, ৪৩৩নং গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে, স্বর্গগত ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রদৌহিত্র, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-প্রসাদ বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অমিয়প্রসাদ অমরধামে চলিয়া গিয়াছে। গত ১৬ই মে, তাহার আত্মার কল্যাণার্থ ঐ গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতায়, ৭নং বিপ্রদাস ষ্ট্রীটে, ময়ূরভঞ্জের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র, শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই বৎসরের শিশু পুত্র হঠাৎ জ্বর কাশীতে মা বাবার ক্রোড় শূন্য করিয়া অনন্ত পিতামাতার বক্ষে প্রস্থান করিয়াছে।

পরমজননী তাঁহার প্রিয় সন্তানদের আত্মাকে নিত্য স্নেহ-ক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বর্ষণ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৮শে চৈত্র, অমরাগড়ীতে, স্বর্গীয় যশোদাকুমার রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর সমাধি-মন্দিরে দুই বেলাই উপাসনা ও প্রার্থনাদি হয়। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। প্রাতঃকালীন উপাসনায় তাঁর শান্ত জীবনের বিষয় কিছু বলা হইয়াছিল। তিনি রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় এ দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নীতি এবং ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভক্ত ফকির দাসের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

গত ২৭শে এপ্রিল, কলিকাতায়, ১৩নং হরলাল দাস ষ্ট্রীটে, চট্টগ্রামের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ নবীনচন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে, জ্যেষ্ঠপুত্র ডঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত পরিবারের সকলকে লইয়া উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হয়।

গত ১৭ই মে, স্বর্গগত ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে, ১৩নং হরলাল দাস ষ্ট্রীটে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের গৃহে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমলতা দত্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৮ই মে, ৬৫।১ হ্যারিশন রোডস্থিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস উপাসনা করেন।

গত ২৭শে মে, শান্তিকুটীরে, স্বর্গগত প্রেরিত-প্রবর ভক্তি-ভাজন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাম্বৎসরিক দিনে প্রাতে অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ সুন্দর উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীমতী হেমলতা চন্দ বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনার বিস্তৃত বিবরণ আগামীবারে দেবার ইচ্ছা রহিল। সন্ধ্যায় জমাট কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে শিলচরে তত্রত্য সিভিল সার্জ্জন লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেনের গৃহেও উপাসনা হয়, ভাই বিহারীলাল সেন উপাসনা করেন।

গত ২৯শে মে, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, ব্রহ্মানন্দের অনুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সুন্দর জীবনের সংক্ষিপ্ত কথা ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠ করেন।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দাতা-দিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

ডিসেম্বর, ১৯৩০—শ্রীযুক্ত মতিরামসখীরাম আদভানি মাসিকদান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের স্মৃতিতে মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান পাঁচমাসের ৫৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ দত্ত ভ্রাতৃশ্রাদ্ধে ১০৲, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু মাতৃ-সাম্বৎসরিকে ৪৲, শ্রীমতী স্নেহলতা দাস মাতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, রায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী চারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিকদান চারিমাসের ৮৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতিদেবী C.I. মাসিকদান ১৫৲, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত পিতৃসাম্বৎসরিকে ৫৲, শ্রীমতী প্রভাতবালা সেন পিতৃসাম্বৎসরিকে ৪৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীমতী শশাঙ্কপ্রভা দত্ত কন্যার শুভবিবাহে ৪৲ এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে কন্যার শুভবিবাহাশীর্ব্বাদে ৪৲ টাকা।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে", বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২১শে জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ১২শ সংখ্যা। ১লা আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 16th June, 1931. অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী পরম দেবতা! তুমি তো সর্ব্বস্থান, সকল বসুধা পূর্ণ করিয়া আছ বলিয়া লোকে তোমাকে বাসুদেব বলে; কিন্তু তোমারই আবার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ বিশেষ চিহ্নিত স্থানে তোমার অনুগত বিশ্বাসী পুত্রকন্যাগণ যেন তোমাকে বিশেষ ভাবে স্বীকার করে, দর্শন করে, এবং বিশেষ স্থানে তোমার বিশিষ্ট প্রকাশের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ধন্য হয়। প্রাচীন ভারতের সাধক-সাধিকাগণ কত ভাবে কত স্থানেই তোমাকে দর্শন করিলেন, কত ভাবেই তোমাকে প্রকাশিত দেখিলেন, কত নামেই তোমাকে গ্রহণ করিলেন। তুমি তোমার সাধু আত্মা-দিগের তৃপ্তি-বিধানের জন্য, এবং মনে হয়, তোমারও নিজের সাধ মিটাইবার জন্য, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছ; কিন্তু তোমার সাধকের হৃদয় যেন তোমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রিয় স্থান। তাই ভক্ত কবি গাহিলেন, "হৃদি বৃন্দাবনে, হরি হে, তুমি কত লীলা দেখাইলে!" মানব হৃদয় চিরদিনই তোমার আদরের স্থান, তুমি মানব হৃদয়কে কখনও পরিত্যাগ করনা। হায়! যখন বিপথগামী ভ্রান্ত মানুষ না বুঝিয়া, না জানিয়া, আপনার হৃদয়ে তোমা ভিন্ন অন্য কিছুকে স্থান দেয়, তখনও তুমি সে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আপনাকে লুক্কায়িত রাখ। যেন তোমার এমন শ্রীসৌন্দর্য্য-পূর্ণ মুখখানা ঢাকিয়া রাখিয়া, আপনি কত অপমান সহ্য করিয়াও সে হৃদয়ে বাস কর; এই যে তোমার অযাচিত কৃপা। কীটাণুকীট ক্ষুদ্র মলিন মানবের অন্তরেও স্বর্গের শ্রীসৌন্দর্য্য লইয়া হৃদয়-বিগ্রহরূপে বিরাজমান থাকতে ভালবাস। তাই প্রতিনিয়ত বলিতেছ, "সন্তান, তোমার হৃদয় আমার বড় প্রিয় স্থান। সে হৃদয়কে ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিত, অনুরাগ-পুষ্পে সজ্জিত করিয়া আমার পূজার মন্দিররূপে নিয়ত রক্ষা কর। পুষ্প ও ধূপ-ধুনার গন্ধে তাহার সব দিক পূর্ণ হইয়া থাকুক।" হে হৃদয়-বিহারী পরম দেবতা! যখন অন্তরে বাহিরে এই ভয় ভীতির সময়ে, আপনি কৃপা করিয়া আমাদের প্রতি তোমার জীবন্ত বাণীতে এই স্বর্গের অনুজ্ঞা ঘোষণা করিলে, তখন তুমি এই অনুজ্ঞা-পালনে আমাদের সহায় হও। দুর্ম্মতি বশতঃ যেন এ অনুজ্ঞা-পালনে আমরা অলস না হই, শিথিল না হই, তব পাদপদ্মে এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

ধর্ম্মক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। (২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বর্ত্তমান যুগে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্ম্মনীতি ও ঈশ্বর-ভীতির অভাব প্রদর্শন করিয়াছি এবং জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাসেরও প্রচুর অভাবের উল্লেখ করিয়াছি। সে প্রবন্ধে অভাবাত্মক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভাবাত্মক বিষয়ের কথা বলিব।

নবযুগে নববিধানে ধর্ম্মের মৌলিক নব আদর্শ উপস্থিত হইয়াছে। সে আদর্শ—এক ঈশ্বর বিশ্বের পিতা-মাতা এবং তাঁহা হইতে জাত বিশ্বের সকল নর-নারী জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে এক অখণ্ড পরিবার। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল ধর্ম্ম-বিধানের আদর্শ হইতে পূর্ণতর ও প্রশস্ততর আদর্শ। এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান জানিত ও অজানিত যে কোন জাতি, যে কোন সম্প্রদায়, সমস্তই এক অখণ্ড প্রেম-পরিবারে নিবদ্ধ, এ আদর্শ প্রাচীন হিন্দু বিধানেও নাই, খৃষ্ট বিধানেও নাই, অন্য কোন বিধানেও নাই। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগধর্ম্ম-বিধানের আদর্শের উচ্চতর, প্রশস্ততর ও পূর্ণতর পরিণতি।

বাহিরে পার্থিব জগতে দেখিতেছি, সকলেই তো নানা স্বার্থ-গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে পরিণত হইয়াছে; এই সব ক্ষুদ্র পরিবার ভাঙ্গিয়া এক অখণ্ড পরিবারে পরিণত হইবে, তাহা কি সম্ভব? তাহা যে সম্ভব, তাহার পরিচয় পাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। যখন ব্রহ্মমন্দিরে, অথবা বিরাট বিশ্বমন্দিরের সুপ্রশস্ত আকাশ-চন্দ্রাতপতলে জাতিবর্ণ-ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের নর-নারী এক ঈশ্বরের পূজা বন্দনায় একপ্রাণ হইয়া, একহৃদয় হইয়া শুভমিলনে মিলিত হন, তখন সব খণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, সকলে এক অখণ্ড বিশ্ব-পরিবারে পরিণত হন। যখন বিশ্বমানবের কল্যাণ-কামনায় এক উদ্দেশ্য প্রাণে লইয়া, একপ্রাণ একহৃদয় হইয়া, কোন সাধারণ কার্য্য-ক্ষেত্রে জাতিবর্ণ-ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিত হন এবং মিলিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল-সংকল্পে ছোট বড় যে কোন কার্য্য করেন, তখন আমরা এক অখণ্ড বিশ্বপরিবারের দৃশ্য দর্শন করি যখন আমরা কোন সাধারণ শিক্ষা-মন্দিরে বা বিদ্যা-মন্দিরে, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে, বিভিন্ন ক্ষুদ্র পরিবারের আশার আলোক পুত্রকন্যাগণের দিব্য সমাবেশ দর্শন করি, তখন কি সেই বিশ্ব-মানবের অখণ্ড পরিবারের জীবন্ত মূর্ত্তি আমাদের মানস-চক্ষে প্রতিভাত হয় না? এ সকল ক্ষেত্রে সেই বিশ্বমানব-পরিবারের অখণ্ড মূর্ত্তির পূর্ব্বাভাস পাই মাত্র। এই বিশ্ব-মানব-পরিবারের অমর মূর্ত্তির প্রকৃত দর্শন এবং জীবন্ত দর্শন পাই অন্তরে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের জমাট মিলন, স্বর্গের শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ সেই অখণ্ড পরিবারের চিত্র-দর্শন, কেবল বিনয় ও ভক্তিমাখা বিশ্বাস-দৃষ্টিতে এবং একমাত্র ব্রহ্মকৃপাগুণে তাঁহারই শিক্ষা দীক্ষায় তাঁহারই দিব্যালোকে মানবের অন্তরেই সম্ভবে।

প্রকৃত ঈশ্বর-দর্শন যেমন অন্তরে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে, অখণ্ড প্রেম-পরিবার-দর্শনও অন্তরে আধ্যাত্মিক রাজ্যে। ভিতরের দর্শন যত সত্য হয়, জমাট হয়, বাহিরে ব্রহ্ম-মন্দির-বক্ষে, কিম্বা মিলিত অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের অখণ্ড প্রেম-পরিবারের প্রারম্ভিক দর্শন তত সম্ভব হয়, সত্য হয়। বাহিরের এক সূর্য্য হইতে অগণ্য অসংখ্য ধারায় সূর্য্যরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে খেলা করিতেছে, তেমনই এক ঈশ্বরের প্রকৃত দর্শন ও ধারণা হইতে, জগতের ছোট বড়, স্বদেশের, বিদেশের সকল নরনারী যে তাঁহার সন্তান, সব সৃষ্টি যে তাঁহা হইতে, এ ধারণা খুব সহজে স্বাভাবিক ভাবে উপস্থিত হয়। এই ধারণা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, পৃথিবীর সকল নরনারী তাঁহারই নিজ হস্তের রচনা, তাঁহা হইতেই সমাগত, তাঁহারই পুত্র কন্যা; কিন্তু মানব-পরিবার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন, সাধারণ ধারণা যথেষ্ট নহে। একস্থলে অনেকগুলি মানুষ মিলিত হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাদের বাহিরের আকার অবয়ব দেখিয়া আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করি, ইহারা মানুষ, সকলেই মানুষ, পশু নহে, পাখী নহে বা কোন উদ্ভিদ শ্রেণীও নহে। বাহিরের অবয়ব দেখিয়া তাহারা যে মনুষ্যশ্রেণী, এ ধারণা হইল। কিন্তু তাহারা কে কি প্রকৃতির, কোন্ গুণ-বিশিষ্ট লোক, তাহা জানিতে হইলে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। ইহাকেই বলে বিজ্ঞান-দৃষ্টি। বিশিষ্টতা-দর্শন, বিশিষ্টতার ধারণা না হইলে প্রকৃত চিনা, জানা, দেখা শুনা, কিছুই হইবে না। তেমনই

ঈশ্বর হইতে জাত, ঈশ্বর-সন্তান বলিয়া, পৃথিবীর নরনারী এক অখণ্ড পরিবার সাধারণ ভাবে জানা হইল, স্বীকার করা হইল; কিন্তু তাহাদের বিশিষ্টতা, বিশেষত্ব জানিতে হইলে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান-লাভের প্রয়োজন। যেমন মানুষ ঈশ্বরের বিধানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বাহ্যতঃ বিভক্ত হইয়া আছে, তেমনই ধর্ম্ম-বিধান অবলম্বন করিয়া বিশিষ্ট ধর্ম্ম-পরিবার হইয়া, ধর্ম্ম-মণ্ডলী বা সমাজে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে জানিতে হইলে, স্বীকার করিতে হইলে, গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাদের ধর্ম্মমণ্ডলীগত বিশিষ্টতা, সামাজিক বিশিষ্টতাকে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়, অন্যথা তাহাদিগকে চিনা হয় না, জানা হয় না, গ্রহণ করা হয় না। এরূপ গ্রহণের মূলে কত নূতন ও বিচিত্র সাধনার প্রয়োজন, এবং সে সাধনার প্রকৃতি কি, তাহা আমরা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত কয়েকটী কথার উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র যখন বিলাতে ছিলেন, তখন লণ্ডন নগরে থিয়িষ্টিক্ এসোসিয়েসন বলিয়া একটী সমাজ গঠনের উদ্যোগ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জার্ম্মানি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থানে চিঠি পত্র ও আলোচনা দ্বারা ধর্ম্ম-বিষয়ে পরস্পরের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ এই সমাজসংস্থাপনের লক্ষ্য ছিল। কেশবচন্দ্র সেই সমাজ-গঠনের বিষয়ে যে সকল মূল্যবান্ কথা বলেন, তাহার মধ্যে বিশেষ এই কয়েকটী কথা ছিল। আমরা তাঁহার ইংরেজি বক্তৃতার এই বিশেষ অংশের অনুবাদটাই নিম্নে দিলাম।

"ধর্ম্মক্ষেত্রে সাধারণতঃ একটা ভুল করা হয়, আশা করি, সে ভুল এই সমাজ করিবেন না। সে ভুলটী এই, বর্ত্তমানে যে সকল খণ্ড খণ্ড ধর্ম্মসমাজ বা ধর্ম্মমণ্ডলী রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক মণ্ডলী অন্য মণ্ডলীর প্রতি নিজের প্রাধান্যতার ভাব এবং বিরুদ্ধ ভাব প্রদর্শন করা এবং সেই দৃষ্টিতে এক মণ্ডলী অন্য মণ্ডলীকে দেখা। এই ভাবেই সাধারণতঃ এক ধর্ম্মমণ্ডলী অন্য ধর্ম্মমণ্ডলীকে দেখিয়া আসিতেছেন ও তৎপ্রতি সেইভাবে ব্যবহার করিতেছেন; কিন্তু আমরা খুব বিনয়ের পথ অবলম্বন করিব। যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বে ধর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্ম-চিন্তা মূল্যবান্ সম্পত্তি রূপে উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদপ্রান্তে আমরা দণ্ডায়মান হইব। এরূপ ব্যক্তিগণ আমাদিগের নিকট সর্ব্বদা সম্মান পাইবেন। তাঁহারা হিন্দু হউন, খৃষ্টিয়ান্ হউন, চায়নিজ হউন, বৌদ্ধ হউন, গ্রিস্‌বাসী হউন্ অথবা রোমান্ হউন্, সকল জাতীয়, সকল শ্রেণীর এবং সকল সময়ের যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবে মানব-মণ্ডলীর উন্নতি-কল্পে, কি ধর্ম্ম-বিষয়ে, কি নীতি বিষয়ে, কি সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে কৃতকার্য্যতার সহিত আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী সময়ের সকলের নিকট চির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিয়াছেন।"—(Lectures in England V. II. P. 106)

কেশবচন্দ্রের এই কয়েকটী কথার মধ্যে, পরস্পরকে গ্রহণ করিতে কি নূতন পন্থা, কি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম রহিয়াছে। ইহা হইতে ধর্ম্ম-সাধনার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা হইতে সমন্বয়-সাধনার পথ খুলিয়া গিয়াছে এবং ইহা হইতেই বর্ত্তমানে বিশ্বের সকল নরনারীকে কোন্ বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিয়া সকলকে এক অখণ্ড পরিবার রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, সে পথও খুলিয়া গিয়াছে। কোথায় ছিল গুরু হইয়া নিজ মণ্ডলীর ধর্ম্মের গুরুত্ব গৌরব প্রদর্শন করিয়া, অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে শিষ্য রূপে আকর্ষণ ও গ্রহণ করা, আর কোথায় শিষ্য হইয়া অন্যের পদপ্রান্তে বসিয়া, অন্যের নিকট শিখিয়া, অন্যের বিশিষ্টতা স্বীকার করিয়া, সকলকে আপনার পরম আত্মীয় রূপে এক অখণ্ড পরিবারের লোক বলিয়া গ্রহণ করা! ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাই চিরশিষ্য ছিলেন। এই নবসাধন-সূত্র ধরিয়াই আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আদর্শ কত নূতন, কত প্রশস্ত, কত উচ্চ এবং কত পরিপূর্ণতার দিকে গতিশীল। কিন্তু কেশব-জীবনের শিষ্যভাব, কেশব-জীবনের বিনয় ও নম্রতা, কেশব-জীবনের গ্রহণাগ্রহ আমাদের মধ্যে কোথায়? কেশব-জীবনের ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বর-ভক্তি আমাদের মধ্যে কোথায়? কেশব-জীবনের সেই সাধন-তীব্রতা আমাদের মধ্যে কোথায়? তাই আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন আদর্শ হইতে বহুদূরে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দৃশ্য ও অদৃশ্য।

দৃশ্যতঃ দেখি, মানুষ ও বাঘ কত ভিন্ন; কিন্তু উভয়েরই ভিতর সেই একই প্রাণ-শক্তি প্রাণরূপে বর্ত্তমান। সরল শিশু ধ্রুব বাঘের ভিতর পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে বর্ত্তমান ভাবিয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে গিয়াছিল; বাঘও স্তম্ভিত হইয়া তাহার হিংসা-বৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছিল। যদি অদৃশ্য ভগবানে সরল বিশ্বাস থাকে, দৃশ্যমান যাহা কিছু তাহারই ভিতর সেই অদৃশ্যকে দেখিয়া ধন্য হই।

ইহ পরে অভেদ।

সাগরের উপকূলে দেখি, তরঙ্গ কি তর্জ্জন গর্জ্জনই না করিতেছে; কিন্তু যত দূর দূরান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, আর সে তরঙ্গ নাই, তর্জ্জন গর্জ্জন নাই, শান্ত স্থির গম্ভীর। আরও দূরান্তে আকাশ ও সাগর একাকার হইয়াছে, রেখা মাত্র ব্যবধান। বাস্তবিক যত কিছু ঘাত প্রতিঘাত এই সংসারে; কিন্তু সংসারের অতীত অবস্থায় মন ধাবিত হইলে দেখি, এই জীবন-জলধি শান্তিতে পূর্ণ, ইহলোক পরলোক এক হইয়াছে, ভেদাভেদ কিছুই নাই।

পুণ্য-শ্লোক ডেবিড হেয়ার।

"The world is my country,
to do good is my Religion."

জগতের দুঃখ, কষ্ট যাঁদের প্রাণকে বিচলিত করে, জীবের দুর্গতি দূর করতে না পারলে যাঁদের প্রাণে শান্তি থাকে না, জীবের উদ্ধারের জন্যে যাঁরা মুক্তহীন প্রাণ নিয়ে সংসারে আসেন, দুঃখীর কান্না যাঁদের প্রাণকে কাঁদায়, সেই সব প্রাতঃস্মরণীয়, মহানুভব, মহাপুরুষদের জীবনের কথা জানতে কার্ না ইচ্ছে হয়? ঈশ্বর মানুষের মনে সাধুদিগকে জানবার জন্যে এক স্বাভাবিক ক্ষুধা দিয়েছেন, তাই আমরা উপরি উক্ত মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে ইচ্ছে করেছি।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে মহামতি ডেবিড হেয়ারের জন্ম হয়। পঁচিশ বছর বয়সে ঘড়ির ব্যবসায় করতে তিনি কলিকাতায় আসেন। বিলেতে তাঁর মা ও তিন ভায়ের অবস্থা খুব ভাল ছিল। তাঁরি এক ভ্রাতুষ্পুত্রী মিস্ হেয়ার বিলেতে মহাত্মা রামমোহন রায়ের অন্তিম কালে সেবা শুশ্রূষা করেন। এদেশে এসে হেয়ার সাহেব দেখলেন যে, বাঙ্গালীদের মধ্য লেখা পড়ার চর্চ্চা নেই। স্থানে স্থানে পাঠশালা আছে বটে, কিন্তু তাতে পত্রলেখা, জমাওয়াশীলবাকী, গুরুদক্ষিণা, গঙ্গার বন্দনা, দাতাকর্ণ ছাড়া কিছুই শেখান হয় না। ছেলেরা কেবল বাইনাচ, যাত্রা, পাঁচালি, কবি, হাফ্-আকড়াই, বুলবুলের লড়াই এই সব দেখে বেড়ায়। শিক্ষা ত কিছুই হতো না, তার উপর নৈতিক অবনতি যতদূর হবার তা হয়েছিল। দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হয়েছিল। এ দেশের এই অবস্থা দেখে, কিসে এই দুর্গতি দূর হবে, তাই ভাবতে লাগলেন। প্রাণে বড়ই ব্যথা পেলেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ স্যার হাইড ইষ্ট এদেশের একজন পরম হিতকারী বন্ধু ছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা বল্লেন এবং একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরেজী স্কুল করবার প্রস্তাব করলেন। তিনি তাঁর কোর্টের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে প্রধান প্রধান হিন্দুদের মত জানতে বল্লেন। হেয়ার সাহেবও তাঁদের কাছে গেলেন এবং স্কুল স্থাপন করা ঠিক হলো। কথামত ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি, গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজ প্রথম স্থাপিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রতিদিন সেই স্কুলের তদারক করতেন। পটলডাঙ্গায় বর্ত্তমান গোলদিঘির চারপাশে তিনি অনেক জমি খরিদ করেন। তার বর্ত্তমান চতুঃসীমা, উত্তরে হ্যারিশন রোড, পূবে রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট ও পটুয়াটোলা লেন, দক্ষিণে আরপুলি লেন, এবং পশ্চিমে ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট ও প্যারীচরণ সরকার ষ্ট্রীট। ঐ জমি তিনি শিক্ষাকল্পে দান করে যান। যাহার উপর এক্ষণে Presidency College, Hare School, Hindu School, Sanskrit College রয়েছে। প্রথমে আরপুলিতে একটী বাঙ্গালা স্কুল করেন। তারপর কলিকাতাকে চার ভাগে ভাগ করে, এক এক ভাগে এক একটী বাঙ্গালা ও ইংরেজী স্কুল করেন। বিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর স্কুলের পড়ো ছিলেন। বালিকাদের জন্যেও, হিন্দু ফিমেল সোসাইটীর অধীনে, শ্যামবাজার, জানবাজার, ইটালীতে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রতি বছর স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে তাদের পরীক্ষা হ'ত এবং পুরস্কার দেওয়া হ'ত। স্কুল ত হলো, কিন্তু পড়বার বই যে নেই। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে Calcutta School Book Society (এক্ষণে নাম বদলে গেছে) নামে একটী সভা স্থাপন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক তৈয়ারী করে অল্প বা বিনামূল্যে বিতরণ করা। এই সভার দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হয়েছে।

হেয়ার সাহেব যখন দেখলেন যে, ছেলেরা বাঙ্গালা ও ইংরেজি বেশ শিখছে, তখন তাঁর একটী মেডিকেল কলেজ করবার ইচ্ছে হ'ল। লর্ড অকল্যাণ্ড তখন গভর্ণর জেনারেল। হেয়ার সাহেব প্রায়ই তাঁর কাছে যেতেন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি খুব সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু হিন্দুর ছেলে মড়া-কাটতে রাজি হবে কি? এই কঠিন সমস্যা

উপস্থিত হলো। একদিন হেয়ার সাহেব বসে আছেন, মধুসূদন গুপ্ত নামে একটী যুবক তাঁর কাছে এল। তাকে জিজ্ঞেস করায় সে মড়া-কাটতে রাজি হল। হেয়ার সাহেব খুব খুসী হয়ে তার পরদিন লর্ড আকলেণ্ডকে জানালেন এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হল। শুনেছি, প্রথম যেদিন মড়া-কাটা হয়, কেল্লা (Fort william) থেকে তোপ পড়েছিল। হেয়ার সাহেব অন্যান্য স্কুল যেমন তদারক করতেন, মেডিকেল কলেজ হওয়া অবধি প্রতিদিন সেখানে গিয়েও তদারক করতেন, এবং হাঁসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করতেন। যে রকমেই হউক, এদেশের কল্যাণ-সাধনে রত থাকতেন। দিবানিশি এদেশের কিসে ভাল হবে ভাবতেন। শেষে, এ বিষয়ে, রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর, স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব, দেওয়ান রামকমল সেন প্রভৃতি সেকালের বড় লোকদের সাহায্য পেয়েছিলেম।

তিনি খুব ভোরে বিছানা থেকে উঠতেন। উঠে ব্যায়াম করতেন। তাঁর দেহে অসীম বল ছিল। একবার চা খেতে খেতে একজন ছাত্রকে বল্লেন, "তুমি আমার সঙ্গে হেঁটে চাণক যেতে পার?" সে বলিল, "হাঁ, পারি।" "এস দেখা যাক" বলে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। চাণক কলিকাতা থেকে ৭ক্রোশ। খানিক পরে দুজনেই ফিরে এলেন। যুবক শ্রান্ত ও অবসন্ন, আস্তে আস্তে আসছে; কিন্তু হেয়ার সাহেব দৌড়ে বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। আর একবার, একজন পানাসাক্ত গোরা হিন্দু কলেজের একজন ছাত্রের গাড়ী ভেঙ্গে দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করে। কলেজের ভোজপুরী দরোয়ান, চাপরাসী, কেউ তাকে ধরতে পারে না; ইতিমধ্যে হেয়ার সাহেব তীরের মত গিয়ে তাকে ধরে পুলিশের জীম্মা করে দেন।

তারপর নিজের আবশ্যকীয় কাজ সেরে, বেলা ৯টার সময় খেয়ে পাল্‌কি করে বেরুতেন। এদানীং ঘড়ির কাজ এক রকম ছেড়ে দিয়েছিলেন। ৩।৪খানি টোষ্ট, দুটি ডিম সিদ্ধ ও এক পিয়ালা চা তাঁর সকালবেলাকার আহার ছিল। রুটিতে মাখন দিয়ে খেতেন না। মদ, মাছ, মাংসে তাঁর রুচি ছিল না। তিনি এ দেশের ঋষিদের মত মিতাহারী ছিলেন। সন্দেশ, মিঠাই, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল, মাগুর মাছ ভালবাসতেন। রাত্রেও সামান্য আহার করতেন। প্রতিদিন ১০টার মধ্যে তাঁর পাল্‌কি স্কুলের দরজায় দেখা দিত। তাতে কি থাকতো? রোগীর জন্যে ওষুধ, পুস্তক-হীনের জন্যে পুস্তক, বস্ত্র-হীনের জন্যে বস্ত্র। তিনি ছেলেদের কাছে আশা ও আনন্দের মূর্ত্তি ছিলেন। তারপর ক্লাসে গিয়ে, রেজেষ্টারি দেখে, অনুপস্থিত বালকদের তালিকা প্রস্তুত করতেন; অনুপস্থিতির কারণ লোক দিয়ে কিম্বা নিজে সন্ধান করতেন। কে কি রকম পড়ছে, বাড়ীতে কেমন ব্যবহার করে, খোঁজ নিতেন। বালকদের দোষ, ত্রুটী, দুর্ব্বলতা, কুপ্রবৃত্তির ওষুধ দিতেন। তাদের দেহের অসুখ হলে আপনি তাদের বাড়ী গিয়ে ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। যে সব ছাত্র অন্নবস্ত্রের অভাবে স্কুলে আসতে পারতো না, তাদিগকে অর্থ-সাহায্য করতেন। এমন কি, তাদের বাপ মায়েরও ভরণ পোষণ চালাতেন। দুর্গোৎসবের সময় প্রতি বছর দুঃখী গরীব ছেলেদের মা বোন্‌কে কাপড় দিতেন। একদিন এক বিধবা ছেলেকে ভর্ত্তি করবার জন্যে তাঁর কাছে আসে। তিনি ক্লাসে যায়গা নেই বলে ফিরিয়ে দেন, বিধবা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। দয়ার সাগর হেয়ার সাহেবের প্রাণ গলে গেল। তিনি ঐ দুঃখিনীর কুটীরে গিয়ে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বল্লেন, "কেঁদনা, আজ্‌ হতে তোমার ছেলের ভার আমি নিলুম।" সারাদিন স্কুলের কাজ করে, বিকেলে ছেলেদের হাতের লেখা সংশোধন করে দিতেন; গরীব ছাত্রদের জীবিকারও উপায় করে দিতেন। এ ছাড়া রোজ একটা না একটা দেশ-হিতকর কাজে লিপ্ত থাকতেন। পূর্ব্বে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না। গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অধীন ছিল। ঐ অধীনতা দূর করবার জন্যে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি, হেয়ার সাহেবের চেষ্টা ও যত্নে, কলিকাতা টাউন হলে এক প্রকাশ্য সভা হয় এবং পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত করা হয়। ঐ বছর মারীচ দ্বীপে এদেশ থেকে কুলিচালান প্রথম আরম্ভ হয়। পটলডাঙ্গার এক বাড়ীতে নারাজ (Unwilling) এমন অনেক-গুলি কুলীকে বদ্ধ করে রাখা হয়। হেয়ার সাহেব খবর পেয়ে, পুলিশের সাহায্যে তাদিগকে উদ্ধার করেন। অহরহ এই রকম অনেক মঙ্গলকর কাজে দিন কাটাতেন।

আরপুলিতে যে স্কুল ছিল, তার সব খরচ নিজে দিতেন। ছাত্রদের বই, কাগজ, কলমেরও খরচ তিনি দিতেন। তার উপর তাঁর অজস্র দান ছিল। এই রকমে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। হেয়ার ষ্ট্রীটে, গ্রে সাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এই গ্রে সাহেবকে তাঁর নিজের কারবার দান করেছিলেন। এমন কি যখন তাঁর হাত একেবারে খালি হয়ে গেল, চীন দেশে তাঁর এক ধনী কুটুম্ব ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে টাকা এনে এদেশের শিক্ষার ব্যয় চালাতে লাগলেন—শিক্ষার পথ যেন রুদ্ধ হয়ে না যায়।

হেয়ার সাহেব বাড়ীতে আছেন। সন্ধ্যার সময় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্চে। চন্দ্রশেখর দেব নামে একটি বালক ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে উপস্থিত হ'ল। তিনি আস্তে ব্যস্তে তাকে একখানি কাপড় পরতে দিলেন এবং আপন হাতে তার ধুতি, চাদর নিংড়ে শুকোতে দিলেন। অনেক রাত্রে বৃষ্টি থ'রে গেল। চন্দ্রশেখরকে সন্দেশ আনিয়ে খাওয়ালেন। তারপর এক মোটা লাঠি নিয়ে তাকে পৌঁছাতে চল্লেন। বল্লেন, "চুনো গলিতে মাতাল গোরার বড় দৌরাত্ম্য, এতরাত্রে একা যাওয়া ঠিক নয়।" এই বলে সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন। প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি এসে, মোড়ের মাথায় সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এবারে একা যেতে পারবে?" সে উত্তর

করলো, "পারবো"। সাহেব ফিরলেন। খানিক দূর এসে ভাবলেন—মায়ের প্রাণ কি না—"এতরাত্রে বালকটিকে একা ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নি, যদি সে বাড়ী খুঁজে না পায়।" আবার তার বাড়ীর দিকে চল্লেন। গলির ভেতর তার বাড়ী সাহেবের জানা ছিল। দরজায় গিয়ে ঘা মারতে লাগলেন, "চন্দোর", "চন্দোর" বলে ডাকতে লাগলেন। এতরাত্রে কে ডাকা ডাকি করে? বাড়ীর লোক দরজা খুলে দেখে যে, হেয়ার সাহেব। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "চন্দোর বাড়ী এয়েচে?" "এয়েচে" শুনে তবে স্থির হ'লেন। এই যে মায়ের ভালবাসা, এর কি তুলনা আছে? এ কি বৃথা যায়? ধন্য ডেবিড হেয়ার, তুমি ধন্য! প্রেমে তুমি এ দেশ জয় করেছিলে। "কালের অজেয় প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।"

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, মে মাসের ৩১শে তারিখে, হেয়ার সাহেবের ওলাউঠা হয়। ১লা জুন তাঁর প্রাণ-বিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বদন-মণ্ডল শান্ত ও জ্যোতিঃপূর্ণ, আঁখিদ্বয় স্নিগ্ধ ও নিমীলিত। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হলে, হাজার হাজার লোকে হেয়ার সাহেবের বাড়ী পূর্ণ হয়ে যায়। হা মাতঃ, হা পিতঃ, হা ভ্রাতঃ, হা বন্ধো, হা গুরো ইত্যাদি শব্দে আকাশ, বাতাস ছেয়ে যায়। কত বিধবা অভিভাবকহারা হলুম বলে কপালে করাঘাত করতে থাকে। এদিকে প্রকৃতি অবিরলধারে চোখের জল ফেলতে থাকে। আকাশ ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হয়। ভারী দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। তথাপি পাঁচ হাজার লোক পিতৃহীন, মাতৃহীন, বন্ধুহীন, গুরুহীনের ন্যায় শবাধারের অনুগমন করে। সন্ধ্যার সময় গোলদীঘির দক্ষিণ পাড়ে ঐ মহাত্মার সমাধি হয়। কুলের গরীব ছাত্রেরা এক এক টাকা চাঁদা দিয়ে আজও বর্ত্তমান ঐ সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। আজ ৮৯ বৎসর চলে গেছে, "নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে" তাঁর চরিত্রের আলো! তাঁর সুমধুর চরিত্র-সৌরভে কত হৃদয় আজ মুগ্ধ! হায়! অকালে শুকিয়ে গেল! এদেশের ভাগ্যে সহিল না! যদি অহেতুক শুদ্ধ প্রেমের কিছু মূল্য থাকে, "পরোপকারায় সতাং হি জীবনম্" এই বাক্যের কোন মানে থাকে, যদি পার্থিব সুখ-বিসর্জ্জনের গৌরব থাকে, যদি আত্মত্যাগে পুণ্য থাকে, যদি নিষ্কাম ব্রত-পালনে ধর্ম্ম থাকে, যদি পরহিতার্থে দধীচির মত জীবন-দানে স্বর্গ থাকে, তবে অক্ষয় স্বর্গ তাঁরি প্রাপ্য, মঙ্গল-লোক-দীপ্ত অমর্ত্ত আনন্দলোকেই তাঁর স্থান।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(গিরিধির ডাঃ জি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

১৮।১৯ সংখ্যা—২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভাদ্রোৎসবের আলোচনা।

৩রা ভাদ্র—১৭৯৪ শক।

প্রশ্ন—আমাদের স্বাধীনতা ঈশ্বরের হস্তে দিলে তিনি গ্রহণ করেন কি না?

উত্তর—আমাদের স্বাধীনতা ঈশ্বরের হস্ত দিলে তিনি যে তাহা গ্রহণ করেন, একথা বলিতে পারি না। মনুষ্যের আত্মার প্রকৃতিই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বিলোপ করিলে আত্মার প্রকৃতি বিলোপ করা হয়। স্বাধীনতা আত্মা হইতে পৃথক হইবার নয়। তবে যখন বলা যায়, "হে ঈশ্বর! আমার স্বাধীনতা তোমার চরণে বিক্রয় করিলাম", তাহার ভাব অন্যপ্রকার। অর্থাৎ আমি যেন সম্পূর্ণ অধীনের ন্যায় কার্য্য করি, আমার স্বাধীনতায় ও তোমার অধীনতায় যেন কোন প্রভেদ না থাকে। কেহ স্বাধীন হইয়া, কেহ অধীন হইয়া সাধন করিতেছেন। প্রথমোক্ত বলিতে পারেন, আমি এই অবধি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব, আর করিব না। দ্বিতীয় অবাধ্য হইতে পারেন না, চিরকাল বলেন, "আমাকে তোমার অনুগত কর।" স্বাধীন আত্মার নিকট প্রেম আদান প্রদান করিলে যেরূপ সুখ হয়, অধীনের নিকট সেরূপ নয়। সূর্য্য অবিশ্রান্ত পরের কাজ করে, অথচ একবার হাসে না। পশুরা অন্ধবৎ ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া চলে, কখন ধর্ম্মের সুখ পায় না। আমরা পরের কাজ করি, কিন্তু স্বাধীন ভাবে তাহা করিয়া পুণ্যের ফলভোগ করি। ঈশ্বর আমাদিগকে জড় বা অধীন-প্রকৃতি করিয়া সৃজন করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ও আজ্ঞা এই, "স্বাধীন হইয়া আমার কাছে আইস।" নিজের ছিল, তোমাকে দিলাম, এই ভাবে যাহা দিব, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। জড় জগৎ তাহা দিতে পারে না।

প্রশ্ন—প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রভেদ কি?

উত্তর—সামান্য ভাবে দেখিলে এ তিনই এক মূল হইতে উৎপন্ন। ঈশ্বরের প্রেম মনুষ্য-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা ভাবে প্রধাবিত হয়। একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধের দিকে যায়। সূক্ষ্মরূপে দেখিলে ইহাদের এক একটী বিশেষ কার্য্য উপলব্ধি হয়। প্রীতি সহজ ভাষায় ভালবাসা। আমরা ঈশ্বর ও ভাই ভগিনীকে প্রীতি করি। যাহাদের এমন গুণ আছে যে স্বভাবতঃ ভালবাসা আকর্ষণ করে, বল মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া নয়, তাহাদিগকে আমরা প্রীতি করি। প্রীতি আপনাকে আপনি উৎপন্ন করে, অন্যের

প্রীতিকে উদ্দীপন করে এবং প্রিয় ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। পবিত্রতা শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে। ঈশ্বর পিতা বলিয়া যেমন আমাদিগের প্রিয়, পবিত্র-স্বরূপ বলিয়া সেরূপ শ্রদ্ধেয়। যাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম, পুণ্য আছে, তাঁহাকে স্মরণ করিলে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ভালবাসার সঙ্গে পবিত্রতার যোগ থাকিলে শ্রদ্ধা হয়, নতুবা তাহা সংসারের প্রীতি। শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রেষ্ঠতা উচ্চতর ভাব। পিতাকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রদ্ধা করি। ঈশ্বর সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়। ভক্তি প্রীতি ও শ্রদ্ধার মিলিত ভাব। প্রীতি মিষ্ট, শ্রদ্ধা পবিত্র; ভক্তি যেমন মিষ্ট, তেমনি পবিত্র। ঈশ্বর এক সময়েই পিতা ও পুণ্যের আধার; তিনি এক সময়েই আমাদিগের হৃদয়ে দুই ভাব উদ্দীপন করেন। আমরা তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা একসঙ্গে দান করি। শ্রদ্ধা শুষ্ক হইতে পারে, প্রীতি অপবিত্র হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি চির সরস ও চির পবিত্র। ভক্তিরসে যাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত, প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়া তিনি আপনাকে ঈশ্বরের চরণে গ্রথিত করিয়াছেন।

প্র—প্রেম-সাধনের উপায় কি?

উ—ঈশ্বর প্রেমের সাগর, তাঁর সঙ্গে যোগ হওয়া চাই। যে বস্তু দেখি, তাহার অনুরূপ ভাব মনে হয়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যাহা দেখিয়া ভয় কি ভালবাসা হয়, বারংবার তাহা দেখিলে সেই সেই ভাব দৃঢ় হইতে থাকে। সাধনের অর্থ বস্তু খুঁজিয়া ভাব উদ্দীপন করা। যদি প্রেম সাধন করিতে হয়, (১) ঈশ্বরের প্রেমের দিক নয়নের সম্মুখে রাখিতে হইবে, (২) কার্য্যের সময় ও যতদূর পারা যায় সকলকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। যে বস্তু যে ভাব উদ্দীপন করে, সর্ব্বদা তাহা সম্মুখে রাখিলে বিপরীত ভাব সহজে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাকে দেখিলে রাগ হয়, তাহাকে যদি ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভাবি, তাহার গুণ ও ভাল দিক সম্মুখে রাখি, রাগের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি ভালবাসা আসিয়া পড়ে। ঈশ্বরের প্রেমের আবির্ভাবে মনকে অনুরঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া এবং মনুষ্য সকলকে ভাই ভগিনী বলিয়া দেখিতে অভ্যাস করাই প্রেম-সাধনের উপায়।

প্র—কখন কখন আত্মা নীরস হয় কেন?

উ—জোয়ার ভাঁটায় যেমন জল বাড়ে ও কমে, আত্মার প্রেম-সরোবর সেইরূপ কখন স্ফীত ও কখন সঙ্কুচিত হয়। জল স্ফীত হইবার কারণ চন্দ্রের আকর্ষণ। আত্মার প্রেম-বৃদ্ধির কারণ প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণ। প্রেমময় ঈশ্বর যখন নিকটস্থ হন, তখন আত্মার প্রেম-সরোবরের জল উথলিত হইয়া জগৎকে অভিষিক্ত করে। প্রেম-চন্দ্র দূরে গিয়া পড়িলে আর সেরূপ হয় না, ক্রমে অনেক দূরের জল পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। আর একদিকে উত্তপ্ত সংসারের প্রভাবে প্রেম-জল শীঘ্র শুষ্ক হয়। উপাসনা শুষ্ক হইলে আমরা প্রেম-চন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করি না, সংসারের অনলের কাছে হৃদয়কে লইয়া যাই। এই নীরস ভাবের পরাকাষ্ঠা হয় যখন নিরাশা আসিয়া আত্মাকে অধিকার করে। যখন প্রেম-চন্দ্র উঠিল না, তখন যদি বিশ্বাস করি আর উঠিবে না—আর কখনই উঠিবে না, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ। এই জন্য অনেক ব্রাহ্ম ভক্তিহীন হইয়া নিরাশ হন এবং অবশেষে নাস্তিক হন। যদি হৃদয়কে সরস রাখিতে চাও, অধ্যবসায় সহকারে অবিশ্রান্ত সাধন কর। ভাঁটা কেবল জোয়ার আসিবার প্রতীক্ষা করে জানিয়া আশার সহিত ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর।

প্র—ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি না করিয়া প্রার্থনা করিলে তাহা সফল হয় কি না?

উ—ঈশ্বরের উপাসনা দুই প্রকারে হইতে পারে—উদ্দেশ্যে ও প্রত্যক্ষ ভাবে। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু যেখানে থাকুন, যে ভাবে আমার কথা শুনুন কিছুই জানিনা, তাঁহার নাম ধরিয়া আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিলাম, ইহা উদ্দেশ্যে প্রার্থনা। প্রত্যক্ষ উপাসনায় 'তিনি' নয় 'তুমি', তুমি এখানে আছ এই বলিয়া প্রার্থনা। ইহার মধ্যে কোন্‌টী সফল হয় দেখিতে হইলে, সফল হইবার নিয়ম কোনটীতে কতদূর পালন হয় দেখা আবশ্যক। প্রার্থনার প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরান। প্রার্থনার উত্তর কি? না, তাঁহার জ্যোতি আত্মাতে পড়া। যাঁহারা ঈশ্বরের পানে না তাকান, তাঁহাদের প্রার্থনা কিরূপে সফল হইবে? ঈশ্বরের নিকটে বসিয়া ভিক্ষা চাহিতে হইবে। নিঃসন্দেহ বিশ্বাসের প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করেন। নতুবা শূন্যের কাছে জানাইলে শূন্য যদি উত্তর দিতে পারে দিউক, তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য হয় না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আছে, সামান্য দর্শন ও উজ্জ্বল দর্শন, দূরের আলোক ও নিকটের আলোক দেখার ন্যায়। যখন দূরস্থ ঈশ্বর নিকটস্থ হন, তখন নয়ন উজ্জ্বল ভাবে দেখিয়া কৃতার্থ হয়—প্রার্থনা মধুর হয়। ঈশ্বর আমার কাছে আছেন, এই মাত্র জানা প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রথম সঞ্চার। আমার কথা তিনি শুনেন এবং গ্রহণ করেন, ইহা ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দর্শনের সূত্রপাত; এরূপ অবস্থায় প্রার্থনা আরম্ভ হয়। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনায় ঈশ্বর নিকট হন এবং তিনি নিকট হইলে প্রার্থনা ভাল হয়, এই উভয়ের পরস্পর আকর্ষণে দর্শনের উজ্জ্বলতা ও প্রার্থনার মধুরতা বৃদ্ধি হয়। তিনি বলিয়া প্রার্থনা করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না, বরং তুমি আমাকে দর্শন দাও বলা ভাল। উদ্দেশে প্রার্থনা কেহ যেন অধিক দিন থাকিতে না দেন। 'তুমি' কথাকে প্রত্যক্ষের মূল বন্ধন করা হয়। ক্রমশঃ প্রার্থনা সুলভ হয়। যাঁহারা তিনি বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনা প্রার্থনাই নহে। তাঁহারা প্রার্থনার ফল লাভ করিতেও পারেন না।

প্র—আমরা ঈশ্বরের পুত্র, তিনি আমাদের সকল অভাব মোচন করিবেন, তবে প্রার্থনার আবশ্যকতা কি?

উ—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আমাদের সকল অভাব দেখেন ইহা সত্য, তথাপি প্রার্থনার প্রয়োজন আছে। প্রার্থনার অর্থ অভাব জানান নহে, তাহা হইলে অন্তর্যামীকে পরিহাস করা হয়। ইহার অর্থ প্রার্থী ভাব লাভ করা। প্রার্থী না হইলে কেহ স্বর্গের বস্তু চিনিতে বা বুঝিতে পারে না—লাভ কিরূপে করিবে? বস্তুতঃ না চাহিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, ভৌতিক নিয়মের ন্যায় পরিত্রাণের এই নিয়ম অখণ্ড। সামান্যতঃ প্রার্থনার অর্থ ঈশ্বরের কাছে যাইবার উপযুক্ত হওয়া—অভাব বোধ করিয়া ঈশ্বরের নিকট বিনীত ও ব্যাকুল হওয়া। কথায় বল না বল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মন যখন অনন্যগতি, শরণাপন্ন ও বিনয়ী হইল, তখনি তাহাতে প্রার্থীর ভাব প্রকটিত হইল। সরল প্রার্থীকে ঈশ্বর স্বর্গের দ্বার খুলিয়া প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন।

প্র—শরীর নষ্ট হইলে আত্মা জীবিত থাকে, কি উপায়ে এ বিশ্বাস আত্মাতে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকে?

উ—জানা উচিত আমরা এ পৃথিবীর বিষয় অধিক চিন্তা করি, ইহাতেই মুগ্ধ হই। পরলোকের বিষয় অধিক চিন্তা করিতে হইবে। পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর আছেন ও চিরকাল থাকিবেন, সর্ব্বদা আলোচনা আবশ্যক। সংসারীদের চক্ষু ইহলোকের বিষয়ে আচ্ছন্ন। এই জন্য তাহারা পরলোক অতি অল্প দেখে। শরীরের প্রতি যাহাদের অধিক আশা, ভরসা ও অনুরাগ, শরীর ছাড়িয়া সকলই তাহারা অন্ধকার দেখে। সাধকের ভাব ইহার বিপরীত। তিনি আত্মার সহিত বাস করিয়া ইহলোকেই পরলোকে বাস করেন এবং সাধন দ্বারা পরলোক ইহলোকের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিতে পান।

(ক্রমশঃ)

ভক্তিমতী দেবী জননী সৌদামিনী।

যেদিন আমাদিগের নিকট ভক্তিমতী দেবী জননী সৌদামিনীর আকস্মিক ঘটনা-জনিত মৃত্যু-সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, সেদিন আমরা কোথায় গিয়া পড়িলাম জানিনা। মনে হইতেছিল, সেই মাতৃ-বিয়োগ-শোক-জনিত অশ্রুজল লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখি, কিন্তু দুর্ব্বল লেখনী আর সরিল না। আজ কিছু লিখিতে আসিলাম। যখন আমরা পিতা মাতার সঙ্গে কলিকাতার সান্‌কি ভাঙ্গার বাড়ীতে বাস করিতাম, তখন ভক্ত পিতা প্রতাপচন্দ্র ঐ পল্লীতেই বাস করিতেন। বলিতে গেলে সে সময়ে সেই ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব হইতে আমরা ও নিকটবর্ত্তী সকলেই যেন এক পরিবারেই বাস করিতাম। সে সময়ের সে অভিন্ন পরিবার এখনও মনে পড়িতেছে। আমরা তখন সর্ব্বদাই জননী সৌদামিনীর অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া তাঁহাকে জননী বলিয়াই চিনিতাম। তাঁহার সেই স্নেহমাখা মধুর সম্ভাষণ এখনও হৃদয়ে ঝঙ্কারিত হইতেছে। তাহার পর যখন কলিকাতায় "শান্তিকুটীরে" বাস করিতেছিলেন, তখনও কতবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। তখনও তাঁহার সেই মাতৃস্নেহ আমাদের উপর সেইরূপই ছিল। তিনি আমাদের নিকট আমাদের বাল্যকাহিনী আনন্দের সহিত বলিতেন। যখন আমরা স্কুলে—যখন আমি ও আমাদের শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী মহারাণী সুনীতি দেবী ও শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী সাবিত্রী দেবী ও আরও সমসাময়িক ভগিনীগণ এক স্থানে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহারও কাহিনী অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিতেন। তাঁহার বিষয় যত ভাবিতে যাইতেছি, সে সময়ের সেই স্মৃতি সাগর-বেলায় উদ্বেলিত স্রোতের মত হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। ভক্তিভাজন ব্রহ্মানন্দদেব, ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র ও সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতির পার্শ্বে বসিয়া পারিবারিক উপাসনায় যখন যোগিনীর মত বসিতেন, সে সময়ের সে স্বর্গীয় স্মৃতি চিত্রার্পিতের মত হৃদয়ে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই এক স্থানে উপবিষ্টা দেবী জননী "জগন্মোহিনী" ও দেবী জননী "সৌদামিনীর" স্বর্গীয় জ্যোতিঃপূর্ণ পবিত্র মূর্ত্তি এখনও সম্মুখে দেখিতেছি। গোলাপ ফুলও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। সুন্দর শতদলও বায়ুতাড়িত হইয়া সরোবর-বক্ষে আন্দোলিত হইতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদের সেই সমাধিপূর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি কখনও নিষ্প্রভ ও আন্দোলিত হইতনা। ভক্ত পিতা প্রতাপচন্দ্র যখন নববিধান-প্রচারে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, তখন দেবী সৌদামিনীর মুখে উৎসাহের বিদ্যুদগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিত। মানবীয় অভিধানে তিনি হত্যা-কারীর হস্তে হত হইয়াছেন, কিন্তু নববিধানের অভিধান বলিয়াছেন যে, যাঁহার ভিতরে সমস্ত পার্থিব ভাব পূর্ব্বেই হত হইয়াছিল, তাঁহার নিকট হত্যাকারীর হত্যা কল্পনা মাত্র। জননী আজ সমাধিস্থ। জননী আজ ভক্ত ব্রহ্মানন্দ, ভক্ত প্রতাপচন্দ্র, ভক্ত অঘোরনাথ ও ভক্তিমতী জননী দেবী জগন্মোহিনীর সমাধির পার্শ্বে মহা সমাধিতে সমাহিতা। তাঁহার জীবনে নববিধান জয়যুক্ত।

নামকুম, পোঃ রাঁচি;
২৫।১।৩১।

শোকার্ত্তা
সুমতি মজুমদার।

স্বর্গগতা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সৌদামিনী মজুমদার মহাশয়ার শ্রাদ্ধ-বাসরে পূর্ব্ব স্মৃতি।

হে শ্রদ্ধেয়া, মাননীয়া, সে বাণী তোমার
নীরব হয়েছে আজি, গেছ পরপার;
আজি এ কুটীর পরে সহস্র নয়ন ঝরে,
মনে ক'রে স্তব্ধ সংসার লীলা বিধাতার।

আচার্য্যদেবের সেই ভারত আশ্রমে
প্রথম হেরিনু যবে তোমা কয়জনে,
দেবী সেই রাজলক্ষ্মী, অন্নদা রাধার সখী,
আচার্য্যের অর্দ্ধাঙ্গিনী ফুলরাণী সনে।
কত যে স্নেহ পরশ, স্মরণে আনে হরষ,
কত বাণী, কত গান, কত উপাসনা—
ছিল সে হৃদয়-স্পর্শী, জাগে সেই সর্ব্বদর্শী,
কি ছিল কনক দিবা, রম্য বিভাবরী!
বহুদিন গত হ'ল, তবুও হৃদয়-তল,
সেই উপদেশ বাণী, সেই সে বন্দনা,
আজিও যে নব ভাবে, ভাবের সমুচ্চ ভাবে,
সহস্র অন্তরে হয় ঘন আলোড়না।
সে কালের লোকবল কেবা আছে আর
করিতে হৃদয়ঙ্গম এ স্মৃতি আমার;
কালের অতল তলে অনেকে গিয়েছে চলে,
অনেকে অন্তর-দূর হয়েছে আবার।
এস গো সুনীতি রাণি, এস একবার,
তব সনে অশ্রুধার মিশাই আমার।
বিগত কালের সেই সুখময় ছবি,
তোমারও আমার মত আঁকা আছে সবি।
দুর্দ্দিনের দিনে তাই তোমারেই আগে চাই,
যেথা থাক মর্ম্মতলে পরশ তোমার—
পাই আমি মাঝে মাঝে, যথায় বিরাজে রাজে
শ্রী কেশব-মূর্ত্তিখানি সকলের সার।
প্রতাপের মহাবল গৌরাঙ্গ নিতাই দল,
নবরত্ন সভাতল করিয়া উজল—
গঠিত হল বঙ্গেতে পুণ্য রসে হরিনামেতে,
ভাসিল প্রেমের স্রোতে ভকত সকল।
প্রসন্ন প্রসন্নমুখে কেশবে প্রচারি সুখে,
কান্তির স্নেহের কান্তি সবে শান্তি দিয়ে;
বিপুল ব্রাহ্ম-পরিবার ভারতে হল প্রচার,
সকলেই আপনার সুপ্রশস্ত হিয়ে।
ধরম-বন্ধনে বাঁধা, ছিল নাক কোন বাধা,
বিশ্বাসে সবাই এক, এক ব্রহ্ম নিয়ে,
নিজ পরিবার প্রায় সুখে দুঃখে মমতায়
একমেবাদ্বীতিয়ম্ সকলে বলিয়ে।
অমূল্য মাণিক যাঁরা, তাঁরা আজ কোথা হায়!
জননীর কোলে বসি দেখয়ে সবায়—
অন্তর অন্তরতম সকল আবার।
বিভুনামে সবে স্মরি, সবারে প্রণাম করি,
পদছায়া দানে মুক্ত করুন সংসার,
হরি হরি হরি বলে তরি পারাবার।

৪৮নং ক্রীক রো,
"দেবকুটীর" } শ্রীমতী শরৎকুমারী দেব।

স্মৃতি-তর্পণ

(গত ৩০শে মে, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতি-সভায় নিবেদনের সার মর্ম্ম)

সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ! এ সভায় আমার অবস্থান 'হংস মধ্যে বক যথা' বলে মনে হয়। এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার কোন সাক্ষাৎ যোগ নাই। যেখানে যোগের অভাব, সেখানে বলার কোন মূল্য নাই। যেখানে ভাবের সঙ্গে ভাবের যোগ হয়, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিল থাকে, তথায় ভাষা আপনা আপনি এসে পড়ে; নতুবা ভাষা যতই সাধু হউক, যতই শিল্প-নৈপুণ্যে পূর্ণ হউক, যতই মিষ্ট ও সুস্বাদু হউক, তাতে মানুষের মর্ম্ম-স্থল স্পর্শ করতে পারে না। তবে যিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ, তাঁর সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ ছিল, সেই যোগের খাতিরে দুই একটী কথা বলবার অধিকারের দাবী করতে পারি।

সে আজ বহুদিনের কথা, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে যিনি সাধুরত্নহারের দ্যুতিমান মধ্যমণি রূপে ভারত আকাশে উদয় হয়েছিলেন—যিনি যুগান্তরের কুজ্ঝটিকা ভেদ করে আশার সূর্য্যা-লোকের স্বর্ণচ্ছটায় বাংলার মাঠ ঘাটকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, যিনি বাংলার একদল যুবককে সঙ্গে নিয়ে সংকল্পের উদ্যত বজ্র হাতে করে, যাহা কিছু অধর্ম্ম, যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু অন্যায় ও অপকর্ম্ম, তাকে চূর্ণ করে, নূতন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মৃত্যুর শক্তিশেল বুকে নিয়ে, ঘরের বাহিরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম নেতা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র। আজ তাঁহারই শ্রাদ্ধবাসরে ফুল চন্দনের নৈবেদ্য হাতে নিয়ে এসে দেখি যে, ঘর শূন্য! এ ঘরে পূজারী মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, কিন্তু শ্রোতার অভাব। পুরোহিত প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু প্রসাদ গ্রহণ করিবার লোকের অপ্রতুল। তথাপি এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যাঁহারা আজকার দিনে সভা আহ্বান করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। প্রার্থনা করি, তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা ভবিষ্যতে যেন সার্থক হয়।

সমুদ্র মন্থন করে দেবতারা যেমন রত্নোদ্ধার করতেন, ঋষি প্রতাপচন্দ্রের জীবন-সমুদ্র মন্থন করে আমরাও একটী মহারত্ন লাভ করেছি—সেটী প্রেম,—অসামান্য ও অলৌকিক প্রেম—যে প্রেমে পাষাণ গলে জল হয়—যে প্রেমে পাষাণময় ভূমি শস্য-শ্যামলা ধরণীতে পরিণত হয়—যে প্রেমে অসাধু সাধু হয়। তিনি সেই প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। এই প্রেমই তাঁর রক্ত মাংসে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁর মূর্ত্তিকে শান্ত ও সুবিমল করেছিল, তাঁর চরিত্রকে শুভ্র, নির্ম্মল ও দৃঢ় করেছিল, তাঁর আত্মাকে গভীর ও জ্যোতির্ম্ময় করেছিল। প্রেম মানুষকে রূপান্তরিত করে। অসাধু সল ঈশাকে ভালবেসেই সাধু পল হলেন, তিনি ঈশাময় জীবন লাভ করলেন; তাই তিনি বল্লেন যে, "For me to live

is Christ"। আর একবার Fransis D Asisi (ফ্রান্সিস ডি আসিসি) খৃষ্টের ক্রুশের যাতনা সাধন করতে গিয়ে তাঁরও দুই হাতে ক্রুশের দাগ ফুটে উঠেছিল; এবং Saint Fransis Latimer খৃষ্টের ক্রুশের যাতনা নিজের শরীরে বহন করবার জন্য, জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে, মৃত্যুর যাতনাকে জয় করে দেখালেন যে, প্রেমের শক্তি অলৌকিক ও অসীম। অবশ্য এ সকল প্রায় দু'হাজার বৎসরের কথা, ইহার ভিতর কতকটা ঐতিহাসিক সত্য, আর কতকটা কল্পনাও থাকা সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকদিনের কথা নয়, এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম সাধন করতে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। ভাবের সঙ্গে ভাব মিশে গেল, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিলে একপ্রাণ হয়ে গেল। তাঁর নৃত্য, তাঁর অশ্রুজল, তাঁর কণ্ঠস্বর সব প্রভুর মত হয়েছিল। দূর থেকে তাঁর কীর্ত্তন, নৃত্য ও অজস্র অশ্রুজলের প্রস্রবণ দেখে ভক্তেরা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন বলে ভ্রম করতেন।

ঋষি প্রতাপচন্দ্র সুখে, দুঃখে, আনন্দে, অবসাদে, নির্য্যাতনে, অপমানে, দাস দাসীর কঠোর ব্যবহারে ঈশার আদর্শে চলতেন। ক্রমে তাঁহার সঙ্গে একটা জীবন্ত ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হল, জীবন ঈশাময় হল। ঈশা ভাবেরই ফুটন্ত ফুল তাঁহার ওরিয়েন্টাল ক্রাইষ্ট (Oriental Christ.)

হে যুবক-মণ্ডলী, তিনি তোমাদের কত ভালবাসতেন, তিনি তোমাদের সম্বন্ধে কত স্বপ্ন দেখতেন। তাঁহাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি যে, বাংলার যুবকদের উচ্চ শিক্ষার সহিত উচ্চ নৈতিক জীবনের যদি সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহা হইলে বাঙ্গালী একদিন জ্ঞান-রাজ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে। ইহাদের উচ্চশিক্ষা, বিশুদ্ধ জীবন, অদম্য উৎসাহ, কর্ম্মকুশলতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ভাব-প্রবণতা একাধারে মিলিত হইয়া সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মত অবিশ্রান্ত অগ্রসর হবে। ধর্ম্মে কর্ম্মে, দর্শনে বিজ্ঞানে নব নব সত্য আবিষ্কার করে, নব নব কর্ম্মের সূচনা করে, এরা একটী আদর্শ জাতি গঠন করবে। এদের ভিতর একটা Potentiality খুব আছে। তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি স্যার জগদীশ চন্দ্রের বিজ্ঞান-চর্চ্চায় ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ভিতর ফুটে উঠেছে। তিনি ভবিষ্যতের এই অসামান্য উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়েই "Higher Training for young men" যুবকদের জন্য উচ্চ-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অক্লান্ত শ্রম ও অবিশ্রান্ত চিন্তার ভিতর দিবা রাত্র কাটাইতে হইত। একদিকে দেশের মনীষী লোকদিগের সাহায্য প্রার্থনা ও অপর দিকে রাজপুরুষদিগের প্রসাদ ভিক্ষা করিতে তাঁহাকে অসাধ্য সাধন করিতে হইয়াছিল। যুবকগণ তাঁহার অভিপ্রেত পথ হইতে একটু সরিয়া পড়িয়াছেন, ইহা অনেকের মত। এখন যুবকদের ভিতর একটা নূতন প্রেরণা, নূতন ভাব, নূতন কর্ম্ম-শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; তাহা ভাল কি মন্দ, তাহা চিন্তা করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে একটা কথা বলিতে চাই যে, যুবকেরা যাহাই করুন, তাহার সহিত নীতির যোগ না থাকিলে ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আবৃত বলিয়া মনে হয়।

তিনি কায়মনে নারীজাতির উন্নতি প্রার্থনা করিতেন। তাঁহাদের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। অনেক সভা সমিতি ও আলোচনার মধ্যে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মাতৃত্বের মহিমময় নারীর মাহাত্ম্য বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সৃষ্টিকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিবার জন্য পৃথিবীতে নারীর আবির্ভাব। ইয়ুরোপ রুদ্র ভাবের উপাসক, নারীর ভিতরও তাঁহারা রুদ্র ভাবের সার্থকতা দেখিতে চান। পাশ্চাত্যের অনুকরণ নারী-স্বভাবের পরিপন্থী। নারী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি লইয়া গৃহকে মধুময় ও শোভা সৌষ্ঠবে পূর্ণ করিবে। তিনি যখন পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন একটী প্রকাশ্য সভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু বাংলার মায়ের মত এমন স্নেহশীলা জননী আর আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাইলাম না এবং পবিত্র-চরিত্রা ও সতী সাধ্বী নারীও আমার চক্ষে পড়িল না। ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে যে, "In the heaven above and in the earth below there is nothing like Englishman". অর্থাৎ স্বর্গে এবং পৃথিবীতে ইংরাজের মত এরূপ অপরূপ বস্তু আর নাই। এই কথার দ্বারা ইংরাজ-জাতির প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম ভালবাসা বুঝায়, যে ভালবাসায় প্রণোদিত হইয়া ইংরাজ স্বজাতির প্রতি অলৌকিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। সেই প্রেমই আবার প্রতাপচন্দ্রের ভিতর প্রস্ফুটিত হইয়া, বঙ্গের ললনা তাঁহার নিকট দয়ামায়া, স্নেহ বাৎসল্য, বিনয়, পবিত্র চরিত্র, মাতৃত্বে ও সতীত্বে পৃথিবীতে অতুলনীয়া বোধ হইয়াছিল। যে জাতি নারী-চরিত্রকে শ্রদ্ধা করিতে জানেনা, সে জাতি কখন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া সুখ্যাতি পাইবার যোগ্য নহে।

মহাপুরুষদিগের চরিত্রে দুটী মহৎ গুণ থাকে, 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি," তাঁহারা যেমন একদিকে বজ্র অপেক্ষা কঠোর, অন্য দিকে কুসুম অপেক্ষা কোমল। তিনি কাহারও নিকট একটু সহানুভূতি পাইলে, একটী মিষ্ট কথা শুনিলে, অথবা একটু সেবার স্পর্শ পাইলে ছোট শিশুর ন্যায় তাহাকে সমগ্র হৃদয় দিয়া ভালবাসিতেন। রক্ত মাংসের সম্বন্ধ অপেক্ষা নিজের দয়াবন্ধুদের অধিক আপনার বলিয়া মনে করিতেন, তাই তিনি নিঃসন্তান হইয়াও অনেক সুসন্তান লাভ করিলেন। আবার যাহাদের ভালবাসিতেন, তাহাদের মধ্যে যদি কোনরূপ দুর্নীতি অথবা অকর্ম্মের সহিত গুপ্তাকারে যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন শুনিতে পাইতেন, তাহাদিগকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতেন। মণ্ডলীতে অথবা সমাজে কোন পাপ প্রসার পাইতেছে শ্রবণ করিলে, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় তাঁহার সমস্ত শরীর মন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া পড়িত; যথাসাধ্য তাহা

নিবারণ করিবার জন্য কখন একাকী, কখন দুএকটী বন্ধুসহ জীবনের প্রতিজ্ঞা লইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

তাঁহার জীবনের আর একটী বিশেষ কথা ব্রহ্মানুভূতি। এই ব্রহ্মানুভূতি তাঁহার কষ্টসাধ্য অর্জ্জিত বস্তু নহে, ইহা তাঁহার ধর্ম্ম-প্রকৃতির সহজলভ্য বস্তু, বিধাতার বিশেষ দান। তাঁহার শৈশবের একটী কথায় তাহা প্রমাণিত হয়। তিনি বলিতেছেন, "নির্দ্দোষ ও নির্ব্বোধ অতি শৈশবে আমার সঙ্গে একজন আনন্দময় সত্তা কিরূপে ব্যবহার করিতেন, কত ক্রীড়া আমোদ করিতেন, তাহা মনে আছে, এখনও ভুলি নাই। মনে পড়িলে বড় কৌতুকাবিষ্ট হই। বোধহয়, সকল সুজাত শুদ্ধ-শরীর শিশুর সঙ্গে অন্তরাত্মা এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

শৈশবে তাঁহার এই আনন্দময় সত্তার অনুভূতি ক্রমে যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে জীবন্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধে পরিণত হইয়া ছিল। তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, অলৌকিক ভাব-প্রবণতা, বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্র, শিল্প-সৌষ্ঠবে পরিপূর্ণ সুললিত ভাষা, বিবেকের সাক্ষাৎ বাণী, অদম্য সাহস, কর্ম্মতৎপরতা, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দৃষ্টি সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনের অব্যর্থ পরিচয়। শরীরে প্রাণ থাকিলে শরীর যেমন ক্রিয়াশীল হয়, আত্মা ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ ও জীবন্ত হইলে নানা স্বর্গীয় ভাব ও সংকল্পে তাহা প্রস্ফুটিত হয়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত প্রভু নিত্যানন্দের যে সম্বন্ধ ছিল, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীপ্রতাপচন্দ্রের সেই সম্বন্ধ ছিল। বৈষ্ণব যুগে গৌর নিতাই মিলিত হইয়া বাংলার ঘরে ঘরে যেমন ভক্তির অমৃত-ধারা বর্ষণ করিয়াছেন, সেইরূপ কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মিলিত হইয়া দেশ বিদেশে নববিধানের যুগবার্ত্তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যুগের বার্ত্তা সমন্বয়, যুবা বৃদ্ধের সমন্বয়, জ্ঞানী ভক্তের সমন্বয়, যোগী কর্ম্মীর সমন্বয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের সমন্বয়, পুরুষ ও নারীর সমন্বয়; এই সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যুবকদের সহিত যুবার উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া মিলিত হইলেন। এই সমন্বয়ের ভিতরই ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মিলন প্রতিষ্ঠা হইবে। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সত্য শিব সুন্দর শ্রীভগবানের বাহ্য প্রকাশ।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ।

সাম্রাজ্যদিন—গত ২৪শে মে, মহারাজ্ঞী মাতা ভিক্টোরিয়ার শুভ জন্মদিন স্মরণে, পুরীতে সমুদ্রোপকূলস্থ গ্যালষ্টন কুটীতে, প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয় এবং সন্ধ্যায় পুরী সার্ব্বজনীন যুগধর্ম্ম-বিধান নববিধান শ্রীক্ষেত্রে মুক্ত ভূমিতে সামাজিক উপাসনা উপলক্ষেও, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় এবং সর্ব্ব-জাতির ও পূর্ব্ব পশ্চিমের সমন্বয়ে যে সর্ব্ব সাম্রাজ্যের শান্তি ও মিলন, ইহাই আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা হয়। মা ভিক্টোরিয়ার নবরূপে যেন ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সদ্ভাব ও মিলন সম্পাদিত হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ও শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ মধুর সঙ্গীত করেন। কতিপয় গণ্য ব্যক্তি যোগদান করেন।

শুভবিবাহ—১৪ই জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতায়, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী, শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী উমার সহিত, ময়মনসিংহ-নিবাসী স্বর্গীয় রায় অভয়শঙ্কর গুহ বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান বিরজাশঙ্কর গুহের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার মাতামহ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বাগনানে দেউলটী-নিবাসী ভ্রাতা সত্যচরণ সিংহের মধ্যম পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অমলচন্দ্রের সহিত, বাগনান-নিবাসী ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী হরিপ্রিয়ার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪নং৺ষ্টনীবাগান লেনে, হুগলীনিবাসী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্তের মধ্যম পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র দত্তের সহিত, স্বর্গীয় সরোজকুমার দেবের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সান্ত্বনার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এই শুভানুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন।

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১০০।এ গড়পার রোডে, হাওড়া বাঁটরা-নিবাসী স্বর্গীয় হরকালী দাসের পৌত্র, স্বর্গীয় ডাঃ শরৎকুমার দাসের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ শচীকুমারের সহিত, হুগলী-নিবাসী স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বর সরকারের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী মণিকার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোহিতের কার্য্য করেন।

ভগবান্ এই সকল নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

দীক্ষা—গত ৩০শে মে, বাগনান মুরালীবাড় গ্রামে ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী হরিপ্রিয়াকে নববিধানে দীক্ষাদান করা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। ভগবান নবদীক্ষিতাকে শুভাশীষ দান করুন।

সমাধি-প্রতিষ্ঠা—গত ৩রা জুন, ৯নং গিরিশবিদ্যারত্নের লেনে, স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের সমাধি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, প্রাতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন, সায়ংকালে শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে কীর্ত্তন হয়। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরলা সেন ব্রহ্মমন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার-কার্য্যে ২০৲ ও প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১৮ই মে সন্ধ্যায়, শান্তিকুটীরের যে কক্ষে সতী সৌদামিনী দেবী আকস্মিক ভাবে দেহমুক্ত হন, সেই কক্ষে বিশেষ উপাসনা, সংকীর্ত্তন ও পাঠাদি হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই গোপাল চন্দ্র বিশেষ প্রার্থনা করেন, ভ্রাতা অখিলচন্দ্র সংকীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। মঙ্গলপাড়াস্থ ভগিনীগণ ও নববিধানাশ্রমস্থ সকলে যোগদান করেন।

গত ২৭শে মে, মহর্ষিদেব দেবেন্দ্রনাথের জন্মদিন এবং ভাই প্রতাপচন্দ্রের স্বর্গগমনদিন স্মরণে পুরী গ্যাষ্টন কুটীতে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন। আচার্য্যদেবের খুল্লতাত ভ্রাতার পুত্র কানপুর-প্রবাসী ডাঃ সেন ও স্থানীয় কতিপয় বন্ধু-বান্ধব যোগদান করেন।

তীর্থবাস—গত ১৯শে মে হইতে ২৮শে মে পর্য্যন্ত, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পুরী তীর্থ বাস করিয়া, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র এবং শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ ভগ্নীদেবীদিগের সহযোগিতায় উপাসনাদি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ভগ্নিদেবীদিগের সেবা-ভক্তি-সমন্বিত উচ্চসাধনা ও মধুর সঙ্গীত এবং সমুদ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পবিত্র বাতাস সকলই শরীর মন আত্মার যথেষ্ট কল্যাণপ্রদ ও আত্মিক উন্নতি-বিধানের সহায়।

স্মৃতি-সভা—গত ৩০শে মে, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে, ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে স্মৃতি-সভা হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। কামাখ্যাবাবুর নিবেদন স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

পারলৌকিক—গত ৩রা জুন, ৭নং বিপ্রদাস ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশু পুত্রের পরলোকগমনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমা জননী শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—আমরা অতীব দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে, গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বালেশ্বরে, আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী দুর্গামণি দেবী সপ্তসপ্ততিতম বর্ষ বয়সে অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামী, সন্তানগণ ও বহুপরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময়ী জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তাঁহার আদ্যকৃত্য নবসংহিতানুসারে পুত্রগণ কর্ত্তৃক বালেশ্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সমযোগে অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শাশুড়ীর জীবনী পাঠ করেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র দাস প্রধানশোককারীর প্রার্থনা, মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ হেমচন্দ্র দাস নবসংহিতার প্রার্থনা এবং স্বামী বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে সহায়তা করেন। অনুষ্ঠানটী বেশ সুগম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হয়। চিন্ময়ী জননী পরলোকগত আত্মাকে তাঁর অনন্ত স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্ত পরিবারে ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৯শে মে, দেউলটী-নিবাসী ভ্রাতা সত্যচরণ সিংহের পিতৃদেবের স্বর্গাদিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এইদিন শ্রীকেশবানুজ কৃষ্ণবিহারী সেনের স্বর্গদিন স্মরণে বিশেষ প্রার্থনা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেনের তিরোধান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৩১শে মে, শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিকের কন্যা ও ভাই প্রিয়নাথের দৌহিত্রী শ্রীঅণুর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে উপাসনা ও পরলোক-সাধন হয়।

কুলটীতে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়ের মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ শান্তিসুধা রায়ের প্রবাস-ভবনে, গত ২৭শে মে স্বর্গগত প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্রের, ২৮শে মে অনুকূল বাবুর ভগ্নী স্বর্গীয়া তরঙ্গিনী দেবীর এবং ২৯শে মে অনুকূল বাবুর খুল্লতাত স্বর্গীয় সবজজ প্রসন্নকুমার রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় কলিকাতা হতে গিয়ে উপাসনা করেন। তরঙ্গিনী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র রায় ২৲, ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুষমা বসু ২৲ ও শ্রীমতী সুচারু বসু ২৲ টাকা প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ১ই জুন, ১নং গিরিশবিদ্যারত্ন লেনে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেনের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল স্বর্গীয় মোহিতলাল সেনের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

ভ্রম-সংশোধন—১৬ই জ্যৈষ্ঠের, ধর্ম্মতত্ত্বে, ১১৫ পৃষ্ঠায় প্রথমস্তম্ভে, ৪র্থ লাইনে "শুভবিবাহাশীর্ব্বাদ" সংবাদে "অজিত-কুমারের" স্থলে "আশাকুমার" এবং "সুমিত্রার" স্থলে "সুচিত্রা" হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৪ঠা আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 1st July, 1931. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

ধন্য ধন্য মা তুমি! এই যে মহামিলন-বিধায়িনী জীবন্তরূপিণী জননী হইয়া নববিধানে প্রকাশিত হইয়াছ। ধন্য আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন, যিনি এই নবযুগধর্ম্ম-বিধানের বীজ ভারতে বপন করিলেন। ধন্য ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যিনি তাহাতে জল সিঞ্চন করিলেন এবং ধন্য আমাদের অগ্রজ ব্রহ্মানন্দ, যিনি তাহাকে ফল ফুলে শোভিত নববিধান-তরুরূপে প্রতিফলিত করিলেন। আজ একবার সেই দৃশ্য স্মরণ করি, যাহা ঐ [illegible] মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থায় একদিন মা তুমিই দেখিতে দিয়াছিলে। তখন যে তিনজন একত্রে এক হইয়া সকল ব্রাহ্মপরিবারকে এক পরিবাররূপে মিলাইয়া রহিয়াছিলেন। আজ আবার সেই দৃশ্য স্মরণ করি, যেদিন ধর্ম্মপিতা কেশবচন্দ্রের শেষ রোগশয্যায় দেখিতে গিয়া "বাবা কেশব" বলিয়া গভীর প্রেমালিঙ্গন করিয়া দর দর ধারে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। আজ আরো সেই দৃশ্য মনে করি, যে দিন ব্রহ্মানন্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া আসিয়া বলিলেন, "এ মন্দির আমার মার হইবেই হইবে। যদি ওঁরা দরজা বন্ধ করিয়া না দিতেন, মিলন নিশ্চয় অনেক অগ্রসর হইত।" আমরা আর যেন হৃদয়-দ্বার রুদ্ধ না করি। নববিধান যে সকলকে মিলাইতে, সকলকে আলিঙ্গন করিতে মুক্ত-হৃদয়। সকলকে তবে আলিঙ্গন করি, গ্রহণ করি। যাহার যাহা বিশেষত্ব, তাহা স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া চিরমিলনে মিলিত হইয়া যাই। আর তোমার অনন্ত বিধানকে যেন সমাজের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ না করি; কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত ভুল ভ্রান্তি, বিচার বুদ্ধি, মতভেদ পরিহার করিয়া, "মা আমাদের, আমরা মার" বলিয়া আনন্দে, আনন্দময়ী মা, তোমারই জয়গান করি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, সাধারণ অসাধারণ, আমরা সকলেই যে এক মায়ের সন্তান, ইহা বিশ্বাস করিয়া, কার্য্যতঃ তোমার নববিধানের সর্ব্বসমন্বয়কারিতা স্বীকার করি, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন শুভ বুদ্ধি বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

সর্ব্বসমন্বয়-বিধান নববিধান।

নববিধান বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিধাতা যে সমুদয় ধর্ম্ম বিধান, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, বিভিন্ন-জাতীয় মানবের কল্যাণের বা

ধর্ম্মোন্নতি-বিধানের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, সে সমুদয় সমন্বিত বা একীভূত করিবার জন্য তিনি বর্ত্তমান যুগে এই নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন।

নববর্ষের দিন ক্ষণ মাস বার তিথি বিধি ব্যবস্থা নিরূপণ করিবার জন্য যেমন নূতন পঞ্জিকা, তেমনি বর্ত্তমান সময়ের মানবাত্মার শিক্ষা, সাধন এবং ধর্ম্ম-জীবনের সমুন্নতি বিধানের জন্যই নববিধান।

হিন্দুস্থানে হিন্দুজাতির ধর্ম্ম-শিক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতি বিধান করিতে, যুগে যুগে দুষ্কৃতি-বিনাশের জন্য এবং সাধুদের পরিত্রাণের জন্য নব নব ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ বিধাতার অবতারণা হইয়াছে। আবার ইহুদী দেশেও ইহুদী বিধানের নব নব অভিব্যক্তি হইতে হইতে খৃষ্টবিধানের ও ক্রমে এস্লাম বিধানের অবতারণা হইয়াছে। ক্রমে প্রাচ্য প্রতীচ্যের পরস্পরের যখন মিলন সম্ভাবিত হইল, তখন উভয়ের ধর্ম্ম-বিধানেরও আদান প্রদান ও সমন্বয়-সাধনের যুগ আসিল।

তাই যেমন পূর্ব্বদেশবাসী ও পশ্চিমদেশবাসিগণ ব্যবসায় বাণিজ্যে পরস্পরের পণ্য-দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিবার জন্য পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করিলেন, তাহার সহিত ভাবেরও বিনিময় করিলেন, জ্ঞানেরও আদান প্রদান করিলেন, তেমনি ক্রমে ধর্ম্মেরও সমন্বয় সাধন দ্বারা যে আত্মিক মিলনে মনের মিলন, আত্মার মিলন, জীবনের মিলন সংসাধিত হয়, তাহাই করিতে উন্মুখীন হইলেন। ইহাই স্বয়ং বিধাতার প্রেরণা এবং নববিধান।

এখন যেমন বিভিন্ন জাতির সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে হইলে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা বিনা কারবার চলে না, তেমনি সকল ধর্ম্মের ও সকল শাস্ত্রের সকল সাধন ও সকল শিক্ষা গ্রহণ না করিলে পূর্ণ মানবত্ব লাভ হয় না।

নববিধান তাই সর্ব্ব ধর্ম্ম, সর্ব্ব শাস্ত্র, সর্ব্ব ভক্ত, সর্ব্ব সাধন সমন্বয় করিয়া, বর্ত্তমান যুগে পূর্ণ মানবত্ব বিধানের জন্য অবতীর্ণ।

এই মানবদেহ যেমন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত, হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ও কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা না করিলে যেমন দেহ রক্ষা হয় না, এবং সকল অঙ্গের পরিপুষ্টি-সাধনে পরস্পরের সহায়তায় হইতেছে বলিয়াই দেহের পরিপুষ্টি হইতেছে, উদর এবং অন্যান্য অবয়বের বিবাদ হইলে যেমন দেহের দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই বিকল অবস্থা উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনি সকল মানবই এক অখণ্ড মানব-দেহরূপে পরস্পরের সহায়তায় রক্ষিত, পরস্পরের সহিত বিবাদে সকলেরই বিনাশ সাধন হয়।

এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মও একই অখণ্ড ধর্ম্ম-দেহরূপে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। ইহাদের সমন্বয় ও মিলনেই পূর্ণ ধর্ম্ম, অসম্মিলন বা অসহযোগিতায় সংকীর্ণতা, হীনতা, অধর্ম্ম এবং বিনাশ।

তাই পূর্ণধর্ম্ম-বিধাতা বর্ত্তমান নবযুগে নববিধান বিধান করিয়া শিক্ষা দিতেছেন, হিন্দু, এসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ, ব্রাহ্ম সকলেরই উপাস্য, উদ্দেশ্য, নেতা ও নিয়ন্তা যে একই, ইহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া, পরস্পরকে একই ধর্ম্মাঙ্গের বিভিন্ন অবয়বরূপে স্বীকার পূর্ব্বক, পরস্পরকে বিবাদ বিদ্বেষ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে এবং পরস্পরকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার আদেশ, ইহাই তাঁহার বিধান বা ব্যবস্থা।

ভাষার ভিন্নতা বশতঃ যেমন একই বস্তু বিভিন্ন নামে বা অভিধানে অভিহিত হয়, তেমনি একই ব্রহ্ম গড্ খোদা জিহোভা কৃষ্ণ কালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, সেই একই যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান সাধনের প্রক্রিয়া হিন্দু, এসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ধর্ম্মে বিচিত্র বা বিভিন্ন হইলেও, সকলেরই লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক ভিন্ন দুই নয়।

শান্তভাবে ইহা উপলব্ধি করিলে এবং সদ্গুরু স্বয়ং পবিত্রাত্মা বিধাতার শরণাপন্ন হইলে, তিনি বিবেকালোকে সমুদয় মীমাংসা করিয়া দেন এবং তিনিই কেবল তাঁহার পথ দর্শন করাইতে পারেন, কারণ তিনি অনন্ত, অনন্তের পথ অনন্ত বিনা কে দেখাইতে পারে?

যুগে যুগে যে সকল যুগধর্ম্ম-নেতা ঈশ্বর-প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া পৃথিবীতে অবতাররূপে পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তিরও অবতারণা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মোহম্মদ, জোরাষ্টার, আব্রাহাম, কন্‌ফুচি, শ্রীগৌরাঙ্গ, গুরু নানক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন জাতি মধ্যে এক এক ঐশিক শক্তি লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহাদের সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

তাঁহারা কেহ বা যোগী, কেহ বা সন্তানত্ব, কেহ বা

নির্ব্বাণ, কেহ বা দাস্য, কেহ বা ভক্তি, কেহ বা কর্ম্ম, কেহ বা জ্ঞান, তত্তৎ কালোপযোগী ভাবে সাধনার সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়া আদর্শ মানবত্ব লাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে তাঁহাদের সকলকার সকল সাধন সমন্বয় করিয়া গ্রহণ করাইতেই নববিধান অবতীর্ণ। এবং বিশ্বমানব ব্রহ্মানন্দ-জীবনে বিধাতা নববিধান মূর্ত্তিমান করিয়া ইহা সকলের পক্ষে সম্ভাবিত করিয়াছেন

আমরা সকলেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যোগে এই জীবন লাভে আকাঙ্ক্ষিত হইলেই, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সকলেই এক অখণ্ড বিশ্বমানব ব্রহ্মানন্দ হইবে। কারণ তিনি আমাদের জন্মদায়িনী জননী রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। মার কাছে সরল শিশুর ভাবে ব্যাকুল অন্তরে যদি আমরা প্রার্থনা করি, অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, তিনি লইয়া যাইবেনই যাইবেন; যদি আমরা চাই, অজ্ঞান অন্ধকার হইতে জ্ঞান-জ্যোতিতে লইয়া যাও, তিনি লইয়া যাইবেনই যাইবেন; যদি চাই পাপ মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে বা অমরত্বেতে লইয়া যাও, তিনি লইয়া যাইবেনই যাইবেন; যদি বলি, হে সত্যস্বরূপ, প্রকাশিত হও, দয়াময়, তোমার অপার করুণাগুণে রক্ষা কর, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেনই করিবেন।

এই বিধান মিলনের বিধান। ভাই ভাইতে, ভগ্নী ভগ্নীতে মিলিয়া দলগত পরিবারগত মিলিত ভাবে আমরা একই ঈশ্বরের পূজা করিলে, আমাদিগের মধ্যে একাত্মতা তিনি প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহাই তাঁহার নির্দ্দেশ।

সংকীর্ত্তন যেমন একা একা হয় না, ব্যাণ্ড যেমন একটা বাজনায় বাজে না, তেমনি একাকী যাইলে নববিধানের পথে যাওয়া যায় না। কেননা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মহামিলন-সম্পাদনের জন্যই এই নববিধান। মিলনেই ইহার প্রমাণ।

এই নববিধানে সর্ব্বজগজ্জনকে সম্মিলিত ভাবে নবজীবন দিবার জন্যও বিধাতা এই বিধান আনিয়াছেন। সমস্ত ধর্ম্ম, সমস্ত জাতি, সমস্ত জগৎ ইহার প্রভাবে নবজীবন প্রাপ্ত হইবে এবং সকলে একাত্মতা-লাভে, স্বর্গে যেমন ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্, তেমনি মর্ত্তে সমস্ত মানব কেবল এক পরিবার হইবে তাহা নহে, একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গ্রথিত হইয়া এক অখণ্ড মানবত্বে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হইবে।

মনের শুদ্ধতা।

কাচ নির্ম্মল স্বচ্ছ হইলেই তাহাতে সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। নদীবক্ষ অবাতকম্পিত স্থির হইলেই তাহাতে চন্দ্রের জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। তেমনি পাপালোড়িত জীবনে ব্রহ্মসত্তা প্রকাশিত হয় না। রোগ থাকিলে মিষ্ট জলও দুঃস্বাদ বোধ হয়, স্নিগ্ধ সমীরণও অসহ্য হয়। তাই পাপ থাকিতে ভগবানের নামও ভাল লাগে না। মন বিশুদ্ধ নির্ম্মল না হইলে আনন্দময়ীর দর্শন লাভ হয় না। শুদ্ধতাই ব্রহ্মানন্দ-লাভের উপায়।

পাপ কি ?

শ্রীকেশব বলেন, "পাপ কি ? আমি বলি।" বাস্তবিক কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অহংকার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি পৃথিবীর অভিধানে পাপ বটে; কিন্তু নববিধানের অভিধানে পাপ, পাপ করিবার সম্ভাবনা যাহা, তাঁহাই পাপ। তাই পাপের মূল এই আমি বলা। আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র একজন যখনই হই, তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য জগতে ইহাকেই সয়তান বলে, এই আমিত্বই আমার পাপের মূল। কাম ক্রোধাদি রিপু আমিত্বই রোগ, আমিত্বের ক্লেদ। শরীর থাকিলে শরীর হইতে যেমন ক্লেদ নির্গত হয়, তেমনি এই আমি হইতেই সমুদয় পাপ নির্গত হয়। তাই গুরু বলেন, পাপ-বিনাশের ঔষধ আমিত্ব-নাশ। এই আমিত্বের যদি সম্পূর্ণরূপে বলিদান হয় বা ব্রহ্মসত্তায় আত্মবিলীন হয়, তাহা হইলেই পাপের সম্ভাবনা থাকে না। ব্রহ্মের পুণ্যরূপ হোমাগ্নিতে আত্মাহুতি-দানই পাপ-বিনাশের উপায়।

ধর্ম্মরাজ্যের দুর্ভিক্ষ।

ক্ষেত্র আছে, ফসল উৎপন্ন হয় না। ফসল আছে, বিক্রয় হয় না, অর্থাগম হয় না। শ্রমজীবী আছে, বেতন পায় না। পরস্পর কেহ কাহাকেও সহায়তা করেনা, সহানুভূতি করে না, কাজেই চারিদিকে হাহাকার দুর্ভিক্ষ। বৈষয়িক জগতে যেমন, ধর্ম্মজগতেও তেমনি ধর্ম্মের আড়ম্বর আছে, শাস্ত্রপাঠ, মন্ত্র তন্ত্র, কৃচ্ছ্র, কষ্টসাধ্য সাধনা, গৈরিক বসন, বাহ্য অনুষ্ঠান, মৌখিক প্রার্থনা সকলই আছে, অথচ প্রেম নাই, সহানুভূতি নাই, ভক্তি নাই, পরস্পরের মিলন নাই, ধর্ম্মাভিমান, স্বার্থপরতা, দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসম্বাদ, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ ইত্যাদি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কেই জর্জ্জরিত করিতেছে, ইহাই ত ধর্ম্মরাজ্যের দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন করিতে

পারিলে, মা তাঁর কৃপাবারি-বর্ষণে সকল দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবেন, ইহাই নববিধানের শিক্ষা।

শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ (১)।

স্থানে অস্থানে, দেশে বিদেশে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য-নাম ধারী ব্যক্তিগণ যে রকম সত্য তত্ত্ব না জানিয়া, বা না বুঝিয়া, মিথ্যা সত্য মিশাইয়া অতিরঞ্জিত ভাবপ্রবণতায়, আপনাদের গুরুকে ঈশ্বরাবতার সাব্যস্ত করিবার জন্য কতই কল্পিত মত বা কাহিনী রচনা করিতেছেন, তাহা ভাবিলে নিতান্তই ব্যথিত হইতে হয়।

বর্ত্তমান শিষ্যদিগের মধ্যে কয়জন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, বা তাঁহার মুখের বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

এখনকার সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে উপন্যাস-লেখকের সংখ্যা যেমন অধিক, আমাদের দেশের লোকেরা তিলকে তাল করিতে যেমন মজবুদ, এমন প্রায় অন্যত্র অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বপ্নে দেবতা পাওয়া, দশা পাওয়া, হিষ্টিরিয়ায় ভূতের ভর হওয়াও উচ্চ ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া যাঁদের আদৃত, তাঁহারা যে গুরুদেবকে বাড়াইবার জন্য অতিরঞ্জিত কাহিনী রচনা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

কিন্তু সত্য যাহা, তাহা সত্য; ধর্ম্ম যাহা, তাহা ধর্ম্ম; আজ না হয় চোখে ধূলি দিয়া দশটা আজগুবি কথা বলিয়া দল বাড়াইতে পার, কিন্তু কখনই তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। ধর্ম্মের বাতি আপাততঃ ধিকি ধিকি জ্বলিলেও, একদিন তাহা সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিবেই করিবে।

এই প্রবন্ধ-লেখক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ করিয়া এবং তাঁহাদের উভয়ের আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদ লাভে ধন্য হইয়াছে এবং তাঁহাদের উভয়ের সাধনার কথা তাঁহাদের নিজ মুখে শ্রবণ করিয়া ও নিজ জীবনে তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের ধর্ম্ম, মত, বিশ্বাস ও সাধন সম্বন্ধে যাহা চারিদিকে কল্পনা জল্পনা যোগে প্রচারিত হইতেছে, সত্যের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে, তৎসম্বন্ধে যথাজ্ঞান নিবেদন করা কর্ত্তব্য বোধেই এই প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইতেছে।

নববিধানের গৃহস্থ বৈরাগ্য-ব্রতধারী শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু একবার রামকৃষ্ণের এক শিষ্যকে আমোদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এত চেষ্টা বেষ্টা করে যদি আর একটা অবতার খাড়া কর্ত্তে পার, আমাদের তাতে বড় একটা কিছু যাবে আসবে না; দশটার দশা যা হয়েছে, এটারও তাই হবে। তবে অল্পবিশ্বাসী লোকগুলো দিন কতক মিথ্যা ভ্রমে পড়ে হাবু ডুবু খাবে, তার জন্যে সেখানে গিয়ে তোমাদেরই লগুড় খেয়ে মর্ত্তে হবে।" বাস্তবিক সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগকে মিথ্যা ভ্রান্তিতে ফেলার মত অপরাধ আর নাই। যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা সহজ বিশ্বাসে প্রাণে শান্তি পাইবে; কিন্তু যাহারা তাহাদিগের মনে মিথ্যা সংস্কার সঞ্চার করিবে, তাহাদিগকে যে তজ্জন্য বিলক্ষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

১। রামকৃষ্ণপন্থী ভাইদের প্রথম কল্পনা শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং আমাকে তাঁর স্বর্গারোহণের কয়দিন মাত্র পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "তুমি তো সেই আচার্য্য গো, বলো; শালারা আমাকে বলে কিনা, আমি ঈশ্বর। শালাদের বুঝিয়ে বলত, ঈশ্বর কি কখনও গলার ঘায় মরে?" একথা আমি স্বকর্ণে তাঁর শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ইহার অর্থ, তিনি যে ঈশ্বর নন, বা হইতে পারেন না, তাহাই ত তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। যিনি ঈশ্বর, তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না।

যদি কাহাকেও ভাবাবেশে অন্য ভাবের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হয় ত তাঁর অদ্বৈতবাদ বশতঃ যোগাবস্থায় বা ভাবাবেশে বলিতে পারেন। যোগাবস্থায় প্রত্যেক সাধকই তেমন আত্মহারা হইতে পারেন। কেশবচন্দ্রও যোগাবস্থায় বলিয়াছেন, "ঈশ্বরকে দেখ নাই? আমাকে দেখিলেই হইবে, এক পদার্থে দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে।"

২। পরমহংসপন্থী বন্ধুদিগের দ্বিতীয় কল্পনা, শ্রীকেশবচন্দ্রের মাতৃভাব সাধনের শিক্ষাগুরু রামকৃষ্ণপরমহংস।

ইংরাজী ১৮৭৫ সনের মার্চ্চ মাসে রামকৃষ্ণদেব বেলঘরিয়ার তপোবনে গিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচয় করেন। তাহার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেবকে কেশবচন্দ্র চিনিতেনও না, তাঁহার নাম-প্রসঙ্গও জানিতেন না। রামকৃষ্ণ বরং কেশবচন্দ্রের পরিচয় পূর্ব্ব হইতে পাইয়া একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার মনের ফাত্‌না যে ব্রহ্মেতে ডুবিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই ছেলেটার ফাত্‌না ডুবেছে।"

ঈশ্বরকে মাতৃনামে সম্বোধন ব্রাহ্মসমাজে বহুদিন হইতেই সময়ে সময়ে হইয়া আসিয়াছে। নিম্নলিখিত সঙ্গীতের অংশ তাহার প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

১। "জননীর কোলে বসি, কেন রে অবোধ মন, করিছ রোদন।" ২। "কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।" ৩। "জগত জননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ।" ৪। "স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্রকন্যাগণে

দ্বারে, বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে।" ৫। "চরণ দেহি মাগো কাতর জনে।" ইত্যাদি।

কেশবচন্দ্রও ১৭৯৪ শকের ১৪ই মাঘ, ব্রাহ্মিকাগণের প্রতি যে উপদেশ দেন, তাহাতেও "পরম মাতা যে কন্যাগণের জন্য আকুল" তাহা স্পষ্ট ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমহংসদেবের সহিত দেখা হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বেও মাঘোৎসবে যে উপদেশ দেন, তাহাতেও বলিয়াছেন, "মাকে যদি না দেখিলে, তবে যে তোমরা মাতৃহীন।" "মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন।" "আমাদের জননী কেমন, তাঁহাকে চিনিয়া, তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া, অনন্তকাল তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইতে পারিব; কতকাল আর তোমরা এই বলিয়া ক্রন্দন করিবে, মা নিকটে।" "মাকে না দেখিলে যে আর সুখ নাই।" "যে একবার মাকে দেখিয়াছে, সে পাগলের মত হইয়াছে।"

এই সকল উক্তি দ্বারা কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না যে, ঈশ্বরের মাতৃভাব স্বাভাবিক ভাবে মাই স্বয়ং নববিধানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের প্রাণে আপনিই প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছিলেন।

আশ্চর্য্য বিধাতার অনির্ব্বচনীয় বিধান! নিরাকার পরব্রহ্ম নবযুগধর্ম্ম যেমন ক্রমে ক্রমে কেশব-জীবনে পরিস্ফুট করিলেন, তেমনি তিনিই স্বয়ং ক্রমে দয়াময় হরিরূপে, তাহার পর মাতৃরূপে প্রকট হইয়া, বিধানের নব নব অভিব্যক্তি কেশবের নিকট প্রকাশ করিলেন। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত্তদ্-ভাবসম্পন্ন সাধক ভক্ত ব্যক্তিদিগের সহিতও তাঁহার আত্মিক যোগ সমাধান করিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত যোগ, গাজীপুরের পওহারী বাবার সহিত যোগ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিতও যোগ এমনই এক এক সাধনের অবস্থায় তাঁহার হইয়াছিল। সুতরাং কালীভক্ত রামকৃষ্ণের নিকট হইতে ঈশ্বরের মাতৃভাব যে তিনি ধার করিয়া লইয়াছেন, বা তাঁহার কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন, ইহা সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত মিথ্যা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হইতে পারে, ভাবের ভাবুক লোক পাইলে ভাবরাজ্যের ভাব যেমন স্বভাবতঃ বাড়িয়া যায়, সাধক মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন, তেমনি মাতৃভাব-সাধক পরমহংসের সহিত বিধাতার কৌশলে তখনই মিলন হইল, যখন কেশবের ভিতর সেই ভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং পরস্পরের সহিত ভাব-বিনিময়ে উভয়ের ভাবোচ্ছ্বাস আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র ও শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র যে লিখিয়াছিলেন, "পরমহংসের জীবন হইতে ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে অনেক পরিমাণে উদ্দীপিত হইয়াছিল," ইহার অর্থ এই নয় যে, একাইক তাঁহা হইতেই শিক্ষা হইয়াছে। এই কথা লইয়া আমাদের বন্ধুরা কতই রং চং দিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাই গিরিশচন্দ্রই প্রথম পরমহংসের উক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং তাহাতে তিনিই ত বলিয়াছিলেন, "পরমহংস দ্বারা আচার্য্যদেব, আচার্য্য দ্বারা পরমহংস দেব জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। * * পরমহংসও আচার্য্যের জীবনের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন, ধর্ম্মের উদারতা ও কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার নিয়ম নিষ্ঠা লাভ করেন।"

এইরূপে উভয়ে উভয়ের ভাবগ্রাহী ছিলেন, ইহাই সত্য কথা। তাহা ছাড় রামকৃষ্ণ যাঁকে মা বলিয়া পূজা করিতেন, কেশবের মা সে মা নন। রামকৃষ্ণ মৃন্ময়ী চৌদ্দপোয়া কালী-মূর্ত্তিকে মা বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট স্বয়ং নিরাকার পরব্রহ্ম চিন্ময়ী মাতৃরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া, তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতে শিখাইয়াছেন। কোন মানুষ তাঁহাকে শেখান নাই। সুতরাং কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের নিকট মাতৃভাব শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহার ন্যায় মিথ্যা অলীক কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

বরং কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে যে নিরাকার মাতৃরূপ দেখিতে রামকৃষ্ণ শিখিয়াছিলেন, ইহা তিনি নিজে আমার সম্মুখেও স্বীকার করিয়া, কেশবকে সরল ভাবে বলিয়াছেন, "কেশব, তোমার কাছে এলে আমার চৌদ্দপো মা গলে যায়।" একথা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। কে ইহার প্রতিবাদ করিবে? কেশবের সংস্পর্শে তাঁর মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হন, ইহাই কি এই উক্তির অর্থ নয়?

সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

স্বর্গীয়া দুর্গামণি দেবী।

(১০ই জুন, বালেশ্বরে, শ্রাদ্ধবাসরে, জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ত্তৃক পঠিত)

যে বংশে আমাদের প্রপিতামহী জন্মিয়া ছিলেন, সেই বংশেই আমাদের মা দুর্গামণি জন্ম গ্রহণ করেন। বালিকাবস্থায় হিন্দু পরিবারের প্রথানুযায়ী তিনি সমস্ত বার ব্রতাদি পালন করিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তখন বাবার বয়স ১৯ বৎসর। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ পিতার প্রাণে সবে মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় গিয়া, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মধুর আস্বাদ লাভ করিয়া, পাপের কুদৃষ্টি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরে গুটিকতক সহপাঠীকে লইয়া বালেশ্বরে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে মা তাঁর সহধর্ম্মিণী রূপে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেন। মা যে ঘরে এলেন, সেখানেও যে বার ব্রত এবং পৌত্তলিকতার প্রভাব কিছু কম ছিল, তা নয়। এখনও তাহা সে বাড়ীতে পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। কাজেই মার বার ব্রতগুলি উৎকর্ষ লাভের খুব সুযোগ পাইয়াছিল সে কালে বাবা তাঁর পিতা এবং পিতৃব্যদের মধ্যে সর্ব্ব জ্যে

সন্তান ; তাই মা যখন আমাদের বাড়ীতে বধূরূপে প্রথমে প্রবেশ করেন, তখন তিনিই এ বাড়ীর একমাত্র বধূ এবং সবারই বড় আদরের। তাঁর দিদিশাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী এবং পিশিশাশুড়ীগণ যেমন তাঁহাকে আদর করিতেন, তেমনি কুসংস্কারজড়িত ব্রতাদির নিয়মলঙ্ঘনের তিল মাত্র ত্রুটি সহ্য করিতে পারিতেন না। কাজেই মা প্রভুভক্ত দাসীর ন্যায় ঐ সমস্ত ব্রতাদি পালন করিতে করিতে, তাহাতে একেবারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে বাবার মস্তকে তখন জাতিভেদ, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার দৃঢ় সংকল্প জাগিয়া উঠিতে ছিল। তিনি তার সহকর্ম্মীদের মধ্যে নেতা ছিলেন ; তাঁহাকে কিরূপভাবে এগিয়ে যেতে হবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যে দোসরের সঙ্গে যুক্ত হইলেন, তাঁহা দ্বারা তাঁর কাজে বড়ই ব্যাঘাত জন্মিল। মা গোড়ায় তাঁর দোসর বা সহধর্ম্মিণী না হইয়া নিগড়রূপে তাঁহাকে ভারগ্রস্ত করিলেন। বাবার অবস্থা বহুকাল পর্য্যন্ত যে সংকটাপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেবল যুগপ্রবর্ত্তকগণের ইহা অনুমেয় ; অন্যে কি বুঝিবে। প্রথমাবস্থায় গোপা যেরূপ গৌতমের এবং বিষ্ণুপ্রিয়া যেরূপ চৈতন্যের ছিলেন, আমাদের মা সেরূপ প্রথমাবস্থায় বাবার বিরুদ্ধমতাবলম্বিনী ছিলেন। সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্যের কথা বলি না। তাহাতে ত মার ভাগ্যে কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। সাজ সজ্জায়, বেশ ভূষায়, কি অলংকারে, কি বিভবে, কি পুত্র কন্যায়, তিনি কোন বিষয়েই হীনা ছিলেন না ; কিন্তু ধর্ম্ম-জীবনে গোড়ায় তিনি বাবার সঙ্গে সমান পদ-বিক্ষেপে চলেন নাই। এমন কি, সময় সময় বিপরীত দিকে গিয়াছেন। সেজন্য বাবাকে মাঝে মাঝে বাধা পাইতে হইয়াছে। পরবর্ত্তী জীবনে নিশ্চয় মার মনে অনুতাপ আসিয়াছিল, যার জন্য তিনি তাঁর চিরাভ্যস্ত সমস্ত কুসংস্কার ও ব্রতাদি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সময় আসিল, যখন তিনি উপাসনাশীলা হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বাবার উপাসনায় যোগ দিয়া তাঁর উপাসনাকে সরস করিয়া গিয়াছেন। বৃহৎ পরিবারের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া যখন তিনি এক এক কুসংস্কারকে দূরে সরাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে কম নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। বাড়ীর বর্ষীয়সী কিম্বা সমবয়স্কা মহিলাদিগের নিকট নির্য্যাতিত হইলে তিনি চোখের জলে ভাসিয়া সারা হইতেন। বাবার কাছে অভিযোগ করিয়া তার কোন ফল পাইতেন না। বাবা কখনও কাহাকেও কিছু মুখ তুলিয়া বলিতে পারিতেন না। মহিলাদের মধ্যে কেহবা তাঁর পূজনীয়া, কেহবা স্নেহের পাত্রী ছিলেন ; তাই সে অবস্থায় মায়ের দৃশ্য বড়ই করুণ হইত। যাহা হউক, বাবার উপদেশে উপদিষ্টা হইয়া সব নির্য্যাতন সহ্য করিতে শিখিলেন এবং পাথরে হৃদয় বাঁধিয়া, ঐ অদূরবর্ত্তী দ্বিতল অট্টালিকায় স্বীয় বাস-প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া, বাবার সহিত এই ভগ্ন আশ্রমে শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমলক্ষ্মীর স্থান অধিকার করিলেন। আজ এই গৃহ আমাদের সেই সাধ্বী জননীর দেহত্যাগে পবিত্রীকৃত। তিনি লজ্জাশীলা ও সুবিনীতা ছিলেন। তাঁর চাল চলনে কখনও কেহ দোষ ধরিতে পারে নাই। তিনি এবাড়ীর দৃষ্টান্তস্থানীয়া ছিলেন। তিনি ছয় পুত্র ও চারি কন্যার মাতা ছিলেন। মৃত্যুকালে চারি পুত্র, এক কন্যা এবং ২০।২১টী নাতি নাতনি রাখিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বোপরি তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামীর সম্মুখে পক্ক কেশে সিন্দুর পরিয়া হাসিতে হাসিতে ও সকলকে হাসাইয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাই তিনি সৌভাগ্যবতী ও ধন্যা।

জীবনে তিনি কয়েকটী মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া ছিলেন। প্রধানতঃ পুত্র শরচ্চন্দ্রের বিয়োগে এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা সুমতির পরলোকগমনে। এই দুই শোক তিনি সহজে ভুলিতে পারেন নাই। সুমতি যখন মারা যায়, তাহার সন্তান সুকুমার তখন তের দিনের হইয়াছিল। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত সুকুমার এ বাড়ীতে তাঁর আদরে লালিত পালিত। হায়, আজ সুকুমার দ্বিতীয়বার মাতৃহারা!

আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, তিনি শয্যাশায়ী হন। তাঁর চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছিল। বিছানাতেই খাওয়া ও নিত্যকৃত্যাদি সমস্তই হইত। সময় সময় কেহ দয়া করিয়া তুলিয়া লইয়া গেলে তিনি ভিতর বারান্দায় গিয়া বসিতেন। এই ভাবেই সকলের খাওয়া দাওয়া এবং সাংসারিক খুঁটি নাটী নানা প্রকার কাজ কর্ম্মের তদারক করিতেন। তাঁর এরূপ অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, এই রোগ-শয্যায় থাকিয়াও তাঁর চক্ষু কর্ণ বাহিরের সাড়া লইতে চেষ্টা করিত। সেই অবস্থায় যখন তিনি জানিতেন যে, কেহ অভুক্ত আছে বা কোন কার্য্যের বিশৃংখলা হইয়াছে, তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিতেন, বাবা ঐ চীৎকার শুনিয়া কম্পিত পদবিক্ষেপে তাঁর কাছে যাইতেন এবং তাঁর অনুরোধ যাহাতে কাজে পরিণত হয়, তার উপায় করিতেন।

দীর্ঘ ৬১ বৎসর কাল তিনি তিল তিল করিয়া তাঁর রক্তবিন্দু এ বাড়ীর সেবায় ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। যে দিন তাঁর দেহান্ত হয়, তখন তাঁর শরীরে কিছুই ছিল না। কেবল অস্থি-চর্ম্মসার। সতের দিন হই পৃষ্ঠব্রণের জ্বালায় বড়ই বিকল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ব্রণের ব্যাস প্রায় আট ইঞ্চি ছিল। তাহা সমস্ত পিঠ জুড়িয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি মারাত্মক ব্যাধির যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছেন, এবং কাউকে সেজন্য ব্যস্ত করিয়া তুলেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সহজ ও সরল কথার জন্য কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, তাঁর মহাযাত্রার সময় খুব নিকট হইয়া আসিয়াছে। ৩১শে মে, ১৯৩১, রবিবার, প্রায় ৪টার সময়, তিনি নশ্বর দেহের সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া চিন্ময়ীর শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করেন।

আজ মা আমাদের নাই। তিনি আমাদিগকে কাঁদাইয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি সত্যই আমাদের বড় ভাল মা। তিনি জয় লাভ করিয়াছেন। ঐ দেখুন, তাঁর হাসি কোথায় ফুটিয়াছে!

প্রতাপচন্দ্রের সাম্বৎসরিক।

গত ২৭শে মে, বুধবার, প্রেরিত-প্রবর স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্বর্গারোহণ দিনে শান্তিকুটীরে পূর্ব্বাহ্ণে ৭॥টার পর উপাসনা হয়। অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ এম, এ, উপাসনার কার্য্য করেন। প্রতাপচন্দ্রের পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী স্বামীর পবিত্র স্মৃতি-মাখা যে শয্যায় অল্পদিন পূর্ব্বে গভীর রজনীতে দুর্বৃত্ত নরঘাতক দস্যুর আক্রমণে আকস্মিক ভাবে ৮৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন, সেই শয্যার সম্মুখে উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মণ্ডলীর পুরুষ মহিলা অনেকে শ্রদ্ধার সহিত এ অনুষ্ঠানে যোগ দান করেন।

উদ্বোধনের মধ্যে বিশেষ ভাবে এই কয়েকটী কথা উল্লিখিত হয়। এই স্থান ঋষি আত্মা প্রতাপচন্দ্রের সাধন-ক্ষেত্র, এখানে বসিলেই উপাসনার ভাব সহজেই অন্তরে স্ফুরিত হয়, উদ্বোধনে বেশী কথার প্রয়োজন হয় না। গত বৎসর এই দিনের প্রায় এক মাস পরে এই গৃহ হইতে সাধু আত্মা প্রমথলাল চলিয়া গিয়াছেন; তৎপর এই মণ্ডলী হইতে আরও আমাদের কত শ্রদ্ধাস্পদ, শ্রদ্ধাস্পদা ও অতি আদরের পুরুষ মহিলা চলিয়া গিয়াছেন। মণ্ডলীর অন্নপূর্ণা দেবী, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, অতিবৃদ্ধ জগন্মোহন বীর, উমা দেবী প্রভৃতি চলিয়া গেলেন; তারপর এই তো সে দিন প্রতাপচন্দ্রের পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী, আমাদের মাতৃস্থানীয়া পূজনীয়া সৌদামিনী দেবী এই গৃহ হইতে কি শোকাবহ আকস্মিক মৃত্যুর ভিতর দিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। মণ্ডলী-জীবনের আকাশ তাই ঘন কালিমায় আচ্ছন্ন। বিশেষ বিশ্বাস-দৃষ্টি ভিন্ন কি এই ঘন কালিমা ভেদ করিয়া, আমরা সেই অক্ষয়ধামের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারি? না, সেই পরলোকগত দেবাত্মাদের সঙ্গে মিলিত হইতে পারি? শুনিয়াছি, কোন সময় স্বর্গগত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে প্রতাপচন্দ্র পাটনা প্রদেশে বেড়াইতে ছিলেন; গুরুদাস বাবুকে প্রতাপচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, এখন মণ্ডলীর বিশেষ অভাব কি? গুরুদাসবাবু কোন উত্তর দিলেন না। পরে প্রতাপচন্দ্র বলিলেন, এখন মণ্ডলীর বিশ্বাসের বিশেষ অভাব। বিশ্বাসই যে ধর্ম্মের মূল, বিশ্বাস-বলে ধর্ম্ম-পথে অসম্ভব সম্ভব হয়। আসুন, আমরা লীলাময়ী পরমজননীর শরণাপন্ন হই। তিনি আজ আমাদিগকে সেই বিশ্বাস-দৃষ্টি খুলিয়া দিন, যে দৃষ্টিতে এই মৃত্যুর ঘন কালিমা ভেদ করিয়া, আমরা পরলোকের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া এবং পরলোকগত দেবাত্মাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধন্য হইতে পারি।

আরাধনা অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হয়। সমস্বরে প্রার্থনার পর, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, প্রতাপচন্দ্রের জীবন ও তাঁহার লেখা ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্ম-সাধন ও ব্রহ্মগত জীবন-যাপনে আমাদিগকে কত সহায়তা করে, তাহা উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। মাতৃ-স্তোত্র ও কয়েকটী শ্লোক-পাঠের পর "আশীষ" গ্রন্থ হইতে "অক্ষর-ধাম" ও আচার্য্যদেবের "পরলোকগৃহ" প্রার্থনা পঠিত হয়। তৎপর অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ নববিধানের লীলাতত্ত্ব, ব্রহ্মদর্শনের বিচিত্রতা, এবং বিশেষ ভাবে প্রতাপচন্দ্রের জীবনের বিশেষ বিশেষ দিক ও স্বামীর ভাবের অনুগমনে সতী দেবী-আত্মা সৌদামিনীর পরলোকগমন বেশ প্রাণস্পর্শী ভাষায় উল্লেখ করিয়া প্রার্থনানন্তর উপাসনা শেষ করেন। তাঁহার প্রার্থনার পর শ্রীমতী হেমলতা চন্দ প্রার্থনা করিলে সঙ্গীতের পর এবেলার কার্য্য শেষ হয়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন সময়োপযোগী কয়েকটী সঙ্গীত করেন।

অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষের আত্মনিবেদন হইতে কয়েকটী বিশেষ কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। তিনি নববিধানতত্ত্ব বলিতে গিয়া মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ধর্ম্মের Evolution, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের জীবনে ধর্ম্মের Revolution বিশেষ উল্লেখ করেন। মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুত্থান, কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের জীবনে ধর্ম্মের যুগান্তর। ঈশা-জীবনের বিশেষ ভাব Conscienceএর ভিতর দিয়া যখন ঈশ্বরের বাণী কেশব ও প্রতাপচন্দ্রে সমাগত হইল, বিবেকের যোগে যখন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের ঝড় বহিতে লাগিল, তখন Revolutionএর ধর্ম্ম প্রবল হইল, যুগ-পরিবর্ত্তনের ব্যাপার, আমূল পরিবর্ত্তনে নূতন গঠন তাঁহাদের জীবনে আরম্ভ হইল। আমূল পরিবর্ত্তনে নূতন গঠন ব্যাপার বিবৃত করিতে যাইয়া ভট্ট মোক্ষমূলার ও প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে যে লেখা লেখি হয়—তাহার মর্ম্ম এই রূপে উল্লেখ করা হয়:—ভট্ট মোক্ষমূলার প্রতাপচন্দ্রকে লিখেন, আপনারা খৃষ্টভাবের অথবা শ্রীঈশার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, আর কিছু অগ্রসর হইলেই আপনাদের পূর্ণ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হইতে পারে। তাহার উত্তরে প্রতাপচন্দ্র লিখিলেন, এদেশে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে দুইটী পক্ষ দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে দুই ভাবের দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। এক পক্ষ বলিতেছেন, ভারতে যে ধর্ম্মধারা প্রবাহিত হইয়া অতীত ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছে, বর্ত্তমান যুগের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; মানবাত্মার কল্যাণের জন্য, পরিত্রাণের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। অন্য পক্ষ বলিতেছেন, ভারতের প্রাচীন যাহা কিছু সব বিলুপ্ত করিয়া দেও, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-পূর্ণ খৃষ্ট-সভ্যতা ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম ভারতের পরিত্রাণের জন্য গ্রহণ কর। আমরা ইহার মধ্য পথ আশ্রয় করিয়া প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দিকের যাহা কিছু

ভাব সকলই গ্রহণ করিয়া, এক নূতন সাধন ও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছি; আমরা কোনটীকেই উপেক্ষা করিতে পারি না।

নববিধানে ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে আত্ম-নিবেদনে বলা হয়, ঋষি ভাবে ব্রহ্মদর্শন গ্রহণ করা হইল, তাহাতে আত্মার পূর্ণ তৃপ্তি হইল না; তাহার সঙ্গে মুঙ্গেরের ভক্তি-বন্যায় হরিভক্তি মিলিত করিয়া সাধনাকে সরস ও মধুর করা হইল, তাহাতেও পূর্ণতৃপ্তি হইল না; অবশেষে নববিধানে মাতৃভাব, মাতৃসাধন আসিয়া, সাধনাকে, ধর্ম্মকে মধুর হইতে সুমধুর করিয়া, ব্রহ্ম-দর্শনের উচ্চ পূর্ণতা সম্পাদন করিল।

প্রতাপচন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। কেশব-চন্দ্র হইতে প্রতাপচন্দ্র ক্রুশ বহনে খ্রীষ্টের ধর্ম্মভাব বিশেষ সাধন করিয়া, খৃষ্টধর্ম্মকে ও খৃষ্ট জীবনকে নববিধান-ক্ষেত্রে বিবৃত করিবার ভার প্রাপ্ত হন। প্রতাপচন্দ্র জীবনের সে ব্রত অতি সুন্দর ভাবে উদ্‌যাপন করেন। ধর্ম্মবন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, খৃষ্টের ক্রুশ বহন করিতে করিতে, একাকী নবধর্ম্ম-পথে স্থির থাকিয়া, আপনার কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া গেলেন। এই নূতন মণ্ডলীতে অনেকে দলভ্রষ্ট হইয়া নব সাধনার পথ ছাড়িয়া দেন। কেবল অল্প কয়েক জন, দল তাঁহাদিগকে ছাড়িলেও, নব ধর্ম্মে শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকেন। প্রতাপচন্দ্র শেষ জীবনে একাকী থাকিয়াই, উচ্চ সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন, উচ্চ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত নবধর্ম্মে অটল রহিয়াছেন। তাঁহার যোগ্যতমা সহধর্ম্মিণীও পতির অনুসরণে একাকিত্বের জীবন যাপন করিয়া, পতির ক্রুশ-সাধন ধর্ম্মটীকে প্রাণে বরণ করিয়া লইয়া, মহাপরীক্ষার ভিতরে দৈহিক জীবনে তাহা উদ্‌যাপন করিলেন।

নির্জ্জনতা-প্রিয়া তপস্বিনী সৌদামিনী।

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে "দেবী সৌদামিনীর আকস্মিক লোমহর্ষণ মৃত্যুতে আমাদের শিক্ষা" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, ভিতরে প্রত্যাদেশ-জনিত যে ভাব আসিয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছে, তাহার একটু চিত্র না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রত্যাদেশ-পরিচালিত লেখকের লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধটী বাস্তবিকই প্রত্যেক বিধান-বিশ্বাসীর হৃদয়ের অন্তস্তলকে স্পর্শ করিয়াছে। যে অবস্থায় দেবী সৌদামিনী লোক-চক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে আত্মদান করিয়াছেন, তাঁহার সে অবস্থার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে দ্বিতীয়া সৌদামিনীর প্রয়োজন। সাধনশীলা সৌদামিনী নির্জ্জনতাকে বাস্তবিকই তাঁহার সাধন-পথের সঙ্গিনী করিয়া, চিরদিনই চলিয়া আসিতে-ছিলেন। সন্ন্যাসিনীর সন্ন্যাস-ব্রত সহজ ধর্ম্ম নহে। হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী হিমালয়ের নির্জ্জন পথে বিচরণ করেন। তিনি সেই ভয়াবহ দুর্গম স্থানে কোনরূপ প্রাণের আশঙ্কাকে হৃদয়ে স্থান দান করিতে পারেন না। তাঁহার গভীর চিন্তা তাঁহাকে কোথায় লইয়া যায়, তাহা কে বলিবে? দেবী সৌদামিনী এই পথের পথিকা ছিলেন। এভাব তাঁহার ভিতরে সংক্রামিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি ভক্ত ব্রহ্মানন্দের নির্জ্জন সাধন-পথ অধ্যয়ন করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই কলুটোলায় বাসের সময় হইতে তাঁহার সে সুযোগ আসিয়াছিল। পঞ্চ-পঞ্চাশত্তমবর্ষ পূর্ব্বে আমি যখন কলিকাতায় গুড়াগির্জ্জায় বিখ্যাত-নামা স্বর্গগত রমানাথ কবিরাজ মহাশয়ের আবাসে বাস করিতাম, তখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই, অথচ ব্রহ্মা-নন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি একটা প্রগাঢ় ভক্তি হৃদয়ে জাগিতেছিল। কেবল ব্রহ্মমন্দিরে সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতাম, তাহা নহে, কলুটোলার বাড়ীতে ত্রিতল প্রকোষ্ঠে ভক্ত ব্রহ্মানন্দকে নির্জ্জন কুটীরে গভীর চিন্তায় মগ্ন অথবা লেখনী ধারণ করিয়া নিবিষ্ট মনে প্রবন্ধাদি লিখিতে দেখিয়াছি। ব্রহ্মানন্দের সে নির্জ্জন সাধনার পথ এখনও সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। নির্জ্জনতা-প্রিয়া সৌদামিনী কেবল সেই নববিধানাচার্য্যের পথই দেখিলেন, তাহা নহে, কেশব-পথের পথিক স্বামী প্রতাপচন্দ্রের ভিতরেও সে পথের আভাস দেখিতে পাইলেন। প্রতাপচন্দ্রও তাঁহার সাধন কুটীরে নির্জ্জন সাধন করিয়াছিলেন। শান্তিকুটীরে অবস্থান কালে তিনি একাকী নিকটবর্ত্তী কোলাহল-শূন্য আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রত্যূষে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। সেই ভ্রমণের সময়েও তাঁহার ভিতরে নির্জ্জন চিন্তা আসিয়া অধিকার করিত। কুটীরে প্রত্যা-গত হইয়া সেই যে নির্জ্জন কুটীরে যখন লেখনী লইয়া বসিতেন, তখন তাঁহার সে প্রকোষ্ঠে দেবী সৌদামিনীও প্রবেশ করিতেন না। হিমালয়-বক্ষে প্রতাপচন্দ্রের "শৈলাশ্রমও" এই নির্জ্জন চিন্তার কুটীর রূপে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার এই নির্জ্জন সাধন হইতেই তাঁহার "Heart-Beats", "Silent Pastor" প্রভৃতির অভ্যুদয়। দেবী সৌদামিনীর ভিতরেও এইরূপ নির্জ্জন সাধনের পথ জাগিয়া উঠিয়াছিল। ভক্ত স্বামীর তিরোধানের পর এভাব তাঁহার ভিতরে আরও বিশেষ রূপে জাগিয়া উঠে। ভক্ত স্বামীর উপাসনা-কুটীরে ও তাঁহার শয়ন-গৃহে, তাঁহার সমস্ত ভাবের মধ্যে ও তাঁহার প্রাত্যহিক সংসৃষ্ট বস্তু সমুদায়ের ভিতরে একাকিনী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় সময় কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার এভাব ও নির্জ্জনতার উপর কে আঘাত করিবে? শান্তিকুটীরের আশ্রমে আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনী হইয়া আপন আপন কক্ষে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই দেবী সৌদামিনীর এই উচ্চ ভাবের প্রতি সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। এক্ষেত্রে তাঁহারা অনন্যোপায়। এক্ষেত্রে তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন না। দেবী সৌদামিনীও তাঁহার সাধন-পথকে অতিক্রম করিতে পারিতেন না। ম্যাডাম্ গায়ন্ তাঁহার নির্জ্জন বাস ও নির্জ্জন সাধন অতিক্রম করিতে পারিতেন না। হেরড্, রাজার ভয়

মহর্ষি ঈশাকে সত্য হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। হাসন হোসয়ন প্রাণের গভীর আশঙ্কা সত্ত্বেও সতর্ক হইতে পারেন নাই। নববিধান-ভক্ত বলদেব প্রাণের আশঙ্কা সত্ত্বেও সত্য-প্রচারের পাগলা ও তুরস্ক দেশে যাত্রা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। "উপরসে হুকুম আয়া, কাম্ কেয়া করেগা" এই মহামন্ত্র লইয়া, সেই বন্ধু-শূন্য ইস্‌লামবাদীদিগের ভিতরে বলদেব আত্মদান করিলেন। ভক্ত প্রতাপচন্দ্রও তাঁহার ধর্ম্মাচার্য্যের উচ্চ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, জীর্ণ ও শীর্ণ দেহে নববিধান-প্রচারে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। এই সমস্ত উচ্চ দৃষ্টান্তের ভিতর দেবী সৌদামিনী কি করিতে পারিতেন? সাধনাকে লইয়া তিনি তাঁহার সাধনকুটীরে লোক-চক্ষুর অজ্ঞাতসারে শত্রুহস্তে আত্মদান করিলেন। সাধন-পথের পথিকগণ কোন্ মন্ত্র লইয়া চলেন? "He that loveth his life, shall lose it." এ পথের পথিকগণ কি এ মন্ত্র ছাড়িতে পারেন? যাঁহারা আপন জীবনকে ভালবাসেন, তাঁহারা তাঁহাদের সে জীবন হারাইবেন। দেবী সৌদামিনী সত্য সত্য ঠাকুর তলায় হত্যা দিয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ব্বেই যাঁহার পার্থিব বাসনা ও আসক্তি হত হইয়াছিল, তাঁহাকে আবার কে হত্যা করিবে? উচ্চ বিশ্বাসী শরীর থাকিতেও হত। তিনি সেই হতভাব লইয়া ঠাকুরতলায় হত্যা দিয়া ছিলেন। দেবী সৌদামিনী সত্য সত্য সেই হত্যা-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া সেই ধর্ম্মের উদ্‌যাপন করিয়াছেন। হিন্দুগণ "নিয়তি" বিশ্বাস করেন। এ বিশ্বাস সহজ নহে। বিধাতার নিয়মের উপর যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসই "নিয়তি"। আবার বলিতেছি, এ বিশ্বাস সহজ নহে। তাঁহার বিধানের উপর অটল ও অবিচলিত বিশ্বাস! ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ! এ বিশ্বাসকে হাওয়ার মত চঞ্চল বস্তু বলিয়া মনে করিও না। যে ভাবে দেবী সৌদামিনী আত্মদান করিলেন, সে দৃষ্টান্ত কোথায়? এ ঘটনার জন্য তিনিও অপরাধী নহেন এবং অপর কেহও অপরাধী নহে। হত্যা-ধর্ম্মাবলম্বিনী দেবী সৌদামিনী আজ মহা হত্যা-ধর্ম্ম ও মহা নিয়তির উচ্চ দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেলেন এবং সেই দেবলোকে ব্রহ্মানন্দ, দেবী জগন্মোহিনী ও প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। তিনি দেহ-মুক্ত ও চির সমাহিত। স্বর্গে তাঁহার অক্ষয় বাস।

উপসংহারে আমার এই ভাবের উপর আমাদিগের বর্ষীয়ান্ ও ভক্তিমান্ সমবিশ্বাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বলরাম সেন মহাশয়ের পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শান্তিকুটীরের ঘটনা হইতে তাঁহার সঙ্গে এ সম্বন্ধে ভাবের বিনিময় চলিতেছিল। তাহার পর বিগত ১২ই জুন তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"Your card of 5th instant was duly received. The unexpected and heart-rending events may some time darken the brightest faith. These changes in the worldly affairs may threaten the material man but not the spiritual. Who can understand the kind dispensation of the Father in the crucifixion of Christ, poisoning of Socrates and burning of the saints? 'Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword separate us from the love of God? I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God.'—(Rom VIII.)

'Does not purification consist in separating as much as possible the soul from the body and to dwell as far as it can, both here and hereafter with the supreme Soul? Is not death the deliverance of the soul from the shackles of body? May God bless her relieved soul to continue her search after the Supreme Beatitude."

বিধান-বিশ্বাসী ভক্তিমান্ বলরামবাবুর পত্রখানি ও বাইবেল হইতে উদ্ধৃত অংশটুকু বাস্তবিকই সময়োপযোগী হইয়াছে। নববিধান আসিয়া বাস্তবিকই এই ঘটনায় আমাদিগকে এক উচ্চ শিক্ষা বিধান করিলেন। ইহার উপর এ ঘটনায় আমাদিগের কোন্ অভিযোগ উপস্থিত হইবে? ভগবৎ-বিশ্বাস ভিন্ন আমাদিগের পরিত্রাণ নাই। বিধান-জননী তপস্বিনী দেবী সৌদামিনীকে তাঁহার স্বর্গস্থ শান্তিকুটীরে স্থান দান করিয়াছেন। আমরা এখানে প্রার্থনা করিতে থাকি। তাঁহার কৃপায় তিনি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন।

নামকুম পোঃ, রাঁচি; ১৪।৬।৩১। } প্রণত—সেবক শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সাধু হীরানন্দ।

(বৌদ্ধবিহারে ১৪ই জুলাই, ১৯২৬, প্রদত্ত বক্তৃতার সার)

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, মাতৃগণ ও মাননীয় বন্ধুগণ! প্রায় ৩০ বৎসরের কথা, আজকার দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে, সাধু হীরানন্দের শবদেহ কাঁধে করিয়া পাটনার গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়াছিলাম। সে স্মৃতি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল হয়ে, এই গৃহের বৈদ্যুতিক আলোক-মালার ন্যায় প্রদীপ্ত হয়ে, হৃদয়ে ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠ্‌ছে! সাধু হীরানন্দের জীবনের মূলে ছিল এক সাধনা, এক কঠোর তপস্যা; সেই সাধনার সিদ্ধি জীবনের নানা দিক দিয়ে ফুটে উঠে ছিল। মানুষ যে কাজই করুক, ধর্ম্মই হ'ক, ব্যবসায়ই হ'ক, আর রাজনীতিই হ'ক, তার মূলে যদি কাজের উপযোগী সাধনা না থাকে, তাহলে তাহা কখনই সার্থক হবে না। এই গৃহে যাঁর অসংখ্য ছবি দেখছি, সেই বুদ্ধদেব কত কঠোর সাধনার পর নির্ব্বাণ পেলেন।

আজ তিনি কেবল বাঙ্গলা দেশের রাজা নহেন, পরন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের, সমস্ত পৃথিবীর রাজা। আজ তাঁর গৌরবে পৃথিবী পরিপূর্ণ। মহর্ষি ঈশার জীবনের মূলে যদি সাধনা না থাকত, তা'হলে আজ পৃথিবী জুড়ে তাঁর গৌরব ছড়িয়ে পড়ত না। আপনারা শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের নাম শুনেছেন, তাঁকে আপনারা রণ-দুর্দ্দম বীর বলেই জানেন, তাঁকে আপনারা প্রবল পরাক্রান্ত সৈনিক পুরুষ বলেই জানেন ; কিন্তু তা নয়, তিনি একজন সাধক ছিলেন। যমুনার তীরবর্ত্তী দুর্গম গিরিময় প্রদেশে গিয়া বিশবৎসর কাল কঠোর তপস্যার ভিতর মগ্ন ছিলেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট একদিকে বেদ পাঠ করতে লাগলেন, অন্যদিকে আরবী ভাষায় মৌলবীর নিকট কোরাণ পাঠ করতে লাগলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস, পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানের ইতিহাস, মিসর ও পারশ্যের ইতিহাস পাঠ করতে লাগলেন। ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়া কেমন করে জাতির উত্থান পতন সংঘটিত হয়েছে, তার তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। শিখজাতির ধর্ম্মরক্ষা করাই তাঁর সাধনের মূল, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মরক্ষা করতে গিয়ে ধর্ম্মের যারা বিরোধী, সেই প্রবল রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। সংগ্রাম একটা সাময়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত। আসল কথা ধর্ম্মরক্ষা। গুরু গোবিন্দের আত্মত্যাগ, ধর্ম্মের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা, প্রাণের বিনিময়ে ধর্ম্মরক্ষার অলৌকিক চেষ্টা, জ্ঞান উপার্জ্জন ও কঠোর সাধনার কথা শুনলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই সাধনের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তিনি তাঁর গুটীকয়েক শিষ্যের নিকট বলছেন :—

এখনো বিহরে কল্প জগতে
অরণ্য রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবা নিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্ম্মবাণী !

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে
দুর্গম গিরিমাঝে,
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী-কল্লোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে।

* * * *

চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ,
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে ?

* * * *

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ !

গুরু গোবিন্দের কঠোর সাধনা ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল চিত্র পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের আকাশে বাতাসে খেলা করিতেছে ; মগ্ন নারীর শোণিত-প্রবাহে সে সাধনার বীজ ছড়াইয়া রহিয়াছে। হীরানন্দ মাতৃস্তনদুগ্ধ-পানের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের দৃঢ় সংকল্প, আত্মত্যাগ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। পাষাণের মত দৃঢ়-ব্রত, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মানুরাগী হীরানন্দ বাঙ্গলায় এলেন, এসে দেখলেন, বাঙ্গলার গঙ্গা ভক্তির প্রবাহ নিয়ে ভেসে চলেছে। বাঙ্গলার ফল ফুল ভক্তির সৌরভে চারিদিক পূর্ণ করে রেখেছে। ভাগবতের অধ্যায়ের মত বাঙ্গলার ভক্তি নৃত্যাতত্ত্ব ও অশ্রুতত্ত্বের নানাবিকাশ ও প্রকাশের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে ফুটে উঠেছে। পর্ব্বত-দুহিতা গঙ্গার ন্যায় দৃঢ়ব্রত হীরানন্দের হৃদয় হতে কোমলা ভক্তির উদয় হল। হীরানন্দ গঙ্গা যমুনার মত পাঞ্জাব ও বাঙ্গলাকে নিজের প্রাণে মিলিত করেছেন। এই মিলন নিয়ে, হে বাঙ্গলার যুবকগণ! হীরানন্দ আজ তোমাদের সম্মুখে এসেছেন। কেবল কোমলা ভক্তিতে বাঙ্গলার পরিত্রাণ হবে না, ভক্তির সঙ্গে সত্য-নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের বীরভাব চাই। রক্তের লাল অক্ষরে তোমাদের সাধনার কথা যদি লিখে যেতে না পার, কেউ তোমাদের ধর্ম্ম নেবেনা।

আর একটী কথা এই, ইংরাজী শিক্ষা যখন প্রথম এ দেশে এল, তখন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ইংরাজী পাপও অবাধে শিক্ষিতদের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিক্ষিতদের মধ্যে মদ্যপান, গোমাংস-ভক্ষণ অনায়াসে গৃহীত হল। এ সব অনাচারকে তাঁরা নির্ব্বিকারচিত্তে গ্রহণ করলেন। একটা বিকৃত ভাব ও বিদেশীয় আচারের অনুসরণ করা ইংরাজী শিক্ষিত-দের স্বভাব হয়ে দাঁড়াল। এই জাতি-পীড়িত দেশে ইংরাজী-শিক্ষিত লোকেরা আর একটা নূতন জাতি সৃষ্টি করলেন। ইংরাজী-শিক্ষা এদেশের চিন্তার ধারাকে ওলট পালট করে দিয়েছে ; যে চিন্তার ভিতর দিয়ে এদেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজ শিক্ষা নীতি ও রাজকার্য্য পরিচালিত হচ্ছিল, তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে একটা বিশৃঙ্খলতা এনেছে, জাতীয় স্বভাবের মূলে একটা গুরুতর আঘাত দিয়েছে। কি শিক্ষায়, কি সমাজে, কি ধর্ম্মে, কি ব্যবসায়ে, কি বাণিজ্যে, কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি আচার ব্যবহারে, বিদেশীয় ভাব এমন করে আমাদের জাতীয় স্বভাবে বিকৃত ভাব বিস্তার করেছে, তাকে মারবে ফেলা বা তার মূলোৎপাটন করা এখন শক্ত। যে জাতি নিজের সর্ব্বস্ব হারিয়ে, বিদেশী আবহাওয়ার ভিতর তার ক্ষীণ প্রাণ টুকু বাঁচাবার চেষ্টা করে, তাকে অনিবার্য্য ধ্বংসের পথ হতে কেউ বাঁচাতে পারে না। তাই শ্রীকেশবচন্দ্রের মর্ম্মস্থল হতে সহস্র দুন্দুভির মত এই কথাগুলি ফুটে উঠেছিল :—

"Alas! Before the formidable artillery of Europe's aggressive civilization the scriptures

and prophets, the language and the literature of the East, nay her customs and manners, her social and domestic institutions and her very industries have undergone a cruel slaughter. The rivers that flow eastward and the rivers that flow westward are crimson with Asiatic gore; yes, with the best blood of oriental life. But Europe, thou holdest in one hand life and in another death. Thy civilization has proved a blessing, but inasmuchas it utterly exterminates our nationality, and seeks to destroy and Europeanize all that is in the East, it is a curse. Therefore will I vindicate Asia."—(Asia's Message to Europe.)

শ্রীকেশবচন্দ্র স্বর্গের দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, ভারতের জাতীয় আত্মাকে যদি বাঁচাইতে না পারি, তাহ'লে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইবে। তাই তিনি তাঁহার নববিধানকে জাতীয় বিধান, হিন্দু বিধান ব'লে ঘোষণা করতে প্রত্যাদিষ্ট হলেন। হীরানন্দ শ্রীকেশবের এই জাতীয় ভাবের ভিতর পরিপুষ্ট হতে লাগলেন, নিজের স্বভাবে নিজে ফুটে উঠলেন, দেশে ফিরে গিয়ে নূতন সিন্ধুদেশ নির্ম্মাণ করলেন। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় নীতি ও কর্ম্মকে জাগ্রত করলেন। ইংরাজী শিক্ষা যে অশিক্ষিতদের সঙ্গে নূতন জাতি-ভেদ সৃষ্টি করেছিল, তিনি তা মুছে ফেলে একটা নূতন ধর্ম্ম-জাতি সৃষ্টি করলেন, যেখানে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সাম্য ও স্বাধীনতা বড় হয়ে উঠবে, যেখানে চরিত্র ও নীতির উপর সকলের ধর্ম্মাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সুগঠিত চরিত্র, ধর্ম্ম ও উদারতার জন্য আজ যুবকদের কাছে হীরানন্দের আদর। হীরানন্দের ভিতর যে সত্যটী ফুটে উঠত, তাহা কার্য্যে পরিণত করবার জন্য বীরের মত অগ্রসর হতেন; লোকের ভয়, দেশের ভয়, রাজকর্ম্ম-চারীর ভয় তাঁকে ভীত করতে পারত না, এই নির্ভীকতাই তাঁকে দেবতা করেছিল। ভগবানের ডাক যাঁর ভিতরে আসে, তাঁকে বাধা দিতে পারে জগতে এমন শক্তি নাই, স্বর্গেও এমন শক্তি নাই। গঙ্গার স্রোতকে বন্ধ করা বরং সহজ, বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শ জলরাশিকে শোষণ করা বরং সম্ভব, কিন্তু ভক্তি-প্রমত্ত আত্মাকে বাধা দেওয়া দেবতারও সাধ্যাতীত।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ১৭ই জুন, ৯৪।১ নং, গড়পার রোডে, ডাঃ হেমন্তকুমার চাটার্জির গৃহে, তাঁহার দৌহিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন বীরের নবজাত শিশুপুত্রের শুভজাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ২২শে মে, মাতামহ-গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে মাতামহী প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নামকরণ—গত ২৮শে জুন, গাজারিবাগে, শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগীর গৃহে, তাঁহার দৌহিত্রী, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের শিশু কন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাতামহ ব্রজকুমার বাবু উপাসনা করেন এবং শিশুকে "বীণা" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে মাতামহ প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শুভবিবাহ—গত ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন, কলিকাতায় ২৪।৩ বাহির মির্জ্জাপুর রোডে, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্তের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুচিত্রার সহিত, মেদিনীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসুর মধ্যমপুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ আশাকুমারের শুভবিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ এই নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ২৫শে জুন, সন্ধ্যায়, পুরী ভিক্টোরিয়া ক্লাবের সহৃদয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়ের আহ্বানে, ক্লাবের ছাদের উপর বিশেষ উপাসনা হয়। অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্লাবের যাত্রী ও অনেকগুলি ভাই ভগ্নী এই উপাসনায় যোগ দান ও সঙ্গীতাদি করেন।

পুরীতে নববিধান—গত জুন মাসের তিন রবিবার, নিয়মিতরূপে পুরীতে যে মন্দির এবং আশ্রম স্থাপনের জন্য ভূমি পাওয়া গিয়াছে, সেই ভূমিতে মুক্ত আকাশ ও বৃক্ষতলে রবিবাসরীয় উপাসনা হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, এবং ভগ্নী ভক্তিমতি ও চিত্তবিনোদিনী সঙ্গীত করেন। অন্যান্য উপাসক উপাসিকা ব্যতীত, ফরিদপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স জজ মিঃ এ, এন, সেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী (লর্ড সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী), কানপুরের সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মহিমানাথ ভট্টাচার্য্য, এলাহাবাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি উপাসনায় যোগদান করেন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৈলাস চন্দ্র দাসের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত বিভুরঞ্জন দাসের অতি আদরের জ্যেষ্ঠা কন্যা বারবছরের শ্রীমতী আরতির আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পত্রিকাস্থ করিতেছি। রূপে গুণে সুন্দর ফুলটীর মত জীবনটী বিকসিত হইতেছিল। মুখে বিষাক্ত দুষ্ট ব্রণের আক্রমণে দুই দিনের মধ্যেই ভগবান্ তাহাকে গত ১৭ই জুন, চিরবসন্তের রাজ্যে তুলিয়া লইলেন। গত ২৮শে জুন, ১০।২ পটুয়াটোলা লেনে তাহার আত্মার কল্যাণার্থ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে

কন্যার পিতা প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা এবং বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ে "আরতির" স্মরণার্থ একটা পুরস্কারদানের জন্য ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। চিন্ময়ী জননী তাঁহার আদরের কন্যাকে নিত্য শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত পিতামাতা ও বন্ধু বান্ধবদের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

প্রথম সাম্বৎসরিক—স্বর্গগত ভাই প্রমথলাল সেনের (শ্রদ্ধেয় নালুদার) প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উৎসবের ভাবে নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে :—

২৮শে জুন, রবিবার, প্রাতে, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে কলেজের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। ২৯শে, সোমবার, সন্ধ্যায়, শান্তিকুটীরে "আমাদের সঙ্ঘের" শ্রদ্ধাঞ্জলিদানে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন নালুদার লেখা হইতে ও আচার্য্যদেবের উপদেশ হইতে উপযোগী অংশ বিশেষ পাঠ করেন। ৩০শে জুন, মঙ্গলবার, সাম্বৎসরিক দিনে শান্তিকুটীরে প্রাতে ৭॥টায় অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, প্রার্থনাপাঠ ও আলোচনাদি হইতে থাকে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু নালুদার সুন্দর জীবনী পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সংকীর্ত্তনে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র দাসের রচিত আরাধনা-সঙ্গীতটী গীত হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সম্ভব হইলে আগামী বারে দিতে চেষ্টা করিব।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই আষাঢ়, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে পুরীতে মিঃ গলষ্টন সাহেবের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। মিঃ গলষ্টন সাহেব অনুগ্রহ করিয়া বিনা করে এই গৃহটি আমাদের ভাইকে সমাদরে আপাততঃ বাস করিয়া সাধন ভজন ও প্রচার-কার্য্য করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গত ৮ই আষাঢ়, ধুবড়ীতে, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকারের দ্বিতীয়া কন্যার প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন।

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার পুত্র দিনাজপুরের অন্তর্গত চূড়ামণ ষ্টেটের ম্যানেজার, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুর কর্ম্মস্থলে, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন উপাসনা ও পাঠাদি করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিধুবাবু প্রচার ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা ও অনাথ আশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দিনে কলিকাতায়, মঙ্গলবাড়ীতে, জ্যেষ্ঠা কন্যার গৃহেও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৪ই জুন, বাঘলানিবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসুর সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, কলিকাতায় তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গুহের গৃহে, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

গত ১৮ই জুন, কলিকাতায়, ৬।৪ বি, ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বর্গীয় মনোমতধন দের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগ্নী শ্রীমতী অশোকলতা দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। মনোনীত বাবু এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দিনে দার্জ্জিলিং শৈলাবাসেও ভগ্নী শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ও শ্রীমতী বনলতা দের উদ্যোগে বিশেষ উপাসনা হয়। ভগ্নীগণের সহিত স্বর্গীয় মনোমতধন দের একটী প্রিয় ছাত্রী মধুর সঙ্গীত করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

গত ১৮ই জুন ২৪।৩ বাকর মির্জ্জাপুর রোডে, স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় সুশীলচন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ ভাই বোনদের নিয়া বিশেষ উপাসনা করেন।

—০—

পত্রপ্রেরক মহাশয়দিগকে নিবেদন।

সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীমনোনীতধন দে (একই হস্তাক্ষরে উভয় নাম স্বাক্ষরিত) :—

(১) শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং সে পত্র মুদ্রাঙ্কণ জন্য না পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা বিধি নয়।

(২) সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যখন নাম নাই, তখন আন্দাজে লেখকের নাম উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে সাধারণ সমক্ষে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করা ভদ্রতা ও বিধি বিরুদ্ধ।

(৩) প্রবন্ধ-লেখক যথাজ্ঞান কাহারও প্রতি দোষারোপ বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি "কটাক্ষপাতের" উদ্দেশ্যে লেখেন নাই।

(৪) প্রার্থনায় যদি "কপটতা" হইয়া থাকে, যাঁহার নিকট প্রার্থনা, তিনি বিচার ও ক্ষমা করিবেন; এবং যদি তাহা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হয়, যাঁহাদের হাতে আইন, তাঁহারা দণ্ড দিবেন।

(৫) পত্রের ভাষায় ও ভাবে অন্যের মনে অশান্তি ও উত্তেজনা উদ্দীপনের আশঙ্কা; এই হেতু প্রকাশ্য পত্রে, বিশেষতঃ ধর্ম্মতত্ত্বে এমন মতদ্বৈধ-বিষয়ক পত্র মুদ্রিত করিতে অনুরোধ না করিয়া, পরস্পর পত্রব্যবহারে, সদ্ভাবে ও শান্ত ভাবে অভিযোগের বিষয় মিটাইয়া লইলেই ভাল হয় না?—ধঃ সঃ

—০—

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

মহাত্মা ধর্ম্মপাল রচিত "বুদ্ধদেবের উপদেশ" নামক পুস্তিকাখানি পেয়েছি। বইখানি পড়ে আমরা বিশেষ সুখী হয়েছি। গ্রন্থকার ইহাতে সরল ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের মতসার দিয়েছেন। এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক জগৎময় ছড়িয়ে পড়েছিল। ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের প্রধান উপদেশ—চিত্ত শুদ্ধ কর, ইন্দ্রিয় জয় কর, বাসনা কামনা পরিত্যাগ কর ইত্যাদি। বিশুদ্ধ-চরিত্র না হলে নির্ব্বাণ লাভ হয় না, ভগবদ্দর্শন হয় না, মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে না। পুস্তিকাখানি পড়ে অনেকেই উপকৃত হবেন, আশা করি।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৮ই আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 17th July, 1931. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে নববিধানের নবদেবতা, তুমিই ত সত্য জগতের নাথ এবং আমাদের প্রত্যেকেরও হৃদয়ের নাথ, প্রাণনাথ। তুমি আমাদের প্রাণমন্দিরে নিত্য বিরাজিত। তথাপি আমরা আমাদের ভ্রম-ভ্রান্তি বশতঃ মনে করি, কোথায় তুমি, তোমার দর্শন-লাভ কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? আকাশে সূর্য্য উদিত, চারিদিকে তাহার কিরণালোক বাহির হইতেছে; তথাপি মেঘ মধ্যে ব্যবধান থাকিলে সূর্য্যকে দেখা যায় না। তেমনি তুমি এই হৃদয়াকাশে এবং বাহ্য প্রকৃতিতে নিত্য বিরাজিত থাকিলেও, আমাদের অবিশ্বাস ও সংশয়রূপ মেঘ মধ্যে ব্যবধান থাকিয়া তোমার মুখ দেখিতে দেয় না। বর্ত্তমান যুগে নূতন বিধানে সত্যই তুমি নিরাকার চিন্ময় কলেবরে প্রত্যেক বিশ্বাসীকে দর্শন দিবার জন্য প্রকট হইয়াছ। আমাদের সংশয়-মেঘ অপসারিত কর, আমাদের পাপ-কলুষিত অন্ধ দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়া দাও। আমরা নিত্য নিত্য নব নবরূপে, যে দিন যে রূপে তুমি আমাদিগকে দেখা দিতে চাও, তোমার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করি। তোমার সন্তান বলিলেন, বিশুদ্ধাত্মারাই তোমার দেখা পান। বর্ত্তমানযুগে পাপীদেরও দেখা দিবার জন্য মাতৃস্নেহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ। মা, পূর্ব্বে তুমি বিশুদ্ধাত্মাদের দর্শন দান করিতে, এখন পাপী আমাদিগকে দর্শন দিয়া বিশুদ্ধ কর, তোমার চরণে কাতরপ্রাণে ইহাই ভিক্ষা চাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীজগন্নাথের নবকলেবর।

সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিগণের নিকট ঘোষিত হইয়াছে, শ্রীজগন্নাথদেব এবার নব কলেবর ধারণ করিবেন। মূর্ত্তি-উপাসক ভক্ত বিশ্বাসী নরনারী নাকি এবার ইহা দর্শনার্থ বহুসংখ্যায় সেখানে সমবেত হইবেন।

জগন্নাথ-মূর্ত্তির নবকলেবর যাঁহারা দর্শন করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা কতই কষ্ট স্বীকার করিয়া তদ্দর্শনে যাইবেন ও তদ্দ্বারা আপনাদের ভক্তি বিশ্বাস চরিতার্থ করিবেন, সন্দেহ নাই। কে কতদূর প্রকৃত দর্শন-লাভে ধন্য হইবেন, জানি না।

কেবল হিন্দু-সম্প্রদায়স্থ বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী কেন, এই জগতে বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ কোন্ বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী এই জগতের নাথ জগন্নাথ যিনি, তাঁহাকে দশন করিতে

আকাঙ্ক্ষিত নন? কোন্ আত্মা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে চান না?

হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, ভক্ত সকলেই নিজ নিজ ভাবে যে সাধন করিতেছেন, সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য, ঈশ্বরকে দর্শন করা, ঈশ্বরকে লাভ করা। এবং সকল ধর্ম্মেরই নিগূঢ়-তত্ত্ব যদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে ইহাই কি দেখিতে পাই না যে, জগন্নাথ-দর্শন কেবল বাহ্য মূর্ত্তি-দর্শন নয়, সে দর্শন আরো একটু নিগূঢ় দর্শন।

হিন্দুশাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

"অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধককে এই পরমাত্মা মনোনীত করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।" অর্থাৎ পরমাত্মা যে সাধককে মনোনীত করেন, সেই সাধকও পরমাত্মাকে মনোনীত করেন এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনাশীল আত্মাই তাঁর দর্শন পায়।

তেমনি শিখধর্ম্মশাস্ত্রও বলেন :—

"বেদ কেতেব দু হফ্‌তরা ভাই দিলকা ফিকির না যাই। টুক দম করারী জো করে হাজীর হুজুর খোদাই।"

"বেদ কোরাণ দর্পণের ন্যায় দুই ভাই. তাতে মনের চিন্তা দূর হয় না; যে ক্ষণমাত্র বিশ্বাস করে, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন।"

ইহুদী শাস্ত্রেও আছে, "তুমি কি অনুসন্ধান করিয়া ঈশ্বরকে পাইতে পার?" "আমি যা তাই আমি।" "আমার সম্মুখে অন্য দেবতার পূজা করিও না।" "সর্ব্বান্তঃকরণে প্রভু পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর, আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিও না।"

এমনই খৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রও বলেন :—"যাহারা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধাত্মা, তাহারাই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারে। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, দ্বিজাত্মা না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।"

কোরাণসরিফও বলেন, "তোমাদের ঈশ্বর একই ঈশ্বর, তিনি ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই।" "চক্ষু তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না। কিন্তু তিনি চক্ষুকে অবধারণ করেন। তিনি বোধাতীত ও জ্ঞানবান্।"

এইরূপে যে শাস্ত্র, যে ধর্ম্মই পর্য্যালোচনা করি, সকলেই তাঁহাকে দেখিতে লক্ষ্য দেন, সকলেরই লক্ষ্য তাঁহার দর্শন লাভ করা। সকলেই স্বীকার করেন, তাঁহার দর্শন বাহ্য দর্শন নয়, আত্মার দর্শনই যথার্থ দর্শন।

কিন্তু হায়! ইহা কি আমরা কেহ অস্বীকার করিতে পারি, যিনিই যে ধর্ম্ম মানুন, এখন যেন সকলেই কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান, মন্ত্র, তন্ত্র, বার, ব্রত, পূজা, হোম, বা শাস্ত্রের অনুসরণ ইত্যাদি লইয়া আপনাপন ধর্ম্মপালন করিতেছেন। ঈশ্বরের যে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হয়, ইহা যেন অসম্ভব বোধে তাহার সাধনা সকলে ভুলিয়া গিয়াছেন।

এই বর্ত্তমান যুগে স্বয়ং সেই পরমাত্মা জগতের নাথ জগন্নাথ যিনি, তিনি যথার্থ নব কলেবর ধারণ করিয়া নববিধানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

সেই আমাদের আর্য্য ঋষিদিগের নিকট তিনি যেমন "অহমস্মি" বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ইহুদী মুষার নিকট যেমন "আমি আছি" বলিয়া স্বয়ং দেখা দিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগেও তিনি প্রত্যেককে দর্শন দিবার জন্য নবকলেবরে বা চিন্ময় আকারে এই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

এই নববিধান যেমন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-বিধান, তেমনি ইহাতে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে, অব্যবহিতরূপে, বিনা মধ্যবর্ত্তিতায়, বিনা মূর্ত্তি অবলম্বনে যে দর্শন দান করেন, তাহাও ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই চিন্ময় ঈশ্বরের যে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, এবং তাঁহার বাণী প্রত্যেকের শ্রবণ করা সহজ, ইহা প্রতিষ্ঠা করিতেই এই নব যুগের নববিধান।

নববিধান এক নূতন আবিষ্কার। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যেমন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড় লৌহেরও চেতনা আছে, বৃক্ষেরও অনুভূতি-শক্তি আছে, তেমনি নববিধান আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নবভাবে সেই প্রাচীন ঋষিদিগের নিকট যেমন বলিয়াছেন, "অহমস্মি" "আমি আছি", এখনও তেমনি বলেন ও বলিতেছেন। পাপী একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রার্থনা করিলেই তিনি দেখা দেন ও দর্শন দিয়া তাহাকে শুদ্ধ করেন এবং স্বয়ং কথা

বলিয়া তাহার যাহা কিছু জানিবার প্রয়োজন তাহা বলিয়া দেন, ইহা তিনি স্বয়ংই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

জগতের নাথ জগন্নাথ নবকলেবর ধরিয়াছেন, ইহার অর্থ, তিনি তাঁহারই নিরাকার চিন্ময় আকার ধরিয়া ব্যক্তি-রূপে সবার দর্শনীয় ও শ্রবণীয় হইয়াছেন এবং প্রত্যেকের হৃদয়-রথেই তিনি দৃশ্যমান হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে অনেক আয়াস করিতে হয় না, অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয় না, অনেক কষ্টসাধ্য সাধনা করিতে হয় না। বিশ্বাস-চক্ষে সম্মুখে "এই তুমি আছ" বলিলেই তিনি দেখা দেন, ধরা দেন। আমরা এইরূপে নববিধানের নবভক্ত সঙ্গে দেখিয়াছি, তাঁহার বাণী শুনিয়াছি। প্রত্যেকের হৃদয়েই এবং সম্মুখেই তিনি বর্ত্তমান, এই বিশ্বাস করিয়া তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইলেই তাঁহাকে দেখা যায়। আমরা যে প্রার্থনা করি, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই করি।

তাঁহাকে যে যে নামেই ডাকি, গড, খোদা, জিহোভা, হরি, মা, সেই নামেই তিনি সাড়া দেন; কিন্তু যে যে ভাবেই তাঁহাকে দেখিতে চাই, সকল সময় সেই সেই ভাবেই দেখা দেন বলিয়া যে অনেকে বলেন, তাহা ঠিক নয়। তিনি বাস্তবিক তাঁর নিজের ভাবে, নিজের রূপে, দর্শনার্থীর অধিকার অনুসারে দর্শন দান করেন। মাকে ছেলে যখন যাহা চায়, তখনই কি মা তাহা দেন? রোগা ছেলে যদি পলাউ আহার করিতে চায়, তাহা কি দেন? তিনি তাহার উপযোগী পথ্যাহার দেন। ঠিক তেমনি আমরা যথার্থ একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে, আমাদের উপযুক্ততা অনুসারে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। বাস্তবিক বিশ্বাসী হইলেই নববিধানে তিনি নব নব কলেবরে দর্শন দান করেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ঈশ্বরের উপর প্রকৃত নির্ভর।

আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছি না কেন? আমি কিছু করিতে পারি, এই ভ্রান্তি সম্পূর্ণ যাইতেছে না বলিয়া। আমি সত্য সত্যই কিছুই পারি না, আমি কিছুই নই, একেবারে অক্ষম, অকর্ম্মণ্য, পাপী ও অবিশ্বাসী, এই বোধ পূর্ণমাত্রায় না হইলে, আমি কেমন করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিব? সম্পূর্ণ নির্ভর বিনাও আমার দ্বারা কিছুই হইবে না।

পৃথিবীর ও নববিধানের অভিধান।

পৃথিবীর অভিধানে যে কেহ কোন নরকে হত্যা করে, সে নরহন্তা; কিন্তু নববিধানের নব অভিধানে যে কোন ব্যক্তি নর-নারীকে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্যা বলিয়া শ্রদ্ধা প্রীতি না করে এবং তাহাদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অপবিত্র চিন্তা বা প্রবৃত্তি মনেও পোষণ করিতে পারে, সেই নরহন্তা বা নারীহন্তা। হত্যার অর্থ কোন ব্যক্তিকে বিনাশ করা; কিন্তু নববিধানে বিনি যাহা, তাঁকে তাহা নয় মনে করাই হত্যা। নববিধান মতে "চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা হাতে নয়, হৃদয়ে", ভাবিলেই হয়।

বিচার ও শাসন।

বিচারের ভার বিচারপতির হাতে। তাই আচার্য্য বলিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তিকেও বিচার করি না।" বাস্তবিক পৃথিবীর আদালতেও বিচারপতি ভিন্ন যে সে বিচার করিতে পারে না। ধর্ম্মাদালতের বিধি আরো সূক্ষ্ম ও উচ্চ। যাঁহার যে দোষের জন্য আমি অভিযোগ করিতেছি, সত্য সত্য সে দোষ আমার ভিতর আছে কিনা, প্রথমে সূক্ষ্মভাবে তাহা দেখিতে হইবে; তাহার পর স্বয়ং ন্যায়বিচারপতি পরামর্শদাতা যিনি আমার হৃদয়স্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তাহার পর যাঁহাকে বিচারা-ধীনে আনিব, তিনি যে আমার ভাই। নববিধান মতে "ভাই ও আমি এক" ইহা মনে রাখিয়া, তাঁহাকেও সদ্ভাবে, প্রীতি-ভাবে, সরল শিক্ষার্থীর ভাবে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাঁহার যে দোষ আমি দেখিতেছি বা সন্দেহ করিতেছি, তাঁহার সে সম্বন্ধে বক্তব্য কি। তাহার পর ঈশ্বরের নিকট আকুল প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার সংশোধন চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই নববিধানে বিচার ও শাসন।

সাগরের তরঙ্গ।

সাগরের তরঙ্গ যখন আসিতেছে, যদি উল্লম্ফন করিতে না পার, মস্তক পাতিয়া ডুব দিবে; তরঙ্গ মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, কিছুই আঘাত পাইবে না; কিন্তু যদি দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হও, ঘাত প্রতিঘাতে তোমার জীবন সংকটাপন্ন করিয়া তুলিবে এবং হয় ত কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। সংসার-সাগরের তরঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু যদি বিনয় সহকারে অবনত-মস্তক হও, বা নির্ভয়ে ব্রহ্মবলে উল্লম্ফন করিতে পার, সকল তরঙ্গ অতিক্রম করিতে পারিবে।

সাধক-প্রবর প্রমথলাল সেন।

(৩০শে জুন, শান্তিকুটীরে, প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ-বাসরে পঠিত)

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। আবার ৩০শে জুন আজ উপস্থিত। কিন্তু গত বছর ৩০শে জুন আমরা যা হারিয়েছি, তা আর কখনও এ জগতে ফিরে পাবোনা। যা যায়, তা আর ফিরে আসে না; যা হারায়, মাথা খুড়লেও তা আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায় না। যুগ যুগান্তের তপস্যার ফলে যে দুর্লভ কোহিনুর আমরা সহজে পেয়েছিলুম, নিষ্ঠুর কাল তা সহসা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। কে আমাদের মর্ম্মযাতনা, হৃদয়ের বেদনা বুঝবে? কে আমাদের অন্তরের শূন্যতা ও দৈন্য অনুভব করবে? কার কাছে যাবো? শুনেছি, ভগবান্ ব্যথাহারী, ক্ষতিপূরণকারী। তাঁর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন জীবের আর গতি নেই। মরুভূমির ভেতর দিয়ে উট্ যখন চলে, জলের জন্যে যখন ছটফট্ করে, খুব দূরে জলাশয় থাকলেও অনায়াসে তার গন্ধ পায় এবং সেই দিকেই ছোটে। আমরাও সংসার-মরুভূমে পড়ে, শোকে যখন হাহাকার করি, সহজেই কোথা সান্ত্বনার উৎস আছে, তারি খোঁজ করি এবং সেই দিকেই প্রাণের আবেগে ছুটে যাই। "আমি শুনেছি, হে তৃষাহারী! তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি; তুমি আপনা হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই, তুমি আছ তার।" আজ তাঁরি শরণ লই। তিনি আমাদের শোকের আকুল অশ্রুজলে তাঁর করুণার কিরণধারা ঢেলে দিন, এ দুঃখ-সঙ্কটে তাঁর অমোঘ মঙ্গল হাতের স্পর্শ আমাদের দিন্!

কিন্তু, প্রশ্ন এই, প্রাণ গেলে কি মানুষ মরে? দেহের মরণ কি প্রকৃত মরণ? আবার এ রকম সাধুর কি মৃত্যু আছে? যিনি ভুবনবাসী হয়েও চির আনন্দধামে নিত্য বাস করতেন, যিনি অমৃতের আধার প্রাণারাম-সাগরে সতত ডুবে থাকতেন, যিনি আনন্দভাণ্ডার প্রেম-সুধা-সিন্ধুনীরে দিনরাত সাঁতার দিতেন, যিনি যাবার আগে, শেষ গেয়ে গেলেন, "এবার অমর হব, এম্নি রব, দয়াল হরির চরণ ধরে", এ রকম দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান্ লোকের তো মরণ নেই। শাস্ত্রে বলে, :—

"ন সাদৃশ্যে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
মনীষয়াহৃদো মনসা হৃদা চ
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"

"তাঁহার (সেই অবিনাশী পুরুষের) রূপের সাদৃশ্য নাই, কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। যাঁহারা ইঁহাকে বুদ্ধি, মন ও হৃদয়ের দ্বারা জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।"

বিধানের আলোক আমাদিগকে সাধু-সমাগম সাধন করবার অধিকার দিয়েছে; স্বর্গবাসী অমরাত্মাদের নিমন্ত্রণ করে হৃদয়ের ভেতরে বসাবার উপায় বলে দিয়েছে। যে সকল আত্মা সুদূর অতীতে বা সুদূর ভবিষ্যতের পথে দেবতার কাছে গিয়েছে, তাদের পুনরাহ্বান করবার কথা বলেছে। "তত্র আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে"—তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক। তাই আজ সেই বিদেহী আত্মার সঙ্গলাভের আশায়, তাঁর সেই অমৃত সমান অমর চরিত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাচ্ছে। ইহাতে সংসার-বিষবৃক্ষের যে দুটী অমৃতময় ফল, সে দুটিই লাভ হবে—শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ উভয়ই লাভ হবে।

আমরা যে সকল অনায়াসলব্ধ জিনিষ অকুণ্ঠিত অভ্যাসে ভোগ করি, অনেক সময়ে তাদের অস্তিত্বটুকুও আমাদের অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয় না। যেমন ভগবানের আলো, বাতাস, জল, আমরা দিনের পর দিন ভোগ করে যাই, তার জন্যে যে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, একথা মনেই আসে না। কিন্তু যেদিন ভগবান্ তাঁর রুদ্রমূর্ত্তিতে সেগুলি কেড়ে নেবেন, সেই দিনই জানতে পারবো, আমরা কতখানি বিনা দাবীতে এতদিন ভোগ করছিলুম, কতখানি আনন্দ, মঙ্গলের পূর্ণ অধিকারী ছিলুম। তাই আজ এই অনাড়ম্বর, অনাসক্ত, মুক্তি-পথের পথিক, সহজ সন্ন্যাসী, খাঁটি সাধুর তিরোধানে বুঝতে পারছি, আমাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, আমরা কি জিনিষ হারিয়েছি। বর্ষোন্মত জলভারনম্র পর্জ্জন্য যদি হঠাৎ আকাশে মিলিয়ে যায়, বারি-প্রত্যাশী, তৃষাতুর, কাতরকণ্ঠ, উন্মুখ চাতকের যে দশা হয়, আমাদের দশাও আজ তদনুরূপ। কঠিন পাষাণস্তূপ ভেদ করে যে অনন্ত অহেতুক প্রেমের উৎস এতদিন আমাদের মত কত শত ক্ষুধিত, তৃষিত, বিক্ষিপ্ত আত্মাকে সুখের সুস্নিগ্ধ সুশীতল মুক্তি-বারি দানে তৃপ্ত করছিল, সহসা উহা রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার বেশ অনুভব করছি, প্রাণের একটি সূক্ষ্ম তন্ত্রী প্রয়োজনীয় তার ছিঁড়ে গেছে; বেশ বুঝতে পারছি, স্বর্গের সেরা উপাদানে তয়েরি সেই সুধাময়ী রসনা চিরদিনের মত নীরব হয়ে যাওয়ায় জীবনের আনন্দ-রসধারা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তিনি কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে এ ধরায় এসেছিলেন, কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখে সদাই হাসতেন ও "হরিবোল, হরিবোল" বলতেন, কোন্ অনন্ত প্রাণ-সাগরের আনন্দে নিত্য ভাসতেন ও গান করতেন, সেই কথাটি বলবার জন্যেই আজ পুণ্য দিনে, এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে আমি সভয়ে, নিজের অযোগ্যতা সত্বেও, আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। আসল মানুষকে চিনতে হলে, দিব্যদৃষ্টি থাকা চাই, সংকল্প ও সংযম থাকা চাই। আমার বিশ্বাস, আপনাদের কাছে সে বিষয়ের আশা অনায়াসেই করতে পারি।

আলবার্ট স্কুলের ৮ম শ্রেণীতে আমি প্রথমে ভর্ত্তি হই; তিনিও সেই শ্রেণীতে পড়তেন। কিন্তু যখন আমরা ৭ম শ্রেণীতে

উঠি, তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। সে আলাপ পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তিনি ক্লাসের "first boy" ছিলেন। ধনীর সন্তান, দেখতে সুন্দর, পড়াশুনায় ভাল, নম্র প্রকৃতি—তাঁর সহিত আলাপ পরিচয় করবার ইচ্ছা ত খুব স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম প্রথম আমরা সাহস করে তাঁর সঙ্গে মিশতে পারতুম না,—খুব দূরে দূরে থাকতুম। ক্রমশঃ যত দিন যেতে লাগলো, তাঁর চরিত্রের সৌরভ তত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং আমাকে মন্ত্রের মত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করল। তিনি Entrance, 1st divisionএ পাশ করে আরও দু'বছর কলেজে first Arts পড়েছিলেন। তাঁর হাতের লেখা বেশ ভাল ছিলো। কলেজে পড়া ছেড়ে দিয়ে, শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, দেশভ্রমণে বাহির হন এবং ভারতের নানাস্থান দর্শন করেন। এই উপলক্ষে অনেকদিন সিন্ধুদেশে বাস করেন। তাঁর প্রিয়বন্ধু সিন্ধুদেশবাসী হীরানন্দ আদওয়ানীর বাঁকীপুরে অকালমৃত্যুতে তিনি যে শেলসম আঘাত পেয়েছিলেন, তা কাউকেও বুঝাতে পারবো না, আজ বুঝাতে চেষ্টাও করবো না। তাঁর মেজদাদা স্বর্গীয় সাধু নন্দলালের মত তিনিও গম্ভীর ও মিতভাষী ছিলেন; তাঁর মত অম্বর কুসুমের ন্যায় কোমল এবং সিংহসম বিক্রমশালী ছিল। দৃঢ়, অচল, অটল, অভ্রভেদী পবিত্রতার শৈলের উপর চরিত্রের দুর্গ নির্ম্মাণ করতে পেরেছিলেন বলেই এত বড় হতে পেরেছিলেন।

বোধ হয়, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সহিত তাঁর আলাপ হয়। প্রথম দেখাতেই উভয় উভয়কে চিনতে পারেন, হৃদি বিনিময় হয়। পরস্পর পরস্পরকে কি চ'খে যে দেখতেন, তা কথায় বলা যায় না। বিনয়েন্দ্রনাথ প্রমথলালের আরাধনার সুখ্যাতি দশমুখে করতেন। প্রমথলালের চরিত্র-সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত, এই কথাই সদাসর্ব্বদা আমাদের বলতেন। প্রমথলালের জীবনের আদর্শ কি ছিল? তাঁর নিজের কথাতেই বলি:—"আমরা দেবনন্দন—দেবতার কাছ থেকে এসেছি। দেবতার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। তাঁর কাছে খুব খাঁটি হতে হবে। তাঁর সম্পূর্ণ অধীন হ'তে হবে। আমাদের কথায় ও কাজে মিল আছে, তা দেখাতে হবে। সেখানে মিথ্যা কল্পনার স্থান নেই। আমাদের অভাবের কথা তাঁকেই জানাতে হবে। সকল অবস্থায় তাঁর পানে তাকাতে হবে। তাঁর আলোকে জীবনের পথে চলতে হবে। তিনি যা চান্, তাই আমাদের হতে হবে। তিনিই আমাদের জীবনের কাজ বলে দেবেন। বিনীত হয়ে তাঁর অভিপ্রায় জানতে হবে। তাঁর অভিপ্রায়, তাঁর ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ করতে হবে।" * * * * "দেবনন্দন কাকে বলে, তা কি জানতে পেরেছি? দেবতার ছেলে, ঈশ্বরের সন্তান মানে কি? স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি আপনার রক্ত-মাংস দিয়ে আমাকে সৃজন করেছেন। তাঁর প্রকৃতি দিয়ে আমাকে গড়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার যোগ, তাঁরই সঙ্গে আমার কাজ। তা না হ'লে আমি কিছুই নই। আমাকে তাঁর মত হতে হবে। তিনিই আমার [জীব]নের আদর্শ।'

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল তারিখে, তিনি বিলেত থেকে ফিরে এলে, তাঁকে সংবর্দ্ধনা করবার জন্যে যুবকবৃন্দের প্রার্থনা-সমাজের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে স্বর্গীয় অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন মহোদয় প্রার্থনা-সমাজের প্রতিনিধি হয়ে নিম্নলিখিত ভাবে তাঁকে সম্বোধন করেন:—

"প্রিয় ভ্রাতঃ! তোমার প্রত্যাগমনে আনন্দিত হ'য়ে, তোমার প্রিয় এই প্রার্থনা-সমাজ তোমাকে এই পুষ্পমালা উপহার দিচ্ছেন, সাদরে এই উপহার গ্রহণ করে উহাকে আনন্দিত কর। যে মঙ্গলময় বিধাতার প্রেমবিধানে আহূত হয়ে দু'বছর পূর্ব্বে সুদূর পশ্চিমে গিয়েছিলে, আজ তাঁরি প্রেমবিধানে আমরা তোমার সহিত আবার মিলিত হলুম। অসংখ্য প্রেমাশীর্ব্বাদ দিয়ে, সেই অনন্ত প্রেমময় তোমার জীবন-মন্দিরকে উন্নত করেছেন এবং যে সমস্ত কষ্টভোগ না করলে জীবন ভাল করে গড়ে না, যে পবিত্র শ্মশানের ধুলিমুষ্টি ব্যতীত জীবনের ভিত্তি ভাল করে গঠিত হয় না, সে সমস্ত ত তোমাকে দিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। তোমার জীবনে কত সুকুমার ভাব বিদ্যমান রয়েছে। ভ্রাতঃ! সে সমস্ত দেখতে দেখতে আমাদের মনে কত আনন্দ, কত আশা হয়, তা কথায় প্রকাশ করতে পারা যায় না। তোমার জন্য এই প্রার্থনা-সমাজ প্রতীক্ষা করছে, এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতীক্ষা করছে, এই পবিত্র আর্য্যভূমি প্রতীক্ষা করছে। এস, তোমার স্থান অধিকার কর, প্রেমময় পরমেশ্বরের নিকট হতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। যাঁরা আপনাদের জীবন ভগবানের সেবায় উৎসর্গ ক'রে তাঁর সহিত মিলিত হয়েছেন, তাঁরাও আজ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছেন, তাঁদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আজ যদি তোমার চারধারে দাঁড়িয়ে তোমার পুরাতন বন্ধুগণ তোমার দিকে আশা ও আনন্দ-মিশ্রিত কাতরতার সহিত তাকায়, তুমি কি সে কাতরতাকে সস্নেহে সম্ভাষণ করবে না? তাঁদের হৃদয়ের দুঃখ দূর কর, তাঁদের প্রাণের আশা পূর্ণ কর। আর তাঁরা তোমার প্রেম-পুণ্য-পরিপূর্ণ জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে ধন্য হউন—সফলতা, সার্থকতা লাভ করুন। প্রেমময় পরমেশ্বরকে আজ আমরা অনেক ধন্যবাদ দিই এবং তোমার হৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয়কে এক ক'রে তাঁরি চরণে বার বার প্রণাম করি।"

দিনে দিনে এই জীবন-কুসুম বিকশিত হয়ে উঠতে লাগলো এবং ক্রমশঃ ইহার অপূর্ব্ব পুণ্য-সৌরভে ব্রাহ্মসমাজ ভ'রে উঠলো। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী, তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করলেন। তার আগে থেকেই তিনি নানাস্থানে উপাসনা করতেন। যুবকবৃন্দের প্রার্থনা-সমাজেও প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে নিয়মিত উপাসনা করতেন। তারপর থেকে, বিশেষ ভাবে নববিধান সমাজের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, এই দেবদূতের সংযোগিত্ব দেখা যেতো। দেশ বিদেশে যে যেখানে

এই মণ্ডলীর সভ্য আছেন, ক্রমশঃ সকলের সঙ্গে গভীর প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। তাঁর মত সকলের প্রিয়, সকলের আদৃত লোক প্রায় দেখা যায় না। শেষে এমনি হয়ে উঠেছিলো যে, তাঁকে না হলে কারুর চলতো না; সকলেই তাঁদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে তাঁকে চাইত। কোন কারণে তাঁকে না পেলে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হতো, কোন রকমেই মন উঠতো না। এক কথায়, তিনি সকলের হৃদয়ে অধিকার স্থাপন করেছিলেন, হৃদয়ের রাজা হয়েছিলেন।

কলেজ ছেড়ে দিলেও তিনি একদিনের জন্যেও পড়া ছাড়েন নি। প্রতিদিন নিয়মমত পড়াশুনা করতেন। তা ছাড়া দু'বছর ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত Oxford-এর Manchester কলেজে ধর্ম্মবিজ্ঞান পড়েন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে বার্লিনে The world Congress of Free Christian and Religious Progress-এর অধিবেশনে উপস্থিত হন এবং ইংলণ্ড ও ইউরোপের অনেক দেশ দেখে আসেন। পড়াশুনা করা, ইংরাজি Navavidhan (পূর্ব্বে The world and the New Dispensation নাম ছিল) কাগজের জন্যে প্রবন্ধ লেখা, উপাসনা করা, বন্ধু বান্ধবেরা দেখা করতে এলে তাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা—এই তাঁর সারাদিনের কাজ ছিল। তাঁর স্বর্গারোহণের পর ঢাকা থেকে শ্রদ্ধেয় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন যে, তিনি absentminded, Godpossessed মানুষ ছিলেন। কথাটা ঠিক। তার দু একটা উদাহরণ দিই। একবার এক জন এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "প্রমথবাবু এখানে আছেন?" তিনি অম্লান-বদনে উত্তর করলেন, "প্রমথবাবু কে? কৈ প্রমথবাবু ত এখানে নেই।" তিনি বল্লেন, "ওগো, না, না। নাদুবাবুকে আমি চাই।" তখন তিনি বুঝতে পারলেন ও হেসে ফেল্লেন। আর একবার তিনি একখানা সংবাদপত্র নিয়ে পায়খানায় ঢুকলেন। অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল, তিনি সেখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি যখন বিলেতে ছিলেন, একটা লম্বা overcoat পরে এমনি অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে চলতেন যে, ছেলেরা "ব্ল্যাকী", "ব্ল্যাকী" বলে চেঁচিয়ে তাঁর চমক ভেঙ্গে দিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

"ধর্ম্ম-সাধন"।

১৮।১৯ সংখ্যা—২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ বি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভাদ্রোৎসবের আলোচনা।

৩রা ভাদ্র—১৭৯৪ শক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—দুর্ব্বল আত্মার পক্ষে পরলোক-সাধনের সহজ প্রণালী কি?

উত্তর—সকল ধর্ম্মে পরলোক-সাধনের সহজ উপায়—মৃত্যু-চিন্তা। আমরা প্রত্যেকেই সংসারের অনিত্যতার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাই। ইহলোকের অসারতা দেখিয়া ইহা সামান্য লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং পরলোক অনন্তলোক—চিরবাসস্থান বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয় মূর্খেরা জানে, কিন্তু পণ্ডিতেরাও হয়তো স্মরণ রাখিতে পারেন না। সংসারে মায়ার প্রাবল্য বুদ্ধিকে স্থির রাখিতে দেয় না। পরলোকে অনুরাগ না থাকিলে তাহার সাধন হয় না। যাহা পর বলিয়া বোধ হয়, কে তাহা চায়? যাহা হউক, মৃত্যু স্মরণ করিয়া যে পরলোকের প্রতি অনুরাগী হওয়া, সে অজ্ঞান পক্ষে। পরলোক-সাধনের জ্ঞান পক্ষ কি? ঈশ্বরের সহিত চিরকাল বাস করিব, এই বিশ্বাস দৃঢ় করা। প্রতিদিনের উপাসনায় তাহা সাধন করিতে হইবে। কাহারো বাটীতে একটী মৃত্যু-ঘটনা হইলে বৈরাগ্য হয়, দুই চারি দিন পরে আবার চলিয়া যায়। ইহা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। ঈশ্বর-সাধন ছয় মাসে একবার হইলে তাঁহাকে কি লাভ করা যায়? ব্রাহ্মের অঙ্গীকার, প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব। এই জন্য ব্রাহ্ম প্রতিদিন ঈশ্বরের অধিকতর সন্নিহিত হইয়া আনন্দ ও শান্তি লাভ করেন। পরলোকের সাধন সেইরূপ প্রতিদিনের হওয়া চাই। ঈশ্বরে অনন্তকাল থাকাই পরলোকে বাস করার প্রকৃত ভাব। ঈশ্বরের সহিত যতবার যোগ হইবে, মনে হইবে, ইহা চিরকালের করিতে হইবে। যতবার দর্শন সহবাস হইবে, তাঁহার সহিত অনন্ত কালের যোগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ও পরকাল উভয়ের মিলনে যে সাধন, তাহাই বিশুদ্ধ ও তাহাই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মের পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য।

প্র—অন্তর্দৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিবার সাধন কি?

উ—আমরা অভ্যাসবশতঃ সর্ব্বদা বহিবিষয়ে ব্যাপৃত থাকি। অভ্যাসে প্রথমতঃ আমাদের কার্য্য করিতে হয়, অবশেষে আমরা তাহার অধীন হইয়া পড়ি। অভ্যাস আর কিছু নয়, কতকগুলি

ভাব বা কার্য্যসমূহ একত্র করা। তাহার একটীকে টানিলে সব গুলি আইসে। বারংবার কোন কথা বলিতে বলিতে তাহা সহজ হয়। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাহিরের ইন্দ্রিয় লইয়াই আমরা কার্য্য করি, এই জন্য আমাদের অভ্যাস বাহিরের বিষয়েই ধাবিত হয়। অন্তর আমরা দেখি না, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে যাওয়া সময় নষ্ট করা মনে করি। কেহ চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যান করিতে বসিলে, সংসারী বলিবে, এ লোকটা মিছামিছি সময় হরণ করিতেছে। কিন্তু জানা উচিত, একটা লাভ না থাকিলে কেহ কোন বিষয়ে যায় না। বহির্বিষয়ে কেন লোক আকৃষ্ট হয়? ধন বা মান মর্য্যাদার জন্য, কেন না তাহাতে লাভ, সুখ ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ইহারই জন্য লোকে পাহাড় সাগর তুচ্ছ করিয়া দিন রাত্রি পরিশ্রমপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আধ্যাত্মিক শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে তজ্জন্য আমরা রৌদ্র বৃষ্টি কিছু না মানিয়া লালায়িত হইয়া বেড়াইতাম। আমরা বাহিরের বিষয়ে উপকার আছে ভাবিয়া বাহিরের সংবাদ পত্র পড়ি, অন্তরের বিষয়ে সেইরূপ উপকার জানিলে তথাকার সংবাদ লইতাম। উভয় বিষয়েই পরিশ্রম করিলে লাভ হয়। বাহিরের কবাট খুলিলে গৃহমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোক আইসে। অন্তরের কবাট খোল, ঈশ্বরের আলোক ও বায়ু হৃদয়ে সঞ্চরণ করিবে। এ সকলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। ছাদে বসিয়া গালে হাত দিয়া বসিলে অন্ধকার দেখি, ঘুমাইয়া পড়ি। কিন্তু পরিশ্রমপূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি অভ্যাস করিলে অন্ধকারের মধ্য দিয়া আলোকের রাজ্যে গিয়া উপনীত হই। ইহার উপায় দুইটী :—

(১) অন্তরে দৃষ্টি করিলে লাভ হইবে দৃঢ় বিশ্বাস করা।

(২) ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে বারংবার অন্তর্দৃষ্টি অভ্যাস করা।

প্র—কিরূপ সাধনে যথার্থ অনুতাপ আসিতে পারে?

উ—যেমন যেমন ঘটনা বাহিরে আছে, তাহার অনুরূপ ভাব হৃদয়ে আছে। শ্রদ্ধেয় বা প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিলে অমনি মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হয়। অনুতাপ হৃদয়ের ভাব, তাহা জাগাইবার বস্তু আছে। অগ্নিতে হাত দিলে আর ঠাণ্ডা বোধ হয় না। পাপ-স্মরণে অনুতাপ আইসে। আপনার জীবনের জঘন্যতা একদিকে ও ঈশ্বরের পবিত্রতা অন্যদিকে চক্ষের সমক্ষে রাখিলে যথার্থ অনুতাপ আইসে। ইচ্ছাতে অনুতাপ আইসে না, কিন্তু যে বস্তুতে আসে তাহা স্মরণ করিতে পারি—ইচ্ছাপূর্ব্বক বার বার জীবনের জঘন্যতা স্মরণ করিলে অনুতাপ আসিবে। দুর্গন্ধ বস্তু ছাড়িব ইচ্ছা করিলেই ছাড়া যায় না, কিন্তু তাহার ঘ্রাণ অনুভব হইলেই তাহা ছাড়া যায়। আমরা অনেক সময় মনে করি, এত সাধন করি, একটু পাপ থাকিলই বা, কত লোকের কত থাকে? ইহাতে পাপে উপেক্ষা হয়, অনুতাপের পথ রোধ হয়।

প্র—যাহা আপাততঃ বুঝিতে না পারি, বিশ্বাস কর, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

উ—বুঝিতে পারা ও বিশ্বাস করা এ দুয়ের একের ভূমি অন্যের বহির্ভূত। বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভূমি অল্প; বিশ্বাসের ভূমি প্রশস্ততর। ইহলোক দেখি, বিশ্বাস করি, পরলোক দেখিনা, অথচ বিশ্বাস করি। ইহার মর্ম্ম এই, যাহা আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে না পারি, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বরের বিষয় কে আয়ত্ত করিতে পারে? "তাঁহাকে জানি যে এমন নহে, না জানি যে এমনও নহে" ইহার মর্ম্ম যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসের ভাব বুঝিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান স্থূল ও অল্প পরিমিত, আমরা কিছুই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারি না। পরলোক, ঈশ্বরের করুণা ইত্যাদি যতটুকু স্পষ্ট দেখিতে পাই, গ্রহণ করিবই করিব; আবার কতক সত্য বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণ করিতে না পারিলেও বিশ্বাস করিতে হইবে। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, তবে গোলাপফুলে কাঁটা কেন? ঝড়ে এত লোক মরে কেন? বুদ্ধি ইহা বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে। ভক্ত বলেন, এ সকল ঘটনার কারণ আছে, শাস্ত্রকারেরা তাহা আবিষ্কার করিবেন; কিন্তু আমি বিশ্বাসচক্ষে ঈশ্বরকে কেবলই মঙ্গলময় দেখিতেছি। অনেক ভক্ত আপনার জীবনে দেখিয়াছেন, যে সময় কোন বিষয় বুঝিতে না পারেন, যদি শান্তভাবে ধৈর্য্য-সহকারে সত্য বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করেন, সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে দৃঢ় বিশ্বাস কর, যাহা বুঝিতে না পার, তিনি বুঝাইয়া দিবেন। বিপদ্, রোগ, মৃত্যু সকলই মঙ্গলের কারণ জানিতে পারিবে। যাহার প্রমাণ নাই, অন্ধ হইয়া তাহা ধরিয়া থাকা ব্রাহ্মধর্ম্মসম্মত নহে; কিন্তু যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহার এক অংশ না বুঝিলেও বিশ্বাস করিতে হইবে। বুদ্ধি ভিন্ন বিশ্বাসের অন্য প্রমাণ আছে।

প্র—কোন্ সাধন দ্বারা ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগ হয়?

উ—ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ। জ্ঞান দ্বারা পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ বলিয়া জানি। হৃদয়ের প্রেম দ্বারা তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করি। হস্ত দ্বারা তাঁহার কার্য্য করি। সত্য, প্রেম, পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত এই ত্রিবিধ যোগ সাধন করিতে পারি; কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোগ প্রাণের যোগ অর্থাৎ ঈশ্বরে জীবিত থাকি, তাঁহা ছাড়া সকলেই মৃত হই। জলে মৎস্য থাকে কেন? জলের সহিত মৎস্যের আর কিছু যোগ নয়—প্রাণের যোগ। সে জীবনে জীবন লাভ করে, অন্তর হইলে বাঁচে না। ঈশ্বরের সহিত ভক্তের সেইরূপ যোগ হইলে, ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচি না, এ কথার অর্থ বুঝা যায়। ভক্ত কেন উপাসনা করে—কেন ঈশ্বরকে ভালবাসে? মাছ কেন জলে থাকে, কেন জল ভালবাসে? জলের উপরই মাছের জীবন, মরণ, স্ফূর্তি সকলি নির্ভর করে। ভক্তের

বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ, তাঁরা কেহ বা "উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" হইয়া, কেহ বা "বিবেকানন্দ" হইয়া জগদ্বিখ্যাত বক্তা ও ধর্ম্মনেতা হইয়া চলিয়া গেলেন। নববিধানে আমি যে দীন সেবক, সেই দীন সেবক হইয়াই রহিয়াছি। কিন্তু ইহা নির্ভয়ে বলিব, ইঁহাদের, বিশেষতঃ বিবেকানন্দের যাহা কিছু শিক্ষা ও সাধনা, তাহার মূলে শ্রীকেশবচন্দ্রেরই "নক্স" ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আমার প্রিয়বন্ধু নরেন্দ্রনাথ "বিবেকানন্দ" নাম লইয়া শ্রীকেশবচন্দ্রের নক্সার উপর পরমহংসের ছাপ মারিয়া, নূতন হিন্দুয়ানী নামে মার্কিণে ইহা প্রচার করিয়া আসাতেই, এদেশে তাঁহার এত প্রভাব বিস্তার হইল; এবং ইহাতে যাঁহারা নববিধানের উচ্চ জীবনাদর্শ গ্রহণে অক্ষম, তাঁহারা হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়া নূতন এক স্বেচ্ছা-সেবক সম্প্রদায় হইবার সুযোগ পাইলেন।

এখনকার যুগে খাঁটী জিনিষের কাটতি ত অতি কম। যে যত সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন জাহির করিতে পারে, তাহারই তত মান কাটতি হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যে যেমন, ধর্ম্মের ব্যবসায়েও তেমনি দেখিতে পাই। তাই কেবল বিবেকানন্দের দল কেন, কতই গেরুয়াধারী যুবা সন্ন্যাসিনীর দল রচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীকেশবচন্দ্র যেমন বিরোধীদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"I have no enemies on earth. Those who profess to be my enemies, are my friends in disguise; they are myself reproduced." ঠিক তেমনি বিবেকানন্দ যে নামেই পরিচিত হউন, শ্রীকেশবচন্দ্রেরই reproduction ভিন্ন আর কিছুই নন। তবে তাঁর সঙ্গে যে গুলি ভেজাল মিশাল মত হিন্দুয়ানীর নামে চালাইয়াছেন, সেটা না করিলেই ভাল হইত।

তাঁহার প্রভাবে তাঁহার শিষ্যগণ যে দীন-সেবার কার্য্য চারিদিকে সম্পাদন করিতেছেন, ইহা যথার্থই বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীকেশবচন্দ্র প্রথম ব্রাহ্মসমাজে যে সেবা-সাধন প্রবর্ত্তন করেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সেই কাজ জাগাইয়া রাখিয়া নববিধানেরই কার্য্য করিতেছেন, এ জন্য নিশ্চয়ই আমরা কৃতজ্ঞ। ইঁহাদের আত্মত্যাগ প্রশংসনীয়।

রামকৃষ্ণদেবের শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমাদের বন্ধুগণই সম্পাদন করেন। আমাদের সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ, ভক্ত অমৃতলাল বসু, আমার শ্বশুর রাজমোহন বসু ও গৌরানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন যুবা নানা প্রকার নিদর্শন সহযোগে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তাঁহার ভস্ম আনয়ন করেন। আমি শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলালের নিকট হইতে সেই ভস্ম কিঞ্চিৎ লইয়া এখনও আমার ব্রহ্মানন্দাশ্রমে রক্ষা করিতেছি। এবং ভাই অমৃতলালের সঙ্গে আমিও গিয়া স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাকুড়গাছীর বাগানে পরমহংসদেবের ভস্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া আসি। তখন নববিধান-দলের লোকেরাই তাঁহাকে আপনাদের অন্তরঙ্গ বোধে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করেন। কেবল দুই চারিজন ভিন্ন তখন তাঁহার কেহ শিষ্য ছিলেন না।

আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং আমার কাছে বলিয়াছেন, "ঈশ্বর কখনও গর্ভের ঘায় মরে না"; ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে দিয়াছেন, তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না।

তিনি আমার নিকট কতবার বলিয়াছেন, "কেশব ত একটা বট গাছ; কত জীব জন্তু পশু পক্ষীকে তিনি আশ্রয় দিয়ে আছেন; আর আমি ত একটা ঝাঁটা তাল গাছ, কোন রকমে একা খাড়া হয়ে আছি।" "কেশব যে ষ্টীম বোট, নিজেও ঝক্ ঝক্ করে যাচ্ছে, আবার কত গাধা বোটকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে; আর আমি একটা কলার মান্দাস, কেউ বসলে টুপ করে ডুবে যাই।" ইহা দ্বারা স্পষ্ট বলিয়াছেন, কেশবচন্দ্রের যেমন দল, তাঁর তেমন দল নাই। কেশব তাঁহা অপেক্ষা শক্তিশালী ও দলপতি। কেহ উপদেশ চাহিলে বলিতেন, সে আধারে অর্থাৎ কেশবই উপদেশ দিবার অধিকারী।

কেশবচন্দ্রকে একবার জড়াইয়া ধরিয়া বলেন, "তুমি শ্যাম, আমি রাধা; আমি রাধা, তুমি শ্যাম", এমনই বলিতে বলিতে ভাবাবেশে সমাধিস্থ হন।

তিনি আমার সম্মুখে শ্রীকেশবচন্দ্রকে বলিয়াছেন, "তোমার কাছে এলে আমার চৌদ্দপো মা গলে যায়" অর্থাৎ মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হইয়া যান। ইহাতে তিনি কেশবচন্দ্রের উচ্চধর্ম্ম-প্রভাব মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং প্রথম যখন বেলঘরিয়ার বাগানে কেশবচন্দ্রের নিকট গমন করেন, তখন তিনি গিয়াই প্রশ্ন করেন, "ওগো বাবু, তুমি নাকি ঈশ্বর দর্শন কর, সে দর্শন কি, আমাকে বল না।" ব্যাকুল শিক্ষার্থীর ভাবেই তিনি শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট ঈশ্বর-দর্শন-শিক্ষার্থী হইয়া গমন করেন। পরে যখন তিনি স্বীকার করেন যে, কেশবের নিকট আসিলে তাঁর চৌদ্দপো মা গলে যায়, ইহাতে কি এই স্বীকার করা হইল না যে, তিনি শ্রীকেশবের প্রভাবেই নিরাকারের দর্শন পাইয়াছিলেন?

তিনি আমাদের সাক্ষাতে পরে কালীকে গালাগালি দিয়া বলিয়াছেন, "তুই শালীই ত এদ্দিন আসল মাকে দেখতে দিস্‌নি।" আরও বলিয়াছেন, "আমি আর ও শালীর মুখ দেখি না।"

ইহাতেই সকলে বুঝুন, শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ এবং কে কাহার শিক্ষক?

তবে শ্রীকেশবচন্দ্র সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী, সংসার-তপোবনবাসী গৃহস্থ যোগী, আর শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তীব্র সন্ন্যাসী, হিন্দু পরমহংস। যাহা হউক, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, উভয়ে উভয়ের হাত ধরাধরি করিয়া নাচিয়াছেন, আর নববিধান-সঙ্গীতাচার্য্য-রচিত সঙ্গীত গাহিয়াছেন, "মা আমাদের, আমরা মায়ের।"

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক।

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, হাওড়া খাঁটরা নিবাসী শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার দাসের ২য় পুত্রের জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। এই শিশু বিগত ২০শে বৈশাখ (৩রা মে, ১৯৩১) রাত্রি ১টার সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। মঙ্গলময়ী মা শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার প্রাতে, হাওড়া খাঁটরা নিবাসী শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার দাসের প্রথম পুত্রের নামকরণ নবসংহিতানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শিশু "রথীনকুমার" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। মঙ্গলময়ী মা শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহাশীর্ব্বাদ—গত ২রা জুলাই, কলিকাতায়, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দিরার (বুলবুল) সহিত, স্বর্গগত শান্ত সাধক ভাই কেদারনাথ দের পৌত্র, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুশীলকুমার দের (I.C.S.) শুভবিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ সুশীলকুমারের মাতামহ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই অনুষ্ঠানে উপাসনার কার্য্য করেন। ভগবান্ ইঁহাদিগকে শুভাশীষ দান করিয়া পবিত্র ব্রতের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন।

মেয়রের সংবর্দ্ধনা—গত ১১ই জুলাই, সন্ধ্যায়, শান্তি-কুটীরে, কলিকাতার নূতন মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সংবর্দ্ধনা করা হয়। মণ্ডলীর অনেকেই সানন্দে যোগদান করেন, এবং অনুষ্ঠানটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। সঙ্গীতান্তে ভাই অক্ষয়-কুমার লধ প্রার্থনা করিয়া মেয়রকে প্রাণের সংবর্দ্ধনা জানাইলে, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমান্ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাণের আবেগে অদ্যকার অতিথিকে প্রাণের সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। সংবর্দ্ধনান্তে মেয়র সরলভাবে যে কয়টী কথা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাতে সকলেরই মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়। তিনি বলেন, "'পারিনা' এই কথাটী আমি বলি না, সকল কাজে আপনাকে ঢেলে দিই, ফলাফল চিন্তা না করিয়া আনন্দমনে সকল কাজ করিয়া যাই, নিত্য নূতন কাজের ভিতর বিরাম ও আরাম লাভ করি, এই রূপে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পড়েছি।" শেষ কথা বলেন, "আজিকার আনন্দ সত্যিকার আনন্দ নয়, কাজ করতে করতে যে দিন চলে যাব, সেই দিনই প্রকৃত আনন্দের দিন হবে।" ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন, নববিধানের আদর্শ পথে চলিয়া, সাধু সাধ্বী পিতামাতার সুসন্তানরূপে তিনি দেশের ও মণ্ডলীর সেবা করিয়া ধন্য হউন। এই সম্মিলনে শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুধা সেন ও শ্রীমতী বাণী বসু সুন্দর সঙ্গীত করিয়া সকলের মনে আনন্দ দান করিয়াছেন। পরে কথাবার্ত্তা ও আলাপ পরিচয় হইয়া, জলযোগান্তে অনুষ্ঠানটী শেষ হয়।

উৎসব—হিমালয় ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চচত্বারিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, গত ১৭ই জুন অপরাহ্নে মহিলা-সম্মিলন হয়, ১৮ই জুন সন্ধ্যায় শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ "নূতন ধর্ম্মের অভিব্যক্তি" সম্বন্ধে ছায়াচিত্র যোগে ডাঃ প্রেমনাথ সুরীর সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন, ১৯শে জুন সাম্বৎসরিক দিনে সন্ধ্যায় শ্রীমান্ পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার উপাসনা করিলে, কীর্ত্তন ও আরতি হয়, ২০শে জুন অপরাহ্নে ধর্ম্মসংঘে সার যোগীন্দর সিংহ, মৌলানা গুলাম মহম্মদ মুফতি, মিঃ মোং গি, ডাঃ মুঞ্জে, মিঃ শা (I.C.S.), শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ, এবং রেভঃ এ, বি, চন্দুলাল বক্তৃতা করেন এবং ভারতের রয়েল আফগান কাউন্সিল জেনেরল সর্দ্দার আবদার রসুল খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ২১শে জুন প্রাতঃকালে মিসেস এস্ মজুমদার বাঙ্গলায় উপাসনা করেন, অপরাহ্নে শ্রীমান্ পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার হিন্দিতে উপাসনা করিলে কীর্ত্তনান্তে উৎসবের কার্য্য-প্রণালী শেষ হয়।

সেবা—ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ শিলং প্রবাসকালে, গত ১৭ই মে সন্ধ্যায় পোলসবাজার ব্রহ্মমন্দিরে, ২৪শে প্রাতে চেরাপুঞ্জী ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন, ২৫শে পোলিসবাজার ব্রহ্মমন্দিরে ইংরেজি বক্তৃতা, ২৭শে লাবান মহিলাসমিতির অধিবেশনে "শরীর ও মনের স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে বাঙ্গলা বক্তৃতা, ২৯শে ওয়েলস মিশন চার্চ্চে য়্যালকোহল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, ৩০শে আপল্যাণ্ডস্ রোডে শ্রীমতী সুশীলা সেনের নবগৃহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা, ৩১শে প্রাতে লাবান ব্রহ্মমন্দিরে বাঙ্গলায় উপাসনা ও সন্ধ্যায় পোলিস বাজার ব্রহ্মমন্দিরে ইংরেজীতে উপাসনা করেন, ২রা জুন কুইণ্টন হলে "শরীর মনের স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে বাঙ্গলা বক্তৃতা, ৪ঠা সিনেমা হলে "স্বাস্থ্য" বিষয়ে লেণ্টার্ণ যোগে হিন্দি বক্তৃতা এবং ৭ই গৌহাটীতে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসুর সন্তানের নামকরণে উপাসনা করেন।

সমাধি-প্রতিষ্ঠা—গত ১২ই জুলাই, সিমলা হিমালয় ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে, লাহোরের স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কাশীরামের পবিত্র সমাধি-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

পুরীর সংবাদ—পুরী নব জগন্নাথ-মন্দির এবং নব সমন্বয়-আশ্রম সম্বন্ধে আবেদন পত্র পাঠ করিয়া, পুরীর সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ এন, পি, থাডানি সাহেব নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়া আমাদের কার্য্যে সহায়তা বিধান করিয়াছেন ঃ—

Collector's Bungalow, Puri

The 13th June, 1931.

The Appeal issued under the signature of Rev. P. N. Mallik on behalf of the New Universal

Dispensation Church Puri, for raising a Mandir and a Ashram for the propagation, training and culture of the universal religion should be enthusiastically received by the public.

It is a call for Universal brother hood based on synthesis of cultures and those abiding truths which are common to all religions and the ignoring or reconciling of accidental differences and rituals. The appeal is peculiarly well timed as now more than ever the need for communal unity is crying and urgent.

I hope the appeal will find a generous response from the religious minded and those who have the larger interest of the community at heart.

Sd/ N. P. Thadani I. C. S.,
Collector, Puri.

সাম্বৎসরিক—গত ২৩শে জুন, ১৭নং রামমোহন দত্ত রোডে, শ্রীমতী বিভা দেবী ও স্বর্গীয় কাপ্তান কে, কে, মুখার্জির স্বর্গীয় শিশু কন্যার সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ সত্যানন্দ রায়, ২৪শে জুন, ২৯।১এ নিউপার্ক ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রাধানাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া বিভারতা দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ২৫শে জুন ১নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ সেনের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১লা জুলাই ২৯।১এ নিউপার্ক ষ্ট্রীটে ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের মাতা স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এবং ২রা জুলাই ১নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

গত ২৮শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকালে কাকিনা (রংপুর) ব্রহ্মমন্দিরে, শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে তাঁর জীবনী পাঠ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন উপাসনা করেন।

গত ৩০শে জুন, সন্ধ্যাকালে, ভাগলপুরে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে, শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু উপাসনার কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু তাঁর জীবনের গভীর যোগের বিষয় বিশদরূপে বলেন। স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা শ্রদ্ধা সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। ২৮শে জুন, রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরেও শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উপদেশের মধ্যে তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়া স্কুল—স্বর্গগত ভাই প্রমথলাল সেনের (নালুদার) প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, গত ১লা জুলাই, ভিক্টোরিয়া মহিলা-বিদ্যালয়ে অপরাহ্নে ৩টায় স্মৃতি-সভা হয়, ডাঃ সত্যানন্দ রায় ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় নালুদার সুন্দর জীবনের কথা বলেন। সন্ধ্যায় ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ তথায় উপাসনা করেন।

গত ১০ই জুলাই, হাওড়ায়, ১৯নং কুচিল সরকার লেনে, স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হয়।

গত ১৩ই জুলাই, ১৭নং বৈঠকখানা রোডে, স্বর্গীয় সুধাংশুমোহন চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হয়

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

জানুয়ারী, ১৯৩১—শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদভানী মাসিকদান ২৫৲, রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসু মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে ৫০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের স্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, গাজিপুরের স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায়ের সহধর্ম্মিণী স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ১০ , শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু পিতৃসাম্বৎসরিকে ৪৲, শ্রীমতী শরৎকুমারী দেব পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী চপলা মজুমদার পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত শর্ব্বরীকান্ত ধর নবশিশুর জাতকর্ম্মে ২৲, শ্রীযুক্ত বিপুলচন্দ্র গুপ্ত (কাংড়া) পৌত্রীর নামকরণে ১০৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখোপাধ্যায় মাসিক দান দুই মাসের ৪৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী মাসিকদান ১৫৲, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস ভিন্ন ভিন্ন শুভানুষ্ঠানে ১০৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲ ও পিতৃসাম্বৎসরিকে ৫৲, রায় ব্রাদার্স ১১।৵১০, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত মাসিকদান ১৲ এবং ডাঃ সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল মাতৃসাম্বৎসরিকে ৩৲ টাকা।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১লা শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ১৪শ সংখ্যা।
১৬ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
1st August, 1931.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন, অধমতারণ, সদ্গতিদাতা, পরম দেবতা! তুমি আমার মত, আমাদের মত, অধম মলিন জীবদিগের উদ্ধারের জন্য, উচ্চ গতি বিধান জন্য, কত আয়োজনই করিয়াছ। সংসার-মোহে অন্ধ আমি, সংসারের কোলাহলে বধির আমি; তোমার সে বিচিত্র আয়োজন দেখিয়াও দেখি না, তোমার স্বর্গরাজ্য হইতে পরিত্রাণের কত সুসংবাদ আসিতেছে, তাহা শুনিয়াও শুনি না। যাহারা দীর্ঘ দিন সংসারের নানা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্য কিঞ্চিৎ দর্শন করিলেও, অতীন্দ্রিয় লোকের অমৃত কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিলেও, তেমন করিয়া অন্তর্ম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় নাই, সাধন-সমুদ্রের গভীর হইতে গভীরে ডুবিয়া স্বর্গের অমূল্য ধন রত্ন সংগ্রহের জন্য তেমন করিয়া ব্যাকুল হয় নাই, আমাদের মত সেই সকল বিষয়াসক্ত জীবদিগের উদ্ধারের জন্যই তো যুগে যুগে তোমার অবতরণ এবং তোমার সাধু ভক্তদিগের আগমন। অতীতে তোমার সাধু ভক্ত প্রেরিত মহাজনদিগের জীবনের দৃষ্টান্তে কত পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল, কত বিষয়াসক্ত মানব তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পূজা বন্দনার পুণ্য গন্ধে মোহিত হইয়া চিরদিনের জন্য তোমার পদে আত্ম-সমর্পণ করিল; কিন্তু নব যুগে আমাদের মত পাষণ্ড-দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, তুমি অতীতের ও বর্ত্তমানের কত ঋষি আত্মা, ভক্তাত্মা, স্বদেশের বিদেশের কত সাধু মহাজনদিগকে লইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি অযাচিত কৃপাগুণে আমাদের অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া তোমার শ্রীমুখের জ্যোতিতে আমাদের হৃদয়কে কতবার আলো-কিত করিয়াছ, তোমার শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনাইয়া কত সঙ্কটে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ, কত সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছ, তথাপি আমাদের মন আশানুরূপ তোমার হইল না, আমাদের অন্তরের গূঢ় পাপ এখনও সমূলে উৎপাটিত হইল না। তোমার সাধ পূর্ণ হইল না, আমাদেরও অন্তরের গূঢ় সাধ মিটিল না, সাধু ভক্তদিগেরও আকাঙ্ক্ষা আমাদের সম্পর্কে পূর্ণ হইল না। আমাদের অন্তরের এই দুরবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া কাতরপ্রাণে তব চরণে ভিক্ষা করিতেছি, তীব্র অনুতাপানল জ্বালিয়া আমাদের প্রাণকে দগ্ধ কর, অন্তর বাহিরের সকল আবর্জ্জনা ভস্মীভূত করিয়া চিত্তকে বিশুদ্ধ কর, বিবেক-কর্ণকে নির্ম্মল কর, সাধু ভক্তদিগের দৃষ্টান্তে আমাদের অন্তরকে মুক্তিপ্রদ বিশ্বাস, বিনয়, ভক্তি এবং

বাধ্যতায় ভূষিত কর, যেন আমরা তাঁহাদের জীবন্ত সঙ্গ ও সহবাসে তোমার পূজা, বন্দনা, দর্শন, শ্রবণ ও ইচ্ছা-পালনে স্বর্গের পথে, মুক্তির পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সেবা-ধর্ম্ম।

আহা! সংসারে আসিয়া নিজ প্রয়োজনে কত সেবাই গ্রহণ করিলাম, অন্যের দ্বারা কত ভাবেই উপকৃত হইলাম, কিন্তু নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের সেবা প্রাণ ভরিয়া করিলাম কৈ? অতীত জীবনে বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত নানা অবস্থায়, নানাভাবে, নানা আকারে, প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে কত সেবা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার কি গণনা সম্ভবে? আর এই দীর্ঘ জীবনে সেবার কার্য্য যদি কিছু করিয়া থাকি, তাহা কত সামান্য, তাহার পরিমাণ কতই অল্প। আবার সে সেবা-কার্য্যের গভীরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই, সে সেবার মধ্যে কত সূক্ষ্ম স্বার্থ, স্থূল স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। নিখুঁত নিঃস্বার্থ সেবা, পরের দুঃখে, পরের অভাবে ব্যথিত হৃদয়ে সেবা জীবনে কয়টা সম্পন্ন হইয়াছে? সেবাব্রতে ব্রতধারী হইয়াও নিঃস্বার্থ পর-সেবার মর্ম্ম বুঝিলাম না, ঈশ্বর-প্রেমে, জীব-প্রেমে বিগলিত হইয়া সে উচ্চ সেবার কিঞ্চিৎ করিয়াও প্রাণ ধন্য হইল না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয়, আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে?

নিঃস্বার্থ উচ্চ সেবার ক্ষেত্র জগতে কতই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেবা বিষয়ে খৃষ্ট সম্প্রদায় অনেক উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, উচ্চ শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারত নানা আকারে সেবা-ব্রতে অগ্রসর হইতেছে। ভারতের নরনারী আজ সমভাবে সেবাক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ ভারতের খ্যাতনামা উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মিদল হইতে ক্রমে পরিচিত, অপরিচিত অসংখ্য নরনারী, দেশ-সেবা-কার্য্যে প্রমত্ত। নারীগণ স্বতন্ত্র ভাবে দলবদ্ধ জীবনে সভা সমিতি করিয়া, দেশের নানা কঠিন সমস্যার পূরণ-কার্য্যে ব্যস্ত, নানা সেবা-কার্য্যে রত। ইহা ব্যতীত দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর দুঃখ-মোচনে, বন্যানিপীড়িত জনমণ্ডলীর দুর্গতি দূর করার সংকল্পে, সাময়িক নানা পরীক্ষা বিপদে, অভাবে, দৈন্যে পতিত জনদের উদ্ধারে কত ব্যক্তি নিঃস্বার্থ সেবা করিয়া ধন্য হইতেছেন। এ সেবার মূল্য কত! সেবা যে আকারেরই হউক, নিঃস্বার্থ-ভাবে, পরদুঃখমোচন উদ্দেশ্যে, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সহানুভূতিতে সম্পন্ন হইলেই তাহা স্বর্গীয়, পুণ্যপ্রদ।

পূর্ব্বে যে সকল সেবা-কার্য্যের উল্লেখ করিলাম, তাহার অধিকাংশই পৃথিবীর ব্যাপার লইয়া। পার্থিব সেবা সত্যই অপার্থিব আকার ধারণ করে, স্বর্গের শোভা সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয়, স্বর্গের পুণ্য গন্ধে আমোদিত হয়, যদি সেবা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং পরার্থ হয়। যথার্থ সেবা অপার্থিব, তাহার ফল ইহপরকালব্যাপী।

কিন্তু পৃথিবীতে অন্য এক শ্রেণীর সেবা কার্য্য আছে, যাহা সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয়; যাহা কেবল আধ্যাত্মিক জগৎ লইয়া, মর লোকে অমর লোক লইয়া। এ সেবা-স্রোত কোন না কোন আকারে, সকল দেশে, সকল কালেই প্রবাহিত হইতেছে। যখন হইতে মনুষ্য-মণ্ডলী পরিপক্ব ভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গঠন লাভ করিয়াছে, তখন হইতেই এ সেবা-স্রোত কোন না কোন আকারে, কখন প্রবল বেগে, কখন মৃদু মন্দ গতিতে, মানব-সমাজ-ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছে। জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়া দেওয়া, স্বর্গের ধর্ম্ম মানবের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে ও মণ্ডলীগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা, দেহে বর্ত্তমানে মানুষ যে পথে, যে উপায়ে ঈশ্বর হইতে অক্ষয় অমর জীবন লাভ করিতে পারে, মানব সমাজে সেই পথ ও সেই উপায় প্রদর্শন করা, সেই সুসংবাদ সকলের নিকট দান করাই এই স্বর্গীয় সেবা। এই সেবার পথে যাঁহারা কার্য্য করিয়া জীবনপাত করিলেন, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীঈশা, শ্রীমহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনানক প্রভৃতির জীবন, মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতীতে এই সকল মহাপুরুষের জীবন-যোগে যে সেবা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার স্রোত মন্দীভূত হইলেও, এখনও কোন না কোন আকারে বিভিন্ন মানব-সমাজক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কিছু না কিছু তাহার সুফল ফলিতেছে।

বড় বড় সহরে সকল সম্প্রদায়ের কার্য্যই নানাভাবে কিছু না কিছু চলিতেছে। সুদূর পল্লীতে পল্লীতেও দেখি, মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে নমাজের আওয়াজ

ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইতেছে, নমাজের শুভ নিমন্ত্রণ সকলের প্রাণকে স্পর্শ করিতেছে। হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যেও দেখি, খোল করতাল ও হরিনামের ধ্বনিতে এখনও বঙ্গ ভারতের আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং দীন দুঃখী নরনারী হরিনাম রসসুধা আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছে।

নব যুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই সেবা-কার্য্যের প্রবল স্রোত নূতন উদ্যমে সদলবলে বঙ্গ, ভারত ও সমস্ত পৃথিবীবক্ষে প্রবাহিত করিয়া মানব-জীবন-ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিতে প্রাণগত চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবের ধর্ম্ম-প্রচার স্বদেশে, বিদেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। উচ্চ শিক্ষিত হইতে নিরক্ষর, ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা, স্বদেশের বিদেশের সকলের জীবনে কেশব-প্রবর্ত্তিত নব যুগের নব ধর্ম্মের সুসংবাদ এক আশ্চর্য্য জাগরণ উপস্থিত করিয়াছে। সকল প্রাচীন সম্প্রদায় মধ্যে প্রচারের নব উৎসাহ, নব উদ্যম দেখা দিয়াছে, কত ভাবে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে! সকলে যেন দীর্ঘ দিনের ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া বিবিধ সংস্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল, মর দেহ এখানে রক্ষা করিয়া, বাহিরের প্রচারক্ষেত্র, ধর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতেও যেন লুকাইয়াছেন; তাঁহার জীবন্ত সহকর্ম্মী বীর-দলও একে একে যবনিকার আড়ালে যাইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রকে শূন্য করিয়া ফেলিতেছেন। তবে কি এই নব-বিধানের সেবা-ক্ষেত্রে কার্য্য-স্রোত বন্ধ হইয়া যাইবে? বাহিরের লক্ষণে যেন তাহাই মনে হইতেছে। কিন্তু সত্য কথা কি? ব্রহ্মানন্দের অমর জীবন এখনও জীবন্ত ভাবে কার্য্য-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান, তাঁহার দলের জীবনও এখনও কার্য্য-ক্ষেত্রে জীবিত। স্বয়ং পবিত্রাত্মা তাঁহাদিগকে লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই অবতীর্ণ। এই জীবন্ত নববিধানের সেবাক্ষেত্রে যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবার নয়, যদিও সময়ে সময়ে সে অগ্নি একটু মন্দীভূত হইতে পারে। ব্রহ্ম-কৃপা-পবনে উহা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিবেই চলিবে; এ ক্ষেত্রে, এ পথে নিঃস্বার্থ প্রচার-স্রোত সেবা-স্রোত প্রবাহিত হইবেই হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ভিক্ষা।

ভিক্ষার ন্যায় আত্মমর্য্যাদাহীন বিষয় আর কি আছে? উপার্জ্জনক্ষম আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে, ইহা সমাজের চক্ষে নিতান্তই হীনতা। বাস্তবিক আপনার ভরণ পোষণের জন্য এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা কেবল হীনতা নয়, ইহাতে ঈশ্বরের প্রতিও অবিশ্বাসের পরিচয় দেওয়া হয়। যিনি সামান্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকেও আহার যোগাইতেছেন, তিনি কি তাঁহার মানব-সন্তানকে অযাচিত রূপে আহার পান যোগাইতে পারেন না, যদি সে একান্ত-হৃদয়ে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার সেবায় দেহ মন উৎসর্গ করে। কিন্তু ভক্ত সাধকগণ ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রকৃত ধর্ম্ম-সাধনের প্রধান উপায় বলিয়া অবলম্বন করেন; কেন না, তাহাতে আত্ম-নির্ভরের অহংকার চূর্ণ হয়, আত্মার দীনতা সাধন হয়, এবং ঈশ্বরের জন্য ও পরসেবার জন্য পরের দ্বারস্থ হওয়ায় হীনতা সহ্য করাতে যে আত্মপ্রসাদ, তাহা প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়। পরার্থে ভিক্ষার্থী হইয়া কাহারও দ্বারস্থ হইলে যখন ভিক্ষা লাভ হয়, তাহাতে যত না লাভ হয়, তাড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হইলে আরো অধিক লাভ হয়। কারণ ঈশ্বরের বা তাঁহার কার্য্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সে হীনতা সহ্য করা সৌভাগ্য ভিন্ন আর কি? উচ্চ সাধকদিগকেই ঈশ্বর সে পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।

উজ্জীবন।

বীজ দেখিতে জড়বৎ পদার্থ। আপাততঃ দেখিতে যেন জীবন-বিহীন। কিন্তু তাহাতে জল সিঞ্চিত হইলেই তাহা হইতে অচিরে অঙ্কুর উদ্গত হয় এবং তাহা ক্রমে শাখা-পল্লব-বিশিষ্ট, ফুল ফলে শোভিত বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। কতজন তাহার ছায়ায় শীতল হয়, কতজন তাহার ফল ফুল সম্ভোগ করিয়া দেহ মনে পরিতৃপ্ত হয়। এই মানব-দেহ জড় রক্ত মাংসে গঠিত, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে সেই জীবন-স্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং বাস করিতেছেন। আত্মার্পণ ও বিশ্বাস ভক্তি সাধন বারি সিঞ্চন হইলে এই দেহ হইতে দেব জীবন অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমে প্রেম পুণ্যে শোভিত হইয়া এ তনু ভাগবতী তনু হয়, ইহা হইতে ব্রহ্ম-চরিত্রের ফুল স্ফুরিত হয়। এই জন্যই সাধু বলেন, "ইয়া সচাকবি কোটরী"—ইহা সত্য-স্বরূপের মন্দির। ঈশাও বলিলেন, "Ye are the temple of God"—"তোমরা ঈশ্বরের মন্দির।" তাই "হরি হে, এ দেহে, আছ সদা বর্ত্তমান" দেখাই আমাদের উজ্জীবন।

কুরুক্ষেত্র, না শ্রীক্ষেত্র ?

কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম-ক্ষেত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে, যেখানে এক দিকে ধর্ম্মপুত্র, অপর দিকে অধর্ম্ম কুরুপুত্র পরস্পরের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং পরিণামে কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই নাম কুরুক্ষেত্র। যেখানে ভক্ত-সঙ্গে ভগবান্ জগন্নাথরূপে ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া জগন্ময় প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, যেখানে মানবে মানবে জাতি-ভেদ নাই এবং পরস্পর প্রেম পুণ্য অন্ন বিতরণ করিয়া আনন্দ-বাজার স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীক্ষেত্র নামে পরিচিত। এই দুইটীর আধ্যাত্মিক ভাব যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, দেখি, বাস্তবিক এই সংসারই আমাদের কুরুক্ষেত্র; এখানে ক্রমাগতই জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে নিধন করিতেই নিরত রহিয়াছে। এখানে শ্রীভগবানকে জীবন-রথের সারথি করিয়া যদি আমরা পাপ অরিকুল নির্ম্মূল করিতে পারি এবং এই হৃদয়-বেদীর উপরে ভগবান্, ভক্ত ও বিধানকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পরস্পরকে প্রেমপুণ্য বিলাইয়া সদা আনন্দবাজার বসাতে পারি, তবে এই সংসার-কুরুক্ষেত্রই আমাদের শ্রীক্ষেত্র হয়।

সাধক-প্রবর প্রমথলাল সেন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রিয় বন্ধু চুনীবাবু যে লিখেছেন, "Nobody had ever seen him in anger; nobody had ever heard him speak an unkind word"—কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি তাঁর সহবাসে অনেক দিন ছিলুম। ৯২নং ও ৮২নং হ্যারিসন রোডে, ৫৯নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, তাঁর সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি। আমরা যদি বামুন, চাকর কিম্বা দরওয়ানকে কখনো চড়া কথা বলতুম, তিনি খুব দুঃখিত হতেন। একবার ৮২নং হ্যারিসন রোডস্থ "কেশব নিকেতনে" তিন খানি গায়ের মোটা চাদর (যাহা বামুন, চাকরদের বক্‌শিস্ দেবার জন্যে কিনে আনা হয়) চুরি যায়। একটা লোককে সন্দেহ করে তাকে শাসন করা হয়। তিনি কিন্তু শাসনকারীর উপর খুব অসন্তুষ্ট হন। কোন রকমে আশ্রমের বিন্দুমাত্র শান্তি ভঙ্গ হয়, সহ্য করতে পারতেন না। সে অবস্থায়, আমরা যখনি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছি, তাঁর মুখের ভাব দেখে সরমে সারা হয়ে গেছি। ৩ নম্বরের gate থেকেই "হরিবোল" "হরিবোল" বলতে বলতে উপরে উঠতেন, তাতেই বাড়ীর বাতাস শুদ্ধ হয়ে যেতো, নিঃশব্দ শান্তির আলয় বিরাজিত হতো। যারা তাঁর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করতো, তারা মায়াচ্ছন্ন এক স্বপ্নলোকে বাস করতো। সেথা নেই অন্ধকার, সে যে আনন্দ ভাণ্ডার; সেথা নেই সংসারের কোলাহল, আশার প্রলোভন, ষড়রিপুর বল,—সে যে সুধামাখা, প্রেমানন্দপূর্ণ শান্তিনিকেতন। তাঁর নির্ম্মল, নীরব, মধুর, সরল সহজ হাসিমুখের প্রভাব, তাঁর জীবন্ত, শাশ্বত, দৈবশক্তিসম অহৈতুকী হরিভক্তি, ছিল তার মূল, তার গূঢ় কারণ—তার গোপন সঙ্কেত। তিনি একঘরে, আমি অন্য ঘরে থাকলেও, তাঁর চরিত্রের প্রভাব এসে আমাকে জাগিয়ে দিত, প্রাণে শক্তি সঞ্চার করতো, অন্তরকে পুণ্য-জলে ধুয়ে দিতো, জীবনকে মধুময় করে তুলতো। খুব ভোরে তাঁর মধুর কণ্ঠের মাতৃস্তোত্রের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠতুম, সারাদিন তাঁর দেহের, চরিত্রের পবিত্র পদ্মগন্ধে প্রাণ মন ভরপুর হয়ে যেতে থাকতো। আবার রাত্রে তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তার পর নিদ্রা যেতুম। কি সৌভাগ্যই আমাদের ছিল!

তিনি যে শুধু উপাসনাই করতে পারতেন, তা নয়। কাজও খুব ভাল করে, শৃঙ্খলার সহিত করতে পারতেন। তাঁকে চিঠি লিখলেই তার জবাব মিলতো—অবশ্যি শেষাশেষি তাঁর অসুখের সময়ে নয়। সে বিষয়ে কাউকে কখনও বঞ্চিত করতেন না। স্বর্গীয় উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায় চিঠি লেখালেখি চলতো। সেগুলি আজও তাঁর আলমারির মধ্যে বোধ হয় রয়েছে। যে দু'বছর বিলেতে Manchester Collegeএ ছিলেন, (১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ অবধি) প্রতি mailএ বিনয়েন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতেন—তার অন্যথা হতো না। কেবল যে mailএ তাঁর ভগ্নীর মৃত্যু-সংবাদ পান, সেই mailএ শোক-ভারাচ্ছন্ন হয়ে চিঠি লিখতে পারেন নি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, বিলেতে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর মারা যান। সে সময়ে প্রমথলালও বিলেতে ছিলেন। মহারাজার Military funeral হয়। Funeral service প্রমথলাল করেন। তাতে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁর পাত্র, মিত্র প্রভৃতি অনেক বড়লোক যোগদান করেন। Golders Greenএ সমাধি হয়। সকলেই সে service শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সংবাদপত্রেও তার যথেষ্ট প্রশংসা বেরিয়েছিল। বালিগঞ্জে, Civilian লোকেন্দ্র পালিতের আদ্যশ্রাদ্ধের উপাসনা ইংরাজীতে (তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে) প্রমথলাল করেন এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গান করেন। পঞ্জাবের স্বর্গীয় অধ্যাপক গোপাল সিং চৌউলার দীক্ষা কলিকাতায় ৯২নং হ্যারিসন রোডস্থ Fraternal Homeএ হয়। সেই উপলক্ষে প্রমথলাল ইংরাজীতে উপাসনা করেন। আমাদের মধ্যে তাঁর মত নিখুঁত করে Proof sheet দেখতে কেউ পারতো না। তাঁর উপর যখন যে কাজের ভার পড়তো, তা সুচারুরূপে, সুশৃঙ্খলার সহিত সমাধা করতে চেষ্টা করতেন ও কৃতকার্য্য হতেন। কখনো কাজে পশ্চাৎপদ হতেন না। "I can't"—"পারি না" এই কাপুরুষোচিত কথা তাঁর মুখে কখনো শুনি নি। যদিও তিনি ভাবেভোলা, হৃদয়-খোলা, ক্ষমার আধার, উদাসীন যোগী ছিলেন, তথাপি তাঁর

সংসারের জ্ঞান যে কিছু কম ছিল, মনে হয় না। তিনি খুব shrewd লোক ছিলেন।

তিনি ছেলেবেলা থেকেই খুব লাজুক ছিলেন। তাঁর দাদা, কাকা, বিশেষতঃ তাঁর মেজো কাকা (আচার্য্য কেশবচন্দ্র) বাড়ী এসে তাঁকে খুঁজলে তাঁর দেখা পেতেন না। তিনি যে কোথায় লুকাতেন, কেউ খুঁজে বার করতে পারতো না। ক্রমশঃ সে লজ্জাশীলতা চলে যায়। পরে সকল রকম লোকের সঙ্গেই মিশতে পারতেন; উপাসনা করতে বললেই উপাসনা করতেন—অস্বীকার করতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে থেকে ধর্ম্মসাধন হয় না। কামিনীর আকর্ষণ, কাঞ্চনের আকর্ষণ মানুষ সহজে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু নববিধান বলেন, কামিনী কাঞ্চনের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যদি ধর্ম্মসাধন করতে না পারো, তা'হলে তোমার কিছুই হলো না। উহারা সাধনের অন্তরায় হবে না, সহায় হবে। তার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত এই জীবন। অনেকদিন আগে বলেছিলেন, "আমার আর flesh and blood এর attraction নেই, অর্থাৎ রক্ত ও মাংসের আকর্ষণ নেই, কামিনী কাঞ্চনের লোভে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। এর চেয়ে বেশী সংযমের কথা আর কি হতে পারে? জীবনে কত স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশেছেন, কৈ মনে বিকার ত উপস্থিত হয় নি। জীবনে চিরকুমারব্রত পালন করে গেছেন। কাঞ্চনের প্রতি, টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর কখনো ছিল না। একথা আপনারাও জানেন। তাঁর হাত দিয়ে কত হাজার হাজার টাকাই ব্যয় হয়েছে, তাতে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। "নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্" এ কথা তাঁর সম্বন্ধে খাটে না। অর্থ বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত; টাকার মায়া কোনকালে ছিল না। সে সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই উদাসীন, অনাসক্ত ছিলেন। বৈরাগ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত জীবনে দেখিয়ে গেছেন।

সুষমময়ী উষার শিরে বালার্ক-সিন্দুরফোঁটা যেমন, "আবিষ্কৃত-চারুতারং শরৎপ্রসন্নম্" আকাশের শোভা যেমন, স্বচ্ছ সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্য্য যেমন, তুষারাবৃত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে নবারুণ-কিরণ-সম্পাত মধুর যেমন, বিশাল সাগরোর্ম্মির উপর সুধাধবলিত রজতরশ্মি পূর্ণ-চন্দ্রের নৃত্য মনোহর যেমন, তেজোময় সূর্য্যের সহিত স্নিগ্ধমল চন্দ্রের—উজ্জ্বলে মধুরে—মিলন অপূর্ব্ব যেমন, পরদুঃখকাতর, অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ের মহিমা চারুতায় শ্রেষ্ঠ যেমন, নবনীরদ কোলে দামিনীর হাসি সুন্দর যেমন, সুর, তাল, লয়যুক্ত সুমধুর সঙ্গীত মনোমুগ্ধকর যেমন, তেম্নি পুণ্য ও প্রেমের সংযোগে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে, বিধাতার নিজহাতেগড়া এই জীবনখানি সুন্দর, মনোহর, রমণীয় ও সুবাসিত ছিল। গোলাপের মত সুন্দর, সেফালির মত শুভ্র, চামেলির মত সুগন্ধি, পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় মনোহর, নির্মেঘ আকাশের ন্যায় বিমল, উষার হাসির ন্যায় আনন্দদায়ক ছিল। তাঁর কাছে খানিকক্ষণ বসলে মনের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যেতো, চরিত্রের কলুষরাশি পুণ্যজলে ধুয়ে যেতো, অন্তরের সব নীচতা, ক্ষুদ্রতা, বাসনা-বিক্ষোভ দূরে চলে যেতো। তাঁর শিশিরসিক্ত প্রভাত কুসুমের মত জীবনের সুমধুর সৌরভে হৃদয় ভরে যেতো। সে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় মহিমাময়, সুসংযত চরিত্রসুষমা, তা বাক্যে বলা নাহি যায়। সোনার পাখী যখন পিঞ্জর ছেড়ে, জড় দেহ ত্যাগ করে, অনন্তকে ধরবে বলে অনন্তে উড়্‌ল, সেই জড়-দেহে কি এক অলৌকিক স্বর্গের জ্যোতি ঢেলে দিয়ে গেল, তা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই অভিভূত হয়েছেন। সে যে "মরণ-অন্তে তাঁহার চরণে সুপ্রভাত।" সে ত মৃত্যু নয়! চারিদিকে "মধুরং মধুরং মধুরং" অনাহত ধ্বনি বাজতে লাগলো। অনলে, অনিলে, সলিলে মধুপ্রবাহিণী চলতে লাগলো। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। আমরাও ঐ অজানা দেশের ছবি দেখতে দেখতে, সেই অনিন্দ্যজ্যোতি স্বর্ণতনু ঘেরে সারারাত্রি জেগে বসে রইলুম।

হে প্রেমময় ঈশ্বর! তোমার প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে? তুমি এই পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গের সমগ্র আলোক ও শান্তি দান কর। তাঁকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়ে আমাদিগকে ধন্য করেছো। তাঁকে গর্ভে ধরে তাঁর মা ধন্য হয়েছেন—রত্নগর্ভা নাম পেয়েছেন। যে বংশে, যে কুলে তিনি জন্মেছেন, সে বংশ, সে কুল পবিত্র হয়েছে, ধন্য হয়েছে। তাঁকে পেয়ে প্রেরিতবর্গ, আমাদের মণ্ডলী ধন্য হয়েছেন। এই দেবনন্দনের আগমনে আমাদের দেশ, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ধন্য হয়েছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আর্য্যঋষি, মুনিগণ ধন্য হয়েছেন। জগতের সকল মহাজনগণ ধন্য হয়েছেন। জয় জয় তোমারি জয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

"ধর্ম্ম-সাধন"।

২০ সংখ্যা—২৮শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভাদ্রোৎসবের আলোচনা।

৩রা ভাদ্র—১৭৯৪ শক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—প্রেমরাজ্য, স্বর্গরাজ্য আত্মাতে আনিতে হইলে কি কি উপায় গ্রহণ করিতে হইবে?

উত্তর—স্বর্গরাজ্যে থাকিবার যে অবস্থা বিশ্বাসপটে মুদ্রিত আছে, তাহা যাহাতে বাস্তবিক ও স্বাভাবিক অবস্থা হয়, এরূপ সাধন করিতে হইবে। এ পৃথিবীকে যতক্ষণ দেখি, শরীরে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ স্বর্গরাজ্য হইতে দূরে থাকি। যে অবস্থায় ঈশ্বর আমাদিগের পরম লোক, পরম আনন্দ, সেই স্বর্গের অবস্থা। পরলোকে আমরা সেই অবস্থায় থাকিব। ইহলোকে যে পরিমাণে ব্রহ্মকে বাসস্থান করিতে পারি, সেই পরিমাণে স্বর্গলোকের নিবাসী হই। আত্মা ঈশ্বরের প্রেমভাব যত ধারণ করিতে পারে, তত প্রেমরাজ্য বুঝিতে পারে। সকলে ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন করিয়া, এই পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করি, অনন্তকাল সেই রাজ্যে বাস করিব।

প্র—মতভেদ সত্ত্বে কিরূপে সদ্ভাব রক্ষা করা যায়?

উ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে যে কথা স্মরণ করিলে যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার অন্যথা হয় না। অগ্নিতে হাত দিলেই পুড়িবে। মতভেদ যখন আছে—বিবাদের কারণ আছে। যতবার সে ভাব দেখিব, ততবার বিবাদ হইবেই হইবে। তবে কি মতভেদ সত্ত্বে মিলনের উপায় নাই? মতভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সদ্ভাব রক্ষা অসম্ভব। মতভেদ সত্ত্বে মত-ভেদের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া মিলন করিতে হইবে। চক্ষু যাহা দেখে, হৃদয় তাহার অনুগত। চক্ষু যদি বিরূপ দেখে, বিবাদ হইবে; চক্ষু যদি বলে, বিরোধ সত্ত্বে ঐক্যস্থল এখানে অনেক আছে, হৃদয় তাহা অবলম্বন করে। ঐক্যের ভূমি কি? আমরা সকলে ব্রাহ্ম, এক পথের পথিক, এক পিতার সন্তান। ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য যত দেখিব, হৃদয় তত ভিন্নতা ভুলিয়া ঐক্যভাব ধারণ করিবে।

প্র—মতভেদ জন্য ব্রাহ্মদের অমিলন অধর্ম্ম কি না?

উ—মতভেদ জন্য হৃদয়ের বিভিন্নতা কেবল অধর্ম্ম নয়, অব্রাহ্ম ভাব। যে পরিমাণে মতভেদ সত্ত্বে পরস্পরকে প্রেম করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সকল জগৎকে এক করিবে, তখন সকল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতেই হইবে। অন্যান্য ধর্ম্মের এপ্রকার আবশ্যকতা নাই। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন দেখা যায়, তাঁহারা মতের মিলে হৃদয়ের মিলন করিয়া থাকেন, এই জন্য একটু মতভেদ-বায়ু বহিতে না বহিতে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হন। আমাদের পরস্পরের মত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইবে না, অথচ পরস্পরে প্রীতির সহিত মিলিত হইতে পারি, এইটী প্রথম বিশ্বাস চাই। যাঁহাদের সঙ্গে মতভেদ হইবে, প্রেমাহ্বানে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বা তাঁহাদিগের কাছে গিয়া বলিব, 'এ বিষয়ে মিলিলাম, এ বিষয়ে মিলিলাম না; কিন্তু তা বলিয়া কেহ ভ্রাতৃভাবের অন্যথা করিতে পারিবেন না।' ঈশ্বর তাঁহার প্রেম দ্বারা পাষণ্ডদিগকে দলন করেন, আমরা তাঁহার অনুরূপ প্রেম প্রকাশ করিতে পারিলে, উদ্ধত ভ্রাতাদিগকেও পরাস্ত ও বশীভূত করিতে পারি।

উপাসক-মণ্ডলী।

প্র—ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে আর আত্মচেষ্টার কোন আবশ্যকতা নাই, এ কথা যথার্থ কি না?

উ—নির্ভরের অর্থ ইহা নয়, আমি অলস হইয়া ঘুমাইয়া থাকিব, আর ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণ আনিয়া দিবেন। তাঁর উপর নির্ভর করার অর্থ এই যে, তাঁর সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করিলাম, তিনি যখনি যাহা বলিবেন, আমি তখনি তাহা করিব, কোন ক্রমে অন্যথা করিব না। ইহা অত্যন্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ-স্বীকারের কাজ। আমরা কুঁড়েমি করিয়া অনেক সময়ে সাধকদিগকে হারাইয়া দি। আমরা ঈশ্বরকে ঠকাইতে চাই। 'তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর' মুখে বলিয়া তাঁহাকে খুসী করি; কিন্তু যখনি তিনি আত্মা, মন, প্রাণ, বল চান, অমনি নানা আপত্তি করি। এরূপ ভাবে সাধন হয় না।

প্র—উৎসব হইতে চিরস্থায়ী কি লাভ হয়?

উ—উৎসবে ঈশ্বর জীবনের এক একটী আদর্শ দেখাইয়া দেন, চিরদিন তাহা সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বর দয়াময় পিতা, মহাপাপীর পরিত্রাতা, স্বর্গীয় পরিবার-বন্ধন আমাদের জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি মহাসত্য উৎসব হইতে লাভ করিয়াছি।

প্র—এ সকল বিষয় আমরা সাধনে আনিতে পারি না কেন?

উ—যাহাতে বিশ্বাস নাই, তাহার সাধন হইতে পারে না। মন্দিরের ব্যাপার মন্দিরেই থাকে। উন্নত ব্রাহ্মদিগেরও এ প্রকার বিশ্বাস নাই যে, আমাদিগের মধ্যে পরিবার-বন্ধন হইতে পারে।

প্র—ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরিবার-বন্ধনের উপায় কি?

উ—ব্রাহ্মদের মধ্যে মতগত অনৈক্যই সদ্ভাব-নাশের প্রধান কারণ এবং অনেক স্থলে ইহা বিশ্বাসের প্রভেদ বশতঃ যত—মন্দভাব জন্য তত নয়। যদি আমাদিগকে একগৃহে বাস করিতে হয়, ক্ষমা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা মতভেদ কমাইতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাইতেছে, আমাদের ক্ষমাশক্তি অতি দুর্ব্বল; অতএব বিশ্বাসে ঐক্য না হইলে আমাদের মিলন রক্ষা করা কঠিন। ঈশ্বরকে প্রীতি ও মনুষ্যদিগের প্রতি প্রীতি, এই এক মত সকলে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া যেন ঐক্য-স্থলে দণ্ডায়মান থাকি।

প্র—মিলনের ইচ্ছা হয়, অথচ তাহা হয় না কেন?

উ—ধর্ম্মরাজ্যে ইচ্ছার অর্থ কেবল ইচ্ছা বা ক্ষণিক মুখের বক্তৃতা নয়, কিন্তু ব্যাকুলতা, প্রার্থনা, দিবারাত্রি চিন্তা ও চেষ্টা। ইচ্ছার বিষয় যতক্ষণ না পাইব, ততক্ষণ সুস্থির হইব না। এরূপ ইচ্ছা কয়জনের?

প্র—যে চেষ্টায় ফল কি হইবে বুঝা যায় না, তাহাতে মন যাইবে কেন?

উ—আমাদের এক প্রকার সরলতা আছে, ভাল কাজে মন যায় না, কি করিব? কিন্তু ইহাই বিনাশের কারণ। ইহার মধ্যে গূঢ়ভাবে অবিশ্বাস রহিয়াছে। বিশ্বাসের বিষয়ে যুক্তি খাটে না, ফল না দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে হইবে।

প্র—কিছু না জেনে শুনে কি অন্ধ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য?

উ—উপাসনা করা যে ভাল, তা আমরা জানিয়াই উপাসনা করি। ইহা চুরি করা বা মিথ্যা কথার ন্যায় নহে, কিন্তু ভাল কাজ, এটী আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় অথবা বিশ্বাস প্রত্যক্ষ। তবে যুক্তিদ্বারা যতক্ষণ ইহার ফল স্থির করিতে না পারি, ততক্ষণ কি বিশ্বাসের আলোক অগ্রাহ্য করিব? ভ্রাতৃভাবেও সেইরূপ।

প্র—বিচার না করিয়া কি আমরা সকল মত গ্রহণ করিব?

উ—মানুষের কোন কথা যতক্ষণ বিচার করিয়া, প্রমাণ দেখিয়া না বুঝিতে পারি, ততক্ষণ তাহা গ্রহণ করিতে পারি না; কিন্তু ঈশ্বরের কথা অবিচার্য্য, তাহা নিজেই নিজের প্রমাণ, তাহা শুনিলে করিতেই হইবে। ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে যে কথা বলিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্ম করিয়াছেন, সে কথায় অবিশ্বাস করিলে আর আমরা ব্রাহ্ম থাকিতে পারি না।

প্র—অপরের জন্য প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা কি?

উ—আপনার জন্য যেমন, অন্যের মঙ্গলের জন্য ইচ্ছা করাও তেমনি স্বাভাবিক। এই মঙ্গল ইচ্ছা হইতে দুইটী ভাব উৎপন্ন হয়। (১) কার্য্যে মঙ্গল চেষ্টা, (২) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। কি দেশহিতৈষিতা, কি পরোপকার, ইহা কিছুতেই স্বার্থপরতা থাকিলে হয় না। কিন্তু অন্যের যেরূপ মঙ্গল করিতে আমরা ইচ্ছা করি, কার্য্যে সেরূপ করিতে ক্ষমতা হয় না। এই জন্য যেখানে নিজে অক্ষম, সেখানে ঈশ্বরের করুণা ও সাহায্য প্রার্থনা করাই আমাদের একমাত্র উপায়।

প্র—আপনার ও অন্যের পরিত্রাণের জন্য যে প্রার্থনা করি, তাহাতে ব্যাকুলতার তারতম্য আছে কি না?

উ—নিজের পরিত্রাণের জন্য প্রথম ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, অন্যের পরিত্রাণ না হইলে নিজের পরিত্রাণ হইবে না। অন্যের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আমরা যে পরোপকার করি তাহা নয়, কিন্তু নিজের পরিত্রাণের উপায় করি। ভ্রাতা যত পবিত্র হইবেন, আমার পবিত্রতা তত বাড়িবে; ভ্রাতাতে যে পরিমাণে পাপ, আমার পরিত্রাণের তত ব্যাঘাত। আমরা দশবৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম শিখিয়া আগে কেবল নিজের ভাল করি, পরে প্রচার করিয়া অন্যের উপকার করিব, ইহা ব্রাহ্মের ভাব নহে। ব্রাহ্ম নিজে যেমন ভাল হন, সেই সঙ্গে জগতেরও মঙ্গল করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাই পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন।

প্র—মৃত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধ করা কুসংস্কার কি না?

উ—শ্রাদ্ধের অর্থ শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া মৃত ব্যক্তিকে ধরিয়া ঈশ্বরের চরণে ফেলা। জীবিত অন্য ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা যেরূপ স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত, মৃত ব্যক্তিদিগের জন্যও সেইরূপ। মৃত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে শারীরিক যোগ বন্ধন করিতে গেলে কুসংস্কার হয়, কিন্তু সে কুসংস্কার বাঁচাইয়া তাঁহাদিগের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ সাধন করিতে হইবে। ক্রাইষ্ট বা চৈতন্যকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে যদি ইচ্ছা হয়, তাঁহারা পেণ্টুলন পরিতেন, কি টিকি তিলক ধারণ করিতেন, ইহা দেখিতে গেলে কুসংস্কার আইসে। আমরা শরীরের নৈকট্য ধরিব না—মানিব না; শরীরকে গুঁড়া করিয়া, নিরাকার আত্মার সহিত নিরাকার আত্মার মিলন করিব। আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া অনুরাগের মিলনে ইহলোক ও পরলোকস্থ আত্মা সকল মিলিত হইতে পারেন এবং পরস্পরের সাধু ইচ্ছা ও প্রার্থনার দ্বারা পরস্পরের ইষ্ট সাধন করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন অবস্থার সৃষ্টি।

যখন কোন জাতি পতিত হয়, পরাধীনতার অবশ্য নিষ্পেষণে মনুষ্যত্ব হারায়, নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর স্বাধীন চিন্তার ক্রমবিকাশ হইতে জাতির অন্তর শুষ্ক ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে, অসত্য, দুর্নীতি, অনাচার, মিথ্যা ও নির্য্যাতনের চাপে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, মৃত্যুর শীতল বায়ু যখন জাতির ক্ষীণ প্রাণটুকুকে অসাড় ও অবসন্ন করিয়া ফেলে, তখনই সেই জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গের আশীর্ব্বাদ জাতীয় শক্তিরূপে অবতীর্ণ হয়। শক্তি আধার অন্বেষণ করে। যে আধারে সেই শক্তি অবতীর্ণ হয়, তাহাকে আমরা মহাপুরুষ, বা অতিমানব বলি। পতনের পরে উত্থান, আলোক ও অন্ধকারের মত বা দিবস রজনীর মত ভারতের ইতিহাসে বা ভারতের আকাশে উজ্জ্বল ধ্রুবতারার ন্যায় চিরদিন আলোকদান করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে এক একটী জাতির, এক একটী বিশিষ্টতা আছে, এই বিশিষ্টতার মধ্য দিয়া জাতি আত্মবিকাশ করিয়াছে। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে আমরা জাতীয় বিবর্ত্তন (Evolution) বলিতে পারি। সকল নরনারীই সমভাবে এই বিকাশের (Evolution) অধিকারী হয় না। বেশ সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, একটী গাছে যতগুলি ফুল ফোটে, সবগুলি এক নয়; তাহাদের ভিতর একটী ফুল সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। জাতীয় বিকাশের সময় সকল মানুষই সমান শক্তি লাভ করে না। এক এক যুগে বা এক এক যুগের একটী বিশেষ সময়ে জাতির ভিতর একটী মহামানব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাকে আমরা মহাজন বলি এবং তাঁহার প্রচারিত সত্যকে বিধান বলিয়া স্বীকার করি। ইহা প্রাকৃতিক সত্য।

বিধানের অন্তর্গত যে সকল সত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কল্পনা-প্রসূত নহে, অথবা মানবের সূক্ষ্ম বিচার বা মীমাংসার ফল নহে, তাহা একটী মহাজীবনের প্রত্যক্ষ বিকাশের ফল সেই জীবন সত্যের Organic evolution বা অঙ্গাঙ্গীভূত বিবর্ত্তন হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, অথবা জীবন সত্যকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তি দান করিয়াছে। সেই জীবন আমাদিগকে আজ সত্যের পথে আকর্ষণ করিতেছে। সত্য চিরদিন শাশ্বত, অক্ষয় ও অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও, স্থান, কাল ও অবস্থা ভেদে তাহার প্রয়োগ ব্যক্তির জীবনে ও জাতির জীবনে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন আর সে অবস্থা নাই। আমাদের পিতা পিতামহদিগের জীবনে সে সময় যে সকল প্রশ্ন উঠিত তাঁহাদের জীবনে যে সকল উৎকণ্ঠার কারণ আসিয়া সমুপস্থিত হইত, এখন আর সে সকল প্রশ্ন বা তাঁহাদের উৎকণ্ঠা আমাদের প্রাণের শান্তি নষ্ট করে না। এখন আমাদের জীবনে নূতন প্রশ্ন আসিতেছে—নূতন উদ্বেগ—নূতন সঙ্কট আসিয়া জীবনের অবাধগতিকে অবরোধ করিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল প্রশ্নের সমাধানের উপর পূর্ব্ব বংশের জীবনের উত্থান পতন নির্ভর করিত, এখন তাহা অতীতের অন্ধকারে চিরনিদ্রিত।

এখন জীবনের অবস্থা-ভেদে যেমন একদিকে নূতন সত্য, নূতন আলোক আসিয়া নূতন উদ্বোধনের শঙ্খনাদ করিতেছে, অন্য দিকে আকাশ ভরা মৃত্যুর কাল মেঘ হইতে নিরাশার বজ্র-নিনাদ মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতেছে। মৃত্যুর সংহার পার হইয়া জীবনের অভয় আশ্রমে কেমন করিয়া উপস্থিত হওয়া যায়, তাহাই চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

পৃথিবীতে যখন বিধান অবতীর্ণ হয়, তাহা যে কেবল মন্দিরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকে তাহা নয়, পরন্তু জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে সত্য আপনার রূপ প্রকাশ করে। ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প ও রাজনীতি সকলই এক অবিনশ্বর সত্যের বাহ্যরূপ। যাঁহারা ঈশ্বরের বিধান স্বীকার করিলেন, তাঁহারা নানা পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা ও বিবিধ সমাজ-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া, বিধানের অবাধগতি দর্শন করেন ও সত্যের অভয়বাণী শ্রবণ করেন।

কেবল চক্ষু থাকিলে মানুষ দেখিতে পায় না, দেখিতে হইলে আলোকের প্রয়োজন হয়; যেখানে আলোক নাই, গভীর অন্ধকারে দৃষ্টিহীন চক্ষু যদি বিপথে পড়ে, যদি তাহার পদস্খলন হয়, সে দোষ পতিত ব্যক্তির নয়, সে দোষ অন্ধকারের, সে দোষ প্রকৃতির প্রতিকূলতা। চক্ষুর দেখিবার শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, আলোকের সৃষ্টি করিতে হইবে। আমরা অনেক সময় বলি যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা উপাসনাবিহীন, ধর্ম্মবিহীন। উপাসনা বা ধর্ম্ম সাধন না করার সকল অপরাধ সন্তানদের ঘাড়ে চাপাইয়া আক্ষেপ করি। কিন্তু একথা বুঝিনা যে, তাহাদের চক্ষু আছে বটে, কিন্তু পথ দেখিবার মত আলোকের সৃষ্টি আমরা করিতে পারি নাই। ভীষণ অন্ধকারময় পথে চলিতে গেলে পথিকের যে অবস্থা হয়, তাহাদেরও সেই অবস্থা। আমরা একটু তলিয়ে দেখিলে বুঝিতে পারি, একটু গভীর চিন্তা করিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব নহে। তবে তাহাদের যে ধর্ম্মহীনতার এবং মধ্যে মধ্যে নীতিহীনতার হৃদয় বিদারক সংবাদ পাই, সেটা আমাদেরই অজ্ঞানতা বা অবিমৃষ্যকারিতার বিষময় ফল। আমরা তাহাদের জন্য এমন একটা অবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছি, এমন একটা নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছি, যাহা তাহাদের পক্ষে ধর্ম্ম সাধন করা অপেক্ষা ধর্ম্মহীন হওয়াই স্বাভাবিক, নীতিবান্ হওয়া অপেক্ষা নীতিহীন হওয়াই সহজ। আমরা এমন একটা আবহাওয়ার ভিতর তাহাদের মানুষ করিবার আয়োজন করিয়াছি যে, তাহাদের পক্ষে সুস্থ ও সবল হওয়া অপেক্ষা রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হওয়াই প্রকৃতির অনিবার্য্য বিধান। এই অবস্থার চাপ বহু পরিমাণে বাহিরের দিক হইতে আসিয়াছে, আর কতকটা আমাদের অজ্ঞানতার অপরিহার্য্য পরিণাম। এই চাপটা সকল দিক হইতেই অজ্ঞাতসারে এমন করিয়া আসিয়াছে যে, আমরা তাহার জন্য আদৌ সতর্ক হইতে পারি নাই, কেবল তাহা নয়, পরন্তু তাহার বাহিরের চাকচক্যে ভুলিয়া বিষকে সুধা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

দুইটী জাতি যখন পরস্পর মিলিত হয়, তখন তাহারা দুইটী বিভিন্ন আদর্শ লইয়া উপস্থিত হয়। এই আদর্শের সংগ্রাম পৃথিবীতে চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় আদর্শ আত্মিক আদর্শ, পাশ্চাত্য আদর্শ জড় আদর্শ (Material)। এই জড় আদর্শের মোহে অভিভূত হইয়া, জাতি আবহমানকাল-প্রচলিত যে আত্মিক আদর্শের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। এই বিজাতীয় আদর্শের বিষময় ফলে এখন জাতি জর্জ্জরিত। চারিদিকের বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে বাস করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ না করা যেমন অস্বাভাবিক, এখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং নীতিবিহীন ও ধর্ম্মবিহীন সভ্যতার মধ্যে বাস করিয়া, আত্মিক আদর্শের অনুসরণ করা অথবা বিধানের উচ্চতর নীতি ও ধর্ম্ম রক্ষা করাও সেইরূপ দুরূহ। এখন যদি বর্ত্তমান বংশকে মানুষ করিতে হয়, তাহাদের ভিতর ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিতে হয়, তাহাদের নীতিকে শুদ্ধ রাখিতে হয়, তাহা হইলে মণ্ডলীতে নূতন জাগরণ আনিতে হইবে, নূতন অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে, দেশের আবহাওয়া এমন করিয়া বদলাইয়া দিতে হইবে যে, নূতন আদর্শের সূর্য্যকিরণ আসিয়া তাহাদের অন্ধকারাবৃত দৃষ্টিকে যেন উদ্ভাসিত করিতে পারে। শিক্ষার ভিতর দিয়া এমন নূতন নূতন সংস্কার সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহা ধর্ম্মবিহীন জড় আদর্শের উপর যেন জয় লাভ করিতে পারে।

শরীর, মন ও আত্মার বিকাশের জন্য এখন একটা স্বাভাবিক, সত্য ও মুক্ত অবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। স্বাভাবিক মুক্ত বায়ুতে যদি মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে না পায়, তবে বাহিরের শত চেষ্টাতেও তাহার জীবন রক্ষা হয় না। ভিতরে যদি প্রাণ না থাকে, তবে চিকিৎসার শত উত্তেজনাপূর্ণ ঔষধ প্রয়োগে (Injectionএ) রোগীর জীবন ফিরিয়া আসে না।

এই নূতন অবস্থার সৃষ্টি তোমার আমার বুদ্ধি-প্রসূত অনুষ্ঠান নহে, অথবা সামাজিক শাসন নহে, ইহা ভগবানের বিধান। কোন বিষ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিলে যেমন প্রকৃতি তাহার প্রতিবিধান করে, সেইরূপ কোন অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর একটা জাতি যখন তাহার শরীর, মন ও আত্মা হারাইয়া ফেলে, তখন তাহার রক্ষার জন্য স্বর্গ হইতে বিধান অবতীর্ণ হয়। আমরা স্বপ্নে বিধানের আশীর্ব্বাদে স্বীকার করিতেছি বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে জীবনের প্রত্যেক বিভাগে, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে সত্যের নিকট মাথা নত করিতে পারি না। সত্যকে স্বীকার করিতে হইলে, পাছে সব ওলট পালট হইয়া যায়, এই আমাদের ভয়। প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে গেলে পাছে নিজেকে ক্ষুধার্ত্ত রাখিতে হয়, এই আমাদের আশঙ্কা। যাঁহারা রাজরাজেশ্বর হইয়া, ধন রত্নের সর্ব্বেসর্ব্বা মালিক হইয়া বসিয়া আছেন, পাছে তাঁহাদিগকে রাস্তার ফকির হইতে হয়, এই ভয়। মিথ্যা একটা মস্তবড় পাষাণের ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া সয়তানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; পাছে তাহা চূর্ণ হইয়া যায়, এই স্মরণ করিয়া আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে।

আমরা যতটুকু সত্য স্বীকার করিলে, উপাসনায় ও কীর্ত্তনে বিধানের মাহাত্ম্য মহিমান্বিত করিতে পারি, তাহাতে আমরা পশ্চাৎপদ নহি। আমরা যতটুকু বিধান স্বীকার করিলে, পুরাতন পৃথিবীর সঙ্গে মিটমাট করিয়া, অথবা পাপ, অনাচার ও মিথ্যার সহিত রফা করিয়া, অথবা অল্প স্বল্প সেবা বা লঘু কর্ম্ম স্রোতে গা ভাসান দিয়া চলিতে পারি, ততটুকু স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু যেখানে অর্থবিত্ত, পরিবার ও আত্মসম্মান সত্যের সিংহাসনতলে বলি দিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, সেখানে আমরা সভয়ে কম্পিত হই। নিজেকে ও নিজের যাহা তাহাকে বলি না দিলে, কোন দিনই সত্য প্রস্ফুটিত হইবে না— নূতন অবস্থা সৃষ্ট হইবে না—কোন দিন দেশে নূতন ধর্ম্মরাজ্য গড়িয়া উঠিবে না। আমাদের সহস্র আক্ষেপ, সহস্র মনস্তাপ, আকুল ক্রন্দন ও মর্ম্মভেদী অনুতাপ আমাদের বিকৃত অবস্থাকে একবিন্দুও প্রকৃত অবস্থার দিকে অগ্রসর করিতে পারিবে না। অবশ্য ব্যাকুলতা ও অনুতাপ মানব-প্রকৃতির সহায় ও কর্ম্ম-রাজ্যের প্রধান প্রস্তুতি। যখন আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই এবং আমাদের দোষ, দুর্ব্বলতা ও ত্রুটির জন্য পদে পদে কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, তখন ব্যাকুলতা ও অনুতাপের স্থান আছে। এখন আমাদের গঠনমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া ছেলেমেয়েদের কোমল মনকে গঠন করিতে হইবে। শিক্ষার ভিতর দিয়া মনের সংস্কার দৃঢ় হয়। নীতিহীন শিক্ষার পরিবর্ত্তে, যে শিক্ষার দ্বারা বালক বালিকার মনে সত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয় এবং সত্যকে প্রতিপালন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। যে সকল প্রচ্ছন্ন শক্তি জাগ্রত হইলে বিপদ অন্ধকারের সময় মানুষকে আলোক দান করিতে পারে, সেই সকল শক্তির উদ্বোধন করিতে হইলে যেরূপ উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, সেইরূপ শিক্ষকের হাতে শিক্ষার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষার প্রধান কার্য্য, মানবের মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তোলা। নববিধানের আদর্শ অনুসারে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়িতে না পারিলে এবং বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম ও বিশ্বাসের মুক্ত বায়ুতে ছেলেমেয়েদের চক্ষের সম্মুখে নূতন আলোকের সৃষ্টি করিতে না পারিলে, কোন শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা হইবে না।

তারপর ধর্ম্ম-শিক্ষা। ধর্ম্ম কল্পনার বস্তু নয়। পিতামাতার ধর্ম্মাচরণ, সত্যনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য বাল্যকালে বীজরূপে হৃদয়ে প্রোথিত হয়। শিক্ষকদিগের সুচরিত্র, বাল্যবন্ধুদিগের সদ্ভাব, প্রতিবেশীদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া তাহা অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হয়। ছেলেমেয়েদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি এমন ভাবে সৃষ্ট করিতে হইবে, যেন তাহাদের বৃদ্ধির পথে কোন বাধা না আসে। শিক্ষার মূল ভিত্তি হইবে বিশ্বাস। বিশ্বাস বিকৃত অবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িতে পারে, পুরাতন পৃথিবীকে নূতন আকার দান করিতে পারে। বিশ্বাসের ভিতর দিয়া মানুষের সকল চেষ্টা ও শক্তিকে ব্রহ্মের অন্বেষণে প্রযুক্ত করিতে হইবে। এই শিক্ষাই পরম শিক্ষা। এই শিক্ষা মন্ত্রের মত মানুষের আত্মায় শক্তি সঞ্চার করিবে, মানুষের ভিতর নূতন আত্মাকে জন্মদান করিবে।

পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিতর আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, যে শিক্ষা আমাদের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে, আমাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে ক্ষীণ ও নিস্তেজ করিয়াছে, আমাদের স্বাভাবিক শক্তিগুলির বিকাশের পথে বিষম অন্তরায় হইয়াছে, নৈতিক জীবনের অঙ্কুরকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, বিশ্বাসের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছে, এক মুষ্টি অন্নের জন্য নিরাশ্রয় ও পরমুখাপেক্ষী করিয়াছে, শরীর, মন ও আত্মাকে বাহিরের অস্বাভাবিক চাপে নিষ্পেষিত করিতেছে, তাহা অবশ্য পরিহার্য্য। বিশ্বাসের ভিত্তির উপর এই নূতন জ্ঞান ও নূতন নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নীতি-শিক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষার পূর্ব্বাবস্থা। জ্ঞান একটী প্রণালী-বদ্ধ নিয়মের ভিতর দিয়া শিক্ষা করিতে হয়। চার বৎসরের শিশুর যাহা পাঠ্য, বিশ বৎসরের বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের তাহা পাঠ্য নয়। ধর্ম্ম সেইরূপ শিক্ষণীয় বস্তু। যে সকল

শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা জ্ঞানের অন্তর্গত হইলেও, তাহার বিশেষ শিক্ষা আমাদের মধ্যে হওয়া উচিত। উপাসনা-সাধনও শিক্ষণীয় বস্তু। উপাসনা-শিক্ষা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের অন্তর্গত হওয়া উচিত, মনের বিকাশ অনুসারে উপাসনার ভাবের বিকাশ হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে উপাসনা-প্রণালী এক হওয়া সম্ভব নয়। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনার স্তর ভিন্ন হইবে। এক স্তরের সাধকের পক্ষে যে প্রণালী ফলপ্রদ হইবে, অন্যের পক্ষে তাহা হইবে না। যুবকদিগের পক্ষে জ্ঞানের ন্যায় উপাসনা যে শিক্ষণীয় বস্তু, একথা আমরা এখনও স্বীকার করি না; এবং অধিকারভেদে উপাসনা-প্রণালী যে পৃথক হওয়া উচিত, একথাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই, অথবা আবশ্যক মনে করি না। যে সকল আলোক আসিলে বালক ও যুবকদিগের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা ও উপাসনার ভিতর প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে, সে বিষয়ে আমরা উদাসীন। এ বিষয়টী বিস্তৃত, একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এই টুকু বলিতে চাই যে, বিধানের আদর্শ অনুসারে যদি মণ্ডলী গঠন করিতে হয়, তবে জীবনের সম্যক্ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে হইলে, জীবনের সকল বিভাগে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হইবে। শিক্ষা, দীক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম, সেবা ও উপজীবিকার নূতন পথ দেখাইতে হইবে। নূতন কর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং মণ্ডলীর প্রত্যেক নরনারীর জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের অধিকার অনুসারে, তাঁহাদের শক্তিকে এই গঠন কার্য্যের নূতন অট্টালিকা-নির্ম্মাণের এক একটি উপাদানরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। এই নূতন অবস্থা, নূতন আলোকই আমাদের নূতন গঠনের প্রাণ হইবে। নূতন অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার প্রধান উপকরণ মন। শিক্ষার দ্বারা মনের পরিবর্ত্তন হইবে, সত্যের ধারণা হইবে, নূতন আলোক আসিবে, সেই নূতন আলোকের প্রেরণা হইতে নূতন কর্ম্মের সূচনা হইবে। এখন এমন কয়েকটী সাধকের প্রয়োজন, যাঁহারা সত্যকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন এবং বালকবালিকাদের মনে সে সত্যকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিবেন। তাঁহাদের ক্ষুধার অন্ন থাকিবে না, মস্তক রাখিবার স্থান থাকিবে না, থাকিবে কেবল বুকভরা ভালবাসা ও অনন্ত বিশ্বাস! যে বিশ্বাসের সুদৃঢ় হিমালয়ে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য গঠন করিয়াছেন, কাঁটার মুকুট পরিধান করিয়া প্রাণ বলি দিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া বর্ত্তমান বংশকেও ধর্ম্মরাজ্য গঠন করিতে হইবে। আর অন্য পথ নাই।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভক্তিরত্ন অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত।

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ, ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল, মহোদয়ের অকাল মৃত্যুতে একটী উৎসাহী, ধর্ম্মপ্রাণ, সর্ব্ববিশ্বাসী বন্ধুকে হারাইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। নববিধান-বিশ্বাসীর সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং ঈশ্বর-পিপাসু, জীবনে যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের মিলনের একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত এবং সংসারে যোগ-বৈরাগ্য-সাধনে যত্নশীল ব্যক্তির সংখ্যা খুবই অল্প। ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র এই অল্পসংখ্যকের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি যেমন নববিধানের সর্ব্বতোমুখী ভাব সকল সুন্দর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি শুধু আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার সহযোগী প্রতাপচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ, সঙ্গীত-প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, সৌম্য ভক্তি অমৃতলাল বসু, শিশু প্রকৃতি বিশ্বাসী উমানাথ গুপ্ত, প্রেরিত প্রচারকগণের অভিভাবক এবং সেবক কান্তিচন্দ্র মিত্র ও অন্যান্য প্রচারকগণ, যাঁহারা এ যুগে প্রেম ভক্তি বিস্তারের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের প্রতিই একান্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এই সকল প্রেরিতগণের স্মৃতি-সভাতে, ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র বাগ্মিতা সহকারে স্বীয় ওজস্বিনী ভাষায় ভাবপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অনেকদিন নবভাবে তাঁহাদের প্রতিজনের মহত্ত্ব উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি একজন রাজনীতিজ্ঞ ও সুলেখক ছিলেন। একজন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের গ্রন্থ সহকারে তিনি বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি বহু হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত কর্ম্মজীবনের মধ্যেও তিনি দেহ, মন, ও আত্মার পবিত্রতা সাধনে একান্ত উৎসাহী ও নিষ্ঠাযুক্ত ছিলেন। বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া ওকালতি কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহা ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার জন্য একটী ছাপাখানা করেন, এবং তাহা হইতে "বিশ্ববার্ত্তা" ও "শিক্ষাসমাচার" নামক পত্রিকা পরিচালন এবং বিদ্যালয়ের উপযোগী পুস্তক প্রকাশ করিয়া, নিজের অসাধারণ প্রতিভা ও স্বাধীনভাবের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করেন। ঢাকার নবকুমার ইনষ্টিটিউশন নামক বিদ্যালয় তাঁহারই কীর্ত্তি। তিনি আজীবন উহার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার পিতার নামে ঐ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তিনি পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

প্রথমতঃ তিনি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা এবং স্বাধীনভাব সেখানে আশানুরূপ স্ফূর্ত্তি না পাওয়াতে, ক্রমে নববিধান-সমাজের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করেন। এখানে সময় সময় তিনি সঙ্গত-সভায়

সম্পাদক ছিলেন। সংকীর্ত্তনে এবং প্রার্থনা কালে তিনি এতই ভক্তিতে বিগলিত হইতেন যে সেরূপ বিগলিত ভাব অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এই জন্যই প্রেমদাস গাহিয়াছিলেন, "ভেবে ছিলাম কলিকালে আর, যত সভ্য জ্ঞানী পণ্ডিতেরা হবে না তোমার; এখন সকল বিদ্যা উল্‌টে গেল, করেদিলে খুব নাকাল!"

ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র সাধু ভক্ত মহাজনদের প্রতি বড়ই শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। শাক্য, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণের পবিত্র স্মরণীয় দিনে তাঁহাদের জীবন সম্বন্ধে উৎসাহ ও ভক্তি সহকারে আলোচনা করিতেন।

ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের জীবনে যেমন কর্ম্মনিষ্ঠা, তদ্রূপ ভগবানের নামে ভক্তি এবং সর্ব্বভূতে দয়া আমরা দেখিয়াছি। ভগবানের নাম কীর্ত্তনে ও শ্রবণে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। ভগবৎ-পাদপদ্মস্পর্শ লাভের জন্য তাঁহার আত্মা একান্ত ক্ষুধিত ও তৃষিত ছিল, ইহা আমরা দর্শন করিয়াছি। গঙ্গার জল যেমন অবিরত সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, অবিনাশচন্দ্রের আত্মা তদ্রূপ ভগবৎ-স্মৃতিতে পূর্ণ ছিল। ইহার নামই অহৈতুকী ভক্তি। ভাগবত বলেন, "যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমুদয় গুণসহকারে দেবগণ আসিয়া তাঁহাতে বাস করেন।" ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের হৃদয়েও ভগবানের সঙ্গে সর্ব্বগুণ সঙ্গে করিয়া দেবগণ বাস করিতেন। ইহা ভক্তির লক্ষণ। এজন্য ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র ভক্তিরত্ন।

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ, সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময়, "নবকুমার ইনষ্টিটিউসন" ভবনে নববিধান ও সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ উপাসনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দুর্গানাথ রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

সংবাদ।

তীর্থ-যাত্রা—পরলোকগত প্রিয়জনের আত্মতীর্থ-সাধনার্থ, ভাই প্রিয়নাথ গত ৮ই জুলাই নবদেবালয়ে উপাসনা করিয়া কটক যাত্রা করেন। ৯ই প্রাতে সেখানে পৌঁছিয়া, স্বর্গীয় রায় মধুসূদন রাও বাহাদুরের গৃহ-দেবালয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং পরিবারবর্গ সহ বিশেষ উপাসনা করেন। ১০ই জুলাই গৃহস্থ বৈরাগী স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর পুত্র স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। পর দিন ১১ই জুলাই ভাই প্রিয়নাথের প্রথম একমাত্র পুত্র প্রমোদনাথের স্বর্গদিন-স্মরণে মধুভবনে প্রাতে বিশেষ ভাবে উপাসনা হয়, তৎপর মহানদী-তীরস্থ সমাধিক্ষেত্রে বটবৃক্ষতলে ধ্যান প্রার্থনাদি হয় এবং অপরাহ্ণে পরিবার ও বন্ধুদের লইয়া শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, লিখিত ধ্রুবচরিত ও রায় বাহাদুর মধুসূদন রাও লিখিত পদ্য পাঠ ও প্রমোদ-চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র বসু এবং ভ্রাতা বিশ্বনাথ কর প্রমোদের আশ্চর্য্য ধর্ম্মজীবনের কথা কিছু কিছু বলেন। সন্ধ্যায় নির্জ্জন সাধনাদি হয়।

সেবা—বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাসের সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধের পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ একমাসের অধিককাল বালেশ্বরে থাকিয়া, বিভিন্ন গৃহে পারিবারিক উপাসনা, তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা, বন্ধুগণের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ও প্রসঙ্গ, একদিন তথাকার রাজবাটীতে "ধর্ম্মের সামঞ্জস্য" বিষয়ে বক্তৃতা ও সর্ব্বশেষে তত্রত্য সমাজের আষাঢ়ের বার্ষিক উৎসবের কার্য্য করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগত হইয়াছেন।

গত ১২ই জুলাই কটক ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের অনুরোধে ভাই প্রিয়নাথ স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে রবিবাসরীয় সান্ধ্য উপাসনা করেন এবং অসাম্প্রদায়িক নববিধানের প্রভাবে সকল সম্প্রদায়ের নব সৃষ্টি সম্বন্ধে আত্মনিবেদন করেন। ১৩ই জুলাই প্রাতে কটক ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষক ভ্রাতা জিতেন্দ্রমোহন হালদারের পরিবারবর্গকে লইয়া বিশেষ উপাসনা করেন। পরে স্কুল-ইন্স্পেক্টর মিঃ এস্ রায়ের পরিবারে, অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফ মিঃ পট্টনায়কের পরিবারে, হেড মাষ্টার মিঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রোগশয্যাপার্শ্বে, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর গৃহে এবং কটকের সুবিখ্যাত উকিল শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা জানকীনাথ বসুর সঙ্গে প্রসঙ্গ ও প্রার্থনাদি করিয়া সেই রাত্রেই শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে পুনঃ যাত্রা করেন।

প্রত্যাবর্ত্তন—চট্টগ্রামের স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিজয়শ্রী গুপ্ত জার্ম্মাণীতে প্রায় দশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া, বার্লিনের শারলোটেনবর্গ হইতে ইঞ্জিনীয়ার উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, জার্ম্মাণ পত্নী মিসেস হেলমা গুপ্ত সহ, গত ১৬ই জুলাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৭ই জুলাই, ২নং ছকু-খানসামা লেনে তদীয় ভ্রাতা শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের গৃহে কলিকাতাস্থ পরিবারের সকলে মিলিয়া শ্রীমান্ বিজয়শ্রী ও তাঁহার পত্নীকে সানন্দে আদর অভ্যর্থনা করেন এবং ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ ও শ্রীমান্ বিজয়শ্রী ভগবানের শুভাশীষ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। শ্রীমানের উপর পরিবার, মণ্ডলী ও দেশের কত আশা ভরসা। ভগবান্ তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

উন্নতি—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদের প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন বাঙ্গলার প্রভিশন্যাল এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক উপাসনা—গত ১০ই জুলাই, ৮৩।১নং অপার সার্কুলার রোডে, শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহের গৃহে, তাঁহার শ্বশুর

গিরিধির স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র নাগের পরলোকগমনের একমাসান্তে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩০শে জুন, স্বর্গগত আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের স্বর্গগমনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, বালেশ্বরে শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাসের গৃহে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ভগবানবাবুর পরিবারবর্গের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিশেষ উপাসনা করেন। উপাসনা কালে স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের অতি পবিত্র বৈরাগ্য-পূর্ণ নববিধান-সর্ব্বস্ব, ব্রহ্মানন্দ-কেশবচন্দ্র-সর্ব্বস্ব ও মাতৃ-সাধন-সর্ব্বস্ব জীবনের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল।

গত ১৪ই জুলাই, সাধু অঘোরনাথ... স্বর্গদিন-স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা ও সাধুর পত্রাদি পাঠ হয়। গত ২০শে জুলাই, গৃহস্থ বৈরাগী স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী সাধ্বী ক্ষেমঙ্করী দেবীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণেও বিশেষ উপাসনা হয়। দেবী বড়ই পরসেবাপরায়ণা ছিলেন। গত ২৪শে জুলাই, শ্রদ্ধেয় ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গদিন স্মরণে এবং গত ২৫শে জুলাই ভাই প্রিয়নাথের চতুর্থ কন্যা বিনীতির স্বর্গগমন দিন স্মরণেও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনাদি হয়।

ভ্রম-সংশোধন—১লা শ্রাবণের "ধর্ম্মতত্ত্বের" সংবাদ-স্তম্ভে, মিঃ থডানির পত্রে "New universal Dispensation Church" স্থলে "Universal New Dispensation Church" হইবে।

দ্বি-ষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব

—আহ্বান—

নববিধানের দেবতা, আনন্দময়ী মাতা, ডাকিছেন সবে
স্নেহ আদরে।
তোরা আয়রে আয় ভাই, মায়ের কাছে যাই, গিয়ে
প্রাণ জুড়াই;
গাই আনন্দে মা নাম সমস্বরে।

উৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে এই কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩১, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৮, শনিবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে (৭৮বি, আপার সার্কুলার রোড) উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভা।

১৬ই আগষ্ট, ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার—প্রাতে ৮॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১৭ই আগষ্ট ৩২শে শ্রাবণ, সোমবার—শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ।

১৮ই আগষ্ট, ১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা।

১৯শে আগষ্ট, ২রা ভাদ্র, বুধবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় শান্তিকুটীরে (৮৪নং আপার সার্কুলার রোড) "আমাদের সঙ্ঘের" উৎসব।

২০শে আগষ্ট, ৩রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদলের প্রার্থনা ও বক্তৃতা।

২১শে আগষ্ট, ৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধেয় ভাই বলদেব নারায়ণের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ।

২২শে আগষ্ট, ৫ই ভাদ্র, শনিবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে কেবলমাত্র মহিলাদিগের উপাসনা।

২৩শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, রবিবার—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭টায় কীর্ত্তন, ৮টায় উপাসনা। মধ্যাহ্নে ২॥০টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ ও আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৬টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৪শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র, সোমবার—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৫শে আগষ্ট, ৮ই ভাদ্র, মঙ্গলবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানমণ্ডলীর সাধারণ সভা (Conference)।

২৬শে আগষ্ট, ৯ই ভাদ্র, বুধবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দী ভজন।

২৭শে আগষ্ট ১০ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ।

সকলের সপরিবারে সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
২৮শে জুলাই, ১৯৩১।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

দ্রষ্টব্য:—উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ভক্তির অঞ্জলিরূপে যিনি যাহা দিবেন, তাহা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধের নামে অথবা ৮০নং আপার সার্কুলার রোড এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদের নামে পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

৫ই, ৬ই, ৭ই ও ৯ই ভাদ্র, ব্রহ্মমন্দিরে দান সংগৃহীত হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ১৫শ সংখ্যা।
১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
18th August, 1931.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, তোমার নববিধানাচার্য্য প্রার্থনা করিলেন, "ঈশ্বর, স্বর্গ হইতে নির্ম্মল পবিত্র অলৌয় ধর্ম্ম এসেছে, কিন্তু প্রণালীর দোষে কলঙ্কিত হয়ে যায়। প্রথমে যা অকলঙ্কিত থাকে, প্রণালীর দোষে তা কলঙ্কিত হয়ে যায়। দশজন প্রচারকের হাতে দশ নববিধান হইল। তাই সঙ্কোচ হইতেছে, আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। জ্ঞান, ধর্ম্ম, যোগ, ভক্তি, মত্ততা, গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে যখন এত বিবাদ, তখন বোধ হয়, আর ধর্ম্ম খাঁটি রহিল না। মা, তোমার ধর্ম্ম এত শীঘ্রই ভিন্ন আকার ধরিল? সাদা কাল হয়ে গেল। দয়াময়, খাঁটি পরিত্রাণের ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচার করিতে হবে। আমরা তোমার কাছে খাঁটি হয়ে থেকে খাঁটি ধর্ম্ম জগৎকে দিব। এ যা ছিল, অনন্তকাল তাই থাকবে, কেহ বদলাইতে পারিবে না। আমরা যতদিন বাঁচিয়া আছি, ততদিন ইহার রক্ষক। আমরা জাল করিব? আমাদের হাতে চিঠি দিলে, আমরা তাকে জাল করে তারপরে চিঠি বিলি করিব? দয়াময়, ষোল আনা ভক্তি দিতে হবে তোমার ধর্ম্মে, ষোল আনা বিশ্বাস কর্ত্তে হবে। তুমি সরস্বতী হয়ে বস, আমি বেদব্যাস হয়ে লিখি। হে ঈশ্বর, যা তোমার বিধি, তা আমার বিধি। আমার কোন ভাই কি ভগিনী তোমার এক টুকরা সত্য যেন বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা না করেন, কমিয়ে দেবার চেষ্টা না করেন। মন ব্যথিত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার ধর্ম্ম এত ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে? দয়াময়, আমাদের পাঁচগুরু দরকার নাই, জগদ্‌গুরু আমাদের গুরু। হরি, আমাদের দশটা দশ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশজন দশটা মত খাড়া করেছে। ভারি বিপদ। দেখে শুনে ভয় পেয়ে, তোমার দাস তোমার কাছে তাই এই ভিক্ষা চাহিতেছি, সাংঘাতিক বিপদে রক্ষা কর। তুফান ভারি, ওহে হরি, তোমার হাল তুমি ধর। এক খানি ধর্ম্ম আমরা রাখিব। একখানি মানুষ হয়ে, একখানি ভক্ত হয়ে, তোমার পাদপদ্ম সাধন করিব। গরিবের ধন, এবার যদি পড়ি, ভারি লাগিবে, এবার যেন না পড়ি। ঈশ্বর, তোমার নববিধানের দোহাই। যেন তোমার রচিত অখণ্ড নববিধান-শাস্ত্র সকলে মিলিয়া সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।" মা, নবভক্তের এই প্রার্থনাই আমাদের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হউক। সত্যই তুমি যে এবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ হয়ে, অখণ্ড বিধান নববিধান, অসাম্প্রদায়িক সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-বিধান-শাস্ত্র স্বয়ং রচনা করিলে এবং আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তার রক্ষকরূপে নিযুক্ত

করিলে। আমরা কি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তার উপর কলম চালাবো? জাল করে, ভেজাল মিশাল নিজ নিজ মত নববিধান বলে প্রচার করিব? ধিক্ আমাদিগকে। বরাবর তোমার বিধানে এইরূপ মানবীয় মত সংযোজিত হইয়াই ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিতেই এই অসাম্প্রদায়িক সর্ব্বসমন্বয়-বিধান প্রবর্ত্তন করিলে। তাতেও যদি আমরা নিজ নিজ মত চালাইয়া সাদাকে কালো করি, ভাবি পতন হইবে। তোমার ধর্ম্মকে তুমি রক্ষা কর। আমাদিগকে খাঁটি করিয়া, খাঁটি নববিধান রক্ষা ও প্রচার করিতে দাও এবং তোমার বিধান-প্রবর্ত্তকের সঙ্গে একাত্মা হয়ে সবে মিলে একখানি মানুষ হয়ে, তব বিধান জয়যুক্ত করি, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাদ্রোৎসবের আহ্বান ও অভিবাদন।

বর্ষা নামিল, গ্রীষ্ম চলিয়া গেল, ক্ষেত্রে বীজ-বপন হইল। প্রাকৃতিক জগতে ভাদ্রমাস বর্ষাকাল। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানেও বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৌশলে এই ভাদ্রমাসে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ উপ্ত হয়, আবার এই ভাদ্রমাসেই সর্ব্ব-সমন্বয়-বিধান যুগধর্ম্ম নববিধানের নব উপাসনা-সাধন প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুষ্ক জড়বাদ, কুসংস্কার, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, জাতিভেদাভেদ ধর্ম্মরূপে যখন সমাজকে মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, একেশ্বরবাদের শীতল বায়ু তখন এই ভাদ্রমাসেই প্রথম প্রবাহিত হয়।

আবার ব্রাহ্মসমাজও যখন শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তখনই ভক্ত্যুচ্ছ্বসিত হৃদয়ের প্রাণগত উপাসনা-সাধনের বারি বর্ষিত হইয়া যে নববিধান-সাধনার উদ্গম হয়, তাহাও এই ভাদ্রমাসে হয়। ইহা হইতেই এই ভাদ্রোৎসবের প্রবর্ত্তনা।

সর্ব্বধর্ম্মের সাধনা একাধারে সমন্বিত করিয়া, সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনাই নববিধানে জীবনলাভের একমাত্র উপাদান। ইহা স্বর্গের কৃপা-বর্ষণেই সম্ভোগ হয়। ইহা সম্ভোগের জন্যই আমরা ভাদ্রোৎসবে আহূত। তাই এই সময়ে আমরা সমতানে ঐক্যতানে গান করি :—

"বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি।
দগ্ধ হৃদয় লয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে, ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ;
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান;
বিতর বিতর প্রেম, পাষাণ হৃদয়ে,
জয় জয় হোক্ তোমারি।"

এই উপলক্ষে সর্ব্ববিশ্বমানবকেও এক অখণ্ড নববিধানে মিলনের জন্য আহ্বান করি ও অভিবাদন করি।

বর্ত্তমান সমস্যা।

যুগে যুগে যিনি বিধাতারূপে স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিয়া বা অবতীর্ণ হইয়া, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতি দূর করিবার জন্য, নব নব যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনিই প্রাচীন যুগধর্ম্মে গ্লানি সঞ্চারিত হইতে দেখিয়া, ঈশ্বরের নামে কল্পিত মূর্ত্তির ও মানুষের পূজা প্রবর্ত্তিত দেখিয়া, ধর্ম্মের নামে শাস্ত্র মন্ত্র বাহ্যানুষ্ঠান, বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, আচার, সংস্কার, মৌখিক প্রার্থনা ও পূজা পদ্ধতির প্রশ্রয় দেখিয়া, সাধু ভক্ত মহাপুরুষগণের উচ্চ জীবনাদর্শ অনুসরণ অসাধ্যবোধে তাঁহাদিগকেই ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইতে দেখিয়া, বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ব ধর্ম্ম, সকল সাধু ও সকল শাস্ত্র সমন্বিত করিয়া, এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পূজা-সাধনে পরস্পর ভ্রাতৃত্বযোগে এক প্রেম-পরিবারে মিলিত হইয়া সর্ব্বমানবের পরিত্রাণ লাভের জন্য, এই নবযুগধর্ম্ম-বিধান নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন।

তিনিই রাজর্ষি রামমোহনকে তাঁহারই জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করাইয়া, একই ঈশ্বরবাদ-প্রবর্ত্তনে এই নবধর্ম্মের বীজ ভারতে প্রথম বপন করান।

তিনিই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহারই প্রেরণায় প্রেরিত করিয়া, বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধন ও প্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্মের পূজা পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করতঃ একেশ্বরের উপাসনা-

মণ্ডলী গঠন করেন এবং স্বয়ং সেই বিধাতাই মহর্ষিকে প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশে প্রত্যাদিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে নিয়োগ করেন।

তিনিই ত বিশ্ববিধাতা হইয়া, ব্রহ্মানন্দকে অলৌকিক অধ্যাত্ম জীবনে ভূষিত করেন এবং রামমোহন ও মহর্ষির প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মাকারে পরিপুষ্ট করিয়া, ব্রহ্মানন্দের জীবনে তাহা সাধন করাইয়া, ইহাই যে নবযুগের নববিধান, ইহা ঘোষণা করাইয়াছেন।

এই বিধানের গঠন ও পরিপুষ্টি সকলই জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেরণা-সম্ভূত, ইহার ভিতর কোন মানুষের হস্ত বা কিছুই নাই। তাই কেশবচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "যিনি বীজ বপন করেন, তিনিও কেউ নন, যিনি জল সিঞ্চন করেন, তিনিও কেউ নন। এ বিধানে বিধাতা সকলই করেন।" মহর্ষিদেবও আমাদের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম যে "নববিধান" ইহা স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়াছি, পণ্ডিত শিবনাথ ও শেষে "নববিধান" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

তাই আমরা রাজা রামমোহনকে আমাদের ধর্ম্মপিতামহ, মহর্ষিকে আমাদের ধর্ম্মপিতা, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে অগ্রজ ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান করি; তাঁহাদের কাহাকেও আমাদের মধ্যবর্ত্তী বলি না এবং তাঁহারাও তাহা কেহ চান নাই। একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের উপাস্য উদ্দেশ্য পিতামাতা এবং তাঁহারই সম্পর্কে আমাদের অগ্রজগণও আমাদের ধর্ম্মভ্রাতা ভিন্ন আর কিছুই নন। আমরা তাঁহাদের সহযোগী বা সমসাধক হইয়া, এই সর্ব্ব-সমন্বয়-ধর্ম্মবিধান সাধন করিয়া, জীবনে চরিত্রে তাহা সপ্রমাণ করিব, ইহাই আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ। আমরা কেবল মতে বা মুখে এই ধর্ম্ম মানিয়া ক্ষান্ত হইব, ইহা বিধাতার ইচ্ছা নয়। আমাদের অগ্রজদিগের ন্যায় আমরাও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়া, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রহ্মের এই নূতন ধর্ম্ম-বিধান জীবনে আচরণ ও পালন করিয়া, বিশ্বমানব-চরিত্র লাভ করিব, ইহাই আমাদের ধর্ম্ম এবং ইহাই আমাদের জীবনের কর্ম্ম।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বিধান যথার্থ সমন্বয়-বিধান বলিয়া, আজকাল কতই নূতন নূতন গুরু আবির্ভূত হইয়া আপনাপন ধর্ম্মমতকে সর্ব্ব-সমন্বয়-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক সময়ে হয় ত প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সম্ভব ইহার উচ্চ গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের সাধন গ্রহণ করিতে না পারিয়াই, এ ধর্ম্মের সকল মত, আচরণ অনুকরণ করিয়া, তাহাতে কেবল হিন্দু ধর্ম্মের ছাপ মারিয়া এবং নিজে নিজে এক একজন গুরু হইয়া এক এক সম্প্রদায় গঠন করিতেছেন।

বাস্তবিক এই যুগ যেমন সমন্বয়ের যুগ, তেমনি নূতনত্বেরও যুগ। এযুগে নবধর্ম্ম সকল মানবেরই আকাঙ্ক্ষণীয়। তাই প্রাচীন কুলধর্ম্মে, পুরাতন বর্ণাশ্রমে, পুরাতন আচার ব্যবহারের প্রথা অবলম্বনে কেহই ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না; কুলগুরুর কাছে মন্ত্র না লইয়া নূতন গুরুকরণ করা শিক্ষিত মাত্রেরই যেন সাধন হইয়াছে; মেয়েরা আর গৃহে আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছেন না। প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে কে আবদ্ধ থাকিবে? স্ত্রী-শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, জাতি-ভেদ-বর্জ্জন ইত্যাদি যাহা কিছু ব্রাহ্মসমাজ নববিধানে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সকলই সকলে অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেছেন। সকলই লইতেছেন, কেবল আসল ধর্ম্ম-বিধান বা ধর্ম্মজীবন এবং এই বিধানের বিধাতা জীবন্ত ঈশ্বরকে লইতেছেন না। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে যত নব নব সম্প্রদায় উদ্ভূত হইতেছে, সবাই এক এক জন মানুষকে গুরু বা নেতা করিয়া তাঁহারই পূজা বা অনুসরণে নিরত হইতেছেন। প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা কোথায়?

ইহাতে আপাততঃ আমাদের অনেক বলক্ষয় হইতেছে। আক্ষেপের বিষয়ও এই যে, অনেক ধর্ম্মপিপাসু আত্মা, যাঁহারা নিশ্চয়ই ধর্ম্মপিপাসায় পিপাসিত হইয়া সত্য-ধর্ম্মগ্রহণে ধন্য হইতে পারিতেন, তাঁহারা সত্যের ধর্ম্ম পাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস করি, সত্যের জয় হইবেই হইবে, সত্যধর্ম্মের আশ্রয়ে বিধাতা সকল সরল বিশ্বাসীকে আনিবেনই আনিবেন, এবং যতই কেন বাহ্য আড়ম্বরের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উদ্ভূত বা প্রচারিত হউক না, এই মহা অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন বিধানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, এবং একদিন এই নববিধানই জগতের ধর্ম্ম হইবে।

এ বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক বিধানে আমরা সকল ধর্ম্মকে এক করিব, সকল জাতিকে, সকল সম্প্রদায়কে এক করিব বলিয়া এই নববিধানাশ্রয়ে আসিয়াছি;

কিন্তু আমরাই যদি তাই তাই ঠাই ঠাই রই, আমরাই যদি আমাদের ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা পরিহার করিয়া ঐক্যবন্ধন করিতে না পারি, কেমনে আমরা মহামিলনের স্বর্গরাজ্য ধরায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব?

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজা রামমোহন যে ধর্ম্মের বীজ বপন করিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে বীজকে সাধনরূপ জলসিঞ্চনে অঙ্কুরিত করিয়া প্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্ম-নামাভিধানে অভিহিত করিলেন, তাহাই সর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয়াকার-ধারণে বিশ্বজনীন নবযুগধর্ম্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট নববিধান বলিয়া স্বয়ং বিধাতার আলোকে প্রত্যক্ষীভূত হইল। তাই তিনি ইহাকে নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সুতরাং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ এই একই নববিধানের অন্তর্ভূত, ইহার ত্রিশাখা একই বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সাধন ও শিক্ষার তারতম্য অনুসারে ব্যক্তিগত উপলব্ধির ভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে নিজ নিজ মতের পক্ষপাতী হইয়া পরস্পরের বিশিষ্টতা স্বীকারে ও গ্রহণে যদি উপেক্ষা করি, তবে আমরাও এক একটী সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিব। এই তিনটী সমাজ যদি এখনও আপনাদের ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা এই অখণ্ড অসাম্প্রদায়িক নববিধানে নিমজ্জিত করিয়া ঐক্যবন্ধনে কৃতসংকল্প না হন, এই তিনটী সমাজও কেবল তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে তাহা নহে, ইহা হইতে অচিরেই বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়া, এই অখণ্ড অসাম্প্রদায়িক বিধানকেও সাম্প্রদায়িকতার পাপে কলুষিত করিবে। বিধাতা আমাদিগকে এ পাপ হইতে রক্ষা করুন।

বিধান-প্রবর্ত্তকের সহিত পূর্ণ একাত্মতা অবলম্বনে, পরস্পরের সহিত বিধাতার আলোকে একাত্মতা-বন্ধনই সাম্প্রদায়িকতা হইতে রক্ষার একমাত্র উপায়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

রং পরিবর্ত্তন।

কালো রং সকল রংকে পরিবর্ত্তন করিয়া কালো করিয়া থাকে। অনন্তরূপ ঘন কালো, নিরাকার শূন্যাকারও কালো। তাই নিরাকার অনন্ত স্বরূপ যাহা কিছুতে লাগাও, তাকেই নিরাকারে পরিণত করে। এই জন্যই নিরাকার ব্রহ্মস্পর্শে সংসার, বাহ্যপ্রকৃতি বা সাধুভক্ত ও দেব দেবীর মূর্ত্তি সকলই নিরাকার হইয়া যায়। তাই নববিধানের কাছে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, এমন কি ঈশা, মুষা, গৌর, শাক্য, মোহম্মদ সকলেই নিরাকার চিন্ময়। বাহ্য আকার-বিশিষ্ট কিছুই নয়। এই জন্যই সাধক রামকৃষ্ণ বলিতেন, "কেশব, তোমার কাছে এলে আমার চৌদ্দপো মা গলে যায়।" ইহা অতি সত্য কথা।

শরীরের সহিত বিবাদ।

এতদিন মনে করিতাম, শরীর আমার হুকুমের চাকর, ইহাকে যেমন খুসী তেমন করিয়া খাটাইব। বাল্যে, যৌবনে ইহা নির্ব্বাকে আমার স্বেচ্ছাচার সহ্য করিয়াছে। বার্দ্ধক্যে আর আমার স্বেচ্ছাচার সহ্য করিতে চায় না। বলে, "এতদিন আমি তোমার স্বেচ্ছাচার হুকুম মানিয়াছি, এখন আমার তোষামোদ তোমাকে করিতে হইবে, নইলে তোমার সেবা আমি করিতে পারিব না। আমার এখনকার উপযুক্ত সেবা যদি করিতে পার, আমার হুকুম মত তোয়াজ করিতে পার, তবে কিছুদিন তোমার সেবা করিতে পারি; নতুবা অচিরেই ইসতফা দিয়া চলিয়া যাইব, তোমার কাছে থাকব না।" তাই এখন যাহা করা উচিত ছিল না করিয়াছি, যাহা উচিত ছিল করি নাই বলিয়া অনুতাপ করি।

আকস্মিক মৃত্যুতে শিক্ষা।

মৃত্যু দেখিলেই ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা হয়। কাহার কখন মৃত্যু হয়, তাহার ত স্থিরতা নাই; তাই যখন তখন আমাদেরও মৃত্যু হইতে পারে, এজন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" মৃত্যু আমাদের কেশ ধরিয়াই আছেন, কখন বলিতে কখন লইয়া যাইবেন, এই মনে রাখিয়া ধর্ম্মাচরণে সর্ব্বক্ষণই নিয়োজিত থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ মৃত্যু হইতে আমাদিগের ইহাই শিক্ষা। আকস্মিক মৃত্যু হইতে আরো শিখিলাম, নববিধানে ধর্ম্মসাধন যেমন নিষ্কাম, মৃত্যু সম্বন্ধেও তেমনি নিষ্কাম হইতে হইবে। অর্থাৎ আমরা যে সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করিয়া থাকি, তাহাও আমাদিগের করা ধর্ম্ম নয়। যে ভাবেই মৃত্যু আসুক না কেন, তাহাই বিধাতার ইচ্ছা মনে করিয়া, আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে নিষ্কাম হইতে হইবে, ক্রুশবাহী ঈশা যেমন নিষ্কাম ভাবে মৃত্যু গ্রহণ করিলেন।

ভাষার পরিবর্ত্তন।

নববিধানের সঙ্গীত সকল পবিত্রাত্মার প্রেরণাতেই রচিত। উপাসনার অবস্থায় আচার্য্যের প্রাণে যখন যে ভাব আসিয়াছে, সঙ্গীতাচার্য্য তখনই সে ভাবানুরূপ আদকালেই সঙ্গীতই রচনা করিয়া গান করিয়াছেন। সুতরাং ইহার ভাষা ও ভাব

অধ্যাত্মপ্রেরণা-সম্ভূত। মানবীয় বিচার বুদ্ধি সহকারে ইহাতে কলম চালাইতে গেলে অর্থাৎ ইহার ভাষা বদলাইয়া দিতে গেলে সঙ্গীত-রচয়িতার অবমাননা করা হয়, কেবল তাহা নয়, তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব-গ্রহণেও ভবিষ্যৎ সাধনার্থীদিগকে বঞ্চিত করা হয়। সাধকমাত্রেই ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, যে শব্দের যে ভাব আপাততঃ গ্রহণ করিতে পারি না, ক্রমে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে তাহা করিয়া থাকি। এরূপ শুধু সঙ্গীতের ভাষা কেন, আচার্য্য ও উচ্চ সাধক মাত্রের প্রার্থনা, উপদেশ, লেখা বা উক্তির উপর আমাদের কলম চালান নিতান্তই অপরাধ। সাবধান, যেন সে অপরাধে অপরাধী না হই। আচার্য্য বলেন, "আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলি না।"

—০—

"ধর্ম্ম-সাধন"।

২১ সংখ্যা—৪ঠা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

২৮শে ভাদ্র—১৭৯৪ শক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—কিরূপে ঈশ্বরকে প্রেম করা যায় ?

উত্তর—ঈশ্বরকে প্রীতি করাই সকল ধর্ম্ম-সাধনের উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রতি প্রেম সাধন করিতে হইলে, তিনি আমাদিগকে কিরূপ প্রেম করেন, হৃদয়ে অনুভব করা চাই। প্রেমের নিয়ম এই, যিনি আমাকে প্রেম করেন, তাঁহাকে আমিও প্রেম না দিয়া থাকিতে পারি না। বস্তুতঃ আমরা আমাদিগের জীবনে যতই তাঁহার প্রেম অনুভব করিতে সমর্থ হইব, ততই আমরা তাঁহার প্রেমিক হইব। পাপী পাপ মলিনতায় তাঁহার প্রেম অনুভব করিতে পারে না; সে মনে করে, আমার ন্যায় পাপীকে কি তিনি প্রীতি করিতে পারেন? এই মলিনতা দূর করিয়া তাঁহার প্রেম বুঝিবার জন্য সাধন চাই। এই সাধনের নাম বৈষ্ণবেরা সাধন-ভক্তি বলেন। প্রতিজনের পক্ষে সাধন এক প্রকার নয়। কেহ বা তাঁহার নাম করিলেন, কেহ বা তাঁহার উপাসনা করিলেন, কেহ বা শুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। এই সাধন হইতে ভক্তির প্রতিবন্ধক সকল অল্পে অল্পে চলিয়া যায়, ইহাকে অনর্থ-নিবৃত্তি বলে। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং পরিশেষে প্রেম উপস্থিত হয়, এই প্রেমই পর্য্যবসান। ইহাতেই ঈশ্বরের সহিত সাধকের সম্মিলন হয়। ইহাকেই বৈষ্ণবেরা প্রেমভক্তি বলেন।

প্র—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম কিরূপে স্থায়ী হয় ?

উ—প্রীতি হইলেই তাহার কার্য্য হইবে। প্রীতি করিলাম, অথচ তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিলাম না, সে প্রীতি কখন প্রীতি নহে। কার্য্যহীন প্রীতি অধিকদিন স্থায়ী হয় না। শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব যেমন প্রীতি করিতে হইবে, তেমনি ঈশ্বর-সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এরূপ করিলে ঈশ্বর-প্রেমের স্থায়িত্বের পক্ষে আর কোন সংশয় থাকিবে না।

প্র—কৃতজ্ঞতা প্রেম-বৃদ্ধির উপায় কি না ?

উ—কৃতজ্ঞতা প্রেম-বৃদ্ধির উপায় অবশ্য বলিতে হইবে। যে ঈশ্বরের প্রেম বুঝে, সেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। প্রেম বুঝিলেই তাঁহার প্রতি প্রেম নিশ্চয় হইবে। পশু হইতে মনুষ্যের প্রভেদ এক এই কৃতজ্ঞতাতে। পশুগণ তাঁহা হইতে উপকার লাভ করিতেছে, অথচ সেজন্য তাহারা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। কৃতজ্ঞতা বস্তুতঃ মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ।

প্র—প্রেম-সাধনের প্রধান বিঘ্ন কি ?

উ—অহংকার। ইহা এমন ভয়ানক শত্রু যে, ইহা সাধনের মধ্যে ও প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। আমরা দেখিয়াছি, যে দিন মনে করিলাম, আমরা বেশ ভাল উপাসনা করিতে পারি, অমনি উপাসনা শুষ্ক হইয়া গেল, পুনরায় ভাল উপাসনা শীঘ্র হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ কোন কিছুরই জন্য আমাদিগের অহঙ্কার করিবার অধিকার নাই, কারণ সকলি তাঁহার দান।

প্র—ঈশ্বরের প্রেম-সাধনে সংসার প্রতিবন্ধক হয়, অতএব সংসার পরিত্যাগ করিয়া সাধন সমুচিত কি না ?

উ—প্রেম সাধন করিতে সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইতে হয়, এটী ভ্রম, বরং তাদৃশ পরিত্যাগে প্রেম শুষ্ক হইয়া যায়। বৈষ্ণবেরা এরূপ পরিত্যাগকে ফল্গু শুষ্ক বৈরাগ্য আখ্যা দিয়াছেন। 'মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগঃ ফল্গু বৈরাগ্য-মুচ্যতে।' বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হইয়া যথোপযুক্তরূপে বিষয় সকলকে ভোগ করিবে, অথচ হৃদয় ঈশ্বরে বদ্ধ থাকিবে। তাঁহারা এরূপ বৈরাগ্যকেই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য বলেন। যাঁহারা মনে করেন, সংসার পরিত্যাগ না করিলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম সাধন হয় না, তাঁহারা বস্তুতঃ প্রেম সাধন কি, বুঝেন না। ঈশ্বরের প্রেম না বুঝিলে কি প্রকারে তাঁহাকে প্রেম করিব? স্ত্রী, পুত্র, কলত্র প্রভৃতি যত কিছু সংসারে সুখকর উপায়, সকলই তাঁহার প্রেমের দান। এই সকলের মধ্য দিয়াই আমরা বিশেষরূপে তাঁহার প্রেম বুঝিতে পারি। আমি আমার সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া যে আনন্দ পাইতেছি, যদি সেই সঙ্গে বুঝিতে পারি এটী ঈশ্বরের দান, ঈশ্বর আমাকে সুখী করিবার ও শিক্ষা দিবার জন্য আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, একগুণ আনন্দ চতুর্গুণ হয়। সংসারী-দের এরূপ আনন্দলাভের কি সম্ভাবনা আছে? আবার সেই

সন্তান যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকস্থ হয়, এ সন্তান তাঁহারই, তিনি মঙ্গলের জন্য তাহাকে এখান হইতে লইয়া গেলেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে পারি। যাহারা মনে করে, এরূপ সংসার উপভোগ করিতে গিয়া সাধক সংসারে নিমগ্ন হইবে, তাহাদিগের বিষম ভ্রম। সংসার মধ্যে তাঁহার প্রেম দর্শন করিয়া, ঈশ্বরেতেই প্রেম বৃদ্ধি হয়, সংসারেতে নহে। "বিষয়েষু গরিষ্ঠোহপি রাগো যত্র বিলীয়তে" বিষয়েতে অতিমাত্র অনুরাগও যাঁহাতে (ঈশ্বরেতে) বিলীন হয়। ঈশ্বরের প্রেম সাধনে একথা মনে থাকিলে ভয় করিবার আর কোন কারণ থাকে না।

প্র—ঈশ্বরে যথার্থ প্রেম কাহাকে বলা যায়?

উ—ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করাই তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রেম। নিঃস্বার্থ, অহেতুকী, অকিঞ্চন ভক্তি হইতে যে প্রেম সম্ভূত হয়, তাহাই যথার্থ প্রেম।

প্র—তাঁহার প্রতি প্রীতি হইয়াছে, কি প্রকারে বুঝা যায়?

উ—ইহার পরীক্ষা, তাঁর সঙ্গে সহবাসে, তাঁর কথায়, তাঁর সেবায় আনন্দ হয় কি না? যাঁহাকে ভালবাসি, তজ্জন্য আমরা আমাদিগের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হই না। ঈশ্বরের জন্য আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি কি না? এবং তাহা করিয়া সুখী হই কি না?

প্র—সাধনের মধ্যে কোন অবস্থাটী ঘোর পরীক্ষার অবস্থা?

উ—সাধনে অনেক পরীক্ষা আছে; তন্মধ্যে সাধনের প্রথমাবস্থায় ঈশ্বর-সহবাসের আমোদ লাভ করিয়া, মধ্যাবস্থাতে যে ঈশ্বর-সহবাস হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এইটী অতি ভয়ানক পরীক্ষার অবস্থা। এই সময়ে অনেকে দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া পলায়ন করেন। সাধকের যে এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার একটী উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা আছে। কথিত আছে, নারদ দাসীপুত্র ছিলেন। তিনি মাতার সহিত একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকিতেন। চাতুর্মাস্যায় কয়েকজন উদাসীন ঐ ব্রাহ্মণ বাটীতে অতিথি হন। পঞ্চমবর্ষীয় নারদ তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গ-শ্রবণে নিতান্ত আসক্তি প্রদর্শন করেন। ইহাতে তাঁহারা তাহাকে মন্ত্রদান করেন। নারদ সেই পর্য্যন্ত সাধন আরম্ভ করেন। তাঁহার মাতার সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। তিনি সেই সময়ে বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। একটী বৃক্ষতলে বসিয়া যখন হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতেছিলেন, তখন তিনি 'আনন্দসংপ্লবে লীনঃ' আনন্দ-সাগরে বিলীন হইলেন, ঈশ্বর-সহবাসের অপূর্ব্ব আস্বাদ লাভ করিলেন; কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই এ ভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি ব্যাকুল হইলেন। এই সময়ে অশরীরী বাক্ (হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ) তাঁহাকে বলিয়া দিল, তোমাকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য আমি একবার সাক্ষাৎ দর্শন দিলাম, ইহার পর কঠোর সাধনান্তে তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করিবে। ইহার পর নারদ বহু কঠোর সাধনা করিয়া, দশদিক্ শূন্য দর্শন করিয়া বহুকাল পরিভ্রমণ করেন, এবং নূতন জীবন লাভ করিয়া পশ্চাৎ ঈশ্বরকে লাভ করেন। তখন যখনি অভিলাষ করেন, তখনি ঈশ্বরকে দেখিতে পান। 'আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি।' সকল কালের সাধকেরই এটী জীবনের পরীক্ষিত কথা। প্রসিদ্ধ দর্শনবিৎ কুজিনও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর প্রমুগ্ধ করিবার জন্য একবার দেখা দিয়া কতক দিনের জন্য অন্তর্হিত হন। বস্তুতঃ কিছুকাল বিচ্ছেদ ভিন্ন প্রেম কখনই পরিবর্দ্ধিত হয় না।

প্র—এই অবস্থাতে যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, তাহার কি হয়?

উ—ঈশ্বর যাহাকে একবার ধরিয়াছেন, তাহাকে কখন ছাড়িতে পারেন না। ঈশ্বরের নিকটে আমরা সকলে বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায়। যে মাছটা যত বলবান্ হয়, তাহাকে তত খেলিতে দিবার জন্য যেমন সূতা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, পশ্চাৎ নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলে কূলে আনিয়া তোলা যায়, তেমনি ঈশ্বর যাহার প্রকৃতি যত দুর্দ্দান্ত, তাহাকে তত খেলিতে দেন, পরে যখন সে অনন্যগতি হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

প্র—পরলোক-সাধন কি প্রকারে করা যায়?

উ—পূর্ব্বেই পরলোক বিষয়ে যাহা আলোচিত হইয়াছিল, পরলোকে-সাধন তাহা হইতেই লাভ করা যায়। আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান পরলোক-বিশ্বাসের মূল। জ্ঞান দ্বারা আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ় হয়। আমাদিগের পরস্পরের আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, কিরূপ যোগ, ইহা দেখিয়া পরলোকের সঙ্গে যোগ বুঝা যায়। জীবিত বা মৃত হউক, একই ভাবের ভাবুক ব্যক্তিদিগের আত্মার কেমন আশ্চর্য্য গূঢ় সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়। চৈতন্যের ভাবে ভাবুক হওয়া, ক্রাইষ্টের ভাবে ভাবুক হওয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ। একটী বটের বীজের মধ্যে যেমন একটী বটবৃক্ষ প্রচ্ছন্ন থাকে, কালে সমুদায় বটবৃক্ষ প্রকাশ পায়, তেমনি আত্মার প্রচ্ছন্ন ভাব ও শক্তি সকল যতই বিকাশ লাভ করে, ততই উহা ইহলোক পরলোককে আয়ত্ত করিতে থাকে। প্রাতদিন ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের সঙ্গে যোগ সাধনের যত্ন করা আবশ্যক। হিন্দুদিগের প্রতিদিন নিত্য শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মগণও যদি প্রার্থনার সময়ে পরলোকস্থ আত্মা সকলের সহিত নিত্য সম্বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে পরলোকের সঙ্গে যোগ দিন দিন পরিস্ফুট হয়। কুসংস্কারাবিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়গণ কোন মনুষ্য বা অপর সৃষ্ট বস্তুকে মধ্যস্থ করিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন করিতে যায়। আমাদিগের মধ্যস্থ ঈশ্বর, তাঁহারই মধ্য দিয়া আমরা দূরস্থ বস্তুকে নিকটে দর্শন করি।

(ক্রমশঃ)

—•—

দয়া-ব্রত-গ্রহণ।

(বুদ্ধদেবের জন্মদিনে আর্য্যনারী-সমাজের অধিবেশনে পঠিত)

আমাদের আর্য্যনারী-সমাজের দ্বারা কতদূর উন্নতি লাভ হইতেছে, তাহা অনেকের কাছে শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বের আর্য্যনারীগণের সঙ্গে এখনকার আর্য্যনারীদের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল তফাৎ। তুলনাই করা যায় না। তাঁহাদের পদধূলির সমানও নহি আমরা, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আর আমাদের ভাল হইবার কোনও আশা ভরসা নাই? বা তাহার জন্য কোনও চেষ্টা করিবার উপায় নাই? এখন আমাদের কিসে ভাল হইতে পারা যায়, তার জন্য প্রাণপণ যত্ন করা উচিত। পরস্পর পরস্পরের দোষ ত্রুটী দেখাইয়া দিয়া তাহা সংশোধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা আত্ম অহংকারে এমন অন্ধপ্রায় হয়ে আছি, যে নিজেকে খুব ভাল মনে করি, নিজের পাপ, দোষ, ত্রুটী, অপরাধ কিছুই যেন চোখে দেখিতে পাই না। আমরা নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে সারাদিন এত ব্যস্ত যে, অপরের জন্য ভাবিবার একটু সময় পাই না, অন্যের দুঃখের কথা মনে করিবার বা দুঃখ দূর করিবার একটু চেষ্টা করিতেও সময় হইয়া উঠে না। আত্মসুখ অন্বেষণে মন এত ব্যস্ত হইয়া আছে যে, পরদুঃখ-নিবারণে একটু ইচ্ছা বা আগ্রহ হয় না। দুঃখীর ক্রন্দন শুনিতে কর্ণ বধির, প্রাণ পাষাণ সমান কঠিন হইয়া যাইতেছে। হৃদয় এত নিস্তেজ নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে যে, কোনও দুঃখিনী ভিখারিণী ভগিনীর ক্রন্দন-ধ্বনিতে কর্ণপাত করিবারও যেন একটু অবসর নাই। কিছুতেই কাহারও যেন সাড়া পাওয়া যায় না। পরের ভাল করিতে, উপকার করিতে, কল্যাণ সাধন করিতে মন আর কিছুতেই ব্যস্ত হইয়া উঠে না। অপরের দুঃখ দেখিলে, কষ্ট শুনিলে প্রাণ তেমন করে কেঁদে উঠে না ত। মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ দয়া ধর্ম্ম যেন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। তাই নিজ অন্নের অংশ হইতে একমুষ্টি অন্ন, কি পানীয় জলের কলস হইতে একঘটি জল, কি খরচের পয়সা হইতে দু'একটি পয়সা গরিবের জন্য দান করিতে মন চায় না। কিসে অপরের ভাল হইবে, প্রকৃত মঙ্গল হইবে, এ চিন্তায় কই আমাদের সুদীর্ঘ-জীবনের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কয় মুহূর্ত্ত ব্যয় করিয়া থাকি?

আজ সেই দয়ার সাগর প্রেমের অবতার বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব দিন। আজ এসো প্রাণের ভগিনী, আমরা সবাই মিলে দয়াব্রত গ্রহণ করি। আজ হইতে সবাই মিলে এই পবিত্র দয়াব্রত সাধন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, এবং প্রাণপণ যত্নে যেন সেই ব্রতপালন করিয়া শুদ্ধ, সুখী ও ধন্য হইতে পারি। আমাদের প্রতিদিনের অন্ন হইতে প্রতিদিন একমুষ্টি করিয়া চাল রাখিয়া দেওয়া হইবে, আর প্রতিদিনের বাজার খরচের পয়সা হইতে অন্ততঃ দুই চারিটী পয়সা আলাদা করিয়া রাখা হইবে। প্রতি মাসান্তে সেই চালের দাম ও সেই পয়সা একত্র করিয়া দাতব্যে দান করা হইবে। ইহাতে কোনও শুভানুষ্ঠানে আলাদা করিয়া চাঁদাদান করিতে বা পয়সা খরচ করিতে কাহারও কোনও কষ্ট বোধ হইবে না, বরং প্রাণে একটা অনির্ব্বচনীয় দিব্য শান্তি ও পরমানন্দ লাভ হইবে। ইহাতে প্রতিদিন গরিব ভাই বোনদের কথা মনে পড়িবে। প্রতিদিন শোকার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত দুঃখী জনের নয়নের অশ্রুবারি স্নেহের অঞ্চলে মুছাইয়া দিবার জন্য প্রাণে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিবে। ইহাতে যেন আমাদের স্বার্থপর হৃদয়ে পরদুঃখ-কাতরতা বর্দ্ধিত হয়, পরদুঃখমোচনে ও পরের মঙ্গল-সাধনে প্রবল ইচ্ছা ও উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তাহা হইলে আমাদের মানব-জীবন ধন্য হইবে, আমরা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব।

দয়াময় ভগবান্ আজ এই পবিত্র শুভদিনে আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন ভাল করে, যেন আমরা আর এই অসার অনিত্য ক্ষণস্থায়ী সুখের মায়ায় পড়ে, জীবনের উচ্চ দায়িত্ব, প্রধান কর্ত্তব্য আর ভুলিয়া দিন না কাটাই। তিনি দয়া করে আমাদের তাঁর অভয়চরণতলে স্থানদান করিয়া, কত সুখ শান্তি আনন্দ, কত করুণা, কত আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে দান করিতেছেন। আমরা যেন তাঁর চরণে চিরকৃতজ্ঞতাভরে প্রণত থেকে, সকল ভাই বোনদের সেই করুণার অংশ দান করিয়া, প্রাণভরে সকলকে স্নেহদানে সুখী করিতে পারি এবং নিজেরা সুখী ও ধন্য হইতে পারি, এই তাঁর চরণে একান্ত বিনীত ভিক্ষা।

সরলা দাস।

বালেশ্বর নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দ্বিষষ্টিতম বার্ষিক উৎসব-বিবরণ।

২৪শে আষাঢ়, বুধবার, সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন-সূচক উপাসনা ব্রহ্মমন্দিরে সম্পন্ন হয়। আমাদের নানা ত্রুটী সত্ত্বেও, লীলাময়ী পরম জননী অযাচিত কৃপাগুণে, ইহপরকালবাসী তাঁহার সাধু ভক্তগণ সহ প্রকাশিত হইয়া, তাঁহার মধুময় প্রকাশে, মহিমাময় আবির্ভাবে, গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে বাহিরের সকল ক্ষতি পূরণ করেন। "জাগ জগতবাসী ঘুমাইবে কত আর, দেখ নববিধানের প্রেমলীলা চমৎকার।" এই গান প্রথমে গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। মা দেখতে দিলেন, তিনিই স্বয়ং উৎসবের মূল, এবং সকলকে লইয়া কেমনে উৎসবানন্দে মত্ত হইতে হয়, তাহার সঙ্কেত প্রদর্শন করিয়া, নিরুৎসাহ প্রাণে আশা, বিশ্বাস, উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার করিলেন।

২৫শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যার পর নববিধানের জীবন্ত বিশ্বাসী স্বর্গগত সাধু-আত্মা কালিন্দি কমিলার জীবন-স্মরণে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কমিলার গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। এখানে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কমিলার গৃহে প্রতি বৃহস্পতিবারই সন্ধ্যার পর নিয়মিতরূপে উপাসনা কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। এখানে এই পল্লীর ও সিদ্ধিয়া গ্রামের অনেকটী ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি উপাসনা কীর্ত্তন সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। স্বর্গগত কালিন্দি কমিলার পরিবর্ত্তিত জীবন এ প্রদেশের বড় আশার জীবন। ইনি বালেশ্বরের নববিধান-বিশ্বাসী প্রাচীন সাধক শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাস মহাশয়ের বিশেষ অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। ভগবানবাবু ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ বয়সে, জরাজীর্ণদেহে, ধর্ম্মবন্ধুর পুণ্যস্মৃতি বক্ষে লইয়া, উৎসাহভরে এ দিন এখানে উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এবং তিনিই উড়িয়া ভাষায় সুমিষ্ট উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ "সুখমণি" শিখগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করেন ও স্বর্গগত অমিয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ও বিশেষ প্রতিভা-সম্পন্ন কর্ম্মী ও সেবানুরাগী কালিন্দি কমিলার জীবন স্মরণ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভগবানবাবুও তাঁহার আত্ম-নিবেদনে স্বর্গগত বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধুর জীবন উল্লেখ করিয়া, তাঁহার বংশধরগণের এবং অন্যান্য সকলের জন্য জননীর চরণে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। পরে কীর্ত্তন হয়।

২৬শে আষাঢ়, শুক্রবার, পূর্ব্বাহ্ণে, ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের উৎসবের জন্য নির্দ্ধারণ ছিল। এবেলা মহিলাগণ মধ্যে অনেকে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারাই এ বেলার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কেহ কেহ বাধা বিঘ্ন বশতঃ এ বেলা মন্দিরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাই সন্ধ্যায়ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহিলাদিগকে লইয়া উপাসনা করেন। "বিদুরের ক্ষুদ" আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠান্তে আত্ম-নিবেদন করেন। তিনি আত্ম-নিবেদনে বলেন, বঙ্গের পল্লীজীবনের পরিবারে পরিবারে মেয়েদের সংসারের বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় বলিয়া, নিত্য রীতিমত শিক্ষায়, পূজা উপাসনা ও পাঠ প্রসঙ্গে তাঁহারা সময় দিতে পারেন না। তাই তাঁরা সত্যই অবলা। নবযুগে ঈশ্বর যেন তাঁহাদের দুর্দ্দশা বিশেষ ভাবে দূর করিবার জন্যই মাতৃভাবে গৃহে গৃহে প্রকাশিত। অনন্ত মাতৃরূপের স্পর্শ দিয়া, স্বর্গীয় উপাদানে তাঁহার কন্যাগণকে আপনার দিব্য ছাঁচে প্রেম পুণ্যে গঠিত করিয়া, এই সংসারেই তাঁহাদিগের মধ্যে মাতৃ-ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ দান করিবেন, এই তাঁহার সংকল্প। অনন্ত মা এত কাছে, সুতরাং এখন অবসর নাই একথা বলিলে চলিবে না। তিনি তো ক্ষুদ্ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত, অল্পেতে তিনি সন্তুষ্ট। যে যত টুকু সময় পাইবেন, নিত্য তাঁর উপাসনা ধ্যান ধারণা করিবেন। তাঁহার পূজা বন্দনাই সকল প্রকার সুখ সৌভাগ্যের কারণ, সংসারে শান্তি, আরাম ও আরোগ্যের হেতু। তিনি কন্যাগণকে একদিকে সতীত্বের তেজে, অপর দিকে স্নেহ করুণা দয়া প্রেম প্রভৃতি কোমলগুণে পূর্ণ করিয়া, দিব্য গৃহিণী-মূর্ত্তি, দিব্য মাতৃমূর্ত্তি প্রদান করিবেন। ভারতের অতীতের স্মৃতিও আমাদের কত আশার স্মৃতি। অতীত ভারতের নারী-জীবনে সতীত্ব-তেজ, ব্রহ্মজ্ঞান, তপস্যা, সেবা ও ধর্ম্মের যে সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, সে জন্য আমরা গৌরবান্বিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের নারী-জীবনেও কত শ্রেষ্ঠ তপস্যার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের নারী-জীবনেও কত তপস্যা, ত্যাগ ও সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এখন স্বদেশের, বিদেশের, অতীতের ও বর্ত্তমানের সকল শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমাদের অবলম্বনীয়। সর্ব্বোপরি পরম জননীর পূজা, বন্দনা এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের সম্বল।

বালেশ্বর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে চুনপাড়া মঠে এদিন সন্ধ্যার পর উপাসনা, কীর্ত্তন ও আলোচনাদি হয়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা এখানে উপাসনা করেন ও কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন।

২৭শে আষাঢ়, শনিবার, পূর্ব্বাহ্ণে, "দাস-ভবনে" অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাসের গৃহে উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হয়, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ভগবান্ বাবু সবান্ধবে ও তাঁহার পুত্র, পুত্র-বধূগণ ভক্তি নিষ্ঠার সহিত যোগদান করেন। পুত্র শ্রীমান্ হেমচন্দ্র দাস সঙ্গীত ও কীর্ত্তনের নেতৃত্ব করেন। এ বেলার উপাসনায় প্রকাশ হয় যে, বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানদিগের গৃহ পরিবার লীলাময়ী পরম জননীর বিশেষ লীলাক্ষেত্র ও প্রকাশের স্থান। গৃহ পরিবার ছাড়িয়া ধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ অথবা নির্জ্জন বনভূমি বা গিরিগুহা চিরদিনের জন্য আশ্রয় তাঁহার ব্যবস্থা নয়। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার, পরিজনপূর্ণ গৃহই এবার তাঁহার নিত্য পূজা বন্দনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে লীলাময়ী জননী গৃহ-দেবতারূপে, গৃহলক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণ থাকিয়া, তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে এখানে ধর্ম্মের সাজে সজ্জিত করিবেন, গৃহ পরিবারকে জীবন্ত ধর্ম্মক্ষেত্র করিবেন, এই তাঁহার নবযুগে বিশেষ সাধ। গৃহ পরিবারকে উৎসবময়, মধুময় করিতে তাঁহার বিশেষ অভিপ্রায়। ৬০ বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল এই গৃহে তাঁহার পূজা বন্দনা চলিতেছে। এই দীর্ঘ দিনের পূজা বন্দনার সুফল এখানে নানা আকারে ফলিয়াছে। জননী তাঁহার এই চিহ্নিত গৃহের প্রাচীন বিশ্বাসী সাধক পুত্রের জীবনে এবং তাঁহার বৃহৎ পরিবারে নববিধানকে জয়যুক্ত করুন।

২৮শে আষাঢ়, রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে দিনব্যাপী উৎসব হয়। এ বেলা "রাজ্য-প্রতিষ্ঠা" বিষয়ে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হয়। ঈশ্বরের রাজ্য প্রথমে নরনারীর ব্যক্তিগত জীবনে, তৎপর পারিবারিক জীবনে, তৎপর সামাজিক জীবনে এবং ক্রমে সমস্ত মানব-মণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রূপে ধরাতলে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা বিবৃত হয়।

উপাসনার পর প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্নে বৃষ্টির জন্য মন্দিরে লোক-সমাগমের সুবিধা হয় নাই। সন্ধ্যার পর একটী কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। এ বেলা আত্মনিবেদনে, বাহিরে বাহ্য ত্যাগে নয়, কিন্তু অন্তরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, নিষ্কাম হইয়া, সম্পদে, বিপদে, জীবনে, মরণে, সকল প্রকার পরীক্ষায় স্থির থাকিয়া, সত্যকে, ধর্ম্মকে কিরূপে জয়ী করিতে হয়, বিভিন্ন সাধু ভক্তগণের জীবন উল্লেখ করিয়া তাহা বিবৃত করা হয়। দুই বেলাই উপাসনার পর জমাট কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা সঙ্গীতে ও কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। দুই বেলাই ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

২৯শে আষাঢ়, সোমবার, পূর্ব্বাহ্নে, ব্রহ্মমন্দিরে প্রথম উপাসনা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা হয়। এই উপাসনা-প্রতিষ্ঠা হইতে দীর্ঘ ৮২ বৎসরে এখানে উপাসনার কত সুফল ফলিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া, বিশেষ ভাবে স্বর্গগত সাধু-আত্মা কালিন্দ কমিলার পরিবর্ত্তিত নবজীবনের কথা উল্লেখ করিয়া, এখানকার পল্লিতে পল্লিতে এই উপাসনার প্রভাবে ও স্বর্গগত কালিন্দি কমিলার জীবনের প্রভাবে, কিরূপ সামাজিক উপাসনা ও কীর্ত্তন স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার সুফল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে, ইহা বিবৃত করিয়া ও স্মরণ করিয়া লীলাময় শ্রীহরির চরণে বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা হয়।

সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনান্তে শান্তিবাচনের উপাসনা হয়। উপাসনান্তে উপাসক-মণ্ডলীর বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। এ দিনের উপাসনার কার্য্য ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন।

ভাদ্রোৎসবে উপাসনা।

[১৯২৬ কি ১৯২৭ সনের ভাদ্রোৎসবের দিনব্যাপী উৎসবদিনে, শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের (নালুদার) আরাধনাদি মেয়েরা কয়জনে লিখিয়াছিলেন; সকলের লেখা মিলাইয়া কক্সৌর শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশের জন্য তাহা পাঠিয়েছেন। মাঝে মাঝে শব্দ পড়ে যাওয়াতে ভাব ও ভাষা অপূর্ণ হইলেও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ সুন্দর উপাসনাটি ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইল]

উদ্বোধন।

আমরা এসেছি যার কাছে, যার কাছে সবার এই আহ্বান… যার কাছে গেলে দেখতে পাওয়া যায় কত তীর্থস্থান—এই সব তীর্থে যায়……সংসারে বিরক্ত……আবার এমন সময় আসে যখন সব আর ভাল লাগে না……সবাই কাশী বৃন্দাবন গেলেন—কাশী যেতে কতদিন; ঠাকুরমারা গিয়াছিলেন, কি সাহসে তীর্থে যেতেন……সংসারে শান্তি হোলনা বলে' গেলেন, আবার ফিরে এসে সংসারে ঢুকতে আর ইচ্ছে করে না।……সে দলের সঙ্গে কত অপবিত্র লোক পবিত্র হয়।……কিন্তু প্রকৃত অধিকারী কে? যাদের কপটতা নেই, যাদের বিশেষ গুণ আছে, সেই ভক্তিমান্ বৈরাগী তীর্থের অধিকারী……যারা আনন্দমনে সংসার-ধর্ম্ম পালন করে, সংসার তপোবনে দিন কাটান…… সেই খানেই কত সুখশান্তি পায়।…উপাসনা আমাদের তীর্থ—বিশ্ব পবিত্র তীর্থ হোল……অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল হলে, জগতে কত তীর্থ আছে সব বুঝতে পারি—জগৎ মন্দির হয় হৃদয় শুদ্ধ হলে…… মক্কা কাশীও তীর্থস্থান……জলের মধ্যে কত কোটি কোটি সাধু লোক স্নান করে' কত পবিত্র হয়েছেন—সেটী আমাদের কত তীর্থের জিনিষ।……উপাসনা করি, প্রত্যেকবারেই তীর্থে যাই; দশজনে বিশজনে উপাসনা করি, মন্দিরে এসে উপাসনা করি—ভাদ্রোৎসব, মাঘোৎসব নববিধানে নতুন তীর্থের স্থান হোল। উপাসনা সৌভাগ্য লাভ করি। এত ঘরে বসে হয়। বছরের পর বছর কত ভাদ্রোৎসব হয়……ব্রহ্মমন্দির মহাতীর্থ প্রতিষ্ঠার পর কত ভাদ্রোৎসব, কত ভাই ভগ্নীকে দিয়েছেন; সবাইকে এখানে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, গানে যে গাই, "ইহলোক পরলোক কভু নয় পৃথক" ইহলোক পরলোক মিলে এক হব, সবার সঙ্গে মিলে এক হ'য়ে……সবাই আমাদের প্রাণের মধ্যে স্থান পেয়েছেন—এই উৎসব মহা উৎসব, কত বড় তীর্থ। যদি আনন্দময়ী নিয়ে এলেন, তবে কৃপা করে' তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, উপাসনা বিধান করুন। তাঁহারই কৃপায় তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হই।

আরাধনা।

সত্য।

আপনার নাম আপনি উচ্চারণ করছ। আমি আছি, আমি আছি, এই কথাই বলতে লাগলে—আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় আমি আছি, আমি আছি বলছ—তোমার ঐ মন্ত্র শুনতে লাগলাম। আপনার নাম আপনি শোনাচ্ছ। যত শুনি, তাই উৎসব, তাই তীর্থ, অন্য তীর্থের প্রয়োজন দেখতে পাই নে। তুমি আছ বললে তোমার ছেলে মেয়ে কেউ কি আর সংসারে বদ্ধ থাকতে পারে? রোগ শোক, যত বকাবকি, সংসারের যত অশান্তি, তোমার নাম যখন শুনতে পায়, সব ভুলে যায়।…… যতক্ষণ অভিযোগ করছিলাম, ততক্ষণ তুমি ছিলে, তুমি কখন আমাদের ছেড়ে যাওনি—এত সত্য তুমি, তোমাকে ভাল করে দেখিনে কেন? ভিতরে বাহিরে পূর্ণ করে তুমি রয়েছ। তুমিই তো ধর্ম্ম দিলে, বিধান দিলে, উপাসনা শেখালে। সবের ভেতরে তুমি নিজেই পরমতীর্থ, মহাতীর্থ দেখালে—এই আরাধনার ভেতর পরমতীর্থ, এক এক স্বরূপের ভেতর কত তীর্থ, এমন তীর্থ আর কোথায় আছে? এই তীর্থে রোজ রোজ এনে নাইয়ে, তোমার পূজা করতে দাও। যে সব কথা বাহিরে থেকে বলেছিলাম, সে সব না বললেই ভাল ছিল। তোমার

অপরূপ রূপ সকলে মিলে দেখি; এখন তোমারি কথায়, তোমারি সেবায় ভুলে থাকি। তীর্থ তো তাই, যেখানে সকলে মিলে......হাজার হাজার লোক যায়—সেই হরিদ্বার, সেই কাশী, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক যায়; নইলে তীর্থ কি করে হবে? কত আশা করে' যায়··· আমরা চাইতে না চাইতে আশা পূর্ণ কর, কত অপরাধ, তবু এত ঢেলে দাও—কত বাধা অতিক্রম করে' সেই কাশীতে যাওয়া সে এক সময় ছিল। এখন যাই সন্তানেরা মা বলে, তখন আপনাকে আপনি ঢেলে দাও; তোমার সন্তানেরা তোমার কোলে চড়ল, আর তুমি তাদের কত ঢেলে দাও; তবে আর অন্য তীর্থে কেন যাবে? "আমি আছি" নূতন বিধানে এই তীর্থের সব চেয়ে উচ্চ-স্থান—এই তীর্থকে সকলের আদরের করে দিলে, এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকবে। তুমি যদি কৃপা করে আমাদের সকলকে এই তীর্থে নিয়ে এলে, তখন এখান থেকে আর যাব কেন? এর বাইরে গেলে কেউ কিছু নয়। এখানে আপন পর হয়, পর আপন হয়, শত্রু মিত্র হয়ে যায়—এই থানেই তুমি আমাদের থাকতে বলছ। ভাল করে এখানে ঘর বাড়ী করি, সেই জন্য জমি জমা কিনে চিরদিনের জন্য যাতে থাকা হয়, তার বন্দোবস্ত করছ।······

৫

স্নান।

মনের মন রূপে তোমার সন্তানেরা যখন তোমাকে দেখবে, তখন মন কত পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনের ভেতর তুমি বার বার এসে মনের ভেতর থাকতে চাও—মনটী যাতে নির্ম্মল হয়, তাই মনের মন হ'য়ে মন তীর্থ করবার জন্যে রাতদিন ছটফট কর। আমাদের মনগুল ময়লায় ভরিয়ে, অজ্ঞানে পূর্ণ করে' রেখেছি, তুমি নির্ম্মল করে রাখ। সেই মনের ভেতর তোমার সরল সন্তানেরা তোমার কোলে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গ সহবাস দাও। তাঁদের সহবাস পেয়ে আমরা তোমার এখান থেকে যেতে চাইনে—এখানে নিয়ে এলে, এখানেও সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে—এখানে এল যখন, মুহূর্ত্তের ভেতরে সব আপনার হয়ে গেল—এখানে পর আপন—শত্রু মিত্র কি করে' হোল? নোতুন মন হোল তাই, এই মন না হলে কাউকে চেনা যায় না। আর যে সব তীর্থ-স্থান আছে, তোমার নূতন বিধানের নূতন মন নিয়ে যখন আসি, তখন সব নূতন হয়ে যায়। তীর্থের মান কে রাখে? নববিধানে নোতুন মন যার। কার না ইচ্ছে হয়, সেই সব পুরাণো বিধানে নোতুন মন নিয়ে যায়? আমরা যখন সারনাথ, মক্কা, জেরুসিলামে নূতন মন নিয়ে যাই, তুমি সেই সব পুরোণো তীর্থ কত নূতন করে দাও, কত পবিত্র করে দাও। কিছুই নষ্ট হোলনা নূতন বিধানের কাছে। গঙ্গার জল এত পবিত্র······তুমি তোমার নূতন বিধানে কলের জল এত পবিত্র করে দিলে, ঈশা তার ভেতরে এলেন—যেই স্নান করল, অমনি সব নূতন হয়ে গেল। এই নূতন মন নিয়ে পূজো আরম্ভ হবে,—এখানে তোমার সন্তানেরা বিরক্ত হয়ে আসেন, আনন্দ মন নিয়ে এসেছে। এই যুগেতে এই তীর্থেতে নিয়ে এলে, এখানে তোমার পূজা অর্চনা হবে। ভাদ্রোৎসব কি? এর মত মহাতীর্থ আর কোথায়?

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

জন্মদিন—কলুটোলায় ১লা আগষ্ট, শনিবার, পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের জন্মদিনে ও ৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর গগনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

ফতেহা দোয়াজ দহম—শ্রীমহম্মদের জন্ম ও স্বর্গগমন দিনে, গত ২৮শে জুলাই, বিশেষ উপাসনা শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে সাধিত হয়।

পারিবারিক উপাসনা—গত ৭ই আগষ্ট, এন্টনিবাগানে বাবু শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গৃহে ও ৮ই আগষ্ট, নারিকেল বাগান লেনে বাবু যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পারিবারিক উপাসনার কার্য্য করেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম—গত ১লা আগষ্ট, এই আশ্রমের উন-ত্রিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে দুই বেলা উপাসনা, পাঠ, প্রসঙ্গ, সঙ্গীত ও প্রীতিভোজনের সুব্যবস্থা মা আনন্দময়ী কৃপা গুণে করেন। স্থানীয় বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীগণ ব্যতীত, হাওড়া হইতে একটি পুরাতন বন্ধু ও আশ্রমের প্রথম অভিভাবক ভ্রাতা অক্ষয়কুমার দত্ত যোগদান করেন। উৎসব-সম্পাদনার্থ নিম্নলিখিত সহৃদয় দাতৃগণ অর্থ-সাহায্য দান করিয়া [illegible] —মিসেস পি, সি, সেন ১০৲, শ্রীমতী [illegible] অমৃতচন্দ্রের সাম্বৎসরিক স্মরণে [illegible], [illegible] (শিবপুর) ২৲, শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাস [illegible] সাম্বৎসরিক স্মরণে ১৲, শ্রীযুক্ত [illegible] (হাওড়া) ১৲, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত (হাওড়া) [illegible], শ্রীমতী শান্তসুধা রায় ২৲, মিসেস নৃত্যগোপাল রায় ([illegible]) ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। মা ব্রহ্মানন্দজননীর অজস্র আশীর্ব্বাদ [illegible] দাতৃগণের মস্তকে বর্ষিত হউক। নববিধান-বিশ্বাসী [illegible] সকলেরই শুভ কামনা ও আশীর্ব্বাদ এই আশ্রমের [illegible]।

শোক-সংবাদ—আমরা সন্তপ্তহৃদয়ে দুইটী পরলোকগমন সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

সম্বলপুরের [illegible] কালেক্টর, আই, সি, এস, মিঃ এন্, সেনাপতির [illegible] মাতৃদেবী স্বধামে যাত্রা করিয়াছেন। গত ২৫শে জুলাই, [illegible], সম্বলপুরে পরলোকগত আত্মার আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া

গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। হাজারীবাগ হইতে ভ্রাতা ব্রজকুমার নিয়োগী ও কটক হইতে ভ্রাতা বিশ্বনাথ কর আগমন করিয়া আনুষ্ঠানিক উপাসনাদি করেন। এই উপলক্ষে অন্যান্য দানের মধ্যে পুরী নববিধান ব্রহ্মমন্দির ও সমন্বয়াশ্রম স্থাপনের সাহায্য-কল্পে ৫০০৲ দান ঘোষণা করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানের যথাযথ বিবরণ পাইলে পরে প্রকাশ করা হইবে।

গিরিধি-নিবাসী রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার গত ১৬ই জুলাই, পাটনায়, তত্রত্য কলেজের অধ্যাপক, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ সুবিমলচন্দ্র সরকারের গৃহে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর ধামে প্রবেশ করিয়াছেন। গত ২৮শে জুলাই, মঙ্গলবার, পাটনাস্থ জ্যেষ্ঠপুত্রের ভবনে তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন এবং পাটনাস্থ রামমোহন সেমিনারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী সময়োপযোগী ভাবের সঙ্গে সঙ্গীত করেন। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উভয় সমাজেরই ভাই ভগ্নীগণ এবং কয়েকজন ভক্তিমান্ হিন্দু বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। উপাসনান্তে স্বর্গগত সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ সরকার সময়োপযোগী প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও ভক্ত পিতার জীবনী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আশাবতী মজুমদারও পিতার সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বিধাতা পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁর অনন্ত শান্তি ক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং সন্তপ্ত সন্তান ও পরিজনবর্গকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

পরীক্ষায় সফলতা—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, এলাহাবাদ-প্রবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী, শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসুর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী রমা বসু বি, এ, পরীক্ষায়, দর্শনের অনার্স কোর্সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৬ই জুলাই, আষাঢ়ের সংক্রান্তি দিনে, ৭নং বকুলবাগান রোডে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বীরের গৃহে, তাঁহার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী কুমুদিনী দাস মাতৃদেবীর নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ জীবন ভিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী কুমুদিনী দাস মাতৃদেবীর পবিত্র স্মৃতিতে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন। অদ্য ভাই অক্ষয়েরও মাতৃদেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিন ছিল।

গত ১৭ই জুলাই, ৯৪।১সি, গড়পার রোডে, ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করা হয়।

গত ২০শে জুলাই, প্রাতে, কুচবিহারে স্বর্গীয়া মহারাজকুমারী প্রতিভা সুন্দরীর স্বর্গারোহণ দিনে, "কেশব আশ্রমস্থিত" তাঁহার পবিত্র সমাধি পার্শ্বে, স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে দরিদ্র বিদায়ও হইয়াছিল।

গত ২৪শে জুলাই, ১২নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, অনাথ আশ্রমে, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৮ই শ্রাবণ, শুক্রবার, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, শ্রীমতী মাধব বসুর আলয়ে, তদীয় মধ্যমা বধূমাতা স্বর্গীয়া সাধ্বী সর্ব্বমঙ্গলার পরলোকগমন দিন স্মরণ করিয়া বিশেষ উপাসনা হয়। সেবিকা হেমলতা উপাসনা করেন। শ্রীমতী শ্বশ্রূমাতা ব্যাকুল হৃদয়ের আবেগে প্রার্থনা করেন।

গত ২৯শে জুলাই, কুচবিহারে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় করুণাকুমারের স্বর্গারোহণ দিনে, তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনাদি হইয়াছিল।

গত ২৯শে জুলাই, সন্ধ্যার পর, ১০নং নারিকেল বাগান লেনে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে, তাঁহার শ্বশুর স্বর্গগত শরচ্চন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৩০শে জুলাই, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সেনের স্বর্গদিন স্মরণে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। গত ৩১শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের প্রচারক ভাই ফকির দাসের স্বর্গদিন স্মরণে বাঁটরায় স্বর্গীয় ডাঃ শরৎকুমার দাসের গৃহে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন। অমরাগড়ীতে ও ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

—০—

ফকিরদাস ইন্‌ষ্টিটিউসন।

(সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী ও নববিধান-বিশ্বাসাদিগের অবগতির জন্য)

আমার দীর্ঘকাল স্বদেশ-সেবার পুরস্কার স্বরূপ, নিরাকারবাদী সাধকদিগের নির্জ্জন সাধনার জন্য জয়পুর ফকিরদাস ইন্‌ষ্টিটিউসন নামক ইংরাজী স্কুলের কম্পাউণ্ড মধ্যে ইং ১৯১৮ সনের ডিসেম্বর মাসে যে একটি পাকা সাধন-কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে উক্ত স্কুলের বোর্ড-অফ-ট্রাষ্টীর নিকট এ সেবকের প্রার্থনা-পত্রের সারাংশ এই:—"স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সেবকস্বরূপে আমি বহুকাল জয়পুর স্কুলের সেবায় নিযুক্ত আছি, কিন্তু (এই স্কুল) সংস্থাপক শ্রীমৎ ফকির দাস রায় মহাশয়ের আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসরণ জন্য ও আমার সাধন হেতু, স্কুলের হোষ্টেল গ্রাউণ্ডের একপার্শ্বে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী সাধন-কুটীর ভিক্ষালব্ধ অর্থে নির্ম্মাণ করিয়াছি। ঐ কুটীরটী নিরাকারবাদী সাধকদের সাধনার জন্য আমি বোর্ড-অফ-ট্রাষ্টীদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। আমি বোর্ড-অফ-ট্রাষ্টীদের অনুরোধ করিতেছি যে, উক্ত কুটীরটী যাহাতে চিরদিন নিরাকারবাদী সাধকদের সাধনার জন্য ব্যবহৃত হয় ও তাহার ব্যবস্থা করেন, এই আমার প্রার্থনা।"

অমরাগড়ী,
নববিধান ব্রাহ্মসমাজ;
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯১৮।

বিনীত সেবক—অখিলচন্দ্র রায়
ফাউণ্ডেশন ট্রাষ্টী,
জয়পুর ফকিরদাস ইন্‌ষ্টিটিউসন।

বোর্ড-অফ ট্রাষ্টীর নির্দ্ধারণের সারাংশ:—

"উক্ত সাধনকুটীরের তলস্থ জমি স্কুলেরই সম্পত্তি, উহা অখিল বাবুর প্রার্থনা মতে ব্যবস্থা হইবে।"

D. N. Mullick প্রেসিডেন্ট

দ্বি-ষষ্টিতম ভাদ্রোৎসব

—আহ্বান—

নববিধানের দেবতা, আনন্দময়ী মাতা, ডাকিছেন সবে
স্নেহ আদরে।
তোরা আয়রে আয় ভাই, মায়ের কাছে যাই, গিয়ে
প্রাণ জুড়াই;
গাই আনন্দে মা নাম সমস্বরে।

উৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে এই কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩১, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৮, শনিবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে (৭৮বি, আপার সার্কুলার রোড) উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভা।

১৬ই আগষ্ট, ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার—প্রাতে ৮॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১৭ই আগষ্ট ৩২শে শ্রাবণ, সোমবার—শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ।

১৮ই আগষ্ট ১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা।

১৯শে আগষ্ট, ২রা ভাদ্র, বুধবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় শান্তিকুটীরে (৮৪নং আপার সার্কুলার রোড) "আমাদের সঙ্ঘের" উৎসব।

২০শে আগষ্ট, ৩রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদলের প্রার্থনা ও বক্তৃতা।

২১শে আগষ্ট, ৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধেয় ভাই বলদেব নারায়ণের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ।

২২শে আগষ্ট, ৫ই ভাদ্র, শনিবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে কেবলমাত্র মহিলাদিগের উপাসনা।

২৩শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, রবিবার—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। **ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব।** প্রাতে ৭টায় কীর্ত্তন, ৮টায় উপাসনা। মধ্যাহ্নে ২॥০টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ ও আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৬টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৪শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র, সোমবার—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা।

২৫শে আগষ্ট, ৮ই ভাদ্র, মঙ্গলবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানমণ্ডলীর সাধারণ সভা (Conference)।

২৬শে আগষ্ট ৯ই ভাদ্র, বুধবার—প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দী ভজন।

২৭শে আগষ্ট ১০ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টায় নবদেবালয়ে উপাসনা। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ।

সকলের সপরিবারে সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
২৮শে জুলাই, ১৯৩১।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

দ্রষ্টব্য:—উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে ভক্তির অঞ্জলিরূপে যিনি যাহা দিবেন, তাহা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় শ্রদ্ধেয় ভাই অমরকুমার দত্তের নামে অথবা ৮৯নং আপার সার্কুলার রোড এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদের নামে পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

৫ই, ৬ই, ৭ই ও ৯ই ভাদ্র, ব্রহ্মমন্দিরে দান সংগৃহীত হইবে।

বিজ্ঞাপন ও নিবেদন।

কমলকুটীর ও নবদেবালয় "শ্রীব্রহ্মানন্দধাম" তীর্থরূপে পরিণত করিয়া রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবান্ধবদের সহযোগে অর্থ-সাহায্য-সংগ্রহে চেষ্টা করি। অন্যূন এক একটী টাকা ভিক্ষা করিয়া লক্ষটাকা সংগ্রহ করা হইবে, এইরূপ সংকল্প করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ অতি অল্প কয়েকটী টাকা ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে না করিতে আমি শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ি এবং ইতিমধ্যে কমলকুটীর ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পিত হয়। সেহেতু অর্থ-সংগ্রহ স্থগিত করা হয়। একটি ছোট গৈরিকের ঝুলী করিয়া, যিনি যাহা অর্থদান করেন, তাঁর নাম ও সাহায্য লিখিয়া, ঝুলীতে রাখিয়া দিই। সেই সংগৃহীত অর্থের ঝুলী পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র ভাণ্ডাররূপে বদ্ধ ভাবে একটী ক্ষুদ্র বাক্সে রক্ষিত আছে। আমি এ পর্য্যন্ত তাহা খুলি নাই। কোন বন্ধুর অনুরোধে খুলিয়া দেখি, মাত্র ১৫৲টী টাকা সংগৃহীত হইয়া সেই ঝুলিতে আছে। বিশ্বাস করি, কমলকুটীর "শ্রীব্রহ্মানন্দধাম" রূপে রক্ষা জন্য একদিন না একদিন ব্যবস্থা হইবে। যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি তজ্জন্য অর্থ-সংগ্রহে প্রেরণা অনুভব করেন, তিনি আমার ভিক্ষার ঝুলিটী গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। কিম্বা যিনি যাহা দিয়াছেন তাহা যদি ফিরাইয়া লইতে চান, শ্রীদরবারের সম্পাদকের নিকট লিখিলেই পাইতে পারিবেন।

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক
শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম, বাগনান, হাওড়া।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ।
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
2nd September, 1931.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিপদ্‌ভঞ্জন, গতিদাতা, পরিত্রাতা, ত্রিভুবনের একমাত্র রক্ষক! দেশের এই দুর্দ্দিনে আমরা কার শরণাপন্ন হইব, কার মুখের দিকে তাকাইব? দেশের লোক যে নানা ভাবে বিপন্ন হইয়া হাহাকার করিতেছে। দেশের বহু স্থান জলে প্লাবিত। আশার শস্যক্ষেত্র-গুলি জলে নিমগ্ন। হাতে অর্থ নাই, ঘরে অন্ন নাই। অনেকেই পুত্রকন্যা সহ, গৃহপালিত গো মেষাদি ও গৃহের অবশ্য প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহারের সামগ্রীগুলি সহ কোথায় মাথা রাখিবে, তাহার ঠিকানা নাই। সমস্ত দেশ নানা বিপদ্ পরীক্ষার দুঃসহ পীড়নে নিপীড়িত। অভাবের যে সীমা নাই, দুঃখ দুর্গতির যে অবধি নাই। এ দুঃখ দুর্দ্দিনে আমরা, একমাত্র জগতের রক্ষক, প্রতিপালক, দুঃখদুর্গতিহারী, অনন্তশক্তি, অনন্ত প্রেমের আধার হে পরম দেবতা! তোমার দিকেই আশাপূর্ণ-হৃদয়ে তাকাইব, তোমারই শরণাপন্ন হইব; অন্যথা প্রাণে শান্তি সান্ত্বনা কোথায়? তোমার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হয়। তোমারই ব্যবস্থাতে অমাবস্যা, তোমারই ব্যবস্থাতে পূর্ণিমা। তুমি এ সময় আশার চন্দ্র হইয়া ভারতের আকাশে, বঙ্গের আকাশে, এ দেশের দুঃখ-দৈন্যনিপীড়িত অগণ্য অসংখ্য তোমার পুত্রকন্যাদিগের হৃদয়াকাশে উদিত হও তোমার বিপন্ন পুত্রকন্যা তোমাকে বিশ্বাস করিতে শিখুক, ডাকিতে শিখুক, তোমার শরণাপন্ন হইতে শিখুক। মা, ধর্ম্মের বলই বঙ্গ ভারতের পরম বল। তুমিই বঙ্গ ভারতের পরম সম্বল। তুমি প্রসন্ন হইলে শত্রু মিত্র সকলেই প্রসন্ন হয়, সকল প্রতিকূলতা অনুকূলতায় পরিণত হয়। "তুমি না হলে প্রসন্ন, একমুষ্টি অন্ন, এ সংসার মাঝে মিলে না।" তুমি মহাশক্তিরূপে, অসুরনাশিনী, দুর্গতিহারিণী, অভয়দায়িনীরূপে অবতীর্ণ হও। তোমার মহাশক্তিরূপ অসি চালনায় এ দেশের সকল পাপাসুর, সকল দুর্গতি বিনাশ কর। স্বদেশ বিদেশ সকল দেশের কল্যাণ কর। বিশেষ ভাবে অভয়দায়িনী জননীরূপে এ দেশকে সকল প্রকার ভয় হইতে উদ্ধার কর, ভয়ে ভীত তোমার অগণ্য অসংখ্য পুত্রকন্যাদিগের প্রাণে অভয় দান কর, স্বর্গের বলে বলীয়ান্ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাদ্রোৎসব।

বৎসরে দুইটী আমাদের বিশেষ উৎসব, মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব। ভাদ্রোৎসব বিশেষ ভাবে সাধনের উৎসব বলিয়া গণ্য। কোন্ উৎসব সাধনের উৎসব নয়? তবে ভাদ্রোৎসবকে বিশেষ সাধনার উৎসব বলিয়া এই জন্য গণ্য করা যাইতে পারে যে, এই দিনে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা, নবযুগধর্ম্ম নববিধানের ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই ভাদ্রোৎসব। ব্রহ্মমন্দিরে এই উপাসনা-প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহার ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি ও উচ্চ পরিণতির বিষয় আলোচনা করিলে, লীলাময় ঈশ্বরের এই মহাযুগলীলা স্মরণ করিয়া, তাঁহার কৃপার জীবন্ত জ্বলন্ত সাক্ষ্য লাভ করিয়া, কাহার মন আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল না হয়? অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সাধন-সম্পদের মূল উপাদানগুলি একত্র গ্রথিত হইয়া এই মহা উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। এ উপাসনা-প্রণালী জীবন্ত ঈশ্বরের কি মহা দান, মানব মণ্ডলীর পক্ষে কি মহা আশীর্ব্বাদ! কেহ তো বুদ্ধি করিয়া, বা উপাসনা-প্রণালীর ভবিষ্যৎ ফলের বিষয় কোনরূপ অবধারণ করিয়া, এ উপাসনা-প্রণালী রচনা করেন নাই। এই উপাসনা-প্রণালীটী কোন এক বিশেষ ব্যক্তিদ্বারাও রচিত নহে।

প্রাচীন ভারতের ঋষি আত্মাগণ কত হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যাদি তপস্যা-ভূমিতে গভীর তপস্যা ও সাধন-যোগে ঈশ্বরকে যে যে ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, যে যে ভাবে সম্ভোগ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপ বিভিন্ন ঋষি আত্মাদিগের অন্তরে যে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, ধ্যান, ধারণা ও গ্রহণের নিয়ম হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ও গাথায় তাহা ব্যক্ত করিয়া ভবিষ্যৎ বংশের জন্য, কত যুগ যুগান্তের আমাদের জন্য গ্রন্থবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই সকল ঋষি-প্রণীত গ্রন্থের নাম উপনিষদ্। সময় আসিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্তরাত্মার প্রেরণায় সেই সকল বিভিন্ন উপনিষদ্ গ্রন্থ হইতে মনোনীত ঈশ্বর-স্বরূপাত্মক শ্লোক বা বাক্যগুলি সংগ্রহ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মমণ্ডলীর ধর্ম্ম-সাধনার জন্য একটী গাথায় নিবদ্ধ করিলেন। তখন এই স্বরূপাত্মক গাথা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। ক্রমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই নবধর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবনায় মহর্ষি দেবের যোগে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" বাক্য পূর্ব্ব গাথা বা শ্লোকে সংযোজিত হইয়া ঈশ্বর-স্বরূপ-সাধনার একটী পূর্ণাঙ্গ শ্লোক প্রস্তুত হইল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উপাসনা-প্রণালীকে অন্তরাত্মার প্রেরণায় প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিলেন,—উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা। পরে ইহার সঙ্গে শ্লোকপাঠ, স্তোত্রপাঠ অঙ্গগুলিও মিলিত হইল। সঙ্গীত, কীর্ত্তন ক্রমে ইহার অঙ্গ-পুষ্টির বিশেষ আয়োজন রূপে গৃহীত হইল। সাধনের কি বিচিত্র এবং প্রকাণ্ড আয়োজন! সবই হইল পবিত্রাত্মার প্রেরণায়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই কি জানিতেন, এ মহা উপাসনা-প্রণালী-সাধনের ফল কি দাঁড়াইবে? নারদ ঋষি কোন্ অতীত কালে বীণাযন্ত্রে ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া হরিনাম গান করিয়া জীবের ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইতেন, কোন অতীতে যোগিবর শিব তানপুরা যন্ত্রে গান ধরিয়া হরিনাম সাধন করিতেন। প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত-যোগে সাধনা এতই সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ আয়োজনরূপে গৃহীত হইয়াছিল যে, তাঁহারা সাধন-ক্ষেত্রে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিলেন, "গানাৎ পরতরো নহি," অর্থাৎ সাধনক্ষেত্রে সকল উপায় মধ্যে সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ উপায়। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভক্তবীর শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন-যোগে ভক্তির তরঙ্গ উত্থিত করিয়া বঙ্গদেশে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন! ওদেশের মহাযোগী মহর্ষি ঈশাদেব প্রার্থনাকে পৃথিবীতে সাধন-ক্ষেত্রের কি মূল্যবান আয়োজনরূপেই রাখিয়া গিয়াছেন! আমাদের স্বরূপ-সাধনার আয়োজন-মূলক আরাধনা-মন্ত্রের সঙ্গে, এই সব স্বদেশের, বিদেশের সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি মিলিত হইয়া, নববিধান-ক্ষেত্রের উপাসনা কি বৃহদাকার, বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে! এই উপাসনা-প্রণালীতে এতগুলি সাধনার মৌলিক আয়োজন মিলিত হওয়াতেই, ইহা সমন্বয়-ধর্ম্মের মহা সাধনার প্রণালী হইয়াছে। এই উপাসনা-সাধন-যোগেই ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার দলের জীবনে মহা সমন্বয়ের ধর্ম্ম-সাধনা সম্ভব হইয়াছে। এই উপাসনার প্রণালীগুণেই ব্রহ্মানন্দের জীবনে কত বিচিত্র ব্রহ্মদর্শন, কত বিচিত্র ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ, কত ব্রহ্মলীলার ব্যাপার, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের মহা সাধনার ব্যাপার সম্ভব হইল। তাই ভক্তকবি

গাইলেন, "নববিধানে হলরে ভাই প্রকাণ্ড ব্যাপার! এ তো নহে মানুষের কারবার। খুলে দিয়েছেন ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত ধন-ভাণ্ডার।" সাধনার উৎসব ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বাপরে এই সকল বিষয় আলোচনা, ধ্যান, চিন্তন ও স্মরণ মনন যোগে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলারস-সুধা পান করা আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

শ্রীকেশব ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীকেশব প্রথমেই দৈববাণী শুনিলেন, "প্রার্থনা কর," প্রার্থনা করিলেন, সহজে নিরাকার ব্রহ্মদর্শন পাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তি পূজিতে পূজিতে অতৃপ্ত ব্যাকুলতায় নানা সাধ্য সাধনা দ্বারা পথ খুঁজিতে লাগিলেন। নিরাকার ঈশ্বরদ্রষ্টা শ্রীকেশবের নিকট আসিয়া, নিরাকার দর্শন কি, জিজ্ঞাসু হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গ করিতে করিতে শেষে স্বীকার করিলেন, "কেশব, তোমার কাছে এলে আমার চৌদ্দপো মা গলে যায়।"

শ্রীকেশব স্বাভাবিক পাপ-বোধে ব্যাকুল হইয়া ঘরকেই বন দেখিলেন, স্ত্রীর সঙ্গ সাময়িক ত্যাগ করিলেন, মনোগমনে বনগমন সাধন করিলেন; পরিণামে ব্রহ্মকৃপা-বলে সংসারেই পাইলেন তপোবন, স্ত্রীকে পাইলেন সহধর্ম্মিণী, সতীপতি একাত্মতা-সাধনে হইলেন "দুজনে একজন।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দেখিয়া হইলেন গৃহ-যোগী ভক্ত ও লভিলেন মুগ্ধ-বোধ, অর্থাৎ সজ্ঞানে মুগ্ধ ভাব। নিবৃত্তির পর প্রবৃত্তি-সম্ভোগে ব্রহ্মেতে যে আনন্দ, তাহাই লাভ করিয়া হইলেন মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন অবলম্বনে স্ত্রীকে মা বলিয়া চির ত্যাগ করিলেন, "টাকা মাটী, মাটী টাকা" সাধনে অর্থকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিলেন, তীব্র-বৈরাগ্য-লাভে যোগ ভক্তি সমাধানে সমাধিস্থ বা বেহুস মুগ্ধ হইলেন। পাইলেন নাম পরমহংস।

শ্রীকেশবের নিরাকার ব্রহ্ম ক্রমে স্বয়ং মাতৃরূপে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাকার মা শ্রীকেশবের সহযোগে নিরাকারা চিন্ময়ী হইয়া দেখা দিলেন।

শ্রীকেশব ও শ্রীরামকৃষ্ণ হাত ধরাধরি করিয়া নাচিলেন; আর গাইলেন, "মা আমাদের, আমরা মার।"

শ্রীকেশব-রাম একাত্মন,
জয় মা, মার নববিধান!

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

আচার্য্যের সাধ।

"হে পিতা, দুইটী জিনিষ ভাল হইলে, তবে জগতের ভাল হওয়া আশা করিতে পারি। যদি পরিবারটি ভাল হয়, আর দলটি ভাল হয়, তাহা হইলে আশা করিব, পৃথিবী নববিধানকে বলিবে ঠিক। মা, যে দুটি সাক্ষী পাব মনে করেছিলাম, তাহাদিগের কাহাকেও পেলাম না, ঘর আর দল। এত দিনেও তোমার নববিধানের ফুল ফুটিল না। মা, একটা দল প্রস্তুত কর, আর একটা ঘর প্রস্তুত কর। দেখিলে লোকে বলিবে, একটু ময়লা নাই, একটু পাপ নাই, একটু অধর্ম্ম নাই। একটি দলের কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী। প্রত্যেক প্রচারকের পরিবারের ঘর দেখ, একটু পাপ নাই। কেমন পবিত্র ছেলেমেয়েগুলি হাসিতেছে। হে দয়াময়, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের দলটি আর পরিবারটি যেন তোমার করিয়া লই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া তোমার এই পরিবার পবিত্র হইয়া সংহিতা পড়িতেছে; এই দেখিয়া আমরা শুদ্ধ ও সুখী হইব।" এই প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে না?

নববিধানের মিলন কেমনে হয়?

নববিধান মিলনের বিধান। কিন্তু আমার সঙ্গেই যে আমার মিলন হইল না, আমার সঙ্গিনীর সঙ্গেও আমার অমিল গেল না, আমার সহোদর বা সহযাত্রীদিগের সহিতও বিবাদ কই ঘুচিল? তবে কেমন করিয়া আমরা নববিধান প্রমাণ করিব? নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে। এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদায় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে। ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য। গুরু হউক না হউক, একজন মধ্য বিন্দুতে দশজন মিলিত হইবে। গুরু বলে, মধ্যবর্ত্তী বলে মানিতে হয় না, কিন্তু ভগবানের লীলা বলে, অভিপ্রায় বলে এ সব মানিতে হইবে। নববিধানের ব্যবস্থা তুমি এই রকম করিয়াছ। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া মিলন হইল না। এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি।" এই ত মিলন সাধনের উপায়।

বৃদ্ধ কে ?

আভিধানিক অর্থে যাহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা গিয়াছে, সেই বৃদ্ধ। কিন্তু নববিধান বলেন, মানবাত্মার বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনন্ত। তবে কেমন করিয়া আমরা বৃদ্ধ হইব ?

প্রকৃত উপাসনা।

যে দিন আমি উপাসনা করি, সে দিন আমি আমার উপাসনা করি, ঈশ্বরের উপাসনা করি না। যে দিন ঈশ্বর উপাসনা করান, সেই দিনই আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি, আমার আমি থাকি না। যে দিন আমি উপাসনা করি, সে দিন আমি পুত্তলিকার পূজা করি, কামনা বাসনার পূজা করি, সংসারের ইচ্ছা রুচি চরিতার্থ করি, আত্মাভিমান, ধর্ম্মাভিমান ও আমিত্বের দাসত্ব করি। যে দিন ঈশ্বর উপাসনা করান, সে দিন আমি ধর্ম্মও চাই না, কর্ম্মও চাই না, কামনাও চাই না, মুক্তিও চাই না; নিষ্কাম নিঃসঙ্গ নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরেরই উপাসনা করি, আনন্দ-পূর্ণ হইয়া যাই। যে দিন আমি উপাসনা করি, সে দিন আমি যাহা চাই, তাহা কিছুই পাই না। যে দিন ঈশ্বর উপাসনা করান, সে দিন যাহা চাই সকলই পাই, যাহা আমি চাই না তাহাও পাই, আমার চাইবার কিছুই থাকে না, আমার পাইবারও শেষ দেখি না। সে দিন আমার ভিতরই আমার ঈশ্বরকে দেখি, ইহলোকেই পরলোকবাসী হই।

"ধর্ম্ম-সাধন"।

২২ সংখ্যা—১১ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

৪ঠা আশ্বিন—১৭৯৪ শক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—কোন ভৌতিক উপায় দ্বারা পরলোক সাধন হয় কি না ?

উত্তর—পরলোক সাধন সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক। পরলোকে ভৌতিক সাধন অসম্ভব, যেহেতু শরীর পরলোকে যায় না, কেবল আত্মারই লোকান্তর হয়।

প্র—পরলোকের বিষয়ে অপরের কথায় বিশ্বাস করা যায় কি না ?

উ—ঈশ্বর-জ্ঞান যেমন, পরলোক-জ্ঞান তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। পরলোকের তত্ত্ব নিজ নিজ অন্তরে উপলব্ধ হয়। ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের হৃদয়ে ঐ জ্ঞান প্রেরণ করেন; তিনি অন্তরে ঐ জ্ঞান না দিলে আমরা পাইতে পারি না। এ বিষয়ে অপরের প্রমুখাৎ কোন কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, যদি অন্তরে তাহার সায় এবং প্রমাণ পাওয়া না যায়।

প্র—Spirit আত্মা আসিয়া যদি দেখা দেয় বা কথা কয়, তবে বিশ্বাস হয় কি না ?

উ—কোন আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার দর্শন বা শ্রবণ-যোগ অবশ্যই আধ্যাত্মিক হইবে, ভৌতিক হইতে পারে না। সুতরাং শরীরযুক্ত স্পিরিটের দর্শন বা কথা শ্রবণ কেবল উপহাসের ব্যাপার। স্পিরিটদিগের মধ্যে আবার পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা আছে। স্পিরিট-বাদীরা বলেন, পুণ্যাত্মারা যেমন যথার্থ বলেন, পাপাত্মারা সেইরূপ মিথ্যা বলিয়া লোককে প্রতারণা করে এবং তাহারা ঠিক পুণ্যাত্মার বেশও ধরিতে পারে। আমরা কি প্রকারে এ দুয়ের প্রভেদ করিব? বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্পিরিট ভিন্ন অন্য স্পিরিটের কথা আমরা অবলম্বন করিতে পারি না।

প্র—Medium মধ্যবর্ত্তী দ্বারা স্পিরিট কথা কহিতে পারে কি না ?

উ—যদিই স্বীকার করা যায় যে, স্পিরিট মধ্যবর্ত্তী দ্বারা কথা কয়, তথাপি সে কথা ঠিক স্পিরিটের হইতে পারে না। মধ্যবর্ত্তীর দ্বারা তাহা বিকৃত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর, একজন স্পিরিট আর একজনকে পায়, ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। কারণ মানুষ নিজে স্বাধীন থাকিবে, অথচ সম্পূর্ণরূপে স্পিরিটের যন্ত্রস্বরূপ হইবে, ইহা অসম্ভব। স্পিরিট আবার চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি এক একটী জড় পদার্থ অবলম্বন করিয়া কথা কয়, ইহার ভাবও আমরা বুঝিতে পারি না।

প্র—পূর্ব্বে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 'আত্মাই আত্মার শত্রু এবং আত্মাই আত্মার মিত্র,' এখন আত্মাকে আত্মার মিত্র কিরূপে করা যায় ?

উ—ইহার একমাত্র উপায়, ইচ্ছার সহিত পুণ্যের ঐক্য করা। ইচ্ছা সংসার ও পাপের দিকে থাকিলে বিবেকের সহিত তাহার বিবাদ হয়। আত্মার মধ্যে দুই বিরোধী বস্তু থাকিলে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং সংসারাসক্ত পাপপ্রিয় ইচ্ছা আত্মার প্রাণ বিবেককে বিনাশ করিতে চেষ্টা পায়, সুতরাং ইহাতে আত্মারও বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্মা যদিও অমর, তথাপি পাপ ইচ্ছার দ্বারা তাহার তেজ, শান্তি, আনন্দ, স্বর্গীয় ভাব সকল ধ্বংস হইয়া যায়। ইচ্ছা ভাল না হইলে কেবল কতকগুলি পুণ্য কার্য্য করিলেও হয় না। অতএব অসাধু ইচ্ছা সমপ্রযত্নে দূর করিয়া, সাধু ইচ্ছা অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা কেবল পুণ্যবান্ হইব না, কিন্তু পুণ্যকে ইচ্ছার একমাত্র বস্তু করিব। তাহা হইলেই আত্মা আত্মার মিত্র হইবে।

(ক্রমশঃ)

সম্মিলিত ঈশ্বরোপাসনা বা সালাতে ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্বে একত্ব, একত্বে স্বরাজ।

ভাই হিন্দু-মুসলমান, তোমরা উভয়ে স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষী। তোমরা কি জান, ১৯২১ সনে, ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, দিল্লীতে, ভারত-সম্রাট্ তাঁহার দূতবার্ত্তাদ্বারা ভারতীয় জনসাধারণকে জানাইয়াছিলেন:—"অনেক বৎসর যাবৎ, হয়ত বহু পুরুষ-পরম্পরা যাবৎ স্বদেশভক্ত রাজভক্ত ভারতসন্তানগণ তাঁহাদের মাতৃভূমির জন্য স্বরাজের সুখস্বপ্ন দেখিয়াছেন। অদ্য তোমরা আমার রাজ্যের প্রজারূপে স্বরাজের প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে; আমার অন্যান্য রাজ্যবাসিগণ (Dominion) যেরূপ স্বাধীনতা সম্ভোগ করে, অদ্য হইতে তাহারই দিকে অগ্রসর হইবার জন্য তোমরা অতি বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র এবং প্রচুর সুবিধা লাভ করিলে।" এই প্রতিশ্রুত স্বরাজের মৌলিকতত্ত্ব "স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সকল মানুষের সমান অধিকার।" স্বরাজ যদি খাঁটি স্বরাজ হয়, কোন পিল্‌টা করা ফাঁকির মাল না হয়, তবে জানিও, তাহা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, অথবা কেহ কখনো দানসূত্রে লাভ করিতে পারে না। ভাই হিন্দু-মুসলমান, ভ্রাতৃভাব এবং সমান অধিকারের সাধনাদ্বারা, বড়-ছোট ভাব পরিত্যাগ করিয়া, তোমাদিগকে প্রকৃত স্বরাজ লাভের অধিকারী হইতে হইবে। জানিও, এই আদর্শের সাধনা বিষয়ে যে দেশ যতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহারা সেই পরিমাণেই প্রকৃত স্বরাজও লাভ করিয়াছে। তোমরা কি জান না, যে ইংরাজ তাহার দেশে বর্ত্তমানে শ্রমিকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্বরাজের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। ইহা তাহাদের বিশেষ গৌরবের বিষয়। তোমরা কি জান,—মহম্মদের জন্ম ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে, এবং তাঁহার বয়স যখন ৯ বৎসর, তখন ৫৮০ সনে এই ইংরাজ-জাতির পূর্ব্বপুরুষ (Angles) রোমের বাজারে গোলাম বিক্রি হইত? তোমরা কি জান, যে তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া, রোমের পোপ বা প্রধান ধর্ম্মনেতা গ্রেগারি তাহাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। তখন হজরৎ মহম্মদের বয়স ২৮ বৎসর। তখনও তাঁহার 'রসুলত্ব' লাভের ১২ বৎসর বাকি। এই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণেরই ফলে সকল ইংরাজ একত্রে মিলিয়া, এক পরমেশ্বরকে তাহাদের সকলের স্বর্গস্থ পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া, এবং পরস্পরকে ভাই এবং সমান অধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিয়া, বিগত ১৩০০ বৎসর যাবৎ তাহাদের দেশময় বিস্তৃত ধর্ম্মমন্দির সকলে এই ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে করিতে, আজ তাহারা প্রকৃত স্বরাজের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে! ভাই হিন্দু-মুসলমান, চল আমরাও তবে ইংরাজের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া, সেই পথ অবলম্বন করি। স্বরাজের প্রকৃত মূলমন্ত্র "ইন্নামাল্ মোমেনুনা এখও-য়াতুন্" (৪৯-১০) "একেশ্বর-বিশ্বাসীরা সকলে ভাই ভাই।" কোরাণই জগতে একালে তাহা প্রথম ঘোষণা করে। 'মোমেন' কে? যাহারা বলে, "এক পরমেশ্বর আমাদের রক্ষক" "ইয়াকুলু রাব্বানা ল্লাহু" (২২-৪০)। হিন্দু কখনো কাফের নয়। হিন্দুও একেশ্বরবিশ্বাসী, অতএব "মোমেন"। পরমেশ্বরের কৃপায় হিন্দু-মুসলমান আমরা এক হইয়া প্রকৃত স্বরাজ লাভ করিয়া ধন্য হইব। শোন, কোরাণ কি বলিতেছে:—"ও-আ তাসেমু বে হাব্‌লে ল্লাহে জামি-য়ান ও-আ লা তাফার্‌রাকু; ও-অজ কুরু নে'মা-তা ল্লাহে আলাইকুম্; এজ্ কুন্তুম আ' দা আন; ফা আল্লাফা বাইনা কুলুবেকুম্, ফা আস্‌বাহ্‌তুম বে নে'মাতে'হি এখ্‌ও-আনান্।" (ইমরান (৩)-১১-১০২)। "সকলে মিলিয়া পরমেশ্বরের প্রেম-রজ্জুকে দৃঢ় করিয়া ধর; কেহ কাহাকেও পৃথক জ্ঞান করিও না। এবং তোমাদের উপরে পরমেশ্বরের দয়া স্মরণ কর:—যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তিনি তখন তাঁহার দয়াদ্বারা তোমাদের হৃদয় সকল একত্র করিয়া বাঁধিয়া এক করিলেন, ও তখন হইতে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে।"

"ইন্না হাস্‌বুকা ল্লাহু। হুবাল্লাজী আ য়্যাদাকা বে নাস্‌রে-হি ও-আ বেল্‌মুমেনিন॥ ও-আ আল্লাফ বাইনা কুলুবেহিম্। লাউ আন্‌ফাক্‌তা মা ফিল্ আর্দ্দে জামিয়ান্ মা আল্লাফ্‌তা বাইনা কুলুবেহিম্, ও আ লাকিন্না ল্লাহা আল্লাফা বাইনা হুম্; ইন্নাহু আজিজুন্ হাকিম্॥" আন্‌-ফাল, ৮-৬২, ৬৩॥

"নিশ্চয় পরমেশ্বরই তোমার পক্ষে যথেষ্ট; তিনিই যিনি তাঁহার আপন সাহায্যদ্বারা এবং বিশ্বাসীদিগের দ্বারা তোমাকে বলদান করিয়াছেন; এবং তিনিই বিশ্বাসীদের হৃদয় প্রীতিসূত্রে বান্ধিয়া এক করিয়াছেন। ধরাতলে যৎকিছু ধনসম্পত্তি আছে, সমস্ত ব্যয় করিয়াও তুমি বিশ্বাসীদের হৃদয় প্রীতিসূত্রে বান্ধিয়া এক করিতে পারিতে না; কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগকে প্রীতি-সূত্রে বান্ধিয়া এক করিয়াছেন; নিশ্চয় তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ।"

তোমরা কি জান না, যে বেদই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, "বেদো' খিলো ধর্ম্মমূলং হি" (মনু, ২-৬)। বেদ সকলের মধ্যে আবার ঋগ্বেদই প্রকৃত বেদ—"ঋচো বেদঃ" (শতপথ, ১৩-৪-৩-৩) "ঋগ্বেদই বেদ"। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলিতেছে, "যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তৎ, যদৃচা তদ্দৃঢ়ং" (৬-৫-১০-৩), "সামদ্বারা বা যজুদ্বারা যজ্ঞের যাহা করা হয়, তাহা শিথিল, ঋক্‌দ্বারা যাহা করা হয়, তাহাই দৃঢ়"। সেই ঋগ্বেদ কি বলিতেছে, তাহা শোন:—(১) "পিতেব সূনবে" [১-১-৯] "পরমেশ্বর মানুষের কাছে, ছেলের নিকটে বাপের মত"। (২) "পিতা পুত্রং ন হস্তয়ো দধিধ্বে" [১-৩৮-১,] "বাপ যেমন ছেলেকে হাত ধরিয়া চালায়, পরমেশ্বরও তাঁহার

উপাসককে সেইরূপে চালান''। (৩) "ত্বং ত্রাতা তরণে চেত্যো ভূঃ পিতা মাতা সদমিন্মানুষাণাং'' ॥ ঋ ৬ ১-৫ ॥ "হে জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর, তুমি ত্রাণকর্ত্তা, তুমি উদ্ধারকর্ত্তা, তুমি সকলের জ্ঞাতব্য, তুমি মানুষের নিত্য পিতামাতার ন্যায়''। (৪) "সেই অন্নদাতা পরমেশ্বর মানুষের পক্ষে পিতা হইতেও অধিক পিতৃতুল্য"—"পিতৃতমঃ পিতৃণাং" ॥ ৪ ১৭-১৭ ॥ (৫) "ইন্দ্র ক্রতুং ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা'' ॥ ৭-৩২-২৬ ॥ "হে অন্নদাতা, পিতা যেমন পুত্রকে করে, সেইরূপে তুমি আমাদিগকে সংকল্পে মতি দান কর।'' ভাই হিন্দু, ইহা কি আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা, যে পৃথিবীর মধ্যে বেদই প্রথমে মানবজাতির পক্ষে, পরমেশ্বর পিতা অপেক্ষাও অধিক পিতৃতুল্য, "পিতৃতমঃ পিতৃণাং'' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল? শুধু ঈশ্বরের পিতৃতুল্যত্ব ঘোষণা করিয়াও বেদমাতা নিরস্ত হন নাই। পরমেশ্বরের "পিতৃতমত্বের'' ফলে বেদই জগতে প্রথমে মানব-জাতিকে এক পরিবার, এক ভ্রাতৃমণ্ডলী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। "জনং মনুজাতং'' (১ ৪৫-১), "মনুষো নহুষো বি জাতাঃ'' (১০-৮০-৬),—এক পিতার সন্তান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। মনু অথবা নহুষ, বোধ হয়, একই ব্যক্তির নাম-ভেদ মাত্র। শুধু মানব-জাতিকে এক পিতার সন্তান বলিয়াও আমাদের বেদমাতা নিরস্ত হইতেছেন না; বরং আধুনিক বলশেভিকদিগের সুর ধরিয়া বলিতেছেন, "সচা সনেম নহুষঃ সুবীরাঃ'' (১-১২২-৮)। "আমাদের মানব-পরিবার আত্মত্যাগী বীর প্রসব করিবে, এবং আমরা সকলে সমানভাবে ধনসম্পত্তি সম্ভোগ করিব।'' "সমানী প্রপা সহ বোহন্নভাগঃ। সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি॥'' অথর্ব, ৩-৩০-৬॥ "তোমরা এক পানশালাতে পান করিও, একই অন্ন সমানভাবে ভাগ করিয়া খাইও, আমি তোমাদের সকলকে এক প্রেম-রজ্জুতে একতাসূত্রে বদ্ধ করিতেছি।'' ভাই হিন্দু-মুসলমান, তোমরা কি আজও এক পরমেশ্বরকে সকলের পিতৃতুল্য জানিয়া—পরস্পরকে ভাই ভাই জানিয়া, আলিঙ্গন করিবে না? "ইন্নামাল্ মোমেনুন এখ্ওআতুন্ (৪৯-১০), "সকল একেশ্বরবিশ্বাসী পরস্পর ভাই ভাই''। বেদ এবং কোরাণ উভয়ের উপদেশ, শিরে ধারণ করিয়া, আজও কি হিন্দু-মুসলমান এক হইবে না?

আবার কেহ মনে করিবে না, যে না বুঝিয়া, মর্ম্ম পরিগ্রহ না করিয়া, শুধু তোতার মত লোকে আরবি কিম্বা সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াইলেই হইবে, কোরাণেরও মর্ম্ম তাহা নয়, বেদেরও মর্ম্ম তাহা নয়। আরবি যাহারা বুঝে, আরবি যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদেরই জন্য কোরাণ আরবিতে আসিয়াছিল। কোরাণ বলিতেছে, "ও-আ লা তাক্‌ফু মা লাইসা লাকা বেহি এল্‌মুন্" (১৭-৩৬), "যাহা তুমি না বোঝ, তাহার অনুসরণ করিও না।" কোরাণ আরবিতে প্রকাশ সম্বন্ধে কোরাণ বলিতেছে, "ও-আ লাও জা-আল্‌নাহু কুরানান্ আ'জামিয়ান্, লাকালু লাউ লা ফুসেসলাৎ আয়াতুহু; আ আ'জামিয়ুন ও-আ আরাবিয়ুন্" (৪১-৪৪)। "আমি যদি বিদেশীয় ভাষায় কুরান পাঠাইতাম, তবে তাহারা নিশ্চয় বলিত, কেন ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া বলা হয় নাই? কি আরব দেশী লোক, আর বিদেশীয় ভাষা!" (৪১-২, ৩, এবং ৪৩-৩ দেখ)। আবার কোরাণ বলিতেছে—"যখন যেখানে প্রেরিত পাঠান হইয়াছে, সেই দেশের ভাষা দিয়াই পাঠান হইয়াছে, যেন লোকে বুঝিতে পারে'', "ও-আ মা আরসালনা মিন্ রাসুলিন্ ইল্লা বে লিসানে কাউমেহি, লে ইয়ুবায়্যিনা লাহুম্" (১৪-৪)।

অপরদিকে বেদও বলিতেছে, "যা তে অগ্নে পর্ব্বতস্যেব ধারা, দেব চিত্রা। তামস্মভ্যং প্রমতিং জাতবেদো বসো রাস্ব সুমতিং বিশ্বজন্যাং॥ (৩-৫৭-৬), "হে সর্ব্বজ্ঞ পরম জ্যোতিস্বরূপ দানকর্ত্তা (দেব) পরমেশ্বর, হে আমাদের আশ্রয়স্বরূপ, আমাদিগকে সেই সুমতি দেও, যাহা এই বিচিত্র জলধারার মত সর্ব্বজনের হিতকারী।" না বুঝিয়া, তোতার মত বেদমন্ত্র আওড়াইলে, সেই "সুমতিং বিশ্বজন্যাং" পাইবার আশা কোথায়? বেদেও তবে না বুঝিয়া তোতার মত গায়ত্রী মন্ত্র আওড়াইয়া ঈশ্বরোপাসনার স্থান নাই। তুমি আরবিই বল, আর সংস্কৃতই বল, হিন্দিই বল, বা বাঙ্গলাই বল, পরমেশ্বরের পক্ষে তাহা সমান। কিন্তু যে মানুষ আরবি কি সংস্কৃত না বুঝে, তাহার পক্ষে আরবিতে, কি সংস্কৃতে ঈশ্বরারাধনা বা ঈশ্বর-নিকটে প্রার্থনা, তোতার বুলির মত হইল কি না, তোমরাই বিচার কর। সে যাহা হউক, তাহাদের পক্ষে আরবি বা সংস্কৃতের সঙ্গে, তাহারা যেন বুঝিতে পারে, সেরূপ বাঙ্গলা কি হিন্দি অনুবাদ থাকাও আবশ্যক। ইংরেজ জাতি তাহাদের গির্জ্জাদিতে যেন সকলে বুঝিতে পারে, সে জন্য তাহাদের মাতৃভাষা ইংরাজিভাষা ব্যবহার করিয়াই ঈশ্বরের উপাসনা বা সালাৎদ্বারা ভ্রাতৃত্ব এবং একতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমরা হিন্দু-মুসলমানও তাহা করিলেই সহজে সফলকাম হইতে পারিব। আমরা নিম্নে বেদ ও কোরাণের সাহায্যে, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সংক্ষিপ্ত মিলিত সালাৎ বা ঈশ্বরোপাসনার পদ্ধতি পাঠক-সমীপে উপস্থিত করিতেছি। আশা, যে তাহার সাধনদ্বারা আমাদের হিন্দু-মুসলেম উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব এবং একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা ইংরাজের মত আমাদেরও প্রকৃত স্বরাজ লাভের বিশেষ সাহায্য হইবে।

সম্মিলিত হিন্দু-মুসলেমের সংক্ষিপ্ত মিলিত ঈশ্বরোপাসনা বা সালাৎ।

১। উদ্বোধন।

"ও-আ তাসেমু বে হাব্‌লে ল্লাহে জামিয়ান্, ও আ লা তাফার্‌রাকু; ও-আজ্‌কুরু নে'মাতা ল্লাহে আলাইকুম্; এজ

মুহুম আদ-আন্ ফা আল্লাফা বাইনা কুলুবেকুম, ফা আস্‌বাহ্‌তুম্ বে নে'মাতেহী এখ্‌ও-আনান্" (এমরান (৩)-১১-১০২)। "সকলে মিলিয়া পরমেশ্বরের প্রেমরজ্জুক দৃঢ় করিয়া ধর; কেহ কাহাকেও পৃথক হইতে বলিও না। এবং তোমাদের উপরে পরমেশ্বরের দয়া স্মরণ কর:—যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তিনি তখন তাঁহার দয়াদ্বারা তোমাদের হৃদয় সকল এমন করিয়া বান্ধিয়া এক করিলেন, যে তখন হইতে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে।"

"হাস্‌বুকা ল্লাহ। হুবা ল্লাজী আয়্যাদাকা বে নাস্‌রেহি ও-আ বেল্ মুমেনিন। ও-আ আল্লাফা বাইনা কুলুবেহিম্। লাউ আন্‌ফাকতা মা ফীল্ আর্দে জামিয়ান্ মা আল্লাফ্‌তা বাইনা কুলুবেহিম্, ও-আ লাকিন্না ল্লাহা আল্লাফা বাইনা হুম্'॥ ৮-৮-৬২, ৬৩॥ "(হে মহম্মদ) নিশ্চয় পরমেশ্বরই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তিনিই যিনি তাঁহার আপন সাহায্যদ্বারা এবং বিশ্বাসীদিগের দ্বারা তোমাকে বলদান করিয়াছেন; এবং তিনিই একেশ্বর-বিশ্বাসীদের হৃদয় প্রীতিসূত্রে বান্ধিয়া এক করিয়াছেন। ধরাতলে যত কিছু ধনসম্পত্ত আছে, সমস্ত ব্যয় করিয়াও তুমি সেই একেশ্বরবিশ্বাসীদের হৃদয় প্রীতিসূত্রে বান্ধিয়া এক করিতে পারিতে না; কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগকে প্রীতিসূত্রে বান্ধিয়া এক করিয়াছেন।"

"ইন্নি ও-আজ্‌জাহ্‌তু ও-আজ্‌হিয়া লিল্লাজি ফাতারাস্ সমাও-আতে ও-আল্ আর্দে, হানিফান্ ও-আ মা আনা মিনাল্ মুশরেকিন্' (আ'ন্‌আম (৬)—৮০)

"নিশ্চয় তাঁহারই দিকে মুখ ফিরাইলাম, যিনি আকাশ-পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন;—সরল অন্তরে। বহু ঈশ্বরের উপাসকদিগের মধ্যে আমি নহি।"

২। আরাধনা।

আল্ হামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন্॥ ১॥ সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক পরমেশ্বরের জন্য॥ আর্ রাহমানের রহিম॥ ২॥ যিনি দাতা এবং দয়ালু॥ মালিকে ইয়াওমেদ্দিন॥ ৩॥ যিনি দোষগুণের বিচারকর্ত্তা॥ ইয়াকা না' বুদো ও-আ ইয়াকা নাস্তাইন॥ ৪॥ আমরা তোমারই আরাধনা করি, এবং তোমারই নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। এহ্ দে নাস্ সেরাতাল্ মুস্তাকিমা॥ ৫॥ আমাদিগকে সরল সত্যের পথে চালাও॥ সেরাতল্ লাজিনা আন্ আম্‌তা আলাইহিম॥ ৬॥ তুমি যাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহাদিগের পথে চালাও॥ গাইরিল মাগজুবে আলাইহিম ও-আ লাজ্ জালীন॥ ৭॥ যাহাদের উপরে তোমার ক্রোধ পতিত বা যাহারা পথ-ভ্রষ্ট, তাহাদের পথে নয়॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১॥ সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের স্থিত-রক্ষণার কারণস্বরূপ পরমেশ্বর বর্ত্তমান ছিলেন; তিনিই সৃষ্ট বস্তু সকলের এক অদ্বিতীয় প্রভু রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনিই পৃথিবী এবং ঐ দ্যুলোককে যথাস্থানে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি ভিন্ন যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ব্বক আমরা অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিব?

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ যস্য চ্ছায়া' মৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ২॥ যিনি ভক্ত উপাসকের নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন, যিনি প্রার্থীকে বল প্রদান করেন, বিশ্ব-সংসার যাঁহার আদেশ বহন করে, যাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে মোক্ষ লাভ হয়, মৃত্যু যাঁহার দাস, সেই পরমেশ্বর ভিন্ন যথাযোগ্য ভক্তির সহিত আমরা অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিব?

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে'স্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৩॥ যিনি স্বীয় মহিমাবলে শ্বাসপ্রশ্বাসকারী, চক্ষু-নিমেষ-উন্মেষকারী, গতিশীল প্রাণিবর্গের এক অদ্বিতীয় রাজা, যিনি এই দ্বিপদ মনুষ্যাদি এবং চতুষ্পদ গবাদি সকলের দেহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর ভিন্ন যথাযোগ্য ভক্তির সহিত আমরা অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিব?

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥' ৪॥ যাঁহার প্রভাবে সূর্য্যাদি তেজোময়, এবং পৃথিবী স্থির, যিনি স্বর্গলোক, যিনি দুঃখরহিত লোক ধারণ করিয়া আছেন; যিনি অন্তরিক্ষে থাকিয়া জলরাশি নির্ম্মাণ করেন, সেই পরমেশ্বর ভিন্ন যথাযোগ্য ভক্তির সহিত আমরা অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিব?

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥ যজু ৩০-৩॥ হে জগতের পিতা-মাতা, তুমি আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর। যাহা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।

রাব্বানা আৎমেম্ লানা নুরা না, ও-আগ্ ফের লানা। ইয়াকা আলা কুল্লে শাইন্ কাদির॥ তাহ্‌রিম (৬৬)—২—৮॥ হে আমাদের পালনকর্ত্তা [পিতা], আমাদের অন্তরে যে জ্যোতি দিয়াছ, তাহা পূর্ণ কর। আমাদের রক্ষা বিধান কর। নিশ্চয় সকলের উপরে তুমিই ক্ষমতাশালী।

আস্ সালামু আলায়কুম ও-আ রাহ্‌মাতুল্লাহে॥ তোমাদের সকলের উপরে পরমেশ্বরের দয়া এবং শান্তি বর্ষিত হউক॥ আল্লাহু আকবর, ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্॥

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

ভাদ্রোৎসবে উপাসনা।

[১৯১৬ কি ১৯২৭ সনের ভাদ্রোৎসবের দিনব্যাপী উৎসবদিনে, শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের (নালুদার) আরাধনাদি মেয়েরা কয়জনে লিখিয়াছিলেন; সকলের লেখা মিলাইয়া লক্ষ্ণৌর শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশের জন্য তাহা পাঠিয়েছেন। মাঝে মাঝে শব্দ পড়ে যাওয়াতে ভাব ও ভাষা অপূর্ণ হইলেও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ সুন্দর উপাসনাটি ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইল]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনন্ত।

তুমি অনন্ত, অনন্তরূপ তোমার, বিচিত্র গুণ তোমার, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে হবে; এর ভেতর কত শক্তি, এক একটির ভেতর কত উৎসাহে উদ্যম রেখে দিয়েছ। নয় ত আবার কি করে উৎসাহে কাজ করতে ওঠে? তোমার কথা শুনলে, বিশ্বাস করলে, অমনি বেঁচে গেল। কেউ বা ৫০ বছর বেশী বাঁচলে; কি করে বেঁচে গেল তুমিই জান—এমন ব্যামো হয়েছিল, ডাক্তারেরা সব জবাব দিলে, গোরের উপর কি লেখা হবে, তাও ঠিক করে নিয়েছিল। কে ভেতরে ভেতরে বলে দিলে, না মরবে নি কো......He redeemeth thy life from destruction. মৃত্যু থেকে তিনি তোমায় কতবার বাঁচালেন......করুণার কথা ভুলে গেলে? অনন্ত অসীম, তুমি কি ভুলে যেতে দাও? দুদিনের সংসার দুদিন পরে ফুরিয়ে যায়। আমাদের প্রত্যেকের স্থান ঠিক করে দাও।

প্রেম।

কত ভালবাস, দেখতে দাও তোমার সংসার; তোমাকে ভালবাসব, সেই জন্য সংসার সৃজন করলে, চাকর বাকর, ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র পরিবার সৃজন করলে; আপনাকে এত বেশী করে ঢেলে দাও, তাই সংসার তপোবন হয়ে গেল......এক একটি দেওয়ার ভেতর কত তীর্থ, সংসারে দেওয়ার মানে তো আর কিছু নয়, বেশী ভালবাসা পাওয়া যাচ্ছিল না, সংসার করে এত ভালবাসা পাওয়া গেল......নতুন অবস্থায় তোমাকে এত করে পেল......পরীক্ষায় আপনাকে আপনি ঢেলে দাও, না হলে পরীক্ষার মানে কি?......ভাবছে কেন তোল?......তোমার কৃপায় দেখতে পায়।......শুধু শুধু সময় নষ্ট কর, তা কি হয়? সেখানে কি তুমি এত নিষ্ঠুর? তা না; শোকের চোখের জল, তার ভিতর তোমার এমন অভিপ্রায় থাকে; চোখের জলে তোমাকে দেখতে পায়......ভেতরে তোমার নববিধান নতুন করে' দেখতে দাও......এই এক এক ফোঁটা চোখের জলে তুমি অপরূপ রূপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠ; যখন কাঁদেন চোখের জল ফেলে, তার ভেতর তোমার যে অপরূপ রূপ কত সুন্দর, তাই দেখাও—এত জল এর ভেতর? চোখের জল সৃষ্টি করেছ—বৃষ্টির ভেতরে এত চোখের জলের কি প্রয়োজন? তারা আপন হতে দিন রাত কাঁদে না কেন? তারা তোমাকে দেখলেই কাঁদে, স্বীকার করলেই কাঁদে, তারা কাঁদবেই কাঁদবে—এই নতুন বিধানে কত পাপীকে কাঁদিয়েছ; এখানে এক এক উৎসবে কত কাঁদিয়েছ। সেই তীর্থস্থানে এনেছ, যেখানে সকলে কত কেঁদেছেন; বাইরে কত বৃষ্টি, ভেতরেও বর্ষা এনেছ। অহৈতুকী কান্না কি তোমার ছেলে মেয়েরা শেখে না? আমাদের দেখলে তোমার এত আনন্দ হয়, আর আমাদের তোমাকে দেখলে আনন্দ হয় না। আমাদের এত সহজে স্বীকার কর, আমরা তোমায় স্বীকার করবো না; প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে এমন করে' দেখা দিচ্ছ, স্বীকার না করে' পারবে কেন? আমরা না কেঁদে থাকতে পারবো না? যেই ভাববে এই তুমি, অমনি সে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে......জ্ঞান বিজ্ঞান পড়লেও এমন কোমল......সকলে বেশ বুঝতে পারে আমরা এসেছি এখানে—তোমার সন্তানেরা কঠোরপ্রাণ হবে না, শুকিয়ে যাবে না—তোমার প্রাণ তাদের দিলে কিসের জন্য? আমাদের হৃদয় সহজে যা'তে গলে' যায়। কাউকে শত্রু মনে করবো না। যাকে শত্রু ভাবে, তাদের আর ভাববে না, ভাবলেই চোখে জল আসবে—সেখানে থাকলে সব একাকার হয়ে যাবে।

অদ্বিতীয়।

একমেবাদ্বিতীয়ম্, তোমার সন্তানেরা সব এক......আমরা কেবল তোমাকে অন্তরে এক ছিলে, সেই করে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলেছিলেন, তাতে কি আমরা তৃপ্ত হতে পারি?......মা, মা, মা বলে' রাতদিন না ডাকলে তৃপ্ত হয় না......তাইতে যারা দুঃখ পেয়েছে, শোক পেয়েছে, তারা না ডেকে থাকতে পারবে না, আর মা-নাম শুনে থাকতে পারবে না, তোমার সন্তানেরা তোমার নাম করতে না করতে গলে' যাবে......মিছি মিছি তোমার নাম না করে......লাভ কি?......আমাদের ভেতরে প্রেমের উচ্ছ্বাস এনে দাও, আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না, তুমিও আমাদের ছেড়ে থাকতে পার না; এই রকম করে' তুমি বার বার আস, তাই উৎসবের সময় তুমি আবার এলে, তোমার ভিতর কত স্নেহ মায়া মমতা তাই আমাদের জানতে দাও, ঢেলে দাও, জেনেও কি করে' সন্তানেরা তোমাকে ছেড়ে থাকবে? ভেতরে এই যে তোমার মায়া মমতার বধ, এর ভেতর নববিধান মূর্ত্তিমান করছ......কতবার গেয়েছি "ইহলোক পরলোক, কভু নয় পৃথক, তোমারি অভয় চরণে; তুমি বাঁধিয়ে রেখেছ দোঁহে, তোমার অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে।" এর ভেতরে ইহলোক পরলোক আপনা আপনি এক হ'য়ে যাবে; এখানে এলে, ওঁরা আমাদের ভেতর আসেন, আমরা ওঁদের ভেতর যাই; ওঁরা আমাদের মত হ'য়ে যান, আমরা ওঁদের মত হয়ে যাই—

তোমাকে দেখলে তোমার সন্তানেরা তোমার মত হয়ে যায়, তুমি আমাদের মত হয়ে যাও, প্রত্যেকের মত হয়ে তুমি প্রত্যেকের কাছে দেখা দাও—তোমাকে এই রকম দেখতে দেখতে তোমার মত হয়ে যাই। হে অনন্ত, হে অসীম, আর তুমি কিছুতে আমাদের ছেড়ে যেতে পার না—তোমার সন্তানেরা তোমায় নিয়ে খেলা করবে, তোমায় গাড়ী চড়াবে, তারা নিজেরা তোমাকে খেলার সাথী করে নেবে—সেই তুমি পূর্ণ সত্য হয়ে প্রাণের ভেতর, মনের ভেতর, সকলকে নিয়ে এস, যত ভক্তদল, পুরাতন বিধান নিয়ে এসে মেলাও—প্রকাণ্ড যে তুমি, চোখের জলের ভেতর পলকের ভেতর এত সহজে দেখা দাও; যাই দেখতে পায়, অমনি তোমার সন্তানেরা বলে একমেবাদ্বিতীয়ম্……এখানে কিসের অভাব থাকে? তোমার প্রত্যেক সন্তান নূতন বিধানের ভেতর জয়লাভ করবে, তাই সংসারে আসে। তোমারি নাম করতে করতে দেখবে পৃথিবীতে নূতন বিধান সত্য হয়েছে। সেই জন্ম যুগে যুগে প্রেরিত মহাপুরুষেরা সকলে এলেন। তুমি তো দেখিয়ে দিলে, যেখানে যেখানে বড় বড় লোক সব থাকেন, সেখানে সেখানে তোমার প্রতিষ্ঠা হবে। ভাদ্রোৎসবের ভেতর প্রকাণ্ড জেনারেল বুথের দলের সঙ্গে তোমার নাম করলাম—একলা একলা যা পারা যায় না, দলে বলে তা পারা যায়, তাই এক সঙ্গে উপাসনা দিলে। এই সব উপাসনার ভেতর দিয়ে সমস্ত দেশকে তোমার পদতলে আনবে, সবাই তোমার হবে, তাই বার বার দীক্ষা দিচ্ছ, ব্রত নিতে বলছ……এক হল, তাতে শেষ নয়, আরম্ভ মাত্র।

শুদ্ধ।

বার বার যারা তোমায় স্বীকার করে, দীক্ষা নেয়, তাদের ভিতর রাবণ আসতে পারে না। এই রকম করে যাতে তোমাকে এবং তোমার ভক্তদল নিয়ে দিনরাত থাকি, সেই ব্যবস্থা করলে। ……শুদ্ধম্ বলে শুদ্ধ হয়ে যাব। আমরা যে একলা একলা শুদ্ধ হব, তা হবে না, সকলে মিলে পবিত্র হতে হবে। সব শুদ্ধ হয়ে যাব, সেই ব্যবস্থা করলে, তারই জন্ম সকলকে ঘরের ভেতর আনলে সকলকে উৎসবের ভেতর আনলে। কেউ কাউকে ছাড়তে পারবে না, কেউ বাহিরে থাকতে পারবে না, যদি একজনও বাহিরে থাকে, পূর্ণ হবে না। আর কেউ অসার সংসারে থাকবে না, অসার চিন্তা নিয়ে……এখানে নিত্যলীলা করবে, তাই সবাইকে নিয়ে এলে। এই তীর্থে সবাই আসবে, এই মন্দির তীর্থ, ভাদ্রমাসে এখানে কতবার দেখা দিয়েছ।

আনন্দ।

মাঝে মাঝে কি দেখা দাও? তা নয়; আনন্দময়ী জননী, দিন রাত এখানে আছ…তারা তোমার নাম করবে, তোমার গুণ গান করবে, তোমার কথা বলবে আর উৎসাহে পূর্ণ হবে; আর কারুর প্রাণে শোক যেন না থাকে। সকলে শোকের ভেতর দুঃখের ভেতর, উৎসবের যে আনন্দের কান্না, তাই যেন কাঁদে। বাহিরে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আনন্দের বৃষ্টি করে' মহাতীর্থ সৃজন করেছ। এই খানে যদি তুমি আনলে এইখানে যদি তুমি দেখা দিলে, আমরা সকলে মিলে বলি, জয় জয় তোমারি জয়। বার বার তোমাকে প্রণাম করি।

রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার।

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

আমাদের শাস্ত্র বলিয়াছেন, পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম ও তপ, পিতাকে প্রীত করিতে পারিলে সর্ব্বদেবতা প্রীত হন। সন্তান মাত্রের কাছে পিতামাতা পরম প্রিয়, তদুপরি আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে সত্যই আমরা দেবচরিত্র পিতামাতা পাইয়াছিলাম। আপনারা পিতৃদেবের শেষ যাত্রার দিন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং আজও আমাদের সঙ্গে একত্র বসিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতির অঞ্জলি দিতে আসিয়াছেন; ইহাতে সেই বিদেহী আত্মার তৃপ্তি হইবে, ইহাই আমাদের আশা। ইহলোকে তাঁহার জন্ম আর কিছুই আমাদের করিবার রহিল না।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীপঞ্চমী অর্থাৎ মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী সরস্বতী-পূজার দিন পিতৃদেবের জন্ম হয়। তাঁহাদের নিবাস ২৪ পরগণা ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী সরিষা গ্রামে। পিতামহদেবের নাম ৺হরকুমার সরকার। শৈশবেই তাঁহাদের পিতৃবিয়োগ হয়, সেজন্য দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই তাঁহাদের মানুষ হইতে হয়। মেধাবী ছাত্র হইলেও জ্যাঠামহাশয় এফ, এ, পাশ করিয়াই চাকুরী লইতে বাধ্য হন, পরে নিজগুণে তিনি উচ্চপদ লাভ করেন। বাবা অতিকষ্টে লেখাপড়া করিতে থাকেন। বই কিনিবার ক্ষমতা ছিল না, সহপাঠীদের পুস্তক চাহিয়া লইয়া খাতায় নকল করিয়া পড়া চালাইতে হইত। যখন নিজে অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার পড়ার খরচ চালাইতে লাগিলেন। আমরণ তিনি দেশে ভ্রাতা ভাগনীর জন্য খরচ পাঠাইয়াছেন, ভাগিনেয় ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের লেখাপড়ার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিনকয়েক পূর্ব্বে এক ভ্রাতুষ্পুত্রের আই, এ, পাস হওয়ার সংবাদে আনন্দিত হইয়া তাহার বি, এ, পড়ার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ঠাকুরমা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, পূজার সময়ে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। ইদানীং শরীর অসুস্থ হওয়ায় যাইতে পারিতেন না।

বাবা ও তাঁহার সেজদাদা পাঠ্যাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেজ জ্যাঠামহাশয় ও তাঁহার পত্নী হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া থাকিলেও, মন্ত্র না লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সাধনা করিতেন। বাবা ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এইখানে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কিছু বলা

দরকার, কারণ তাঁহাকে অনেকেই ভুল বুঝিতেন। তিনি চিরদিন সাম্প্রদায়িকতা এড়াইয়া আসিয়াছেন, কোনও বিশেষ সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিলে এই ধর্ম্মকে ছোট করা হয়, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব ছিল। হিন্দুসমাজের উপর তাঁহার কোনও উপেক্ষার ভাব ছিল না, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মই; হিন্দুর নিরাকার একেশ্বরবাদ, যাহা যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কারের নিম্নে চাপা পড়িয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধারই ব্রাহ্মধর্ম্ম, এইরূপ তাঁহার মত ছিল। ব্রাহ্মসমাজ যে সকল সামাজিক সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল এবং নিজের পরিবারেও সে সকল সংস্কার তিনি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি এমনই মধুর ছিল, যে নিজেকে ব্রাহ্ম বলিয়া হিন্দুদিগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন মনে করিতেন না। সামাজিক উপাসনায় তিনি বড় যোগ দিতেন না, ব্রাহ্মসমাজের মৌখিক ভজন উপাসনার দিকটি তাঁহাকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই মনে হয়। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যই তাঁহার উপাসনা, এই তাঁহার মনের ভাব ছিল। কর্ত্তব্যপরায়ণ তিনি যে কিরূপ ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার লোকের অভাব নাই। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তাঁহার মনে যে গভীর ভগবদ্ভক্তি ছিল, তাঁহার পরিচয় আমরা পাইতাম। নিজেকে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে ভালবাসিতেন, এবং সাধন ভজনে দীন মনে করিতেন, এজন্য প্রকাশ্যভাবে দীক্ষা লন নাই। আমাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ দিনে, বিশেষতঃ সঙ্কট ও পরীক্ষার সময়ে আমাদের লইয়া একান্ত নিভৃতে বসিয়া উপাসনা করিতেন, এবং সেই পূজা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত। রুটিনের মত প্রতিদিন তাঁহাকে বাঁধাবুলি আওড়াইতে দেখিতাম না বলিয়াই, যখন তিনি হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিতেন, তখন তাঁহার প্রতি কথাটি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিত। প্রতিদিন নিয়মিত আসনে না বসিলেও, তিনি যে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে সত্য শিব সুন্দর জ্ঞান-স্বরূপের আভাস উপলব্ধি করিতেন, তাহাতেই তাঁহার পূজার অভাব মিটিত। ব্রাহ্মসমাজের সেবকগণ অনেকে অনেক ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন, বাবা যে আদর্শটুকু নিজের জীবনে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

তাঁহার আকৃতি কি সুন্দর ছিল, আপনারা জানেন। চিরদিনই আমরা তাঁহার রূপ অক্ষুণ্ণ একই রূপ দেখিয়া আসিয়াছি। তীক্ষ্ণ নাসিকা, প্রতিভাদীপ্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, সুঠাম হস্তপদের সুক্ষ্মাগ্র অঙ্গুলী, সমস্তই, আভিজাত্য, শিল্পবোধ ও হৃদয়ের প্রসার, এককথায় Culture এর পরিচয় দিত। সৌজন্যে ও শিষ্টাচারে তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় ছিলেন, এবং যদিও কোনও বিলাসিতা তাঁহার ছিল না, থান ধুতি এবং টুইলের শার্ট এই সামান্য পোষাক, এবং আদালতে যাইবার সময়ে গলাবন্ধ কোট প্যান্ট, কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই পরিস্কার থাকিত। চুলগুলি সর্ব্বদা আঁচড়ানো থাকিত, শরীরের কোথাও এতটুকু অপরিচ্ছন্নতা সহ্য করিতে পারিতেন না। শুনিয়াছি, যখন তিনি আট বৎসরের বালক, তখন তাঁহাদের গ্রামের কেহই তাঁহার মত পরিপাটি করিয়া কালো ফিতা পাড় ধুতি পরিতে পারিত না। মেজের উপর একটুকরা কাগজ পড়িয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেটুকু উঠাইয়া টুকরীতে ফেলিয়া দিতেন। কত সময়ে দেখিয়াছি, আমাদের জুতাগুলি নিজের হাতে গুছাইয়া রাখিতেছেন। এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান তাঁহার সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। বই, খাতা, কাগজ, কলম, চিঠি, পত্র সর্ব্বদা গুছাইয়া রাখিতেন। আমরা কোনও দিন বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত হই নাই, কিন্তু কোনও রূপ কষ্টও কোনও দিন পাই নাই, চিরকাল সহরের বাহিরে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীতে থাকিয়াছি। বাগান ও ফুল তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাগানের তরিতরকারী সামান্য হইলেও প্রতিবেশীকে না দিলে তৃপ্ত হইত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি দেশের রীতিনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। বিজয়ার দিন প্রতিবেশীগণ আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কোলাকুলি ও মিষ্টমুখ করিয়া যাইতেন। মেয়েদের পায়ে আলতা ও সীমন্তে সিন্দুর তিনি অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। যতদিন কর্ম্মস্থলে ছিলেন, আমাদের একটু পর্দ্দার ভিতরেই থাকিতে হইত, কারণ হিন্দু বন্ধুগণের সহিত আমাদের একটা অশোভন অনৈক্য দেখানোর প্রতি তিনি চিরদিনই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। পরে অবসর লইয়া গিরিডি আসার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রয়োজন বোধে এই পর্দ্দার ভাব তুলিয়া দিয়াছিলেন। বাড়ীতে ব্রাহ্মণ পাচক রাখিতেন, বলিতেন, কেহ বাড়ীতে আসিয়া এক গ্লাস জল খাইতে পাইবে না, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। এ সমস্তই তাঁহার অন্তর্নিহিত সুরুচি ও শোভনতা জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী হইলেও মেয়েদের তিনি উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন ও যুবকবৃন্দের সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহাদের মতামত শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন। জ্ঞানমার্গই ছিল বাবার সাধনার পথ। ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত তিন ভাষাতেই তাঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল এবং কাব্য ও সাহিত্যের রসজ্ঞান অতি সূক্ষ্ম ছিল। প্রত্নতত্ত্বেও তাঁহার বিশেষ রূপ অধিকার ছিল। সংস্কৃত ভাল জানিতেন বলিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসা ছিল। এই সকল সূত্রে বহু জ্ঞানী ও কৃতবিদ্য লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। তিনি প্রথম জীবনে স্কুল ও কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। মনে হয়, শিক্ষাবিভাগই তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। সেদিকে থাকিলে লেখাপড়ার দিকে বেশী সময় দিতে পারিতেন ও সম্ভবতঃ স্বাস্থ্য এত শীঘ্র খারাপ হইত

না। সেকালের তাল পাতায় লেখা অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া বাবার হাতের লেখা পাকা ও সুন্দর ছিল। বাংলায় চিঠি লিখিবার সময়ে শুদ্ধ বাংলায় লিখিতেন ও পুরাতন সম্বোধনাদি ব্যবহার করিতেন। বলিয়াছি, সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তাঁহার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃত শ্লোক এখনো কর্ণে ধ্বনিত হয়। মেঘদূতের ইংরাজী অনুবাদ বাঙ্গালীদের মধ্যে বোধ হয় তিনিই প্রথম করেন। কাব্য ভিন্ন বেদ পুরাণাদিতেও তাঁহার অধিকার কম ছিল না। উপনিষদের অমর শ্লোক-সমূহ তিনি অতিশয় অনুরাগের সহিত উচ্চারণ করিতেন, উপাসনায় ও অনুষ্ঠানাদিতে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে ভালবাসিতেন। এলাহাবাদের পাণিনি অফিস হইতে কতকগুলি পুরাণ ইংরাজি ভাষান্তরিত করিবার ভার লইয়াছিলেন, স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে সে কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

আশা মজুমদার।

—•—

বারিপদা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ৬ষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব।

বারিপদা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ৬ষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব গত ২৫শে জুলাই, শনিবার, সায়ংকালে আরাত-যোগে আরম্ভ হয়। ২৬শে জুলাই, রবিবার, দুইবেলাই উপাসনা, কীর্ত্তন ও সঙ্গীত হয়। ২৭শে জুলাই, সোমবার, পূর্ণচন্দ্রপুর পাঠশালার উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ১০টার পর উপাসনা, সংগীত ও সংকীর্ত্তন হয়; "ভগবান্ দীন ভক্তের ভক্তিতে সন্তুষ্ট, তাই রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া, তিনি দীন ভক্ত বিদুরের গৃহে ভাকুর ক্ষুদ গ্রহণ করিয়াছিলেন" আত্মনিবেদনে এটী বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং প্রার্থনা-যোগে ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ এই পাঠশালার স্থাপন ও ও পরিচালনে বিধাতার অসীম করুণার সাক্ষ্য দান করেন। উপাসনার পর প্রায় ৬০জন দরিদ্র বালক, বালিকা ও বয়স্থ ব্যক্তি আনন্দে প্রীতিভোজন করে। এই দিন সন্ধ্যার পর বড়বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দত্তের বাটীতে সংকীর্ত্তন, প্রার্থনা ও পাঠ যোগে প্রচার হয়; গৃহস্থ অতি সমাদরে যাত্রীদিগকে গ্রহণ ও নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। ২৮শে মঙ্গলবার, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও কীর্ত্তন ভক্তিভাবে সম্পন্ন হয়। অদ্যই সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হয়। এ সেবক একটী প্রার্থনা করিলে, "কি সুখে জীবন ভার, বহিবে বল আর, যদি বাসনানলে সদা জ্বলে প্রাণ।" এই সংকীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে মিউনিসিপ্যাল বাজারের সম্মুখে যাইয়া বক্তৃতা হয়। "অন্তরে ব্রহ্মশক্তি, বাহিরে সংসারের বিবিধ অশান্তি, ব্রহ্মবিশ্বাসী যাঁরা, তাঁরা জীবনে শান্তি পান" এবিষয়ে প্রায় ১৫মিনিট কাল বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। তৎপরে তদুপযোগী একটী উড়িয়া সংগীত সুগায়ক গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডার দ্বারা গীত হয়। ঐ সংগীতান্তে আর একটী সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রাজবাড়ী, ধর্ম্মশালা ও হাসপাতালের সম্মুখ দিয়া প্রায় ১০॥টার সময় কীর্ত্তনের দল "বিনয়কুটীরে" আসেন ও তথায় কিছুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে সংকীর্ত্তন শেষ হয়, তৎপর একত্রে প্রীতিভোজন হয়। ২৯শে জুলাই, প্রাতে ৯টায় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়া শান্তিবাচন হয়।

বালেশ্বর হইতে সুগায়ক গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা, বাদক মধুসূদন প্রভৃতি প্রায় ১৬জন ২৫শে জুলাই বারিপদার উৎসবে আসেন। ২৬শে জুলাই, বৃদ্ধ সাধক শ্রদ্ধেয় ভগবান্‌চন্দ্র দাস পুত্র সহ বালেশ্বর হইতে বারিপদায় আগমন করেন। স্বর্গীয় ভক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক উৎসব জন্য এদাসকে ২৩শে জুলাই তারিখেই বারিপদা যাইতে হয়। উড়িষ্যাকে ভক্ত নন্দলাল প্রচার-ক্ষেত্র করিয়া উড়িষ্যাতেই পার্থিব দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ পিতৃদেবের পদানুসরণে উড়িষ্যাতে অদম্য উৎসাহে বিধান-প্রচারের কার্য্য করিতেছেন। ভক্তকন্যা ময়ূরভঞ্জের শ্রদ্ধেয়া মহারাণী সুচারু দেবীর মনের সাধ এবার পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ দেখিলাম। এবার ময়ূরভঞ্জ নগরের মধ্যস্থলে বারিপদা ব্রহ্মমন্দিরের শিরোদেশে ধাতুনির্ম্মিত নববিধান-পতাকা দিন রাত্রি উড়িয়া উড়িয়া বিশ্বরাজের অপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। ভক্তকন্যা চেয়েছিলেন, "দেশ কাঁপাইয়া হরিনামের জয়ধ্বনি যেন উঠে," এবার তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। উৎসবের আরম্ভাবধি প্রতিদিন প্রাতে হরিনামের জয়ধ্বনি নগরের পল্লীতে পল্লীতে ঘোষিত হইয়াছে। এবারকার সংকীর্ত্তন, উপাসনা, উপদেশ ও কাতর প্রার্থনার ভিতর দিয়া আত্মদৃষ্টি, অনুতাপ, অকিঞ্চনা ভক্তির ভাব, ব্রহ্মানুভূতি বিশেষভাবে সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। পুরনারীগণও সকলের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ধন্য মা বিধান-জননী।

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—

সংবাদ।

নামকরণ—গত ২৮শে আগষ্ট, মঙ্গলপাড়ায়, স্বর্গগত ভাই উমানাথ গুপ্তের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গগত সত্যশরণ গুপ্তের দৌহিত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার রায়ের একবৎসরবয়স্ক শিশুপুত্রের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন ও শিশুকে "সুশান্তকুমার" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ৩২শে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট, ৫নং টাউনসেণ্ড রোডস্থ ভবনে স্বর্গীয় রাজকুমার চন্দরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রভাতকুমারের সহিত শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর সরকারের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বেলার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট, কলিকাতায় ১নং হ্যারিংটন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, ময়ূরভঞ্জের দেওয়ান শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেনের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুশান্তকুমারের সহিত অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নীতার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু এই শুভবিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

ভগবান্ এই নব দম্পতিযুগলকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

পরীক্ষায় সফলতা—আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের কন্যা শ্রীমতী মণিকা দেবী ও ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সুজিতকুমার মহলানবিশ গত বি, এস্, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষার পূর্ব্বেই শ্রীমান্ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং সে অবস্থায় যে পরীক্ষা দিতে পারিবেন, কেহ আশা করে নাই। তাঁহার সাফল্যে আমরা পিতামাতার সহিত ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। এবার বাগনান-নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর পুত্র শ্রীমান্ বিধানজ্যোতি বসুও কৃতিত্বের সহিত বি, এস্, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিধাতা পরীক্ষোত্তীর্ণ সন্তানদিগকে উচ্চতর জীবনের পরীক্ষায় সাফল্য-দানে কৃতার্থ করুন।

কোচবিহার সংবাদ—কোচবিহার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সাম্বৎসরিক উৎসব, গত ১৫ই আগষ্ট, দুইবেলা উপাসনা, পাঠ আলোচনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন যোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৬ই আগষ্ট, অপরাহ্ণ ৫৷০টায় "ব্রাহ্মসমাজের শতবর্ষের দান" বিষয়ে বক্তৃতা ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। ১৭ই প্রাতে কেশবাশ্রমস্থ সমাধি-প্রান্তে উপাসনা হয়। ভ্রাতা মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপাসনাদি করেন।

স্মৃতিসভা—গত ১৫ই আগষ্ট, সন্ধ্যার সময় শিলচর ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গগত প্রেরিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে স্মৃতি-সভায় খান সাহেব রাসিদ আলী লস্কর বি, এ, (ভূতপূর্ব্ব এম্, এল্, সি,) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান সভাতে যোগদান করেন। স্বর্গগত প্রেরিত ভাইএর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন খুল্লতাত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী (Incometax Officer) এবং সভাপতি মহাশয় হিন্দু মুসলমানের সম্মেলন সমস্যা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন এবং তাঁহারা মনে করেন, মৌলানা গিরিশচন্দ্রের রচিত ইসলামধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুস্তকগুলি উভয় সমাজের শিক্ষিত লোক পাঠ করিলে অনেক মনোমালিন্য দূরীভূত হইবে।

ঐ দিনে নদীয়া জেলার অন্তর্গত গাঁড়াডোবেও, ইসলাম প্রচারক সেখ জমিরুদ্দিন সাহেবের উদ্যোগে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ঐ দিনে কলিকাতায় ব্রহ্মমন্দিরে যে স্মৃতিসভা হয়, তাহাতে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং ইসলাম-প্রচারক মৌলবী আবদুল আজিজ (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) বক্তৃতা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩২শে শ্রাবণ, সোমবার, ৯।৩নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্তা মাধব বসুর গৃহে, তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় মন্মথনাথ বসুর প্রথম সাম্বৎসরিক পরলোকগমন স্মরণে বিশেষ উপাসনা সেবিকা হেমলতা চন্দ সম্পন্ন করেন। মাতৃদেবী প্রার্থনা করেন। বিধান-জননী পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন এবং তাঁহার প্রিয় পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

গত ৭ই ভাদ্র, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক দিনে, নববিধানে দৃঢ়বিশ্বাসী স্বর্গীয় রমণীকান্ত চন্দের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপসনায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ স্বর্গগত পবিত্র আত্মার জন্য বিশেষ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্ম্মিণী সেবিকা হেমলতা চন্দ ভাদ্রোৎসবে ২৲, প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ ও দরিদ্র-দিগকে কিছু পয়সা দান করেন।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দাতা-দিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, মজফরপুর ৬ , শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদ্ভান ২৫৲, মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী তিনমাসের দান ৩০৲, শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র দাস, কটক ৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্ত বালা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের স্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্তের পত্নী শ্রীমতী লীলা দেবী মাতৃদেবীর আদ্য-শ্রাদ্ধে ১০৲ ও মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিকে ৫৲, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রের শুভবিবাহে ২৫৲, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার মাতৃ-দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে ৫৲ ও মাতৃদেবীর জন্য বিশেষ উপাসনায় ২৲, শ্রীমতী সুষমা বাগচি মাতামহীর আদ্যশ্রাদ্ধে ২৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী মাসিকদান ১৫৲, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন স্বামীর সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের আদ্য শ্রাদ্ধে পুত্রকন্যাগণ ২০৲ টাকা।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৮ই ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
18th September, 1931.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা রাজরাজেশ্বরী, তুমি তোমার স্বর্গরাজ্য ধরায় স্থাপনের জন্যই নববিধানে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমিই আমাদিগকে তোমার বিধান-প্রবর্ত্তকের সঙ্গে মিলাইয়া তোমার সেনারূপে স্বয়ং নিযুক্ত করিয়াছ। আমাদের নেতার সহিত সমযোগে তোমারই প্রত্যক্ষ আদেশে আমরা তোমার কার্য্য করিব, তোমার রাজ্য বিস্তার করিব। তুমিই আমাদের একমাত্র আদেশকর্ত্তা, আমরা ত কোন মানুষের মতে বা নিজের বুদ্ধি বিচারের মতে চলিতে আসি নাই। আমাদের বুদ্ধির অহং তুমি বিনাশ কর। মানুষের মন যোগানর দুর্ব্বলতাও তুমি দূর কর। আমাদের সকল প্রকার ভীরুতা, কাপুরুষতা, সাংসারিকতা বিনাশ করিয়া, আমাদিগকে প্রকৃত বিশ্বাসে বলীয়ান্ কর। আমরা যেন তোমারই হুকুমে চলি, তোমারই হুকুমে বলি, তোমারই হুকুমে কাজ করি। পৃথিবীর আক্রমণে ভীত হইয়া আমরা সত্যকে খর্ব্ব করিব না। আমাদিগকে তুমি যে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিয়াছ, আমরা নির্ভীকচিত্তে তাহাই করিব। নববিধান পূর্ণভাবে যাহাতে জয়যুক্ত হয়, তাহাই করিব। আমরা পৃথিবীর সঙ্গে রফা করিব না, অধর্ম্ম উপধর্ম্মের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিব না। মরিতে বল মরিব, যখন দাসখতে নাম লিখাইয়া লইয়াছ, তখন আর ভয় করিব কেন? সত্যের জয় হইবেই হইবে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন সর্ব্বান্তঃকরণে তোমারই চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃত মুক্তির পথ।

এই মানব-জাতি কতই জাতিতে বিভক্ত। হিন্দু জাতি, মুসলমান জাতি, খৃষ্টান জাতি, ইহুদী জাতি, বৌদ্ধ জাতি; এক এক ধর্ম্মাবলম্বনে এক একটি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। আবার এই এক এক জাতির ভিতর কতই শাখা প্রশাখা, কতই মত, কতই ভাব, কতই সম্প্রদায়।

নানা মুনির নানা মত। প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে কত জনে কত মত, কত প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-সাধনে নিরত রহিয়াছেন। কেহ কাহারও মত একটুও খর্ব্ব করিতে চান না; একটু এদিক ওদিক করিলেই যে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে দৃঢ় নিষ্ঠার

সহিত তাহার অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু এই সকলেরই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, এক ঈশ্বর-লাভ বা মুক্তিলাভ ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই।

সকলেই স্বীকার করেন, ঈশ্বর এক, মুক্তির পথ এক। যদি ঈশ্বর এক হন, যদি সবার গম্যস্থান এক হয়, অবশ্যই মিলন-স্থানও এক হইবে। সুতরাং এই যে বিভিন্নতা বা স্বতন্ত্রতা, তাহা সাময়িক বা মানবীয় ভিন্ন আর কি?

বাস্তবিক ধর্ম্মসাধন করিতে এক এক জন বা এক এক সম্প্রদায় যে মত বা পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা বা অধিকার অনুসারেই করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদিগের সাময়িক উপায় মাত্র, কখনই চরম লক্ষ্য নহে।

সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, চরম লক্ষ্য লাভ করিতে হইলে, ক্রমে ধর্ম্ম-সোপানে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে কেমন করিয়া আমরা আমাদের বর্ত্তমান সাধন ভজনের বন্ধনে চির নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি? যদি আমরা মুক্তি চাই, আমরা কোন কিছুর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না।

মুক্তির অর্থ বন্ধন-মোচন। পাপের বন্ধন, মায়ার বন্ধন যেমন, কামনা বাসনার বন্ধনও তেমনি। আবার সংসারের বন্ধন, জড়ের বন্ধন, বিষয়ের বন্ধন যেমন, সংস্কারের বন্ধন, কায়িক মায়িক পূজা ব্রতাদির বন্ধনও কি তেমনি আমাদিগের প্রকৃত মুক্তির অন্তরায় নয়?

যদি বাস্তবিক আমরা ঈশ্বরকে চাই, কোন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে নিশ্চয় আমাদিগের চলিবে না। ঈশ্বর যখন অনন্ত, তখন আমাদিগকে সকল প্রকার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে হইবে। তাই মুক্তি-পিপাসু সাধকগণ এক সাধন হইতে অন্য সাধনে, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে, উন্নত অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় উন্নীত হইতে আকাঙ্ক্ষিত হন। ইহারই নাম মুক্তি। তাহা হইলে কখনই আমরা মতে, সমাজে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারি না। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ যেমন অনন্ত, ধর্ম্মেরও অভিব্যক্তি তেমনি অনন্ত।

মানব-জাতির পূর্ব্ব ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায়, আমাদের আর্য্য ঋষিগণও এক সাধন হইতে উচ্চতর ধর্ম্ম-সাধনের স্তরে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বেদ হইতে বেদান্তে, আবার বেদান্ত হইতে যোগাভূত যোগধর্ম্ম-সাধনে যে সমুন্নত হইয়াছিলেন, ইহা ক্রমোন্নতি ভিন্ন আর কি?

আবার যখন সাধারণ সকলকার পক্ষে সে উচ্চ পথ মৌখিক ধর্ম্মে পরিণত হইল, অমনি শ্রীবুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ব ধর্ম্ম-সংস্কার উচ্ছেদ করিলেন, এবং এক নূতন মুক্তির পথ বা নির্ব্বাণের পথ দেখাইলেন।

কালে সে ধর্ম্মও মতে শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইল, বুদ্ধের উচ্চনীতি কেবল কথার কথা হইল, নিরীশ্বরবাদ, জড়বাদ ধর্ম্মের প্রভাব মলিন করিল। তখন আবার পৌরাণিক ভক্তির ধর্ম্ম এবং নিষ্কাম যোগধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের বিধান প্রচারিত হইল।

এই রূপে ভারতে যেমন, পাশ্চাত্য জগতেও অগ্নি-পূজার ধর্ম্ম হইতে ইহুদীয় অধ্যাত্ম ধর্ম্ম, তাহার পর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ত্রৈনীতিক বিধান, তাহার পর মহম্মদীয় একেশ্বরীয় ধর্ম্ম, এক এক করিয়া অভিব্যক্ত হইল। ক্রমে পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলন বা সংঘর্ষে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টাতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, বা আকবরের সমন্বয়-ধর্ম্ম আবির্ভূত হইল।

তাহার পর ভারতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব-বিস্তারে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব উদ্দীপ্ত হইল। প্রাচীন ধর্ম্ম সকলের ভিতর আবার অনুষ্ঠান ও মতগত আবদ্ধ ভাব যাহা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ধর্ম্ম-বিধানকে মুক্ত করিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধানের বীজ রোপিত হইল। ক্রমে তাহা অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পূর্ণ মানব-ধর্ম্মরূপে বিকশিত হইল।

ইহাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধান নামে অভিহিত। ইহাতে সকল সত্য, সকল প্রেম, সকল পুণ্য নিহিত। সকল ধর্ম্মের সকল সাধন, সকল শাস্ত্রের সকল তত্ত্ব, সকল বিধানের সকল ভক্ত ইহাতে সমন্বিত এবং আদৃত। কোন মতে বা সম্প্রদায়ে এই নববিধান নিবদ্ধ নহে, পূর্ণ মুক্তি ইহার লক্ষ্য, একমাত্র ঈশ্বর ইহার উপাস্য, উদ্দেশ্য, নেতা, নিয়ন্তা এবং গুরু। সকল সাধু ভক্ত মহাপুরুষগণের জীবনাদর্শ ইহার সাধন।

ঋষিদিগের যোগ, শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ, শ্রীমুষার ব্রহ্মবিশ্বাস, শ্রীঈশার আত্মদান, শ্রীচৈতন্যের প্রেমোন্মত্ততা, শ্রীসক্রেটিশের আত্মজ্ঞান, শ্রীমহম্মদের ব্রহ্মনিষ্ঠা,

শ্রীহাওয়ার্ডের সেবা, শ্রীজনকের গৃহ-বৈরাগ্য, সকলই এক অখণ্ড জীবনাদর্শে সমন্বিতভাবে গ্রহণ ইহার জীবন।

এই সাধনে সিদ্ধি দান করিয়া বিধাতা শ্রীব্রহ্মানন্দের জীবনে নববিধান মূর্ত্তিমান করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার সহিত সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী হইয়া, ব্রহ্মারাধনা ও প্রার্থনা-যোগে এবং ব্রহ্মকৃপাবলে নববিধানের জীবন লাভ করিব, ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়। ঈশ্বরের পবিত্রাত্মাই আমাদিগের পরিচালক ও গুরু, কোন মানুষ নববিধানের গুরু নয়। এ বিধানে আমরা আমাদের নিজের বুদ্ধি বিচারের মতেও চলিতে পারি না। ঈশ্বরের আলোকই আমাদের পথ প্রদর্শক।

অতএব যদি যথার্থ আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে চাই, যদি পূর্ণ মুক্তিলাভে আকাঙ্ক্ষিত হই, তবে আমরা যেন একমাত্র পবিত্রাত্মার শরণাপন্ন হই। ইহাও জীবনের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, সরল ব্যাকুল অন্তরে যথার্থ মুক্তি-প্রার্থী বা পরিত্রাণার্থী হইলে, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের মন জানিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন দান করেন এবং আমাদের সকল প্রকার বন্ধন—কি মতের, কি দলের, কি সংস্কারের, কি মনঃকল্পিত ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি দান করেন এবং তাঁহার উদার অনন্ত প্রেমের বিধানে আশ্রয় দান করেন। মার নিকট শিশু কাঁদিলে মা কখনই থাকিতে পারেন না।

অন্ধকার ও আবদ্ধ গৃহে যত রোগের উৎপত্তি হয়, সূর্য্যালোক ও মুক্ত আকাশের বায়ুতে সে সমুদয় রোগ বিদূরিত হইয়া যে নবজীবন লাভ হইয়া থাকে, ইহা বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন। তেমনি কুসংস্কার, অজ্ঞান অন্ধকার ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ধর্ম্মের পেষণে মানব-জাতির মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হইতেছে; তাই বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৃপায় বর্ত্তমান যুগে নববিধানের নবসূর্য্য উদিত হইয়াছে, নবালোক প্রকাশিত হইয়াছে, এবং উদার অনন্ত ধর্ম্ম-সাগরের মুক্ত সমীরণ অবাধে প্রবাহিত হইতেছে, যাহার প্রভাবে নিশ্চয়ই নবজীবন লাভ হইবে।

এস সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মার্থী ও মুক্তি-পিপাসু ভাই ভগ্নী, এস অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, ভগ্ন, পাপী তাপী, জগদ্বাসী সকলে, এস, নববিধানের এই মুক্ত সমীরণ সম্ভোগ করিয়া চির মুক্তিলাভে ধন্য হই এবং ব্রহ্মানন্দ-জীবন প্রাপ্ত হই।

সাবধান, এখানে আসিয়াও যদি আবার আমরা বুদ্ধি বিচারের বা মতের গণ্ডীতে আবদ্ধ হই, ঈশ্বরের আলোক এবং প্রত্যাদেশের সমীরণ অবাধে প্রবহমান হইতে না দিই, তবে এখানেও আমরা সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকূপ খনন করিয়া মরিব, নববিধানের নব নব উন্নতি ও নব নব জীবন লাভে বঞ্চিত হইব।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিদানের জন্য বিধাতা যখন এই নববিধান আনয়ন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি, তিনিই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় কৃপাগুণে বিশ্বজনকে এই বিধানের আশ্রয়ে সম্মিলিত করিয়া পূর্ণ মুক্তি দান করুন এবং নব নব জীবন সম্ভোগে সক্ষম করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধান পালন করিতে আমাদের কি চাই ?

আচার্য্য বলিলেন, "সক্রেতের নীতি, বুদ্ধের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম, আর নববিধানের গুরু-লাভ অর্থাৎ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।" "এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধি পালন করিয়া, ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি।"

রিপু-জয়ের উপায়।

সয়তান বা দুর্ব্বুদ্ধির সহিত তর্ক করিতে যাইও না, কিম্বা তাহার প্রতি দয়ার্দ্রও হইও না। ইভ্ তর্ক করিতে গিয়া তাঁহার পতন হইয়াছিল, সীতা দয়া করিতে গিয়া রাবণের আক্রমণে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশা সয়তানকে 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবও মারকে তেমনি জব্দ করিয়াছিলেন, শিবও তীব্র কটাক্ষের আঘাতে মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন। দুষ্প্রবৃত্তি, দুষ্টবুদ্ধি, দুরভিসন্ধি ও পাপ-বিনাশের ইহাই অস্ত্র। তাহাদের প্রলোভনে কাণ দিবে না, কিন্তু 'দূর হ সয়তান' বলিয়া দূর করিয়া দিবে।

শব্দার্থ-বোধ।

আমাদের শিক্ষা যেমন, সাধন যেমন, তেমনি আমাদের শব্দার্থ-বোধ হয়। আবার যত আমরা শিক্ষা বা সাধনে উন্নত হই, ততই এক এক শব্দের অর্থ বা ভাব গভীর হইতে গভীরতর রূপে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমাদিগের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার

আমাদিগের নিকট ভাবে গদ গদ হইয়া গান করেন, "যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে"। গানটী শুনিয়া বড়ই মোহিত হইলাম। তাই গানটী লিখিয়া ব্রহ্মসঙ্গীতে ছাপাইয়া দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখন ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া "আদরিণী শ্যামা মাকে" পাঠ পৌত্তলিকতা-প্রতিপাদক বোধে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া "দয়াময়ী জননীকে" করিয়া দিলাম। এখনও ব্রহ্মসঙ্গীতে সেই পাঠই আছে। কিন্তু যখন পুত্র-শোকের ঘন আঁধারে মা তাঁর কালো রূপে বা শ্যামারূপে দেখা দিলেন, যখন অন্ধকারের মাণিক দেখাইলেন, তখন আর তাঁকে "শ্যামা মা" ব'লতে বাধা রহিল না, "শ্যামা মা" শব্দের নূতন অর্থ তখন বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। ক্রমে যত অনন্তের অন্ধকারের ভিতর ডুবিতে শিখিলাম, তখন মার কালো রূপই যে ভাল রূপ, নিরাকাররূপই যে ঘন অন্ধকার, স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইল। তখন "শ্যামা মা" শব্দ আর পৌত্তলিকতা-বোধক কেমন করিয়া থাকিবে? তাই গানের বইতে "দয়াময়ী জননীকে" থাকিলেও, এখন "আদরিণী শ্যামা মাকে" বলিয়া গান গাহিলেই অধিক ভক্তির উচ্ছ্বাস হয় ও তাহাতে কিছুই দ্বিধা বোধ হয় না।

পরলোক ইহলোকের বিবর্ত্তন বা EVOLUTION

(ভাদ্রোৎসবে, ৬ই ভাদ্র, দিনব্যাপী উৎসব দিনে প্রাতঃকালীন উপাসনায় বিবৃত)

এখন নূতন ভাবের উদ্বোধনে দেশের বায়ু স্পন্দিত, এখন নূতন আশার শঙ্খনাদে জাতির কর্ণ পূর্ণ, অন্য শব্দ ধারণ করিবার স্থান নাই। দেশের প্রবল ঝটিকা ব্রহ্মমন্দিরের বায়ুকেও স্পর্শ করিয়াছে। আমরা প্রবল বাত্যার বাহিরে আর একটী চিত্র দেখিতেছি। সেটী প্রাচীন চিত্র, সেটী পুরাতন কথা—যাহা যুগে যুগে মানব-প্রাণকে উদ্বেলিত করিয়াছে—যাহা মানব-মনকে বংশ-পরম্পরায় উদ্‌ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত করিয়াছে, আমরা তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছি। সে পুরাতন কথা কি? সেটী মৃত্যু। সেই মৃত্যুই বার বার আমাদের সকল ঘরে হানা দিয়াছে—পৃথিবীর সার-রত্ন সাধু মহাজনদিগকে পৃথিবীর বক্ষ শূন্য করিয়া কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, পতিপ্রাণা সতীর স্বামী ও পুত্র-বৎসলা মাতার পুত্রকে শ্মশানের আগুনে দগ্ধ করিয়াছে; যাহার যাহা প্রিয় ছিল, তাহাকে ভাঙ্গিয়া, চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিয়াছে। আজ যুগযুগান্তরের বুকভরা আর্ত্তনাদ, আকাশ ভরা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, তোমার আমার বুকে আসিয়াও আঘাত করিতেছে—আমাদের ক্ষীণ প্রাণটুকুর শেষ রক্ত-বিন্দুটী পর্য্যন্ত শুষ্ক করিতেছে—আজ সে আঘাতে আমাদের দেহ শীর্ণ ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

মৃত্যুর পরের কথা কি? পৃথিবী পরিষ্কার করিয়া তাহার সন্ধান দান করিতে পারে নাই পরলোকের উজ্জ্বল তৈল-চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানুষ মানুষকে দেখাইতে পারে নাই; কবির কল্পনাও শোকার্ত্তের প্রাণে সান্ত্বনা আনিতে পারে নাই। যাহা পৃথিবীর নিকট অসাধ্য, তাহা তোমার আমার নিকটে কিরূপে সুসাধ্য হইবে? আমরা বিশ্বাসের পথে বিচরণ করি, আমরা পৃথিবীর ধূলি কুড়াইয়া লইয়া সোনার হার নির্ম্মাণ করি। ধূলির ভিতরে আমরা যোগের স্বর্ণ-প্রতিমা খুঁজিয়া পাইয়াছি—মরধামের ভিতর অমৃতের বিন্দু লাভ করিয়াছি। ইহলোকের ভিতর একই প্রাণের ধারা, যুগযুগান্তরের সাধনার ভিতর নব নব জগৎ উৎপন্ন করিতেছে। একটী জগৎ হইতে আর একটী সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ একটীর সহিত আর একটী অবিচ্ছিন্ন যোগে নিবদ্ধ, একটী আর একটীর পূর্ণতা বা বিকাশ, বা Evolution। এ যোগ চর্ম্মচক্ষের অতীত, ইহা অনুভূতির বিষয়। ইহ জগতেরও সকল বস্তু আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না, অনেক বস্তু আমরা অনুভূতির চক্ষে দর্শন করি। আমরা বায়ুমণ্ডলে বাস করি, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি, বায়ুকে প্রাণ বলিয়া স্বীকার করি; সেই বায়ু কি আমাদের দর্শনের বিষয়? না, আমরা শরীরে তাহা অনুভব করি। যে সুখ সুখ বলিয়া মানুষ দিবানিশি ব্যস্ত হয়, তাহা কি মানুষ চক্ষে দর্শন করে? না, তাহা মনের অনুভূতির বিষয়। পরলোকও আমাদের অনুভূতির বিষয়। অনুভূতির দর্শনও সত্য দর্শন। যে অনুভূতির যোগে আমরা বাহ্য বস্তু দর্শন ও বাহ্য সত্তার উপলব্ধি করি, সেই অনুভূতির দ্বারা আমরা পরলোকের আভাস প্রাপ্ত হই। সৃষ্টি-তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট কিরূপে পরলোক-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইল, তাহাই আমাদিগের অদ্য আলোচনার বিষয়।

মানুষ ভগবানের সৃষ্টিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। একটীর নাম সংসার, অপরটীর নাম; একটীর নাম পৃথিবী, অন্যটীর নাম স্বর্গ; একটী অনিত্য, অপরটী নিত্য। নদ, নদী, সাগর, পাহাড়, আকাশ, বাতাস চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী সকলই জড়, এবং মন বুদ্ধি আত্মা ও তৎসম্পর্কিত ভাবং শক্তিই চৈতন্য জগতের অন্তর্গত। শ্রীভগবান স্বয়ং চিৎস্বরূপ। তিনি পূর্ণ শক্তি, শাশ্বত, সনাতন ও সর্ব্বাতীত। এই জড় পৃথিবী অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। শ্রীভগবানের চৈতন্য স্বরূপ ও নিত্য স্বভাবের সহিত পৃথিবীর চিরচঞ্চল গুণ ও স্বভাবের সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। যাঁহারা পণ্ডিত—যাঁহারা পৃথিবীর অভ্যন্তর ভেদ করিয়া নানা গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন—যাঁহারা জ্ঞানের উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করিলেন—তাঁহারাও জ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। একটীর নাম জড়-বিজ্ঞান, অপরটীর নাম অধ্যাত্ম বিজ্ঞান প্রদান করিলেন। তাঁহারা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে, জড়বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই। দুইটীই স্বতন্ত্র

দুইটীই পৃথক বস্তু। আমরা জ্ঞানী নহি, আমরা বিজ্ঞানবিদ্‌ও নহি, আমরা বিশ্বাসী। "We walk by faith not by sight." আমরা বিশ্বাসে জীবন ধারণ করি। শরীরের যেমন চক্ষু আছে, আত্মার চক্ষু সেইরূপ বিশ্বাস। শ্রীকেশবচন্দ্র বলেন যে, "Faith is direct vision. It beholdeth God and it beholdeth immortality." বিশ্বাস সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বর ও পরলোক দর্শন করে। বিশ্বাস যেমন ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেইরূপ অনেক গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের জটিল প্রশ্নেরও সমাধান করে। ঈশ্বরের বাণী আমাদের পথ-প্রদর্শক—তাঁহার আলোক পাইয়া আমরা বস্তুতত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা করি। সৃষ্টি এক অবিভক্ত যোগ, এক অখণ্ড পরিবার। ইহা যোগ-রাজ্যের অভ্রান্ত সত্য, ইহা যোগ-রাজ্যের অপ্রতিহত বিধান। যোগের প্রাণ চিৎ; অতএব চিৎই সৃষ্টির মূল, অথবা সৃষ্টিই চিন্ময়ের অভিব্যক্তি। আমরা বিশ্বাসের ভিতর দিয়া এই চিন্ময় দৃষ্টি লাভ করিলাম। বিশ্বাস আমাদিগের অভ্রান্ত দর্শন। দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ নাই, দুইই এক, ভেদ কেবল প্রণালীর; দুইটীই জ্ঞানোপার্জ্জনের বিভিন্ন পন্থা। কিন্তু মানুষ চিরদিন জড়ের সহিত অজড়ের যে ভেদ-রেখা টানিয়া আসিয়াছে, যুগযুগান্তরের প্রচলিত সংস্কারের সহিত মনের গতি যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, আজ কি তোমার আমার কথায় সে সংস্কার ত্যাগ করিয়া, পৃথিবী চিন্ময়ের অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে অগ্রসর হইবে?

পৃথিবী বলিবে, ব্রহ্মাণ্ড চিন্ময়ের অভিব্যক্তি, একথা ধর্ম্মাভিমানী লোকদিগের মস্তিষ্ক-বিকার। বিশ্বাসের কথা পৃথিবীর ভাষায় উচ্চারণ না করিলে মানুষ বুঝিবে কিরূপে? তাই ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন পৃথিবীকে, হে পৃথিবী, তুমিও শ্রীভগবান্‌কে চিরদিনই নিত্য চৈতন্য, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বগত বলিয়া স্বীকার করিয়াছ; এবং এই আকাশ বাতাস চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি তাবৎ পদার্থই তাঁহার সৃষ্টি বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই যে নিত্য চৈতন্য, পূর্ণ প্রাণময় পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতে অচৈতন্য অসাড় জড় জগতের উৎপত্তি হইল কি প্রকারে? নিত্য চিন্ময় সত্তা হইতে চৈতন্য ও পূর্ণ প্রাণময় সত্তা হইতে প্রাণের উৎপত্তি হওয়াই স্বতঃসিদ্ধ সত্য; কিন্তু অজড় হইতে জড়ের সৃষ্টি ও অমৃত হইতে মৃত্যুর সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইল? এই সৃষ্ট বস্তু সকলের সত্তা পূর্ব্বে ছিল না। ইহারা সূক্ষ্ম কারণ রূপে বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারূপে ব্রহ্মবক্ষে লুক্কায়িত ছিল, সেই সম্ভাবনা হইতে এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হইল। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইল। অভিব্যক্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণে বিলীন ভাবে স্থিতি করিত। আর একটী কথা এই যে, কার্য্যের আত্মভূত কারণ, সুতরাং কারণ ও কার্য্যের অভিন্নত্ব বশতঃ কারণের অনুরূপ কার্য্যেরই উৎপত্তি হইবে। তাহা হইলে চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মই হইতে চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ স্বতঃসিদ্ধ।

এক্ষণে পৃথিবীর সংস্কার অনুসারে আমরা যদি মানিয়া লই যে, পৃথিবী জড় ও অচৈতন্য, তাহা হইলে এই জড় পৃথিবী চিন্ময়ের বক্ষঃ-সম্ভূত অথবা চৈতন্য হইতে প্রসূত, ইহাও স্বীকার করিতে হয়; অতএব কারণ ও কার্য্যের অভিন্নত্ব স্বীকার করিলে অজড় হইতে কখন জড়ের উৎপত্তি হইতে পারে না। অথবা আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ শক্তিমান্ ঈশ্বরের মধ্যে জড়েরও অংশ আছে, নতুবা সৃষ্টির একাঙ্গ অজড় ও অপরাঙ্গ জড় হইল কিরূপে? কিন্তু নিত্য চৈতন্য শ্রীভগবানের ভিতর জড়ের অংশ আছে স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের নিত্য চৈতন্য সত্তার বিলোপ হয়, এবং পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইবেন। অতএব এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ মতের কিরূপে নিরাকরণ হইতে পারে, তাহাই আমাদিগের আলোচনার বিষয়।

ভৌতিক জগতের মূল পরমাণু, অথবা বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে Atom কিম্বা Atom এর অতিসূক্ষ্ম চর্ম্মচক্ষের অগোচর অংশ Electron। এই অণু পরমাণু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এখন যদি আমরা পরমাণুর গুণ অথবা স্বরূপ বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে তাহার গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিতে পারি। যে সকল বস্তুর গতি নাই, স্থিতি-স্থাপক, প্রাণহীন, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কোন আকর্ষণ নাই, প্রেম নাই, ভিতরে কোন সৃষ্টি-শক্তি (Creative force) নাই, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ জড় নামে অভিহিত করিয়া থাকি; আর যে সকল বস্তুর প্রাণ আছে, গতি আছে, পারস্পরিক আকর্ষণ আছে, আত্মরক্ষার (Self-preservation) প্রবৃত্তি আছে, আসঙ্গ-লিপ্সা আছে ও সৃষ্টি-শক্তি (Creative force) আছে, তাহাকেই সাধারণতঃ আমরা অজড় বা সজীব পদার্থ বলিয়া থাকি। এখন পরমাণু জড় কি অজড়, তাহার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে কিঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে। সমুদ্র-গর্ভে যদি একটী অণু কোন নিভৃতস্থানে গিয়া স্থিতি করে এবং ৫০০ বৎসর পরে যদি আর একটী তাহার স্বজাতীয় অণু সমুদ্র-স্রোতে ভাসিতে থাকে, তবে সেই ভাসমান অণু তাহার সেই স্বজাতীয় অণুকে পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে; এবং প্রকৃতির অপ্রতিহত বিধান অনুসারে দুটী যখন মিলিত হয়, তখন তাহারা একটী আর একটীকে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে যে, সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ অথবা প্রবল স্রোত কিছুতেই তাহাদের মিলনের বিলাসকে বিনষ্ট করিতে পারে না, কিছুতেই তাহাদের যোগের গতিকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। এই রূপে অসংখ্য অসংখ্য অণুর সংযোগে একটি দ্বীপ, একটি পাহাড় বা একটি দেশ সৃষ্ট হয়। গভীর ভাবে অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অণুর মধ্যে একটী প্রবল আকর্ষণ আছে—আসঙ্গ-লিপ্সা আছে—গতি আছে—আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি আছে—স্বজাতি-বাৎসল্য আছে—সৃষ্টি-শক্তি (Creative force)

আছে ও প্রাণের লক্ষণ আছে। একটি ক্ষুদ্র অণুকে কে প্রাণের স্পর্শ দিল? কে স্বজাতি-বাৎসল্য দিল? কে মৃত্যুর অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিল? যে অণু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাতিশয় হইয়া চর্ম্ম-চক্ষের অগোচর হইতেছে, সেই অণুই হিমালয়ের বিশাল বপু গঠন করিয়া তাহার অক্ষয় ও অমর রূপকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে। নিরাকার একবার সাকার হইতেছে, সাকার আবার নিরাকার হইতেছে। আমরা দিব্য দৃষ্টি যোগে যখন দর্শন করি, তখন সকলের মধ্যেই প্রাণের পরিচয় পাই, পৃথিবী চিন্ময়ের লীলাভূমি বলিয়া বুঝিতে পারি।

কবি গাহিলেন :—

"তোমার অসীমে, প্রাণ মন লয়ে, যতদূরে আমি যাই ;
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি, নিশি দিন কাঁদি তাই।"

অণুর প্রাণ-ধারা মানব-প্রাণের স্বজাতীয়তার লক্ষণ সপ্রমাণ করে। অণুতে কেবল উন্নত মানব-জীবনের অপরিস্ফুট শক্তির একটি সূক্ষ্ম বিন্দুর পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্ময়ের রাজ্য এক অখণ্ড পারিবারিক যোগের ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। যে দিব্য দৃষ্টি দিয়া কবি দেখিলেন, এখানে মৃত্যু নাই, বিচ্ছেদ নাই, সেই দিব্য দৃষ্টি দিয়া বিশ্বাসীও দর্শন করিলেন যে, পৃথিবী চিন্ময়েরই অভিব্যক্তি। সকল বস্তুর ভিতর দিয়া সেই চিৎ শক্তি, সেই প্রাণ-শক্তিই ফুটিয়া উঠিতেছে ; এখানে অভাব নাই, বিচ্ছেদ নাই, ক্ষয় নাই, সবই মঙ্গল, মায়ের চরণতলে পূর্ণ হইয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছে। ভয় কেবল আমারই, আমার দিব্য দৃষ্টি নাই বলিয়া। ভয় কেবল আমারই, আমি মৃত্যুর ভিতর অমৃতের পূর্ণ প্রকাশ দেখি নাই বলিয়া। জীব-জগৎ যে ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া, ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য ইতর প্রাণীতে উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে অগ্রসর হইতেছে, মানব-জীবনে তাহারই স্পষ্টতর ও শ্রেষ্ঠতর বিকাশ উপলব্ধি হয়। উদ্ভিদ জগতের সহিত ইতর প্রাণী জগতের যে ক্রমবিকাশের সম্বন্ধ আছে, অণু জগতের সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সেই ক্রমবিকাশের সম্বন্ধ উপলব্ধি করা যায়। অণু জগৎ, উদ্ভিদ্ জগৎ ও প্রাণী জগৎ একটী অনন্তের পূর্ণতর বিকাশ বা Evolution। এক চিৎ শক্তিই সকলের জন্মদাতা, চিৎস্বরূপ হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। চিতের আত্মভূত শক্তি প্রেম, প্রেম সৃষ্টির প্রাণ, প্রেম চিন্ময় ; এবং অণুর আত্মভূত শক্তিও প্রেম, এই প্রেমের প্রেরণায় বিভক্ত অণুগুলি মিলিত হয়, নূতন হিমালয় সৃষ্টি করে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বলেন যে, পাহাড়ের প্রাণ আছে। যে বলকারক ঔষধ খাওয়াইলে মানুষের বল বৃদ্ধি হয়, সেই ঔষধে পাষাণেরও শক্তি পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয় ; যে বিষ প্রয়োগ করিলে মানুষের জীবন নষ্ট হয়, সেই বিষে পাহাড়েরও অনিষ্ট হয়। যে প্রাণ পাহাড়ের আছে, সেই প্রাণেরই সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ অণুতেও আছে, ইহা স্বীকার করিতে আমরা কেন কুণ্ঠিত হইব? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেদিন হিমালয়ের গাত্রোত্থান দর্শন করিলেন, হিমালয়ের ভিতর তাহার আত্মা দর্শন করিলেন, সেদিন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষিত সত্য ভক্তের দিব্য দর্শনের সহিত ঐক্য স্থাপন করিল। জগৎ এক চিন্ময়ের অখণ্ড রাজ্য বা অখণ্ড পরিবার বলিয়া জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ই নির্ভয়ে ঘোষণা করিলেন। ভক্তের দিব্য দর্শনের সহিত জ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক দর্শন, ভিন্ন প্রণালীর ভিতর একই সত্য নির্দ্ধারণ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার।

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তাঁহার ইংরাজী লিখিবার Style অতি সুন্দর ছিল, আগাগোড়া সমান গাঁথুনি, একটি শব্দও খাপছাড়া বা অপ্রযোজনীয় থাকিত না। যেরূপ ভাষা-জ্ঞান, সাহিত্য জ্ঞানও তদনুরূপ থাকাতে সোনায় সোহাগা মিলিয়াছিল। ইহার উপর অতি সুমার্জ্জিত বিচারবুদ্ধি, সূক্ষ্ম রসজ্ঞান ও হিউমার বোধ থাকাতে তিনি অতি উচ্চদরের সমালোচক ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা মাসিক পত্রাদিতে লেখা দিতে চাহিতেন না। বহু পূর্ব্বে "কুরুপাণ্ডব" নাম দিয়া মহাভারতের গল্প সংক্ষেপে লিখিতে আরম্ভ করেন ; বোধ হয়, বিরাট পর্ব্ব অবধি লেখা ও ছাপা হইয়াছিল। এরূপ স্বচ্ছ ও শুদ্ধ বাংলায় ঐতিহাসিক অংশ বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়া রামায়ণ মহাভারতের কথা সংক্ষেপে লিখিতে আর তো কাহাকেও দেখিলাম না। অর্থ ও সময়াভাবে তাঁহার কোনও লেখাই উপযুক্ত ভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। শেষ জীবনে এই সকল কাজ সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দারুণ রোগ ও শোক সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিল না। তথাপি কয়েকমাস পূর্ব্বেও জ্যেষ্ঠ পৌত্রের জন্য ভাসের "স্বপ্ন বাসবদত্তা" ইংরাজী পদ্যে ও গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, আর সম্প্রতি তিনি যে ইংরাজীতে একটি সনেটের কাব্যগ্রন্থ লিখিতেছিলেন, তাহার শেষ কবিতাটি মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বের লেখা। প্রাচীন বাংলা ও বৈষ্ণব সাহিত্য এবং কালিদাসের কাব্যের রসগ্রহণ করিতে পারিতেন বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিলেন। কাব্যের এমন রসজ্ঞান খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। বাস্তবিক অতি সূক্ষ্ম রসবোধ, কলাজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার সঙ্গে কঠোর নীতিজ্ঞান এবং কর্ত্তব্য ও সত্যপরায়ণতার অপূর্ব্ব সমাবেশ বাবার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল।

ছোটবেলা হইতেই রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প তাঁহার মুখে শুনিতাম, পরে একটু বড় হইলেই কৃত্তিবাসের ও কাশীরাম দাসের বড় বই আনাইয়া দিয়াছিলেন। অনেক সময়ে সন্ধ্যা-বেলায় বসিয়া পূর্ব্বপুরুষদের নাম ও বাংলা দেশের বিভিন্ন জাতি গোত্র প্রভৃতির পরিচয় শিখাইতেন। দশ এগারো বৎসর বয়স হইতেই ভাল ইংরাজি গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। বাড়ীতে Webster এর প্রকাণ্ড ইংরাজী অভিধান ভিন্ন আর অভিধানই ছিল না, কিন্তু সেই ভারী বই নাড়িতে চাড়িতে আমরা কোনও দিন কষ্ট বোধ করি নাই। এইরূপে কোনও আড়ম্বর না করিয়া জ্ঞানরাজ্যের কত দ্বার যে আমাদের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হই। আপনাদের নিকট তাঁহার কথা বলিতে বসিয়া কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি বলিব ভাবিয়া পাই না।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের কথাও কিছু বলা দরকার। অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন বলিয়া পাছে কলেক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, এই ভয়ে নিজেই অত্যন্ত সাবধানে থাকিতেন। বলিতেন, "অপমানিত হইলেই আমি কাজ ছাড়িয়া দিব।" নিজের উন্নতির জন্য উপরিওয়ালার খোসামোদ করা তাঁহার স্বপ্নের অতীত ছিল। এই তেজ তাঁহার চিরদিনই অটুট ছিল, এবং নিজগুণে সর্ব্বত্র সম্ভ্রম লাভ করিয়া আসিয়াছেন। বিচার-কার্য্যে বিবেক-বুদ্ধি অতি সতর্ক ছিল, এবং অতি সামান্য কেসেও আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত বিবেচনা না করিয়া রায় দিতেন না বলিয়া রোজই এজলাস হইতে নামিতে দেরী হইত। সহজে কঠিন শাস্তি দিতেন না, কারণ জানিতেন, অভাবে অজ্ঞানে পড়িয়াই অধিকাংশ লোকে হীনবৃত্তি অবলম্বন করে। চাকুরীস্থলে কাহারও নিকট হইতে কোনও উপহার, এমন কি সামান্য ফল মূল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। এজন্য কত সময়ে লোকের বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা একদিনের জন্যও ভাঙ্গেন নাই। কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলে গেলে চাপরাসীরা যাহাতে কাহাকেও উৎপীড়ন না করে, সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। তিনি একজন পাকা ঘোড়সওয়ার ছিলেন, এবং প্রথম বয়সে রাজকার্য্যোপলক্ষে তদন্ত করিতে যাইবার সময়ে অশ্বারোহণে যাতায়াত করিতেন। এক এক সময়ে অশ্বা-রোহণে আকণ্ঠ-জল নদী পার হইয়া ঘটনাস্থলে গিয়াছেন ও তদন্ত শেষ করিয়া নিরুদ্বেগে বাড়ী ফিরিয়াছেন। অত্যন্ত শুচিতা-প্রিয় ছিলেন বলিয়া আদালতে জলগ্রহণ করিতেন না। দ্বারভাঙ্গায় সেটেল্‌মেণ্ট কার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম করিতে করিতে তিনি দারুণ রোগাক্রান্ত হন। সেই হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে আরম্ভ করে, এবং প্রায়ই দীর্ঘ অবকাশ লইতে বাধ্য হন। অত সাধের অশ্বারোহণ বন্ধ করিতে হয়। তখন টম্‌টম্‌ চালাইয়া ঘোরাঘুরি করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তাহাও অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য হইয়া পড়ে। তাঁহার গাহিবার সখ ছিল, তাল-মান-জ্ঞান ও গলা সবই ছিল, কিন্তু রোগের জন্য তাহাও বন্ধ হয়। এইরূপ অনেক সখই তাঁহার অপূর্ণ থাকিয়া যায়। রোগে পড়িয়া বারবার অর্দ্ধবেতনে অবকাশ লইতে হইয়াছে। সেই অবস্থায় সমস্ত সংসারের খরচ চালানো, ভবিষ্যতের ভাবনা ও অনিশ্চিতের মধ্যে দিনযাপন করিতে যে কতটা মনের বলের দরকার, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রায় চির-জীবনই দুর্ভাবনার মধ্যে কাটিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এতদিন জীবিত ছিলেন ও রোগে কাতর হইয়াও আমাদের মুখ চাহিয়া প্রাণপণে কাজ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার অসাধারণ মনের পরিচয় পাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি মতিহারীতে; চম্পারণ জেলায় তখন আন্দোলন প্রবল ছিল। এই সংঘর্ষের মধ্যে তিনি একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশবাসীর স্বাভাবিক স্বাধিকার-লিপ্সার সম্মান, যতটা সম্ভব, বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষই তাঁহার বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেন। কিন্তু এই ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়, এবং এক্সটেন্‌সানের চেষ্টামাত্র না করিয়া, অবসর গ্রহণ করিয়া, তাঁহার বড় সাধের গিরিডিস্থিত গৃহে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

কর্ম্মজীবনে পড়াশুনাই একমাত্র অবলম্বন ও বই কেনা একমাত্র সখ ছিল। অবসর লইয়া সময় বেশী পাইবেন ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। গিরিডিতে অনেকগুলি অবসর-প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী বাস করেন, নিজ চরিত্রগুণে বাবা তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল রাজকার্য্য এবং নানা বিষয়ে পড়াশুনা ও আলোচনা করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন; এজন্য সকল বিষয়েই সৎপরামর্শ দিতে পারিতেন, এবং সুরসিক ও সদালাপী বলিয়া লোকে তাঁহার সহিত কথা বলিয়া সুখ পাইত। আর্থিক ব্যাপারে সততাকে তিনি চরিত্রবলের চরম পরীক্ষা বিবেচনা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগে ব্রাহ্মগণ ঋণ দান বা গ্রহণ করিবার সময়ে পাকা লেখাপড়া করা প্রয়োজন মনে করিতেন না। কারণ সকলকেই ভ্রাতৃজ্ঞানে বিশ্বাস করিতেন। বাবা চিরদিন এই মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেন, আর্থিক ব্যাপারে Business-like হওয়া উচিত। প্রতিমাসের আয় হইতে সঞ্চয় প্রায় কিছুই হইত না, তথাপি হিসাবে একটি পয়সার গরমিল হইতে দিতেন না। গিরিডির বাড়ী তৈয়ারীর হিসাব পত্র এমন সুন্দর ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। গিরিডিতে আসিয়া মনপ্রাণ দিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কাজ করেন, ভগ্ন শরীর লইয়া ইহার জন্য তিনি কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার দেশ-সেবা ছিল। এ সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল, এবং সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার

ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সে পুস্তক এখনও মুদ্রাযন্ত্রে রহিয়াছে। কোনও হুজুকে তিনি কখনো যোগদান করেন নাই, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব হইতেই আমাদের বাড়ীতে কখনো বিলাতী মিলের কাপড় আসিত না। দেশী চায়ের পেয়ালা মহোৎসাহে কিনিয়া আনিয়া চা পানের চেষ্টা হইত, সে সময়ে গরম চা পড়িবা মাত্র সে পেয়ালা গলিয়া যাইত। তাহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া আবার নূতন সেট কিনিয়া আনিতেন। দেশীয় শিল্পের প্রতি এই অনুরাগ তাঁহার চিরকাল ছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার শেষ সখের জিনিষ পাটনার তৈরী দেশী মোজা ও ভাগলপুরের তাঁতের মুগার চাদর কেনা হয়—তাহাই দিয়া মহাযাত্রার সময়ে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়।

গিরিডিতে থাকিতে অসুস্থ শরীরেও সর্ব্বদা সকলের সংবাদাদি লইতেন। চিরদিন তিনি পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার বিরোধী ছিলেন। কাহারও ব্যবহার নিন্দনীয় হইলে দুই একটি কথায় নিজের বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, কিন্তু কখনো পাঁচজনের সঙ্গে বসিয়া উৎসাহ সহকারে পরনিন্দা করিতেন না, এবং আমরা করিলেও বিরক্ত হইতেন। চাকরবাকরের গায়ে কোনও দিন হাত তুলেন নাই, তাহাদের রোগে উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেন, এবং সামান্য অপরাধে চাকরবাকরকে পুলিশে দেওয়া একেবারেই পছন্দ করিতেন না। অসচ্চরিত্রতা টের পাইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত মাহিনা চুকাইয়া বিদায় করিয়া দিতেন। একবার ডুমকায় থাকিতে একজন চাকরকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহার দুইদিন পরেই বাড়ীতে চুরী হয়। পুলিশ আসিয়া বাবাকে অনেক অনুরোধ করে, ঐ লোকটিকে সন্দেহ করেন, এইটুকু আপনি একবার বলুন, তবে আমরা উহাকে ধরিতে পারি। কিন্তু বাবা কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার কোনও বাক্য বা আচরণ দ্বারা কাহারও কোনও দিন সামান্য মাত্র ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল, বাড়ীতে সংক্রামক ব্যাধি হইলে যাহাতে তাহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত না হয়, বাড়ীর ড্রেণ ইত্যাদি যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে, এসব দিকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। অনেকে এজন্য তাঁহাকে উপহাস করিত।

বাবার জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, সকল বিষয়েই মধ্যপন্থা হওয়া তাঁহার আদর্শ ছিল। বলিতেন, কোনও বিষয়েই চরমমতাবলম্বী হওয়া গৃহস্থের আদর্শ নয়। তাঁহার মধ্যে যে আভিজাত্যের লক্ষণ ছিল, তাহা ধন সম্পদের আভিজাত্য নয়, কিন্তু সদ্বংশজাত হওয়ার ও সহজাত শক্তি সুপথে চালনা করার ফল। এক কথায় Culture বলিলে যাহা বুঝায়, বাবার সমস্ত জীবন আচার ব্যবহারে তাহারই পরিচয় দিত।

তাঁহার সন্তান-স্নেহ যে কি সুগভীর ছিল, তাহা আর কি বলিব; আমাদের জন্য চিরজীবন রুগ্ন-দেহে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, আমাদের সকল বিষয়ে সুশিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুত্রবধূদের কন্যার মত স্নেহ করিতেন ও নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বধূরাও তাঁহাকে নিজের পিতার মতই দেখিতেন। আমাদের সামান্য অসুখে অস্থির হইয়া পড়িতেন। সকল বিষয়ে বিচক্ষণ লোক ছিলেন, তাঁহার সহিত গল্প করা আমাদের কাছে বড় লোভনীয় ছিল। আমাদের সঙ্গে অবাধে গল্প করিতেন, আমরাও কোনো বিষয়ে সঙ্কোচ না করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতাম। অথচ তিনি কিরূপ গম্ভীর-প্রকৃতি লোক ছিলেন, তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইলে মনে হইত, তিনি আমাদের তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিতেছেন। ইদানীং স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে কথাবার্ত্তা কম বলিতেন, কিন্তু উহারই মধ্যে যে দিন শরীর মন ভাল থাকিত, প্রসন্নোজ্জ্বল-মুখে কত কথা বলিতেন।

ক্রমে বিপদের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মাতৃদেবীর স্বাস্থ্য চিরদিনই সুন্দর ছিল, হঠাৎ তিনি দারুণ রোগাক্রান্ত হইলেন। ৫।৬ বৎসর রোগ ভোগের পর ১৯৩০ সালের ৫ই মে, মা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বাবা পূর্ব্ব হইতেই হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, এখন শোকে কাতর হইয়াও কনিষ্ঠা কন্যার মুখ চাহিয়া প্রাণপণে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আহ্বান আসিল, স্নেহচ্ছায়ায় রাখিয়া যাহার জীবনের সকল অভাব তিনি মোচন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে ফেলিয়া তিনি আজ কোথায় রহিলেন জানি না। কিন্তু মরণেই যদি এই জীবনের শেষ না হয়, তবে জ্যোতির্ম্ময় লোকেই তাঁহার স্থান হইয়াছে সন্দেহ নাই। চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের মেয়াদ আর ছয়মাস কি একবৎসর, এবং রোগ ক্রমশঃ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও দুরারোগ্য হইয়া উঠিবে। নিঃশ্বাসের ভীষণ কষ্ট ও নিদ্রাহীন রাত্রির বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইলেন, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। কনিষ্ঠা পৌত্রীকে দেখিতে পাইলেন না, বড় সাধের গিরিডির গৃহ বিদ্যুতালোকে শোভিত হইয়াছে, তাঁহার আর সে প্রিয়ভবনে ফিরিয়া যাওয়া হইল না, অনেকগুলি সাধ অপূর্ণ রহিয়া গেল। জীবনের শেষদিনটিতে কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ও দৌহিত্রীকে চিরদিনের মতই সুন্দর ভাষায় চিঠি লিখিয়া গিয়াছেন, পড়িলে মনে হয় না যে লেখকের জীবনদীপ ঐ চিঠি লেখার ৩।৪ ঘণ্টা পরেই চিরতরে নিভিয়া গিয়াছে। জীবনে যেমন জ্ঞানী ঋষিকল্প পুরুষ ছিলেন, তেমনি কাহাকেও কোনো কষ্ট না দিয়া শান্তভাবে, সজ্ঞানে, শ্রাদ্ধাধিকারী জ্যেষ্ঠপুত্রের গৃহে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। আজ সেই প্রিয়দেহের আর কোনো চিহ্নই নাই, পবিত্র জাহ্নবীতীরে পবিত্র দেহভস্ম চিরতরে পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সন্তানগণের নিকট তিনি চিরজীবী হইয়া থাকিবেন, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে চিরদিনের মত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছেন। রবীন্দ্রনাথের "জানি হে যবে, প্রভাত হবে, তোমার কৃপাতরণী লইবে

মোরে ভবসাগর কিনারে" গানটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল—নিম্নোক্ত ছত্র কয়টি প্রায়ই গাহিতেন :—

"জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি' বিনাশ-ভয় পাথারে ;
এমন দিন আসিবে, যবে করুণাভরে আপনি,
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে।"

দয়াময়ী বিশ্বজননী সত্যই তাঁহাকে ফুলের মত তুলিয়া লইয়াছেন, ইহাতে তো অভিযোগ করা সাজেনা ; কিন্তু পিতৃ-মাতৃহীন আমাদের তিনি দয়া করুন ও আমাদের শোকাশ্রুর তর্পণে সেই দেহমুক্ত আত্মার তৃপ্তি হউক, এই ভিক্ষা।

আশা মজুমদার।

দ্বিষষ্টিতম ভাদ্রোৎসবের বিবরণ।

লীলাময়ী উৎসবানন্দদায়িনী পরম জননীর শ্রীপদে প্রণাম করিয়া, আমরা নিম্নে এবারকার ভাদ্রোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

গত ১৫ই আগষ্ট, ৩০ শ্রাবণ, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে পাটায় কমলকুটীরের নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতি-সভা হয়। সভায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকজন বন্ধু যোগদান করিয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রার্থনা করেন। তৎপর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ স্বর্গগত ভক্তি-ভাজন ভাই গিরিশ চন্দ্রের আত্ম-জীবনী হইতে তাঁহার আরব্য ভাষা ইত্যাদি শিক্ষার বিবরণ, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দকর্ত্তৃক তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক বলিয়া ঘোষণা, তাঁহা কর্ত্তৃক কোরাণাদি শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে মৌলবী সাহেবদিগের প্রশংসা-সূচক মন্তব্যের বিবরণ পাঠ করেন। পাঠান্তে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, কিরূপে নববিধান-ক্ষেত্রে সমন্বয়ের নব সাধনার প্রয়োজনে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রয়োজন হইল, উপস্থিত হিন্দু মুসলমান ভ্রাতাদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহা এই ভাবে বলেন :—বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যেরূপ অপ্রীতিকর সংঘর্ষ চলিতেছে, সেইটি লক্ষ্য করিয়া এই নবযুগে পবিত্র নববিধান-ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, ও অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রকৃত মিলনের আয়োজন স্বর্গের প্রেরণায়, স্বর্গের আলোকে কিরূপে সমাগত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ৭ই ভাদ্র, এই ব্রহ্মমন্দিরে নবযুগের নব সাধনার মৌলিক আয়োজন নব উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে বিশেষ প্রেরিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন ও তাঁহার দলের ভিতর দিয়া এই নবধর্ম্ম ক্রমে স্বর্গের আলোকে ও প্রেরণায় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই নবধর্ম্মের উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁহাদের অন্তরে স্বর্গের বিশেষ আলোক এইরূপে প্রতিভাত হইল যে, মহান্ অনন্ত ব্রহ্ম সকলের উপাস্য দেবতা, জগতের ছোট বড় সাধু ভক্ত মহাজন-গণ তাঁহার প্রেরিত, এবং ইঁহাদের সকলের জীবন তাঁহারই বিশেষ বিশেষ আলোক ও বিভূতিতে পূর্ণ. তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধন জন্য প্রেরিত হইয়াছেন ; এবং জগতে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচলিত আছে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই সেই এক ঈশ্বরেরই পরিত্রাণপ্রদ বাণীতে পূর্ণ। অতএব পৃথিবীর অতীতের বর্ত্তমানের, স্বদেশের বিদেশের সকল সাধু মহাজনই এবং সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রই আপনার বলিয়া মান্য ও গ্রহণীয়। তাঁহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসকরূপে তাঁহার লীলাস্থল সকল প্রেরিত মহাজনদিগকে ও তাঁহার বাণীর ভাণ্ডার সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে সম্মান ও গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত হইলেন। এই ভাবের নিদর্শন ও পরিপোষণ-স্বরূপ, এই উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সময়ে, পৃথিবীর প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মবাণী সংগ্রহ করিয়া, 'শ্লোক-সংগ্রহ' গ্রন্থ প্রণীত হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন বিলাতে, সেই সময়ে লণ্ডন নগরে থিয়িষ্টিক এসোসিয়েসন নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সভার লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা, ও ভাবের আদান প্রদান প্রচলন। সেই সভায় কেশবচন্দ্র আপনার বক্তব্য এই ভাবে প্রকাশ করেন :—"ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মের আলোচনা-ক্ষেত্রে একটা বড় ভুল করা হইয়াছে, সেটা এই, যখনই কোন এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অন্য কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র কি সাধু মহাজনের সঙ্গে আপনাদের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির তুলনা করিয়া আলোচনা করিতে যাইতেন, তখনই আপনাদিগের ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজন প্রভৃতির এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেন যে, নিজেদের ধর্ম্ম-বিষয়ের গুরুত্ব গৌরবে ও অযথা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, অন্য ধর্ম্মের যাহা কিছু সকলকেই অধঃকরণ করিতেন, অন্য ধর্ম্মের যাহা কিছু শাস্ত্র, সাধনা, সাধু মহাজন, সকলকেই হীন চক্ষে দেখিতেন। আমরা যেন সে ভুল না করি। আমাদের পূর্ব্বে, হিন্দুসম্প্রদায়ের হউক, খৃষ্টসম্প্রদায়ের হউক, গ্রীসীয় হউক, রোমাণের হউক, যে কোন জাতির, যে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যে কোন ধর্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীর ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া, জীবন, আচরণ ও পরিশ্রম দ্বারা মানব-মণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সে সকলেই আমাদের প্রণম্য, ধর্ম্ম-জ্যেষ্ঠ, অগ্রবর্ত্তী বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করিব, বিনীত ভাবে তাঁহাদের চরণতলে বসিয়া আমরা

ধর্ম্মরাজ্যের নানাতত্ত্ব শিক্ষা করিব, তাঁহাদের হইতে ধর্ম্মের নানা ভাব, নানা সংবাদ গ্রহণ করিব, এই হইবে আমাদের কার্য্য, এই পথে আমরা লাভবান্ হইব। ধর্ম্মাভিমান বা অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া অন্যকে হীনচক্ষে দেখিলে, অন্য হইতে ভাল কিছু গ্রহণ করিতে পারিব না, গ্রহণের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহাতে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব।" যিনি এই নববিধান-ক্ষেত্রে বিশেষ সুসংবাদ-বাহক, সেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অন্য সম্প্রদায়ের সাধু মহাজন ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র গ্রহণ সম্পর্কে আপনার গূঢ় মনের ভাব এইরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এই নব ধর্ম্ম ক্ষেত্রে নব গ্রহণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধকগণ গ্রহণের পথে যখন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন, প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্মবিজ্ঞানের অগাধ ভাণ্ডার। তখন প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ জানা প্রয়োজন হইল, প্রত্যেক ধর্ম্মের গূঢ় সাধনা, ব্রত নিয়ম, আচরণ অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন হইল; তাই শ্লোক-সংগ্রহে সব প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না, এক একটি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে এক এক জন বিশেষ ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন। হিন্দু-শাস্ত্রের একজন, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের একজন, মুসলমান শাস্ত্রের একজন, বৌদ্ধশাস্ত্রের একজন ইত্যাদি। যিনি মুসলমান শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইলেন, তিনি আমাদের ভক্তিভাজন গিরিশচন্দ্র সেন, যাঁহার স্মৃতি-সভায় আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। তিনি ৪২ বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য গমন করেন, সেখানে এক বৎসরকাল শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় আসেন; তৎপর কিছুদিন কলিকাতায়, কিছুদিন ঢাকায় ঐ ভাষা শিক্ষা করেন। তাহার পর তিনি কোরাণ গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত হাদিস গ্রন্থ, তাপসমালা, মহম্মদের জীবনী এবং নীতিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব-বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গলায় অনুবাদিত মুসলমান ধর্ম্মের সকল গ্রন্থ একত্র দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এক জীবনে কি করিয়া তিনি এত গ্রন্থ কঠিন আরবী প্রভৃতি ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে পারিলেন! এ কার্য্যে কি তাঁহার পরিশ্রম, কি তাঁর সহিষ্ণুতা, কি তাঁহার দৃঢ়তা, কি তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও কর্ম্ম-নিষ্ঠা! তিনি যে বিপুল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সে কার্য্য দ্বারা শুধু আমাদের ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান-মণ্ডলী, বঙ্গ, ভারত উপকৃত হইবে না, সমস্ত পৃথিবী সময়ে উপকৃত হইবে। আজ সেই স্বর্গীয় মহাত্মা প্রেরিত গিরিশচন্দ্র সেনের জীবন স্মরণ করিয়া, তাঁহার চরণে প্রাণের ভক্তি কৃতজ্ঞতা দান করিয়া, আমরা ধন্য হই।

তৎপর ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রচারক মৌলবী আব্দুল আজিজ—অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা কোরাণের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলেন, এবং মুসলমানতাপসদিগের আত্মত্যাগ ও অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-সাধনার বর্ণনা করিয়া, কোরাণ ও তাপসমালা প্রভৃতি মুসলমান ধর্ম্মের গ্রন্থ সকল স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া কি মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ রূপে স্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞতা দান করেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

১৬ই আগষ্ট, ৩১ শ্রাবণ, রবিবার, প্রাতে ৮॥টায় নবদেবালয়ে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনার আরম্ভে দীর্ঘ উদ্বোধনে, তিনি বর্ত্তমান যুগলীলার ইতিহাস মহাত্মা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে যেরূপ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া, আরাধনাদি অপর অংশের কার্য্য গম্ভীরভাবে সম্পন্ন করেন। "সাধুনাম মিষ্ট" আচার্য্যের প্রার্থনা পঠিত হয়। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন।

"দয়াময় নাম বল বদনে; শয়নে,-স্বপনে, সুখ দুঃখ জীবনে মরণে।" এই গানে উদ্বোধন আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব বঙ্গের জল-প্লাবনে, দৈন্য দুঃখের দিনে, সমস্ত দেশের মহা পরীক্ষা, অভাব, অনটন, নির্য্যাতন ও জীবন মরণের কঠিন সমস্যার দিনে, সেই জীবনের একমাত্র কাণ্ডারী, বিপদ্-দুঃখহারী দয়াময়ের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আমরা কার শরণাপন্ন হইব? অতীত ভারতে দুঃখ দৈন্য নির্য্যাতনে, ব্যক্তিগত জীবনে ও রাজ্যঘটিত ব্যাপারে যাঁহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা কোন্ দুর্গতি, কোন্ বিপদ্, কোন্ নির্য্যাতন হইতে উদ্ধার না পাইয়াছেন? ধ্রুব ও প্রহ্লাদের জীবন কি তাহার সাক্ষী নয়? ভারতের অতীত ঘটনার ইতিহাস কি তাহার সাক্ষ্য দান করে না? দেশের দুঃখ, দৈন্য, নির্য্যাতন ও জীবন মরণের সমস্যা সময়ে ভাল করিয়া দয়াময়ের পদাশ্রয় গ্রহণ করার সময়। আবার সম্মুখে আমাদের সাধনার উৎসব, ভাদ্রোৎসবের দিনব্যাপী উৎসব। তাই পরম পিতামাতা, লীলাময় শ্রীহরি, লীলাময়ী জননী যিনি, তাঁহার পদাশ্রয় ভাল করিয়া গ্রহণ করি। এইরূপে উদ্বোধন উচ্চারণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় গান "বিপদ্‌ভঞ্জন দয়াল হরি," গীত হয়। আরাধনা ও সাধারণ প্রার্থনাদি সেই ভাবে সম্পন্ন হয়। "ঈশ্বর গুরু" এই ভাবের আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠান্তে, "পবিত্রাত্মা আমাদের গুরু ও পরিচালক" এই বিষয়ে আত্ম নিবেদন হয়। এবার জীবন্ত ঈশ্বর পবিত্রাত্মা রূপে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে ও জাতীয় জীবনে শিক্ষা দীক্ষা এবং আমাদিগকে পরিচালন করিয়া, জীবন-যুদ্ধে আমাদিগকে জয়ী করিতে প্রস্তুত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে পবিত্রাত্মা গুরুরূপে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রার্থনা-যোগে এই পবিত্রাত্মার কার্য্য জীবন্ত ভাবে আরম্ভ হইল। ক্রমে এই পবিত্রাত্মার পরিচালনে ধর্ম্ম-জীবনের কি অবিশ্রাম গতি, কি উচ্চ পরিণতি, কি উচ্চ সিদ্ধি ব্রহ্মানন্দ কেশব-জীবনে লাভ হইল! কিন্তু আমাদের জীবনে তাঁহার অযাচিত কৃপাগুণে, তাঁহার আলোকে, তাঁহার বিধি নিষেধ লাভ করিয়াও,

আমরা জীবনে পবিত্রাত্মাকে তেমন করিয়া অনুসরণ করিতেছি না। আমাদের অভ্যাসগত নিচার বুদ্ধি, আত্মচেষ্টা, এ যুগের শিক্ষা ও সভ্যতা, আমাদের জীবনে বাধা হইয়া, তেমন করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে দিতেছে না। পবিত্রাত্মার আনুগত্য ও পরিচালন মানব-জীবনে যে সহজসাধ্য নয়, তাহার জলন্ত সাক্ষ্য আমরা ঈশা-শিষ্য খৃষ্ট-সমাজ হইতেও পাইতেছি। শ্রীঈশা পবিত্রাত্মার একমাত্র অনুসরণ বিষয়ে কত জলন্ত শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত আপনার মণ্ডলী মধ্যে রাখিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার এরূপ শিক্ষাদান সত্বেও তাঁহার মণ্ডলী তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিল, পবিত্রাত্মার একমাত্র দৃঢ়নিষ্ঠ অনুসরণ মণ্ডলী মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইল, তাই খৃষ্ট-সমাজের আধ্যাত্মিক পতন। বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মানন্দ আপনার জীবন ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এদেশকে, বিশেষভাবে এদেশের শিক্ষিত-মণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়া গেলেন, অন্তরস্থ পবিত্রাত্মার শিক্ষা ও একমাত্র অনুসরণ দ্বারা ঈশ্বরের বিচিত্র দর্শন, তাঁহার বাণী শ্রবণ, তাঁহাতে আধ্যাত্মিক উচ্চ জীবনলাভ কিরূপে সম্ভবে, পবিত্রাত্মার অনুসরণে সকল সাধু ভক্তের সঙ্গ ও সহায়তা কিরূপে লাভ হয়, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-বিধান কেমন করিয়া আমাদের নিজস্ব সম্পদ হয়, সকল প্রকার মধ্যবর্ত্তি-বাদ ও অবতারবাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পবিত্রাত্মার অনুসরণে ধর্ম্ম জীবন ও কর্ম্ম-জীবনের পন্থা কেমন সুগম হয়। কিন্তু দেশের কয়জন শিক্ষিত লোক তাহা শুনিল? এই বর্ত্তমান যুগেও কোন কোন সাধু ভক্তকে আবার মধ্যবর্ত্তী করিয়া, অবতার সাজাইয়া, এই দেশের অনেক বড় বড় জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিত ও ধনী মানী ব্যক্তিগণ অন্ধতা ও কুসংস্কারের আবর্ত্তে নিজে ডুবিলেন, দেশকেও ডুবাইলেন, তাহাই প্রমাণ হইতেছে। বাহিরের মানুষ গুরু, মধ্যবর্ত্তী অবতার ছাড়িয়া পবিত্রাত্মার অনুসরণ সহজ ব্যবহার নহে। আমাদের মণ্ডলী কোন মানুষকে, কোন সাধুকে মধ্যবর্ত্তী কি অবতাররূপে দাঁড় করেন নাই, ইহা সত্য; কিন্তু আমাদের ত্রুটি কোথায়? আমরা অনেক পরিমাণে আমাদের আমিত্বকে, আমাদের ব্যক্তিগত রুচি ভাবকে মধ্যবর্ত্তী রূপে দাঁড় করাইয়া আমাদের ব্যক্তিগত ও মণ্ডলীগত ধর্ম্ম-জীবনের মহান্ অনিষ্ট করিয়াছি ও করিতেছি। পবিত্রাত্মার শিক্ষা ও পবিত্রাত্মার প্রেরণাই আমাদের ধর্ম্মজীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় ও অনুসরণের বিষয়। করুণাময় ঈশ্বর আমাদের জীবনে সুমতি, সুগতি বিধান করুন, নবচেতনা দান করুন। আমরা একমাত্র পবিত্রাত্মার শিক্ষা ও পরিচালনে জীবনপথে চলিয়া, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মণ্ডলীগত ও দেশের জাতীয় জীবনে সিদ্ধিলাভ করি, জয়লাভ করি।

১৭ই আগষ্ট ৩২শে শ্রাবণ, সোমবার, শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥টায় নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীমতী হেমলতা চন্দ সময়োপযোগী সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ হয়। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস পরমহংসদেবের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ করেন। বেণীবাবু বিবেকানন্দের জীবনের পরিবর্ত্তন বিষয়ে পরমহংসদেবের জীবনের মহত্ব উল্লেখ করেন।

(ক্রমশঃ)

—০—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২রা সেপ্টেম্বর, ৭৫ নং হ্যারিসন রোডে, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী রমার জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। বিধান-জননী তাঁহার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ৯৪।১সি গড়পার রোডে, ডাঃ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পৌত্রী, ডাঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সন্তান শিশুকন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মঙ্গল ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। শিশুকে "গীতাঞ্জলি" নাম দেওয়া হয়। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—বিগত ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর, ভাগলপুরের অন্তর্গত মাধীপুরা-নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণধন দাসের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথের সহিত ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী আশালতার শুভ বিবাহ ঢাকায় ১নং সিমসন রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

ভাদ্রোৎসব—গত ৬ই ভাদ্র, ময়মনসিংহে নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ও বাঁকুড়ায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন—আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ থাস্তগীরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ব্রহ্মজীব থাস্তগীর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, কম, উপাধি এবং কৃষি সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া, প্রায় আট নয় বৎসর পরে গত আগষ্ট মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা সানন্দে শ্রীমান্‌কে অভ্যর্থনা করিতেছি এবং ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা দান করিতেছি। ভগবান শ্রীমান্‌কে আশীর্ব্বাদ করুন এবং জীবনের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি বিধান করুন।

বিদেশ-যাত্রা—গত ২৮শে আগষ্ট, চট্টগ্রামের স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের কনিষ্ঠপুত্র ডাঃ শ্রীমান্ বিবেক মোহন সেন (এম, বি,) জার্ম্মাণীর মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থ মাদ্রাজ ও কলম্বো হইয়া জার্ম্মাণী যাত্রা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তৎপূর্ব্বদিন ২৭শে আগষ্ট, সন্ধ্যাকালে

ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ শ্রীমানের জন্য ভগবানের চরণে কল্যাণ ও শুভাশীষ ভিক্ষা করিয়া উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। যাত্রাকালে ষ্টেসনে মাতৃদেবী, ভাই ভগ্নীগণ ও বন্ধুবান্ধব অনেকে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমানকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাসহ বিদায় দান করেন। ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদে শ্রীমানের যাত্রা শুভ ও নিরাময় হউক এবং জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।

বিশেষ উপাসনা—শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু লিখিয়াছেন, গত ৬ই সেপ্টেম্বর, পুরীতে, ডাঃ দিনকর রাওর গৃহে তিনি রবিবাসরীয় উপাসনা করেন। শ্রীমতী সুখলতা রাও সঙ্গীত করেন। পুরীতীর্থে বিরাট সমুদ্রতটে অচিরে একটী ব্রহ্মমন্দির ও তৎসংলগ্ন একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধক সাধিকাগণের সাধনভজনের স্থান হয়, ইহা তিনি অতীব আবশ্যক মনে করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক রুগ্ন ও ভগ্ন শরীরে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; ব্রাহ্মবন্ধুগণ ও দাতাগণ সকলে উৎসাহিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন, এই তাঁহার প্রাণের বিশেষ অনুরোধ।

বেদ ও কোরাণের মিলন—আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক বিজদাস দত্ত (M.A., M.R.A.C.) কুমিল্লা হইতে আসিয়া প্রায় মাসেক কাল আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি আজকাল প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে বেদ ও কোরাণের সার্ব্বজনীনতা ও মহামিলনের ভিতর দিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা-স্থাপনের অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া সকলের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি কয়দিন কলেজ স্কোয়ার প্রাঙ্গণে বেদ ও কোরাণের মহামিলন বিষয়ে বক্তৃতা দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি এই মিলনের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরেও ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে "বেদ ও কোরাণের মিলন" বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। তৎপর "আমাদের সঙ্ঘের" কর্ম্ম-সচিব শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষের উদ্যোগে ও চেষ্টায় "সাধু প্রমথ লাল লেকচারের" ব্যবস্থাক্রমে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে গত ২৮শে আগষ্ট ও ৩রা সেপ্টেম্বর "বেদের সার্ব্বজনীনতা" বিষয়ে এবং ৩১শে আগষ্ট ও ৭ই সেপ্টেম্বর "কোরাণের সার্ব্বজনীনতা" বিষয়ে চারিটী বক্তৃতা দান করিয়া, গত ৮ই সেপ্টেম্বর কুমিল্লা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কয়দিন তাঁহাকে পাইয়া, সকলে সুখী ও উপকৃত হইয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে আগষ্ট, সন্ধ্যায়, কটকে, স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ রায়ের গৃহে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রীতিকণা রায়ের স্বর্গীয়া পিতামহীর সাম্বৎসরিক দিনে, প্রীতিকণার মাতৃদেবী শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু উপাসনা করেন, শ্রীমতী প্রীতিকণা সঙ্গীত করেন। কয়েকটী মহিলা শ্রদ্ধাসহ যোগদান করেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর, কোচবিহারে, স্বর্গীয় মহারাজা রাজ-রাজেন্দ্র নারায়ণের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে, কেশবাশ্রমে যথারীতি উপাসনাদি-যোগে পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের সহিত সমযোগ-সাধনে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, হাওড়ায়, ২৮নং নরসিং দত্ত রোডে, স্বর্গীয় ডাঃ শরৎকুমার দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ৩৭নং হ্যারিশন রোডে, ডাঃ জগন্মোহন দাসের প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র "পান্নার" সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ডাঃ দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে এই উপলক্ষে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, ভাই প্রিয়নাথের নিষ্ঠাবান্ ভক্ত পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে ব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনাদি হয়।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, প্রাতে, ৮৩১নং অপার সার্কুলার রোডে, মঙ্গলপাড়ার গৃহে, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ইন্দুরেখা প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায়, ১৩১ নং হরলাল দাস ষ্ট্রীট, স্বর্গীয় রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবিশের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শশাঙ্কলতা দত্তের গৃহে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী সুমতি সেহানবিশ এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গিরিশ-লাইব্রেরী

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত গাঁড়াডোব গ্রামে, বিগত ৩০শে শ্রাবণ, মৌলবী গিরিশচন্দ্রের একটী স্মৃতি-সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভার প্রস্তাব অনুসারে অত্র গাঁড়াডোবের "মণির মঞ্জিলে" "গিরিশ লাইব্রেরী" নাম দিয়া একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ও ব্রাহ্ম-সমাজের কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ থাকিবে। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই অপরাহ্ণ বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক রবিবার সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে উপাসনা হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম-সমাজের গ্রন্থকার মহাশয়দিগের নিকটে আমরা তাঁহাদের কৃত কেবল ধর্ম্ম-পুস্তক ও সাধু-চরিত-পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, প্রত্যেক গ্রন্থকার স্ব স্ব পুস্তক অত্র লাইব্রেরীতে দান করিয়া মৌলবী গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন। নিবেদন ইতি।

গিরিশ-লাইব্রেরীর পক্ষে আবেদনকারী

মৌলবী জনিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ।

পোঃ গাড়াডোব, জেলা নদীয়া।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ৬ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ।
১৮শ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
3rd October, 1931.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে ধর্ম্মরাজ! হে সত্য ধর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক! তুমি স্বয়ং ধর্ম্ম; ধর্ম্ম এবং তুমি তো পৃথক নও। আমরা যখন স্বীকার করি, তুমি জীবের উদ্ধারের জন্য, সদ্‌গতি বিধান জন্য, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া তুমি স্বয়ং সত্য ধর্ম্মের আলোক জগতে বিকীর্ণ করিতেছ, তখন আমরা কি স্বীকার করিব না, বিশ্বাস করিব না, যে তোমাকেই তুমি বিতরণ করিতেছ? তুমি অনন্ত ভূমা মহান্ দেবতা, ক্ষুদ্র কীটানুকীট আমাদের মত জীব কি প্রণালীতে তোমাকে ক্রমে ধারণ করিতে পারে, গ্রহণ করিতে পারে, আত্মস্থ করিতে পারে, তাহা তুমি যেমন ভাল জান, এমন আর তো কেহ জানেনা তাই তুমি সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ ও প্রচারের ভার মানুষের হাতে দেওনা; বড় বড় প্রেরিত সাধু মহাজন বলিয়া গণ্য যাঁহারা, তাঁহাদের হাতেও তুমি এ স্বর্গীয় ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব দান কর না। নিজে কর্ত্তা হইয়া তোমার হাতের যন্ত্ররূপে সাধু মহাজন প্রেরিত-দিগকে এ কার্য্যে ব্যবহার কর। সাধু ভক্তগণ তোমা হইতে এমন প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন যে, তাঁহারা সহজেই তোমার হাতে ধরা দেন; আপনার কামনা বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, তোমার হাতের যন্ত্ররূপে, পৃথিবীতে তোমার প্রদত্ত শিক্ষা, তোমার প্রদত্ত ধর্ম্মালোক ও বিধি ব্যবস্থা প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হন। তাঁহাদের এই স্বভাব দেখিয়া, তাঁহারা যে তোমার প্রেরিত, তাহা সহজে লোকে বুঝিতে পারে। তোমার স্বভাবের ভিতরেই পূর্ণ ধর্ম্ম, স্বয়ং তুমিই ধর্ম্ম। অতএব জীবনে যাহা কিছু ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ইচ্ছা পোষণ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা সাক্ষাৎ ভাবে তোমার বিরুদ্ধেই করিয়াছি, এবং তাহা করিয়া তোমার প্রাণেই সাক্ষাৎ ভাবে আঘাত দিয়াছি ও দিতেছি। ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, ধর্ম্মবিধি লঙ্ঘন করিয়া, আমি আমার শরীর, মন ও আত্মার কতই ক্ষতি করিয়াছি, অপরেরও ক্ষতির কারণ হইয়াছি, ইহা মনে হইলে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু তাহা দ্বারা আমি তোমার প্রাণে আঘাত করিয়াছি, তোমার কোপানলে পড়িয়াছি, সাক্ষাৎ ভাবে তোমার নিকট দণ্ডনীয় হইয়াছি ও হইতেছি, ইহা স্মরণ হইলে প্রাণে বড়ই ভীতির সঞ্চার হয়, আমার অপরাধের গুরুত্ব তখন অভাবনীয় রূপে বাড়িয়া যায়। এ পর্য্যন্ত জীবনে কার্য্যে ও আচরণে, চিন্তায় ও ইচ্ছায়, যত প্রকার পাপ করিয়াছি, কেবল তোমার বিরুদ্ধেই করিয়াছি, ইহা স্মরণ করিয়া ও স্বীকার করিয়া, হে ধর্ম্মরাজ! তোমার চরণে কাতর প্রাণে এই ভিক্ষা চাই, তুমি নিজগুণে আমার

জীবনের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমূল সংশোধনের ব্যবস্থা কর, এবং সংশোধন করিয়া, তোমার আপনার জন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে একজন করিয়া লও, তব পাদপদ্মে এই কাতর প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের সৌভাগ্য।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের দোষ, দুর্ব্বলতা, অভাব, অপ্রস্তুতির বিষয় সর্ব্বদাই মনে পড়ে, বন্ধুবান্ধবগণও কতভাবে সে সব স্মরণ করাইয়া দেন। আমাদের মণ্ডলীগত জীবনের অভাব অপ্রস্তুতির বিষয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনার অভাব নাই। আমাদের শত ত্রুটী সত্ত্বেও আমরা কি আমাদের ধর্ম্মজীবনে সৌভাগ্যের বিষয় কিছু দেখিতে পাই না? শুধু দুর্ভাগ্যের দিক দেখিয়া, দুর্ভাগ্য আলোচনা করিয়া, দুর্ভাগ্যকে মনের পোষণ-সামগ্রী অথবা বুকের বল করিয়া কি মানুষ অনেক দিন বাঁচিতে পারে? এ পথে শীঘ্রই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবসাদ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত আসিয়া জীবনকে অধিকার করিতে পারে। আমাদের নানা প্রকার বিষম ত্রুটী সত্ত্বেও, মরিতে মরিতেও, আমরা যে মরি নাই, এখনও আমাদের মধ্যে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহা অতি সত্য কথা। ইহার কারণ এই, আমাদের শত ত্রুটী সত্ত্বেও ঈশ্বরের করুণা আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই, আমাদের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলার স্রোত মৃদুমন্দগতিতে হইলেও চলিতেছে, জীবন-নদীতে স্রোত একেবারে বন্ধ হয় নাই, ইহা আমাদের সৌভাগ্য। জীবন্ত ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে স্বর্গের অনন্ত অমৃত ভাণ্ডার খুলিয়া, একটা স্বর্গের জীবন্ত বিধানের অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দেখাইয়া, ক্রমাগত সেই দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা আমাদের নিকট কত বড় সৌভাগ্য! তাই আজ প্রাণ ভরিয়া আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করি, কীর্ত্তন করি; কেননা সে সৌভাগ্য ব্রহ্ম-প্রদত্ত সৌভাগ্য, সে সৌভাগ্যের কীর্ত্তন করা এবং ব্রহ্মলীলা কীর্ত্তন করা একই কথা। ব্রহ্মগুণ কীর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মলীলা-যশ গান করিলে, মরা মানুষ বাঁচিয়া যায়, পাতকী উদ্ধারের পথে অগ্রসর হয়। তাই আজ আমাদের জীবনে ও মণ্ডলীতে ব্রহ্ম-প্রদত্ত সৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করি, কীর্ত্তন করি।

সাধুরা বলেন, যে বিশেষ যুগে জীবের পরিত্রাণপ্রদ ভগবল্লীলা-বিধান জগতে সমাগত হয়, সে যুগ বড় সৌভাগ্যের যুগ। আমাদের বর্ত্তমান যুগ জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্তলীলার যুগ। বঙ্গ ও ভারতকে করুণাময় ঈশ্বর এ যুগে তাঁহার জীবন্ত লীলাভূমি রূপে মনোনীত করিয়া, স্বর্গের অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র লীলা কতই প্রকটিত করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন! জীবন্ত লীলার পরিত্রাণপ্রদ স্রোত এখনও বঙ্গ ভারতের বক্ষ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত ও চিহ্নিত মণ্ডলীগত জীবনের শুধু পরম সৌভাগ্য নহে, ইহা সমগ্র বঙ্গ ভারতের সৌভাগ্য, পৃথিবীর পক্ষেও সৌভাগ্য। কেন না, পুণ্যের হাওয়া যখন জোরে বহিতে থাকে, পুণ্য বায়ুর ঝড়, ঈশ্বরের স্বর্গীয় বিধান-বাণীর ঝড় যখন প্রবলবেগে চিদাকাশে উত্থিত হয়, তখন সে ঝড় দেশ কালের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, সকল দিক্ দেশ বিকম্পিত করিয়া প্রবাহিত হয়। তাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, তাঁহার সহকর্ম্মী সহপ্রেরিত প্রতাপচন্দ্র, ভাই প্রমথলাল, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই নবলীলার উত্তাল তরঙ্গ, এই ব্রহ্মবাণীর ঝড় মস্তকে বহন করিয়া, সুদূর ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বিধানবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিলাতে গিয়া বিশেষ একটী খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দিরে উপদেশ দান উপলক্ষে ঘোষণা করেন:—

"If you desire to see the living God carrying on the work of national redemption in a living manner, you should go to India. You will see there a spectacle which in simple beauty and grandeur has, I believe, no parallel in any other part of the world at the present moment."

"মানব-জাতির পরিত্রাণের ব্যাপারে জীবন্ত ভাবে জীবন্ত ঈশ্বরের কার্য্যের পরিচালনা যদি তোমরা দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে ভারতে গমন কর। তোমরা সেখানে সহজ সুন্দর ও মহিমাময় এমন একটী দৃশ্য দেখিবে, যাহার সমতুল্য কিছু বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্য কোন অংশে দেখিতে পাইবে না।" বাগ্মিবর প্রতাপ

চন্দ্র ও অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁহাদের পৃথিবী-ব্যাপী ভ্রমণে ও অন্যান্য সময়ে কত দূরতম দেশে, কত ভাবে এই নববিধানের স্বর্গের বার্ত্তা প্রচার করিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল ১৯১২ খৃস্টাব্দে বার্লিণ নগরীর মহাধর্ম্ম-সম্মিলনীতে এই নববিধানের সঙ্গীত-মালা-যোগে কেমন নব বাইবেল নব যুগে প্রণীত হইয়াছে, তাহা অকুতোভয়ে ঘোষণা করিলেন। এই যে নবযুগে নূতন আকারে জগতের পরিত্রাণপ্রদ, মহাসম্মিলনপ্রদ ধর্ম্ম-বিধান আসিল, এই ধর্ম্ম-বিধানের ভিতর দিয়াই আমরা অতীতের সকল বিধান নব ভাবে জীবন্ত আকারে সম্ভোগের অধিকারী হইয়াছি, এবং দিনের পর দিন এই ধর্ম্ম-বিধানই ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমান করিয়া, কত নব নব তত্ত্বে ও স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্যে আমাদের প্রাণকে উদ্ভাসিত করিতেছে। বর্ত্তমান তো আমাদের আয়ত্তাধীন হইতেছে এবং হইবেই, সুদূর ভবিষ্যৎও আমাদের আয়ত্তাধীন হইবে। বর্ত্তমান বিধান আশার সেই সুদূর ভবিষ্যৎকেও আমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছে, ইহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম-বিধানের অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাইতেছি, সময় সময় কাঁপর হইতেছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা কত অপদার্থ, কত অযোগ্য, কত অপরাধী, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া যখনই দীনাত্মা হইয়া পরম দেবতার শরণাপন্ন হইতেছি, তখনই তিনি পবিত্রাত্মরূপে আমাদিগকে পরিচালন করিতে, পথ প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। অনন্তরূপা স্নেহময়ী জননীরূপে তাঁহার অভয়বাণী শুনাইয়া, তাঁহার সুকোমল সুনির্ম্মল মাতৃ-স্নেহের দিব্য স্পর্শ দান করিয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত ও শক্তিমান্ করিতেছেন, ইহা যখন প্রত্যক্ষ করি, তখন দেখি, আমাদের মত সৌভাগ্য আর কাহার? স্বর্গের এই করুণা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, আমরা আমাদের সকল ত্রুটী অপরাধ স্বীকার করিয়া, সেই অনন্ত-স্নেহরূপা জননীর চরণে আত্মসমর্পণ করি, এবং তাঁহার শ্রীহস্তে গঠন লাভ করিয়া তাঁহারই স্বর্গের পরিবারের চিহ্নিত পুত্রকন্যারূপে পরিণত হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ত্যাগেই লাভ।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিলেন, "যত ছাড়িবে, তত পাইবে। এক গুণ ছাড়, এক গুণ পাইবে; দশগুণ ছাড়, দশগুণ পাইবে। ইহা অভ্রান্ত নিশ্চিত সত্য।"

কখন পতন অসম্ভব হয়।

মাধ্যাকর্ষণী শক্তির অতীত স্থানে যদি কোন পদার্থ উড়িয়া যায়, তখন আর পৃথিবীর আকর্ষণী-শক্তি তাহাকে টানিয়া নামাইতে পারে না। পরলোকগত ব্যক্তিরা সংসারের মাধ্যাকর্ষণী-শক্তির বাহিরে চলিয়া যান, তাই তাঁহারা আর এ দেহপুরে ফিরিতে পারেন না। এই জন্যই তাঁহাদের আর পৃথিবীতে জন্ম হয় না। এমনই যোগী ভক্তগণেরও মন সংসারের মায়ার আকর্ষণের বাহিরে যখন চলিয়া যায়, তখন আর পৃথিবীর মায়ায় আবদ্ধ হয় না; তাই তাঁদের পতন অসম্ভব হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "কোথায় আমার আমি পাখী, সে এই দেহখাঁচা হইতে উড়িয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না।"

নবজীবনের উদ্গম।

বাগানে একটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হল। কয়েকদিন পরে দেখা গেল, বৃক্ষটি শুকাইয়া যাইতেছে, পত্রাদি উদ্গত হইতেছে না, এজন্য শুষ্ক অংশটুকু কাটিয়া দেওয়া হইল। অল্পদিন মধ্যেই নূতন পল্লব বাহির হইয়া মৃতপ্রায় বৃক্ষ সজীব হইল, নবজীবন লাভ করিল। আমাদের জীবন-তরুও অনেক সময় যখন নানাকারণে শুষ্ক হইয়া আসে, তখন বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ রূপ শুষ্ক ভাব কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিলে, আবার নবজীবন সঞ্চার হইয়া থাকে। উদ্যানের কদলী-বৃক্ষ একেবারে মরিয়া গেলেও তাহার স্থানে নব নব তরু উদ্গত হইতে দেখা যায়; পুরাতন জীবনের কুঅভ্যাস বা আমিত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই সেইরূপ নব নব জীবন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ একজনের আমিত্বের মৃত্যুতে দলগত জীবনেরও উদ্গম হয়।

সমস্যা।

কোন ব্রাহ্মবন্ধুর সন্তানগণকে প্রতিদিন প্রাতে প্রার্থনা আবৃত্তি করিতে শেখান হয়। শিশুগণ প্রার্থনাও করে, আবার প্রার্থনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দুষ্টামিও করে। বন্ধু তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রার্থনা করিতে মানা করিলেন। ছেলেরা আর প্রার্থনা করে না, কিন্তু দুষ্টামি যেমন করিত,

তেমনি করিতেছে। শিশুগণ প্রার্থনা করিয়া যে প্রার্থনা মত কাজ করে না, তাহার প্রশ্রয় দেওয়া অবশ্যই উচিত নয়; কিন্তু একেবারে প্রার্থনা করাই যদি বন্ধ করা হয়, তাহাতে কি ভাল ফল হইবে? অনেক ব্রাহ্ম-পরিবারে এই সমস্যা উপস্থিত। ছেলে মেয়েরা বেশ পড়াশুনা করিতেছে, কিন্তু সে পরিমাণে ধর্ম্ম-নীতি কই শিখিতেছে? মৌখিক প্রার্থনা করায় যদি প্রশ্রয় না দিতে চাও, প্রার্থনা করিয়া তাহা যাহাতে পালন করে, পিতামাতার কি তাহার চেষ্টা করা উচিত নয়? তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করিয়া, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা যেন তাঁহারা শিক্ষা দেন, প্রার্থনা করিয়া কেমন করিয়া তাহা পালন করিতে হয়। কাহারও কোন রোগ হইলে যে ঔষধ সেবন করান হয়, তাহা যদি কার্য্যকরী না হয়, চিকিৎসক হয় তাহা বদলাইয়া দেন, নয় তাহার মাত্রা বাড়াইয়া দেন, একেবারে ঔষধ সেবন করা বন্ধ করেন না, তাহা করিলে আরো বিষময় ফল হইতে পারে। সেইরূপ দুর্নীতি দুষ্টামি নিবারণের জন্যই প্রার্থনা-সাধনের ব্যবস্থা, কিরূপে সে ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। প্রার্থনা একেবারে বন্ধ করিলে আরো অশুভরূপ কুফল ফলিতে পারে।

—•—

পরলোক ইহলোকের বিবর্ত্তন বা EVOLUTION

(ভাদ্রোৎসবে, ৬ই ভাদ্র, দিনব্যাপী উৎসব দিনে প্রাতঃকালীন উপাসনায় বিবৃত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা ব্রহ্মকে চিন্ময় বলিয়া স্বীকার করি ও বিশ্বাস করি। ব্রহ্ম যে চিন্ময়, ইহা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই চিন্ময়ের বাহ্য প্রকাশ পৃথিবী—চিন্ময়ের অভিব্যক্তি এই জগৎ; অতএব চিন্ময় হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহা নিশ্চয়ই চিৎস্বরূপের আংশিক প্রকাশ। জীব-জগতে দেখা যায় যে, যে জাতীয় জীব, তাহার মধ্যে হইতে সেই জাতীয় জীব প্রসূত হয়;—যথা মানব হইতে মানবের বংশ সৃষ্ট হয়। এক এক জাতীয় ইতর প্রাণী হইতে সেই সেই জাতীয় জীব জন্ম গ্রহণ করে; সুতরাং ব্রহ্মের চিন্ময় সত্তা হইতে যখন এই জগৎ উৎপন্ন, তখন ইহাও তজ্জাতীয় হইবে। আমরা বিশ্বাসী, বিশ্বাসের একটী পৃথক দৃষ্টি আছে, সেই দৃষ্টি দিয়া বিশ্বাসী যাহা দর্শন করেন, বিজ্ঞান তাহাকে খণ্ডন করিতে পারে না, বরং বিজ্ঞানের বিচার ও মীমাংসার দ্বারা বিশ্বাসের দর্শন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকে যে জগৎ আমাদের নিকট চিন্ময় বলিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের বিচারে তাহারই ভিতর প্রাণের সাড়া প্রত্যক্ষ হইতেছে।

আমরা এই জগৎকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যথা—অণুজগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎ, প্রাণিজগৎ ও মানব-জগৎ। একটী পরবর্ত্তী জগৎ পূর্ব্ববর্ত্তী জগতের বিকাশ বা Evolution। ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া একটী আর একটীর পূর্ণতারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদিগের বিচারে একটী জগতের সহিত আর একটী জগতের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। একটী আর একটীর সহিত বংশ-পরম্পরার যোগ রক্ষা করিতেছে। Matterকে একটী শক্তিরূপে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, সেই শক্তি কি? সেই শক্তি ঐশ্বরিক শক্তি, প্রাণশক্তি; শক্তিই জীবন—সেই জীবনের জীবন ব্রহ্ম বা চিন্ময় শক্তি। "Verily Force is divine. Life—the life of life is God." "প্রাণো ব্রহ্মেতি"। সকল বস্তুর মধ্যেই প্রাণ বর্ত্তমান। ব্রহ্মই প্রাণ-স্বরূপ। প্রাণের ক্ষয় নাই, প্রাণের বিনাশ নাই—কেবলই বিকাশ—কেবলই বিবর্ত্তন—কেবলই Evolution। প্রাণের ধারা ক্রমে ক্রমে অণু হইতে উদ্ভিদে—উদ্ভিদ্ হইতে ইতর প্রাণীতে—ইতর প্রাণী হইতে মানব-জগতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ক্রমের অবস্থা-ভেদে এক একটী পৃথক জীব যেরূপ সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থাভেদে এক একটী পৃথক জগৎও সৃষ্ট হইয়াছে। অণুজগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎ, প্রাণিজগৎ ও মানব-জগৎ একটী আর একটীর ক্রমবিকাশ, ইহা যদি বিজ্ঞানের প্রামাণিক সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে ইহলোকের সহিত পরলোকের সম্বন্ধও ক্রমবিকাশের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আত্মিক জগৎও এই ক্রমবিকাশের অধীন। যে বিধি বা বিধানের দ্বারা ভৌতিক জগৎ পরিচালিত হইতেছে, সেই বিধি বা বিধানের দ্বারা আত্মিক জগৎও পরিচালিত হইতেছে। একই বিধাতার অলঙ্ঘ্য অনুশাসনে আমাদের শরীর, মন ও আত্মা অনিবার্য্য নিয়তির পথে চলিয়াছে।

অশরীরী আত্মা শরীরী আত্মার ক্রমবিকাশ, এখন আমরা ইহা যদি বিশ্বাস করি, তবে সে বিশ্বাসের সহিত বিজ্ঞানের যোগ ছিন্ন হইবে কেন? ক্রমের অবস্থা-ভেদে অণুজগতের সহিত উদ্ভিদ্-জগতের ও প্রাণিজগতের যে পার্থক্য অনুভূত হয়, অশরীরী আত্মার সহিত শরীরী আত্মার সেইরূপ পার্থক্য অনুভূতির বিষয়। অণুজগতের ক্রমবিকাশ হইতে যখন উদ্ভিদ্-জগৎ উৎপন্ন হয়, তখন একটী যে আর একটী হইতে প্রসূত, তাহা চক্ষুদ্বারা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, জ্ঞানের দ্বারা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। সেইরূপ শরীরী আত্মা হইতে অশরীরী আত্মার অবস্থা এত অধিক পরিবর্ত্তিত হয় যে, আমরা বিচার ও মীমাংসার দ্বারা তাহার সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারি না। ইহা সাধন-সাপেক্ষ। যাঁহারা সাধন দ্বারা শরীরী আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন—আত্মার শক্তি ও সত্তার সম্যক পরিচয় লাভ করিয়াছেন—শরীরকে অতিক্রম করিয়া আত্মা যে ঊর্দ্ধলোকে বিরাজ করিতে পারে, এ

অবস্থা যাঁহাদের অনুভূতির বিষয় হইয়াছে—তাঁহারা অশরীরী আত্মার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হন। ঋষি প্রতাপচন্দ্র বলেন, "মৃত্যুর অবগুণ্ঠন কে সম্পূর্ণরূপে ভেদ করিতে পারে? পরলোক বিষয়ে পূর্ণতত্ত্ব কে জানে? যেমন পূর্ণ মাত্রায় ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা অসম্ভব, ইহাও তেমনি। যে পরিমাণে লোকাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব কখন কখন লাভ হয়, সেই পরিমাণে বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব কখন কখন লাভ হয় ও দিব্যধাম-নিবাসী অমরাত্মাদের সুসমাচার মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ ঘোরান্ধকারে জাগ্রত থাকিয়া প্রতীক্ষা করিতে হয়।" ইতর প্রাণীর সহিত মানবের শরীর মনের একটা সাধারণ যোগ থাকিলেও, তাহাদের সুখ দুঃখ প্রকাশ করিবার প্রণালী ও তাহাদের ভাষার সহিত আমাদের এত অধিক পার্থক্য দেখা যায় যে, তাহারা যে আমাদিগের জ্ঞাতি বা বংশধর, তাহা সহজে অনুমান করা যায় না। ইহজগতের সহিত পরজগতের যোগ, সম্বন্ধ ও অবস্থা ভেদও ঠিক সেইরূপ। "মরণান্তে শারীরিক শক্তি, স্মৃতি ও সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে না, নানা অংশে লোপ-প্রাপ্ত হইবে, তা নিশ্চয়; বহু পরিমাণে মানসিক শক্তিও বজায় থাকিবে না; ইহ জীবনেই তাহা অনুভব করিতেছি। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক শক্তির আনুকূল্যে যে জ্যোতির্ম্ময় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঞ্চার ও সঙ্গতি হয়, তাহা কখন ক্ষয়শীল নহে। তামসিক ও রাজসিক গুণের বিশ্লেষে আত্মা আরও তেজঃপুঞ্জ মধুময় আকার ধারণ করে।"—(আশীষ)

আমরা অমরাত্মাদের ভাষা জানি না—কোন্ সূত্র ধরিয়া তাঁহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদান হয়, অথবা আমাদিগের আত্মিক কোন্ অবস্থায় তাঁহাদিগের সহিত পরিচয়ের সুবিধা হয়, তাহাও আমরা বুঝি না। সংসারে অবস্থান কালীন আমরা ভ্রান্তি বশতঃ অনেক শারীরিক প্রবৃত্তি এবং মানসিক শক্তি ও ভাবের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করি; সেটা কাল্পনিক না হইলেও, তদ্দ্বারা একটা অতিশয় ক্ষীণ আভাস মাত্র প্রাপ্ত হই। এই ক্ষীণ আভাসের ভিতর দিয়া আমরা পরলোকের সত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

ইহলোকের সহিত পরলোকের যোগ যদি স্বীকার না করি, তাহা হইলে সৃষ্টির অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া যায়,—জীবন অর্থশূন্য হয়—বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় অণু পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-জীবনের সকল বিভাগ ও বিবর্ত্তনের (Evolution) ক্রমবিকাশের ভিতর যে যোগের সূত্র নিহিত আছে এবং পরীক্ষার দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা মিথ্যা হইয়া যায়—বিশ্বাসীদিগের দিব্য দৃষ্টির ভিতর এক চিন্ময় সত্তায় ইহ পরলোক যে অবিচ্ছিন্ন যোগে নিবদ্ধ, সে ধারণাও ভ্রান্তি বলিয়া মনে হয়—এবং ইহলোকের বিশ্বসৃষ্টির ভিতর ভিন্ন ভিন্ন জগতের উৎপত্তি, তাহাদের ক্রমবিকাশ, তাহাদের পারস্পরিক যোগের ভিতর যে সৃষ্টির প্রচ্ছন্ন শক্তি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাও মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিজ্ঞানের দিক দিয়া, যুক্তির দিক দিয়া, অথবা বিশ্বাসের দিব্য দৃষ্টির দিক দিয়া, পরলোক যে ইহলোকের ক্রমবিকাশ নয়, আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। সৃষ্টির অবং পদার্থের ভিতর আমরা যে যোগের পরিচয় পাইয়াছি, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। তবে সৃষ্টির একই যোগসূত্রের মধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন জগতের উৎপত্তির কারণ নিহিত আছে, সেইরূপ ইহলোকের সহিত পরলোকের সম্বন্ধ বা মিলনও সেই যোগের অন্তর্গত।

মানবের জ্ঞান ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া চলিয়াছে—মানব-হৃদয়ের যে সকল স্থান অন্ধকারে আবৃত ছিল, এখন সেখানে আলোকের সঞ্চার হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেকার মানুষ একথা কি মনে ধারণা করিতে পারিত যে, মানুষের দৃষ্টি অস্থি মাংস ভেদ করিয়া ভিতরের পদার্থ দেখিতে পায়? কখনই নয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকে তাহা সম্ভব হইল। X Rays যেমন ভৌতিক জগতে অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে, অস্থি মাংসের অন্ধকার ভেদ করিয়া নূতন দৃষ্টিযোগে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, সেইরূপ বিশ্বাসের নূতন আলোকে আত্মার দিব্য দৃষ্টি পরলোকের আবরণ ভেদ করিয়া আত্মিক জগতের গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আত্মা উচ্চতর অবস্থা লাভ করিলে, আত্মিক জগতের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় আত্মার স্নায়ু পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইলে, ভগবদ্দর্শন যেমন জীবের পক্ষে সম্ভব হয়, সেইরূপ উচ্চতর আত্মিক যোগের ভিতর পরলোকের আভাস পাওয়া অসম্ভব হইবে কেন?

যে সকল সাধক আত্মলোকে বিহার করেন, শরীরকে অতিক্রম করিয়া চিন্ময় জীবন প্রাপ্ত হন এবং প্রেমাস্পদকে পাইবার জন্য প্রেমিকের প্রাণে যখন অসীম ব্যাকুলতার উদয় হয়, তখন বিধাতা তাঁহার অপ্রতিহত বিধানে প্রেমিকের ব্যাকুল প্রার্থনা কখনও অপূর্ণ রাখেন না। পৃথিবীতে এমন কোন অভাব বিধাতা সৃষ্টি করেন নাই, যাহার পূর্ণতা পৃথিবীতে নাই। শরীরের ক্ষুধা সৃষ্টি করিয়া জীবকে অন্নদান করিয়া সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, পিপাসা সৃষ্টি করিয়া বারি বর্ষণ করিয়াছেন। যে সকল আত্মাকে, আমাদের প্রিয়জনকে আমরা হারাই—তাঁহাদের পাইবার জন্য যখন প্রাণ ব্যাকুল হয়—যখন আত্মা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে—সে অভাব পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা কি তাঁহার বিধানে নাই? নিশ্চয়ই আছে। যে প্রণালীর মধ্য দিয়া সে অভাবের পূর্ণতা হয়, আমরা তাহা জানি না, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেও তাহা গ্রহণ বা সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হই। ভৌতিক জগতে শরীরী আত্মার উপলব্ধির ছাপ মানব-হৃদয়ে যেরূপ পতিত হয়, আত্মিক জগতে অশরীরী আত্মার উপলব্ধি সেরূপে হইবার কথা নয়। চর্ম্ম-চক্ষের দর্শন একরূপ, অন্তশ্চক্ষুর দর্শন অন্যরূপ। বাহ্য বিষয়েও জ্ঞানগত

দর্শনের সহিত চাক্ষুষ দর্শনের পার্থক্য আছে। যাঁহারা দিব্যদর্শী পুরুষ, তাঁহারা মানবের অস্থি মাংস ভেদ করিয়া মনের ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রত্যেক মহাপুরুষ সম্বন্ধে আমরা এ কথার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাপ্ত হইয়াছি। শ্রীকেশবচন্দ্রও মাটির মানুষকুড়াইয়া লইয়া সোণার মানুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিব্য দৃষ্টি-যোগে তিনি কয়লার খনি হইতে হীরক সংগ্রহ করিতেন। মানবের প্রত্যেক চিন্তা মুখে প্রতিফলিত হয়। চক্ষের প্রত্যেক পলকের ভিতর দিয়া মনের স্পন্দন অনুভূত হয়। যাঁহারা দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব হয়। শুভ ও অশুভ চিন্তার সাড়া রক্তের ভিতর পাওয়া যায়। এই দিব্য দৃষ্টি-যোগে ইহলোকে থাকিয়া পরলোকের অনুভূতি সম্ভব হয়, অদৃশ্য-জগতের সত্তা দৃশ্য-জগতে ফুটিয়া উঠে।"

ইহলোকে থাকিয়া যাঁহারা ইহলোকের অতীত হইতে পারিয়াছেন—যাঁহারা ঊর্দ্ধলোকে স্থিতি করেন—আত্মিক আবহাওয়ার ভিতর যাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করেন—তাঁহাদের নিকট পরলোকের সংবাদ আসে। X Rays এর ভিতর দিয়া বৈজ্ঞানিকগণ যখন অস্থি মাংস ভেদ করিয়া মানুষের অভ্যন্তর প্রদেশ দর্শন করেন, সে দর্শন চাক্ষুষ দর্শনের ন্যায় পরিষ্কার নয়, এতো উজ্জ্বল নয়, এতো স্পষ্ট নয়, একটু আবছাওয়া আবছাওয়া মত বোধ হয়। পরলোকের সত্তা আমাদের নিকট যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন পৃথিবীর দর্শনের মত বা স্পর্শনের মত এতো স্পষ্ট নয়; তবে তাহার অনুভূতির ভিতর একটা ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস পাওয়া যায়। সে আভাস পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল হইলেও আলো আঁধারে মিশ্রিত। পৃথিবীর কোন্ জ্ঞান আলো আঁধারে মিশ্রিত নয়? মানুষের মনের কোন্ অনুভূতি ক্রমবিকাশের অধীন নয়? পৃথিবীর কোন্ তত্ত্ব যুগযুগান্তরের সাধনা বিনা সিদ্ধ হইয়াছে? কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি সৃষ্টিতত্ত্ব, কি সমাজ-তত্ত্ব যেরূপ অসংখ্য বংশপরম্পরার ভিতর দিয়া মানব-হৃদয়ে নব নব আলোক দান করিতেছে, পরলোক-তত্ত্বও সেই নিয়মের অধীন। আমরা পরলোকের কণা মাত্র আলোক পাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন শাশ্বত ও অক্ষয়। এই নিত্য জীবন আমাদের মধ্যে যত ফুটিয়া উঠিবে, ইহলোকের সহিত পরলোকের যোগের ভূমি ততই দৃঢ় হইবে। শোকের পরিবর্ত্তে, বিচ্ছেদের পরিবর্ত্তে, এক অনন্ত শান্তি ও আনন্দের অনুভূতির ভিতর, আত্মিক জগতের সহিত আমাদের মিলন নিত্য হইবে। চিন্ময়ের সন্তান হইয়া আমরাও চিন্ময় হইব এবং ইহ-পরলোক-নির্ব্বিশেষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবক্ষে বাস করিব। ঋষি প্রতাপচন্দ্রের "আশীষ" হইতে "অক্ষয়ধাম" সম্বন্ধে শেষ বাণী দুই একটী বলিয়া অদ্যকার নিবেদন সমাপ্ত করিব :—"হে ভ্রান্তিহারী সত্যরূপ ভগবান্, অনেকবার নিভৃত ব্রহ্ম-সহবাস-জনিত আবেগে পারলৌকিক দিব্য আভাস পাইয়াছি, আরও পাইব। এ বিশ্বাস আরও উজ্জ্বলতর হইতেছে যে, দেহান্তে দৈহিকতা থাকিবে না বটে, কিন্তু এক অদ্ভুত দিব্য তনু ধারণ করিব।" "দিব্যাত্মা লোকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদিগের স্থান, পরিচয় ও শুভ সন্দর্শন প্রাপ্ত হইব;" এখন যাহা কেবল মাত্র বিশ্বাসে ও আশার আঁধার আলোক মিশ্রিত চক্ষে দেখি, তখন তাহা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিব।" "বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব বিষয়ে আমার অসীম স্পৃহা ও অসীম কৌতুক—মৃত্যুকে ভয় করা দূরে থাকুক, মৃত্যুর স্মরণে আনন্দ আশার পরিসীমা নাই।"

যদ্দ্বারা অমৃতের পথ মানুষ দেখিতে পায়, তাহাকে মৃত্যু বলিব কিরূপে?—যদ্দ্বারা বিনাশের মহাভয় হইতে জীব পরিত্রাণ লাভ করে, তাহা জীবনের সদর ভ ব্যতীত আর কি?—যে লোকে যাইবার জন্য সাধকের প্রাণ অসীম কৌতুকাবিষ্ট হয়, তাহার অনন্ত সিদ্ধই চির-আনন্দ লোক। যে প্রাণের প্রবাহ অণু-পরমাণুতে চলিয়াছে—উদ্ভিদে যাহার জীবনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে—প্রাণি-মণ্ডলে যাহার বিচিত্র ক্রমবিকাশ মানব-বংশের সহিত বৈচিত্র্য সপ্রমাণ করিতেছে, সেই প্রাণেরই নিত্যলীলা মানবাত্মার পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া, ইহলোক হইতে পরলোকে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। আমাদিগের দিব্যদৃষ্টি যতই প্রস্ফুটিত হইতেছে, আমরা ততই বুঝিতে পারিতেছি, এ ব্রহ্মাণ্ড চিন্ময়েরই প্রকাশ—চিন্ময়েরই অভিব্যক্তি। আমরা চিন্ময়রাজ্যে বাস করিতেছি—চিন্ময় বায়ু-মণ্ডলে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি—চিন্ময় দৃষ্টিতে অক্ষয়ধামের পরিচয় পাইতেছি; সে পরিচয় ক্ষুদ্র হইলেও মহান্—আঁধার-আলোক-মিশ্রিত হইলেও ক্রম-পরিস্ফুট—ক্ষীণ আভাস হইলেও সুনিশ্চিত। আমরা সমুদ্রতীরে যখন দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টিপাত করি, তখন সমুদ্রের কতটুকু দেখিতে পাই? আমাদের দৃষ্টি খর্ব হইলেও তাহার ভিতর দিয়া এক অসীমের সংবাদ পাই, অনন্তের ধারণা প্রাণে উপস্থিত হয়; সেইরূপ আমাদিগের ক্ষীণ দিব্য দৃষ্টি হইতে যতটুকু পরলোকের দর্শন প্রাপ্ত হই, তাহাই আমাদিগকে এক অনন্ত অক্ষয় ধামের সংবাদ দান করে; এবং আমরা বিধাতার নিকট হইতে এই অব্যর্থ অঙ্গীকার প্রাপ্ত হই যে, ইহধামের মোহময় দৈহিকতা বিসর্জ্জন দিয়া, নূতন তেজঃপুঞ্জ ভাগবতী তনু ধারণ করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি করিব। চিদানন্দ-সাগরে, মীন যেমন সানন্দে সলিলে বিহার করে, আমরা সেইরূপ বিচরণ করিব। আমাদিগের চিরপ্রার্থিত অক্ষয়ধামের প্রতীক্ষায় আমরা জীবিত আছি। ব্রহ্মাণ্ড যে চিন্ময়ের অভিব্যক্তি, এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। সকল বস্তুতে এই প্রাণের পরিচয়ই পরলোকে নিত্য জীবনের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ধর্ম্ম-সাধন"।

২৩ সংখ্যা—১৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

১১ই আশ্বিন—১৭৯৪ শক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—অনুভব, উপলব্ধি ও দর্শনের মধ্যে প্রভেদ কি ?

উত্তর—অনুভব এই তিনের নিকৃষ্ট অবস্থা। ঈশ্বর আছেন, ইহা অনুভব করা কি ? না চিন্তা করিয়া জ্ঞান-গোচর করা। উপলব্ধির অর্থ ঠিক সাক্ষাৎ লাভ নয়, কিন্তু ধ্যান দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া রাখা। দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার-লাভ, ইহা অতি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ভাব এবং ইহাতে চিন্তা কল্পনার সাহায্য আবশ্যক নয়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সম্মুখে আছেন, কেবল সাক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে দেখা।

প্র—ঈশ্বর পাপীকে দেখা দেন কি না ?

উ—তাঁর নাম যখন অধম-তারণ, পতিত-পাবন, তখন তিনি যে পাপীকে দেখা দেন, তার সংশয় কি ? কেহ আপনার পুণ্যের বলে তো তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি আপনার কৃপাগুণে পাপী পুণ্যবান্ উভয়কেই দেখা দেন। পাপী পাপ-বিকারের মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁকে অন্বেষণ করে, পুণ্যবান্ সৎকার্য্য করিয়া তাঁর প্রেমে আরো মুগ্ধ হইতে থাকেন। আসল কথা, এই পাপী সকলেই, এবং আধ্যাত্মিক জগতের চিকিৎসা-শাস্ত্রে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যে অবস্থায় আমরা তাঁহার দর্শন-লাভের জন্য প্রস্তুত, অথবা যে অবস্থায় দেখা দিলে আমাদের কল্যাণ হইতে পারে, সেই অবস্থাতেই তিনি দেখা দেন।

প্র—পুণ্যবানেরা কি তাঁহার অধিক দর্শন পান না ?

উ—কোন মূল্য দিয়া ঈশ্বরকে ক্রয় করা যায় না, আমাদের পুণ্য মূল্য দিয়া কি তাঁহাকে কিনিতে পারি ? তবে যে কথিত আছে, "blessed are the pure in spirit for they shall see God."—"পবিত্র আত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন"। ইহার মর্ম্ম এই যে, নিজের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের পুণ্যভার হৃদয়ে ধারণ করা, তাঁহার জন্য ব্যাকুলিত থাকা, সকল ছাড়িয়া তাঁকে স্মরণ করা, এইরূপ হইলে ঈশ্বরের দর্শন হয়। হৃদয়কে স্বচ্ছ কাচের ন্যায় করিতে হইবে। কিন্তু আমি দেখিবার উপযুক্ত হইয়াছি, এত আমার পুণ্যবল, এ ভাব যাঁর মনে আসে, তিনি ঈশ্বরকে হারান। আমাদের পাপ যত চলিয়া গিয়া পুণ্য স্বভাব হইবে অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরের বলে বলী, তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁর পবিত্র জ্যোতিতেই পবিত্র, তাঁর আনুগত্যেই মহৎ বুঝিতে পারিব, তত হৃদয় পবিত্র হইবে, তত তাঁহাকে দেখিতে পাইব।

প্র—পাপের মধ্যে ঈশ্বর কখন দেখা দেন, আবার দেন না, ইহার কারণ কি ?

উ—জ্বর যেমন কুইনাইন বিরামকালে দিতে থাকে, জ্বর-প্রকোপের সময় দিলে তাহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়; পাপের মধ্যে সেইরূপ বিরামের অবস্থা আছে, সেই সময়ে ঈশ্বর দেখা দেন, যে সে দর্শনে পাপী আপনার অবস্থা বুঝিয়া সচেতন ও সাবধান হইবে এবং পাপ ত্যাগ করিয়া পুণ্যের পথে আরোহণ করিবে। অত্যন্ত পাপ-প্রকোপের মধ্যে যদি দেখা দেন, আমরা তাঁহার নিতান্ত অমর্য্যাদা করি এবং তাহাতে আত্মার অধিক অনিষ্ট হয়। ঈশ্বর আমাদের অপরাধের জন্য অনেক সময় দেখা দেন না—সে কেবল আমাদের অনিষ্ট হইবে বলিয়া। অনেক সময় আশা করি না, আপনাদিগকে অপ্রস্তুত ভাবি, অথচ দেখা দেন। আমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা নয়। তিনি আত্মার চিকিৎসার যথার্থ কৌশল জানিয়া কার্য্য করেন।

প্র—কিরূপ অবস্থা হইলে ঈশ্বরের নিত্য দর্শন লাভ হয় ?

উ—সম্পূর্ণরূপে তাঁহারি হইতে পারিলে। ভক্তি-যোগে ভক্ত ক্ষণকাল তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন, সেই ভক্তিযোগ সমুদায় জীবনে ব্যাপ্ত করিয়া অধিকতররূপে তাঁহার দর্শন পায়। তিনি ভক্তের জীবন হইলে ভক্ত তাঁহাতে সকল সঁপিয়া দেয়, তাঁহা ভিন্ন কিছু জানে না, দেখে না। তাঁহার সহিত নিত্য সহবাসে ভক্তের জীবন সার্থক হয়।

প্র—ঈশ্বর যদি সকল মনুষ্যকে সুখী করিতে চান, তবে এককালে সকলকে আপনার সহবাস দিয়া কেন কৃতার্থ না করেন ?

উ—তিনি তো সর্ব্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া সহবাস দিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমরা নিজে অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আর তিনি জড় পদার্থের ন্যায় কোন আত্মাকে আপনার সেবক ও সহবাসী করিতে চান না। আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার দ্বারা আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যাই, এই তাঁহার আদেশ ও নিয়ম। তিনি তো চান, এখনি আমাদিগকে মুক্তি দান করেন, কিন্তু স্বাধীনতা বাধা দেয়, এই জন্য বিলম্ব হয়। যখন স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার সহিত যোগ দিবে, তখনি আমাদিগের মুক্তি লাভ হইবে।

প্র—ধর্ম্ম বা ঈশ্বরকে না মানিয়া পবিত্র বা সচ্চরিত্র হওয়া যায় কি না ?

উ—পবিত্রতার আধার ঈশ্বর, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পবিত্রতা কোথায় ? কম্‌টীর শিষ্যেরা যে পবিত্রতার ভাণ করেন, তাহা মৌখিক ও অসার। দয়া, ন্যায়পরতা ও নির্দ্দোষিতা পবিত্রতা নয়; পাপ প্রলোভনের মধ্যে অটলভাবে পবিত্র-স্বরূপের দিকে

অগ্রসর হওয়া পবিত্রতার পরীক্ষা। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহা কি সম্ভবে? আপনার বলে দুই দিবস চলিতে পারি, তৃতীয় দিনে পতন নিশ্চয়। ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা উপাসনা ছাড়িয়া আপনার বলে ধার্ম্মিক হইতে গিয়াছেন, তাঁহাদের পতন হইয়াছে।

প্র—ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবার আবশ্যকতা লোকে কখন বুঝিতে পারেন?

উ—তাঁর উপর নির্ভর না করিলে আরাম ও শান্তি পাওয়া যায় না, আপনার চেষ্টায় দুর্জ্জয় পাপকে পরিত্যাগ করা যায় না, জীবনকে আর কোন প্রকারে সর্ব্বক্ষণ পুণ্যালোকময় রাখা যায় না, এই সকল বুঝিতে পারিলে তাঁর উপর নির্ভর না করিয়া থাকা যায় না। স্বীয় ইষ্ট দেবতার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুরা কত সময় বিপদ ও পাপ তাপ হইতে আরাম পান। যাঁহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারেন, তাঁহারা এককালে নিশ্চিন্ত হন. ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের জীবনের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সকল আশা পূর্ণ করেন।

প্র—আধ্যাত্মিক জগতের যোগ এ জীবনে কি প্রকারে বুঝা যায়?

উ—আধ্যাত্মিক এক অবস্থাপন্ন লোকে এক স্থানে দণ্ডায়মান হন এবং এক অঙ্গের চালনে সকলে আন্দোলিত হইয়া থাকেন। মফঃস্বলস্থ অনেক ব্রাহ্মের মুখে আমরা অবগত হইয়াছি, যখন তাঁহাদের মনে যে কোন নূতন গভীর ধর্ম্মভাবের আলোচনা আসিয়াছে, তাহার অনতিবিলম্বে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি পত্রে সেই সকল বিষয় লিখিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার কারণ এই যে, কলিকাতায় অনেক ব্রাহ্ম একত্রে যে ধর্ম্মভাব লইয়া বিশেষ আন্দোলন করেন, তাহা সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মনকে আঘাত করিয়া থাকে। এই জন্য তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে হৃদয়ের অনুরূপ ভাব চিত্রিত দেখিতে পান এবং মৌখিক বা লিপিযোগে সংবাদ পাইবার অগ্রে হৃদয়ে সংবাদ পান। এক সময়ে লুথার, চৈতন্য, নানকের উদয়েরও এইরূপ কারণে অসম্ভব নয়। ইহলোক ও পরলোকের একভাবাপন্ন আত্মা সকলের পরস্পরের সঙ্গে এইরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে।

প্র—আধ্যাত্মিক সত্য সকল বুঝিবার উপায় কি?

উ—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যেরূপ, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানেও সেইরূপ বিনয়ী সাক্ষী হইয়া সত্যদর্শন করিতে হয়। আমরা নিজের যুক্তি বা কল্পনা-বলে কোন সত্যের উৎপত্তি বা লোপাপত্তি করিতে পারি না। আধ্যাত্মিক সত্য সকল অবধারণ করিতে হইলে অধিক ধৈর্য্য, আত্মসংযম ও বিনয় আবশ্যক।

প্র—কেবল সামান্য অনুতাপই কি পাপের শাস্তি?

উ—প্রকৃত অনুতাপ কি, লোকে জানে না বলিয়া অনুতাপকে অতি সামান্য মনে করে। ঘোরতর পাপ করিয়া মুখে একবার বলিলাম, 'আমি বড় কুকর্ম্ম করিয়াছি, আর করিব না', আর অনুতাপ হইল, পাপ চলিয়া গেল, এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভ্রম। অনুতাপের অর্থ আত্মা দগ্ধ হওয়া। আগুনে হাত দিলে যেমন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আর জ্বালাতে তাহা স্পর্শ করিতে চাই না, পাপ করিয়া যদি সেইরূপ যন্ত্রণা পাই, হৃদয় যদি পাপকে সেইরূপ এককালে পরিত্যাগ করে, তবে অনুতাপ হইয়াছে বলা যায়। অনুতাপ যেমন পাপ হইতে মুক্ত করে, সেইরূপ পবিত্রতার জন্য হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া দেয়। অনুতাপের অশ্রুতে হৃদয় গলিয়া ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে মিলিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃপেন্দ্র-সমাগম।

(২০শে সেপ্টেম্বর, কোচবিহার ব্রহ্মমন্দিরে,
ভাই প্রিয়নাথের আত্ম-নিবেদন)

পুণ্য-স্মৃতি-সভার সভাপতি মহাশয় আক্ষেপ করিলেন, "যিনি এই নূতন কোচবিহারের গঠন করিলেন, তাঁর অমাত্য, রাজ-কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের কি কর্ত্তব্য নয়, এই পুণ্য দিনে সর্ব্বজনে সমবেত হ'য়ে, তাঁর পুণ্য জীবন-কাহিনী শ্রবণ করেন, আলোচনা করেন ও তাঁর প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন?" সেই কর্ত্তব্য-সাধনে প্রণোদিত হইয়াছি।

শ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীনৃপেন্দ্র-সমাগম-সাধনার্থ প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-প্রেরণায় এ দীন সেবক যথার্থ তীর্থযাত্রী হইয়া কোচবিহারে আসিয়াছে। শ্রীনৃপেন্দ্র-নারায়ণ যেমন কোচবিহারের, তেমনি আমারও উপকারী বন্ধু, নববিধান-প্রেরিত স্বদেশ-সেবক, প্রজাবৎসল, দীনজন-প্রতিপালক রাজা। তাঁহার প্রতি আমার ও আমার বিধান-পরিবারের কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণে আমার পরিত্রাণ, ইহা মনে করিয়া প্রাণ যখন এ তীর্থ-সাধনে ব্যাকুল হইল, তখন সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা তিরোহিত করিয়া, মা স্বয়ং আপনাদের সেবা করিবার জন্য এখানে আসিতে সক্ষম করিলেন। ধন্য তাঁর কৃপা।

মহাপুরুষ ও মহাজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দানে আমরা আপনারাই সম্মানিত এবং কৃতার্থ হই। যদি আমরা তাহা না করি, আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হই ও অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হই। বাস্তবিক সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্মে এক বিশেষ পুণ্যানুষ্ঠান। পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার্পণ ও তাঁহার আত্মার তৃপ্তি-সম্পাদন বা তর্পণ সত্যই অতি উচ্চ সাধন। সাধারণতঃ তাঁহাদের আত্মার স্মরণে দীন দুঃখী জনে দান, ইহাই প্রথা হইয়াছে বটে; কিন্তু বাস্তবিক পিতৃপুরুষগণের সদ্গুণ সকলের স্মরণে আমাদের আত্মা সেই সকল গুণলাভে যখন আকাঙ্ক্ষিত হয় এবং তদ্দ্বারা যাহাতে আমরা তাঁহাদের আত্মার আত্মস্থ হইতে পারি, ইহাই আকাঙ্ক্ষা হয়, তখনই যথার্থ তাঁহাদের আত্মা তৃপ্ত হয়। বাহিরের তক্ত্য-কোলা-

দানে ও দরিদ্র-সেবায় যত না তাঁহাদের আত্মা তৃপ্ত হয়, তাঁহাদের আত্মার সদ্‌গুণ-গ্রহণেই প্রকৃত তাঁহাদের তৃপ্তি হয়। কাহারও সন্তান জন্মিলে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি আত্মা হইতে আত্মা যখন জাত হয়, তখনই আত্মা আনন্দিত হয়।

আত্মা আত্মার অন্ন পান চায়, বাহিরের অন্ন পান এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রকার তাই বলেন, স্বর্গগত ব্যক্তি ক্ষুৎপিপাসা অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দিত হন। তাই নববিধানে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত ব্যক্তির আত্মার কেবল কল্যাণ-সাধন বা তৃপ্তিসাধন নয়, তাঁহাদের আত্মার সমাগম-সাধন।

এই সাধনে উপাসনা-যোগে যখনই আমরা ঈশ্বরের আবির্ভাব উপলব্ধি করি, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অমরাত্মাগণেরও অবতারণা অনুভব করি। কোথাও অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেমন অগ্নিপ্রিয় জীব সকল সেখানে আসিয়া সমবেত হয়, ব্রহ্মাবির্ভাবে ব্রহ্মগত বা ব্রহ্মস্থ মহাজনগণও ব্রহ্মসঙ্গে আমাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গ সাধন করিতে দেন। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের শ্রাদ্ধবাসরে ব্রহ্মবক্ষে তাঁর আত্মার অবতারণা অনুভব করিলাম। শাস্ত্রকার যেমন বলিলেন :—

"যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥"

"তোমার যে আত্মা আজ এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি ; তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।" আমরাও এই প্রার্থনা করিয়া শ্রীনৃপেন্দ্র-আত্মার পুনরাগমন ও আমাদের মধ্যে সমাগম-লাভে ধন্য হইলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ যথার্থ ঈশ্বর-প্রেরিত দেবদূত হইয়া এই রাজ্যে শিববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধাতার অলৌকিক ক্রিয়ায় তিনি নবযুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দের সুকন্যা সুনীতি দেবীর সহিত উদ্বাহিত হইলেন। এবং এই মণিকাঞ্চনের যোগে কেবল বিহার বঙ্গের মিলন হইল তাহা নয়, সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বদেশ, সর্ব্বমানবের সম্মিলনের বিধান নববিধানের অভ্যুত্থান হইল। ইহারই কেবল আভাস মাত্র এই কোচবিহার রাজ্যের নবগঠন।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ভবিষ্যৎ বাণী ব্রহ্মবাণী শুনিয়া বলিয়াছেন, "সুনীতির সহিত সুনীতির আলোক ও পরিত্রাণ কোচবিহারে প্রবেশ করিবে।" এখনও যদিও ইহা কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই সত্য, বরং ইহার অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক এখনও যথেষ্টই আছে, মনে হইতে পারে ; কিন্তু যেমন কথা আছে, রোমরাজ্য এক দিনে সুগঠিত হয় নাই, তেমনি ভক্তের বাণী পূর্ণ হইতে বহু সহস্র বৎসর লাগিলেও পূর্ণ হইবেই হইবে। এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়াই এই তীর্থ-সাধনে আসিয়াছি। বিশ্বাস করি, এ সাধন কখনই ব্যর্থ হইবে না।

এই পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে মহাত্মা নৃপেন্দ্রনারায়ণের যে সদ্‌গুণাবলী আলোচিত হইল, তাহা প্রকৃত পুণ্য কাহিনী। তাহা স্মরণে কাহার না আত্মা সে সদ্‌গুণ-লাভের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হয়? মহাজনগণের জীবন আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, আমরাও যেন আপনাদের জীবনকে সেই আদর্শে গঠন করি। সুতরাং নৃপেন্দ্রনারায়ণের গুণ আলোচনা করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হল, ইহা যেন মনে না করি ; কিন্তু তাঁহার আত্মা যাহাতে আমাদের মধ্যে পুনর্জীবিত হয়, তাই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের জীবন বিচিত্রতায় পূর্ণ। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, তাঁহার মাতৃভক্তি, তাঁহার দাম্পত্য-প্রেম, তাঁহার সন্তানবাৎসল্য, তাঁহার সম্রাট্ সখ্য, তাঁহার স্বদেশানুরাগ, তাঁহার আত্মসম্মান, তাঁহার নির্ভীক স্বাধীনতা, তাঁহার দীনতা, তাঁহার দীনপ্রতিপালন, তাঁহার প্রজাবাৎসল্য, তাঁহার ভৃত্যপালন, তাঁহার বৈরাগ্য ও অনাসক্তি, তাঁহার উদার অসাম্প্রদায়িকতা, তাঁহার শান্তিসংস্থাপয়িতৃত্ব ও শান্তিপ্রিয়তা, তাঁহার নিষ্কাম সেবা-পরায়ণতা এবং অক্লান্ত দানশীলতা যে অতুলনীয়, কে তাহা অস্বীকার করিবে।

এমন সর্ব্বগুণান্বিত রাজা যাঁহাদের রাজা, যাঁহাদের বন্ধু, যাঁহাদের পিতা, যাঁহাদের আত্মীয়, তাঁহাদের কি সামান্য সৌভাগ্য? আমরা এমন রাজর্ষির আত্মার সঙ্গ-সাধনে যদি এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত হইলাম, তবে যেন সত্য সত্যই তাঁহার আত্মা আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং এই রাজ্যের রাজা, রাজপরিবার, রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাদিগকে চির অনুপ্রাণিত করেন, ইহাই প্রার্থনা করি।

আর তাঁহার আত্মার চির-সঙ্গিনী সতী মাতা রাজমহিষী সুনীতি দেবীকেও সহানুভূতিপূর্ণ অভিবাদন করি, এবং তাঁহার দিব্য জীবনের প্রভাবও এই রাজ্যকে ও আমাদের সকলকে যেন সেই মহা রাজর্ষির আত্মার অনুগমনে সক্ষম করে, ইহাও কাতরে ভিক্ষা করি। আজ মহারাজর্ষির আত্মাকে ব্রহ্মবক্ষে দর্শন করিয়া এই বলিয়া নিত্য স্মরণ ও প্রণাম করি,—

নমি পুণ্য শ্লোক রাজন্ শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ,
সুনীতি-পতি প্রেরিত বঙ্গ-বিহার-মিলন।
দানে কর্ণ, প্রাণে জনক, রাজকার্য্যে শ্রীরাম হেন,
রাজভক্ত দেশবন্ধু সর্ব্বজন-বন্দন॥

পুণ্যাশ্রম সম্বন্ধে নিবেদন।

দয়াময়ী বিশ্বজননী যেদিন দয়া করিয়া তাঁর এই দীনহীন কাঙ্গাল সন্তানদের জন্য একটু মাথা রাখিবার আশ্রয় দান করিলেন, তখনই আমাদের গরিব দুঃখিনী অনাথা বিধবাদের জন্য প্রাণে এক আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। সেই দিনই

মঙ্গলময় ভগবানের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া, দয়াময়ের নাম স্মরণ করিয়া, করুণাময় ঈশ্বরের অনন্ত কৃপা সম্বল করিয়া, এই পুণ্যাশ্রম স্থাপিত হয়। ৭নং রামমোহন রায় রোডে যে বাড়ীতে ছিলাম, সেখানেই ইহার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। অনেক দিন পূর্ব্বে মাননীয়া ভগিনী মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী আর্য্য-নারী সমাজ হইতে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ও অনুমতি অনুসারে, আর্য্যনারী-সমাজের আশীর্ব্বাদ ও চাঁদার সাহায্যে, আজ দুই বৎসরের অধিক হইল, এই পুণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমে দুইজন, পরে চারজন, ক্রমে আরও কয়েকজন আসিলেন। ৯০টাকা ভাড়া সে বাড়ীর। সেই সময় কলিকাতায় মেয়েদের বোর্ডিং হোষ্টেলের বড় অভাব ছিল। মেয়েরা থাকিবার স্থানের অভাবে কতজন পড়িতে না পাইয়া দেশে ফিরে গেছে। এই কথা শুনিয়া সেই বাড়ীর কতক অংশে হোষ্টেলেরও বন্দোবস্ত করা হয়। তখন অনেকগুলি মেয়ে (প্রায় ২০ জন) বোর্ডিংএ আসেন। তখন সেই বাড়ীতে স্থানাভাব ও অসুবিধা হওয়াতে, গড়পারে আর একটী বড় বাড়ী ১১৫টাকায় ভাড়া করা হয়। আশ্রমের জন্য আশানুরূপ বেশী চাঁদা সাহায্য পাওয়া যায় নাই; সুতরাং বাড়ী ভাড়া বেশী দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। তবে বোর্ডিংএর মেয়েদের বাড়ীভাড়া সাহায্যে এক প্রকার চলিয়াছে। তবে আশ্রমের মেয়েদের জন্য একজন ভাল আচার্য্যাবিকা বা শিক্ষয়িত্রী রাখিতে পারিলে ভাল হইত; কিন্তু বেশী চাঁদার অভাবে তাহা না পাওয়ায় বড়ই দুঃখিত আছি। ক্রমে যাহাতে সে বিষয়ে ভাল রকম ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ও চিন্তিত আছি। চাঁদা বেশী না পাওয়ায়, অনেকে থাকিবার জন্য আবেদন করিলেও ফিরাইয়া দিতে হয়। এখন দশ জন আছেন। তাহা ছাড়া দুজন অন্যস্থানে গিয়াছেন। একজন এখানে থাকিয়া সরোজ-নলিনীতে শিখিয়া এখন রাণাঘাটে কাজ করিতেছেন। আর একজন এখানে প্রায় দুইবৎসর থাকিয়া বাণীভবনে শিল্পাশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কিছু দিন পুরীর বিধবাশ্রমে আছেন। আর কয়েকজন ট্রেণিং পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহারা আরও একটু বেশী শিখিয়া ট্রেণিং পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। এই রকমে দুই বৎসর থাকিয়া ট্রেণিং পাস করিয়া, নিজের এক মুঠো অন্নের সংস্থান ও জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া, মনের শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারিবেন, ইহাই একান্ত ইচ্ছা ও আশা। দয়াময় ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন, হৃদয়ের এই প্রার্থনা।

মধ্যে মধ্যে অনেকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া আশ্রম দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ, শ্রীমতী শকুন্তলা সেন, শ্রীমতী কিরণময়ী সেন, শ্রীমতী হেমন্ত বালা চাটার্জ্জি, শ্রীমতী চপলা মজুমদার, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ, শ্রীমতী অশোকলতা দাস, শ্রীমতী মাধবমোহিনী বসু, শ্রীমতী নিভাপ্রভা ঘোষ, শ্রীমতী সরযূ ঘোষ প্রভৃতি অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্রম দেখিয়া গিয়াছেন। এখন হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা, আমাদের স্নেহময় ভ্রাতা ও স্নেহময়ী ভগিনীদের উচ্চ হৃদয়ের দয়াস্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ, সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিয়া, এই পুণ্যাশ্রমের যেন যথার্থ উন্নতি ও মঙ্গল হয়। যাহাতে ইহা স্থায়ী হইতে পারে, সে বিষয়ে সকলের দয়া ও সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়। ১৯২৯সনের এপ্রেল মাস হইতে ১৯৩১সনের মার্চ্চ মাস অবধি এই দুই বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। এই দুইবৎসরে ইহার মোট আয়—২০০৭৲ টাকা। আর মোট ব্যয় ২১৮৯৲ টাকা। ১৯২৯সনের এপ্রেল মাসে আর্য্যনারী-সমাজের চাঁদা হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। পরে ইহার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। তাহার মধ্যে কেহ কেহ দুইমাস, কেহ কেহ চার ছয় মাস পরে পরে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেছেন। এখনও ইহার চাঁদা অনেকের কাছে বাকী পড়ে আছে। সেগুলি ঠিকমত পাইলে অনেক উপকার হইবে;

এককালীন চাঁদা দাতাদের নাম ও চাঁদার পরিমাণ :—

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী—১০০৲, শ্রীমতী হেমাঙ্গিনি মৈত্র—১৫৲, শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী—২৫৲, শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত লাহোর মহিলা-সমিতি হইতে—১৫৲, শ্রীমতী শকুন্তলা সেন—২৲, মিসেস কে, কে সেন—১৲, মিসেস ডি মুখার্জ্জি—১৲, মিসেস মুখার্জ্জি—১০৲, মিসেস মতিলাল মুখার্জ্জি—৫৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র—১০৲, শ্রীমতী চিত্ত-বিনোদিনী ঘোষ—৫৲, শ্রীমতী চারুবালা রায় ৫৲, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেন—২৲, শ্রীমতী সরলা সেন—৫৲, শ্রীমতী মৃণালিনী বানার্জ্জি—৮৲, শ্রীমতী মাধবমোহিনী বসু—২৲, শ্রীমতী শান্তিদায়িনী দাস—৫৲, শ্রীমতী আশা মজুমদার—১০৲, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু—৫৲, প্রেমসুন্দর বাবুর মা—৷৹, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা রায় ২৲, স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের পুণ্য-স্মৃতি—১০৲, বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ—১৫৲, স্বর্গীয়া ক্ষীরোদা দেবীর পুণ্য-স্মৃতি—২৲, স্বর্গীয়া তরঙ্গিনী দেবীর পুণ্য-স্মৃতি—২৲, শ্রীমতী ক্ষীরোদা দেবী—২৲ টাকা। মোট ২৬৭৷৷৹ আনা মাত্র।

মাসিক চাঁদাদাতাদের নাম ও চাঁদার পরিমাণ :—

মহারাণী সুচারু দেবী—১০৲ হিঃ — ১৬০৲
শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ—১৲ „ — ১৭৲
„ সুধা ব্যানার্জ্জি—১৲ „ — ১৪৲
„ প্রফুল্ল হালদার—৫৲ „ — ৭০৲
„ অমলা সেন—১৲ „ — ১১৲
„ সুধা সেন—২৲ „ — ৪৮৲
„ সুশীলা মুখার্জ্জি—১০৲ „ — ২০৮৲

শ্রীমতী কমলা সেন—১০৲	,,	—	১৮২৲
,, পুণ্যপ্রভা বসু—১০৲	,,	—	২০২৲
আর্য্যনারী-সমাজ—১০৲	,,	—	২৪৫৲
ভগিনী সমিতি—২৲	,,	—	২৪৲
শ্রীমতী সুধা দাস—৫৲	,,	—	১০৮৲
,, সরলা দাস—৫৲	,,	—	১০৩৲
,, কিরণময়ী সেন—৷৷০	,,	—	১২৲
,, হেমন্তবালা চাটার্জ্জি—৷৷০	,,	—	১২৲
,, বাণী চাটার্জ্জি—৷৷০	,,	—	৫৲
মিসেস ব্যানার্জ্জি—২৲	,,	—	২০৲
শ্রীমতী বামুন দিদি—১৲	,,	—	৭৲
,, মল্লিকা বীর—১৲	,,	—	২০৲
,, স্নেহলতা দাস—৷০	,,	—	৪৲
,, পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী—৷০	,,	—	৩৷০
,, ইন্দিরা দে—৷০	,,	—	৷৷০
,, সুখদায়িনী দে—৷০	,,	—	১৷৵০
,, স্নেহলতা রায়—৷০	,,	—	১৲
,, সাবিত্রী নারায়ণ—১৲	,,	—	১৲
,, প্রীতিলতা গুপ্ত—৷০	,,	—	৷৷০
,, মোহিনী দাস গুপ্ত—৵০	,,	—	৵০
,, শান্তি রায়—৷৷০	,,	—	১৷৷০
,, বিভা মুখার্জ্জি—৷০	,,	—	১৷০
,, লীলানারায়ণ—৷০	,,	—	৷০
,, প্রেমদায়িনী চক্রবর্ত্তী—৷০	,,	—	৷০
,, ইন্দুরেখা সিংহ—৷৷০	,,	—	১৷৷০
,, প্রভাতবালা সেন—৷০	,,	—	১৷০
		মোট	১৪৮৯৲

মাসিক চাঁদা—	১৪৮৯৲
এককালীন চাঁদা—	২৬৭৷৷০
আশ্রমের মেয়েদের চাঁদা—	২৫০৷৷০
মোট আয়	২০০৭৲ টাকা

শ্রীসরলা দাস।

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ৯৪।১সি গড়পার রোডে, ডাঃ হেমন্তকুমার চাটার্জ্জির গৃহে, তাঁহার দৌহিত্রী, দেরাদুনের শ্রীমান্ আলোকচন্দ্র দেবের নবজাত শিশুকন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় উক্ত ভবনে জন্মগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে দুই টাকা দান করা হইয়াছে।

অদ্য ৯১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে, ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ বসুর নবজাত শিশু সন্তানের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে শিশুর পিতামহ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু উপাসনা করেন।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জন্মদিন—গত ১১ই সেপ্টেম্বর, রাঁচি-নামকুমে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিধেনন্দিনীর এবং তৎপর দিন ১২ই সেপ্টেম্বর, তাঁহার পৌত্রী, স্বাস্থ্যবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর ডাঃ বিধানপ্রসাদ মজুমদারের পঞ্চমবর্ষীয়া শিশুকন্যা শ্রীমতী মীরা মজুমদারের জন্মদিন উপলক্ষে গৌরী বাবু উপাসনা করেন এবং তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সুমতি মজুমদার উভয় দিন প্রার্থনা করেন। নব জন্মদিনে ভগবানের শুভাশীষ ইহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায় ৬২।১নং হ্যারিশন রোডে, কলিকাতায় নববিধান-মণ্ডলীর বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের চতুরশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। দীর্ঘ জীবনে বিধাতার কত আশীর্ব্বাদ পেয়েছেন ও নববিধানের কত নব নব লীলা দেখেছেন, এখন আনন্দের সহিত সে সব কাহিনী বলিয়া কত প্রাণে আনন্দ দিচ্ছেন। ভগবান্ তাঁহার এই আনন্দের সন্তানের প্রাণে আরও আনন্দ দান করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে এক টাকা দান করা হইয়াছে।

উৎসব—পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব গত ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়া ২০শে সেপ্টেম্বর শেষ হইয়াছে। আমরা উৎসবের বিবরণ আগামী বারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সেবা—কোচবিহার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে গত ২১শে সেপ্টেম্বর ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক রংপুরে নামিয়া তত্রত্য প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ ভি:, এন, মল্লিকের বাটীতে বিশেষ উপাসনা করেন। কয়েকদিন হইল রামকৃষ্ণপুরে নিত্যধামে বিশেষ উপাসনা করিয়া, ভাই প্রিয়নাথ শিবপুরের ডাঃ বিহারীলাল ঘোষের বাড়ীতে গিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও প্রার্থনাদি করেন।

সিমলা শৈলস্থ আর্য্যনারী-সমিতির মহিলাদিগকে লইয়া মহারাণী সুচারু দেবী হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, বিশেষ উপাসনা করিয়াছেন। মহিলাগণ মহারাণীর মধুর উপাসনায় যোগ দিয়া সকলেই কৃতার্থ হইয়াছেন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষেও মহারাণীর সভানেতৃত্বে এক অসাম্প্রদায়িক সভায় অধিবেশন হইয়াছিল।

পরলোক-গমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভাগলপুরের স্বর্গীয় রামলাল দাসের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস অনেক দিন রোগে ভুগিয়া, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ভাগলপুরস্থ বিনকটেজ হইতে স্বর্গের আনন্দ ভবনে প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার অনন্ত স্নেহবক্ষে নিত্যশান্তিতে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তজনের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

রাজর্ষির সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে বাগনানে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয় এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাদি হয়। ঐ দিন কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন, এবং রাজর্ষির জীবন সম্পর্কে আত্মনিবেদন করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ৬১৪ই ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের কনিষ্ঠা কন্যার সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে এই উপলক্ষে এক টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে, ৬৫।১নং হ্যারিসন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের শ্বশুরদেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, স্বর্গীয় আত্মার কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ঐ গৃহে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের কন্যা স্বর্গীয়া সুপ্রভা ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুশীলা ঘোষ প্রচার ভাণ্ডারে পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর, ৭৮এ আপার সার্কুলার রোডে, আচার্য্যপুত্র শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেনের গৃহে, তাঁহার শ্বশুরদেব রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় পি, সি, সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মিসেস পি, সি, সেন প্রচার ভাণ্ডারে দশ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১২নং আণ্টনীবাগান লেনে, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১লা অক্টোবর, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত কুমুদ বিহারী সেনের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

মার্চ, ১৯৩১—শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস ২৲, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদ্‌ভানি মাসিকদান ২৫৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী মাসিকদান ১৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের স্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার দাস (কটক) ৫৲, শ্রীমতী মাখন বসু স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে ১৲, শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী পত্নীর সাম্বৎসরিকে ৫৲, শ্রীযুক্ত কনকচন্দ্র সিংহ মাতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় কনিষ্ঠ পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধে ১০৲, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, ডাঃ সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল ভগ্নীর শুভবিবাহে ৫৲ ও পুত্রের নামকরণে ৫৲, স্বর্গীয় জগন্মোহন বীরের আদ্যশ্রাদ্ধে পুত্রকন্যাগণ ২৫৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্ত পত্নী উমাদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে ৩০৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীযুক্ত মনোনীত ধন দে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমারের (আই, সি, এস,) জন্মদিনে ২৲, শ্রীমতী চপলা মজুমদার মাতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিকে সহধর্ম্মিণী ১০৲ টাকা।

ভগবান্ দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নূতন সংস্করণ।

নিম্নলিখিত বইগুলির জন্য অনেক দিন ধরে সকলে বড়ই অভাব অনুভব করিতেছিলেন; সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হইয়া সে অভাব দূর করিয়াছে।

১। Life and Teachings of K. C. Sen by Late Rev. Bhai P. C. Mazumdar. নববিধানট্রাষ্ট কর্ত্তৃক এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত। সুন্দর ছাপা ও সুন্দর বাঁধাই, লাইব্রেরী ও প্রাইজের উপযুক্ত। এবার কয়েকখানি সুন্দর ছবিও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মূল্য ৩৲ টাকা। ২৮নং নিউরোড, আলিপুর, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ও নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

২। কেশব-চরিত—স্বর্গীয় চিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত। পাইকা অক্ষরে, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মায় ৪২৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। এই নূতন সংস্করণ লাইব্রেরী ও প্রাইজের উপযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে।

৩। ব্রহ্মগীতোপনিষৎ—যোগ-ভক্তি-সাধনার্থীদিগের যোগ-ভক্তি সাধনে পরম অনুকূল এই সুন্দর বইখানি এবার সুন্দর ভাবে মুদ্রিত। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

উপরি উক্ত বইগুলি কলিকাতায়, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৬ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। | ১লা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 18th October, 1931. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, আজ বঙ্গদেশ দুর্গোৎসব আরম্ভ করিল। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন উৎসব করিয়া, দশমীর দিনে উৎসব সমাপন করিবে। তিন দিনের উৎসব তিন দিনে ফুরাইবে। মা দুর্গার নামে যে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া, বঙ্গবাসী এত আমোদ আহ্লাদ, পূজা অর্চ্চনা, নৈবেদ্য, হোম, যাগ, যজ্ঞ, বলিদানাদি করিবে, সেই মূর্ত্তিও আবার জলে ভাসাইয়া দিবে। আমাদের ভাই ভগ্নী, প্রিয় আত্মীয় স্বজনগণ, মা, তোমার নাম করিয়া এই উৎসব করিতেছেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের উৎসব যে তিনদিনের উৎসব, তিনদিনেই শেষ হয়। ইহা দ্বারা তাঁহারা যেন স্বীকার করিতেছেন, এ পূজা, এ উৎসব কল্পনার পূজা, সাময়িক উৎসব; এ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি আসল তোমার মূর্ত্তি নয়, তাই তিন দিন পরে তাহাকে জলে বিসর্জ্জন করেন। বাস্তবিক প্রতিমা কল্পনা, উপমা মাত্র, আসল মা তুমি নও; তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য যদি এই তিন দিনের প্রতিমা-পূজার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে, মা, দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, এই প্রতিমা বা কল্পনার পূজায় আমাদের দেশ, আমাদের হিন্দু জাতি যেন নিবদ্ধ হইয়া না থাকেন। এই মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ভেদ করিয়া, ভাঙ্গিয়া দিয়া, বিসর্জ্জনান্তে, চিন্ময়ী মা, তুমি তোমার আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি তোমার ভক্ত সন্তান সন্ততিদিগকে লইয়া যথার্থ দুর্গতিহারিণী মা দুর্গারূপে প্রকট হও; এবং তোমার নববিধানে যে তোমার নব আরাধনা, ধ্যান, পূজা, উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছ, তাহা সাধনে সকল সন্তান সন্ততিকে প্রণোদিত কর। তাহাতেই এ জাতির ও জগতের সকল দুঃখ দুর্গতি দূর হইবে এবং তোমার শক্তি-স্বরূপ, তোমার জ্ঞান-স্বরূপ, তোমার লক্ষ্মীশ্রী-স্বরূপ, তোমার পুণ্য ও জয়-স্বরূপ এবং সিদ্ধিস্বরূপের প্রভাবে ভক্তসিংহবল লাভ হইবে ও তদ্দ্বারা পাপাসুর চিরতরে নিধন হইয়া নিত্য উৎসবানন্দে দেশকে চির মত্ত করিবে। মা দয়া করে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাহাই হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসবের অর্থ দুর্গতিনাশিনীর উৎসব। বঙ্গদেশেই এই উৎসবের প্রচলন অধিক। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এ উৎসবের তেমন প্রচলন নাই।

কবে, কেমনে, কোন সূত্রে এই দুর্গোৎসব বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় শুনা যায়, সুরথ নামে একজন

রাজা ছিলেন, তিনিই এই পূজা আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে এই উৎসব বসন্তকালে বাসন্তী পূজা বলিয়া অনুষ্ঠিত হইত। তাহার পর শ্রীরামচন্দ্র নাকি রাবণ-বধ-কামনায় এই উৎসব শরৎকালে প্রবর্ত্তন করেন। তখন হইতে শরৎকালেই এই উৎসব হইয়া আসিতেছে।

বাস্তবিক দুর্গোৎসবের ন্যায় উৎসব বঙ্গদেশে আর নাই। পৌরাণিক হিন্দু মহাসমারোহে এই উৎসব সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই উৎসব-সম্পাদনে দুঃখ দুর্গতি দূর হয়, পরিণামে কৈলাসরূপ স্বর্গলাভ হয়। সাধারণ অজ্ঞলোকে ইহাও বিশ্বাস করে, স্বয়ং আদ্যাশক্তি সতী ভগবতী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা-মূর্ত্তিতে কৈলাস হইতে সিংহবাহনে তিন দিনের জন্য তাঁহার লক্ষ্মী, সরস্বতী দুই সখী ও সন্তান কার্ত্তিক গণেশকে সঙ্গে লইয়া ভক্তের গৃহে আগমন করেন এবং তাঁহার দুর্গতি-অসুর বিনাশ করিয়া শান্তিবর্ষণ করিয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়া যান।

এ সকল সংস্কারের ভিতর ভ্রান্তি থাকিলেও, এই প্রতিমা দেখিলে মনে হয়, ইহার ভিতর গভীর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে। অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের উপমা হইতে যে এই প্রতিমার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ

মা আদ্যাশক্তি চিন্ময়ী, কিন্তু ভক্ত-মন তাঁহাকে উপমা-যোগে বর্ণনা করিতে গেলে, বাহ্য আকারে প্রকারে বর্ণনা করিতে নিশ্চয়ই প্রলুব্ধ হন। কিন্তু যাহা উপমা, যাহা পদ্য, চিত্রকর যদি তাহা চিত্রে চিত্রিত করে বা কুম্ভকার তাহা মূর্ত্তিতে গঠিত করে, তবে যাহা চিন্ময়, তাহা মৃন্ময়ে পরিণত হয়। তাই যিনি আসল মা, তাঁহাকে ভাবুক ভক্ত স্বতঃই উপমায় বর্ণনা করেন; কিন্তু যখনই সেই ভাবকে মৃত্তিকার মূর্ত্তিতে গঠিত করিলেন, অমনি তাহা প্রতিমায় পরিণত হইল। বিদ্যুৎ যাহা আকাশে নিরাকার ছিল, ক্রমে তাহা আলোকে দৃশ্যমান হইল; কিন্তু যখনই তাহা মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল, তখনই তাহার শক্তি ধ্বংস হইয়া গেল।

তেমনি নিরাকারা চিন্ময়ী দেবী উপমায় বর্ণিত হইতে পারেন; কিন্তু যাই তাহা কুম্ভকারের মৃত্তিকার মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, অমনি তাহার আধ্যাত্মিকতা জড়ীয় ভাবে বিধ্বংস হইল। তাই আমাদের মনে হয়, দুর্গোৎসবের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা প্রতিমা-পূজায় পরিণত হইয়া, ইহার জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই দুর্গোৎসব এখন কেবল বাহ্যাড়ম্বরে, বাহ্য অনুষ্ঠানে পরিণত।

এক্ষণে সেই মৃত্তিকার মূর্ত্তিকে যোগ-বলে উড়াইয়া দিয়া, যদি তাহার ভিতরকার সত্য উদ্ভাবন করিয়া দেখি, তবে দেখি, দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতী মা যিনি, তিনি সত্যই চিন্ময়ী মহাশক্তি-ধারিণী; তাঁহার সহিত তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ সরস্বতী নিত্য সংযুক্ত এবং সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্য-স্বরূপ লক্ষ্মীশ্রীও চিরযুক্ত। এই তিনটী স্বরূপ একই মার স্বরূপ। লক্ষ্মী সরস্বতী মার কন্যা নয়, মার স্বরূপ। মা আদ্যাশক্তির জ্ঞান-শক্তি সরস্বতী, সৌভাগ্য-শক্তি লক্ষ্মী।

মা শক্তি-প্রভাবে, সিংহসম ভক্তের বলে পাপাসুর নিধন করেন। জ্ঞান-স্বরূপ সরস্বতী যে বেদ উচ্চারণ করেন, গণেশ তাহা ব্যাখ্যা করেন বা প্রচার করেন। আবার লক্ষ্মীশ্রীর পুনঃ সৌন্দর্য্য-প্রভাবে কার্ত্তিককে বীরত্ব এবং সৌন্দর্য্য বিধান করেন ও তদ্দ্বারা তাঁহার সকল বিষয়ে জয়লাভ হয়। ইহাতেই ভক্তের সকল দুঃখ দুর্গতি অপনোদিত হইয়া, নিত্য শান্তি সম্ভোগ হইয়া থাকে।

বাস্তবিক গভীর ভক্তি-ভাবে এই দুর্গোৎসবের আধ্যাত্মিকতা অনুধ্যান করিলে আত্মার যথেষ্টই কল্যাণ হয়। দুর্গা-মূর্ত্তি স্বয়ং আদ্যাশক্তিরূপিণী ভগবতীর মূর্ত্তি, দশদিকে দশ বাহু তাঁহার শক্তির প্রকাশ। লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহা হইতে জাত কন্যা নন, তাঁহার দুই স্বরূপ, তাঁর জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তির প্রকাশ। গণেশ বা মানব-শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি আপনাকে হস্তিমূর্খ বা অজ্ঞ বলিয়া জানেন; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘমুখ দিয়া জ্ঞান-শক্তি সরস্বতী বেদ উচ্চারণ ও বিস্তার করান, এবং কদলী-বৃক্ষরূপ প্রকৃতি তাঁহার সঙ্গিনী। আবার আর একদিকে আর এক সন্তান কার্ত্তিক রিপুজয়ী চিরকুমার-ব্রতধারী বীরত্ব মূর্ত্তি লক্ষ্মীশ্রীর সৌন্দর্য্যে পূর্ণ; তিনি মূর্ত্তিমান সর্ব্ব কার্য্যে জয়লাভ।

আদ্যাশক্তির বল সিংহবল, ভক্ত সেই বলে বলীয়ান হইয়াই আদ্যাশক্তিকে বহন করেন; এই জন্য তিনি পাপ-রূপ অসুর-নিধনে দেবীর সহায়। পাপ-মূর্ত্তি, দুঃখ দুর্গতি রূপ অসুর মূর্ত্তি যখন ভক্ত-সিংহদ্বারা আক্রান্ত হয় এবং স্বয়ং আদ্যাশক্তি তাহার বক্ষে শূল-বর্শা নিপাত করেন, তখন তাহার পাপ তাপ ভবরোগাদি থাকিলেও

তাহা পরিচালনে তাহার শক্তি থাকে না; সে নিহত হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে ভগবতীর দিকে চাহিয়া নিরত হয়।

ভগবতী মাতৃমূর্ত্তি তাঁহার এক চরণ যেমন ভক্ত সন্তানের পৃষ্ঠে রাখেন, আর এক চরণ তেমনি পাপীরও বক্ষে দেন; কেননা, তিনি যে উভয়েরই মা, কাহাকেও চরণচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত করেন না। এই প্রতিমা কেবল কল্পনায় গড়িলে হয় না, কিম্বা বাহ্য আড়ম্বরে পূজা করিলেও হয় না। যদি এই প্রতিমা হইতে আসল মাকে যোগবলে উদ্ভাবনা করিয়া যথার্থ ভক্তিভাবে পূজা করা হয়, যাহা প্রতিমায় গঠিত, তাহা জীবনে প্রতিফলিত হইয়া নিশ্চয়ই সাধন সার্থক হয়।

এই জন্য শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "ভ্রান্ত বঙ্গদেশ, কেন তুমি মাকে উপমা ও উপমাকে প্রতিমা করিয়া জীবন্ত মাকে হারাইলে? যিনি ত্রিজগতের জননী, তিনি কি মাটী হইতে পারেন? চিন্ময়ী মাকে, সতীকে, দেবীকে, জগজ্জননীকে কদাচ মৃন্ময়ী ভাবিও না; তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে নিরাকারা আকাশরূপিণী জানিয়া তাঁহার পূজা কর। মৃন্ময় সিন্দুকের ভিতরে চিন্ময় পদার্থ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই সিন্দুক খুলিয়া সতী দেবীকে বাহির কর এবং মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সেই জীবিতেশ্বরী দেবীকে অসুরনাশিনী, জ্ঞানরূপা কল্যাণদায়িনী এবং শান্ত ও জয়-প্রসবিনী বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা কর।

"সাধক, যদি তুমি যথার্থ হিন্দু অথবা যথার্থ ব্রাহ্ম হও, তবে যোগ দ্বারা পুতুলের বক্ষ খুলিয়া তাহার মধ্যে হইতে চিন্ময়ী মা, তাঁহার সখী এবং সন্তানদিগকে বাহির কর। যেদিন তোমার স্বাবস্থাতে ব্রহ্মপ্রসাদে তোমার চরিত্রে মাটীর দুর্গার পরিবর্ত্তে চিন্ময়ী দুর্গা প্রকাশিত হইবেন, সেই দিন তোমার সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবে। অতএব, হিন্দুস্থান, মৃত মাটীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জীবিতেশ্বরী চিন্ময়ী মহা দেবীর পূজা কর।"

আমরাও বলি, তাহা হইলেই যথার্থ দুর্গোৎসব সার্থক হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব দুর্গোৎসবে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী তিথিতে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিয়ে দেওয়া হইল:—

সপ্তমী।

"হে পরম পিতা, তোমাকে পিতা বলে ভালবাসিলে যেমন খুব তোমার নিকটস্থ ভক্ত হওয়া যায়, তেমনি তোমার শত্রু যারা, তাদের যদি আমাদের শত্রু মনে করিতে পারি, তা হলেও খুব নিকটস্থ ভক্ত হওয়া যায়। দেখ, মা, আজ সপ্তমীর দিন লোকে তোমাকে ঘরে আনিবে, না কাহাকে লইয়া আসিল? মৃত মূর্ত্তিটাকে আরিয়া মা মা বলে ডাকছে! আহা! দুঃখ হয়। মা ভগবতী, একবার এসময় আসিতে হইবে। মা, বাঁচাও। আমাদের উপায় তুমি। আমরা পূজা করিব, ভগবতীর পূজা। ত্রিভুবন-মোহিনী মা আমার। আমার মার ভিতর জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। একবার এস, চিদানন্দময়ী মা। বঙ্গবাসী, সব চলে আয়। ও মা নয়, যাকে মা মা বলে ডাকছিস; এই মা, যিনি কোলে করেন, দুগ্ধ দেন, ঔষধ খাওয়ান। আমরা এই মার পূজা করিব। আমরা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী করিব। দশমীর দিনান্তে তোমায় ছাড়িব না। আয় আয়, সকলে দেখাব আয়, মার রূপ। একবার দুর্গা হইয়া হাসনা, জীবন্ত দুর্গা! মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, আজ তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, সব বাড়ীতে যাও। ওদের পূজা স্থানে বস। সব ভেঙ্গে চুরে ফেলে দিয়ে আপনি গিয়ে বোস নিরাকার রূপ ধরে। পৌত্তলিকতা-রোগ ভয়ানক। তুমি শান্তি-জল ঢাল। সচ্চিদানন্দময়ী মা, সুপ্রসন্ন হয়ে আজ আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের মতি ভগবতীর চরণে চিরদিন থাকে এবং সকল লোকের মতি যেন ঐ দিকে হয়।"

অষ্টমী।

"হে দুঃখিবৎসল, তুমি ধর্ম্মের ভিতর নীতিকে স্থাপন করেছ। যেখানে তুমি আত্মাকে ধ্যানশীল উপাসনাশীল কর, সেখানে চরিত্রকে নির্ম্মল ও দোষশূন্য কর। হে পরম পিতা, যদি এদেশে এত ভক্তির আধিক্য, পূজার আড়ম্বর, তবে কেন এই পূজার উপলক্ষ করে লোকে পাপ করে? এই পূজার সময় হিন্দু নরনারী বালক বৃদ্ধ হৃষ্ট দেবতাকে পূজা করিবে, যা কেন তাদের ধর্ম্ম হোক না। কিন্তু পূজা-ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সয়তানের পূজা কেন? হে পরমেশ্বর, আমাদের স্বজাতির এই দুর্দ্দশা! দয়াময়, তোমার চরণে মাথা রেখে এই মিনতি করিতেছি যে, সুরাপান, অপবিত্রতা, অধর্ম্ম, ব্যভিচার যত পাপ এই পূজা উপলক্ষ করে এদেশে এয়েছে, সে গুলোকে পুড়িয়ে ফেল। কোথায় গেল যোগীদের যোগ-সাধন, হোম, আমাদের তব পূজা? সে সব ...

মাটী পূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপের অত্যাচার! এ অবস্থায় কোথায় নববিধান, এস একবার, নতুবা উপায় দেখছিনা, আর কিছুতে দেশ বাঁচাইবার উপায় দেখছি না। হে দয়াময়ী দেশটা বাঁচাও। কপটতা, নাস্তিকতা, ধূর্ত্ততা, অবিশ্বাস, সব এক হইল। এই যে প্রতিমা খানা, নীচে অসুর, উপরে দুর্গা; কিন্তু এই কয়দিন অসুর উপরে উঠে, দুর্গা নীচে পড়ে। দুর্গতিনিবারিণী, এস, সকল আসুরিক ভাবগুলোকে দমন করে নীচে ফেল।"

নবমী।

"হে বিঘ্নবিনাশন, পতিত দেশ উদ্ধারের ভার তোমারি হাতে, মাতৃভূমির জন্মভূমির ভার তোমার হাতে। এই যে সময়, এই যে হিন্দুর সাম্বৎসরিক মহোৎসবের সময়, ইহা বুঝাইয়া দেয়, কত উন্নত এ জাতি, কেমন পতিত এ জাতি—কত সাধু ভাব এ জাতির মধ্যে আছে, কত পাপাসক্তি ইন্দ্রিয়-সেবা এ জাতির মধ্যে আছে—কত ভাল হইতে পারি আমরা আর্য্য-সন্তান, কত মন্দ হইতে পারি আমরা আর্য্যের পতিত সন্তান। আজ এই জাতির গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়া এদেশ হাসিতেছে আজ আবার চিরদুঃখিনীর মত হয়ে মাতৃভূমি কাঁদছে। সামান্য মৃত্তিকার কাছে হিন্দুর মাথা অবনত। যাঁরা এক সময় হিমালয়েতে ধ্যান ধারণা করিতেন, আজ বঙ্গদেশে নিম্নভূমিতে এসে তাঁরা খড়ের মাটীর পূজা কচ্ছেন। এজন্য নবমীর দিনে প্রার্থনা করিতেছি, এর ভিতর যা কিছু ভাল, তা যেন করিতে পারি। খড় মাটী ছেড়ে দিব। মাটী পূজা যেন আর না হয়। কিন্তু নির্দ্দোষ দুর্গাপূজা, সত্য পূজা যেন না ছাড়ি। করুণাময়ি, খড়ের দুর্গা দেখে আমরা চিন্ময়ী দুর্গা লাভ করিলাম। বিশ্বাস-নয়নে দেখিলাম, যদি পূজা করিতে হয়, ওর চেয়ে পূজা নাই। যার ভিতর অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীরূপ, বীরত্বের প্রতিরূপ ও সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা কল্যাণময় দুটী সন্তান; দুই সখী দুই সন্তান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী এসে দেখলেন, অসুর বিনাশ না করিলে নিজের মহিমা রক্ষা হয় না, পাপ অত্যাচার দূর হয় না। ইহা দেখিয়া তুমি শক্তিপূর্ণ কোটিহস্ত বাহির করিলে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পরাক্রমে আকাশ পূর্ণ করিলে। অসুরের উপর আঘাত পড়িল। প্রকৃতির ভিতর দিয়া পশুভাব-পূর্ণ অসুর নাশ করিলে। পৃথিবীর দ্বারা পৃথিবীর যা কিছু অমঙ্গল নাশ করিলে। তুমি কেবল উত্তেজনা করিলে। মা, দয়া কর, ভাল জিনিষগুলি রক্ষা কর। এই যে বৎসরান্তে পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রীর যে পবিত্র মিলন, তা যেন রক্ষা পায়। এ দেশ চিরকাল ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। মা, এর ভিতর যা খারাপ আছে, দূর কর। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এই পূজার অসার অংশ ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের মধুরতা পবিত্রতা যাহা আছে গ্রহণকরিয়া, আমরা ভাল হই, অন্যকেও ভাল করি। দুর্গে, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

দশমী।

"হে দয়াময়, দেশের লোক বৎসরান্তে আমোদ করে। ধর্ম্মের নামে করে বটে, কিন্তু তাহা ফুরাইয়া যায়। আমাদের ভজন সাধন যেন অনন্তকাল থাকে। কত সাধক ভক্ত প্রেম-সাধন, যোগ-সাধন, ধর্ম্ম-সাধন করেন। তিন রাত্রির পর সব ছাড়িল, গঙ্গাজলে ফেলে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পলায়ন করিল। হৈ ঠাকুর, কত ব্রহ্মজ্ঞানীরা শুষ্ক কল্পিত ব্রহ্ম লইয়া শেষ জীবন কাটাইতেছে। তাদের ভক্তির তিনদিন ফুরাইয়াছে, বিশ্বাস কমিয়াছে, লক্ষ্মীশ্রী আর নাই, উপাসনায় আর সে তেজ নাই। মা, গরিবের প্রার্থনা শোন। যদি বিশেষরূপে মহোৎসবের সময় এলে, তবে দুর্গার রাজ্য চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কর। দুর্গতিনাশিনী, চিরকাল বঙ্গদেশে থেকে অসুর বিনাশ কর। মা, তোমার পায়ে পড়ি, গৃহস্থের বাড়ী অন্ধকার করে যেওনা, যেওনা। যদি তুমি জগদ্ধাত্রী হয়ে এয়েছ, তবে সিংহাসনে রাণী হয়ে থাক। হে কৃপাময়ি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, তুমি আমাদের হৃদয়ে, আমাদের গৃহে, আমাদের দেশে, এটা যেন খুব বুঝিতে পারিয়া, মাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিয়া সুখী এবং কৃতার্থ হইতে পারি।"

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের দলত্তের আলোচনা)

২৪শ সংখ্যা—২রা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

২৫শে আশ্বিন—১৭৯৪ শক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—বলপূর্ব্বক কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত বা অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার আছে কি না? যদি থাকে, উহা কতদূর পর্য্যন্ত?

উত্তর—কাহার স্বাধীনতা বিনাশ করিবার অধিকার কাহারো নাই। স্বামী বলিয়া স্ত্রীর উপরে তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে উপদেশ দ্বারা সৎপথে প্রবৃত্ত এবং অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবেন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঈশ্বর এমনি একটী গূঢ় ক্ষমতা দিয়াছেন যে, সেই ক্ষমতার যথোচিত ব্যবহার করিতে পারিলে একজন আর একজনকে স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট না করিয়া সৎপথে প্রবৃত্ত বা অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন।

প্র—স্ত্রী যদি কোন কুৎসিত স্থানে যাইতে চাহেন, তবে কি তাঁহাকে যাইতে দিতে হইবে?

প্র—স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সকল কার্য্য নির্ব্বিবাদে সাধন করা উচিত। শিশু সন্তানকে যেরূপ শাসন করা যাইতে পারে,

স্ত্রীকে কখন তদ্রূপ শাসন করা যাইতে পারে না। কোন মন্দ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া সে কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। তবে স্ত্রী যদি স্পষ্টতঃ কোন ভয়ানক বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন বুঝিতে পারা যায়, তবে কোন ব্যক্তি জলে ডুবিয়া মরিতে যাইলে তাহাকে যেমন বলপূর্ব্বক তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়, এ সম্বন্ধেও তাহাই; তদপেক্ষা কিছুই ন্যুনাধিক নহে। ভয়ানক পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে স্বামীরও যেমন অধিকার, স্ত্রীরও তেমনি অধিকার আছে। আত্মা সম্বন্ধে নর নারীতে কোন প্রভেদ নাই। ঈশ্বর ধনী দরিদ্র, দুর্ব্বল, সবল সকলকেই সে বিষয়ে সমান অধিকার দিয়াছেন।

প্র—স্ত্রী অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন হইলে, শিশুকে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিতে যেরূপ ব্যবহার করা যায়, তেমন ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না?

উ—মনে কর, স্বামী মূর্খ, স্ত্রী জ্ঞানবতী; এ স্থলে স্ত্রী যেরূপ স্বামীর প্রতি ব্যবহার করিবেন, স্বামীও ঠিক তেমনি ব্যবহার করিবেন। দুর্ব্বলের সহিত সবলের, ধার্ম্মিকের সহিত অধার্ম্মিকের, জ্ঞানীর সহিত মূর্খের ব্যবহার কি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া হয় না? পুরুষের বল সমধিক, ইহা বলিয়া বলপূর্ব্বক স্ত্রীকে স্বপথে আনিতে গেলে আরো বিপদে পড়িতে হয়; কৌশলে স্বপথে আনয়ন করিতে হইবে। আমার অসুবিধা হয় বলিয়া ন্যায়-পথকে কখনও খর্ব্ব করিতে পারি না।

প্র—স্ত্রী যদি দুর্গোৎসবে যাইতে ব্যগ্র হন, তবে কি তাঁহাকে বাধা না দিয়া যাইতে দিতে হইবে?

উ—কেহ কোন কার্য্যে যথার্থ ব্যগ্র হইলে, সে সে কার্য্য করিবেই। আর শুদ্ধ যদি দুষ্টামি হয়, তবে বাধা পাইলেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে। স্ত্রী ভয়ানক কার্য্য করিতে যাইতেছেন, জানিলে বাধা দিতে পারি, অন্যতঃ নয়।

প্র—স্ত্রী পৌত্তলিক, তিনি ব্রাহ্মণ-ভোজন কি অন্যবিধ অনুষ্ঠান করিতে চাহিলে তাহাতে কি সাহায্য করিতে পারি?

উ—স্ত্রীর স্বীয় স্বাধীনতা-সূত্রে স্বকীয় অনুষ্ঠেয় কার্য্য করিতে অধিকার আছে। সুতরাং তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন কার্য্য সমুপস্থিত, তখন সে কার্য্যের জন্য কিছু দিতে পারি না। পূর্ব্বে তাঁহাকে যাহা কিছু নিয়মিতরূপে দেওয়া হইত, তিনি তাহা হইতে স্বীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

প্র—স্ত্রী যদি খ্রীষ্টান হইতে যান, তবে তাঁহাকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে কি না?

উ—যদি খ্রীষ্টধর্ম্মে যথার্থ ই তাঁহার মতি জন্মিয়া থাকে, তবে তিনি খ্রীষ্টান হইয়াছেন, তাঁহাকে আর বাধা দিলে কি হইবে? দৃঢ় বিশ্বাস হইলে আর কেহ কাহাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষতঃ আমরা নিয়ত দেখিয়া আসিতেছি, বাধা দিলে বা প্রতিবাদ করিলে দুর্ব্বল বিশ্বাসও দৃঢ় হইয়া উঠে।

প্র—স্ত্রী যদি লোকানুরোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া গৃহে পৌত্তলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে কি তাঁহাকে গৃহে তদনুষ্ঠান করিতে দেওয়া যাইতে পারে?

উ—বাসগৃহের উপরে উভয়েরই সমান অধিকার; সুতরাং তাঁহাকে গৃহেই অনুষ্ঠান করিতে দিতে হইবে।

প্র—মাসিক ব্যয়াদি না দিয়া প্রকারান্তরে স্ত্রীকে কি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে না?

উ—দৃঢ় প্রত্যয় (Conviction) কোন প্রকারেই বাধা মানে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শুদ্ধ দুষ্টতা থাকিলেই বাধা মানে, অন্যতঃ নয়। বায় বন্ধ কর, একজন কৃপণের স্ত্রী কৃপণের হাতে পড়িয়া যেমন অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ব্রাহ্মের স্ত্রীও তেমনি বিনা ব্যয়ে যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হয়, তাহাই করিবেন। কোনরূপ বাধা তাঁহার নিকট কার্য্যকর হইবে না। শাসন বাধা সেখানে খাটে, যেখানে বৃথা আড়ম্বর।

প্র—স্বামী ব্রাহ্ম, স্ত্রী অব্রাহ্ম অথবা স্ত্রী ব্রাহ্মিকা, স্বামী অব্রাহ্ম; ইঁহারা পরস্পরে কি প্রকার ব্যবহার করিবেন? এবং একজন অন্যজনকে অসত্য পথ হইতে কি প্রকারেই বা প্রতিনিবৃত্ত করিবেন?

উ—পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই জানা যাইতেছে, স্ত্রী স্বামী উভয়েরই ক্ষমতা সমান। অতএব উভয়ে উভয়ের অবস্থাতে সমান ব্যবহার করিবেন। কখন উভয়ের মধ্যে যেন চেষ্টার শিথিলতা না হয়। বিশুদ্ধ নীতিবলে (Moral influence) একজন আর একজনকে অসত্য পথ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিবেন। কোন প্রকার প্রভাব (Influence) বিস্তার না করা উদাসীনতা।

প্র—পৌত্তলিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করা বা তদুপলক্ষে প্রতিনিধি দেওয়া যাইতে পারে কি না?

উ—কখনও সেরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যাইতে পারে না। ঠিক ব্রাহ্ম হইলে তাহাকে কেহ নিমন্ত্রণ করে না। মুসলমানকে কে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে? পৌত্তলিক নিমন্ত্রণ আসিলেই ফিরাইয়া দেওয়া উচিত।

প্র—বিজয়ার পর সাক্ষাৎ হইলে এদেশে প্রণাম নমস্কারের প্রথা প্রচলিত আছে; ব্রাহ্মগণ সেরূপ করিতে পারেন কি না?

উ—বিজয়ার পর প্রণাম নমস্কার পৌত্তলিক ক্রিয়ার অঙ্গস্বরূপ; সুতরাং তাহাতে ব্রাহ্ম যোগ দিতে পারেন না।

প্র—পৌত্তলিকের কোন প্রকার নিমন্ত্রণ কি আমরা রক্ষা করিতে পারি না?

উ—পৌত্তলিক নিমন্ত্রণ, আর পৌত্তলিক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ স্বতন্ত্র। পৌত্তলিক কার্য্যে যোগ দিবার জন্য যে নিমন্ত্রণ, তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মের অগ্রাহ্য; কিন্তু পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী কোন

ব্যক্তি যদি অন্ত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহার সহিত পৌত্তলিকতার কোন যোগ না থাকে, তবে তাহা অবশ্য রক্ষা করা যাইতে পারে।

প্র—ব্রাহ্ম, হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃতিকে বিবাহ করিতে পারেন কি না?

উ—একজন মাতাল স্ত্রীকে বিবাহ করিতে ব্রাহ্মের প্রবৃত্তি হয় কি না? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই ইহার উত্তর পাওয়া যায়। ঈশ্বরানুরক্ত উৎসাহী ব্রাহ্ম ধর্ম্মপথে তাঁর সঙ্গিনী পাইবেন, এইজন্য বিবাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মিকা ভিন্ন অন্ত কাহাকে কেন বিবাহ করিবেন? স্ত্রী কেবল ভোগ্য বস্তু বা দাসীর ন্যায় নহেন যে, তিনি যাকে তাকে বিবাহ করিতে পারেন।

প্র—ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস আছে, অথচ ধ্যানের সময় কাহাকে ধ্যান করিতেছি আশঙ্কা হয়; ইহা কিরূপে চলিয়া যায়?

উ—ক্রমাগত ধরিয়া পড়িয়া থাকলে আশঙ্কা চলিয়া যায়। আমরা অনেকে অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। পূর্ব্বে অনেকের সংশয় ছিল, এ পর্য্যন্ত সে সংশয় সম্পূর্ণ যায় নাই; সুতরাং উপাসনার সময় তাঁহাতে গিয়া সংশয় উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে এমন হয়, আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ধরিয়াছিলাম, বস্তুতঃ উহা ঈশ্বর নয়—কল্পনা। সুতরাং ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে স্বয়ং ঈশ্বরই উহার অসত্যতা দেখাইয়া দিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হন। অনেক সময়ে দর্শন পাইয়া আমরা অহঙ্কারী হই, তদ্দ্বারাও আবার দর্শন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে বিনীত প্রার্থনা ও উপাসনা করিতে করিতে পুনরায় সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বাস্তব বিশ্বাস ধরিয়া পড়িয়া থাকলে কোন ভয়ের কারণ নাই। যে কিছু কল্পনা কুসংস্কার থাকে, সকলি তিনি স্বয়ং সংশোধন করিয়া দেন। যত সংশয় চঞ্চলতা মধ্যমধ্যে হইয়া থাকে, ইহা কেবল বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার জন্য।

প্র—আপদ্ বিপদের দিন তাঁহার আবির্ভাব বিশেষরূপে দেখিলাম। সেই বিপদের দিন না ভুলি, ইহার কোন উপায় আছে কি না?

উ—যে বিষয় গত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্মরণ ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। ঘোরতর শোক উপস্থিত হইলে তাহা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়। বিপদ্‌কে স্মরণ করিয়া রাখাও তেমনি অসম্ভব। অতএব ঈশ্বরকে যেদিন উজ্জ্বলরূপে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন মনে রাখিয়া সেইরূপ দেখিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে।

প্র—ঈশ্বর সর্ব্বদা নিকটে আছেন, এ ভাবটী সর্ব্বদা কিরূপে জাগ্রৎ রাখা যায়?

উ—সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ভাবা উচিত। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ ভাবটী স্থায়ী হইয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

দ্বিষষ্টিতম ভাদ্রোৎসবের বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

১৮ই আগষ্ট, ১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার, প্রাতে নবদেবালয়ে উপাসনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত সম্পন্ন করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে "বেদ ও কোরাণের মিলন" বিষয়ে অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বে, যে গৃহে আমরা উপাসনা সাধন করি, সে গৃহ বিভিন্ন সাধু ভক্ত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কেমন মিলন স্থান, এইটী প্রদর্শনের ভাবে "শ্রীদরবারের গৌরব" আচার্য্যদেবের এই প্রার্থনার বিশেষ অংশ ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পাঠ করেন। পরে বক্তা বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম স্থানান্তরে প্রকাশিত হইতে পারে। তাঁহার বক্তৃতার বিশেষ কথা এই, বেদে ভারতীয় জাতি-ভেদের কথা একেবারেই উল্লেখ নাই। কিন্তু সকল মানুষ যে একেরই সন্তান, একেরই সন্তান বলিয়া এক পরিবার, প্রেম-বন্ধনে সকলের সঙ্গে মিলিত থাকাই পারিবারিক ধর্ম্ম, এইটী বেদে বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে। তিনি বেদের বিশেষ বিশেষ শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া এবং তৎসঙ্গে সেই ভাবের কথা কোরাণে যেরূপ আছে, তাহাও উল্লেখ করিয়া, বেদ ও কোরাণের মিলনের কথা অতি উৎসাহপূর্ণ তেজোময় ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। ইংরেজ জাতি গত ছয় শত বৎসরের মধ্যে খ্রীষ্টের Brotherhood এর ভাব গ্রহণ ও অনুসরণ করিয়া কেমন একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের Labour-party কেমন প্রাধান্য লাভ করিয়া, দেশের শাসন-দণ্ড ধারণ করিয়াছেন; আর জাতিভেদের ফলে, নানা সম্প্রদায়-ভেদের ফলে আমরা কেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি এবং আমাদের দেশের কৃষক ও মজুর দল সর্ব্বাপেক্ষা কেমন হীন অবস্থায়, দুর্গতির একশেষ অবস্থায় পতিত হইয়াছে; এই সকল বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ নববিধানের সমন্বয়-সাধনের ভিতর দিয়া মিলন কেমন স্বাভাবিক ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক মিষ্ট ও সহজ সরল ভাষায় উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দেন। অগ্রকার তাঁহার বিশেষ কথা এই—সুধু বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠের ভিতর দিয়া যথার্থ চরিত্রগত মিলন-সাধন হয় না। যদি শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্মভাব জীবনে গ্রহণ করিতে হয়, তবে বুদ্ধ-চরিত্রকে স্বীয়-চরিত্রে গ্রহণ করিতে হইবে; যদি খ্রীষ্টশাকে জীবনে লইতে হয়, তবে চরিত্রে ঈশা-চরিত্র গ্রহণ ও হজম করিতে হইবে; যদি মহম্মদের ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, তবে শ্রীমহম্মদের সেই ধর্ম্মতেজকে আয়ত্ত করিতে হইবে ইত্যাদি। তাঁহার বক্তৃতার পর অগ্রকার কার্য্য শেষ হয়।

১৯শে আগষ্ট, ২রা ভাদ্র, বুধবার, পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শান্তিকুটীরে

"আমাদের সত্ত্বের" উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার সরল সুমিষ্ট উপাসনা প্রার্থনায় মিলন-সাধন নববিধানের বিশেষ লক্ষ্য এবং মিলনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উদ্ভাসিত হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন। পরে সকলের জলযোগ হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত করেন। সর্ব্বশেষে একটী সঙ্গীত মহিলাগণ করেন।

২০শে আগষ্ট, ৩রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদলের (Salvation Army) সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙ্গলায় সমন্বয়-সাধন সূচক একটী সঙ্গীত করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু এ দেশে মুক্তিফৌজদলের আগমন উপলক্ষে আচার্য্যদেবের ইংরেজি ভাষায় আশ্চর্য উক্তি পাঠ করেন ও সমাগত দলের অভ্যর্থনা করেন। তৎপর ঐ দলের সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হয়।

২১শে আগষ্ট, ৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার, ভক্তিভাজন ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের ও ভাই বলদেব নারায়ণের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে ডাক্তার জগন্মোহন দাস উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনা বেশ সরস ও সারগর্ভ হইয়াছিল। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ হয়। প্রথমে ভাই অক্ষয়কুমার লধের নেতৃত্বে একটী সঙ্গীত হয়। তৎপর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন ও ভক্তিভাজন অভিভাবক কান্তিচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে কিছু বলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন এবং শ্রীমতী হেমলতা চন্দ কান্তিবাবুর জীবনের কথা বলেন। পরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস স্বর্গগত কান্তিচন্দ্র ও বলদেবনারায়ণের জীবনের কথা বলিতে গিয়া প্রেরিতদিগের জীবনের বিশ্বাসের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। সর্ব্বশেষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ স্বর্গগত ভাই বলদেব নারায়ণের জীবনী উল্লেখ করিয়া কিছু বলার পর অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়।

২২শে আগষ্ট, ৫ই ভাদ্র, শনিবার, পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে শ্রীযুক্ত আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে কেবল মহিলাগণের উৎসব হয়। শ্রীমতী হেমলতা চন্দ উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার বিবৃতির সার নিয়ে দেওয়া গেল:—

সকল ব্রহ্মকন্যা মিলে আজ প্রিয় ব্রহ্মমন্দিরে উৎসব করতে অর্থাৎ খাঁটি জীবন লাভ করতে এসেছি। এমন একদিন ছিল, যখন মেয়েদের মধ্যে কেহ ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত ও সুখী হতে শেখেন নি। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ শ্রীআচার্য্যদেব ভারতাশ্রমে ছেলেদের সঙ্গে সব মেয়েদেরও ডাকলেন। তখন প্রতিদিন দু'বেলা নিয়মিত ব্রহ্ম-আরাধনায় সহিত সুমিষ্ট উপাসনা প্রার্থনা করতে মেয়েরা শিখেছিলেন এবং আনন্দ লাভ করেছিলেন; এবং অনেকে দলবদ্ধ হয়ে শ্রীআচার্য্যদেবের কাছে ধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তাঁদের ভিতরে কাহাকে কাহাকে আমার মনে পড়ে। শুনেছি, গার্গী লীলাবতীর মতই তাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনাতে জীবনাতিপাত করিতেন। কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী সর্ব্বপ্রথম পবিত্র কুমারী-জীবনে পরসেবাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করে ও জ্ঞান বিদ্যা দান করে ইহলোকে ধন্য হয়ে রয়েছেন। স্বর্গে তিনি আজ আমাদের স্মরণীয়। শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবী, মোহিনী দেবী, রাজলক্ষ্মী সেন, স্বর্ণলতা দেবী, কাদম্বিনী দত্ত প্রভৃতি মহিলাগণ শ্রীআচার্য্যদেবের মনের মত আর্য্যনারীর সাধনায় জীবনকে চিরদিনের তরে নিয়োগ করেছিলেন। শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীও তাঁদের সমসাময়িক বন্ধু; কিন্তু তিনি পৃথিবীতে আরও কিছুদিন তাঁর ব্রাহ্মিকাজীবনের গৌরব রক্ষা করে, প্রিয়তম পতি ভক্তিভাজন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইচ্ছামত নববিধানমণ্ডলীর উপকারার্থ কর্ত্তব্যগুলি পালন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করে, শীঘ্র শীঘ্র স্বর্গে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। আমরাও, যে ব্রহ্মকন্যাগণ, তাঁদের শ্রীপদ-চিহ্ন আদর্শ করিয়া সাধনে সিদ্ধি লাভ করিব, এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা লয়ে এস জীবন পথে চলি। সেই সময়ে ভারতাশ্রমে গঠিত আর্য্যনারীগণের মত একালে আমাদের ভিতর কাহারও উপাসনা বা প্রার্থনাকে অনুরাগ বা নিষ্ঠা দেখিতে পাই না। বল, ব্রহ্মকন্যা, শ্রীআচার্য্যদেবের শিক্ষা ও বাণী অনুসরণ করতে আমরা কি বিরত থাকব? এস আজ চিন্তা করি, তাঁর প্রিয় নববিধানের আর্য্যনারীর পদে আমরা অধিরোহণ করতে পারছি কি না? এই সুখের প্রিয় ভাদ্রোৎসব আমাদের জীবনগুলিকে স্বর্গের দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্যই এসেছে। সকলেরই স্মরণ থাকতে পারে, পূর্ব্বকালে এই উৎসবের সময়ে কেবল মাত্র মেয়েদের জন্য এরূপ একটী দিন নির্দ্ধারিত হইত না। গত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রোৎসবে প্রথম এই দিনটীতে মেয়েরা উৎসব সম্ভোগ করিলেন। তদবধি এই নিয়ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। ইচ্ছা করছে, আজ সকলে আলোচনা করি, এই এতদিন এ শুভ মিলন ও উপাসনা পেয়ে, ব্রহ্মকন্যাগণ কত উপকৃত, উন্নত ও সুখী হয়েছেন এবং আধ্যাত্মিক চরিত্রই বা কতখানি উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে? এস, ব্রহ্মকন্যাগণ, আবার ভাল করে আমরা ব্রহ্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হই; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জগতের কাজে ধর্ম্মদানে নিরত থাকি ও স্বদেশের সেবায় যত্নবতী হই। এই যে জল-প্লাবনে হাহাকার উঠেছে, আমাদের প্রাণ যেন উদাসীন না থাকে। শ্রীআচার্য্যদেবের বিশ্বপ্রেমের কামনা ও আশীর্ব্বাদে, আমরা যে এই বিলাস-স্বার্থময় সময়েও পরমেশ-পদে সকলে মিলিত হতে পেরেছি, তা নিশ্চয় সপ্রমাণ করছে, এই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী নববিধান-নিশান বিশ্ব-বিজয়ী। তবে, হে ব্রহ্মকন্যা, আমাদের এইক্ষুদ্র জীবনে বিশ্বপিতা ভগবান্ যে এত কৃপা দিলেন, দিচ্ছেন ও দিয়েছেন, আমরাই

অবলা কুলবালা হয়ে তাঁর সেই প্রেমের ঋণ কখনও কি পরিশোধ করিতে পারি? মায়ের দয়া মেয়ের প্রতি মনে হলে প্রাণ প্রেম-রসে আর্দ্র হয়। যেন আমরা এই প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ থাকি চিরদিন। স্নেহময় পিতা মাতার স্নেহ ঋণ কখনও আমরা পরিশোধ করিতে পারব না জেনে, বিশ্বপূজ্য দেবতার চরণে কৃতজ্ঞ হই! সকল জানিত অজানিত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি।

২৩শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, রবিবার, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে কীর্ত্তনান্তে ৮টায় উপাসনা আরম্ভ হয়। ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি দীর্ঘ উপদেশে পারলৌকিকতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার প্রদত্ত এ বেলার উপদেশ স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নের উপাসনা ৩টায় আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু উপাসনা করেন। তৎপর প্রায় ৬টা পর্য্যন্ত পাঠ ও আলোচনাদি হয়। তারপর প্রায় এক ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন হইলে সান্ধ্য উপাসনা আরম্ভ হয়। এবেলা ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করেন। আচার্য্যদেবের "জলধরে শব্দশ্রবণ" এই উপদেশ পাঠান্তে উপদেশ দেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ হস্তগত হইলে পরে স্বতন্ত্র বাহির হইতে পারে।

২৪শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র, সোমবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বাহ্ণে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই ৭ই ভাদ্র, বঙ্গ, ভারত এবং সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে কত বড় দিন, কেমন পুণ্য দিন, শুভদিন। ধর্ম্মরাজ্যে যত প্রকার বিরোধ ও বিবাদ, তাহার অবসানের উপায়-স্বরূপ মহাসমন্বয়ধর্ম্ম-সাধনার মূল উপাসনা-প্রতিষ্ঠার অঙ্কুর এই শুভদিন। এইভাবে উদ্বোধন হয়। আরাধনা ও প্রার্থনাদি সেই ভাবে সম্পন্ন হয়। "নববিধানকে জয়ী করিব" আচার্য্যদেবের এই প্রার্থনা এবেলা পঠিত হয়। উপাসনার শেষভাগে স্বর্গগত নববিধান-বিশ্বাসী রমণীকান্ত চন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিন বলিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য বিশেষ প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি আত্ম-নিবেদনে রাজা রামমোহন রায়ের উপাসনা-প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে কি ভাবে সেই উপাসনা ক্রমবিকাশের ভাবে পরিণত হইল এবং তৎপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে সেই উপাসনা কেমন মহাসমন্বয়-সাধনার মহা উপাসনা রূপে ক্রমবিকাশ লাভ করিল, তাহা বিশদভাবে বিবৃত করেন।

২৫শে আগষ্ট, ৮ই ভাদ্র, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে, নবদেবালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত উপাসনা করেন। সন্ধ্যার পর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধান-মণ্ডলীর সাধারণ সভা হইবার কথা ছিল; কিন্তু বিশেষ কারণে এ সভার কার্য্য হইতে পারে নাই।

২৬শে আগষ্ট, ৯ই ভাদ্র, বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে, নব দেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়দাস দত্ত প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে হিন্দি ভজন হয়।

২৭শে আগষ্ট, ১০ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। এ দিন পূর্ব্বাহ্ণে নবদেবালয়ে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের জীবন অবলম্বনে প্রার্থনা করেন। বেলা প্রায় ১১টার সময় ১৫ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতি-সভা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই যখন প্রচার-ব্রতে শিক্ষার্থিরূপে কলিকাতায় বাস করেন, সেই সময় হইতে তাঁহার প্রচারক-জীবনের বিশেষ বিশেষ সুরের কথা, বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া, তাঁহার প্রচারক-জীবনের কার্য্য ভাই গোপালচন্দ্র বিবৃত করেন। সেবাভাবপ্রধান তাঁহার জীবন ছিল। দুর্ভিক্ষের সময়ে দুঃস্থদিগের সেবা যেমন তিনি প্রাণ মন ঢালিয়া করিতেন, তেমনই ধর্ম্মক্ষেত্রে এবং মণ্ডলীর ও বাহিরের লোকের মধ্যে, ধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ সুসংবাদ বক্তৃতার ও বেদীর কার্য্য উপলক্ষে ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলকে প্রাণ মন ঢালিয়া প্রদান করিয়া, সকল আধ্যাত্মিক সেবার কার্য্যও সেবার ভাবেই করিতেন। প্রচার-ব্রত-গ্রহণের পূর্ব্বে বাঁকীপুরে যখন বিষয়-কার্য্য উপলক্ষে ছিলেন, সেখানে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্য ডোম, মেথর প্রভৃতির ছোট ছোট সন্তানদিগের মধ্যে শিক্ষা-দান ব্যবস্থা করিয়া সেবা-কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূজনীয়া ভক্তিপথের উচ্চ সাধিকা মাতৃদেবীর জীবনে বিশেষ সেবার ভাব নানা পরহিতকর কার্য্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সেবার বিশেষ ভাব তিনি গর্ভধারিণী জননী হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার জননীর জীবন-চরিত্রের অংশ বিশেষ পাঠ করিয়া তাহা প্রদর্শন করা হয়। তিনি দীর্ঘকাল উপাসক-মণ্ডলীর সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। যুবকদল ও বৃদ্ধদলের মিলনে বর্ত্তমান উপাসক-মণ্ডলীর গঠন-কার্য্যে তাঁহার প্রাণগত চেষ্টা ছিল। তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন, কাহারও তুষ্টি রুষ্টির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, দৃঢ় ভাবে তাহার সমর্থন ও অনুসরণ করিতেন। স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের জীবনের এই সকল বিষয় বিশেষ ভাবে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উল্লেখ করেন। তৎপর স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর প্রচার ও বেদীর কার্য্য সম্পর্কে শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশের লিখিত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু পাঠ করেন এবং পাঠের পর শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত ভাইয়ের অন্তিম সময়ের বিবরণ উল্লেখ করিয়া, স্বর্গগমনের কি

সুন্দর এবং উচ্চ প্রস্তুতির পরিচয় তিনি তাঁহার স্বর্গগমনের পূর্ব্বে দিয়াছিলেন, তাহা বিমলবাবু বিশেষ ভাবে বিবৃত করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত বিজদাস দত্ত একটী প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করিলে অঙ্গীকার কার্য্য শেষ হয়। শ্রীমতী ঘণিকা দেবীর প্রবন্ধটী নিয়ে দেওয়া গেল :—

ভক্তিভাজন ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয়ের সম্বন্ধে আজ আমি দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার উপাসনা উপদেশাদিতে যে উপকার লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ আছি। তাঁহার উপদেশ, প্রার্থনা ও উপাসনায় প্রায়ই কোন না কোন নূতন ভাব প্রকাশ হইত।

একবার মাঘোৎসবে, এই বোধ করি, তাঁর ইহ জগতে শেষ উৎসব, তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়া আছে। সেদিন উৎসবের ঘন আনন্দের মধ্যে তাঁহার কণ্ঠস্বর উৎসাহাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। অনর্গল ভাষার স্রোতে তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিভাব উদ্বেলিত হইয়া শ্রোতৃ কাকে মোহিত করিয়াছিল। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই ছিল যে, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা আমরা বলিব না, কিন্তু এই কথাই বলিব, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করি।" "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা বলা যায়, কারণ আমরা জানি, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই; কিন্তু আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা মিলাইয়া বলিতে পারি, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করি", তবেই জীবন ধন্য হইবে। এই দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদিগকে এই সঙ্কটময় সংসারে রক্ষা করিতে পারিবে।

একবার ব্রজগোপালবাবু গিরিধিতে একটী নূতন উৎসব করেন, ইহা "গ্রীষ্মোৎসব"। আমরা "বসন্তোৎসব" "শারদোৎসব" সম্ভোগ করিয়াছি, কিন্তু "গ্রীষ্মোৎসব" সম্পূর্ণ নূতন। গ্রীষ্মের মধ্যেও যে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার এক বিশেষ ভাব প্রকাশিত হয়, ইহা সাধন করিবার জন্য তিনি এই উৎসব করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের সময় তাঁহার বালকের ন্যায় উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম। এই উৎসবের মধ্যেই তিনি ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পিতৃদেবের জন্মোৎসবে একবার গিরিধিতে তিনি আমাদের বাড়ীতে বালকবালিকাদিগকে যে সুন্দর উপদেশটি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও একটি নূতন ভাব প্রকাশিত ছিল। ইহা সকলেরই বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল। উপদেশটি ধর্ম্মতত্ত্বে ছাপানো হয়েছিল, বোধ করি, তাহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন।

একবার গিরিধি-বাসকালে তিনি আমাদের গৃহের নিকটেই বাস করিতেন। আমি প্রতিদিন তাঁহার জন্য সামান্য আহার্য্য পাঠাইতাম, ইহাতে যে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। সম্প্রতি জুবিলী উৎসবে যে Forum হইল, ইহার শিক্ষা আমি প্রথম ব্রজগোপালবাবুর নিকটে লাভ করিয়াছিলাম। গিরিধির মন্দিরে এই Forumএর অধিবেশন হইত। তাই ভগনী সকলেই তাঁহাকে ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেন, তিনি সহজ ও সুমিষ্ট ভাষায় তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। এই প্রশ্নোত্তরে আমি যে কত উপকৃত হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমি আজ ভাই ভগ্নীর নিকট বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই Forumএর ব্যবস্থা করুন। যাঁহারা সাধনায় অগ্রগামী, তাঁহারা উপদেশ ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা আমাদের সাধনায় সহায়তা করুন।

ব্রজগোপালবাবু সমাজের যে কত সেবা করিয়াছেন, তাহা অন্য ভাই ভগ্নীরা আরও অধিক জানেন, তাঁহারা বলিবেন; আমার শক্তি অল্প, তাই বেশী আর বলিতে পারিলাম না। আজ তাঁহার পবিত্র-স্মৃতিকে অন্তরের ভক্তি অর্পণ করিয়া প্রণাম করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক।

পূর্ব্ব বাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের দীনাত্মা সভ্যগণ একপক্ষকাল আনন্দময়ী জননীর নাম-গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া উৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। ২০শে ভাদ্র, রবিবার, সায়ংকালে আরতি হইয়া উৎসবের সূচনা হয়। আরতির কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ সম্পাদন করিয়া, উদ্বোধনের উপাসনা জন্য ভাই মহিমচন্দ্রকে আহ্বান করেন। তদনুসারে ভাই মহিমচন্দ্র সে দিন বেদী হইতে যে দুইটী কথা বলেন, তাহা এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারে :—

ভাই ভগিনীগণ, আমরা সঙ্গীতে প্রথমতঃ শুনিলাম, "চল ভাই যাই সবে, মহা মহোৎসবে, অমরধামে যোগবলে। নিরখি আনন্দে, আনন্দময়ীরে, মিশে সাধু অমর-দলে।" উৎসবে আমরা সাধু অমরাত্মাদের সঙ্গে যোগ-বলে মিলিত হইয়া আনন্দে আনন্দময়ীকে নিরীক্ষণ করিব। এই আনন্দময়ীর দর্শন আমরা তিন জায়গায় লাভ করিব, তাহাও আমরা সঙ্গীতে শুনিলাম— "নিরখি তোমারে বিশ্বচরাচরে, সাধুর অন্তরে, হৃদয় ভিতরে, আনন্দে হইব মগন।" এই যে বিশ্বচরাচরে এবং সাধুর অন্তরে আনন্দময়ীর দর্শন, এ দুইটীই গৌণ দর্শন; কেন না, সৃষ্টির আবরণ এবং সাধুদিগের চরিত্র ও জীবন মুখ্য দর্শনের অন্তরায়। কিন্তু আমাদের স্বীয় অন্তরে যে আনন্দময়ীর দর্শন, তাহাই মুখ্য দর্শন। উৎসবে এই ত্রিবিধ দর্শনের যুগপৎ সমাবেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহোৎসবের ব্যাপারে, "দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই; ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষিত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে এবং নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।"

২১শে, ২২শে, ২৪শে, ২৫শে ও ২৯শে ভাদ্র, বিধানপল্লী, নিমতলী, ফরাসগঞ্জ, মালাকার টোলা এবং দিগ্‌বাজারে

উপাসনা হয়। প্রথম মুহূর্ত্তে ভাই দুর্গানাথ ও অন্যান্য স্থানে ভ্রাতা মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করেন। ২৫শে ভাদ্র, সঙ্গত-সভার সাম্বৎসরিক দিন সায়ংকালে রায়বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্. এ, উপাসনা করেন এবং বেদী হইতে অতি সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। পাঠ ও উপদেশ কিঞ্চিৎ সুদীর্ঘ হইলেও, শ্রোতৃবর্গ তাঁহার সুমধুর ভাব ও ভাষাতে মুগ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ২৬শে ভাদ্র, ভ্রাতা মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান" বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাতে রাজর্ষি রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, বক্তৃতান্তে শ্রোতৃবর্গ বক্তাকে উহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। ২৭শে ভাদ্র দিনব্যাপী উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্ণে ভাই দুর্গানাথ উপাসনা করেন ও সুমিষ্ট উপদেশ দেন। পুনরায় ২টার সময় অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্. এস্. সি মাধ্যাহ্নিক উপাসনা করেন। ৩টাতে প্রথমতঃ শ্রীমদ্‌গীতা পরিপূর্ত্তি হইতে পরম ভক্ত নায়কের "ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ" সম্বন্ধে পাঠ হয়; তৎপর আচার্য্যের উপদেশ হইতে ভাই দুর্গানাথ পাঠ করেন। পাঠান্তে আলোচনা হয়। তৎপর ভ্রাতা মহেশচন্দ্র ধ্যানের উদ্বোধন করিলে উপাসক উপাসিকাগণ ধ্যানে প্রবৃত্ত হন এবং ধ্যানান্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনার পর জমাট সংকীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে ভাই মহিমচন্দ্র শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বন্ধুদের একান্ত অনুরোধে বেদী গ্রহণ করিয়া, পুতুলের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া উপাসনা করেন। উপদেশ দিবার পূর্ব্বে 'নববিধান কি?' এবিষয়ে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের ইংরাজি লেখার বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন। উপদেশে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটী উল্লেখযোগ্য বিশেষ কথা এই ছিল যে, 'অমিতব্যয়ী পুত্র অনুতপ্ত হইয়া পিতার গৃহে ফিরিয়া আসে' ইহাও পুরাতন তত্ত্ব। নববিধানে নূতন তত্ত্ব 'নরকে ব্রহ্মমার অবতরণ'। ব্রহ্মানন্দ টাউন হলে বলিলেন, 'এই নরক-তুল্য হৃদয়ে আমি অনেকবার তাঁহাকে দেখিয়াছি।' বঙ্গচন্দ্র বলিলেন, 'আমি নরক, সেই নরকে ব্রহ্মমাতা অবতরণ করিয়াছেন।' আর আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি বলিতে পারেন, আমি নরক নই, আমাতে পাপ নাই। 'আমাতে পাপ নাই, এ কথা যে বলে, তাহাতে সত্য নাই।' অথচ কাহার সঙ্গে না জীবন্ত ঈশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন? এই যে তিনি অবতীর্ণ হইয়া 'আমা হতেও আমার নিকট স্থিতি করিতেছেন', ইহা আমাদের পরিত্রাণের নূতন সংবাদ। তিনি বলিতেছেন—"জীব তোর সঙ্গে আমি আছি বর্ত্তমান। নিত্যকাল আছি রে সঙ্গে, দিতে তোরে পরিত্রাণ।" ইহাতেই প্রেমদাস গাইলেন, "হরি হরি বল, সবাই ভাল, সবাই মাথার মণি। সবার প্রাণের ভিতর, সুখের সাগর, হরি গুণমণি।" তিনি আমাকে পরিত্রাণ দিতে সঙ্গে আছেন, ইহা স্মরণ করিয়া প্রেমদাস পুনরায় গাইলেন:—"খুলে গেছে চিরতরে স্বর্গের দুয়ার, নিমন্ত্রণ আসিয়াছে তোমার আমার। (পত্র পড়ে দেখ ভাই)—(মায়ের মধুমাখা পত্র পড়ে দেখ ভাই) কেহ নাহি রবে, পড়িয়ে এ ভবে, সবে যাব মার কাছে।"

২৮শে ভাদ্র, সাম্বৎসরিক দিনে সায়ংকালে, সমাজের সম্পাদক উপাসনা করেন এবং জীবন্ত ঈশ্বর এই একার বৎসরকাল আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র উপাসক-মণ্ডলীকে কিরূপ ধন্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া উপদেশ প্রদান করেন।

৩০শে ভাদ্র, ভ্রাতা মহেশচন্দ্র "ব্রাহ্মসমাজের অভিজ্ঞতা" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩১শে ভাদ্র, নারায়ণগঞ্জে প্রচার-যাত্রা। সেখানে উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ দাসের গৃহে ভ্রাতা মহেশচন্দ্র উপাসনা করেন এবং 'গৃহী ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন' এই বিষয়ে উপদেশ দেন। যতীন্দ্রনাথ সকলকে জলযোগ করাইয়া আপ্যায়িত করেন। ১লা আশ্বিন, শুক্রবার মন্দিরে জমাট কীর্ত্তন হয় এবং প্রার্থনান্তে কার্য্য শেষ হয়। বাবু চন্দ্রকান্ত গুহ ঠাকুরতা বিশেষ উৎসাহ সহকারে কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ২রা আশ্বিন, যুবকদিগের উৎসব হয়। প্রথমতঃ একটী যুবক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তৎপর অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা, পাঠ এবং উপদেশ প্রদান করেন।

৩রা আশ্বিন, পূর্ব্বাহ্ণে মহিলা উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রমেশকুমার দাস এম্. এ, উপাসনা করেন এবং কুমুদিনী-চরিত, ব্রহ্মময়ী-চরিত, দেবী অঘোর কামিনীর চরিত ও কার্য্য আলোচনা করিয়া সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। মহিলাগণ সঙ্গীত, প্রার্থনা ও পাঠ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে বালকবালিকা-সম্মিলন হয়। বালক বালিকারা আবৃত্তি ও অভিনয় করেন এবং পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ এবং উপদেশ দিয়া কার্য্য শেষ করেন। তৎপর কীর্ত্তন হইয়া সায়ংকালীন শান্তি-বাচনের উপাসনা ভাই দুর্গানাথ রায় করেন। তিনি শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের যে উপদেশ বেদী হইতে পাঠ করেন, তাহার সার ঘনীভূতরূপে নিম্নলিখিত কথা কয়টীতে শেষ হয়, যথা :—"তোমরা ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মবাণী-শ্রবণের রাজ্যে আইস। আর ডাকাতদের রাজ্যে থাকিও না, আর ডাকাতদের রাজ্যে থাকিও না, আর ডাকাতদের রাজ্যে থাকিও না, আর ডাকাতদের রাজ্যে থাকিও না, আর ডাকাতদের রাজ্যে থাকিও না। পাঁচবার নিষেধ করিতেছি।"

উৎসবে মত্ত, লালমণির হাট, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ হইতে বন্ধুগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ইতি।

সম্পাদক।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৫ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর, সন্ধ্যায়, ভক্তি-ভাজন ভাই প্রতাপচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু "আশীষ" হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা ও সঙ্গীত করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ৯ই অক্টোবর, ডাঃ ডি, এন, মল্লিকের আলিপুরস্থ ১০নং নিউরোড ভবনে, তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ বেণীমাধব গুপ্তের নবজাত শিশু পুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে, সম্পন্ন হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। শিশুর মাতা নবসংহিতার প্রার্থনায় প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর শিশুকে ও তার পিতামাতাকে শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন।

নামকরণ—গত ১৪ই অক্টোবর, ৩৪নং হরিশ মুখার্জ্জি রোডে, ডাঃ কুমুদনাথ ঘোষের তৃতীয় সন্তান প্রথমা কন্যার শুভ নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, এবং শিশুকে "মীরা" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহাশীর্ব্বাদ—গত ৯ই অক্টোবর, বার্ড কোম্পানীর "হণ্ডিয়াম্ পেটেন্ট ষ্টোন ফ্যাক্টরীর" ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তের গৃহে, বেলেঘাটায় ৫৫নং ক্যান্যালওষ্ট রোডে, ঢাকানিবাসী রায় সাহেব ডাঃ কালীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান বিনয়রঞ্জন সেনের (আই, সি, এস,) সহিত, পাটনার রায় সাহেব হরিদাস চাটার্জ্জির দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নীরপ্রভার শুভবিবাহসম্বন্ধ ঠিক হইয়া আশীর্ব্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁহার পুত্র কন্যাকে শুভাশীর্ব্বাদে নূতন জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া লউন।

বিধানের নূতন সেবক—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছাপরার শ্রীযুক্ত হাজারিলাল সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ভগবানের কার্য্যক্ষেত্রে বিধানের সেবায় মন প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা অতীব আনন্দের সহিত সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। ভগবান্ বিধানের নূতন সেবককে আশীর্ব্বাদ করুন।

রোগারোগ্যে কৃতজ্ঞতা—সুবিখ্যাতা কবি শ্রীমতী কামিনী রায় কঠিন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরীতে তাঁহার সহোদরা ডাঃ শ্রীমতী যামিনী সেনের আবাসে "বিশ্রামকুটীরে" অবস্থান করিতেছেন। গত ৩রা অক্টোবর, সায়ংকালে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ দ্বারা সম্পাদিত হয়। শ্রীমতী কামিনী দেবী আকুলপ্রাণে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রার্থনা করেন। তাঁহার পুত্র সঙ্গীত করেন। একজন হিন্দু সন্ন্যাসিনী উপাসনায় যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

তীর্থ-যাত্রা—পুরীতে শ্রীনবজগন্নাথ-মন্দির ও নববিধানের সর্ব্ব-সমন্বয়-আশ্রম স্থাপন জন্য যে ভূমি গবর্ণমেণ্ট দান করিয়াছেন, সেখানে গত ২রা অক্টোবর শ্রদ্ধেয় প্রেরিত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জন্মোৎসব ও প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্রের স্বর্গীয় নব জন্মোৎসব সাধনের জন্য প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয়। এবং তাহার পর কয়েকদিনই প্রাতঃকালে তীর্থ-সাধন হয়। কেহ কেহ যোগদান করেন। কটকে প্রমোদবট-মূলেও কয়দিন পরলোক-সাধন হয়।

সেবা—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর কটক পৌঁছিয়া, কয়দিন তত্রত্য স্কুলইন্‌স্পেক্টর মিঃ এস রায় ও শ্রীমতী প্রীতিকণা রায়ের আতিথ্য লইয়া, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক তাঁহাদের পারিবারিক উপাসনা-সাধনে ব্যবহৃত হইয়া কৃতার্থ হন। একদিন স্বর্গীয় মধুসূদন রাওর পত্নীদেবীর সহিত, ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওর বাড়ীতে ও ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র বসুর গৃহে প্রার্থনাদি করেন। পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মধুভবনে, গত ৫ই অক্টোবর, স্থানীয় উপাসক-মণ্ডলীর ভ্রাতাদিগকে লইয়া বিশেষ উপাসনা হয়। গত ৭ই অক্টোবর খড়্গপুরে ভ্রাতা শান্তিপ্রিয় দাস ও মিঃ এস রায়ের ভবনেও উপাসনা হয়।

কোচবিহার-সংবাদ—মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কেশবাশ্রমস্থ ব্রাহ্মসমাধিতীর্থে উৎসবের প্রাস্তাতিক সাধন হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর, মহারাজার সাম্বৎসরিক দিনে স্থানীয় প্রচারক ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আহচের সহযোগিতায় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ গম্ভীরভাবে উপাসনা করেন। প্রধান রাজ-অমাত্যবর্গ ও প্রজাগণ উপাসনায় যোগদান করেন। অপরাহ্ণ ৪॥০টায়, কাউন্সিল গৃহের বারাণ্ডায়, মহারাজার মর্ম্মর-মূর্ত্তির পশ্চাতে স্মৃতি-সভা হয়। ষ্টেট জজ মিঃ গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ রায় উদ্বোধন-সূচক মধুর সঙ্গীত করেন। অতঃপর ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া মহারাজের জীবন-মাহাত্ম্য বিষয়ে মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহা সমাগত ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করা হয়। তাহার পর অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায় মহারাজার পুণ্য চরিত্রের কাহিনী যাহা প্রত্যক্ষ জানেন, তাহা বিবৃত করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। পরে কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দে ইংরাজী ভাষায় মহারাজাকে গ্রীসদেশীয় রাজনাগণের অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন, "মহারাজাকে যদিও আমি চাক্ষুষ দেখি নাই, তথাপি তাঁহার গঠিত কোচবিহার রাজ্যের রাজ-কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বুঝিতেছি, তিনি কত মহাত্মা ছিলেন। এই

রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও, অন্যান্য বড় বড় রাজ্য অপেক্ষা ইহার পরিচালন-ব্যবস্থা যথেষ্টই উৎকৃষ্ট। মহারাজা মহাত্মা কেশবচন্দ্রের প্রভাবে আসিয়া, তাঁহার সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত উদ্বাহিত হইয়াই এই রাজ্যের এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন; অন্যথা এত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।"

সভাভঙ্গ হইলে কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন করিতে করিতে কেশবাশ্রমস্থ সমাধিমণ্ডপে আসিয়া বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। পরে সংক্ষিপ্ত উপাসনান্তে কার্য্য শেষ হয়। এই উপলক্ষে ঠাকুর বাড়ীতে বহুসংখ্যক দরিদ্রদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়।

১৯শে, প্রাতে সমাধিতে উপাসনা হয়, এবং সন্ধ্যায় প্রিন্সিপ্যাল মনোরঞ্জন দের আবাসে বিশেষ উপাসনা হয়। তিনি বিশেষ প্রার্থনা করেন। তাঁর কন্যাগণ সঙ্গীত করেন।

২০শে, প্রাতে সমাধিতে উপাসনা হয় এবং সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা-কালে রাজর্ষির জীবন-মাহাত্ম্য উল্লেখ করিয়া উপদেশ হয় এবং রাজ্যের জন্য ও বিশেষভাবে বর্ত্তমান মহারাজার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করা হয়।

২১শে, সমাধিতে প্রাতে শ্রীনৃপেন্দ্র-সমাগম-সাধন উৎসবের শান্তিবাচন হয়। এই দিনও কুমারী ইন্দুলেখা মধুর সঙ্গীত করিয়া তীর্থ-সাধনে বিশেষ কৃতজ্ঞতা বিধান করেন।

সাম্বৎসরিক—বিগত ১০ই ভাদ্র, স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসুর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া বিধুমুখী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সেবক অখিলচন্দ্র রায় ৫৩।১নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে উপাসনা করেন এবং দেবীর কন্যাগণ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সেবকের সেবাকার্য্যে ২৲ টাকা দান প্রদত্ত হয়।

বিগত ১৮ই ভাদ্র, স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী দেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সেবক অখিলচন্দ্র রায় ৩৪নং মদন মিত্র লেনে, তাঁর কন্যা সুবালা বসুর বাড়ীতে উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ২৲ টাকা দান করা হয়।

বিগত ১৩ই আশ্বিন, স্বর্গীয় বিনোদবিহারী বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সেবক অখিলচন্দ্র রায় ৩৪নং মদন মিত্রের লেন ভবনে বিশেষ উপাসনা করেন। তাঁর পুত্র কন্যাগণ যোগদান ও ২৲ টাকা নববিধান প্রচারাশ্রমে দান করেন।

গত ২রা অক্টোবর, ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, প্রাতে ভবানীপুরে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের গৃহে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এবং সন্ধ্যায় ১০নং নারিকেল বাগান লেনস্থ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৪ই অক্টোবর, কলিকাতায়, ১০।২নং পটুয়াটোলা লেনে, চট্টগ্রামের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র স্পেশ্যাল সাবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস গুপ্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া চারুশশীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুকুমার দাসগুপ্ত, প্রচার ভাণ্ডারে ২ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ১১ই অক্টোবর স্বর্গীয় ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভ্রাতা ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের যুগীপাড়া লেনস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা সেবক অখিলচন্দ্র রায় করেন এবং শ্রদ্ধেয়া ভগিনী ভক্তিমতি মিত্র ও চিত্তবিনোদিনী ঘোষ বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্র তাঁর পিতৃদেবের একটী সুন্দর লিখিত প্রার্থনা পাঠ করিয়া নিজেও প্রার্থনা করেন।

নূতন সংস্করণ।

নিম্নলিখিত বইগুলির জন্য অনেক দিন ধরে সকলে বড়ই অভাব অনুভব করিতেছিলেন; সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হইয়া সে অভাব দূর করিয়াছে।

১। Life and Teachings of K. C. Sen by Late Rev. Bhai P. C. Mazumdar. নববিধানট্রাষ্ট কর্ত্তৃক এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত। সুন্দর ছাপা ও সুন্দর বাঁধাই, লাইব্রেরী ও প্রাইজের উপযুক্ত। এবার কয়েকখানি সুন্দর ছবিও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মূল্য ৩৲ টাকা। ২৮নং নিউরোড, আলিপুর, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ও নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

২। কেশব-চরিত—স্বর্গীয় চিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত। পাইকা অক্ষরে, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মায় ৪২৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। এই নূতন সংস্করণ লাইব্রেরী ও প্রাইজের উপযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে।

৩। ব্রহ্মগীতোপনিষৎ—যোগ-ভক্তি-সাধনার্থীদিগের যোগ-ভক্তি-সাধনে পরম অনুকূল এই সুন্দর বইখানি এবার সুন্দর ভাবে মুদ্রিত। মূল্য ৫০ আনা মাত্র।

উপরি উক্ত বইগুলি কলিকাতায়, ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, নববিধান-প্রচার-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 27.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ২০শ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd November, 1931. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা দুঃখদুর্গতিহারিণী, পাপাসুরনাশিনী, আনন্দময়ী জননি, আমরা তোমারই সন্তান সন্ততি, তোমারই পূজা করি, তোমাকেই মা বলিয়া ডাকিতেছি। আমরা তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও পূজা করি না। তুমি যে স্বয়ং আমাদের মা হইয়া আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিয়াছ। তুমিই আমাদের জ্ঞানদায়িনী মা হইয়া দিব্য জ্ঞান দিয়া দেখিতে দিতেছ, তুমি আমাদের নিত্যই কাছে আছ; তাই আমাদের তোমাকে কল্পনা করিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া, "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া তোমার প্রতিষ্ঠাও করিতেও হয় না, আবার তোমাকে বিসর্জ্জনও দিতে পারি না। মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া যাঁরা পূজা করেন, তাঁরা তার ভিতর তোমার আবির্ভাব জন্য কত মন্ত্রোচ্চারণ করেন, মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পূজা করেন, উৎসব করেন, আবার সেই প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দেন। মা, মনঃকল্পিত দেবতা যার, তার পক্ষে এরূপ আহ্বান ও বিসর্জ্জন সম্ভব; কেননা, সে ত আসল মা নয়, সত্য মা নয়। তেমনি কত ব্রহ্মজ্ঞানীও "দয়াল এসহে, দয়াল এসহে" বলে যে তোমার আরাধনা করেন, কত উৎসাহ ও আড়ম্বরে তোমার পূজা করেন; আবার তাঁদের সে উৎসাহ উদ্যম কয়দিনে ফুরাইয়া যায়, শুষ্ক মুখস্থ উপাসনা আরাধনা জীবন-বিহীন হয়, ক্রমে কল্পিত ঈশ্বরকে বিসর্জ্জন দিয়া সংসারে বা ধর্ম্মবিহীন বাহ্যাড়ম্বরে জীবন কাটাইয়া থাকেন। তাই, মা, আমরা কাতরে তোমাকে ডাকিতেছি। যদি তুমি নববিধান লইয়া বর্ত্তমান যুগে, স্বয়ং যথার্থ সবার সর্ব্বদুঃখদুর্গতিহারিণী পাপাসুর-নাশিনী জীবন্ত আনন্দময়ী মা হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছ এবং আমাদিগকে তোমার এই বিধানের আশ্রয়-লাভের সৌভাগ্য দিয়া তোমার পূজা করিতে অধিকার দান করিয়াছ, তবে এমনই বঙ্গবাসী, ভারতবাসী, জগদ্বাসী তোমার সকল সন্তান সন্ততিকে সে অধিকার দাও। কেন, মা, তোমার সন্তান সন্ততি হয়ে, আমাদের ভাই ভগ্নীগণ এখনও কল্পনার মূর্ত্তিকার দেব দেবী রচনা করিবে এবং পূজা করিবে? বা কেন ব্রহ্মজ্ঞানী ভাই ভগ্নী-গণও বাহিরের মূর্ত্তি না গড়িলেও, মৃত মনগড়া দেবতার পূজা করিয়া শুষ্ক জীবন-বিহীন ধর্ম্ম লইয়া থাকিবে? তুমি যে নববিধানে জীবন্ত মা হইয়া জানিতে দিয়াছ, তুমিই স্বয়ং মহাশক্তি, তুমি যাদের মা হও, যাদের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও, তাহাদিগকে যে তোমার ভক্ত-সিংহবলে বলীয়ান্ কর, তুমি তাঁহাদের মনের সকল অসুর বা আসুরিক ভাব বিনাশ কর, তুমি তাহাদিগকে দিব্য জ্ঞান দান কর, তাহাদের রসনা দিয়া নব নব বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করাও, তুমি তাহাদিগকে লক্ষ্মীশ্রী

সম্পন্ন নব কার্ত্তিক ও বিশ্ববিজয়ী কর এবং নিত্য নব নব উৎসবানন্দে তাদের হৃদয় পূর্ণ কর ; কারণ তাদের হাতে তুমি ধর্ম্ম রাখ না, তুমি তাদের জীবনের সকল ভার লও, তুমিই তাদের দ্বারা তোমার পূজা করাও। তাই, মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কৃপায় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে দলে, দেশে এবং সমগ্র বিশ্বে যেন ইহা সপ্রমাণ হয়। তোমার জীবন্ত আবির্ভাবে আমাদের নিত্য উৎসব হউক এবং সকল কল্পনার দেব দেবীর ও তার সঙ্গে সঙ্গে সকল "আমি ও আমার" বিসর্জ্জন হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—•—

স্বরাজ বা স্বর্গরাজ্য-স্থাপনে নববিধান।

ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদিগকে এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের আশ্রয় দিয়া কতই সৌভাগ্যবান্ সৌভাগ্যবতী করিয়াছেন। কারণ যে স্বরাজ-লাভের জন্য ভারতে এত আন্দোলন হইতেছে, তাহার পূর্ণতা-সাধনের পথ বিধাতা প্রত্যক্ষভাবে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে দেখাইয়া দিয়াছেন।

স্বরাজের অর্থ যদি পূর্ণ স্বাধীনতা হয়, একমাত্র অদ্বিতীয় রাজরাজেশ্বর পরমেশ্বরের অধীনতা বিনা সে পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সেই জন্যই তো আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন এক অদ্বৈত পরব্রহ্মের পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন, তাই ত আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই একেশ্বরের ধ্যান আরাধনা শিক্ষা দিলেন এবং আমাদের ধর্ম্মাগ্রজ ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সবান্ধবে এক উপাসনা-সাধনে কেমনে পূর্ণ স্বাধীন এক ধর্ম্ম-পরিবার বা দল হইতে হয়, তাহা দেখাইলেন।

পাপের অধীনতা, কুসংস্কারের অধীনতা, পৌত্তলিকতার অধীনতা, দেশাচারের অধীনতা, মাদকের অধীনতা, সাংসারিকতার অধীনতা, অজ্ঞানতার অধীনতা, অস্পৃশ্যতার অধীনতা, জাত্যভিমানের ও জাতিভেদের অধীনতা, সাম্প্রদায়িকতার অধীনতা, পৌরোহিত্য ও গুরুতার অধীনতা, বিদেশীয় ও বিজাতীয় বিভিন্ন প্রকার ভাবের অধীনতা, এইরূপ কত প্রকার অধীনতায় পড়িয়াই মানবজাতি জর্জ্জরিত হইতেছে। এই সকলপ্রকার অধীনতা হইতে, এমন কি মানুষের যে কোন অবৈধ অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে মা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন।

তাই একমাত্র পরম ব্রহ্মকে এই হৃদয়ের ঈশ্বর, প্রাণের ঈশ্বর, জগতের ঈশ্বর, গৃহ পরিবারের, সমাজের এবং সর্ব্ব দেশের ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা না করিলে, কি এই সকল পরাধীনতা হইতে মুক্ত হওয়া যায়? এক রাজার বা এক প্রভুর অধীনতা হইতে মুক্ত হইলেই যে স্বরাজ হইবে তাহা নহে, আর একজন প্রভু বা আর একজন রাজার পদানত হইতে হইবে। একমাত্র অদ্বিতীয় রাজা ভিন্ন আর যদি কাহারও অধীন হও, তবে যথার্থ স্বরাজ-লাভে ধন্য হইতে পারিবে না।

তার একমাত্র উপায় আমাদের এই ব্রহ্মোপাসনা। আমরা এই ব্রহ্মোপাসনা পাইয়া যথার্থই পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। এই উপাসনা করিতে মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন নাই। আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার আদেশ, আলোক ও মহাপ্রসাদরূপ ব্রহ্মানন্দময় জীবন লাভ করি।

এই উপাসনা আমাদের মৌখিক মন্ত্রোচ্চারণ নয়, বিচার-বুদ্ধি-গত চিন্তা-প্রসূত বক্তৃতাও নয়; কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেরণা-সম্ভূত আত্মদর্শন ও জীবন-সাধন। তাঁহারই পবিত্রাত্মা স্বয়ং যখন আমাদের প্রাণ মনকে অধিকার ও পরিচালন করিয়া তাঁর উপাসনা করান, তখনই যথার্থ উপাসনা করা হয়। জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়া এবং তাঁহার বাণী না শুনিয়া, বা তাঁর প্রেরণা অনুভব না করিয়া যদি আমরা উপাসনা করি, কিম্বা ভাষার মাধুর্য্য ও ভাবের চাতুরী দ্বারা অপরের মনোহরণে প্রয়াস পাই, তাহা হইলেই আমরা পৌত্তলিক হইলাম। আমরা বাহিরে কোনও দেব দেবীর পূজা করিতে না পারি, কিন্তু কল্পনার তুলিতে যদি অনুপলব্ধ ঈশ্বরের মুখ আঁকিতে যাই, তাহা হইলে কি আমাদের পুতুল গড়া হইল না?

তাই এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই উপাসনা আমাদের একমাত্র শাস্ত্র, এক মাত্র তপস্যা ও পূর্ণ স্বর্গরাজ্য-লাভের একমাত্র উপায়। স্বরাজ্য স্বর্গরাজ্যের নামান্তর বই তো নয়। ইহা দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা

লাভ হইবে। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ আমার প্রাণের, মনের, দেহের, পরিবারের, দেশের, জাতির অধিপতি নন; ইহা পূর্ণভাবে দর্শন ও উপলব্ধি যাহাতে হয়, তাহাই স্বরাজ। এবং যে ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা তাহা সংসাধিত হয়, তাহা যেন অক্ষুণ্ণ ও বিমল রাখিতে আমরা সর্ব্বথা প্রয়াসী হই।

আবার সার্ব্বজনীন একতা বিনাও যথার্থ স্বরাজ হইতে পারে না। স্বর্গরাজ্য একতার রাজ্য। সেখানে এক ঈশ্বর সকলের ঈশ্বর, সকলেই এক বিধির অধীন। সেখানে সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ঈশা, মুষা, মহম্মদ, শাক্য, নানক, গৌরাঙ্গ বা আর্য্যঋষিগণ সকলেই একই ঈশ্বরের উপাসক। তাই তাঁদের অনুগামী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পার্সী, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলেই একই ধর্ম্মাবলম্বী; কেননা বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণের মর্ম্ম একই ভাবে সকলে অনুসরণ করেন এবং একেরই উপাসনা সকলে করেন। তাহারই অনুরূপ এক অখণ্ড রাজ্যস্থাপনই যথার্থ স্বরাজ। নববিধান তাহাই প্রতিষ্ঠা করিতে স্বয়ং বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত।

আমাদের উপাসনা-সাধনের মধ্যেও তাই সকল ধর্ম্মবিধানের সর্ব্বপ্রকার প্রণালী একাধারে নিহিত। আমাদের উদ্বোধনে সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান ও আত্মপরীক্ষা সাধন, স্বরূপমন্ত্রে হিন্দু ঋষিদিগের বৈদান্তিক দর্শন, আরাধনায় ইহুদী ও মুসলমান ধর্ম্মের মহিমা-জ্ঞান, ধ্যানে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ, সাধারণ প্রার্থনায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা ইহাও এসলাম সাধন, প্রার্থনায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রার্থনা সাধন, শাস্ত্র-পাঠে শিখধর্ম্মের সাধন, নামপাঠে, নাম-গানে ও কীর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধন ইত্যাদি সকলই একত্রে মিলিত। সুতরাং ইহাতে সকল ধর্ম্ম-সাধকের সকল ভাব-সাধনই একাধারে সংগ্রথিত। অতএব সকল ধর্ম্মাবলম্বীর একত্ব-সাধনের জন্যই এই উপাসনা স্বয়ং বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, ইহা কোন প্রকার মানবীয় বুদ্ধি-বিচার-প্রসূত নয়।

একই ঈশ্বরের উপাসক এবং একই ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে, কোন দেশ, কোন জাতি কখনই পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে, জাতিতে জাতিতে, মতে মতে বিবাদ ও সংঘর্ষণ যেখানে, স্বর্গরাজ্যের একাত্মতা, সদ্ভাব, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব কি সেখানে কখনও সম্ভব?

বহু ধর্ম্ম, বহু জাতি, বহু মত, বহু দেবতা বলিয়াই ভারতের এত দুর্গতি, ভারতের এত বিচ্ছিন্নতা ও পরাধীনতা। ইহা দেখিয়াই বিধাতা, ভারতমাতা, জগন্মাতা ভারতের প্রকৃত উদ্ধারের জন্য এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের পূর্ণ স্বাধীনতা ও মহা সমন্বয় বিধানের জন্য, তাঁহার নববিধান লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর এক উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা সর্ব্বজনে এই উপাসনা অবলম্বনে এবং এই নববিধানের অনুসরণে পূর্ণ স্বরাজ-লাভে ধন্য হইতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পূজার প্রসাদ।

পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আছে, ভরত রাজা হরিণের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি বশতঃ পরে হরিণ-জন্ম পাইয়াছিলেন। ইহার সত্যতায় আমরা যদিও বিশ্বাস করি না, কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি, যাহার উপাস্য যেমন, তাহার প্রকৃতিও তেমনি হয়। যে মৃত দেব দেবীর পূজা করে, তার প্রকৃতিও জড়াসক্ত মৃতপ্রায় হয়। কিন্তু যদি আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা করি, আমাদিগের জীবনও নব নব জীবনে সমুন্নত হইবেই হইবে। যদি জীবন্ত আদ্যাশক্তির পূজা করি, নিশ্চয়ই আমরা ভক্তসিংহ-বল প্রাপ্ত হইব এবং সকল আসুরিক ভাবের দমনে শক্তি লাভ করিব। যদি জীবন্ত সরস্বতীর আরাধনা করি, নিশ্চয়ই আমাদের অজ্ঞানান্ধতা চলিয়া যাইবে, হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত ও দিব্যজ্ঞান তাহাতে বিকশিত হইবে। যদি আমরা লক্ষ্মীশ্রীর উপাসনা করি, আমাদিগের জীবন পবিত্র, সুন্দর এবং সৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে। চরিত্রের লক্ষণ দ্বারাই প্রমাণ হয়, আমাদের উপাস্য দেবতা কেমন।

ভক্তি-ভাব।

আকাশের বারিবর্ষণ যেমন সকল সময় হয় না, বর্ষাকালে হয় এবং তাহাও কখন হয়, কখন হয় না; তেমনি মানবপ্রাণে ধর্ম্ম-ভাব বা ভক্তিভাব যখন ভগবৎ-কৃপায় আসে, তখনই আসে, মানবীয় চেষ্টা-সাধনে বা পুরুষকারে আসে না। কৃষক যেমন ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া শস্য-বপনের জন্য বর্ষার প্রতীক্ষা করে, তেমনি উপাসনা প্রার্থনা সাধন-যোগে ভক্তি-ভাব-লাভের জন্য ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

মধ্যবর্ত্তিতা।

যখন সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী ব্যবধান হয়, তখন চন্দ্র-গ্রহণ হয়, পূর্ণচন্দ্রও রাহুগ্রস্ত বা অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়; এমনই ঈশ্বর এবং ভক্তের মধ্যে যদি সংসার মধ্যস্থ হয়, তখন ভক্তের অবস্থা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বরের আলো আর তাঁর প্রাণকে আলোকিত করিতে পারে না, সংসারই তাঁহাকে গ্রাস করে। আবার সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যে যখন চন্দ্র ব্যবধান হয়, তখন সূর্য্যেরও গ্রহণ হয়; এমনই ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে যখন ভক্ত মধ্যবর্ত্তী হন, তখন ঈশ্বরও অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়, ঈশ্বরের উজ্জ্বল আলোকও মলিন হয়, প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বর-দর্শন লাভ হয় না।

প্রার্থনার মাহাত্ম্য।

কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"প্রার্থনা আমার জীবনের রক্ষক। ইহা না থাকিলে আমি বহু পূর্ব্বে পাগল হইয়া যাইতাম। আমার আত্ম-জীবনী পড়িলে জানিবে, আমার জীবনেও অনেক প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞান আছে, তাহাতে সাময়িক নিরাশাও ভোগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রার্থনার বলেই আমি তাহা অতিক্রম করিতে পারিয়াছি। সত্য যেমন প্রার্থনা, তেমনি আমার জীবনের অঙ্গ-স্বরূপ। অভাবে পড়িয়াই আমি ইহা লাভ করিয়াছি, ইহা ব্যতীত আমি শান্তি পাই না, এমন অবস্থাতেই আমি ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। যত আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়িতেছে, ততই আমার প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা ব্যতীত জীবন অসার ও শূন্য বোধ হয়। এক সময় আমি ঈশ্বর ও প্রার্থনায় অবিশ্বাসী ছিলাম, কিন্তু এখন শরীরের অন্নপানও তেমন প্রয়োজনীয় মনে হয় না, যেমন প্রার্থনা। পৃথিবীর তিন জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা বুদ্ধ, ঈশা ও মহোম্মদ অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রার্থনার বলেই সকল আলোক লাভ করিয়াছিলেন। আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে নিরাশায় আক্রান্ত হই, প্রার্থনার বলেই তাহাতে শান্তি লাভ করি। আমি জ্ঞানী পণ্ডিত নই, কিন্তু আমি বিনীতভাবে স্বীকার করিব, আমি প্রার্থনাশীল।" শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের উক্তিরও সায় এই কথায় পাওয়া যায়। তিনিও বলিয়াছেন:—"আমার জীবন-বেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। ধর্ম্ম-জীবনের উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতর উত্থিত হইল। প্রার্থনা করিলাম। প্রথমেই বেদ বেদান্ত কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম। এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। 'সবে ধন নীলমণি' যেমন কথার বলে, প্রার্থনা আমার তেমনই ছিল। আমাকে ঈশ্বর বলিলেন, 'তোর বইও নাই, কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনাই কর।' ক্রমে সব হইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা তাহা। এই জন্য প্রার্থনা বিমল রাখিবে, শেষে ইহলোক পরলোক সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে। এক দুই তিন চারি ঠিক দিয়া তেরিজ কষিয়া যেমন অভ্রান্তরূপে কি হইল বলা যায়, প্রার্থনার সত্যও তেমনই করিয়া বোঝান যায়। বিপদের সময় প্রার্থনা খুব হয়। পারত্রিক মঙ্গলেরই কামনা করিবে, অথচ হইবে সকলই। বন্ধুদিগকে এই জন্য কেবল প্রার্থনা করিতে বলি। বন্ধুরা করেন না, তাই কষ্ট পান। সকলেই স্ত্রী পুত্র অপেক্ষা প্রিয় জানিয়া, ধর্ম্মগ্রন্থ জানিয়া, ধর্ম্ম ও সংসারের সম্বন্ধে সার বস্তু জানিয়া, এই প্রার্থনাকে যেন আদর করেন।"

শ্রীকেশবচন্দ্রের ক্রন্দন।

নববিধান-প্রবর্ত্তক শ্রীকেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে কাহারও কাহারও একটি প্রধান অভিযোগ এই, তিনি পরব্রহ্মের স্থানে পৌত্তলিক দেবদেবীর নাম প্রবর্ত্তন করিয়া পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন; কেহ কেহ ইহাও বলেন, তিনি শেষে পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা জানেন না, তিনি কত পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং জাতির পৌত্তলিকতা-রোগ নিবারণের জন্য কতই আকুল-প্রাণে ক্রন্দন করিয়াছেন। স্বজাতির কল্যাণের জন্য এমন করিয়া যথার্থ ক্রন্দন করিতে কে পারে? তিনি পৌত্তলিকতাকে ঈশ্বরের শত্রুতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন:—"হরির দুষমন যারা, তাদের যদি আদর করি, তাহলে উপাসনার ঘরে আসিয়া দেখিব, দরজা বন্ধ। শত্রুকে যদি প্রশ্রয় দি, হরিকে আর পাওয়া যায় না। শত্রুকে প্রশ্রয় দিলে ভক্তি শুকায়, চরিত্র লোপ হয়। একবাটি ঘন দুগ্ধে যেমন একটু টক দিলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি ভক্তি ছিঁড়ে যায়।"

এই বলিয়া তিনি দুর্গোৎসব উপলক্ষে কাঁদিয়া বলিলেন, "দেখ মা, আজ লোকে তোমাকে ঘরে আনিবে, না কাহাকে লইয়া আসিল? মৃত মৃত্তিকা, তাকে আনিয়া 'মা মা' বলে ডাকছে। আহা, দুঃখ হয়! মাটী, কাঠ, খড় এসব মা হয়ে বঙ্গবাসীর প্রাণ মন আকর্ষণ করিতেছে। পুতুল, তুই কেমন মার জায়গা নিলি? রংকরা পুতুল, তুই সামান্য মাটী হয়ে ব্রহ্মাণ্ড-পতির আসন নিলি? যারা দেশের পিতামাতা, শাস্ত্রকার, চিকিৎসক, তারা কি এই উপায় করে গেল যে, বৎসরান্তে যত পাপ হবে, একটা মাটীর পুতুল হইয়া তাহা দূর করিবে? মাটীর দুর্গা! দেশটা ঘুমাইতেছে নাকি? ঘোর বিকার, বাঙ্গালীগুলো চীৎকার কচ্ছে। খড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এই আমার পরিত্রাণ। বঙ্গদেশ, সোণার দেশ, যায় আর কি। মা, সোণার দেশকে বাঁচাও। আমাদের উপায় তুমি।

পৌত্তলিকতা-রোগ বড় ভয়ানক। তুমি শান্তিজল ঢাল। সচ্চিদানন্দময়ি মা, এস।"

আবার অন্যত্র তিনি ঈশ্বরের নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, আমাদের স্বজাতির এই দুর্দ্দশা! কোথায় মা দুর্গা? একটা কল্পিত দুর্গা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে যাহা ইচ্ছা পাপ অত্যাচার করিতেছে। এক পৌত্তলিকতার ভ্রমে দেশ গেল। আচ্ছা, তাই যেন মানিলাম যে, লোকে বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে মাটীর ভিতর পূজা করিতেছে; কিন্তু ও দিকে পূজার বাজনা, এদিকে বোতলের শব্দ! দয়াময়, কিসের জন্য কাঁদিব? ভ্রমবশতঃ মাটী পূজা করিতেছে সেজন্য, না, জেনে শুনে তোমার নামে পাপ করিতেছে সেজন্য? কোথায় গেল যোগীদের যোগ-সাধন, হোম, আর্য্যদের স্তব পূজা? সে সব গিয়ে আজ মাটী পূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপের অত্যাচার! একি ধর্ম্ম? অর্দ্ধেক নাস্তিকতা, অর্দ্ধেক মাটী পূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপ মিশে গেল। আর কি বাকি রহিল! কপটতা, নাস্তিকতা, ধূর্ত্ততা, অবিশ্বাস সব এক হইল!"

তাই তিনি আরো কাঁদিলেন, "আজ এই জাতির গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়া এদেশ হাসিতেছে, আজ আবার চিরদুঃখিনীর মত হয়ে মাতৃভূমি কাঁদছে। বুক চিরে দেখাচ্ছে কত দুঃখ। ধর্ম্মের নামে কত পাপ হচ্ছে। সামান্য মৃত্তিকার কাছে হিন্দুর মাথা আজ অবনত। দেশশুদ্ধ লোক মেতেছে, কিসের জন্য? পুতুলকে দেবতা মনে করে। এ পূজা দেখাচ্ছে, আমরা কত নীচ হতে পারি। এর চেয়ে নীচ আর কি হবে? খড়ের পর্য্যন্ত পূজা হলো! যাঁরা এক সময় হিমালয়ে তোমার ধ্যান ধারণা করিতেন, আজ বঙ্গদেশে নিম্ন ভূমিতে এসে তাঁরা খড়ের মাটীর পূজা কচ্ছেন! পণ্ডিতেরা এই মাটীর সম্মুখে শ্লোক উচ্চারণ কচ্ছেন।"

এই জন্য তিনি স্বজাতির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলেন, "পতিত জাতি, তবু তার পূর্ব্ব গৌরব রয়েছে। এজন্য হাত জোড় করে এই প্রার্থনা করিতেছি, এর ভিতর যা কিছু ভাল, তা যেন করিতে পারি। খড় মাটী ছেড়ে দিব, মাটী পূজা যেন আর না হয়। কিন্তু নির্দ্দোষ দুর্গাপূজা, সত্য পূজা যেন না ছাড়ি। আজ এ সময় যত নির্দ্দোষ আমোদ তোমার ভক্তদের মন আমোদিত করিতেছে, সেগুলো যেন রেখে দি। হে করুণাময়ি, মাটী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির করিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া ঘরে লইয়া আসিলাম। আমাদের কাছে সব নিরাকার। আমাদের কাছে চালচিত্র নাই, কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী কিছুই মাটীতে বদ্ধ নাই। মা, দয়া কর, মাটীপূজা দূর কর, ভাল জিনিষগুলি রক্ষা কর। এই যে এসময় পুত্র পিতার প্রতি ভক্তি দেখায়, এটি যেন থাকে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রণয় দর্শন করায়, তা যেন থাকে। এই যে বৎসরান্তে পিতা পুত্র স্বামী স্ত্রীর যে পবিত্র মিলন, তা যেন রক্ষা পায়। বঙ্গদেশের গৃহস্থ বড় সুখী, এই যে আদর্শ পরিবার যেন থাকে। মা, ধর্ম্মরক্ষিণী স্ত্রী, এখনকার নব্য স্ত্রীরা যেন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। ধর্ম্মরক্ষার ভার তাঁদের হাতে। এদেশ চিরকাল ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। যা এর ভিতর খারাপ আছে, দূর কর; কিন্তু এর ভিতর যে মুক্তাগুলি পড়ে আছে, আমরা নববিধানবাদী তাহা কুড়াইয়া লই। ধন্য ধন্য বঙ্গদেশ! মাটীর দুর্গার ভিতর হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির হইতেছেন। কালরাত্রি পোহাইল। দয়াময়ি, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমরা এই পূজার অসার অংশ ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের মধুরতা পবিত্রতা যাহা আছে গ্রহণ করিয়া, আমরা ভাল হই, অন্যকেও ভাল করি, দুর্গে, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের বিধান নববিধান। তাই ইনি কোন ধর্ম্মকে একেবারে অন্যান্য সাম্প্রদায়িকদিগের ন্যায় বর্জ্জন করিতে পারেন না। এজন্য সর্ব্বধর্ম্মের অসার ভাগ, মানবীয় মনঃকল্পিত ভাগ যাহা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার সার অংশ, সত্য অংশ, যাহা প্রকৃত বিধাতার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাংশ, তাহা ব্রহ্ম-প্রেরণায় দিব্য জ্ঞানে দর্শন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। নববিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ তাই পৌত্তলিক ধর্ম্মের মধ্যেও যাহা অধ্যাত্ম সত্য, তাহা উদ্ধার করিয়া, তাহার খোসা যাহা তাহা পরিত্যাগ করিলেন ও তাহাই করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন। তাঁহার সহিত একাত্ম ও এক দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া যেন বলি, "যেখানে দেখিবা ছাই, উড়াইয়া দেখি তাই, পেলেও পেতে পারি লুকান রতন।" বিজ্ঞান যেমন কয়লা হইতেও চিনি বাহির করে, নববিধান-বিজ্ঞান-বলে আমরাও তেমনি সর্ব্বধর্ম্মের ভিতর হইতেই সত্যরত্ন গ্রহণ করিয়া ধন্য হই এবং জগৎকে ধন্য করি।

যথার্থ মিলন।

(সিমলায় নারী-সম্মিলনীতে পঠিত)

সেদিন মন্দিরে গান হচ্ছিল:—

"মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।—"

কথাটা মনে ঘা দিল। মন্দিরের বাহিরে এসেও ঘুরে ফিরে সে সুর বার বার কাণের কাছে ধ্বনিত হতে লাগল—আমরা মিলেছি। অনাদি অনন্ত কাল হ'তে যে মা আমাদের ডেকে আসছেন; সেই বিশ্বজননীর আহ্বান আজ দূরত্বের দুস্তর ব্যবধানের সমস্ত বাধা দূরে ফেলে দিয়ে, অচেনা পরমাত্মীয়কে কাছে টেনে এনে হাতে হাতে প্রেমের রাখী বেঁধে দিয়েছে!

কিন্তু কবির কাব্য-জগতে, ছায়া ঢাকা মনের আলোয় যে ফুল ফোটে—বস্তুতন্ত্র মানুষের জীবনে খর উজ্জ্বল দিনের আলোতে

সে ফুল অনেক সময়ই ফুটিতে পারে না—কুঁড়িতেই শুকিয়ে যায়! গানের সঙ্গে মাথা নেড়ে মন জোর করে সায় দিচ্ছে—মিলেছি, আমরা মিলেছি; সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হ'তে প্রতিবাদ উঠছে—না, আমরা মিলি নাই, আমরা মিলি নাই! অতীতের সমস্ত চেষ্টা ভাসিয়ে নিয়ে বর্ত্তমান বয়ে যায়—ভবিষ্যৎ অনাগত—মিলনের সেতু কল্পলোকেই রয়ে গেল; শুভক্ষণ এসেও আসেনা। কেন আসে না? মানুষের সঙ্গে মানুষের, আত্মার সঙ্গে আত্মার যে মহা মিলন, সে মিলনের পথে কি বাধা—যা এমন দুর্গম ব্যবধান সৃষ্টি করার স্পর্দ্ধা রাখে, ঘরের মাঝখানে প্রাচীর তুলে দিয়ে কাছের জিনিষকে আড়াল করে দেয়?

এর উত্তর প্রথমেই যা মনে আসে, সে হচ্ছে ধর্ম্মের বাধা। সত্যিই কি তাই? দেশবাসীর বিভিন্ন ধর্ম্মের পার্থক্যটাই কি আমাদের পৃথক করে রাখার একমাত্র কারণ? যদি তাই হবে, তবে হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর, মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের—নিজের সহধর্ম্মী নিকট প্রতিবেশীর সঙ্গে এমন অপরিচয়ের শুষ্ক নীরস সম্পর্কটাই এতবেশী করে চোখে পড়ে কেন? প্রতি ধর্ম্মগত সম্প্রদায়, আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে ভাই বলে কাছে টেনে এনে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আপনার জন করে রাখেনা কেন? কথায় কথায় আমরা যখন মিলনের পথে ধর্ম্মকে অন্তরায় বলে কারণ দেখিয়ে দিয়ে, নিজেদের নিরুপায় অক্ষমতার বুলি আওড়িয়ে—সমস্ত দায়িত্ব ধর্ম্মের ঘাড়ে চাপিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে দায়খালাস হই, তখন একবারও ভেবে দেখি না—এ আমাদের সম্পূর্ণ মনগড়া কৈফিয়ৎ—আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে এ কথার সৃষ্টি! এমন কেউ এখানে নাই, যিনি বলতে পারেন, তাঁর ধর্ম্ম তাকে মানুষের সঙ্গে মানুষের, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলনকে পাপ বলে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয়—তার থেকে দূরে সরে থাকতে উপদেশ দেয়। এমন কথা কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রে লেখে নাই, যাতে মানুষকে মানুষের ভাই না করে শত্রু করে গড়ে।

সমাজ-ধর্ম্মের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই,—মানুষের জন্য সমাজ-ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথম যুগে আগে ভগবান্ মানুষ গড়েছিলেন, ধর্ম্ম গড়েন নাই। মানুষের অন্তরের বিরাট বিচিত্র উপলব্ধির মধ্যে ভগবান্ ধর্ম্মের প্রেরণা জাগিয়েছেন—তাকে ধার্ম্মিক করবেন বলে সম্প্রদায়ের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করে তিনি পৃথিবীতে পাঠান নাই। তাকে পাঠান ছোট্ট একটি মানুষ করে আমাদের কোলে—তার ধর্ম্ম থাকে না, জাত থাকে না, আচার, অনুষ্ঠান, ভেদবুদ্ধির কোনই বালাই থাকে না। সে শুধু আমাদের কোলে আসে তার একটি মাত্র পরিচয় নিয়ে—সে পরিচয়—এক বিশ্বজননীর অসংখ্য মানবসন্তানের মধ্যে সেও একটী মানব-সন্তান!

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, প্রথম যুগে—সেই আদিম অসভ্য যুগে, মানুষ ও পশুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাদের জীবনেতিহাসের প্রথম পাতায় লেখা থাকত জন্ম, আর শেষের পাতায় মৃত্যু, মাঝের বাকী পাতা কয়টা বেঁচে থাকার প্রাণপণ চেষ্টার হিজি-বিজি দাগ কাটা। এই হিজি বিজি রেখাই ক্রমে স্ফুট হতে স্ফুটতর হয়ে উঠতে লাগল—যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নানা পরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যেতে লাগল—ধীরে ধীরে সে তার চারদিকের বাধা বিঘ্ন সরিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের পথে চলতে শিখল। তারপর তার চলা এমন জায়গায় এসে দাঁড়াল, যখন তার খাতার পাতা থেকে আবছা-দাগ মিলিয়ে গিয়ে, সেখানে গভীর রেখায় ফুটে উঠল মানুষের ইতিহাস—যে মানুষ ধর্ম্ম সৃষ্টি করে, সমাজ সৃষ্টি করে, রাজ্য স্থাপন করে, রাষ্ট্র গঠন করে! আরণ্য পশুর মত বনে জঙ্গলের বাস তার ধীরে ধীরে আকাশস্পর্শী বিশাল প্রাসাদের ভিত্তি গড়তে লাগল। তার ধর্ম্মও ক্রমে পশুর হিংসা-ধর্ম্ম থেকে পৃথক হয়ে, ক্রমে সীমাহীন প্রেমের পথে মানুষের নতুন ধর্ম্ম সৃষ্টি করে চলল। ধর্ম্ম মানুষকে উদার করে', মহৎ করে', তাকে সুন্দরের পথে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে লাগল।

কোনও একটী পদ্ধতি অবলম্বন করে', পবিত্র, উন্নত মনোবৃত্তিকে বিকশিত করে' তোলাকেই ধর্ম্ম বলে। মানুষের জীবনে যখন ধর্ম্ম পূর্ণ বিকশিত হয়—তখন তার পরিণতি দাঁড়ায় বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, নানক, কবীর, নিমাইয়ে—তার পরিণতি দাঁড়ায় রামমোহন, কেশবচন্দ্র, পরমহংস, বিবেকানন্দে। নিখিল বিশ্বের মিলনোৎসবে রাখী বাঁধতে যুগে যুগে এঁরাই মানুষের মাঝে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের বাণী এঁদের কণ্ঠে মিলনের গভীর আহ্বানে ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

ধর্ম্ম মানুষকে অনুদার করে' তার চার পাশে গণ্ডি টেনে তাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখেনা; তাকে ছোট করে—তারই হাতের ছোট ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মনের ক্ষুদ্র ঈর্ষা—সঙ্কীর্ণ ভেদ-বুদ্ধি! এর জন্য দায়ী আমরা, ধর্ম্ম নয়।

একই মায়ের সন্তানেরা যেমন বড় হয়ে, বড় পরিবারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, নিজের জন্য ছোট একটা সংসার পেতে বসে—তেমনি এক বিশ্বজননীর সন্তানেরা জ্ঞানে বুদ্ধিতে যত বড় হতে লাগল, তাদের জগৎজোড়া বিরাট পরিবারের মাঝে তত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় মাথা তুলতে লাগল। এক ভাইয়ের থেকে অপর ভাইয়ের সংসার আলাদা হলেও বিশেষ ক্ষতি থাকে না, যদি তাদের উভয় পরিবারের আনাগোনার দুয়ার খোলা থাকে। আমাদের এই ধর্ম্মগত পার্থক্যও আমাদের মিলনকে এমন ভাবে আটকে রাখতে পারত না—যদি আমাদের মনের দুয়ার বন্ধ করে না রাখতাম। ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে যে ঈর্ষা, অভিমান, স্বার্থবুদ্ধি ভাই থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সেই ঈর্ষ্যা, অভিমান, সঙ্কীর্ণতাই ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে এত অমিলের সৃষ্টি করে। প্রতিপদে যদি আমাদের লোক দেখানো আমিত্বটা বিদ্যা, বুদ্ধি,

ধন মানের, পদমর্য্যাদার অহঙ্কারের ভিতর দিয়ে দাম্ভিকভাবে ফুটে উঠে অপরকে নির্ম্মমভাবে আঘাত না করত, তবে আজ সম্প্রদায়গত, দেশগত ভেদ-বুদ্ধির জন্য এত ভাবতে হত না। প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে ব্যক্তিত্বের চোখ ঝলসান পশরা খুলে তাকে ছোট করে নিজেকে যখন বড় করে প্রমাণ করার চেষ্টা অতিমাত্রায় জটিল ও সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, তখন মনে করি না—পরিচয় হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের। আপনার অন্তরের দরদভরা অনুভূতি না থাকলে সমস্ত পরিচয়ই অপরিচয়ের কোঠায় থেকে যায়! এই অনুভূতির অভাবেই আমাদের ছোট সংসার চিরকাল ছোটই রয়ে যায়—তার দুয়ারের বাহিরে সমস্ত মানবজাতির সম্মিলিত যে বিরাট পরিবার আমাদের আত্মীয়তার দাবী কোরে বার বার ডাক দিয়ে যায়—সে খবর অজানাই থেকে যায়। তাই আমরা মিলনের সহজ স্বাভাবিক সুরটা ব্যক্তিত্বের স্তূপে চাপা দিয়ে—তার মধুর সুন্দর রূপকে বাহিরের লোক দেখান নীরস ভদ্রতা ও শুষ্ক কাঠ হাসির মধ্যেই শেষ করে দেই।

যেদিন আমরা মনে প্রাণে অনুভব করতে পারব—ছোট হোক, বড় হোক, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, মূর্খ হোক, বিদ্বান্ হোক—যে যে স্তরেরই হোক না কেন, এক বিশ্বজননীর সন্তান হিসাবে প্রতি মানুষের সঙ্গে প্রতি মানুষের এক সহজ সুন্দর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক আছে, আর সে সম্পর্কের বিধান-কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্—সেই দিন আমাদের যথার্থ মিলন হবে—বাহিরের সমস্ত খোলস ঝরে পড়ে সেই দিন ভাইকে ভাইয়ের কাছে এনে দিবে। সেই দিন মন্দির, মসজিদ্, গির্জ্জা, গুরুদ্বারা, বৌদ্ধবিহার, পার্সীর অগ্নিমন্দিরের দেবতা বাহিরে এসে নিখিল মানবের মিলন-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাঁচশত বছরেরও আগে নানুরের মাঠে একদিন এক গ্রাম্য কবির কণ্ঠে আড়ম্বর-হীন সরল ভাষায় যে গান ধ্বনিত হয়েছিল, সেদিন সে গান আবার প্রতি মানুষের হৃদয়ে ধ্বনিত হবে :—

"—শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

শ্রীশৈলবালা সেন গুপ্ত।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(২৭শে সেপ্টেম্বর, এলবার্টহলে রাজা রামমোহনের স্মৃতি-সভায় বক্তৃতার সার মর্ম্ম)

সভাপতি মহাশয়! আমার প্রথম কথা, এই মহাযজ্ঞে ঋত্বিক্ কাহারা? এই শ্রাদ্ধবাসরে যুবকদিগের শ্রদ্ধাঞ্জলি কোথায়? বৃদ্ধেরা আর কতদিন পৌরোহিত্যের মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন? এখন যুবকদিগের উদ্যম ও উৎসাহের প্রয়োজন। নূতন শোণিতের আহুতি না দিলে যজ্ঞের অগ্নি চির প্রজ্বলিত থাকিবে না।

যে যুগে রাজার জন্ম, সে যুগ ধর্ম্ম-সংস্কারের যুগ—ধর্ম্মকে মিথ্যা ও আবর্জ্জনা-বর্জ্জিত করিয়া তাহার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করিবার যুগ। ইয়ুরোপে ভল্টেয়ার জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি Miracle হইতে ধর্ম্মকে মুক্ত করিয়া খাঁটি সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অনেক শাস্ত্র পাঠ করিলেন—অনেক গবেষণা করিলেন—অনেক আলোচনা করিলেন, অবশেষে এমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন যে, ধর্ম্মকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। রাজা রামমোহন ভল্টেয়ারের সমসাময়িক। ইনি শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া রত্ন উদ্ধার করিলেন, বাইবেলের আবর্জ্জনা মুক্ত করিয়া "Precepts of Jesus" সংকলন করিলেন, মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে "তুহ্‌ফতুল মহাত্তিন" রচনা করিলেন। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি বহুগ্রন্থের নূতন সংস্করণ করিলেন। মানবের স্বাধীন চিন্তা যে শাস্ত্র হইতে বড়, এই যুগে তিনি প্রতিপন্ন করিলেন। ইহা নূতন ভারতের নূতন যুগ। পৃথিবীতে সত্য মিথ্যা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করিতেছে। সত্যের যেমন রাজ্য আছে, মিথ্যারও সেইরূপ একটা সংস্কার মানব-মনকে অধিকার করিয়া আছে। এই সত্য মিথ্যার সংগ্রাম চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। যেখানে আংশিক সত্য বা অর্দ্ধ সত্য মিথ্যার রাজ্যকে আহত করিয়াছে, সেখানে নিষ্ফল হইয়াছে; যেখানে পূর্ণ সত্য মিথ্যার পাষাণ প্রাচীরকে উদ্যত বজ্রের ন্যায় আঘাত করিয়াছে, সেখানে মিথ্যার রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। প্রাচীন যুগে সত্য মিথ্যার সংগ্রাম হইতে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে ভীষণ প্রলয় হইয়াছিল। এই প্রলয়ের তুফানে মিথ্যার রাজ্য ভাসিয়া গেল, যোগ ভক্তি কর্ম্ম-জ্ঞানের সত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। রামমোহনের ধর্ম্ম-সংস্কার তাঁহার তিরোধানের পর নব যুগে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন সংস্কার যাঁহারা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা গৃহহীন হইলেন, বিত্তহীন হইলেন, পিতামাতার স্নেহের ক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইলেন, ধনীর সন্তান কাঙ্গাল হইলেন। এই বিপ্লবের ভস্মস্তূপ হইতে নূতন সমাজ গঠিত হইল—নূতন স্বর্গরাজ্য উৎপন্ন হইল। ধর্ম্ম-সংস্কার রাজা রামমোহনের মহাকীর্ত্তি। এই মহাকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি স্বর্গ হইতে প্রেরিত।

রামমোহনের পূর্ব্ব যুগে যাঁহারা ধর্ম্ম সাধন করিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে সংসারের কোন সম্বন্ধ থাকিত না। অনাথ বালক বালিকার ক্রন্দন তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিত না—পতিহীনা নিরাশ্রয়া বিধবার নির্য্যাতন ও আর্ত্তনাদ তাঁহাদের পূজার আসন টলাইতে পারিত না—দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও সহস্র

প্রকারের সামাজিক সংক্রামক ব্যাধির হলাহলে তাঁহাদের আত্মার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইত না। রাজর্ষি একদিকে যেমন উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, সতীদাহ-নিবারণ প্রভৃতি জাতীয় মহাপাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলেন, অন্য দিকে ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণয়ন, ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্ম-সংস্কার ও খ্রীষ্টান মিসনারীদিগের সহিত ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সংসারে বাস করিয়া, গৃহ-ধর্ম্ম পালন করিয়া এবং উচ্চ রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তিনি তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত নবযুগে প্রদর্শন করিলেন।

তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য "সংবাদ-কৌমুদী" নামক প্রথম সংবাদপত্র প্রচার করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ী বড়লাট (Acting Governor General) Mr. Adam সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য Ordinance আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। ভাষা মানুষের যন্ত্র, ভাষার মধ্য দিয়া মানুষ ভাব প্রকাশ করে—সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ করে, ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির নির্য্যাতন ও জাতির প্রতি জাতির অত্যাচার সাধারণের নিকট বলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। সেই ভাষার স্বাধীনতা হরণ করিলে জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হইয়া যায়—নৈতিক জীবনের হানি হয় ও জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। এজন্য তিনি জীবন মরণ পণ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তীব্র প্রতিবাদ করেন। জনসাধারণের সেবার ভিতর দিয়া তিনি ধর্ম্মের গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। উপাসনা যেমন ধর্ম্মের একার্দ্ধ, সেবা ধর্ম্মের অপরার্দ্ধ; উভয়ের মিলনেই পূর্ণ ধর্ম্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিব্বতে লামাধর্ম্মের বা নরপূজার প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। সেখানকার নারীগণ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে তাঁহার জীবনে নারীজাতির উপর অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার উদয় হইল। দেশে ফিরিয়া নারীজাতির কল্যাণ-কামনায় নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এজন্য সতী-দাহের প্রথমস্ফুলিঙ্গ তাঁহার কোমল প্রাণকে প্রথম দগ্ধ করিয়াছিল। জাতির প্রবল প্রতিবাদ ও ভীষণ [illegible] একদিকে তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, অন্যদিকে তখনও বৃটিশ রাজার একাধিপত্য পূর্ণ মাত্রায় দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; সুতরাং জাতীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে এতো বড় একটা ব্যাপার আইনে বিধিবদ্ধ করিয়া বন্ধ করিতে রাজকর্ম্মচারিগণ ইত-স্ততঃ করিতেছিলেন। দুই দিক হইতে প্রবল সংঘর্ষ ও ঘাত প্রতিঘাতের দুর্দ্দমনীয় ঝঞ্ঝাবাত অতিক্রম করিয়া, তাঁহার অসামান্য শক্তি এই জাতীয় কলঙ্কের মূল ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ মহা কীর্ত্তি তাঁহারই বীর হৃদয়ের যোগ্য পুরস্কার!

বন্ধুগণ ও মাতৃগণ, রাজর্ষির আদর্শ অনুসরণ করিয়া তোমরাও সত্যের পথে অগ্রসর হও। সত্যের উদ্যত বজ্র দিয়া তোমরা মিথ্যার দুর্গ চূর্ণ কর। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষীণ প্রদীপ প্রদীপ্ত করিয়া, তোমরা নরনারী-নির্ব্বিশেষে পৃথিবীতে ইহার মহিমা প্রচার কর। ইহাই আমার শেষ নিবেদন।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

ভাদ্রোৎসবের নিভৃত সাধন।

"চল ভাই যাই সবে, মহা মহোৎসবে, অমরধামে যোগ-বলে।" ভাল মনে করে দিছিস্। তবে উৎসব ত ওখানে এখানে নয়, অমরধামে যোগবলে যেতে পাল্লে উৎসব মেলে। চল্ চল্ ভাই মন! কি করে যাবে? বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল, অর্থবল, লোকবল, ধর্ম্মবল, কিছুতেই চলবে না; তা নাই থাক। যোগবল নইলে ত সে উৎসবে কেউ যেতে পারে না। তাই বা কোথা পাব?

কেশব বল্লেন, "আমি আমার মার কাছে এলে, আমার আমিটাও গলে যায়।" তবে ত বেশ মজা! কেশবের সঙ্গে কেশবের মার কাছে বসলেই ত আমারও আমি গলে যায়, জড় রাজ্যটা উড়ে যায়। আর হেথা সেথা থাকে না, এখানে সেখানে উৎসব কত্তে যেতে হয় না। এই ত কেশব সহ যোগে বসতেই অমরধাম মিলে গেল।

ও মা! এ ভোজবাজী নাকি? ব্রহ্মমন্দির, বিশ্বমন্দির, সব এখানে উপস্থিত। এক জায়গায় গেলে আর এক জায়গায় যাওয়া হয় না। এ সমাজে গেলে ওসমাজের লোককে দেখতে পাই না। এখানে সব সমাজ, সব দল, সব লোক একত্র। যারা দেহী, যারা অদেহী, ও মা! যাদের সঙ্গে কত দিন দেখা শুনা হয় নি, সবাই এসেছে।

মা যেখানে, ছা সেখানে। ওঁরা সব যোগী হয়েছেন কিনা; মার কোলে গাঁথা, সকলে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা, এরই নাম যোগ। সব জোড়া লেগে গেছে। অমরধামটা বুঝি যোগধাম, সব জোড়া লেগেই আছে; কেউ কারো সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার যোটী নাই। মার সঙ্গে মার প্রেমের আঠায় আঁটা, পরস্পরে যে এক খানা। এই ত তবে উৎসবের দেশ, এই উৎসবের দেশে যোগ দিতে কে আনলে? কেশবাচার্য্য স্বয়ং উপাসনা করুন। আমরা সবাই যোগ দিই।

বা! জিজ্ঞেস কত্তে কত্তেই তুমি বলছ, "আমি আছি"। সবাইকে নিয়ে আছ, যে কেউ যেথা আছে, সবাই এই যে তোমাতে আছে। যারা আসবে না বলেছিল, তারাও যে! আবার আমার এই প্রাণ-মন্দির দখল করে, সবাইকে নিয়ে বল্লে, "আমি আছি, সব মন্দিরে এক আমি আছি।" আমার প্রাণে সবাইকে নিয়ে এখানেই আছ। চিন্ময় আলো জ্বেলেছ, তোমার

আলোতে তোমাকে সসম্মানে দেখাচ্ছ। একটু দেখতে কষ্টও কত্তে হয় না, আর ত লুকোচুরী চলে না, একেবারে দেখে ফেল্লাম। তুমি যে চারিদিক আলো করে, কতই বড় লোক হয়ে, সব লোক নিয়ে রয়েছ। তোমাকে ধর্ত্তে ছুঁতে পারি না। যত ধর্ত্তে যাই, তত বেড়ে যাও। হার মান্‌লাম, আর অমনি এসে তুমি আমাকে জড়িয়ে ধল্লে। এই ওরা বল্লে, আমি উপাসনা কল্লে কেউ আসবে না। তুমি তোমার অমরধাম নিয়ে কি করে এলে, কেন এলে? তুমি ছাড়তে পাল্লে না। খুঁজে খুঁজে আমার ভাঙ্গা কুটিরে বড় বড় সাধুদের নিয়ে উৎসব কর্ত্তে এলে! কোথায় কাকে বসাব! আমার প্রতি তোমার এত মায়া কেন! আমার কেউ নেই বলে? তুমি আমার সর্ব্বস্ব হলে, আর সব্বাইকে আমার করে নিয়ে এলে। আমি যে অস্পৃশ্য। ওমা! বাঁধ ভেঙ্গে এই যে বানের জল ঢুকিয়ে দিলে, কালো জল লাল হয়ে গেল। কোথাকার কে আমি, আমাকে কোথায় আনলে? এই যে সব জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় পুরুষ, ওঁদের তাওয়াতে নিশ্বাসে পাপ উড়ে যায়! তার উপর তোমার পুণ্যজ্যোতিঃ, আর কি আমার আমি থাকে? এখানে জোর করে সুধা খাইয়ে দাও যে, সব্বাই মত্ত, নেশায় ভোঁ হয়ে আছে। যে আসে, তাকেই মাতাল কর? তাই খানিকটা ভোঁ হয়ে নি।

হায়! কল্লে কি আমার দশা। যা ছিল আমার বলতে, সব কেড়ে নিলে? ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিদ্যা-বুদ্ধি, স্ত্রী পুত্র, ভাই-বন্ধু, সব কেড়ে নিয়ে সর্ব্বস্বান্ত করে ছাড়লে। এই করে এত লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে এতদূর আনলে? এরই নাম তোমার উৎসব। আমার দফা রফা করে, আমার সর্ব্বস্ব হরণ করে, একেবারে মাতাল পাগল উন্মাদ করে দেওয়া তোমার উৎসব? এই কি তোমার মতলব? তাই কর। সব্বাইকে কর।

তাই বুঝি, যাঁরা এই অমরধামবাসী হয়েছেন, তাঁদের তুমি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করে, দেহটী পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে, পাগল মাতাল উন্মাদ করে ছেড়েছ। আনলে যদি এখানে, ঐদলেই মিশে যাই। আর যে কটা দিন থাকে, এঁদের সঙ্গেই তোমার পেছু পেছু বেড়াই, আর যেন এ দল ছাড়া নাহই, দোহাই তোমার পায়ে পড়ি। ইহলোক পরলোক সব এক লোক করে এই ভাবের স্রোতে ভাসিয়ে দাও। কেউ যদি না যায়, এ দুটীতে একটী হয়ে এই স্রোতে ভাসতে ভাসতে যাই। ঐ মার বাছা কোলের খোকার সঙ্গে খোকা খুকী হয়ে, খেলা ধূলা সাঙ্গ করে, মা, তোর কোলেই ঘুমিয়ে পড়ি।

দীন সেবক—প্রিয়নাথ।

ঢাকার সংবাদ।

(ভাই মহিমচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রেরিত)

আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের স্মৃতি-সভা।

নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, পূর্ব্ববাঙ্গলার আচার্য্য ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান-সমাজের সভ্যগণ প্রায় প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মদিনে ও স্বর্গারোহণ দিনে আর্ম্মাণিটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বক্তৃতা, প্রসঙ্গ এবং আলোচনা করিয়াছেন। বিগত বৎসর ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের গোলমালে কোন সভাই হইতে পারে নাই। এ বৎসর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়াতে, ২৪শে শ্রাবণ, জন্মদিনে মণ্ডলীর সভ্যদের সভা হইতে পারে নাই। ২রা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন, স্বর্গারোহণ দিনে পূর্ব্বাহ্নে বিধান-পল্লীস্থ দেবালয়ে উপাসনা এবং সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকাতে আর্ম্মাণিটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ স্মৃতি-সভা হয়। সেদিন মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন ছিল, তদুপলক্ষে ঢাকাতে নানাস্থানে সভা সমিতির বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং অপরাহ্ণ হইতে বৃষ্টিপাত হওয়াতে সাধারণ স্মৃতি-সভা হওয়া সম্বন্ধে অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা যখন নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে মন্দিরে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, অসুবিধা সত্ত্বেও বন্ধুগণ (দূরবর্ত্তী লোহার পুলের পরপার হইতেও আসিয়া) মন্দির পূর্ণ করিয়াছেন। তখন কালবিলম্ব না করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। দেওয়ান বাহাদুর সারদাপ্রসন্ন সেন, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ্, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু অমলচন্দ্র বসু বি, এল, সুমিষ্টকণ্ঠে সঙ্গীত করেন। ভাই মহিমচন্দ্র সেন প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন এবং সভাপতির অভিভাষণের পর বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ভাই দুর্গানাথ রায়, পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, বাবু রাজকুমার দাস এম, এ, এবং পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন বক্তৃতা করেন। বাবু রাজকুমার দাস সংক্ষেপে যে দুইটী কথা বলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য; কেন না, তাহাতে আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের আত্মিক ভাবের একটু বিশেষ আভাস ছিল। কথা দুইটী এই, যথা:—বঙ্গচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবন বড় স্বাভাবিক ছিল। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, সীতাকুণ্ডের নিকট সহস্রধারায় সবান্ধবে স্নান করিয়া শিলাতলে বসিলেন এবং পর্ব্বতের অটলতা দেখিয়া চক্ষু খুলিয়া উপাসনাকালে প্রার্থনা করিলেন, "কেমন অটল ভাবে রয়েছ বিরাজমান। 'আমি আছি' বলে তাহা করিতেছ সপ্রমাণ। বক্ষঃ হইতে প্রেম-স্রোত, ঝরিতেছে অবিরত, রাখছে সৃষ্টি সঞ্জীবিত, হইয়ে প্রবহমান। সাধ হয় ঐ বক্ষে পড়ে, স্তন্য-সুধা পান করে, প্রেম-মুখ নয়নে

হেরে, করি তব গুণ গান।' এই স্বাভাবিক ভাব প্রবল থাকাতেই তাঁহার ভাবে সঙ্গীত হইল, "জানি না মা বিনে, জানি না মা বিনে, মা আমার সর্ব্বস্ব ধন। মা বিনে সংসারে, দেখি না কাহারে, মায়ের কোলে অনুক্ষণ। (আছি) ক্ষুধা পিপাসায় মাতা অন্ন জল, বাসস্থান আমার মাতৃবক্ষঃস্থল, নাহি ভয় ভাবনা, অশান্তি যাতনা, সদানন্দে ভাসে মন। মার রক্ত মাংস করি পানাহার, পুণ্য শান্তি নাম জগতে যাহার, মার গুণ গাই, নাচিয়ে বেড়াই, লভি অমর জীবন।" একবার রাঁচিতে বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর বলেন, আমি কি এমন নিষ্ঠুর যে, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যে স্নেহ, সতী নারীর প্রতি সংপতির যে প্রেম, তাহা আমি আত্মসাৎ করিব এবং আমার জন্য সংসারে কাহারও প্রতি স্নেহ ভালবাসা থাকিবে না?" ইতি।

প্রচারব্রত-গ্রহণ।

বিগত ১৯শে অক্টোবর, ১লা কার্ত্তিক, পূর্ব্বাহ্নে বিধান-পল্লীস্থ দেবালয়ে ছাপরা-নিবাসী রায় সাহেব শ্রীমান্ হাজারীলাল পবিত্র প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং নিম্নে প্রদত্ত লিখিত প্রার্থনা করিয়া প্রচারব্রতে দীক্ষিত হন। ভাই বঙ্কিমচন্দ্র সেন পূর্ব্ববাঙ্গলা দাস-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে আসন ও গৈরিক প্রদান করিয়া সাধন-সম্বন্ধে এই ভাবে তিনটী কথা বলেন, যথা :—

প্রিয় হাজারীলাল! দাসমণ্ডলীর পক্ষ হইতে আমি তোমাকে আজ এই আসন ও গৈরিক, জীবনে ধর্ম্মসাধনের জন্য, উপহার প্রদান করিতেছি। এই আসন বিশ্বাসের নিদর্শন। তুমি চিরদিন এই বিশ্বাসের ভূমিতে অটলভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া সাধন ভজন ও মহাপ্রভুর সেবার কার্য্য করিবে। আর এই গৈরিক বস্ত্র বৈরাগ্যের নিদর্শন। তুমি বৈরাগ্য-বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিয়া বিষয়াসক্তি-পরিশূন্য ধীর হইবে। এবং দেখিতে পাইবে, তোমার বৈরাগ্য-বস্ত্র আকাশ হইয়া গিয়াছে; তখন বাহিরও আকাশ এবং অন্তরও আকাশ, এক অখণ্ড আকাশ-স্বরূপ পরব্রহ্মে তুমি পূর্ণ। তুমি শুনিয়াছ, "বিবেক ও বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।" যে বিশ্বাসের আসনে উপবিষ্ট হয়, বিবেক ও বৈরাগ্য তাহারই ধর্ম্ম-সাধনে সহায় হয়। স্বয়ং পবিত্রাত্মা এই বিবেকরূপে তোমার হৃদয়ে গুরু হইয়া নিত্যকাল স্থিতি করিতেছেন এবং বলিতেছেন, "জীব তোর সঙ্গে আমি আছি বর্ত্তমান। নিত্যকাল আছিরে সঙ্গে, দিতে তোরে পরিত্রাণ।" সদ্গুরু অন্তরেই আছেন, তুমি তাঁহার আজ্ঞা শুনিয়া সাধন ভজন করিবে ও কার্য্য করিবে। তিনি তোমার সহায় হউন।

প্রার্থনা।

অদ্য ইং ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসের ১৯শে, ১৯৮৯ সংবৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, সোমবারে, আমার ৬২ বৎসরের জন্মদিনে, আমি অতি বিনীতভাবে গাম্ভীর্য্য-সহকারে প্রচারক-শ্রেণীর ব্রতবিধি গ্রহণ করিতেছি। যাবতীয় বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, মানবজাতির সেবা এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য স্থাপন জন্য আমি আমাকে এবং আমার সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করিতেছি। মনুষ্যের অনুরোধে কদাপি খণ্ডিত না করিয়া, আমি পবিত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় প্রচার করিব; সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, উপাসনা এবং ঈশ্বরেতে সকলের মিলন প্রচার করিব, এবং আমার সমস্ত প্রচার মধ্যে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করিব। আমি স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিব না, কল্যকার জন্য ভাবিব না। মনুষ্যাত্মা সকলকে ঈশ্বরের নিকট আনয়ন ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে ব্রতী হইব না। সাধ্যানুসারে এরূপ কার্য্য এবং পরিশ্রম করিব, যেন আমার জন্য কাহাকেও অর্থ-সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। দারিদ্র্য, বিনয় ও আত্ম-সমর্পণের সহিত আমি বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিব। ঈশ্বর আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—বিগত ১২ই অক্টোবর, রাঁচি নামকুমে, ডাঃ বিধানপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চিত্রার জন্মদিন উপলক্ষে পিতামহ শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার বিশেষ উপাসনা করেন। আরাধনান্তে পিতামহী শ্রীমতী সুমতি দেবী প্রার্থনা করেন। চিত্রার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ অজিতপ্রসাদ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা-পুস্তক হইতে অনুষ্ঠানোপযোগী প্রার্থনা পাঠ করেন। শিশুদের জননী ও শিশুগণ সমস্বরে সঙ্গীত করেন। ভগবান্ তাঁহার কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ২৮শে অক্টোবর, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, স্বর্গীয় কৃষ্ণ-বিহারী সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁর পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জাতকর্ম্ম—বিগত ২৬শে আগষ্ট, কুলটীতে, ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ জামাতা গিডনী-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর নবকুমারের জাতকর্ম্মানুষ্ঠান নবসংহিতা-নুসারে সম্পন্ন হইয়াছে; অনুকূলবাবুই উপাসনা করেন, শিশুর মাতা আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করেন। এই শিশু বিগত ২৭শে জুলাই (১৯৩১), কুলটীতে (জিলা বর্দ্ধমান), রাত্রি ৮৷৹টার সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। এই শুভানুষ্ঠানে শিশুর মাতামহ মুঙ্গের ভক্তিতীর্থের জন্য ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। মা বিধান-জননী নবশিশু ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ২৯শে আশ্বিন, মেটিয়াব্রুজে, উত্তরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ রাউতের জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রভাতকুমার রাউতের সহিত, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুপ্রভার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ৬ই কার্ত্তিক, ১৪৮নং মাণিকতলাষ্ট্রীটে, কেশব একাডেমী স্কুলগৃহে, ঢাকানিবাসী স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু সেনের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ নীহারকুমারের সহিত, চট্টগ্রামনিবাসী স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র দাসের চতুর্থ কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুরুচির শুভবিবাহ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

ভগবান্ এই নবদম্পতিযুগলকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

শারদীয় উৎসব—গত শারদীয় পূর্ণিমায়, পুরীতে নব শ্রীক্ষেত্র-ভূমিতে ও মিঃ গলষ্টনের সমুদ্র-তীরস্থ ভবনে দুই দিন চিন্ময়ী লক্ষ্মীপূজা ও শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হয়। স্থানীয় খৃষ্টান পাদরী, হিন্দু সন্ন্যাসী ও সহানুভূতিকারী এবং বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী অনেকেই যোগদান করেন। শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিক সঙ্গীত করেন।

নবদুর্গোৎসব—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী উপলক্ষে চারিদিন পুরী গলষ্টন প্রাসাদে প্রাতে, নববিধান-মন্দিরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে সন্ধ্যায় নবদুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথের পরিবারবর্গ ব্যতীত বাহিরের কেহ কেহও যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্গীত ও পাঠাদি মহিলাদিগের দ্বারাই হয়।

গত ১লা, ২রা ও ৩রা কার্ত্তিক, প্রাতে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে শারদীয় নবদুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১লা কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, ২রা ডাঃ শ্রীযুক্ত আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩রা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

তীর্থবাস—ভাই প্রিয়নাথ সপরিবারে পুরীধামে গমন করিয়া তীর্থবাস ও সেবা সাধন করিতেছেন।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার—সুবিখ্যাত উদারচেতা ইহুদী বণিক্ মিঃ জে, সি, গলষ্টন সাহেব অনুগ্রহ করিয়া নববিধান-মন্দির ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় আশ্রম নির্ম্মাণের কার্য্যাদি পরিদর্শন ও সেবাসাধন উদ্দেশ্যে যাঁহারা পুরীতে অবস্থান করিবেন, তাঁহাদের থাকিতে তাঁর প্রকাণ্ড গৃহে স্থান দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

জার্ম্মাণী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—আমাদের প্রিয়বন্ধু নোয়াখালী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্তের ২য় পুত্র, আমাদের অতি স্নেহের পাত্র শ্রীমান্ সুধীরকুমার দত্ত যাদবপুর টেক্‌নিকেল স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, জার্ম্মাণী গিয়া, তথায় দেড় বৎসর থেকে, ইলকট্রিকের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া, সুস্থ শরীরে মঙ্গলমতে, গতকল্য ১লা নবেম্বর, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা স্নেহের সুধীরকুমারকে আমাদের প্রাণের স্নেহপূর্ণ সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। শ্রীভগবানের ও সকলের আশীর্ব্বাদে, বাপমায়ের, দেশের ও মণ্ডলীর সুসন্তান হইয়া সকলকে গৌরবান্বিত করুন।

বিলাত-গমন—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আমাদের প্রিয়বন্ধু রেঙ্গুনের ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলা মজুমদার, ১৯২৯ সনে বি. এ পাশ করিয়া, সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়া, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, Maria Grey Training কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং মঙ্গলে কল্যাণে রক্ষা করিয়া, উচ্চ শিক্ষা দিয়া দেশে নিয়ে এসে, দেশের ও মণ্ডলীর গৌরব বর্দ্ধিত করুন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৬ই কার্ত্তিক, অমরাগড়ী-নিবাসী স্বর্গীয় যশোদাকুমার রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, আমাদের প্রিয়বন্ধু রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র রায় অল্প কয়দিন মাত্র জ্বরে ভুগিয়া, ৩৭ বৎসর বয়সে, নিঃসন্তান পত্নী ও ভাইবোনদের পরিত্যাগ করিয়া, হঠাৎ চিন্ময়ী মায়ের কোলে পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। গত ১৫ই কার্ত্তিক, ১২৮নং হ্যারিসনরোডে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার আবাসস্থলে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকপাঠে সাহায্য করেন। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত করেন।

গত ৪ঠা অক্টোবর, ভাগলপুরে, স্বর্গীয় রামলাল দাসের পুত্র স্বর্গীয় নিত্যানন্দ দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র সান্যাল উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ১৫৲, কলিকাতা নববিধান-সমাজে ১০৲, ভাগলপুর কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲, ভাগলপুর অনাথ আশ্রমে ৫৲, গরিবদিগকে ২০৲ দান করা হয় এবং সঙ্গীতের পারদর্শিতানুসারে ভাগলপুরস্থ বালকবালিকাদিগের মধ্যে, একটী বালকদের জন্য, একটী বালিকাদের জন্য, ১০৲ টাকা মূল্যের দুইটী রৌপ্য-পদক প্রতিবৎসর পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হয়।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে নিত্য শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তদিগের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—কলিকাতায় ২৮নং যুগীপাড়া লেনে, বিগত ১৬ই অক্টোবর, প্রাতে, ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্রের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র উপাসনা করেন, এবং শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ ও ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র বিশেষ প্রার্থনা করেন।

বিগত ২৩শে অক্টোবর, সীতারামপুরে কুলটীতে, ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্রের স্বর্গীয়া পিসিমাতা তপস্বিনী ক্ষীরোদমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন, ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্র স্বর্গীয়া পিসিমাতার নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী পাঠ করিয়া নিজেও প্রার্থনা করেন। আচার্য্যের "ব্রহ্মময়ং" প্রার্থনাটীও পঠিত হয়। এই উপলক্ষে ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে সেবা-কার্য্যের জন্য সেবক অখিলচন্দ্রকে ৪৲ টাকা দান করেন। স্বর্গীয়া ক্ষীরোদমোহিনী দেবীর ১৯২৫ সনের ৯ই ডিসেম্বরের প্রার্থনা :—

"মা যোগেশ্বরী! তোমার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, তা তুমি প্রতিদিন সকল সময়ে বুঝিয়ে দিচ্চ ও ভোগ করাচ্চ। তোমারি করবার তরে অবিরাম লেগে রয়েচ। ইহলোক পরলোক সব এক করে ভোগ করাচ্চ। সংসারের অনটন, অভাব, কষ্ট, দুঃখ যাতনা হতে বাঁচবার জন্য এই সব ব্যবস্থা করেচ। এখন আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সঙ্গে যে আমাদের মধুর যোগ, মিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা দিন দিন যেন ঘনীভূত হয়। সব সময় যেন তোমায় নিয়ে থাকতে পারি, কাতরে তোমার চরণ ধরে এই ভিক্ষা চাই।"

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে, বিগত ২৬শে অক্টোবর প্রাতে, ঢাকার স্বর্গীয় শশিভূষণ মল্লিকের ১০ম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, তাঁর মধ্যমা কন্যা লেডি ডাক্তার কুমারী শান্তিপ্রভা মল্লিকের প্রবাস-ভবনে বিশেষ উপাসনা সেবক অখিলচন্দ্র রায় করেন। এই উপলক্ষে কুমারী শান্তিপ্রভা মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে প্রস্তাবিত যাত্রিনিবাস "প্রমথলাল আশ্রম" নির্ম্মাণ ফণ্ডে ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ দিনই সায়ংকালে পূর্ণিমা তিথিতে, বহু দিন পূর্ব্বে শান্তিপ্রভার মধ্যমা দিদি কুমারী সত্যপ্রভা ১৯ বৎসর বয়সে, "এ সংসারে সহজে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, মৃত্যুর পর সহজে তাঁকে দেখা শোনা যায় ও তাঁর কাছে থাকাই প্রকৃত আরাম" এই সরল বিশ্বাসে জলে ঝাঁপাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যস্মৃতি স্মরণে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা সেবক অখিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। কুমারী শান্তিপ্রভা তাঁর দিদির এই স্মরণীয় দিন উপলক্ষে মুঙ্গের ভক্তি-তীর্থ বাসা ফণ্ড ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। মঙ্গলময়ী মা বিধান-জননী তাঁর মনোনীত সেবককে ও সেবকের কন্যাকে তাঁদের বাঞ্ছিত অমরধামে আশ্রয় দিয়া নিত্য শান্তি প্রদান করুন এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ২৭শে অক্টোবর প্রাতে, পুরীতে ভাই প্রিয়নাথের প্রবাস-আশ্রমে, পরলোকগত ভ্রাতা শশিভূষণ মল্লিকের ও তাঁর একটি কন্যার স্বর্গগমন দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিক পিতার ও ভগ্নীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ-সূচক নবসংহিতার প্রার্থনায় প্রার্থনা করেন ও সঙ্গীত করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমের দেবালয়-নির্ম্মাণ ফণ্ডে ২৲ টাকা দান করেন।

গত ২৭শে অক্টোবর, ২৮।১নং চক্রবেড়ে লেনে, ব্রহ্মানন্দের জামাতা কুচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের সাম্বৎসরিক দিনে প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী প্রার্থনা করেন, সন্ধ্যায় পাঠাদি হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ ঢাকায় ছিলেন বলিয়া, ওখানেও এই দিনে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের গৃহে ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন, ভাই মহিমচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করেন। তাঁরা সুন্দরভাবে স্বর্গীয় আত্মার জীবনের সারল্য ও বিশ্বাসের কথা বলেন, তিনি যে কুচবিহারের অমূল্য রত্ন ও ব্রহ্মানন্দের যোগ্যতম জামাতা ছিলেন, কত উচ্চে তাঁর জীবন ছিল, এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ ঢাকা নববিধান-সমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। সেই দিন বৈকালে কুচবিহারেও কেশবাশ্রমে প্রায় দুই শতের উপর ভিখারীদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হইয়াছে।

গত ২৯শে অক্টোবর, কলুটোলায়, কৃষ্ণভবনে, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। অল্প বয়সে মেয়েদের মধ্যে প্রথমে ইনিই ব্রহ্মানন্দের কাছে দীক্ষা লইয়া নববিধানের সুন্দর জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

গত ৩১শে অক্টোবর, ৭৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, ভক্তের ভক্ত স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাবের সঙ্গে সঙ্গীত করেন।

সাহায্য-ভিক্ষা।

শ্রীনববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দের জীবনানুগমনে নববিধান-সাধনার্থ শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। এই আশ্রমের দেবালয়ে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব, শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, মা সারদা দেবী ও নববিধানের প্রেরিতদেবগণের অনেকেরই চিতাভস্ম সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। দেবালয়টী খড়ের চালা ও ছিটাবেড়ার, তাহাও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। গৃহটী ইষ্টক-নির্ম্মিত করিয়া, তাহার দেওয়ালে চিতাভস্মগুলি সমাধির আকারে রক্ষা করিতে পারিলে অনেকটা নিরাপদ্ হয়। এ জন্য কতকগুলি পুরাতন ইট কুড়াইয়া রাখিয়াছি। সহৃদয় সহৃদয়া বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী ভাই ভগ্নীগণ যদি ঈশ্বর-প্রীতিকাম হইয়া কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য ভিক্ষা দেন, তবে ঈশ্বরের প্রসাদ-রূপে লইয়া দেবালয়টী নির্ম্মাণ করিয়া কৃতার্থ হই।

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক
সেবিকা—হেমন্তকুমারী মল্লিক
শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম, বাগনান পোঃ, হাওড়া।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ২১শে কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ। 17th November, 1931. | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

জয় জয়, মা জননি, তোমারই জয়। প্রাচীন যুগে ঋষিগণ তোমাকে "পিতা নোঽসি" বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। ব্রহ্মনন্দন যিশু তাই তোমাকে "স্বর্গস্থ পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতে শিখাইলেন এবং নিজেকে তোমারই পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। তোমার সঙ্গে মানবাত্মার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধ তখন হইতে সাধিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীঈশার সঙ্গে আমরা তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছি। আবার পৌরাণিক ভক্তগণ তোমার সহিত আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া, তোমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। কিন্তু ভক্তির আতিশয্য সাধন করিবার জন্য তোমাকে বাহ্যচক্ষুগোচর করিতে গিয়া, তোমার মাতৃত্বের উপমা প্রতিমায় গড়িলেন ও তাহারই পূজা অজ্ঞ সাধকদিগকে শিখাইলেন। প্রতিমা পাইয়া ভ্রান্ত সাধক আসল মাকে ভুলিল। তাই তুমি বর্ত্তমান কলিযুগে আবার তোমার নব ভক্ত শ্রীকেশবচন্দ্রকে জন্ম দিয়া, তুমি যে নিরাকার হইয়াও মানব-সন্তানের বড্ড ভাল মা, তাহারই পরিচয় তাঁহাকে দিলে এবং আমাদেরও সকলকে তাঁহার সহিত একই মা তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইলে। আমরা তাই তোমাকে নববিধানে মা মা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছি। যিনি তোমাকে মাতৃরূপে পাইয়া মাতৃসন্তানত্ব লাভ করিলেন, তাঁহার শুভ জন্মদিন আসিতেছে। তাঁহার সহিত একপ্রাণ হইয়া যদি তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারি ও তোমাকে দেখিতে শুনিতে পারি, তবেই ত যথার্থ এক তোমাকেই মা বলিবার আমরা উপযুক্ত হই। এ বিধানে মুখে মা বলা তুমি চাও না, মাতৃ-সন্তান হয়ে আমরা এক মাকে মা বলি, এই চাও; এই জন্যই তাঁর জন্ম তাঁর জন্মদিনে তবে আমাদিগকে সেই মাতৃ-সন্তানত্ব দাও, নতুবা তাঁর জন্মের সার্থকতা আমাদের জীবনে কেমনে হইবে? আমাদিগকেও যে তুমি নববিধানে নব জন্ম দিয়াছ, তাহাও ত সপ্রমাণ হইবে না। তাই করযোড়ে মিনতি করি, যদি তোমার নবভক্ত নবশিশুর জন্মোৎসব আমাদিগের দ্বারা সাধন করাইবে, তবে তাঁর দিব্য জীবন আমাদের জীবনে পুনর্জাত কর। আমরাও তাঁহার আত্মার সহিত একাত্মতা-লাভে তোমার নবশিশু হই এবং এক মাকে সবাই তেমনি তেমনি করিয়া মা মা বলিয়া ডাকি। একমাত্র তোমার কৃপা-বলেই ইহা সম্ভব। তোমার কৃপা-গুণে আমাদের এই প্রাণের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব আসিতেছে। যুগে যুগে বিধান-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের জন্ম অপর সাধারণ মানবের জন্মের মত নয়, এই বলিয়া কতই অলৌকিক কথা তাঁহাদের জন্ম সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, তাঁহাদের দৈহিক জন্মও যে স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক বিধি অনুসারে হইয়াছে, ভক্তির আতিশয্যবশতঃ তাঁহাদিগের শিষ্যগণ তাহাও মানিতে চান না। তাঁহাদের ভয়, পাছে তাহাতে তাঁহাদের দেবত্ব খর্ব্ব হয়।

এরূপ অন্ধ বিশ্বাস যদিও নববিধানে আমরা প্রশ্রয় দিই না, তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, সকল মহা মানুষেরই অধ্যাত্ম জন্ম বাস্তবিকই অলৌকিক জন্ম। তাঁহারা যথার্থই কেবল মনুষ্য পিতামাতার জাত নন, বা মানবীয় পুরুষকার-সাধন-সম্ভূত তাঁহাদিগের অধ্যাত্ম জন্ম নয়। ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রেরও জন্ম, সেই ভাবে আমরা বিশ্বাস করি, অলৌকিক জন্ম, পবিত্রাত্মজাত জন্ম। তাঁহার দেহ বা মানবত্ব পিতামাতা হইতে জাত, তাঁহার অধ্যাত্ম ব্রহ্মানন্দত্ব পবিত্রাত্মজাত।

তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, আমরা দেখি, জন্ম হইতে তিনি বিধাতার হস্তে গঠিত। মাতৃ-গর্ভ হইতেও তিনি জন্মিলেন যথাকালের পূর্ব্বে এবং নববিধানে যে জীবনাদর্শ প্রকাশ করিলেন, তাহাও বর্ত্তমান যুগের ভবিষ্য আদর্শ।

তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা, সাধন, সিদ্ধি সকলই বিধাতৃ-প্রেরিত। বাল্যশিক্ষা, বিদ্যালয়ে শিক্ষা তাঁহার অধিক হয় নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধিও তিনি লাভ করেন নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার স্যার রেণল্ড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহা সভায় ছাত্রদিগকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "He was an illustrious example of that culture, which it is the aim and the end of this University to foster.......It remains for you the students of this generation, to follow in his footsteps, to complete his work, to show yourselves worthy to be called his fellow countrymen."—"যে শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান করা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাহারই তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান বংশীয় ছাত্রগণ, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করা, তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করা এবং তাঁহার স্বদেশবাসী বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হওয়া, তোমাদিগের কার্য্য।"

তাঁহার ইংরাজী বাগ্মিতা সম্বন্ধে ইংলিশম্যান পত্র বলিতেন, "Ceceronian speech"—প্রাচীন সিসিরোর ন্যায় তাহার বাগ্মিতা। ষ্টেটসম্যান পত্র বলেন, "যখন কেশব বক্তৃতা করেন, তখন সমগ্র বিশ্ব শ্রবণ করে।" সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিতে শুনিয়াছি, "আমি কেশবের বাঙ্গালা শিখিতে ব্রহ্মমন্দিরে যাই"। অথচ কেশব স্বয়ং বলিতেন, "আমি বাঙ্গালা ভাষা জানি না, যা আসে তাই বলি; তাতে ভাষা হয় কি, কি হয়, জানি না।" অন্যত্র বলেন, "আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলি না।" ইহাতেই পরিচয় পাওয়া যায়, স্বয়ং ঈশ্বর-প্রেরণাই তাঁহার সকল শিক্ষা ও সকল শক্তির মূল। বঙ্কিমচন্দ্র এই জন্যই তাঁর "ধর্ম্মতত্ত্ব" পুস্তকে কেশবচন্দ্রকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিক শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের যাবতীয় কার্য্যই ব্রহ্ম-প্রণোদিত। তাই তিনি আত্মজ্ঞানে আপনার জীবনকে "জীবনবেদ" বলিয়া প্রচার করিলেন। সত্যই তাঁহার জীবন বর্ত্তমান যুগের মানব-জীবন-বেদ।

তাঁহার এই জীবনবেদের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিধাতার হস্ত-রচিত। প্রার্থনা-সাধন হইতে আরম্ভ করিয়া নববিধানের আদর্শে তিনি যে বিশ্বমানবত্বে মূর্ত্তিমান হইলেন, তাহার সকল বিষয়েই বিধাতা স্বয়ং তাঁহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রার্থনা করিতে স্বয়ং ঈশ্বরই প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহাকে শিখাইলেন। ধর্ম্ম-জীবনের উষাকালে ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন "প্রার্থনা কর, সকলই পাইবে।" তাই তিনি তাহাতে সরল বিশ্বাসী হইয়া প্রার্থনা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, শাস্ত্রমন্ত্র, সাধুসঙ্গ, হোম, জল-সংস্কার, পরলোক-দর্শন, সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়-সাধন সকলই ব্রহ্ম-কৃপা-বলে লাভ করিলেন ও জীবনে নববিধানকে মূর্ত্তিমান করিলেন।

যেমন ঈশ্বর তাঁহাকে প্রার্থনা-সাধন-মন্ত্র দিলেন, তেমনি তিনিই ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলাইয়া দিলেন; আবার মহর্ষিও ঈশ্বরের আদেশেই

তাঁহাকে "ব্রহ্মানন্দ" নাম দিলেন ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে বরণ করিলেন। আবার নববিধানের প্রেরিত প্রচারক ধর্ম্মবন্ধুগণ-যাঁহাদের তিনি পাইলেন, তাহাও ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে। কোথা হইতে কাহাকে আনিয়া তিনিই নববিধানের এক অখণ্ড প্রেম-পরিবার রচনা করিয়া দিলেন। এই সকলই বিধাতারই অলৌকিক লীলা।

কেশবচন্দ্রের বিবাহকালে বৈরাগ্যের সঞ্চার ও পরিণামে সহধর্ম্মিণীর সহিত একাত্মতা ও অধ্যাত্ম মিলন, ইহাও বিধাতার অদ্ভুত লীলা। এইরূপে কত পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনা বা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া, তাঁহার জ্ঞান-প্রধান জীবনে নববিধানের ভক্তির অভিব্যক্তি-লাভ, নীতি হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে মহাযোগের সমন্বয়ে জীবনের সমুন্নতি, ইহা কি প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বরের ক্রিয়া নয়? সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জন পরব্রহ্ম যেমন ক্রমে প্রকাশিত হইয়া লীলা-রসময় হরিরূপে, তাহার পর স্নেহময়ী জননীরূপে তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন, তেমনি তাঁহার জীবনকেও বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতির বিধানানুসারে ফুটাইয়া তুলিলেন, এবং তদ্দ্বারা মানবাত্মারও ক্রমোন্নতির আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। এইজন্যই কেশবচন্দ্র আপনার জীবনে নববিধানের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মকে 'নববিধান' নামে অভিহিত করিলেন।

কিন্তু তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের স্থানীয় মহাপুরুষ বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে চাহিলেন না। যদিও তাঁহার যাহা কিছু সকলই দৈবশক্তি-প্রসূত, তথাপি তিনি আপনাকে পাপী মানবের স্থানীয়, পাপীর সর্দ্দার বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন; অথচ আপনাকে অসাধারণ মানুষ বলিয়াও ঘোষণা করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষদিগের জীবন ঈশ্বরত্বে গঠিত বলিয়া, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ যে ঈশ্বর-স্থানীয় করিয়াছেন, তাহার পথ বন্ধ করিতেই শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্ম। তাই তিনি আপনাকে পাপীর সর্দ্দার বলিয়া, পাপীদিগের সহিত সহানুভূতি-যোগে এক হইলেন। কেন না, যাহা এক মানুষের জীবনে ভগবান্ দেখাইয়াছেন, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই জীবনে সম্ভাবিত হইবে।

এই জন্য তিনি মধ্যবর্ত্তী বা গুরু হইতে চাহিলেন না। সকলকে ভাই বলিলেন, ভগ্নী বলিলেন, এবং সবার সহিত ধর্ম্ম-বন্ধুতা-যোগে যুক্ত হইতে চাহিলেন। সকলেও তাঁহার সহিত একাত্মতা অবলম্বনে নববিধানে মূর্ত্তিমান অখণ্ডদেহ বিশ্বমানব হইবে, ইহাও চাহিলেন। তিনি বার বার যে অনুযোগ করিলেন, "কেহ আমার হইল না," ইহার অর্থ, তিনি যাহা হইলেন, তাহা আমরা হইলাম না। তাই তিনি তাঁর শেষ জন্মদিনের প্রার্থনায় বলিলেন, "আবার গুরু হইতে চলিলাম। কি ভাবে গুরু হইব? আমার কথা যার যা খুসি লইতেছে, যার যা খুসি ফেলে দিচ্ছে, তা করলে হবে না, ষোল আনা লইতে হইবে। সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম, অদ্য গুরু-লাভ। অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নয়, নববিধানের গুরু। এক শরীরের সকলে অঙ্গ, এই বিশ্বাস।" তিনি যেমন সকল মানবকে এক শরীরের অঙ্গ বলিয়া পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া বিশ্বমানব হইলেন, তেমনি তাহা হইবার জন্য তাঁহাকে শিক্ষা-গুরু জানিয়া, তাঁহার সহিত এক শরীর ও পরস্পরের সহিত এক শরীর হইয়া নববিধান পূর্ণ করিব, ইহাই তাঁহার প্রার্থনার মর্ম্ম। এবার জন্মোৎসবে যেন তাঁহার এই প্রার্থনা, মা আমাদের প্রতি জীবনে, মণ্ডলীতে, সর্ব্বমানব-জীবনে পূর্ণ করেন, এই ভিক্ষা চাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

অখণ্ডদেহ মানবের জন্ম।

শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় বলিলেন, "মা, স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই মানুষ আমি। আমি বিনয় ও অহংকারের সহিত বলিতেছি, আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া; আমাকে ছাড়ুক, শুকাইবে। দয়াল হরি, নববিধান একটা। এঁরাও যা, আমিও তা; আমিও যা, এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা। এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না, সব এক। এক ঈশ্বর উপরে। এক সন্তান নীচে। সমুদয় মণ্ডলী-সমাজ এক। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ। যোগ-চক্ষে দেখতে দাও, তুমি এক, আমরা এক।" ইহাই নববিধানের প্রকৃত তাৎপর্য্য। সর্ব্বমানবের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেই নববিধান সমাগত, এবং নববিধান-মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দের জন্ম।

শ্রীকেশব কে?

শ্রীকেশব কে?—শব। তিনি আপনাকে শব করিলেন, আমিত্ব-শূন্য হইলেন। তাই বলিলেন, "কোথায় আমার আমি?

সে আমি-পাখী এ দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না।" বাস্তবিক বিজ্ঞান যেমন বলে, প্রকৃতি কোন স্থানকে শূন্য থাকিতে দেয় না—অগ্নির উত্তাপে যে স্থান শূন্য হয়, অমনি ঊর্দ্ধ হইতে বায়ু আসিয়া সে স্থান পূর্ণ করে; তেমনি যাই শ্রীকেশবচন্দ্র আমিত্ব-শূন্য হইলেন, অমনি স্বর্গের পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশ বাণী "আমি আছি" "আমি আছি" ধ্বনিতে তাঁহার 'আমির' স্থান পূর্ণ করিলেন। তখন তিনি আর 'আমি আমি' বলিতে পারিলেন না, আপনার ভিতর বিশ্বাত্মার আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমরা"। তখন কেশবের "শব" "সবে" পরিণত হইল, সব বিশ্বমানবকে আত্মস্থ করিয়া হইলেন "মর্ত্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তাই পুরাতন প্রার্থনা "অসতোমা সদ্গময়" পরিবর্ত্তন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "অসত্য হইতে 'আমাদিগকে' সত্যেতে লইয়া যাও।" এইরূপ সর্ব্বজনে একজন হওয়াই কেশবচন্দ্রের জীবন।

ধর্ম্মরাজ্যের নূতন আবিষ্কার।

প্রতিদিন আকাশে সূর্য্য উঠে, প্রতিরাত্র গগনে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী কিরণ দান করে। এসকল বিধাতার নিত্য বিধি। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, কখন কখন আকাশে ধূমকেতু উদিত হয়। ইহা আকস্মিক ঘটনা। ইহা আকস্মিক হইলেও বিধাতার বিধানে ইহার স্থান কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, অনন্তের হস্তে তাহার নিয়তির পূর্ণতা আছে। মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব সাধারণ বিধির অন্তর্গত নহে। ইহা আকস্মিক হইলেও, দেশের বিপর্য্যয় অবস্থা বা পারিপার্শ্বিক ঘটনা তাঁহাদের জন্মের সাক্ষাৎ কারণ। একবার নেপোলিয়ানের একটী বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্রকে শিক্ষার ছাঁচে ঢালিয়া এমন করিয়া গড়িয়া তোল, যেন ভবিষ্যতে তিনি তোমার স্থান অধিকার করিতে পারেন। নেপোলিয়ন সগর্ব্বে উত্তর করিলেন যে, "Replace Napoleon, Napolean can not be replaced. I am the child of the circumstances."

শ্রীকেশবেরও দেশের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সম্ভূত বিপর্য্যয় অবস্থা জন্মের সাক্ষাৎ কারণ। একথা শ্রীকেশবচন্দ্রও বিশ্বাস করিতেন, তাই তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "Am I an Inspired Prophet? No, I am a singular man. I am not as ordinary men are. I am commissioned by God to preach certain truths." তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বিধাতার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কতকগুলি সত্য প্রচার ও সাধন করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবন-চরিত আলোচনা করিলে, তাঁহাদের এইরূপ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকেশবচন্দ্র ধর্ম্ম-সমাজ ও নীতির পথে নূতন সংস্কার আনয়ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সমাজ-জীবনের একটী বিশেষ সংস্কারের কথা উল্লেখ করিব। এক শতাব্দী পূর্ব্বে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইয়াছিল, তাহার একটু আভাস যাঁহারা পান নাই, তাঁহারা, কেশবচন্দ্র পর্ব্বত-সমান বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে বীরের ন্যায় সত্যের পথে অটল ও অচল হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, একথা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিবেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন কয়েকটী সহসাধক লইয়া একটী ক্ষুদ্র সংস্কৃত সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের সিংহাসন-তলে কাহারও গ্রীবা উচ্চ করিবার অধিকার ছিল না। কেশবচন্দ্রই প্রথম জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের শুদ্ধতার উপর সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন। বংশ ও সংস্কারগত ব্রাহ্মণত্বের পরিবর্ত্তে নূতন গুণগত ব্রাহ্মণত্বের অধিকার সৃষ্টি করিলেন। দেশের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। দেশে সমাজ-বিপ্লবের বহ্নি দিকে দিকে জলিয়া উঠিল। আজ যে অস্পৃশ্যদিগের অধিকার লইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মূল কে? কেশবচন্দ্র। ব্রহ্মানন্দ মানবের এই সনাতন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, ভবিষ্যৎ বংশের পথ উন্মুক্ত করিলেন। সাম্যের শ্রেষ্ঠ অধিকার দান করিয়া স্বাধীনতার পথে জাতিকে অগ্রসর করিলেন। তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রে জাতি-নির্ব্বিশেষে মানবের যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন, আজ রাজনীতিক্ষেত্রে সেই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য ভারতে স্বরাজের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহা একই সত্যের ভিন্ন রূপ বা অবস্থা মাত্র।

শ্রীকেশবচন্দ্র সত্যের উপাসক ছিলেন এবং সত্যের উপাসক ছিলেন বলিয়া নিজে সত্যনিষ্ঠ ও সত্যসংকল্প ছিলেন। সত্য পালন করিতে গিয়া এবং ধর্ম্ম ও সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া, নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের শেল বক্ষে ধারণ করিয়া, একাই সংস্কারের মহাযজ্ঞে আপনাকে আহুতি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার আহত বক্ষের লাল শোণিত দিয়া ধরণীর পৃষ্ঠে লিখিয়া গেলেন যে,—"Every inch of this man is real, tremendously real."

তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কি কিছু নূতন কথা বলিবার আছে? হাঁ, আছে বৈকি? তাঁহার ব্রহ্ম-দর্শন ও ব্রহ্ম-শ্রবণ। যত দিন পৃথিবীতে ধর্ম্ম থাকিবে, যতদিন জীবন্ত ভগবানের প্রতি মানবের বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন ব্রহ্ম-

দর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ নূতন হইতে নূতনতর বেশ ধারণ করিবে। বর্ত্তমান যুগের ইহাই নূতন বেদ। কেশবচন্দ্র এবং ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ একই কথা। তিনি দর্শন ও শ্রবণরূপে মূর্ত্ত হইয়া মানবসমাজে প্রকটিত হইলেন। এই দর্শন ও শ্রবণই নূতন বিধানের নূতন শাস্ত্র। বিজ্ঞানরাজ্যে সত্যের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষণের দ্বারা যেমন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হয়, ধর্ম্মরাজ্যেও সেইরূপ দর্শন ও শ্রবণের মধ্য দিয়াই নূতন সত্য আবির্ভূত হয়। নূতন বিধানের মহাসমন্বয় কখনই সম্ভব হইত না, যদি তিনি জীবনে দর্শন ও শ্রবণ লাভ না করিতেন। এই দর্শন ও শ্রবণ আত্মার সনাতন ধর্ম্ম। নিউটন যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতির একটী গূঢ় সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, শ্রীকেশবচন্দ্রও সেইরূপ দর্শন ও শ্রবণের সনাতন বিধি আবিষ্কার করিয়া ধর্ম্মজগতের নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া গেলেন। তাঁহার নূতন বিধান ধর্ম্মজগতের নূতন সংশ্লেষণ। যে সংশ্লেষণের নূতন বিধি অবলম্বন করিয়া ভৌতিক জগৎ প্রতিনিয়ত নূতন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইতেছে, ধর্ম্মজগৎও সেইরূপ সংশ্লেষণের সনাতন বিধির সাধনে নূতন পথে অগ্রসর হইতেছে। নূতন বিধানই ধর্ম্মরাজ্যের নূতন আবিষ্কার।

কেশবচন্দ্রকে বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাসা ভাসা রূপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম জীবনের সমাজ-সংস্কারের ছাপ দিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনকে দেশের নিকট ধরিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় যে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সত্য নহে। সমাজ তাঁহার আত্মার বাহ্য প্রকাশ, ইহা তাঁহার বিশ্বাসের বাহ্য অঙ্গ। অনেকে তাঁহাকে খৃষ্ট-ভাবাপন্ন বলেন, ইহা আংশিক সত্য। তিনি একদিকে যেমন খৃষ্টানুগত ছিলেন, অন্যদিকে খাঁটি হিন্দু ছিলেন; একদিকে যেমন যোগী ছিলেন, অন্যদিকে ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রথম ব্রাহ্মসমাজে খোল করতাল যোগে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন। যখন বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেন, শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মকে ভাব-প্রধান বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার পরিচায়ক মনে করিতেন, তখন তিনিই ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের ভক্তি জীবের পরিত্রাণের উপায়, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের নিকট প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সাধুদিগের সমন্বিত জীবনই কেশব চরিত্র। সাধারণ দেশ সংস্কারকদিগের তালিকাভুক্ত করিয়া, অথবা অহিন্দু-ভাবাপন্ন বলিয়া যাঁহারা তাঁহার জীবনালোচনা করেন, তাঁহারা তাঁহার জীবনের একদেশদর্শী সমালোচক।

সকল সাধু, সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম্ম, সকল সাধনের সমন্বিত জীবনই কেশবজীবন। তিনি যদি একটী বিশেষ ভাবের উপাসক হইতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে নববিধান অবতীর্ণ হইত না। নববিধান একটী পূর্ণ ধর্ম্ম-বিজ্ঞান। ব্রহ্ম-দর্শনের আলোকে ফেলিয়া ইহাকে বিশ্লিষ্ট কর, ইহা এক একটী প্রাচীন ধর্ম্মবিধান; ব্রহ্মদর্শনের আলোকে ইহার খণ্ড প্রকৃতিকে মিলিত কর, ইহা অখণ্ড নববিধান। কেশবের চরিত্রে এই অখণ্ডত্ব স্থিতি করিতেছে। তাঁহাকে যাঁহারা খণ্ডভাবে দর্শন করেন, তাঁহাদের দর্শন আংশিক সত্য। তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহার সমগ্র জীবন জানিতে হয়—আলোচনা করিতে হয়—সাধন করিতে হয়। সময় আসিবে, যখন ভবিষ্যৎ বংশ বুঝিতে পারিবে যে, যে জীবন হইতে এই পূর্ণ ধর্ম্মবিজ্ঞান পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল, সে জীবনের গতি কত বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া ব্রহ্মে মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ তাঁহার দুইটী দিব্য চক্ষু। এই দিব্য দর্শনের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক অন্ধকার ভেদ করিয়া, নববিধানের নূতন ধর্ম্মবিজ্ঞান আবিষ্কার করিলেন। ইহা সত্যই কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ন্যায় নবযুগের ধর্ম্মরাজ্যের নূতন আবিষ্কার।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে সার্ব্বভৌমিক অখণ্ড এবং খণ্ড সাধনের সামঞ্জস্য।

নবেম্বর মাস ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসবের মাস। আগামী ১৯শে নবেম্বর কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। আমরা গত সমস্ত বৎসর নববিধান-সাধনের মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন, স্পর্শন ও তাঁহার বাণীশ্রবণ এবং লীলানুশীলন মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গ ও সহায়তা যতদূর পাইয়াছি, আমাদের নিজ নিজ জীবনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মানন্দের জীবনে ব্রহ্মলীলা যতদূর দর্শন করিয়াছি ও সম্ভোগ করিয়াছি, সেই পরিমাণে আমাদের মধ্যে তাঁহার জন্মোৎসব সম্ভব হইবে ও সত্য হইবে, তদতিরিক্ত নহে। আমাদের জীবনে সামান্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যাহা কিছু লাভ হইয়াছে, তাহাই সম্বল করিয়া এ সময় ব্রহ্মানন্দের জীবনের কথা কিছু আলোচনা করিব।

অনেকে বলিয়া থাকেন, আমরা বলা কওয়াতে বড় 'কেশব কেশব' করিয়া থাকি। ইহার মূল একেবারে সত্য নাই, তাহা বলিব না। আমরা কেশবের কথা বলিতে গিয়া যে পরিমাণে ঈশ্বরকে ও তাঁহার সাক্ষাৎ প্রকাশকে আবৃত করিয়াছি, সেই পরিমাণে আমরা এ বিষয়ে অপরাধী; সে অপরাধ আমাদের, কেশবের নহে। আমাদের ত্রুটী হইতে পারে না, একথা বলিলে অসত্যই বলা হইবে।

কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মসমাজের কাজ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজ যে সংস্কার-কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এখন আর ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন নাই। আমরা বলি, ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমাদের দেশ এ পর্য্যন্ত যে সংস্কার গ্রহণ

করিয়াছেন, তাহা অভিবাহ্য। আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের যে উচ্চ অভিব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজ এ দেশকে ও জগৎকে দিতে আসিয়াছেন, তাহা দেশ শুধু গ্রহণ করেন নাই তাহা নহে, তাহা সমস্ত ব্রাহ্ম-সমাজের লোকের মধ্যেও সামান্যই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। আধ্যাত্মিক যে উচ্চ অভিব্যক্তিকে কেশবচন্দ্র নবযুগের নববিধান বলিলেন, তাহা নববিধানসমাজেও অতি অল্পই বিকাশ লাভ করিয়াছে, দুই চারিটী বিশিষ্ট জীবন ভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তাহার আভাস মাত্রই গৃহীত হইয়াছে। আমরা সেই উচ্চ অভিব্যক্তির সামান্য মাত্র দর্শন করিয়াছি, জীবনে কিছুই গৃহীত হয় নাই বলিলেই হয়। ইহা অনুভব করিয়া ঈশ্বর-চরণে ক্রন্দন করিতেছি। জীবনে সে অভিব্যক্তির যদি জয় দর্শন করিতে পারি এবং তাহার সুসমাচার জগতে বিলাইয়া জীবনপাত করিতে পারি, তবে এ যুগে পৃথিবীতে আসা সার্থক মনে করিব।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্মের যে অভিব্যক্তিকে নববিধান বলিলেন, এবং যাহা সাধন করিতে করিতে, যাহার সুসমাচার বিলাইতে বিলাইতে জীবনপাত করিলেন, তাহা আমাদের বর্ত্তমান সামান্য অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করিলে যে নিতান্ত অপূর্ণতার কার্য্য হইবে, তাহা জানি; কিন্তু উহা যথাসাধ্য প্রকাশ করা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। জীবনের দেবতা এ বিষয়ে সহায় হউন।

ধর্ম্মের এ উচ্চ অভিব্যক্তির কথা বলিতে গেলে, প্রথমে মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন উল্লেখ করিয়া, কেশবের জীবনের কথা পরে বলিলে তাহা সমধিক পরিস্ফুট হইবে মনে করিয়া, প্রথমে মহাত্মা রামমোহনের বিষয় অল্প কথায় উল্লেখ করিতেছি। রামমোহন সমগ্র জীবনের অনুসন্ধান ও সাধনালব্ধ জীবনালোক তিনি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডিডের মধ্যে ঢালিয়া, সেই ট্রাষ্টডিডকে ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ট্রাষ্ট ডিডের মূল কথা, "এখানে ব্রাহ্মসমাজে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলে জগতের কর্ত্তা ও প্রভু এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজায় মিলিত হইবেন, এবং এখানে উপাসনা সম্পর্কে যাহা কিছু কার্য্য হইবে, তাহা দ্বারা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে মিলন বর্দ্ধিত হইবে; কিন্তু অমিলনের ভাবে এখানে কোন কার্য্য হইবে না।" অতএব ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য হইল দ্বিবিধ,—এক ঈশ্বরের উপাসনা, আর সেই উপাসনা-যোগে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে ক্রমাগত মিলন-বর্দ্ধন। সাধন-পথে শাস্ত্রের অনুসরণ রামমোহনের বিশেষ ভাব। তিনি আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ঋষি-জীবন। উপনিষদের "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যা-যোগে মহর্ষির জীবনে ব্রহ্ম-ভাবের বিশেষ স্ফুরণ হয়। ঋষি-ভাবে তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি। দেশীয় ধর্ম্মাচরণের প্রতি গূঢ় অনুরাগ তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক ভাব। তিনি যে উচ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবন এবং ব্রহ্মে ধ্যান ও সমাধির মহদৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী। তিনি আমাদের সকলের প্রণম্য ধর্ম্মপিতা।

এখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের কথা বলি। কেশব-চন্দ্রের ধর্ম্মজীবন প্রার্থনা-যোগে আরম্ভ। তাঁহার অন্তরে অন্তর্যামী দেবতার বাণী হইল, "তোমার গ্রন্থও নাই, গুরুও নাই; প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনাই একমাত্র তোমার সম্বল।" তিনি প্রার্থনায় ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনা-যোগেই তাঁহার জীবনের বিচিত্র বিকাশ ও প্রকাশ, এবং প্রার্থনা-যোগেই তাঁহার জীবনের উচ্চ পরিণতি। রামমোহন শাস্ত্রবাদী ছিলেন, তিনি পরিষ্কার ভাষায় শাস্ত্রের অনুসরণ সকলের জন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-জীবন ঋষি ভাবে আরম্ভ, উচ্চ ঋষি-ভাবের সাধনায় তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। ভারতীয় ঋষিভাব অতিক্রম করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল না; তাই তাঁহার ধর্ম্মজীবন ঋষিভাবে আবদ্ধ, আমরা দেখিতে পাই।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাব-নিরপেক্ষ ভাবে, কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রভাবনিরপেক্ষ ভাবে, একমাত্র প্রার্থনার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের মুক্তালোকে ও মুক্ত প্রভাবে। ধর্ম্মপিতামহ ও ধর্ম্মপিতা হইতে কেশবচন্দ্রের জীবনের এ স্বতন্ত্রতা সামান্য নহে। ঈশ্বরের এই মুক্তালোকে ও মুক্ত প্রভাবে কেশব-জীবনে সত্যের সার্ব্বভৌমিকতা, ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা ও গ্রহণের সার্ব্বভৌমিকতা দেখা দিল। এই মুক্তালোকে ও মুক্ত প্রভাবেই সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও সার্ব্বভৌমিক সত্য-সাধনার মধ্যে খণ্ড সাধন, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিধান, বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র ও বিশেষ বিশেষ সাধু মহাজনের ভাবসাধনা, ঈশ্বরের খণ্ড খণ্ড প্রকাশ ও খণ্ড খণ্ড আলোক সাধনা, এক কথায় কেশবে সমষ্টিতে ব্যষ্টিগত সাধনা, ব্যষ্টিগত সাধনার ভিতরে সমষ্টিগত সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিণতি সম্ভব হইল। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ এক ব্রহ্মে মন স্থাপন করিয়া, ব্রহ্ম-নিরূপণ করিতে করিতে, ব্রহ্মসত্তায়ই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাই তাঁহাদের অন্তিম ধারণা অথবা ধারণার আতিশয্য হইল "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, ব্রহ্মে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু তাঁহাদের স্বীকার করা অসম্ভব হইল। ব্রহ্মেতে যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বময় দেবলোক, ব্রহ্মেতে যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বময় ইহলোক এবং সব লইয়া ব্রহ্মেতে যে স্বর্গ-লোক, যে স্বর্গ-লোকের শোভা শ্রীঈশা ঈশ্বরেতে দর্শন করিয়া পৃথিবীতে সেই স্বর্গরাজ্যের আগমন ঘোষণা করিলেন, সেই স্বর্গ-লোকের বিশিষ্ট প্রকাশের শোভা আর ভারতীয় ঋষিদের, বা উপনিষদের ঋষিদিগের নিকট ব্যক্ত হইল না। সকলই ক্রম-বিকাশের জন্য সময়-সাপেক্ষ, এজন্য আমরা ভারতীয় ঋষিগণের

উপর দোষারোপ করিতে পারি না। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণের দৃষ্টি এক অখণ্ড ব্রহ্ম-সত্তায় আবদ্ধ রহিল; জীবেতে, জগতে ব্রহ্ম-লীলা তাঁহাদের নিকট উদ্ভাসিত হইল না। আবার পরবর্ত্তী সময়ে যাঁহারা ভক্তিপথে লীলাধীন হইয়া পৌরাণিক ভাবে ধর্ম্ম সাধন করিলেন, নির্ব্বিকল্প ও নির্গুণ ব্রহ্মের দর্শন-সাধনার অভাবে তাঁহারা এক এক খণ্ডলীলাতে, এক এক মহাপুরুষে, এক এক ধর্ম্মশাস্ত্রে, এক এক বিধানে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, এক ব্রহ্মেতে সকলের মিলন দেখিতে পাইলেন না। তাই তো পৃথিবীতে ধর্ম্মক্ষেত্রে এত সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা।

এ যুগে ব্রহ্মপূজায় ও ব্রহ্মেতে সকলের মিলন রামমোহন-কৃত ট্রাষ্টডিডে ঘোষিত হইল। বিশুদ্ধ ব্রহ্মদর্শনের ভিত্তিতে এই মিলন সম্ভবে; তাই ব্রহ্মদর্শন ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মানুভূতি শিক্ষা দিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের আগমন, তাই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের উষাকালে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবের মিলন, এবং তাই দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মপিতা। ব্রহ্মদর্শন, বিশুদ্ধ ব্রহ্মানুভূতি ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাণীশ্রবণ ভিন্ন, এক ব্রহ্মে বিভিন্ন যুগের সকল লীলার বিশিষ্টতা দর্শন ও একেতে সকলের মিলন প্রদর্শন সম্ভব নয়; তাই অপরদিকে ব্রহ্মবাণীতে কেশবের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল এবং ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে কেশবের সঙ্গে শ্রীঈশার জীবনব্যাপী যোগে কেশবজীবনে প্রার্থনার উচ্চ পরিণতি হইল। বিশুদ্ধ ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মানুভূতি এবং ক্রমাগত বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাণীশ্রবণ এই দুই অমোঘ সাধন-পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেশব-পাখী নব যুগের সাধনাকাশে বিচরণ করিলেন। এই দুয়েরই অবলম্বনে তিনি সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে সকল বিশিষ্টতার, সকল বিচিত্রতার মিলন সাধন করিলেন। এই দুয়েরই অবলম্বনে নব যুগে উচ্চ ধর্ম্মের নব অভিব্যক্তি নববিধান জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, মণ্ডলীতে সে সাধন প্রবর্ত্তিত করিলেন, জগতে সে শুভবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

বেদের সার্ব্বজনীনতা এবং অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ।

১। বেদের সার্ব্বজনীনতা।

(১) "বিশ্বাসাং ত্বা বিশাং পতিং হবামহে সর্ব্বাসাং সমানং দম্পতিং" ॥ ঋ, ১—১২৭—৮ ॥

বিশ্বমানবের প্রতিপালক, সকল গৃহের রক্ষক, হে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর, তোমার দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, তোমাকে ডাকিতেছি।

(২) "জনং মনুজাতং" ॥ ঋ, ১—৪৫—১ ॥

মানুষ মাত্রেই মনুর সন্তান।

"অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বি জাতাঃ॥" ঋ ১০—৮০—৬ ॥

মানুষ মাত্রেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরের পূজা করে, মানুষ মাত্রেই নহুষের (Noah) সন্তান। নহুষ, বোধ হয়, মনুরই নামান্তর।

(৩) "বাত্রবীত্বয়না মর্ত্তোভ্যো 'গ্নি বিদ্বান্ ঋতচিদ্ধি সত্যঃ॥" ঋ, ১—১৪৫—৫।

জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর সকলই জানেন; তিনি মানুষ-মাত্রকেই তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া দেন; তিনি সত্যেরই আদর করেন, যে হেতু তিনি সত্যস্বরূপ।

(৪) "যা তে অগ্নে পর্বতস্যেব ধারাসশ্চন্তী পীপয়দ্দেব চিত্রা। তামস্মভ্যং প্রমতিং জাতবেদো বসো রাস্ব সুমতিং বিশ্বজন্যাং॥" ঋ, ৩—৫৭—৬ ॥

হে জ্যোতির্ম্ময় পরমদেব, তোমার প্রদত্ত উৎকৃষ্ট মতি অতি বিচিত্র; তাহা মেঘ হইতে পতিত বারিধারার ন্যায় সর্ব্বত্র সকলকে প্রতিপালন করে। হে সর্ব্বজ্ঞ দেব, হে সকল ধনের আকর, সেই সর্ব্বজন-হিতকর সুমতি আমাদিগকে দেও, যদ্দ্বারা বিশ্বমানবের হিত সাধিত হইবে।

(৫) "ত্বং ত্রাতা তরণে চেত্যো ভূঃ পিতা মাতা সদমিন্মানুষাণাং॥" ঋ, ৬—১—৫ ॥

হে জ্যোতির্ময় পরমেশ্বর, তুমিই পরিত্রাণ-দাতা, তুমিই বিপদুদ্ধারের তরণী-স্বরূপ; তোমাকে যেন আমরা জানিতে পারি। তুমি মানুষ মাত্রেরই নিত্যকালের পিতামাতাস্বরূপ।

(৬) বেদান্তের আদর্শ ঋষি বামদেবের মুখ দিয়া, অন্নদাতা পরমেশ্বর (ইন্দ্র) বলিতেছেন:—"অহং কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ, পশ্যত মা" ॥ ঋ, ৪—২৬—১ ॥

"আমিই অতীন্দ্রিয়দর্শী জ্ঞানী কক্ষীবানের ভিতরে প্রকাশমান, আমাকে দেখ!" কি আশ্চর্য্য! উষিক্-নাম্নী এক দাসীর পুত্র এই কক্ষীবানই ঋগ্বেদের ঋষিদিগের আদর্শ-স্থানীয়। ঋষি মেধাতিথি কক্ষীবান্‌কেই আদর্শ করিয়া বলিতেছেন:—"সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে কক্ষীবন্তং য ঔষিজঃ" ॥ ঋ ১—১৮—১ ॥ "হে স্তবনীয় পরমেশ্বর, আমি সোম-রস-যোগে তোমার পূজা করিতেছি! আশীর্ব্বাদ কর, আমিও যেন উষিজ্-নাম্নী দাসীর পুত্র কক্ষীবানের মত জ্ঞানীদিগের প্রিয় হই।"

(৭) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সাক্ষ্য দিতেছে যে, ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান ঋষি কবষ "দাসীপুত্র, ব্রাহ্মণ নহেন, নীচ জাত (কিতব) ছিলেন।" সেই কবষ নিজেও তাঁহার প্রকাশিত ঋগ্বেদীয় সূক্তে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যাহাতে এই নীচ-জাতীয় কবষ কুরুশ্রবণ রাজার যজ্ঞে পৌরোহিত্য না করিতে পারেন, সে জন্য ব্রাহ্মণজাতীয়েরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন:—"প্র মা যুযুজ্রে প্রযুজো জনানাং বহামি স্ম পূষণমন্তরেণ। বিশ্বে দেবাসো অধ মামরক্ষন্ দুঃশাসুরাগাদিতি ঘোষ আসীৎ॥" ঋ, ১০—৩৩—১ ॥

"মানুষের ভিতরে যে দেবশক্তি কার্য্য করে, তাহা আমাকেও চালাইতে লাগিল, আমি বিশ্ব-প্রতিপালক বা পূষাকে অন্তরে ধারণ করিলাম। সমস্ত দেবশক্তিসকল আমাকে রক্ষা করিল। 'সেই দুর্দ্দান্ত (কবষ) আসিল,' এই চিৎকার চতুর্দ্দিকে উঠিল!" এ সকল বাধা সত্ত্বেও অব্রাহ্মণ নীচজাতীয় এই কবষ প্রধান পুরোহিতের কার্য্য করিয়া ত্রসদস্যুর পুত্র বদান্য রাজা কুরুশ্রবণ হইতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের ন্যায় পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন:—"কুরুশ্রবণ মাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবং। মংহিষ্ঠং বাঘতাং ঋষিঃ"॥ এই কবষ ব্রাহ্মণেতর জাতি সকলের পক্ষে ("দাসী বিশঃ") বৈদিক কালের "মার্টিন লুথার" ছিলেন।

এ কথাও এ স্থলে উল্লেখ করিতে হয় যে, কবষ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ-লাভে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকল জাতির সমান অধিকার:—"অক্ষৈর্মা দিব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ। তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্য্যঃ॥ ১০—৩৫—১৩॥ "পাশা লইয়া জুয়া খেলা করিও না, কৃষিকার্য্য কর, এবং তাহাতে যাহা লাভ হয়, তাহাতেই কৃতার্থ বোধ করিও। হে কিতব (পাশানিক্ষেপ্তা), তাহাতেই তোমার গো সকলের সুখ ও তোমার গৃহিণীরও সুখ। ঐ সূর্য্যালোকের ভিতরে প্রকাশমান, প্রভু জগৎপ্রসবিতা, আমাকে ইহা দেখাইতেছেন।"

(৮) বেদের বরুণ কে? "বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥ বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে॥" ঋ, ১—২৫—৭,৮॥

বরুণ সর্ব্বজ্ঞ—"যিনি আকাশগামী পক্ষী সকলের কোন্‌টি কোথায় আছে, তাহা জানেন, যিনি জানেন সমুদ্র মধ্যে কোন্ নৌকাটি কোথায় আছে। যিনি প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের ধারণকর্ত্তারূপে জানেন, বার মাসে কোথায় কাহার জন্ম হয়। আর বার মাসেরও অধিক যে মল মাস, তাহারও সব কথা জানেন।"

(৯) বরুণ কে? অথর্ব্ববেদ উত্তর করিতেছে:—"দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে, রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ॥"

"দুইজনে গোপনে বসিয়া যাহা মন্ত্রণা করে, বিশ্বরাজ বরুণ তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া, সকলেই জানেন।"

(১০) "পরি চিন্মর্ত্তো দ্রবিণং মমন্যাদৃতস্য পথা নমসা বিবাসেৎ। উত স্বেন ক্রতুনা সং বদেত শ্রেয়াংসং দক্ষং মনসা জগৃভ্যাৎ॥" ১০-৩১-২॥ "মানুষ সর্ব্বদা ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া, ধন লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে। সে ধন লাভ হইলে তদ্দ্বারা বিনীত ভাবে সকলের সেবা করিবে। দেখিয়া শুনিয়া নির্জ্জনে নিজের বুদ্ধির সহিত পরামর্শ করিবে, এবং শ্রেয় বা কল্যাণের পথে বল প্রকাশ করাকেই মনের দ্বারা কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।" ইহার সহিত কৃষ্ণ ঋষির প্রদত্ত জীবিকা-উপার্জ্জন-বিষয়ক আদর্শেরও যোগ কর:—"মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজং" (২-২৮-৯)—"হে বিশ্বরাজ, আমি যেন পরের পরিশ্রমের ফল সম্ভোগ না করি।" হায়, একালে পরের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবার স্পৃহা কি প্রবল! অথচ ঋগ্বেদ বলিতেছে:—"ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ"—যাহারা পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত না হইয়াছেন, দেবগণ তাহাদের সহিত বন্ধুতা করেন না। বেদের অর্থ-নৈতিক আদর্শের সহিত একালের "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং॥"—বসাও, এবং উভয় আদর্শের তুলনা করিয়া বল, এই দুয়ের মধ্যে স্বর্গ-নরক তফাৎ কি না? ইহারই ফলে ভারতের গরিব কৃষক-শ্রমিকের সেবা করার পরিবর্ত্তে, তাহাদের রক্ত শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবার স্পৃহাই, আমাদের মত এ কালের শিক্ষিতদিগের মনে এত প্রবল।

২। বেদের সার্ব্বজনীনতার বর্ত্তমান শোচনীয় পরিণাম—জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা।

(১) বেদই হিন্দুধর্ম্মের মূল।

প্রকৃত বেদ—ঋগ্বেদ যে কত উদার, কত সার্ব্বজনীন, আমরা উপরি উক্ত ঋক্ মন্ত্র সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। সে সকল পড়িয়া কে না বলিবে যে, "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং হি" (২-৬), "ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ (২-১৩), এ সকল মনুসংহিতার বাক্য ঠিকই হইয়াছে; কে না বলিবে যে, শঙ্করাচার্য্য যে তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন, "বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে" (ব্র—সূ, ২-১-১ , —"বেদ তাহার নিজ প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না, রবি-কিরণ যেমন রূপ-বিষয়ে"—তাহাও সমীচীনই হইয়াছে। বেদকেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মূল স্বীকার করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতও আপনাকে "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং"—"বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল" বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণও বেদকেই আপনার মাপকাঠি স্বীকার করিয়া আপনাকে "পুরাণং বেদসম্মতং" বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। শুধু তাহাও নয়, জৈমিনিও বেদকে হিন্দুধর্ম্মের মূল স্বীকার করিয়াই বলিতেছেন:—"বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাৎ" (মীমাংসা-দর্শন ১-৩-৩)—"যাহা কিছু বেদ-বিরুদ্ধ, তাহা হিন্দুর আদরের অযোগ্য"।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ঋগ্বেদের একজন আদিম ঋষি বৃহস্পতি [১০-৭১,৭২ সূক্ত; ১০-১০৯-৪]—তাঁহারই অবতার চার্ব্বাক, যিনি দেহাত্মবাদী হইলেও কখনো কোন নিতান্ত অযৌক্তিক বা মিথ্যা কথা বলেন নাই, তিনি কেন বলিতেছেন:—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ"—তিনি কেন বলিতেছেন, বেদ সকল "বুদ্ধি-পৌরুষ হীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ।"—'বুদ্ধি-পৌরুষ-হীনদিগের জীবিকালাভের উপায় মাত্র'? যখন শুক্লযজুর্বেদ, কি কৃষ্ণযজুর্বেদ খুলিবা মাত্র দেখিতে পাই, কেবলি বলির ছড়াছড়ি—খেচর, ভূচর,

জলচর কাহারও নিস্তার নাই, নিতান্ত নৃশংসের মত পক্ষী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলকেই বলি দিবার ব্যবস্থা:—"সরস্বত্যৈ শারীং" [২৪-৩৩]—"সরস্বতীর নিকটে শারী (শুকী) বলি দিবে, "নৃত্তায় সূতং" [৩০-৬-৩]—"নৃত্য দেবতার নিকটে সূত বা ব্রাহ্মণীর ঔরসে ক্ষত্রিয় হইতে জাত সন্তানকে বলি দিবে", "দুষ্কৃতায় চরকাচার্য্যং" [৩০—১৮]—"দুষ্কর্ম্মের দেবতার নিকটে চরকদিগের আচার্য্য বা গুরু অর্থাৎ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় পুরোহিতকে বলি দিবে", তখন সত্যের অনুরোধে দেহাত্মবাদী বলিয়া চার্ব্বাকের কথা কে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতে পারিবে, বেদে নিষ্ঠুর নিশাচরদিগের মত কোন ব্যবস্থা নাই? আবার যখন কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে রাজাদের সর্ব্বস্ব দানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই "বিশ্বজিতি সর্ব্বস্বং দদাতি", [১—৪—৭—১], রাজারা "বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া পুরোহিতদিগকে সর্ব্বস্ব দান করিবেন", যখন দেখি, নচিকেতার পিতা এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া পুরোহিতদিগকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন—"সর্ব্ববেদসং দদৌ," তখন সত্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া কিরূপে বলিব যে বেদের প্রতি ভণ্ডামি এবং ধূর্ত্ততার অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, চার্ব্বাক্ অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন? কি করিয়া বলিব যে, বেদ বুদ্ধি-পৌরুষহীনদিগের জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়, চার্ব্বাকের এই কথা মিথ্যা?

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

—০—

আর্য্যনারীসমাজের কার্য্যবিবরণ।

দয়াময় ঈশ্বরের অপার করুণায় আমাদের আদরের আর্য্য-নারীসমাজের কার্য্য এই দুই বৎসর নানাবাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক রকম চলিয়া আসিতেছে। তবে যেমন হওয়া উচিত, ইহার আশানুরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ততদূর হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। মঙ্গলময় ভগবান্ কৃপা করিয়া ইহাকে চিরদিন সঞ্জীবিত রাখিয়া, ইহার শুভাকাঙ্ক্ষী স্নেহময় প্রতিষ্ঠাতার প্রাণের আশা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ইহার চির উন্নতি ও চির মঙ্গল বিধান করুন, ইহাকে নবজীবনপ্রদ ও শান্তিপূর্ণ দিব্য আনন্দময় করুন, ইহাই হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা।

গত দুই বৎসরে নানাকারণে ইহার অধিবেশন কিছু কম হইয়াছে। মোটের উপর এবার ১১টি অধিবেশন হইয়াছে। তাছাড়া জুবিলীর উৎসব ও প্রতি মাঘোৎসবের সময় আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব হইয়াছে। ইহার অধিবেশন কমলকুটীরে নবদেবালয়ে সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে একদিন শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশের সাদর আহ্বানে তাঁহার সুন্দর নূতন গৃহে অধি-বেশন হয়। প্রিয় ভগিনী মহারাণী সুচারু দেবী সুমিষ্ট উপাসনা করেন। অনেকগুলি ভগিনী উপাসনায় যোগদান করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন। আর দুই দিন আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে অধিবেশন হয়। তার মধ্যে প্রথম দিনে মহারাণী সুচারু দেবীর শরীর হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার সংবাদ উপা-সনার কয়েক ঘণ্টা আগে টেলিফোনে আসায়, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ সুমিষ্ট উপাসনা করেন। দ্বিতীয় বারের বালিগঞ্জের বাড়ীতে অধিবেশনে প্রিয় ভগিনী সুচারু দেবী সুমিষ্ট উপাসনা করিয়া সকলকে আনন্দ ও তৃপ্তি দান করেন। দুই দিনই অনেকগুলি ভগিনী অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া, উপাসনায় যোগদান করিয়া সুখী করেন। নবেম্বর মাসে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রিয় ভগিনী শ্রীমতী সরলা সেনের ভবনে আর্য্যনারী-সমাজের বিশেষ অধিবেশনে উপাসনা হয়। মহারাণী সুচারু দেবী সুমিষ্ট উপাসনা করেন। অন্যান্য সব দিন কমলকুটীরে নবদেবালয়ে অধিবেশনের উপাসনা হয়। মহারাণী সুচারু দেবী, শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র, শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ প্রভৃতি উপাসনার কার্য্য করেন। প্রতি অধিবেশনেই আনন্দময়ী জননীর নামগুণগান, পূজা উপাসনা, আরাধনা বন্দনা এবং ভক্তের প্রার্থনা ও উপদেশ পাঠে যোগদান করিয়া, সকলেই প্রাণে অতুল আনন্দ ও অসীম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। দয়াময়ী বিশ্বজননী, অনন্ত কৃপাগুণে তাঁর স্নেহের কন্যাদিগকে তাঁহার পূজা, উপাসনা, আরাধনা, বন্দনা, স্তোত্র গান করিবার অধিকার দিয়াছেন। তাই ভক্ত গাহিলেন, "মা, বলে ডাকিবার অধিকার চমৎকার। চরণে কাঁদিবার অধিকার চমৎকার"। করুণাময়ী মা দয়া করিয়া তাঁর পরম ভক্ত প্রিয়তম সন্তানকে দিয়া আমাদের পরিত্রাণের জন্য এই আর্য্যনারীসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে সকল ভগিনী একত্র সম্মিলিত হইয়া, দেখা শুনা করিয়া ও মার চরণতলে বসিয়া মার পূজা অর্চ্চনা করিয়া পরম সুখী ও ধন্য হইবেন, ইহাই চরম উদ্দেশ্য। অনেক বৎসর অতীত হইল, কোন এক শুভদিনে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এত দিনে ইহার যেরূপ উন্নতি হইবার কথা ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই, আশানুরূপ সুফল কিছুই ফলে নাই, বলিতে হইবে। ইহার প্রকৃত উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য এখন কি করা উচিত, তাহাই ভাবিবার বিষয়। মনে হয়, এই আর্য্যনারীসমাজের সভ্যসংখ্যা যত বেশী হয়, ইহার অনুষ্ঠান অধিবেশন উপাসনা প্রভৃতি যত বেশী হয়, ততই মঙ্গল। প্রতি পাড়ায়, দূরে নিকটে, দেশে বিদেশে ইহার শাখা প্রশাখা যত বেশী প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত হয়, ততই ভাল মনে হয়। আর্য্য-নারীসমাজের সভ্য যত ভগিনী ও কন্যাগণ, যিনি যখন যে দেশে যেখানে থাকেন, সেখানেই একটি করিয়া ক্ষুদ্র শাখা আর্য্যনারী-সমাজ স্থাপন করিয়া, সকল ভগিনীদের সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক ডাকিয়া আনিয়া, গান উপাসনা প্রার্থনা সদ্গ্রন্থ পাঠাদি করিয়া, যাহাতে সকলকে সুখী করিয়া, নিজে সুখী ও ধন্য হইতে পারেন, ইহাই সকলের নিকট কাতর প্রার্থনা ও একান্ত বিনীত অনুরোধ।

এখন আমাদের আর্য্যনারীসমাজের দুই বৎসরের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আয়—মহারাণী শ্রীমতী সুনীতিদেবীর মাসিক চাঁদা ২৬ টাকা হিসাবে—৫৭৬৲, মহারাণী সুচারুদেবীর ও অন্য সভ্যাদের চাঁদা—১৩১৲, আর পূর্ব্বের জমা টাকা ২৩৫৲, সবশুদ্ধ মোট আয়—৯৪২৲।

ব্যয়—দাতব্য ৪৩৮৲, দরোয়ানের বেতন ৯৬৲, অধিবেশনের গাড়ীভাড়া ৯০॥৵০, জ্ঞানদা দেবীকে তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে ঋণ শোধ ১০৲, জুবিলী উপলক্ষে খরচ ৩০।৵০, পুণ্যাশ্রমে ২৪৫৲। মোট খরচ ৯১০৲। ব্যয়বাদে বাকী জমা ৩২৲। আর মহারাণী সুনীতি দেবীর নামে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের খাতায় জমা—১০০৲।

আর্য্যনারীসমাজের ফণ্ডের জমান টাকা হইতে পুণ্যাশ্রম আরম্ভ করা হয়। প্রথম পাঁচ মাস মাসিক ৩০৲ করিয়া ১৫০৲ টাকা খরচ হয়। পরে ১৯মাস মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া খরচ হয়। এই সবশুদ্ধ ২৪৫৲, গড়ে মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া ধরা হইয়াছে। শ্রীমতী সরলা সেন তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর পুণ্যস্মৃতির জন্য ৪৲টাকা আর্য্যনারীসমাজে গরিব বিধবাদের কাপড় দিবার জন্য দান করেন। তাহাদ্বারা ৪ খানি কাপড় আনাইয়া, ৪ জন গরিব বিধবাকে দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ দাতাদের আশীর্ব্বাদ দান করুন, এই প্রার্থনা।

শ্রীসরলা দাস।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৬ই নবেম্বর, হাওড়ায়, ১৯নং কুঁচিল সরকারের লেনে, শ্রীমান্ সন্তোষকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার ভাগিনেয়, লক্ষ্ণৌর স্বর্গীয় নীলমণি দত্তের পৌত্র, শ্রীমান্ সর্ব্বাকান্ত দত্তের এক বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রের জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ উপাসনা করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে একটাকা দান করা হইয়াছে।

পাটনা হইতে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ লিখিয়াছেন:—বিগত ১লা নবেম্বর, রবিবার, প্রেরিত ভাই ঋষি কেদারনাথ দের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিমানবিহারী দের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে, পাটনার নিকটবর্ত্তী 'মনের' নামক প্রকৃতিশোভিত নির্জ্জন স্থানে ভগিনীগণ মিলিয়া বিশেষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নববিধান মিশন ফণ্ডে ১৲ দান করা হয়। ভগবান্ তাঁর প্রিয় পুত্রকে চির সুখী এবং চির ধর্ম্মী করুন।

জাতকর্ম্ম—গত ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর, রাঁচিস্থ মোরাবাদী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এক সুবৃহৎ প্রাসাদভবনে, হাবড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের পৌত্র, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকুমার দাসের নবজাত দ্বিতীয় শিশুপুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার উপাসনা করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ৮ই নবেম্বর, কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দের গৃহে, তাঁহার শিশুপুত্রের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "সত্যব্রত" নাম প্রদান করেন।

গত ১৫ই নবেম্বর, আলীপুরে ৩০নং নিউরোডে, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের ৭ম সন্তান শিশু-কন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন এবং শিশুকে "অমিয়া" নাম প্রদান করেন।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ৭ই নবেম্বর, কলিকাতায়, ৪৭।১নং থিয়েটার রোডে, স্বর্গগত শান্ত সাধক প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দের পৌত্র, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দের জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুশীলকুমার দের (আই, সি, এস,) সহিত, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দিরার শুভবিবাহানুষ্ঠান সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ এই নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন। এই শুভানুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবচ্চরণে-কৃতজ্ঞতা-দান—গত ৩রা নবেম্বর, ময়মনসিংহে, ব্রাহ্মপল্লীস্থ "মঙ্গলকুটীরে", শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুধীরকুমার দত্তের ইলেকট্রিক সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-লাভানন্তর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে, ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতাদানসূচক বিশেষ উপাসনা হয়। ডাঃ বৈকুণ্ঠনাথ রায় উপাসনা করেন। উভয় সমাজের গণ্যমান্য ব্রাহ্মবন্ধুগণ উপস্থিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ ও শ্রীমানকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—গত ১১ই নবেম্বর, রাঁচি নামকুমে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পবিত্র অনুষ্ঠান অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। নামকুমস্থ ও রাঁচিস্থ হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম অনেকগুলি ভাই ভগিনী এই অনুষ্ঠানে সমবেত হন। কলিকাতার ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন জলবায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ওখানে গিয়াছিলেন; তাঁহারই আকাঙ্ক্ষায় এই অনুষ্ঠান হয় এবং সকলের অনুরোধে তিনিই উপাসনা করেন। তাঁহার পুত্র ও কন্যা সঙ্গীত করেন। শ্রীমদাচার্য্যদেবের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রার্থনা পঠিত হয় এবং গৌরীবাবুও বিশেষ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতায় ১এ মন্মথ ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীটে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার নন্দ উপাসনা করেন। শ্রীমতী

বিন্দুবাসিনী সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী কিরণবালা সেন প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে পুরীতেও গজনীন আশ্রমে ভাই প্রিয়নাথের প্রবাসভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। স্থানীয় কয়েকটী ভাই ভগ্নী ব্যতীত কটক হইতে ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র বসু ও ভ্রাতা প্রফুল্লচন্দ্র বসু আসিয়া অনুষ্ঠানটীকে বিশেষ আনন্দময় করেন।

শারদীয় উৎসব—বারিপদা নববিধানসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—শারদীয় পূজার কয়দিন সেখানে স্থানীয় হিন্দু নরনারী ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া শারদীয় উৎসব হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের উপদেশাদি পাঠ এবং সেই ভাবে উপাসনা ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। শেষ বিজয়ার দিন প্রায় ৫০ জনকে উপাসনার পর মিষ্টিমুখ করাইয়া প্রীতিসংস্থাপন করা হয়।

ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা—সিন্ধু হায়দরাবাদের নূতন ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠোপলক্ষে, গত ৬ই নবেম্বর হইতে ১৩ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বিশেষ উৎসবানন্দের সহিত, ১০ই নবেম্বর, ব্রহ্মানন্দের সুকন্যা ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী কর্তৃক নূতন ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। তিনি সিমলা হইতে এই উপলক্ষে হায়দরাবাদ গিয়াছিলেন।

ভিত্তি-স্থাপন—শুভ ১লা নবেম্বর, পুরী নবশ্রীক্ষেত্রে, "নবশিশুকুটীরের" ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠান সুগম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালীন সামাজিক উপাসনার পর বিশেষ প্রার্থনাপূর্ব্বক, সচ্চিদানন্দরূপিণী, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারিণী, নবযুগ-ধর্ম্মনববিধান-বিধায়িনী জননীর শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, ভাই প্রিয়নাথ শ্রীমতী হেমন্তকুমারী মল্লিকের সহযোগে এই শুভানুষ্ঠান সম্পাদন করেন।

সমাধি-প্রতিষ্ঠা—গত ১৫ই নবেম্বর, করাচি ব্রহ্মমন্দিরের সংলগ্ন "নন্দকুটীরে" কর্ম্মযোগী নন্দলাল সেনের সমাধির উভয় পার্শ্বে মণ্ডলীর একনিষ্ঠ সেবক ও সেবিকা ডাঃ প্রেমদাস রুবেন ও আমিজির সমাধি-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানোৎসব মাননীয়া ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর নেতৃত্বে সুসমাহিত হইয়াছে।

কালীপূজা ও দীপালী—গত ৯ই নবেম্বর, পুরী ভিক্টোরিয়া ক্লাবে এই বিশেষ উপলক্ষে উপাসনা হয়; ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও একটি হিন্দু সন্ন্যাসী সঙ্গীত করেন। ক্লাবের অধ্যক্ষ ও প্রবাসিগণ ব্যতীত তথায় বিধবা আশ্রমের মহিলাগণ এবং আরো কতিপয় মহিলা যোগদান করেন। ক্লাব গৃহ আলোক-মালায় সজ্জিত করা হয় এবং বাজী পোড়ান হয়।

পারিতোষিক-বিতরণ—বাগনান নিত্যকালী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণোৎসব এবার বেশ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উলুবেড়িয়ার সাবডিভিশনাল অফিসার—মিঃ কে, বি, মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্রীদের সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয়াদি সবার প্রশংসনীয় হইয়াছিল। ছাত্রীদিগকে সচ্চরিত্রতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কার্য্যকুশলতা, নিয়মিত উপস্থিতি, চরকা কাটা, সঙ্গীত, অভিনয়ে পারদর্শিতা, গৃহকর্ম্ম ইত্যাদির জন্য বিশেষ পারিতোষিক বিভিন্ন নামে দেওয়া হয়। ভাই প্রিয়নাথের পত্নী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী মল্লিক এই বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা।

উৎসব—গিরিডি নববিধান ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার ষষ্ঠদশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, গত ২২শে অক্টোবর, ৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যায় আরতি হইয়া উৎসব আরম্ভ হয়। "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে, চল ভাই যাই সকলে" এই সঙ্গীত করিতে করিতে মন্দিরে প্রবেশানন্তর "জয় মাতঃ জয় মাতঃ" আরতির কীর্ত্তন হয়। তৎপর ভাই অক্ষয়কুমার লধ ব্রহ্মানন্দের আরতির প্রার্থনা পাঠ করিয়া ব্রহ্মারতি করিলে, "তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন" এই সঙ্গীত হইয়া অদ্যকার কার্য্য শেষ হয়। ডাঃ যোগানন্দ রায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সান্ত্বনা রায় অদ্যকার সঙ্গীতে নেতৃত্ব করেন। ২৩শে অক্টোবর, প্রাতে শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস সুন্দর উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় মহিলাদিগের উৎসবে ব্রহ্মানন্দের কন্যা শ্রীমতী মণিকা দেবী সুমধুর উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত শকুন্তলা সেন সুমিষ্ট প্রার্থনা করেন, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু সঙ্গীতে নেতৃত্ব করেন। অনেকগুলি মহিলা যোগদান করিয়া প্রাণে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ২৪শে অক্টোবর, দিনব্যাপী উৎসবে, প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে ডাঃ যোগানন্দ রায়ের গৃহে প্রীতি-ভোজন হয়। অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনার পর সন্ধ্যা ৬টার সময় সংক্ষেপ উপাসনানন্তর, হাজারিবাগের সেণ্ট কলম্বস কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ "ধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত" বিষয়ে, ধর্ম্মজগতের নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সমস্যার আলোচনার ভিতর দিয়া, সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন। ২৫শে অক্টোবর, প্রাতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। অপরাহ্ন ৫টায় বেথুন কলেজের অধ্যাপক হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রাভিজ্ঞ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুখেন্দুকুমার দাস "সত্য কি" এই বিষয়ে, হিন্দুদর্শন-সম্মত এক অখণ্ড অনন্ত অনাদি সত্য সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ সুন্দর বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করিয়া উৎসবের শান্তিবাচন করেন। এই কয়দিনই পাটনা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত সত্য-সুন্দর বসু সুমিষ্টকণ্ঠে সঙ্গীত করিয়া সকলের প্রাণে তৃপ্তিদান করিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৪ঠা নবেম্বর, ২নং ছকু খানসামা লেনে, শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ গুপ্তের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। কলিকাতায় ভাই বোন সকলে এবং জার্ম্মাণ হতে নবাগত কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিজয়শ্রী গুপ্ত জার্ম্মাণ-পত্নী সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষভাবে কনিষ্ঠপুত্র ও

তাঁর পত্নীর জন্য এবং পরিবারের সকলের জন্য মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গুপ্ত আকুল প্রাণে পিতৃদেবের ও শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন।

গত ৫ই নবেম্বর, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে, কলিকাতায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের গৃহে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে গিরিডিতে তৃপ্তি-কুটীরেও উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

গত ১৬ই নবেম্বর, কলিকাতায় ১এ মন্মথ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সরোজিনী চৌধুরীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে, পিসীমাতা শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেনের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। পিসীমা বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা চৌধুরী মাতৃদেবীর পূত চরিত্র ও বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করিয়া লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে এবং পৃথিবীস্থ তাঁদের স্বজনবর্গকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

এপ্রিল, ১৯৩১—শ্রীযুক্ত মতিরাম দয়ারাম আদ্‌ভানী মাসিকদান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের স্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত অমৃতচন্দ্র রায়ের পত্নীর সাম্বৎসরিকে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুষমা বসু ২৲ ও শ্রীমতী সুচারু বসু ২৲, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত কোয়ার পুত্রের নামকরণে ৫৲, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার পিতৃসাম্বৎসরিকে ৫৲, শ্রীযুক্ত বঙ্কুমার নিয়োগী ২৲, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত তের মাসের মাসিকদান ১৩৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী মাসিকদান ১৫৲, শ্রীমতী বামাসুন্দরী চন্দ স্বামী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দের অশীতিতম জন্মদিনে ৫৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার মাসিক দান ২৲, শ্রীমান্ অভয়চন্দ্র দাস নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্মে ২৲ এবং শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন খুড়ীমার আগ্যশ্রাদ্ধে ২৲ টাকা।

মে, ১৯৩১—মতিরাম দয়ারাম আদ্‌ভানি মাসিকদান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার দাস ৫৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের স্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র রায় পিসীমার সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী সুষমা বসু পিসীমার সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী সুচারু বসু পিসীমার সাম্বৎসরিকে ১৲, মিসেস ভক্তিসুধা হেমরাজ মাতৃসাম্বৎসরিকে ৪৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন I. M. S.) ৫৲, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত মাতৃ-সাম্বৎসরিকে ২৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী মাসিকদান ১৫৲, নববিধানট্রাষ্টের অন্তর্গত প্রসাদস্মৃতিভাণ্ডার হইতে ৭৲, ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲ ও শ্বশুরের সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত শিশুকন্যার জাতকর্ম্মে ২৲, শ্রীমতী সরলা ভড় মাতৃসাম্বৎসরিকে ২৲ এবং স্বর্গীয় রামলাল ভড়ের সাম্বৎসরিকে পুত্রগণ ৪৲ টাকা।

ভগবানের শুভাশীষ দাতাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়াশ্রম—গত ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর, শনিবার, সন্ধ্যাকালে, কুমিল্লায়, অধ্যাপক বিহারীলাল দত্তের নিজ বাড়ীতে, "সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়াশ্রম" নামে একটী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ বন্ধুগণ উপস্থিত হইয়া মিলিতভাবে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য নিম্নে দেওয়া গেল। আমরা এই আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

"আশ্রমের উদ্দেশ্য"।

এই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়াশ্রমে সকল একেশ্বর-বিশ্বাসী একত্র মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত তাঁহাদের সকলের উপাস্য এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন, এবং জাতি-বা-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলে পরস্পরকে সম্মান করিবেন। এখানে কেহ এমন কথা বলিবেন না, যাহাতে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ বুঝায়। এই আশ্রমে এমন সকল কার্য্য হইবে, যদ্দ্বারা পরমেশ্বরের প্রতি লোকের ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, জীবন এবং চরিত্র উদার ও উন্নত হয়, এবং লোকের মনে "পরমেশ্বর সকল লোকের একমাত্র পালন-কর্ত্তা,"—"মানব মাত্রই সকলেই পরস্পর ভাই" এই আদর্শ দৃঢ়তর ভাবে অঙ্কিত হয়।

নিবেদক দাস—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church. by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১লা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
2nd December, 1931.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩্

প্রার্থনা।

মা, শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব, তোমার নবশিশুর জন্মোৎসব। যদি এই জন্মোৎসব আনিলে, সাধন করাইলে, তবে এই সাধন যাহাতে সফল হয়, তাহা কর। তুমি ত সত্য মা, যাহা তুমি কর, তুমি করাও, তাহা ত কখনও মিথ্যা হয় না, বৃথা হয় না। কেশব-জন্ম নব-জন্ম, নূতন মানুষের জন্ম। আমাদেরও ত জন্ম তোমারই ইচ্ছাতে। তোমার ইচ্ছা-জাত যে সন্তান, সে সন্তান কেমন হয়, তাহাই ত দেখাইলে কেশব-জীবনে। মার গর্ভ হইতে বাহির হইলেন তিনি সহজে, মাকে গর্ভ-যন্ত্রণাটুকুও তুমি ভোগ করিতে দিলে না। দীক্ষা দিলে তাঁহাকে স্বয়ং গুরু হয়ে, প্রার্থনা-মন্ত্রে। সহজ সরল বিশ্বাস তাঁকে তুমিই দিলে এই প্রার্থনায়। আর সেই প্রার্থনার বলে তোমার কৃপাগুণে তাঁহাকে নাম দিলে ব্রহ্মানন্দ, গড়িলে ক্রমে ক্রমে তোমার নবশিশু করিলে তাঁহাতে তোমার নববিধান মূর্ত্তিমান। ঘোষিলেন তাই তিনি জগতে নববিধান জীবনাদর্শে। এসকলই ত, মা, তোমারই কৃপার পরিচয়। প্রার্থনা করিলে এমন হয়, যদি তুমি দেখাইলে, তবে দাওনা, মা, তেমনি করে প্রার্থনা করিতে। তিনিত প্রার্থনা করিয়া, কিছু না লইয়া, কিছু না পাইয়া, কিছু না হইয়া ছাড়িতেন না তোমাকে। ঈশা ঈশা বলি আমরা, তিনি তা চাহিতেন না। বলিলেন, যদি না আমরা ঈশাবৎ হই, সে নাম যেন না লই। তেমনি যদি না আমরা কেশববৎ হই, তবে আমরা কেশবের জন্মোৎসব করিলে যে কেবল অপরাধী হইব। তুমি তাই এবার আশীর্ব্বাদ কর, যাহা তিনি হইলেন, তাহা যেন আমরা হইয়া, যা চাহিলেন তাহাই চাহিয়া, তাঁর জন্মোৎসব সফল করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—•—

জন্মোৎসবের শিক্ষা।

নববিধানাচার্য্য নিজ জন্মদিনের প্রার্থনায় বলিলেন, "মা, আজ ত জন্মদিন। আর ইঁহাদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন," ইহার অর্থ কি? তাঁহার জন্মদিন আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন, একথা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এবং কেনই বা তিনি তাঁর জীবন্ত মার নিকট ইহা বলিলেন?

যিনি আপনার সম্বন্ধে বলিলেন, "এ ব্যক্তির প্রত্যেক ইচ্ছা ভয়ঙ্কর সত্যেতে পূর্ণ," তিনি কি কেবল একটা কথার কথা বলিলেন, তিনি কি তাঁর মার কাছে কেবল মৌখিক প্রার্থনা করিতে পারেন?

তবে কেন এ প্রার্থনা করিলেন? কেন না, তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার জন্মদিন আমাদেরও নব জন্মদিন; তিনি যে বিশ্বাস করিতেন, তিনি এবং আমরা এক। নববিধানে "আমি আমি" নাই। ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা নববিধানে নাই। তিনি একজন, আমি একজন, তাঁর এক ভোট, আমার এক ভোট, ইহা নববিধানের শাস্ত্রে নাই

তাই জন্মদিনের পূর্ব্বদিনের প্রার্থনায় স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "এঁদের বুঝিতে দাও যে, এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না, সব এক। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ; যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন। দয়াময়, এক কর, এক কর।"

এই বিধানাচার্য্যের সহিত একত্ব এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে একত্বের অনুভূতিই নববিধানের লক্ষণ। তাই বলিলেন, "দয়া করে নববিধানের লক্ষণগুলি বিবৃত কর। আমরা চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই।" অর্থাৎ জীবনে তাহা গ্রহণ করি।

বাস্তবিক যদি আমরা আপনাদিগকে নববিধান-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিতে চাই, তবে আমরা নববিধানাচার্য্যের সহিত বা প্রকৃত নববিধান-বিশ্বাসী কাহারও সহিত আপনাকে স্বতন্ত্র মনে করিতে পারি না। "সমুদয় মনুষ্য-সমাজ এক" ইহা প্রতিষ্ঠা করিতেই নববিধান সমাগত। যদি আমরা ইহা বিশ্বাস না করি, কেমন করিয়া আমরা নববিধান মানি বলিয়া পরিচয় দিব? নববিধান মানিতে হইলেই ইহা মানিতে হইবে, "ঈশ্বর এক, আমরা এক।" এবং এই সঙ্গে মানব-যোগ-সাধনও উপলব্ধি করিতে হইবে। এই যোগ অনুভব করিয়াই আচার্য্য বলিলেন, "আজ ইঁহাদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন", কেন না, "আজ আমার জন্মদিন।" কাজেই এঁদেরও নূতন জন্মলাভের দিন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগকে ঈশ্বরাবতার-বোধে অনুবর্ত্তিগণ তাহাদিগকে উচ্চজাতীয় ভাবিয়া, তাঁহাদিগের জীবন চরিত্র লাভ করা সম্ভব মনে করিতে পারেন নাই। তাহারা স্বয়ং ঈশ্বরজাত, ঈশ্বরগঠিত; কেমন করিয়া সাধারণ মানুষ, পাপী নরাধমগণ তেমন জীবন পাইবেন? এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, ঈশা গৌরাঙ্গ প্রভৃতিকে তাঁহাদের শিষ্যগণ পূজাই করিয়া আসিয়াছেন। নববিধান এই ভ্রান্ত সংস্কার পরিবর্ত্তন করিতেই অবতীর্ণ। তাই নববিধানাচার্য্য বলিলেন, "কেবল ঈশা ঈশা বলিলে চলিবে না, ঈশা হইতে হইবে"। তাঁহারা ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহারা আদর্শ মনুষ্য, "যাহা একজন মানুষ করিয়াছে, সকল মানুষ তাহা করিতে পারে" এই নীতি অনুসারে, যাহা মহাপুরুষগণ হইয়াছেন, তাহা মানুষমাত্রেই হইতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যেই বিধাতা তাঁহাদিগকে মানুষের আদর্শরূপে প্রেরণ ও গঠন করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রকেও অবশ্য ঈশ্বরই স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ-জীবনে গঠিত করিয়াছেন। আবার তিনিই তাঁহাকে আমাদের ন্যায় পাপী অধমদিগের সহিত সহানুভূতি-যোগে একত্ব অনুভব করাইয়া আমাদিগকেও তাঁর অঙ্গ রূপে স্বীকার করাইয়াছেন। বাস্তবিক আমরাও যে সহস্র পাপ অপরাধ ও দোষ দুর্ব্বলতা সত্বেও এই নববিধানের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি, ইহাও কি ঈশ্বর-কৃপায় নয়? আমরা কে কোথায় জন্মিয়াছি, কে কোন্ সঙ্গ সহবাসে গঠিত হইয়াছি, আবার কি আশ্চর্য্য অলৌকিক কৃপাবলে নববিধানের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িলাম, নববিধান পরিবারে স্থান পাইলাম, ইহা কি আমাদের নিজ তপস্যার ফলে হইল? না, ঈশ্বর-কৃপায় সংসাধিত হইয়াছে? আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিব, ইহা প্রত্যক্ষ ভগবানের লীলা।

যাহা হউক, যখন বিধাতা আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়া নববিধানের অঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছেন, তখন আমরা যে নববিধানাচার্য্যের সহিত সকই অঙ্গ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইংরাজীতে দল যে Body বা অঙ্গ বলিয়া উক্ত হয়, ইহা বেশ প্রযোজ্য শব্দ। যাহা হউক, ইহা যদি আমরা স্বীকার না করি, আমাদিগকে বলিতে হইবে, আমরা নববিধান স্বীকার করি না। যাঁহারা নববিধান স্বীকার করেন, তাঁহ[illegible] নববিধানাচার্য্য প্রার্থনা করিলেন, "আজ জন্মদিন, ইঁহাদেরও জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন।" অর্থাৎ নবজন্মের দিন বা পুনর্জ্জন্মের দিন।

আমরা পিতামাতা হইতে এক জন্ম লাভ করিয়াছি; নববিধানে আসিয়া আমরা পূর্ণ নববিধান-মূর্ত্তিমান জন্ম লাভ করিব, ইহাই আচার্য্যের প্রার্থনার মর্ম্ম। তাঁহার সহিত এক জন্মদিন আমাদিগেরও হইবে। পুরাতন জন্ম, পুরাতন জীবনের পরিবর্ত্তনে নূতন জন্ম। তাই এই জন্মদিন-সাধনের উদ্দেশ্য, আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। ইহার লক্ষণে তিনি বলিলেন, "আজ মুঙ্গেরের প্রত্যাগমন। সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম।

অন্ত গুরু-লাভ। অন্য ধর্ম্মের গুরুর ন্যায় নহে। এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস।"

এই প্রার্থনার গভীর তাৎপর্য্যের উপলব্ধি যদি আমাদিগের হইয়া থাকে, তবেই আমাদিগের এই জন্মদিনের সাধন আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। আচার্য্যের সহিত নববিধান-বিশ্বাসী আমরা সকলে যে একই শরীরের অঙ্গ, এই বিশ্বাস যদি আমরা লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলেই আমরা, যিনি এই সাধনের গুরু ও পথপ্রদর্শক, তাঁহাকে আমরা লাভ করিয়াছি এবং আমরা আর তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র আমি বা আমরা নই। মাথার সহিত হস্ত পদ যদি গাঁথা থাকে, হস্ত পদ মৃত বা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না; এঞ্জিনের সহিত যদি অন্য গাড়ী গাঁথা থাকে, এঞ্জিন যে পথে যায়, গাড়ীও সেই পথে যায়; তেমনি যদি আমরা নববিধানের মূর্ত্তিমান জীবন পাইতে চাই, তবে যিনি সে জীবন পাইয়াছেন এবং যিনি জীবনে সকলকে গাঁথিয়া লইয়া কেমন করিয়া অংশু মানব হইতে হয় তাহা দেখাইবার গুরু হইয়াছেন, তাঁহার সহিত আমরাও যোগে সংযুক্ত, ইহা অনুভব করিব এবং এক অঙ্গ যেমন অন্য অঙ্গের সহিতও সংযুক্ত অনুভব করে, তেমনি আমরাও অনুভব করিব। অন্যথা আমরা নববিধানের পরিত্যক্ত বস্তু হইব। বাহিরে শরীরের যোগ না থাকিলেও, একজন এদেশে, একজন অন্যদেশে থাকিলেও, ইহা যে হইবে না, তাহা নহে; বিশ্বাসে এক হইলেই হইবে।

এই বিশ্বাসের আরো লক্ষণ, সঙ্গতের [illegible] নীতি আমাদের অবলম্বনীয় হইবে এবং মুঙ্গেরের [illegible] যোগে ভক্তসঙ্গে, ভক্তদল-সঙ্গে ভ্রাতৃ-প্রেমে মাখামাখি চলিবে, এবং নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্মযোগ অনুভূত হইবে। যাহাতে "ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে (ঈশ্বরকে), ষোল আনা বিশ্বাস বিধানকে, ষোলআনা বিশ্বাস প্রত্যাদেশকে ও ষোল আনা বিশ্বাস ভক্তকে" দিয়া আমরা স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি, মা এই আশীর্ব্বাদ করুন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা আমাদের প্রতি জীবনে পূর্ণ হউক।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পাপরোগের ঔষধ।

রুগ্ন স্তন্যপায়ী শিশু তিক্ত ঔষধ সেবন করিতে পারে না, তাই মা নিজে তিক্ত ঔষধ সেবন করিয়া শিশুকে মিষ্ট দুগ্ধ পান করান, তাহাতেই রুগ্ন শিশুর রোগ আরোগ্য হয়। মাতৃ-স্নেহ এতই গভীর ও মধুর। ব্রহ্মনন্দন ঈশাও এই আদর্শ অবলম্বনে পাপী মানবের জন্য ক্রুশ বহন করিলেন। আপনি পাপের যন্ত্রণা অনুভব করিলেন, পাপীর জন্য ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিলেন। তাই তাঁহার প্রার্থনার ফলে মৃত লাজারস বাঁচিয়া গেল, কত পাপীর উদ্ধার হইল। অন্যের পাপ-রোগ-মোচনে যদি আমরা যথার্থ ব্যাকুল হই, আমরা আপনারা পাপ-রোগ হইতে মুক্ত হইয়া যদি প্রার্থনা-দুগ্ধ পান করাইতে পারি, তবেই অন্যের পাপ-মোচনে সক্ষম হই। কেবল উপদেশে বা তীব্র তিক্ত ঔষধদানে আমরা কাহারও পাপ নিবারণ করিতে পারি না, বা কাহাকেও ভাল করিতে পারি না।

ভাইফোঁটা।

ভাই মহিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:—"তুমি জনক জননী, নরনারী ভাই ভগিনী, প্রেমধনে কর মা ধনী, সবায় লব হৃদে টানি; প্রেমভরে দিলে আলিঙ্গন, দেখি একাকার সবাকার তোমাতে মিলন।" এই মিলন যে দেখে, সেই ভাইফোঁটা দিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। বৎসরে দ্বিতীয়া তিথি বহুবার আসে; কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কার্ত্তিকের গভীর অমাবস্যার পরে আসে। কেন না, সাধকের নিকটে অমাবস্যার নিশীথ উপাসনায়, সৃষ্ট যোগপ্রলয়ে বিলীন হইয়া গিয়া, উপরে একমাত্র আদ্যাশক্তিরূপ জননী থাকেন এবং নীচে একমাত্র ব্রহ্মসন্তান মার পাদপদ্মে মাথা রাখেন। সুতরাং ব্রহ্ম সন্তান সাধক [illegible] ও জীবের সঙ্গে এক হইয়া যান। এই যোগের পর সাধক [illegible] অবতরণ করিয়া সকল নরনারীকে বলেন, "[illegible] এবং তোমরা ও আমি এক।" এজন্য ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমি এবং আমার ভ্রাতা এক।" পুনরায় বলিলেন, "উপরে একমেবাদ্বিতীয়ং পিতা, আর নীচে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পুত্র।" আমরা পরস্পরকে জননীর কোলে দেখিয়া এবং সকলে যে পরস্পর আর নাই, এক হইয়া মার কোলে স্থিতি করিতেছে, তাহা অনুভব করিয়া ধন্য হই।

দুর্গোৎসবের মর্ম্মকথা।

ভাই বিহারীলাল লিখিয়াছেন:—জীবাত্মা পাপ কলুষে নিমগ্ন হইলে স্বর্গভ্রষ্ট হয়। পাপাসুর হৃদয় মন অধিকার করে। ইচ্ছা না করিলেও পাপ-কল্পনা, পাপ-প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। জীব প্রবুদ্ধ হইয়া পাপাসুর হইতে মুক্ত হইবার জন্য মায়ের নিকট উপস্থিত, এবং মাতার স্নেহ করুণা সম্ভোগ করিয়া সৌভাগ্যশালী হইতে চায়। আত্মা পাপের অধিকার হইতে নিজকে স্বাধীন করিতে পারে না। তখন মা ভক্ত-সিংহ সহ উপস্থিত হইয়া অসুরের স্কন্ধে পা দিয়া কেশে ধরেন, অসুর আর

নড়িতে পারে না, তার বক্ষে ত্রিশূলী বিঁধিয়া দিয়া অসুরকে সংহার করেন। তখন জীব মহাসাধনা আনন্দময়ী মায়ের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করে এবং জ্ঞান-সরস্বতী লাভ করে এবং যাহা কিছু ধন ধান্য সৌভাগ্য প্রয়োজন, এই লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করে, জয়শ্রী-লাভে বাধা বিঘ্ন অতিক্রান্ত হইয়া কার্ত্তিকের বীরত্ব লাভ হয়, এবং সর্ব্বজীবে মৈত্রী এই গণেশত্ব প্রাণের ধর্ম্ম হয়। প্রকৃত উপাসনা হইলে সাধকের এই সব লক্ষণ হয়।

—•—

ব্রহ্মানন্দের জন্মদিনে।

নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের জন্মদিনে আমরা কোন্ তীর্থে উপস্থিত? আমরা কি জন্মদিনের গভীর অর্থ বুঝিয়াছি? হিন্দু-পরিবারে জাত সন্তানের জন্মদিনে সন্তানের সমক্ষে দীপালোক রক্ষিত হয়। সে দীপালোকের নিগূঢ় অর্থ কয়জন উপলব্ধি করেন? রজনীর অন্ধকারে দীপালোক যেমন সে অন্ধকার বিনাশ করিয়া সম্মুখের বস্তু দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ জাত সন্তানের সম্মুখে রক্ষিত আলোক সন্তানের অভ্যন্তরস্থ জন্মদাতা পরম কারুণিক বিধাতাকে দেখাইয়া দেয়। গৃহবাসী সেই সন্তানকে সুযত্নে ও সাগ্রহে প্রস্তুত পরমান্নাদি ভোজন করিতে দেন। সেই পরমান্নও নিগূঢ় অর্থ-সূচক। সন্তানের ভিতর বিধাতা যে পরমান্ন বিধান করিয়াছেন, তাহাই সন্তানের এবং গৃহবাসী সকলের সেব্য বস্তু। ব্রহ্মদর্শী ব্রাহ্মগণ কি নববিধানে নবশিশুর জন্মদিনে সেই দর্শন ও সেই পরমান্ন-সেবন প্রভৃতি সম্ভোগ করিবেন না? তাঁহার সম্মুখে নববিধান-জননী যে প্রেম, পুণ্য, বিবেক, বৈরাগ্য ও বিশ্বাসের পঞ্চালোক জ্বালিয়াছেন, তাহা কি এই তীর্থে দর্শনীয় নহে? নবশিশুর ভিতরে যে মহাসাধনের পরমান্ন বিধান করিয়াছেন, তাহা কি আমাদের সেবনীয় নয়? এ আলোক-দর্শন ও এ অন্ন-সেবন ব্যতীত আমাদের নববিধানের কোন্ তীর্থ সম্ভব হইবে? নববিধানে নবজাত নবশিশু বাহিরের বস্তুর জন্য আসেন নাই।

আমরা তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। আমরা কি সে স্বীকারের অভিধান বুঝিয়াছি? যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন এবং যিনি ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠানে নিরত চলিতে থাকেন, তিনিই আচার্য্য। নববিধানের ভক্ত এবং নববিধান-সাধনায় সিদ্ধ বিশ্বাসী ও বিবেকিগণ সেই নববিধানাচার্য্যের ভিতরে এই সমস্তের প্রতিষ্ঠান দেখিয়া এবং তাঁহার পথের পথিক হইয়া, তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া বরণ করিলেন। আজ আমরা কি সে দর্শনের দিকে চলিয়াছি? আজ আমরা কি সে আচার, সে অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছি? ব্রহ্মানন্দের জন্মদিনের শেষ নাই। যিনি প্রতিদিন নবজন্ম ও নব সাধনায় নূতন জীবন লাভ করিবেন, তিনিই সত্য ব্রহ্মানন্দের জন্মতীর্থের যাত্রী। "Out of the old cometh the new." Put off the old and put on the new." "পুরাতন হইতে নূতন" এবং "পুরাতন ছাড়িয়া নূতন পরিধান" ইহারই ভিতর ব্রহ্মানন্দের জন্ম। তাই বলিতেছি, তাঁহার জন্মের শেষ নাই। আমরা কই সে পথ ধরিতে পারিলাম? অণ্ডের ভিতর যতক্ষণ পক্ষি-শিশু থাকে, ততক্ষণ সে পক্ষী নহে। অণ্ডের ভিতর হইতে যখন পক্ষযুক্ত হইয়া বাহির হয় এবং মুক্তাকাশে উড়িতে থাকে, তখন সে পক্ষী। নববিধানের পাখী কই? ঐ শুন, নববিধানের পাখী কি বলিতেছেন। উড্ডীয়মান নববিধানপক্ষী বলিয়া যাইতেছেন, "The little bird 'I' has soared away, I know not where." এ পাখী না হইলে জীবনে নববিধান হইল না। নববিধানের যাত্রী! যদি তীর্থে আসিয়াছ, তবে পাখীর ভাষা শিখিয়া লও ও পাখীর মন্ত্রে দীক্ষিত হও। এই মন্ত্রে ও এই দীক্ষায় ব্রহ্মানন্দ-তীর্থ।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

বেদের সার্ব্বজনীনতা এবং অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ।

২। বেদের বিরুদ্ধে গীতার অভিযোগ।

তবে দেহাত্মবাদী বলিয়া হয়ত বেদের বিরুদ্ধে চার্ব্বাকের অভিযোগকে অনেকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু বেদের বিরুদ্ধে ভগবদ্গীতা যে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন, তাহা কি করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়? গীতা বলিতেছেন, "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষ-বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥" ২—৪২, ৪৩॥ "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥" ২—৪৫॥ "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে॥ তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" ২—৪৬॥ আবার:—"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান॥ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" ৯-২০-২১॥ সে যাহা হউক, গীতার এই সকল অভিযোগ কিন্তু কর্ম্মমার্গীদের বিরুদ্ধে, যাঁহারা বলেন—"অগ্নিহোত্রং স্বর্গো ভবতি" "স্বর্গকামো যজেত", "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং", (জৈমিনীয় মীমাংসাদর্শনং ১-১-২; ১-২-১)—"অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গলাভ হয়," "যে স্বর্গকামনা করিবে, সে যজ্ঞ করিবে," "যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদনই বেদের লক্ষ্য;—যে সকল বেদবাক্যের যজ্ঞাদি ক্রিয়া লক্ষ্য নয়, সে সকল বৃথা।" গীতার এই অভিযোগ কেবল মাত্র যজুর্ব্বেদকেই লক্ষ্য করিতেছে। "বেদানাং সামবেদোঽস্মি," [১০—২২] ঋগ্বেদ নামে কোন বেদ ছিল, গীতাপাঠে তাহা

বুঝা যায় না। যদিও ঋগ্বেদ থাকিয়া থাকে, তাহার সহিত যে গীতাকারের কি সমসাময়িকদের বিশেষ পরিচয় ছিল, অথবা গীতারচনার সময়ে নামে মাত্র বর্ত্তমান থাকিলেও "ঋক্‌সামযজু-যজুরেবচ" [৯ ১৭] শব্দ যে হারাইয়া যায় নাই, গীতাপাঠে তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা সরল ভাবে স্বীকার করিতেছে, "যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তৎ, যদৃচা তদ্দৃঢ়ং" (৬-৫ ১০-৩); শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণও বলিতেছেন, "ঋচো বেদঃ" (১৩-৪-৩-৩)—"ঋক্ সকলই বেদ"। গীতাকারের ঋগ্বেদকে মুছিয়া ফেলিবার কারণ দেখা যায় না। তাঁহার সময়ে যজুর্ব্বেদ, বোধ হয়, একমাত্র বেদ বলিয়া গণ্য হইত।

শঙ্করাচার্য্য যে ঋগ্বেদ স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহার সূত্রভাষ্যে তিনি ঋগ্বেদের যে বর্ণনা দিয়াছেন:—"অনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্য বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতো ঋগ্বেদাখ্যস্য"—এ স্থলে যে তিনি "দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যের মধ্যে বর্ণাশ্রমবিভাগের কারণ" মনে করিতেন, তাঁহার এই কথাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। হাতের লেখা পুঁথি, কোন দেশ-বিশেষে বা কালবিশেষে চাপাইয়া থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সে যাহা হউক, গীতাকার যজুর্ব্বেদকেই একমাত্র বেদ মনে করিলেও, আমরা বেদের বিরুদ্ধে গীতার অভিযোগ উড়াইয়া দিতে পারি না। চার্ব্বাকের অভিযোগের সহিত গীতার অভিযোগের তুলনা করিলে, আমরা একথা বলিতে বাধ্য যে, বেদের বিরুদ্ধে চার্ব্বাকের অভিযোগ যেমন অকুটিল ও তীব্র, গীতার অভিযোগ কিন্তু সেরূপ নয়। "সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে"—গীতার অভিযোগের ভিতরে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। "যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মেতে আসক্ত, সেই সকল অজ্ঞানী লোকদিগের মনে সংশয় জন্মাইবে না"—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" (গীতা, ৩—২৬), ইহাই গীতার উপদেশের সার। বস্তুতঃ যজুর্ব্বেদের বিরুদ্ধে বুদ্ধের প্রতিবাদই যথার্থ প্রতিবাদ, এবং তাহা অকুটিল ও তীব্র। বুদ্ধ বলেন:—"ন চাহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং"—"ব্রাহ্মণ-জাতি হইতে উৎপন্ন কিম্বা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত বলিয়া আমি কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলি না, "বাহিতপাপো তি ব্রাহ্মণো"—"পাপ হইতে যে মুক্ত, সেই ব্রাহ্মণ" (ধম্মপদ, ব্রাহ্মণবগ্গো—৬, ১৪)। আবার বুদ্ধ বলিতেছেন:—"মাসে মাসে সহস্সেন যো যজেথ সতং সমং। একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে। সা এব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্সসতং হুতং।" (সহস্সবগ্গো—৭) "যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া সহস্র পদার্থ দ্বারা মাসে মাসে যজ্ঞ করে, এবং সেই ব্যক্তিই যদি অন্য একজন সংযতাত্মা ব্যক্তির মুহূর্ত্তমাত্র সেবা করে, তবে সেই শত বৎসরব্যাপী হোম অপেক্ষা সেই সেবাই শ্রেষ্ঠ।" "যো চ বস্সসতং জন্তু অগ্গিং পরিচরে বনে। একঞ্চ ভাবিতত্তানং" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ (সহস্সবগ্গো—৮, ৯)॥ সে যাহা হউক, গীতারচনাকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের প্রশ্ন করিতে হইতেছে, বেদ কয়টি, এবং কি কি?

৩। ঋগ্বেদই একমাত্র বেদ।

ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, পৃথিবীতে খ্রীষ্টানেরাই আপন ধর্ম্মপুস্তক স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করিয়া এবং প্রতি রবিবারে তাহার উপদেশ সকল সাধারণকে বুঝাইয়া, তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থকে সজীব রাখিয়াছে। তাহার ফল দেখা যায়, পৃথিবীতে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। অপরদিকে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, পৃথিবীতে হিন্দু যেমন তাহার ধর্ম্মপুস্তক বেদকে লোপ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া, কেবল মাত্র পৌরাণিকদিগের সেবায় ব্যস্ত আছে, এমন আর কেহই নয়। তাহার ফল ইহাও দেখা যায় যে, হিন্দুর মতন অধঃপতন পৃথিবীতে অন্য কোন জাতির হয় নাই। বেদ কয়টি? আপামর সকলেই বলিবে, বেদ চারটি; অথচ কেহই চৌদ্দপুরুষের মধ্যেও কোন বেদের মুখ দেখে নাই, এবং সে জন্য কাহারো মনে কোন বাধাও নাই! অথর্ব্ববেদকে অনেকে বেদ বলিয়া স্বীকার করে না। তাহাদের মতে বেদ তিনটি—বেদ ত্রয় বা ত্রয়ী, "ঋক্সামযজুরেবচ" গীতা॥ ৯—১৭॥ বেদ নিজে কি বলে? আমরা দেখাইয়াছি যে, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছে—"ঋচো বেদঃ" (১৩—৪—৩—৩), এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা বলিতেছে, "যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তৎ, যদৃচা তদ্দৃঢ়ং" ॥ ৬—৫—১০—৩॥ ঋক্ই যে বেদ, সে বিষয়ে তবে কোন সংশয় নাই। বস্তুতঃ আমরা, এমন কি স্বামী দয়ানন্দও, মোক্ষমূলারের কৃপায় যে ঋগ্বেদ পাইয়াছি,—তাহাও ঋগ্বেদের একটি শাখা মাত্র (শকল) ঋগ্বেদের অপর শাখা (বাস্কল) লোপ হইয়া গিয়াছে। যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের বেদত্বের মূল কারণ এই যে, এ উভয়ের মধ্যে অনেক অমূল্য ঋক্‌মন্ত্র সকল উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহার অনেকগুলি বর্ত্তমানে প্রকাশিত ঋগ্বেদেই নাই। সম্ভবতঃ লুপ্ত বাস্কল শাখাতে ছিল।

যাহা হউক, বেদ কয়টি, এ প্রশ্নে উত্তরে ঋগ্বেদ কি বলিতেছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে আমাদের জানা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষ-সূক্তে বলা হইতেছে:—"তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥" ১০—৯০—৯॥ ইহাতে দেখা যায়, এ স্থলে ঋকের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে কেবলমাত্র সামবেদেরও উল্লেখ; অনুষ্টুপাদি ছন্দেরও পরে "যজুর" উল্লেখ। ঋগ্বেদে কোথাও বেদবর্গের নামরূপে 'যজুঃ' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদে যজুঃ শব্দ অষ্টম মণ্ডলে একবার [৮—৪১—৮] ব্যবহৃত, এবং দশম মণ্ডলে চারিবার ব্যবহৃত। তাহার পূর্ব্বে কোন মণ্ডলে 'যজুঃ' শব্দেরই ব্যবহার নাই। অষ্টম মণ্ডলে "নিষদাস্থ যজুর্বিদে—সায়নাচার্য্য 'যজু' অর্থ করিতেছেন 'দান' 'প্রজাভ্যো দানং নিদধে বিদধাতি।'

দশমমণ্ডলেও যজুঃ অর্থ "দান"—'বিশ্বে দেবা অনু তৎ বো যজুঃ গুঃ" (১০—১২—৩)—সায়নই অর্থ করিতেছেন—"তে তব সংবর্দ্ধ তন্যজুঃ উদকস্য তন্দানং অনুগুঃ অনুগায়ন্তি।" "যজুরাগামিষ্টঃ" [১০-১০৬-৩] সায়নই 'যজুঃ' অর্থ করিতেছেন—"যজুঃ যজনৌ অস্মদীয়ো আগমিষ্টঃ"—(হে অশ্বিনৃদ্বয়) "আমাদের যজ্ঞে আগমন কর"। 'যজুঃ' অর্থ 'যজ্ঞ' করিতেছেন, কোন বেদের নাম, এরূপ অর্থ করেন নাই। আর ঋগ্বেদের শেষেও 'যজুঃ' শব্দের অর্থ সায়ন করিতেছেন:—"যজুর্যাগসাধনং" ॥ ১০-১৮১-৩॥ এমন কি, "ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত" ॥ ১০—৯০—৯॥ পুরুষসূক্তের এই ঋকের বেলায় "তস্মাদাজ্ঞাৎ ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি যজ্ঞিরে তস্মাৎ যজ্ঞাৎ যজুরপ্যজায়ত." বলিয়া সায়ন নিরস্ত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থলে "যজুঃ" শব্দের ব্যবহারদৃষ্টে, সায়নও 'যজুঃ' শব্দের অর্থ কোন 'বেদবিশেষের নাম' করিতে সাহসী হন নাই। বস্তুতঃ ঋগ্বেদে 'যজুঃ' অর্থ দান, অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

ঋগ্বেদ এবং সামবেদই প্রকৃত বেদ। সামগানের উল্লেখ ঋগ্বেদের প্রথম হইতেই অনেক স্থানে দেখা যায়:—"প্রবো মহে মহি নমো ভরধ্বমাঙ্গূষ্যং শবসানায় সাম"॥—১—৬২—২॥ "তোমরা মহাশক্তি ইন্দ্রের জন্য উচ্চ স্তোত্র উচ্চারণ কর, কীর্ত্তন-যোগ্য (রথন্তরাদি) সাম উচ্চারণ কর।" "গায়ৎসাম নভন্যং যথা বেরর্চাম" (১—১৭৩—১).—"হে ইন্দ্র, (উদ্গাতা) নভোব্যাপী সামগান করিতেছে, যেন তুমি তাহা জানিতে পার।" "শকুন্তঃ উভে বাচৌ বদতি সামগা ইব গায়ত্রঞ্চ ত্রৈষ্টুভং চ॥ উদ্গাতেব শকুনে সাম গায়সি॥ ২—৪৩—১,২॥ "শকুন সামগানকারী উদ্গাতার ন্যায় গায়ত্র ও ত্রৈষ্টুভ উভয় ছন্দের সামগান করিতেছে। হে শকুন, তুমি উদ্গাতার ন্যায় সামগান করিতেছ।" অষ্টম মণ্ডলে বলা হইয়াছে:—"অর্চন্ত্যেকে মহি সাম" (২৯—১০) "কেহ কেহ মহা সামমন্ত্র কীর্ত্তন করেন," "শ্রবৎসাম গীয়মানং" (৮১—৫)—"(ইন্দ্র) গীয়মান সাম শ্রবণ করুন"; "ইন্দ্রায় সাম গায়ত" (৯৮—১)—"ইন্দ্রের উদ্দেশে সাম গান কর।" বস্তুতঃ সামবেদকে ঋগ্বেদের একখানি সঙ্গীত-সংগ্রহ বলিলে অন্যায় হইবে না; কারণ সামবেদের সূক্ত সকলের অধিকাংশই ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডল হইতে গৃহীত, দেবতা "পবমানঃ সোমঃ।" পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া ঠিক্ করিয়াছেন যে, সামবেদের মোট ১৫৪৯ মন্ত্রের মধ্যে ৭৮টি মন্ত্র ভিন্ন সমস্তই ঋগ্বেদে আছে। ঐ ৭৮টি মন্ত্রও হয়ত ঋগ্বেদের লুপ্ত (বাস্কল) শাখাতে ছিল। অতএব ঋগ্বেদ এবং সামবেদকে একবেদরূপে গণ্য করা অন্যায় হইবে না। তাহা হইলে শতপথ ব্রাহ্মণের কথা—"ঋচো বেদঃ" "ঋক্ সকলই বেদ"—ঠিক্ দাঁড়ায়।

আমরা দেখাইয়াছি, চার্ব্বাকের অভিযোগ এবং ভগবদ্গীতার অভিযোগ উভয়ই তাহাদের সময়ে প্রচলিত যজুর্ব্বেদের বিরুদ্ধে। বেদ যদি এক হইল, এবং ঋগ্বেদই যদি সেই একমাত্র বেদ হইল, তবে চার্ব্বাক্ অথবা গীতার অভিযোগ প্রকৃত বেদ বিরুদ্ধে বলা সম্পূর্ণ ঠিক্ হয় না; যদিও ঋগ্বেদের শেষভাগেই অধঃপতনের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়, যাহা দেখিয়া ঋষি বিশ্বকর্ম্মা দুঃখের সহিত বলিতেছেন:—"ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥" ১০-৮২-৭॥ "তাঁহাকে তোমরা জান না, যিনি এই সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন! তোমাদের অন্তরই অন্য রকম হইয়া গিয়াছে! কুজ্ঝটিকাতে তোমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়াতে তোমরা নানাপ্রকার জল্পনা করিয়া বেড়াও! কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের লোভে তোমরা ঈশ্বরের স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া ভ্রমণ কর।" বস্তুতঃ ঋগ্বেদের শেষ ভাগেই দেখা যায়, পুরোহিতদিগের দক্ষিণার লোভ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ঋষি দক্ষিণার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন:—"উচ্চা দিবি দক্ষিণাবন্তো অস্থুর্যে অশ্বদাঃ সহ তে সূর্য্যেণ। হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে বাসোদাঃ সোম প্রতিরন্ত আয়ুঃ॥ দক্ষিণাবান্ প্রথমো হূত এতি দক্ষিণাবান্ গ্রামণীরগ্রমেতি। তমেব মন্যে নৃপতিং জনানাং যঃ প্রথমো দক্ষিণামাবিবায়॥" ১০—১০৭—২,৫॥ ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে বশ (৮—৪৬ সূক্ত) প্রভৃতি ঋষিগণ পৃথুশ্রবা প্রভৃতি রাজাদিগের নিকট হইতে যে দক্ষিণা পাইয়াছেন, "ষষ্টি সহস্র অযুত অশ্ব, বিংশতি শত উষ্ট্র," ইত্যাদির তালিকা দেখিলে চক্ষু স্থির হয়। তাহা পাইয়া ঋষিরা রাজাদের কিরূপ তোষামোদ করিয়াছেন, "তুমি প্রভূত ধনদাতা, তোমার স্তুতি করিতেছি, তুমি মহা ধনদাতা, এখনই তোমার স্তুতি করি" (৫), তাহা পাঠ করিয়া একালের—"The learned pate ducks to the golden fool" মনে হইয়া ঘৃণারই উদ্রেক হয়। যে ঋষিদের আদর্শ ছিল—"মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজং।" ২—২৮—৯॥—"হে বিশ্বরাজ, আমি যেন পরের পরিশ্রমের ফল ভোগ না করি," অথবা যাঁহাদের আদর্শ ছিল:—'পরি চিন্মর্ত্তো দ্রবিণং মমন্যাদৃতস্য পথা নমসা বিবাসেৎ' ॥ ১০—৩১—২॥ "মানুষ নিয়ত ন্যায়ের পথে থাকিয়া ধন কামনা করিবে, এবং ধন লাভ হইলে তদ্দ্বারা জনসমাজের সেবা করিবে"—তাঁহাদের এই শোচনীয় পরিণাম! ব্যাপার কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

আমাদের শৈশবে নবীনাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ।

অনেক দিন হইতে মনের ভিতর একটা আবেগ আসিতেছিল যে, আমাদের বাল্য জীবনে নবীনাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে যাহা

কিছু বুঝিয়াছিলাম, তাহার একটু আভাস আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করি। আজ তাই একটু লিখিতে আসিলাম। যখন আমি ক্ষুদ্র শিশু, তখন হইতেই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কলিকাতায় কলুটোলার বাটীতে যখন ব্রহ্মানন্দ বাস করিতেন, তখন আমি ও আমার ভাই ভগ্নীগণ ঐ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী নীলমাধব সেনের লেনে একটা বাড়ীতে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে বাস করিয়া আসিতেছিলাম। সেই সময়ে পিতামাতার সঙ্গে আচার্য্যদেবের নিকট উপস্থিত হইতাম। একদিকে যেমন আচার্য্য-পরিবারের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজের যোগেও বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে সময়ে যখন আচার্য্যদেবকে দেখিতাম, তখন তাঁহাকে এক নূতন মানুষ বলিয়া মনে হইত। সাধারণ জনমণ্ডলীকে যেরূপ দেখিতাম, তাঁহাকে তাহা হইতে এক স্বতন্ত্র মানুষ বলিয়া মনে হইত। কেন এরূপ মনে হইত, তখন তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিতাম না। তিনি পিতামাতার সঙ্গে যে ভাবে আলাপ করিতেন, সে ভাবের ভিতরেও সেরূপ প্রবেশ করিতে পারিতাম না। এ অবস্থার পর যখন আচার্য্যদেব-প্রতিষ্ঠিত Native Ladies Normal School এ পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলাম, তখনও তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখনও তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে একটা নূতনত্ব অনুভব করিতাম। এই সময়ে কলুটোলার বাড়ী হইতে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ঐ স্কুলে যাইতেন। অবশ্য শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী সুনীতি দেবী আমার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন। এই সময়ে তিনি, ভগিনী সাবিত্রী দেবী, মনোরমা দেবী কিশোরী দেবী প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ে আমার সম-সাময়িক সহাধ্যায়িনীরূপে একটী সুন্দর ভগিনীদলে পরিণত হইয়াছিলেন। ভগিনী মোহিনী দেবী ও ভগিনী চারুবালা দেবী এই বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। ভগিনী সুনীতি দেবী যখন কলুটোলার বাড়ী হইতে স্কুলে যাইতেন, তখন তাঁহারই গাড়ীতে আমাকে লইয়া যাইতেন। সে সময়ের সে সুন্দর জমাট ভাব এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা অস্ফুট আভাস হৃদয়ের ভিতর আসিয়াছিল। এই আভাস একেশ্বরবাদ। ঈশ্বর এক এবং সমগ্র মানব-জাতি ভাই ভগিনী, এইরূপ একটা নবীনালোক জীবনের ঊষাকালে দেখা দিয়াছিল। নববিধানতত্ত্ব সেরূপ বুঝি নাই। ভক্তি-ভাজন আচার্য্যদেবের জীবন ও পথ যে একটা নূতন ও বিশেষত্ব-পূর্ণ, এটুকু অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে যখন বিবাহ হইয়া গেল, তখনও শিক্ষা-স্পৃহা হৃদয়ে খুব বলবতী ছিল। এই সময়ে আমাদের Native Ladies Normal School নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছিল। তখন এই বিদ্যালয় Victoria Institution নামে আখ্যাত হইল। এই সময়ে Senior ও Junior class নামে দুইটী বিশেষ শ্রেণী স্থিত হইয়াছিল। Senior class এ ইংরাজীতে সেক্সপিয়ার ও মিল্টন প্রভৃতি বিখ্যাতনামা কবিদিগের গ্রন্থ এবং সেই শ্রেণীর উপযোগী অন্যান্য ইংরাজি ও বাঙ্গলা গ্রন্থও পড়ান হইত। Junior class এ "Imitation of Christ" "Ancient Prallads and Legends of Hindusthan" প্রভৃতি ইংরাজি গ্রন্থ এবং বাঙ্গলায় সীতার বনবাস, পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগ এবং ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। আমি এবং ভগিনী চারুবালা Junior class এ পড়িতাম। এই নূতনভাবে গঠিত বিদ্যালয়ের উপযোগী পরীক্ষার প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা উভয়েই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম এবং আচার্য্যদেব-স্বাক্ষরিত সর্টিফিকেট পাইয়াছিলাম। ভগিনী চারুবালা প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং আমি দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলাম। এই সময়ে নবীনাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের ভিতরে ধর্ম্মের যে নবালোক প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহার যেন একটা আভাস আমার ভিতরে দেখা দিল। এক দিকে আমরা ঈশাতত্ত্ব, ইসলামতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব একটু একটু করিয়া উপলব্ধি করিতেছিলাম এবং অপর দিকে সমুদায় ধর্ম্ম-বিধানের সমন্বয়ের জ্ঞান ঊষার আলোকের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল। পুরাতন বিধান হইতে যে একটা নূতন বিধান উদ্ভূত হইতেছে, এ কথাও বুঝিতেছিলাম। ব্রহ্মানন্দের পুস্তক ও ব্রহ্মানন্দের উপদেশ সমূহ যে এক নবভাবে উদ্বোধিত, তাহাও ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম। তখন বেশ একটা আলোক আসিতেছিল যে, এ বিধান "নববিধান"। ইহার মূলে প্রত্যাদেশ। মানুষের কিছু নাই। বিধাতার আলোক যখন আসে, তখন মানব-প্রাণে নবীন ঊষার অভ্যুদয় হয়। পুরাতনের ভিতর হইতে নূতন। প্রত্যাদেশ যে বিধাতার প্রেরণা, এভাব ক্রমে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তখন বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, আচার্য্যদেব কোন্ ভাব ও কোন্ আলোক লইয়া, জীবনের ঊষাকালে সেই পুরাতন হিন্দু পরিবারে নির্জ্জন কুটীরে, গ্রন্থ ও গুরু-পুরোহিত-বিরহিত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনায় বসিয়াছিলেন এবং কোন্ বীরত্ব লইয়া সেই হিন্দুর প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার-গঠিত দুর্গ ভেদ করিয়া উপাস্য দেবতার সমক্ষে বসিয়াছিলেন। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, ধর্ম্মের কোন্ আলোক অনুসরণ করিয়া, সেই প্রাচীন অনুদার ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীর ভেদ করিয়া, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম ইষ্টক খণ্ডকে স্পর্শ করিলেন এবং কোন্ নূতন কপোত অবতীর্ণ হইয়া সেই মন্দিরের চূড়ায় "ক্রুশ" "ত্রিশূল" ও "অর্দ্ধচন্দ্রের" প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যে ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ কুচবিহার-বিবাহ জনসাধারণের মহা সংশয় ও সমস্যার ভিতর পড়িয়াগিয়াছিল, সে ঘটনা যে কোন্ প্রত্যাদেশমূলক ও কোন্ নিভৃত কপোতের ভাষানুমোদিত, তাহাও নির্জ্জন কুটীরে নির্জ্জন চিন্তায় ক্রমে বুঝিতে পারিলাম। সাগরের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া পড়িলে, সে জলে কয়জন দাঁড়াইতে পারে? পলের পথ কয়জন বুঝিতে পারিয়া-

ছিলেন? কত গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিয়া পথিককে হিমালয় প্রদেশে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। ব্রহ্মানন্দের পথ পাগলের পথ। ব্রহ্মানন্দের ভাষা নীরব-যোগে যোগিনী মাডাম গায়নের ভাষা। পাগল বালক শিশুই তাঁহার পথ-প্রদর্শক। এখনও বলিতে পারিতেছি না যে ব্রহ্মানন্দের পথ সমস্ত ধরিতে পারিয়াছি। একারণেই পথ বড় আয়াসসাধ্য। ব্রহ্মানন্দের পথ বড় সাধনা-সাধ্য। আমরা চলিতে আসিয়াছি চলিয়া যাই। সপ্ততিবর্ষের নিকটে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ-সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য দিতে আসিলাম।

শ্রীসুমতি মজুমদার।

আমার স্বপ্ন।

(১৯শে নভেম্বর, ব্রহ্মানন্দের জন্মদিন, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভায় নিবেদিত)

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ! সে অনেক অনেক দিনের কথা, তখন আমার বয়স ১৪।১৫ বৎসরের অধিক হইবে না; একদিন শুনিলাম যে, কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং ঈশ্বরের বাণী স্বকর্ণে শ্রবণ করেন। কথাটী আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র আমার কৌতূহলের আর সীমা রহিল না। অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কোথায় এবং কিরূপে তাঁহার কথা শুনিতে পাইব? অবশেষে একদিন রবিবার সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ব্রহ্ম-মন্দিরের উদ্দেশে বাহির হইলাম। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান পিতাকে বলিলে পাছে বাধা দেন, এজন্য তাঁহার অজ্ঞাতে একখানি মলিন বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া বিনা পাদুকায় পদব্রজে মন্দিরের সন্ধানে চলিলাম। ছয় মাইল রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া হগ্‌হলায় সন্ধ্যা হইল। রাস্তায় যাহাকে দেখিতে পাই, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মমন্দির কোথায়? কেহ বলিল, কেহ বলিল না, অবশেষে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে সন্ধান পাইলাম। ছুটিতে ছুটিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছি, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, হাতে পয়সা নাই। অজানা রাস্তা, রাত্রিকাল, কলিকাতা সহর কিরূপ অবস্থায় পড়িলাম, তাহা অনুমান করা বরং সহজ, কিন্তু তাহা বর্ণনার বিষয় নয়। অবশেষে রাত্রি আটটার সময় মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিবার সাহস হইল না! দাঁড়াইয়া কি দেখিলাম? যাহা দেখিলাম, তাহা বলিবার ত ভাষা নাই! কি শুনিলাম? যাহা শুনিলাম, তাহাও বর্ণনার অতীত! আমি দেখিলাম, যেন কোন দিব্যলোকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি শুনিলাম, যেন স্বর্গলোক হইতে কোন ব্রহ্মর্ষি নারদের বীণা লইয়া সামবেদ গান করিতেছেন! সে সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারে যেন চতুর্দ্দিকে অমৃতের প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে! সঙ্গীত থামিয়া গেল, বেদীতে এক সৌম্যমূর্ত্তি দিব্য পুরুষ অধিষ্ঠিত, তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেন ততোধিক মিষ্ট বেদবাণী উচ্চারিত হইতেছে! দেখিলাম, শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার সম্মুখে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক্ ও অচঞ্চল, যেন কোন দেব-পুত্রগণ সমাধিমগ্ন হইয়া নিমীলিতনয়নে সুধা-পানে মত্ত! আমি যেন লোকান্তরে আসিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। আমার জীবনে উহাই প্রথম স্বপ্ন। স্বপ্ন-জগতে বাস করিয়া মানুষের যে অবস্থা হয়, আমারও তাহাই হইল। আমি স্বপ্নে দেবমন্দিরের ছবিখানি বুকের ভিতর আঁকিলাম, আমি সাধু নিরাকারবাদী উপাসক-দলের যোগ সমাধির বাহ্যরূপ অন্তরের ভিতর সযত্নে রক্ষা করিলাম—আমি বেদীতে অধিষ্ঠিত সেই দিব্য পুরুষের দিব্যবাণীর আলোকচিত্রকে প্রেমের স্বর্ণসূত্র দিয়া প্রাণের মধ্যে সাজাইলাম। আর যিনি সঙ্গীত করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না বটে কিন্তু তাঁহার অমৃত ধারায় ভাসিতে ভাসিতে আমার স্বপ্নের ঘোর যেন আরো গভীর ও ঘন হইয়া উঠিল। উপাসনা ভাঙ্গিবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, ইঁহারা কে? যিনি উপাসনা করিলেন, উনি কেশবচন্দ্র; আর যিনি সঙ্গীত করিলেন, তিনি ত্রৈলোক্যনাথ। আমি স্বপ্নের ঘোরেই হাঁটিতে লাগিলাম। রাত্রিকালে একাকী কোথা দিয়া আট দশ মাইল পথ ফুরাইয়া গেল! রাত্রিতে শয়ন করিলাম, কিন্তু ঘুম হইল না, কেবলই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। আহার, বিহার, শয়নে, স্বপনে একই কথা, একই ভাবনা!

কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে, কেশবচন্দ্র সেন টাউনহলে বক্তৃতা করিবেন। বিষয় "Am I an Inspired prophet?". তখনও ইংরাজী ভাল বুঝিতে পারি নাই, তথাপি কয়েকটী ছেলের সহিত বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। সকল লোকই অবাক্ হইয়া শুনিতেছে, কাহারও মুখে সাড়া নাই, শব্দ নাই, অবাত-কম্পিত দীপশিখার ন্যায় সকলেরই চক্ষু জ্যোতির্ম্ময়, মুখ চিন্তামগ্ন, গম্ভীর ও স্থির। আমি না বুঝিয়াও যেন মনে হইল, অনেক বুঝিয়াছি, না জানিয়াও যেন মনে হইল, অনেক জানিয়াছি। আমার অজানা অবোধ্যের ভিতর এমন একটা অবস্থা হইল, যাহা আমাকে জনপূর্ণ আবাসের বাহিরে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া গেল। এই নিভৃত প্রদেশে আমি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। ঈশা শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় তাঁহার পরিচ্ছদ যেমন রজতশুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, আমার চক্ষুও দর্শন করিল যে, শ্রীকেশবের গৌরবর্ণ মুখকান্তিতে যেন বিদ্যুল্লহরী খেলা করিতেছে, যেন দিব্য, যেন অমৃত ঝরিয়া পড়িতেছে। উহা আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন!

একবার কোন কর্ম্ম-সূত্রে কলিকাতায় আসিলাম। আমার বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সহিত দেখা হইল। তিনি ব্যস্ত, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষা হইবে বলিয়া কমলকুটীরে যাইতেছেন, আমাকেও সঙ্গে লইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যদেবকে বলিলেন যে, ইহাকেও প্রশ্ন দেওয়া হউক। আমি

কিছুই জানিনা, কিরূপে পরীক্ষা দিব? কিন্তু অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। আমার নিকট প্রশ্ন আসিল, Inspiration কাহাকে বলে? প্রশ্ন পাইয়া আমার সর্ব্বশরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর দিয়া যেন ঘেম বহির্গত হইতে লাগিল। তখন আমার প্রার্থনার প্রতি বিশ্বাস হইয়াছে। একাগ্র হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, প্রার্থনার ভিতর যাহা আলোক পাইলাম, ২।৩ লাইন বাঙ্গলায় লিখিয়া দিলাম। আমার উত্তর দেখিয়া আমার প্রতি আচার্য্যদেব সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টি কি মধুর! কি মনোহর! দৃষ্টির ভিতর দিয়া আমাকে যেন আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি কোন কথা বলিলেন না, আমিও কোন কথা বলিলাম না। কথা না বলিলে কি হয়? এক দৃষ্টির ভিতর দিয়া কত কথা শুনিলাম! আমিও আমার মনের ভাষা দিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম, মনের হাত দিয়া তাঁহার শ্রীচরণ বক্ষে ধরিলাম। এক মুহূর্ত্তে কত ভাবের আদান প্রদান হইল, স্বপ্নলোক হইতে কত শাস্ত্র আমার নিকট উদ্ঘাটিত হইল! ইহাই আমার তৃতীয় স্বপ্ন!

একবার কলিকাতার বাহিরে উৎসব উপলক্ষে শ্রীকেশবচন্দ্রের উপাসনা করিবার কথা শুনিতে পাইলাম। আমিও অনেক বাধা বিঘ্ন সত্বে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেশবচন্দ্র উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনা আরম্ভ মাত্র সকলেই নিস্তব্ধ, সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল। আমিও একনিষ্ঠভাবে যোগদান করিলাম; মনে হইল, আমি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছি। আমার সম্মুখে আকাশ, বাতাস, পৃথিবী কিছুই না, নরনারী-পূর্ণ উপাসনা-গৃহও আমার নিকট শূন্য; [illegible] কেবল উপাসনা, উপাসনার এক একটা কথা যেন উদ্যত বজ্রের মত আসিয়া প্রাণকে আহত করিতেছে! যেন আমার পুরাতন শরীর, মন, ভাব, রুচি, সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; আমার জন্য এক নূতন লোক সৃষ্টি করিতেছে! আমি যেন উপাসনা আহার করিতে লাগিলাম। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোককে আহার করিতে বসাইয়া অর্দ্ধাহার দিয়া তাহাকে পূর্ণ তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত করা যেমন কষ্টকর, উপাসনার শেষে আমার বাসনাও সেইরূপ অতৃপ্ত রহিয়া গেল। উপদেশের বিষয় ছিল, শ্রীহরি আমাদের দাস দাসী হইয়া সেবা করেন। উপদেশ শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রু পড়িতে লাগিল। গৃহে ফিরিলাম। আমার চক্ষের জল আর শুকাইল না। প্রায় দুদিন দুরাত্রি ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া উপাসনার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল একই চিন্তা! কি যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনা করা আমার পক্ষে দুরূহ। কেবল এইটুকু মনে আছে যে, এই দীর্ঘ কালের অনাহার, অনিদ্রা, অবিরাম অশ্রুপাত আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিল। আমার মন বরাবরই কাদার মত নরম, সহজেই একটু ভাবের ছাপ পড়ে। সে দিনকার উপাসনার যে ছাপ মনে পড়িয়াছিল, তাহা সহজে মুছিয়া গেল না, পাষাণে অঙ্কিত দাগের মত এখনও তার চিহ্ন মনে আছে। আমি স্বপ্নের ভিতর দিয়াই জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছি। ইহাই আমার চতুর্থ স্বপ্ন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী আচার্য্যদেবের তিরোধান হয়। সমস্ত কলিকাতানগরীর লোক সেদিন গৃহ শূন্য করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যুবা, বৃদ্ধ, বালক, বালিকা সকলের মুখ সেদিন বিষাদের কালো মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান সেদিন নিমতলার চিতাগ্নিতে সেই পুরুষবরের সৎকার দেখিবার জন্য শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন তাঁর আকস্মিক বজ্রপাতে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল? আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, নরোত্তম দাস রাজার ছেলে, কাল তাঁহার অভিষেক হইবে, আজ প্রাতঃকালে নরোত্তম ভ্রমণে বাহির হইলেন। বৃক্ষতলে শতবর্ষবয়স্ক এক বৃদ্ধকে দেখিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বৃক্ষতলে কেন সর্ব্বদা বসিয়া থাক? বৃদ্ধ বলিল, এই বৃক্ষতলে মহাপ্রভু একদিন রাস করিয়াছিলেন, এখানে একদিন কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এখানকার আকাশ বাতাসে এখনও তাঁহার কীর্ত্তনের মলয়পবন বহিতেছে, আমি তাই কাণ পেতে শুনি। মহাপ্রভু যাইবার সময় তিনবার নরোত্তম নরোত্তম নরোত্তম বলিয়া গেলেন। যুবক বলিলেন, তবে মহাপ্রভু আমার জন্য ডাক থুয়ে গেছেন? নরোত্তম বলিলেন, আমার এই শাল খানি লও, পিতাকে দিও; বলো, নরোত্তম বৃন্দাবন চলে গেলেন, আমার ছোট ভাইকে যেন রাজ্যে অভিষেক করা হয়। কেশবচন্দ্র চলে গেলেন, তাঁহার স্নেহদৃষ্টি আমার জন্য রেখে গেলেন,—মধুর উপদেশ দিয়া আমাকেও তিনি ডেকে গেছেন। তাঁহার ডাক শুনে আমি পিতার বুকভরা স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের মধুর আকর্ষণ, আভিজাত্যের অভিমান, কুলগৌরব ও ব্রাহ্মণত্বের অধিকার বিসর্জ্জন দিয়া, পতঙ্গ যেমন আলোকে ঝাঁপাইয়া পড়ে, আমিও সেইরূপ অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া, ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমার ইহাই পঞ্চম স্বপ্ন। বাল্যের স্বপ্ন যৌবনে সত্য হয়, যৌবনের স্বপ্ন বার্দ্ধক্যে সত্য হয়, ইহলোকের স্বপ্ন পরলোকে সত্য হয়, পূর্ব্ব বংশের স্বপ্ন পরবংশে সত্য হয়! স্বপ্ন দেখা মানবের স্বভাব!

কেশবচন্দ্র কে? আমি ঐতিহাসিক কেশবের কথা বলিতেছি না। তিনি বাঙ্গালি কি পাঞ্জাবী, সে কথা আমরা বিচার করিব না। তাঁহার পিতামাতা, বংশ, গোত্র লইয়া আমরা আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহি। কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক সত্তাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তবে বুঝিতে পারি যে, কেশবচন্দ্র একটী ভাব, একটী সত্য, অথবা একটী আত্মিক অবস্থা। এক ভাব বা সত্য অনন্ত সত্যের একটী খণ্ড প্রকাশ। অখণ্ড সত্য হইতে খণ্ডকে আমরা বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। কাল অনন্ত, অনন্তকাল হইতে আমরা ঋতু মাস বৎসর শতাব্দী প্রভৃতিকে

বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না, আমাদের সুবিধার জন্য আমরা তাহার নামকরণ করি। সেইরূপ কোন খণ্ড সত্যকে অখণ্ড সত্য হইতে পৃথক করিতে পারি না। প্রত্যেক প্রকাশিত খণ্ড সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ঘোষণা করিতে পারি। প্রত্যেক মহাপুরুষই এক একটী খণ্ড ভাব বা খণ্ড সত্য, ইহা অখণ্ড ব্রহ্ম-বক্ষে নিহিত। অখণ্ডকে গ্রহণ করিলেই তাহার প্রত্যেক খণ্ড প্রকাশ গ্রহণ করা মানবের অপরিহার্য্য সত্য।

কেশবচন্দ্র কোন্ ভাব বা কোন্ সত্য হইয়া অবতীর্ণ হইলেন? তিনি যোগ না ভক্তি, জ্ঞান না কর্ম্ম? তিনি সখ্য না দাস্য, মধুর না বাৎসল্য? অনেকে বলেন, তিনি "ধর্ম্মসমন্বয়"। "ধর্ম্মসমন্বয়" ত প্রাচীন কালের কথা, যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র। গঙ্গা যমুনার সঙ্গম বা মিলন সমন্বয়; গঙ্গার জলের সহিত যমুনার জলের পার্থক্য আছে, ভেদরেখা আছে। যখন দুটী সত্য পরস্পর মিলিত হইয়া চলিতে থাকে, তখন তাহাকে সমন্বয় বলা যায়। যোগ ভক্তির বিরোধী না হইয়া এবং ভক্তি যোগের অন্তরায় না হইয়া যখন সাধনার পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহা সমন্বয়। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সমন্বয় তাহা নয়, ইহা একটি অঙ্গাঙ্গীভূত জীবন, একটী Organic life। এখানে যোগ হইতে ভক্তিকে, বা ভক্তি হইতে যোগকে, বা জ্ঞান হইতে কর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা বলিতে পারি যে, ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম প্রভৃতির মিলনে একটী জীবন্ত মানব-দেহ নির্ম্মিত হয়; কিন্তু জীবন্ত দেহের কোথায় ক্ষিতির স্থান, আর কোথায় জলের স্থান, তাহা পৃথক্ করা যায় না। এক অন্যের সহিত অনুস্যূত। কেশবচন্দ্রের সমন্বয়ও সেইরূপ একটী ভাবের সহিত অন্য ভাব অনুস্যূত, ইহা একটী জীবন্ত ধর্ম্মজীবন, ইহা একটি নূতন সৃষ্টি। অতএব কেশবের ধর্ম্ম-জীবন গ্রহণ করিতে হইলে, যে আধার হইতে সে জীবন প্রস্ফুটিত হইল, তাহাকেও শ্রদ্ধা করিতে হয়; তাহা হইলে আত্মিক কেশবের সহিত ঐতিহাসিক কেশবের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবদেহ সত্য-প্রতিষ্ঠার আধার, আধারের ভিতর সত্যকে বিধাতা অঙ্কুরিত করেন; সুতরাং সে আধারকেও আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলী দিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? ঈশার জীবন জানিতে হইলে পলের জীবনে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, ফ্রান্সিস্ ডি আসিসির ঈশাময় জীবনের ভিতর কিঞ্চিৎ আস্বাদন লাভ করা যায়। হরিদাসের জীবন দেখিলে শ্রীচৈতন্যের জীবনের ভক্তির অতলস্পর্শ গভীরতার কিছু পরিমাণ মানুষ বুঝিতে পারে। সেইরূপ শ্রীকেশবচন্দ্রের অনুবর্ত্তিগণের জীবনের দুই একটী দৃষ্টান্ত পাইলে আমরা বুঝিতে পারিব, সে জীবনের বিশ্বাস ও নির্ভর কত গভীর, কত সত্য।

মেদিনীপুর জিলার কোন এক গ্রামে একটী বিশ্বাসী ব্রাহ্ম বাস করিতেন। তিনি কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতিশয় দরিদ্র, ২০ বিঘা ধানের ক্ষেত তাঁহার সম্বল ছিল। গ্রামের জমীদার অতিশয় প্রতাপশালী ও ধনী। তাঁহার একজন স্বজাতীয় প্রজা ব্রাহ্ম হইবেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার উপর কঠোর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। ধোপা নাপিত বন্ধ হইল। গ্রামে একটী মুদিখানা দোকান ছিল সে দোকান হইতে তেল, লবণ নেওয়া বন্ধ হইল। তাহাতেও বোসজা মহাশয়ের মনে ধর্ম্ম ত্যাগ করিবার কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। অবশেষে জমীদার প্রজাবর্গকে ডাকাইয়া বলিলেন, যে, বোসজা মহাশয়ের ধানের ক্ষেতে যদি কেহ কাজ করে, তবে আমি তাহার ঘর বাড়ি জমিজায়াত বাজেয়াপ্ত করিব। একদিন অগ্রহায়ণ মাসের কোন একদিবস বোসজা মহাশয় একটী কাস্তে হাতে করিয়া ধান কাটিতে গিয়াছেন, ক্ষেতভরা ধানের অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে, ভক্তের প্রাণ মুগ্ধ হইল! তিনি তখনই একটী সংগীত রচনা করিয়া গাহিতে লাগিলেন:—"কার দেওয়া ধান কাটিস তোরা ওরে কৃষক ভাই! তারে জানিস কিনা বল সুধাই? পাঁচসের ধান ফেলে দিলে, দেখ দেখি ভাই কত মিলে, যে এসব পাঠিয়ে দিলে, তারে বলিহারি যাই। তার দেখা পেলে, চরণতলে, দিবানিশি প্রাণ জুড়াই।" স্বর্গীয় শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব তাঁহার সাধক-রঞ্জনে এই গানটী ছাপাইয়া ছিলেন।

বোসজা মহাশয় কাহার জীবনের স্পর্শ পাইয়া এই সব নির্য্যাতন প্রফুল্লচিত্তে বহন করিলেন? কাহার জীবনের অলৌকিক বিশ্বাসের আলোক একজন নিঃস্ব অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রামবাসীর প্রাণকে বীরের অকুতোভয়তা প্রদান করিল? কেশবচন্দ্রের। গান গাহিতে গাহিতে বোসজা বিভোর হইলেন, হাত থেকে কাস্তে পড়িয়া গেল, নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রমত্ত নৃত্য ও গান শুনিয়া, আশে পাশে কাজ করিতেছিল দেড়শত জন কৃষক বোসজা মহাশয়কে অনুরোধ করিল, গানটী আবার গান। গান গাহিতে গাহিতে দেড়শত কৃষক বোসজা মহাশয়ের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপ চলিল, ধানের ক্ষেত এক অদ্ভুত উৎসবে পরিণত হইল। কৃষকেরা বলিল, আপনি চলিয়া যান, আমরা আপনার ধান কাটিয়া বাড়িতে পঁহুছাইয়া দিব। বোসজা মহাশয় নিবারণ করিলেন, এরূপ করিও না, সর্ব্বনাশ হইবে। জমীদার তোমাদের বাস্তোচ্ছেদ করিবে। তাহারা নির্ভয়ে উত্তর করিল, ভয় নাই। দেড়শত কৃষক মিলিয়া, নিজেদের ধান কাটা ছাড়িয়া, একদিনে বোসজা মহাশয়ের ধান গৃহজাত করিল। ভক্তের বোঝা ভগবান্ বহন করেন। এ অদ্ভুত ব্যাপার কাহার জীবনের স্পর্শ? শ্রীকেশবচন্দ্রের।

বাঁকিপুরের স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কিন্তু তিনি সাধু, সচ্চরিত্র, অকিঞ্চনা ভক্তির একনিষ্ঠ সাধক। তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য সদ্যজাত গোলাপের সুমিষ্ট সৌরভের ন্যায় চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একদিন তাঁহার গৃহে অতিথি সমাগত। হাতে পয়সা নাই, কিরূপে তাঁহার সমাদর

করিবেন? প্রকাশচন্দ্রের চাপরাশী চিন্তামণিকে ডাকিয়া বলিলেন, চিন্তামণি, এই ঘটীটী লইয়া গিয়া বাজারে বিক্রয় কর, বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া চাল ডাল লইয়া এস। চিন্তামণি অবাক্! চিন্তামণির চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে বলিল, আপনার অভাব কিসের? এখনি হুকুম করুন, আমি দশহাজার টাকার জিনিষ আনিতে পারি। প্রকাশচন্দ্র একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কোন লজ্জা নাই, আমিত কখন কাহার নিকট ধার করি না। চিন্তামণি প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল। এ অদ্ভুত জীবনের ধারা কোন সাগর হইতে বহিয়া আসিল? ইহা কাহার জীবনের স্পর্শ? ইহা শ্রীকেশবের স্পর্শ। অনেক কথা বলিবার আছে, আজ এইখানেই সমাপ্ত।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ।

জন্মোৎসব নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে, গত ১৯শে নবেম্বর, কলিকাতায়, প্রাতে ৮৷৷০ টার সময় কমলকুটীরের নবদেবালয়ে উপাসনা হয়; ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী উপাসনা করেন। তিনি উদ্বোধনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। অপরাহ্ণে নবদেবালয়ে কল্পতরু হয় এবং সন্ধ্যা ৬টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। প্রথমে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা-পাঠান্তে, কেশবচন্দ্র জীবনে নববিধানের দেবতাকে কেমন মহিমান্বিত করিয়াছিলেন, এবং নববৃন্দাবনে সভক্ত ও সপরিবার শ্রীভগবানের লীলানন্দ কেমন সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেশবচন্দ্র সম্পর্কে আত্ম-জীবনের সাক্ষ্যদান করেন। তাহা স্থানান্তরে দেওয়া গেল। ডাঃ জগন্মোহন দাস বলেন, কেশবচন্দ্র ভগবদ্যোগে Evolutionist এবং Revolutionist হইয়া সকল বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন স্বকীয় ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান যুবকমণ্ডলীকে সকলবিষয়ে কেশবের পদানুসরণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও মাধুর্য্যের সহিত বলেন, কেশবচন্দ্রকে ভুল বোঝা হইয়াছে; তিনি যা চেয়েছেন, বা তিনি যা হয়েছেন, সকল মানব সম্পর্কেই উদার ভাবে তিনি তাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অদ্য সকলকার বক্তৃতাই বেশ সুমিষ্ট, সরস ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

গত ৫ই অগ্রহায়ণ, বাঙ্গালা তারিখ হিসাবে নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মদিনে, বাগনান্ শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রাতে ভ্রাতা তীন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমতী সুনীতি মল্লিক স্থানীয় বালকবালিকাদিগকে লইয়া কল্পতরু প্রদর্শন করেন এবং শিশুদের মুড়কী বিতরণ করেন। শ্রীমতী বাসন্তী মজুমদার আচার্য্যদেবের জীবন-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে গল্প বলেন। আশ্রমটী আলোক দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব পুরীধামে এবার তিন দিন ধরিয়া সম্পন্ন হয়। ১৯শে নবেম্বর হইতে ২১শে নবেম্বর পর্য্যন্ত তিন দিন শঙ্খ ঘণ্টা সহকারে গলষ্টন আশ্রম হইতে নব-শ্রীক্ষেত্র-ভূমি পর্য্যন্ত ঊষাকীর্ত্তন হয়। ১৯শে প্রাতে ৭৷৷০টার সময় "নব-শ্রীক্ষেত্রে" বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ দ্বারা সম্পন্ন হয়। ভ্রাতা ডাঃ গণপতি চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। মিসেস দিনকর রাও সঙ্গীত করেন। ২০শে প্রাতে গলষ্টন আশ্রমে উপাসনা হয় ও সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় ভ্রাতৃসম্মিলন হয়; সংক্ষিপ্ত উপাসনা [illegible]রিয়া 'জীবনবেদ' হইতে 'প্রার্থনা' অধ্যায় পাঠ করা হয়। সিবিল সার্জ্জন ডাঃ গুপ্ত, মিঃ গিরীন্দ্রনাথ সরকার, রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি আলোচনা করেন। শ্রীমান্ শান্তি সরকার ও শ্রীমান্ হেমন্ত সেন মধুর সঙ্গীত করিয়া সকলকে প্রীত করেন। উপস্থিত সকলকে চন্দনের ফোঁটা দিয়া ভ্রাতৃসম্ভাষণ করা হয়। ২১শে অর্থাৎ ৫ই অগ্রহায়ণ, বাঙ্গালা হিসাবে জন্মদিনে প্রাতে গলষ্টন আশ্রমে উপাসনা ও অপরাহ্ণ ৪৷৷০টায় পুরী জেলা স্কুলে সাধারণ স্মৃতি-সভা হয়। কালেক্টর মিঃ থডানি আই, সি, এস্ স্থানান্তরে গমন করাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। তাঁহার প্রতিনিধি মিঃ টি পুজারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত করিয়া সভারম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া, ইংরাজীতে আচার্য্যদেবের জীবনমাহাত্ম্য বিষয়ে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার পর জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র পতি, ডেপুটী কালেক্টর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঊষাচরণ দাস উভয়ে উড়িয়া ভাষায়, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ওজস্বিনী বাঙ্গালা ভাষায়, মৌলবী আব্দুল হালিম সাহেব উর্দ্দু ভাষায় এবং জগৎ ভ্রমণকারী মিঃ গিরীন্দ্রচন্দ্র সরকার বাঙ্গালা ভাষায় মহাপুরুষ সমন্বয়াচার্য্য কেশবচন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন করিয়া সুন্দর বক্তৃতা করেন। শেষে সভাপতি মহাশয়ও ইংরাজীতে অতি সুন্দর বলেন। স্থানীয় পাদ্রী বেভারেণ্ড মিঃ কলিন্স সাহেবও কিছু বলিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য হওয়াতে পারেন নাই। ধারাকাটা রাজার প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী আদি ঈশ্বরানন্দ সভাপতি ও বক্তাদের ধন্যবাদ দেন। স্থানীয় S. D. O. ও অন্যান্য গণ্যমান্য অনেকে এবং স্কুলের শিক্ষক ছাত্র প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

শুভবিবাহ—গত ২১শে নবেম্বর, করাচিতে, ৬২নং মিশন রোডে, স্বর্গীয় সাধক ললিতা[illegible]হন রায়ের একমাত্র পুত্র, কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রেণিং ব[illegible]জের অধ্যক্ষ, মণ্ডলীর সকলের প্রিয়, কল্যাণীয় ডাঃ সত্যান্[illegible]ায়ের সহিত, লক্ষ্ণৌপ্রবাসী

স্বর্গীয় সাধক গোপালচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের ভগ্নী কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুনীতির শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভ্রাতা যামিনীকান্ত কোঙার এই বিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। নববিধান-জননী তাঁহার প্রিয় এই নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন। এই নবদম্পতি গত ২৬শে নবেম্বর, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, হাওড়া ষ্টেশনে বন্ধুবান্ধবগণ ইঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং ঐদিন ২৯।১এ নিউপার্কষ্ট্রীটস্থ গৃহে শুভাগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়; ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্র লিখিয়াছেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠানটী পাটনায় ভাগীরথীতীরে কয়েকটী ভগ্নী মিলে নূতন প্রকারে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে এক টাকা দান করা হইয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন—আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রহ্মানন্দের [illegible] কন্যা, আমাদের সকলের অতি শ্রদ্ধেয়া কুচবিহারের মান[illegible] রাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী (C.I.) কিঞ্চিদধিক তিন [illegible] কাল বিলাতে প্রবাসের পর সুস্থ শরীরে গত ২৯শে নবেম্বর, [illegible]কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দপরিবারের প্রায় সকলে এবং মণ্ডলীর অনেকে হাওড়া ষ্টেসনে গিয়া আনন্দমনে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তিনিও প্রফুল্লচিত্তে হাসিমুখে সকলকে আদর আপ্যায়ন করিয়াছেন। বহুদিন পরে তাঁহাকে পাইয়া সকলেরই মনে আবার খুব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। নববিধান-জননী তাঁহার প্রিয় কন্যাকে আরও গৌরবান্বিত করুন এবং তিনিও তাঁহার জীবনে আরও [illegible]ন্বিত হউন।

পরলোক-গমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গত ২৪শে নবেম্বর, ধুবিড়ীর স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ দাসের সহধর্ম্মিণী ৭৬ বৎসর বয়সে, কলিকাতায় ১৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, পুত্র ডাঃ উপেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে, পৃথিবীর শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে মা আনন্দময়ীর শান্তিক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়াছেন। শান্তিদায়িনী মা তাঁহার কন্যার আত্মাকে চিরশান্তিতে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দাতাদিগকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—

জুন, ১৯৩১—শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদভানী মাসিকদান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিক দান [illegible]৲, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিক দান ২৲ ও স্বামীর, সমাধি-প্রতি[illegible] উপলক্ষে ১০৲, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের স্মৃতিতে মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত গগন বিহারী সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ গুপ্ত মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জ্জি মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি পিতৃপুরুষ শ্রাদ্ধে ২৲, শ্রীমতী আনন্দাসুন্দরী দাস পুত্রদের জন্মদিনে ১৲, শ্রীমতী সরোজিনী সরকার ২৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিক দান ২৲, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহ পুত্রের শুভবিবাহে ১৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী মাসিক দান ১৫৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি দৌহিত্রের অন্নপ্রাশনে ২৲, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে দুই কন্যার শুভবিবাহে ৫৲ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র দত্ত মাসিক দান এগার মাসের ১১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিক দান ৫৲, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু পিতৃ-সাম্বৎসরিকে ৪৲, শ্রীমতী চারুবালা ব্যানার্জ্জি পাঁচ মাসের মাসিক দান ১০৲।

জুলাই, ১৯৩১—শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদভানী মাসিক দান ২৫৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায় মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী মাধবীলতা চট্টোপাধ্যায় মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত গগণবিহারী সেন মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিক দান ২৲, স্বর্গীয় অমৃত লাল ঘোষের স্মৃতিতে মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার দাস পিতৃদেব আদ্যশ্রাদ্ধে ৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার সেন মাসিক দান দশ মাসের ৫০৲, শ্রীযুক্ত নিত্যরঞ্জন দাসগুপ্ত জ্যেষ্ঠাকন্যার শ্রাদ্ধে ৫৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী মাসিক দান ১৫৲, নববিধান ট্রাষ্টের সরলা প্রাণ্ডগীর ফণ্ড হইতে ৫৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিক দান ২৲, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস পিতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী স্বামীর সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী কুমুদিনী দাস মাতৃসাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখোপাধ্যায় [illegible] মাসের মাসিক দান ১২৲, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জ্জি দেবরের স্বর্গীয় শিশিরকুমার চাটার্জ্জির সাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিক দান ৫৲।

ভগবানের শুভাশীষ দাতাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্তৃক ১৭ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ। ২৩শ সংখ্যা।
১লা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
17th December, 1931.
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মা, আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দাও। তুমি আমাদের প্রিয় নববিধানাচার্য্যকে বলিলে, "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। প্রার্থনা করিলে যাহা কিছু পাইবার, সকলই পাইবে।" তিনি তাই তোমার কথা শুনিলেন, বিশ্বাস করিলেন, আর শেষে বলিলেন, "প্রার্থনা করিয়া দুর্জ্জয় বল লাভ করিলাম। প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা তাহা।" যাহা কিছু তিনি পাইয়াছেন, যাহা কিছু তাঁহার হইয়াছে, সকলই প্রার্থনার দ্বারাই হইয়াছে। তাই বলি, মা, তিনি যে নববিধান-মূর্ত্তিমান-জীবন হইলেন, তাহা ত এই প্রার্থনার বলেই হইলেন। তবে আমাদেরও তেমনি করিয়া প্রার্থনা করিতে শেখাও। আমরাও ত কতদিন ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু তেমনি করিয়া প্রার্থনা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই বুঝি, প্রার্থনার ফল হাতে হাতে পাই না। তিনি এই জন্যই আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "প্রার্থনা সম্বন্ধে আমাদের প্রবঞ্চনা দূর করা উচিত।" আমরা প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চক, তাই আমরা প্রার্থনার ফল পাই না। সত্যই ত, আমরা তেমন সরল বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করি না। প্রার্থনা করিলে পাইবই পাইব, এই বিশ্বাসে প্রার্থনা করি না। যতক্ষণ না প্রার্থনার উত্তর পাই, ততক্ষণ কই নেআগড়ে হইয়া বসিয়া থাকি? যতক্ষণ না প্রার্থনার উত্তর দিবে, ততক্ষণ উঠিব না; ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী যেমন আহার না পাইলে উঠে না, দাতার দ্বারে পড়িয়া থাকে, কই তেমন করিয়া আমরা প্রার্থনা করি? মুখস্থ প্রার্থনা কত করি, অথচ মন সে সময় অন্যদিকে থাকে। ভিতর এক রকম, বাহির অন্যরকম রাখিয়া প্রার্থনা করি। অন্যকে শোনাবার জন্যে প্রার্থনা করি নিজের ভিতর সে ক্ষুধা পিপাসা অনুভব করি না। এই জন্যই, মা, আমাদের প্রার্থনা সফল হয় না, প্রার্থনার ফল হাতে হাতে পাই না। তাই বলি, মা, কেশবপ্রাণে একপ্রাণ হয়ে যাহাতে প্রার্থনা করিতে পারি, এমন প্রার্থনা শেখাও। তুমি ত, মা, আমার যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা দিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছ, স্বীকার করি; অথচ তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, আর তাহার ফল পাইতেছি না, ইহা কি মিথ্যা কথা নয়? ইহা কি তোমার নিন্দা করা নয়? মা, দয়া করে এই প্রার্থনা সম্বন্ধে আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমরা যেন সরল শিশুর মত বিশ্বাসী হইয়া প্রার্থনা করি, যেন তোমার কাছে যথার্থ প্রার্থনা করিয়া, হাতে হাতে তাহার

ফল পাইয়া প্রকৃত প্রার্থনার গৌরব রক্ষা করি এবং তাহা দ্বারা জীবনে যাহা পাইবার পাইয়া ধন্য হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

—•—

"ধর্ম্ম" না "বিধান"?

ধর্ম্ম এক, বিধান আর এক। ধর্ম্ম মানা এক রকম, বিধান মানা আর এক রকম। ব্রাহ্মধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, ইহুদীধর্ম্ম, পার্সীধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম ইত্যাদি এক একটি ধর্ম্ম ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। আবার গৃহস্থের ধর্ম্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, রাজার ধর্ম্ম, প্রজার ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, বৈশ্যের ধর্ম্ম, শূদ্রের ধর্ম্ম ইত্যাদি বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মকেও ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হয়।

মৌলিক অর্থে ধর্ম্ম তাহা, যাহা ধরিয়া বা অবলম্বন করিয়া মানুষ সমুন্নত হয় বা ঈশ্বর-মুখীন হয়। ইংরাজীতে ধর্ম্মের (Religion) অর্থ, যে বাঁধনে মানুষ ঈশ্বরের সহিত বাঁধা পড়ে। বাস্তবিক মানুষ সংসারের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়া সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; তেমনি যে বাঁধনের দ্বারা স্বর্গস্থ ঈশ্বরের সহিত আবদ্ধ হইয়া উচ্চ স্বর্গীয় অধ্যাত্ম জীবন যাপনে সক্ষম হয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। এই জন্যই মনুষ্য-জীবনের উচ্চ কর্ত্তব্য যাহা, তাহাই তাহার ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। যাহা হউক, ধর্ম্ম শব্দের সহিত মানবীয় ভাব সর্ব্বদাই যে জড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষ নিজ পুরুষকার বা সাধন দ্বারা ধর্ম্ম সাধন বা কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে। এই জন্য মানুষের নীতিযুক্ত কর্ত্তব্যকে যেমন ধর্ম্ম বলা হয়, তেমনি উচ্চ বিশ্বাসের ধর্ম্মকেও ধর্ম্মনামেই আখ্যাত করা হয়।

তাই প্রচলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়াই পরিচিত। এবং এই সকল ধর্ম্মও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের নামের সহিত সংযুক্ত। এইরূপে যিশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম খৃষ্ট ধর্ম্ম, মহোম্মদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মহোম্মদীয় ধর্ম্ম, শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি। আবার যে যে ধর্ম্ম বিশেষ কোন মহাপুরুষের নামাভিধানে পরিচিত নয়, যেমন হিন্দুধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, ইহুদি ধর্ম্ম প্রভৃতি, তাহাও মানবীয় সংস্কার সংযুক্ত; যেমন যাহা হিন্দুজাতির ধর্ম্ম তাহাকেই হিন্দুধর্ম্ম, শিখজাতির যাহা ধর্ম্ম বা শিষ্য বা শিক্ষার্থীদিগের যাহা ধর্ম্ম তাহা শিখ ধর্ম্ম, ইহুদীজাতির ধর্ম্ম ইহুদীধর্ম্ম। এইরূপে দেখা যায়, ধর্ম্ম শব্দ কোন না কোন আকারে মানুষের সংস্রবে সংসৃষ্ট। বাস্তবিক ধর্ম্ম মাত্রেই মানুষের সাধন-সাপেক্ষ বলিয়াই, সকল ধর্ম্মই কোন না কোন ভাবে মানবীয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া আসিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়েও ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম যাহা, তাহাও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়াছে। এই নাম আমাদিগের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচীন ব্রহ্মবাদীরা যাহা বলিয়াছেন, বা ব্রহ্মবাদীরা যাহা সাধন করিয়াছেন, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই তিনি এই ধর্ম্মের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামকরণ করেন। ইহা যাঁহাদিগের পালনীয় বা সাধনের ধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে তিনিই ব্রাহ্ম নামে অভিহিত করেন। সুতরাং ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহা অনায়াসেই উদ্ভাবন করা যায়।

যাহা হউক, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ব্রাহ্মদিগের পুরুষকার-সাধন-সাপেক্ষ ধর্ম্ম, ইহাও ব্রাহ্মমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু যাহা বিধাতার প্রেরিত বা বিধাতার কৃপা-প্রণোদিত, তাহাকে আর আমাদের সাধন-সাপেক্ষ ধর্ম্ম বলিতে পারি না; তাহা নিশ্চয়ই বিধাতার "বিধান"। বিধানে মানুষের হাত নাই। বিধাতা স্বয়ং ইহা প্রেরণ করেন, বিধাতা স্বয়ং ইহা সাধন করান, বিধাতা স্বয়ং ইহা সঞ্চার করেন। যেমন কোন রাজা যাহা বিধান করেন, তাহা তাঁহার প্রজাগণকে মানিতেই হইবে, পালন করিতেই হইবে। তাহা মানা না মানা, পালন করা না করা তাহাদের হাতে নয়। তাহা মানিতে, পালন করিতে তাহারা বাধ্য, না মানিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে।

তাই আচার্য্য বলিলেন, "আপনার হাতে ধর্ম্ম যার, তার কুপ্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। মানুষের ধর্ম্ম-সাধন তার ক্ষমতার অতীত করিয়া দাও।" "ধর্ম্ম" এবং "বিধানের" পার্থক্য এই। ধর্ম্ম বলিলে তাহা মানবীয় সাধন-সাপেক্ষ, তাহা মানুষের হাতে। কিন্তু যদি বিশ্বাস করি, আমাদের হাতে আমাদের ধর্ম্ম নয়, ইহা বিধাতার বিধান, আমি বাধ্য তাহা মানিতে, আমি বাধ্য তাহা সাধন করিতে; এবং শুধু তাহা নয়, বিধাতা স্বয়ং তাঁহার অনির্ব্বচনীয় কৃপাগুণে যেমন আমাকে এই বিধান

দিয়াছেন, তেমনি তিনিই তাঁহার শক্তি-প্রভাবে আমাকে তদনুরূপ জীবনযাপনে সহায়তা করিতেছেন।

তাই আচার্য্য বলিলেন, "যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম মানিতাম, তখন এক অবস্থা; এখন নববিধান মানি, এখন আর এক অবস্থা। বিধান মানা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এখন নিজের হাতে আর কিছুই নাই।" অন্যত্র তিনি বলিলেন, "আমি চিরদিনের জন্য বিক্রীত হইয়া গিয়াছি। আমার জীবন নাই যে আমি তাহা যাপন করিব, আমার ধর্ম্ম-মত নাই যে তাহা শিক্ষা দিব। আমি অন্য স্বাধীন জীবনের মত ভাবিতে, কাজ করিতে, ইচ্ছা করিতে পারি না। আমার স্বাধীনতা নাই।" ইহারই অর্থ বিধান মানা। বিধান মানিলে বিধাতার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিক্রয় করিতে হয়, আমার বলিবার কিছু থাকে না। তখন আমার ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম নয়, আমার জীবন আমার জীবন নয়, সকলই বিধাতা কর্তৃক অধিকৃত। বিধাতা যেমন সাধন করান, তেমনি সাধন করি; বিধাতা যাহা বলান, তাই বলি এই অবস্থা প্রকৃত বিধান মানার অবস্থা।

তাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বিধান যখন নববিধানরূপে অভিব্যক্ত হইল, তখন আর তাহা মানবীয় পুরুষকার-সাধ্য সাধন-সাপেক্ষ ধর্ম্ম রহিল না; বিধাতা স্বয়ং তখন ধর্ম্মভার লইয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রেরণাধীনে ইহাকে গ্রহণ করিলেন। ইংরাজ রাজ্য ভারতে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একটী ব্যবসাদার দল ইহা প্রথম অধিকার করেন; কিন্তু যখন স্বয়ং রাজরাজেশ্বরী মা ভিক্টোরিয়া এই রাজ্যের ভার লইলেন, তখন পাঁচজন সওদাগরের বুদ্ধি যুক্তির পরিচালনায় ইহার আর পরিচালন ব্যবস্থা রহিল না। প্রত্যক্ষ রাজবিধির অন্তর্ভূত ইহার শাসন পরিচালন চলিল। তখন ভারতবর্ষ ইংরাজ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল, ইহার নামও ভারত-সাম্রাজ্য হইল। ঠিক তেমনি যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে ব্রাহ্মদিগের বুদ্ধি-বিচারাধীন সাধন-সাপেক্ষ ধর্ম্ম ছিল, স্বয়ং বিধাতা তাহাকে তাঁহার বর্ত্তমান নবযুগের নববিধান বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও স্বহস্তে ইহার সমুদয় কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; এবং আপন প্রত্যাদেশে তাঁহার ভক্ত, প্রেরিত প্রচারক ও সাধকদিগকে পরিচালন করিতে লাগিলেন। তখন ইহার অবস্থা ভিন্ন রকম হইল। বাস্তবিক যদি আমরা ইহাকে বিধান বলিয়া মানিতে শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদেরও বিশ্বাস ও জীবন তদনুরূপ হইতে হইবে। আমাদের নিজেদের হাতে ইহার সাধ্য সাধনা বা বিধি ব্যবস্থা নয়। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাহাই আমরা বিশ্বাস করিয়া তাহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ব্রহ্ম-নৈকট্য।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সুতরাং তিনি আমাদের নিকটেই আছেন; কিন্তু আমাদের মন তাঁহার নৈকট্য উপলব্ধি না করিয়া বহির্বিষয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাই তিনি নিকটস্থ হইলেও দূরে অনুভূত হন। তিনি কিন্তু আমাদের ছাড়েন না, নানা প্রকারে আমাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অন্য কিছুতে না হইলে প্রতিদিন যে এ জীবনকে মৃত্যুর রাজ্যের দিকে টানিতেছেন, ইহা অভ্রান্ত সন্ধান। চাই না চাই, বুঝি না বুঝি, প্রতিদিন এ জীবন ক্ষয় হইতেছে এবং পরলোকের পথে প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে হইতেছে। যখন এদেহ থাকিবে না, এ মনের চাঞ্চল্য শেষ হইবে, আত্মাকে তখন ব্রহ্ম-সমীপস্থ হইতেই হইবে।

কথা কওয়া মা।

অপরিচিত রাজাকে আমি দেখিতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহার সহিত পরিচিত হই, ততক্ষণ তিনি আমার সহিত কথা কন না। তাই যুগে যুগে যাঁহারা ঈশ্বরের পরিচিত চিহ্নিত ভক্ত, তাঁহাদের সহিত ঈশ্বর কথা কহিয়া প্রত্যাদেশে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। অপর সাধারণে যে তাঁহার বাণী শুনিতে পায়, ইহা কেহ বিশ্বাসই করিতে পারে না। ধন্য নবযুগের নববিধান! এ বিধানে তিনি কিনা সবার মা হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট পরিচিত অপরিচিত নাই, ছোট বড় নাই, সকলেই তাঁহার শিশু সন্তান; তাই সকলের সঙ্গেই তিনি কথা কন, কাহারও কাছে আর ঘোমটা দিয়া থাকেন না। বিবেক কাণে প্রত্যেককেই তিনি প্রতিনয়ত কথা বলিতেছেন। তবে বধির যার কাণ, সেই কেবল এযুগে তাঁর কথা শুনিতে পায় না। তিনি সর্ব্বদা কাছে থাকিলেও অন্ধ যেমন দেখিতে পায় না, তেমনি বধির যে, সেও তাঁর বাণী শুনিতে পায় না। অবিশ্বাসই আমাদের অন্ধতা এবং মোহ, অজ্ঞানতা, অহং ও বিষয়-বুদ্ধি আমাদের বধিরতা, ইহারাই তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে দেয় না। এই দুই প্রকার অন্ধতা ও বধিরতা অপসারিত হইলেই, আমরা সহজে মাকে দেখিতে পাই এবং সহজে তাঁর কথা শুনিতে, বুঝিতে ও তাঁহার মতে চলিতে পারি। সরল প্রার্থনারূপ ঔষধ-সেবনে আমাদের এ দুই রোগ যায়।

উদ্বোধন।

(১৯শে নবেম্বর, নবদেবালয়ে, ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসবে, উপাসনার উদ্বোধনে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক বিবৃত)

মহাতীর্থে যাবার নিমন্ত্রণ আজ এসেছে। ব্রহ্মসাগর-সঙ্গম মহাতীর্থে। ব্রহ্মকৃপার হিল্লোলে, বিজয়-নিশান তুলে, চল ভাই সকলে, প্রেমানন্দে ধাই। বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনামগুণ প্রাণভরে গাই। এই তীর্থে গৌর, ঈশা, মহম্মদ, শাক্য, মুষা, শঙ্কর, নারদ, যোগী ঋষিগণ আনন্দে অবগাহন করেন। সেথায়, বিশ্বধাম কাঁপাইয়া, জয় জয় ব্রহ্মনাম, অবিরাম উঠিতেছে; ব্রহ্মানন্দে সবে একঠাঁই মিলেছে। সেই পুণ্য-তীর্থ-জলে, চলরে সকলে, স্নানাবগাহন করি; অনন্ত শান্তির জলে, সকল জ্বালা দূরে যাবে। পাপরাশি ধুয়ে, যোগানন্দে হেসে, জীবন্মুক্ত হয়ে, শান্ত শান্তি হরি বলি। হরিপদতলে, মিলে ভক্তদলে, হরি-প্রেমানন্দে গ'লে, ভেদাভেদ ভুলে, এক পরিবার হব। প্রতি ঘটে ঘটে, সবাকার মুখে, এক প্রাণাধার ব্রহ্ম সুখে নিরখিব।

এই কমলকুটীরে আমরা আজ এসেছি, এই নবদেবালয়ে ভাই ভগিনী মিলে সকলে এসেছি, সেই ব্রাহ্মনামগুণ গান করবার জন্য। এই কমলকুটীরাধিপতির নবদেবালয়ের আচার্য্য-দেবের জন্মোৎসবের আজ এই বিশেষ আয়োজন।

হিন্দু পঞ্জিকায়, ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণপক্ষে, অষ্টমীতিথিতে হিন্দুদের সেই আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব, নন্দোৎসব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেইদিনে "গোকুলে পাইয়ে গোবিন্দ, ধরেনা (সবার) আনন্দ" এই গান গীত হয়। কি মহামহোৎসব ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে; আনন্দের জয়ধ্বনি সর্ব্বত্র নিনাদিত হয়। ডিসেম্বর মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে, খৃষ্টীয় সমাজে, Xmas, খৃষ্টের জন্মোৎসব, খৃষ্ট-জগৎ জুড়ে সংসাধিত হয়; কি আনন্দোৎসব, কি হর্ষ-সমীর সকলের প্রাণ বহে। আর বৈশাখী পূর্ণিমাতে, নির্ব্বাণের পথপ্রদর্শক তথাগতের জন্মোৎসব, নির্ব্বাণপন্থী বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত। আরব দেশের পীর পয়গম্বর, হজরৎ মহম্মদের জন্মদিনের উৎসব, মুসলমান সম্প্রদায় কোন দিন বিস্মৃত হন না। ফাল্গুণী পূর্ণিমাতে, নদীয়ার গোরার জন্মদিনে, তাঁর ভক্ত সন্তানেরা প্রেমমদিরাপানে কিরূপ মাতোয়ারা হন, সকলের তাহা জানা আছে।

নববিধান-বিশ্বাসী, নববিধানের উপাসক, তুমি কি তোমার আচার্য্যের জন্মতিথি অতীতের বিস্মৃতিতে নিহিত রাখিবে, না, সেইদিনে আনন্দোৎসব মহাযজ্ঞ মহোৎসব করবার জন্য সকল ভাই ভগিনীকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিবে? নিমন্ত্রণ বাহির হইল, ব্রহ্মসাগরসঙ্গম মহাতীর্থে মহাসম্মিলনের জন্য।

যেদিন "ওঁ পিতা নোঽসি" এই পূজার মন্ত্র প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল, সেদিনে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হয়ে সেই বাণী শুনেছিল, এবং সেই স্বর্গস্থ পিতার উপাসনায় যোগ দিয়েছিল। যেদিন "মামেকং শরণং ব্রজ, নান্যনায় ভিন্নঃ পন্থাঃ" এই উক্তি সেই শ্রীভগবানের মুখ হতে বাহির হয়েছিল, তখন তাঁহারই সৃষ্ট জগৎ, সেই দেবতারই পূজা বন্দনায় নিজেদের নিযুক্ত করেছিল। যখন "I am the Way, I am the Light. Behold the Kingdom of Heaven on earth. I and my Father in Heaven are one." এই সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল, তখন সকলেই নিঃশব্দে সেই আদেশের অনুসরণ করেছিল।

"আল্লাহো আকবর, হুএ আল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা" এই রবে যখন আজান ঘোষিত হয়, তখন সমগ্র মহম্মদীয় মণ্ডলী সেই একেশ্বরের নিরাকারের উপাসনার জন্য, নমাজের জন্য, নিজেদের প্রস্তুত করে।

যখন "মেরেছ ভাই কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না" এই কথা বলে গোরা নেচে নেচে, প্রেমধন বিলায়ে ছিলেন, তখন এই ধরাধাম সেই প্রেমধাম, বৈকুণ্ঠধামে পরিণত হয়েছিল। আর আজকে, যখন সেই নববিধানের দেবতার নব ভাবে পূজার জন্য, নববিধানাচার্য্যের প্রদর্শিত প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনার জন্য, সকলে এই নবদেবালয়ে আহূত হইয়াছি, তখন "কে কোথায় আছ ভাই", প্রেমানন্দে নেচে নেচে, এই আনন্দের জন্মোৎসবে, সেই নববিধানের দেবতা, আনন্দময়ী, স্নেহময়ী মাতার নামগান, আরাধনা, বন্দনায় যোগদান কর।

এই উপাসনাই ব্রহ্মসাগর-সঙ্গম মহাতীর্থ। এই তীর্থেই সকল মহাজন-সমাগম, ব্রহ্মানন্দে। এই তীর্থ-জলে স্নানাবগাহন করিলে সকল পাপরাশি ধৌত হয়ে যায়, যোগানন্দে সকলের মুখে হাস্যময়ী মার রূপের ছটা প্রকাশিত হয়; আর তাঁহারই আশীর্ব্বাদে জীবন্মুক্ত হয়ে, সকলে শান্তি সমাধিতে মগ্ন হয়ে যান।

তবে আর বিলম্ব কিসের, কিসের ভয় ভাবনা। ব্রহ্মকৃপা-স্রোত অবিরত প্রবাহিত, তারি হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে, ব্রহ্মকৃপার বিজয়-নিশান উড্ডীয়মান করিয়া, সেই বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনামগুণ এস সকলে গাই। এ সকল তাঁহারই কৃপা, এ সকল তাঁহারই দয়া; এই নবযুগে সেই চিরদিনের আরাধ্য দেবতা নববিধানের নবশিশুকে জন্মদান করিলেন, এই ব্রহ্মসাগর-সঙ্গম মহাতীর্থ দেখাইবার জন্য; সেই মহাতীর্থে "তোরা আয়রে ভাই" এই কথা বলিয়া ডাকিবার জন্য। যুগে যুগে কত বিধান জগতে আসিয়াছে, তুমি কি বিশ্বাস কর, সেই বিশ্ববিধাতা যে বলিয়াছিলেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে"? এই কথায় যদি তোমার প্রাণ সায় দেয়, তবে, হে নববিধান-বিশ্বাসী, নববিধানের উপাসক, আজকের দিনে সেই নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে কি স্বীকার করিবে না? নববিধানের দেবতা তাঁরই এই প্রিয় পুত্রের ভিতর দিয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের কথা, মহাসম্মিলনের কথা, নূতন বিধানের মহাসঙ্কীর্ত্তন ঘোষণা কি করেন নাই?

"যিনি বেদে ব্রহ্ম তিনিই পুরাণে শ্রীহরি,
একেতে অনন্তরূপ দেখ প্রাণ ভরি।"

অখণ্ড সচ্চিদানন্দে খণ্ড করো না, করো না। জ্ঞান-নেত্রে সেই দেবতাকে পিতারূপে দেখ, আর তোমার হৃদয়াধারে মা আনন্দময়ী চিরদিন বিরাজিত। এই নব নব ভাবে, নব নব বেশে, নববিধানের আলোকে সেই নববিধানের দেবতাকে দর্শন করে, পূজা বন্দনা করে, সকলে ধন্য হও, কৃতার্থ হও। তাই এসো; সকল ভাই ভগিনী, এই কমলকুটীর, এই নবদেবালয় যাহা আচার্য্যদেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এই মহাতীর্থে কত মহা মহোৎসবের আয়োজন করবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়েছিলেন, জীবনের শেষ দিনে তিনি তাঁর প্রাণের দেবতার অভয়চরণ পূজা করে, সেই পরব্রহ্মের স্তোত্র পাঠ করে, নিজেকে সার্থক মনে করেছিলেন, সেই স্থান মহা পুণ্যস্থান, সেখানে তাঁর জন্মোৎসব, সকলেরই মনে আনন্দ উপচি' পড়ছে।

আনন্দময়ী মার আনন্দ কোলে আজ সেই ব্রহ্মানন্দকে দর্শন করি, আর সেই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলে, নববিধানের নবভাবে, নববিধানের শ্রীহরি, নববৃন্দাবনের ঠাকুরের নব নৃত্য দর্শনে প্রাণ মনকে বিমোহিত করি। তাঁরই উপাসনার, পূজার প্রারম্ভে এই অধিকারের জন্য, এই পরম আশীর্ব্বাদের জন্য, কৃতজ্ঞতাভরে তাঁরই চরণে বার বার নমস্কার করি। তিনি এই পূজা গ্রহণ করুন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে সার্ব্বভৌমিক অখণ্ড এবং খণ্ড সাধনের সামঞ্জস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, ঈশ্বর-দর্শন ও তাঁহার বাণী-শ্রবণ এই দুই স্বর্গীয় পক্ষ আশ্রয় করিয়া কেশবপাখী নবযুগের নব সাধনাকাশে বিচরণ করিলেন। মুক্তিপ্রদ বিশ্বাস সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, Perception and hearing এই দুইটী বিশ্বাসের ভিত্তি। প্রার্থনা হইতে যেমন ঈশ্বরের বাণী-শ্রবণ আরম্ভ হইল, এই প্রার্থনা-যোগে সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের সত্তার উপলব্ধিও আরম্ভ হইল। তিনি জীবনবেদে প্রার্থনার ফল বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম"। এই বল কি? জীবনে ব্রহ্মের অবতরণের ফল ব্রহ্ম-বল। তিনি এই ব্রহ্মবলের ভিতরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ইহারই উচ্চ পরিণতি অন্তরে ব্রহ্মদর্শন ও উজ্জ্বল ব্রহ্মানুভূতি। God-vision and God-perception, এ সব হইল ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র অবলম্বনে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। এই মন্ত্র যোগে তিনি ভূমা মহান্ অনন্ত ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি আপনার মধ্যে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ ও ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি-যোগে ব্রহ্মপরিচয় লাভ করিয়াছিলেন; এখন তিনি সেই ঈশ্বরকে অনন্ত মন্ত্রে উপাসনা করিয়া, ভূমা মহান্ অসীম অনন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন। আপনার জীবনে প্রথমে তিনি ঈশ্বরকে জীবনগতরূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তাই এখন সেই ঈশ্বরকে ভূমা মহান্ অনন্ত রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া, ঈশ্বর যে সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বগত এবং যে ঈশ্বর সর্ব্বাতীতরূপে আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ-মান, সেই ঈশ্বর সর্ব্বগতরূপে বিশেষ বিশেষ জীবনে বিশেষ লীলা-বিহারী দেবতা, ইহাই তাঁহার সহজ উপলব্ধির বিষয় হইল। তিনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের প্রকাশে ও বিকাশে যেমন নিজের বিশেষত্ব দর্শন করিতে লাগিলেন, তেমনি অন্যের জীবনে, বিশেষ ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুমহাজনদিগের জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ ও তাঁহাদের বিশেষত্ব দেখা সহজ ও স্বাভাবিক হইল। ঈশ্বর যে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ঋষিদিগের এ দর্শনেরও উপলব্ধি তাঁহার জীবনে বিশেষ আকার ধারণ করিল।

তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উষাকালে প্রাথমিক ক্ষুদ্রাকারের দর্শন শ্রবণের ভিতর দিয়া আত্মিক জীবন যতই গড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই তিনি অনন্তের আকর্ষণে পড়িয়া অনন্তের পানে ছুটিলেন। তিনি দেখিলেন, যিনি জীবনে দর্শন-শ্রবণ-যোগে জীবনের লীলা-বিহারী দেবতা হইয়া জীবনকে গড়িয়া তুলিতে-ছেন, তিনিই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত ঈশ্বর হইয়া, অনন্ত জীবন-পথে তাঁহার দিকে ক্রমাগত টানিতেছেন। এইরূপে ঈশ্বরের অখণ্ড সত্তা ও খণ্ড সত্তার উপলব্ধি ও ধারণা স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। যে কেশব জীবনের প্রথমে জ্ঞান-চর্চ্চা ও বিবেক বৈরাগ্যের যোগে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, অল্পদিন মধ্যেই ঈশ্বরের কৃপাস্পর্শের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনে ভক্তির সঞ্চার হইল। বৈষ্ণব পরিবারে ভক্ত-বংশে তাঁহার জন্ম, তাঁহার জীবনে এতদিন ভক্তি নিষ্ক্রিয়ভাবে স্থিতি করিতেছিল, এখন তাহা উৎসের আকারে উৎসারিত হইল, ক্রমে উত্তাল তরঙ্গে পরিণত হইল। যখন ভক্তিচক্ষু খুলিয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বদেশের বিদেশের যোগী ঋষি সাধু ভক্ত সকলের জীবনে—কোন জীবনে ব্রহ্মদর্শনের বিশালতা, কোন জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের বিশালতা, কোন জীবনে ভক্তির বিশালতা, কোন জীবনে যোগের বিশালতা, কোন জীবনে কর্ম্মের বিশালতা দর্শন করিয়া, তাঁহাদের চরণে তাঁহার মস্তক সহজেই অবনত হইল। তিনি শিষ্য-প্রকৃতি ও শিশু-প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সকল খণ্ডভাব নিজে সাধন ও গ্রহণ করিয়া অখণ্ডে পরিণত করা, খণ্ডের ভিতরে এক অখণ্ড মহান্‌কে দেখা, অখণ্ড মহানের ভিতরে সকল খণ্ডকে দর্শন করিয়া সেই অখণ্ডে সকলকে স্বীকার করা যাঁহার জীবনের বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিশেষ নিয়তি, শ্রেষ্ঠ নিয়তি, তাঁহার জীবনে ক্রমে বিশেষ

বিশেষ মহাপুরুষদিগের ভাব গ্রহণ ও অনুসরণে, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের সাধন খণ্ড খণ্ড ভাবে আরম্ভ হইল। সর্ব্বগ্রাসী তাঁহার জীবন, সকলকে গ্রহণ করা তাঁহার জীবনের গূঢ় ভাব; তাই ঈশাকে গ্রহণ করিতে যাইয়া চৈতন্যকে বাদ দিতে পারিলেন না, ঈশা ও চৈতন্যকে গ্রহণ করিয়া ভারতের ঋষিদিগকে অবহেলা করিতে পারিলেন না, সকলকে গ্রহণ করিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জীবনবেদের "বিয়োগ ও সংযোগ" সাধনের ব্যাপারকে সুন্দরভাবে নিজেই বর্ণনা করিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, 'মন পূর্ণ বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে, আবার খণ্ড খণ্ডকে একত্র করিয়া এই মনই সংযোগ করে।...কাহারও মনে এই বিয়োগভাব প্রবল, কাহারও মনে আবার সংযোগ-স্পৃহা বলবতী। ... ... আমার স্বভাবের মধ্যে এ দুইয়ের সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। ...প্রত্যেক বিষয় সুক্ষ্মরূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে বুঝিবারই চেষ্টা ছিল। একটী একটী করিয়া বুঝিব, এই ইচ্ছাই বলবতী ছিল।...প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই, নববিধানে সমস্ত একত্র গাঁথিব; পরে দেখি, প্রকৃতি মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন। কে জানিত, ঈশাকে মানা উচিত? যখন দেখিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গকে না মানিলে আমার চলিতেছে না, নবদ্বীপ হইতে গৌরাঙ্গকে আনিয়া আদরে বসাইলাম। বুদ্ধের আবশ্যক হইল, তখনই বৃক্ষতল হইতে বুদ্ধকে প্রাণের মধ্যে আনিলাম। কে জানিত, তিনজনকে একত্র মানিতে হইবে? কে জানিত, ভগবান্ এইরূপে এক এক করিয়া আনিয়া ভক্তমণ্ডলী রচনা করিবেন? ....এইরূপে দিন গেল বটে, কিন্তু সামঞ্জস্যের দিকেই যাইতেছি, নববিধানের দিকেই যাইতেছি। আংশিক ধর্ম্ম ছাড়িয়া হৃদয় এখন পূর্ণতার দিকে গিয়াছে।......স্বদেশ মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন, ইহার অর্থ কেবল পূর্ণতা। এই পূর্ণতা মনের মধ্যে ছিল। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও"। খণ্ড খণ্ডের সংযোগ ও সামঞ্জস্যে পূর্ণ ব্রহ্মের সাধনা ও ধারণা বিষয়ে ব্রহ্মানন্দের জীবনের ভাব তিনি বিশদরূপে "আচার্য্যের উপদেশ" ১০ম খণ্ডে প্রকাশিত "অখণ্ড ঈশ্বর" ও "ব্রহ্মখণ্ডের সংযোগ" এই দুইটী উপদেশে ১৮৮০ পৃষ্ঠাব্দে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "ব্রহ্মখণ্ডের সংযোগ" উপদেশ হইতে কয়েকটী কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"ব্রহ্মের এক এক অংশ লইয়া কেহ ইংলণ্ডে, কেহ চীনরাজ্যে, কেহ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কি চমৎকার শোভা দেখ। সকলেই এক ব্রহ্মের সাধক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কাল, নীল, সবুজ, হরিৎ প্রভৃতি নানাবর্ণ। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন আপন ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছে, এবং আপনার অবতারকে শ্রদ্ধা করিয়া অপর অবতারকে উপহাস করিতেছে। এক ব্রহ্মখণ্ডের সঙ্গে অপর ব্রহ্মখণ্ডের সংগ্রাম। দেখ, ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মের যুদ্ধ। এই যে পৃথিবীতে কালীর সঙ্গে কৃষ্ণের, শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের, হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধের এবং খ্রীষ্টানের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ দেখিতেছ, ইহার মূলে ব্রহ্মবস্তুর বিয়োগ দেখিতে পাইবে। এই সকল অংশের আবার যখন যোগ হইবে, তখন আবার সেই পূর্ণ ব্রহ্মের পূজা প্রবর্ত্তিত হইবে।.........ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধান এই সমস্ত খণ্ড একত্র করিয়া পুনরায় পূর্ণাবয়ব ব্রহ্মপূজা প্রবর্ত্তিত করিবে।......নববিধানে বিয়োগের পরিবর্ত্তে যোগ, খণ্ড খণ্ড ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে অখণ্ড ব্রহ্মকে লাভ করিব।...এই নববিধানের কার্য্য, এই জন্য নববিধান পৃথিবীতে আসিয়াছেন।"

কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির ভিতর এই খণ্ড ও অখণ্ডের মিলন এবং সামঞ্জস্যের ভাব গূঢ়রূপে নিহিত ছিল। কিন্তু এ সাধনে তাঁহার গুরু ও নেতা কে? স্বয়ং ঈশ্বর। যে মন্ত্রে তিনি এই সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলেন, সে মন্ত্র কোথা হইতে পাইলেন? স্বয়ং লীলাময় ব্রহ্ম হইতে। সে মন্ত্র কি? "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" এখানে বিশ্লেষণে খণ্ড খণ্ড ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা, সাধনা, অখণ্ডভাবে ঈশ্বরের ধারণা ও ধ্যান।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

বেদের সার্ব্বজনীনতা এবং অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪। ঋগ্বেদের বয়ঃক্রম।

ঋগ্বেদের সময়েই ঋষিদিগের মধ্যে যে অধোগতির বীজদৃষ্টি হয়, তাহাই কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যজুর্ব্বেদের আকার ধারণ করিয়াছিল; এবং তাহারই বিরুদ্ধে চার্ব্বাকের সবল এবং তীব্র অভিযোগ, এবং গীতারও প্রাণপূর্ণ অভিযোগ। তাহা ভাল রূপে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে কল্পনাতে সেই ঋগ্বেদের ঋষিদিগের সময়ে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের অবস্থার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, আমাদের ঋগ্বেদই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ—"The oldest book in the library of mankind." তাঁহাদের এই মত যে, ইহুদিগের "আদি পুস্তকের (Genesis) বয়স তিন হাজার বৎসর এবং আমাদের ঋগ্বেদের বয়স অন্ততঃ চারিহাজার বৎসর। * ঋগ্বেদেও আবার "পূর্ব্ব" এবং "নূতন"

* "The Biblical record, I may remark", says Dr. Keith, "was made 3000 years ago by men who knew more of astronomy than of geology." (Nineteenth Century for Feb, 1928.) Max Muller says in his Science of Language: "As I

ঋষির ভেদ দৃষ্ট হয় :—"অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি র্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত ॥" ১—১—২ ॥ "অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদের উপাস্য এবং নূতন ঋষিদেরও উপাস্য ॥" "ক ঋতং পূর্ব্বং গতং কস্তদ্বিভর্ত্তি নূতনঃ" ॥ ১—১০৫—৪ ॥ "পূর্ব্বকালের ঋষিদের মধ্যে যে সত্য ছিল, নূতন ঋষিদের মধ্যে কে তাহা ধারণ করিতেছে ?" ঋগ্বেদের মধ্যেও "পূর্ব্ব" এবং "নূতন" ভেদ। পণ্ডিতবর তিলক বলেন, ঋগ্বেদের বয়স ছয় হাজার বৎসর। আমরা যে প্রমাণ পাইতেছি, তদ্দৃষ্টে ঋগ্বেদের বয়স তের হাজার বৎসরের কম বলিতে পারি না। অনেকেই গীতাতে পাঠ করিয়াছেন, "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং" ॥ ১০—৩ ॥ এবং জানেন যে, 'মার্গশীর্ষ' অর্থ 'অগ্রহায়ণ'। অগ্রহায়ণ মাসের প্রাধান্য কেন ? মার্গশীর্ষ অর্থ রাস্তার মস্তক, অর্থাৎ সূর্য্যের বার্ষিক রাস্তার মস্তক বা আরম্ভ। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতেছি যে, এখন আমাদের যে বৎসর বৈশাখ মাসে আরম্ভ হয়, এক সময়ে আমাদের সেই বৎসর অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ মাসে আরম্ভ হইত। সে সময় কখন ছিল ? শতপথব্রাহ্মণ-রচনার সময়। (আমাদের "বেদমাতা মানব-মণ্ডলীর আদিম ধর্ম্মমাতা", পৃঃ ২৯ হইতে ৩২ দেখ) "সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ। মৃগ-শীর্ষেঽগ্নী আদধীত। এতদ্বৈ প্রজাপতেঃ শিরো যন্মৃগশীর্ষং"। (১০—২—৫—১৩), অর্থাৎ শতপথ ব্রাহ্মণের সময়েই বৎসরাত্মক প্রজাপতির মস্তকস্বরূপ মৃগশীর্ষনক্ষত্রযুক্ত অগ্রহায়ণ মাসে বৎসরের আরম্ভ হইত। তাহার তুলনায় এখন বৈশাখ মাসে আরম্ভ হওয়াতে, আমাদের প্রচলিত বৎসর ছয়মাস পিছাইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ "Precession of the equinoxes"—অর্থাৎ সূর্য্য প্রতিবৎসর কিঞ্চিৎ আগে বিষুবরেখাতে আগমন করে। এই অগ্রগতি ২৬০০০ বৎসরে ৩৬০ ডিগ্রি পূর্ণ হয়, অর্থাৎ ২৬০০০ বৎসরান্তে সূর্য্য তাহার পূর্ব্ব স্থান লাভ করে। অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত এই ছয়মাসে সূর্য্য ১৮০ ডিগ্রি অগ্রগামী হইয়াছে। তাহাতে ১৩০০০ বৎসর লাগিয়াছে—অর্থাৎ শতপথ ব্রাহ্মণেরই বয়স ১৩০০০ তেরহাজার বৎসর, ঋগ্বেদের বয়স তাহারও অধিক না হইয়া পারে না।

৫। বৈদিক কালের অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষি ও স্থূল-দর্শী জনসাধারণ।

আদি বৈদিক ঋষিদিগকে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকেও কল্পনার ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া সে সুদূর অতীতকালে প্রবেশ করিতে হইবে। জাগতিক ক্রমবিকাশের (Evolution) পথে আমাদিগকেও কল্পনা দ্বারা জাগতিক ক্রমবিকাশের সেই ধাপে স্থান গ্রহণ করিতে হইবে, যে ধাপে উঠিয়া আমাদের পিতৃপুরুষদের অগ্রণী ঋষিগণ প্রথমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং তদাশ্রিত স্থূল বুদ্ধির ধাপ (Senses and Intellect) অতিক্রম করিয়া, অতীন্দ্রিয় বিষয় এবং তদাশ্রিত আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ—"একাত্মপ্রত্যয়সারং"—ঈশ্বরানুভূতির ধাপে (Instinct or Supra-intellectual intuition) পাদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ক্রমবিকাশবাদ-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশক মিঃ ডারবিন ভ্রমক্রমে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে "প্রকৃতি কখনো লাফ দিয়া অগ্রসর হয় না"—"Natura non-facit saltum"। তাঁহারই পরবর্ত্তিগণ তাঁহার সেই ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। সেই সুদূর অতীতকালে পাঁচহাজার কি দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, প্রকৃতি যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং বিষয়-বুদ্ধির সমুদ্রে নিমগ্ন মানব-মণ্ডলীর মধ্যে প্রথম লম্ফ প্রদান করিয়া, সমুদ্রমধ্যে জলবিন্দুর মত দুই একজন অতীন্দ্রিয়দর্শী আদিম ঋষিকে আবির্ভূত করিলেন, যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে যাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছেন :—"সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ" ॥ ১·৬·৫ ॥ আত্মার রাজ্যের সম্বন্ধে প্রথম জাগ্রত সেই অত্যল্পসংখ্যক অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিদের অবস্থা কল্পনা কর। তুমি নিজেই যদি তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতে, তবে কি করিতে, কল্পনা কর। মোক্ষমূলার প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, "অতীন্দ্রিয়বাচী যত শব্দ আমাদের ভাষায় আছে, সকলি উপমিতিবলে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবাচী শব্দ হইতে উৎপন্ন"—(Science of Language, II—387)। আজ যে আমরা 'আত্মা' 'আত্মিক,' 'পরমাত্মা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতেছি, তাহার মূলে যাও ; দেখিতে পাইবে, ইহারও মূলে উপমিতি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। 'আত্মা'—'অত' ধাতু হইতে সম্পন্ন, অর্থ সতত-গমনশীল, এবং নিঃশ্বাস বায়ুর প্রতি প্রযুক্ত। "অততি অত সাতত্যগমনে" (যাস্ক)। "আত্মৈব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতং" ॥ ১—৩৪—৭ ॥ "আত্মা বা সততগমনশীল নিঃশ্বাস বায়ু যেমন নিরন্তর শরীর মধ্যে গমনাগমন করে, তোমরাও সেইরূপ যজ্ঞগৃহে গমনাগমন কর।" সেই আদিম বৈদিক ঋষিগণ যখন প্রথমে অতীন্দ্রিয় আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রথম চেতনা লাভ করিলেন, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের উপমা দ্বারা ভিন্ন অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এক সময়ে "আত্মা" শব্দেরই দুইটি অর্থ ছিল :—(১) সততগমনশীল নিঃশ্বাস বায়ু, এবং (২) বায়ুর মত চক্ষুর অদৃশ্য "আত্মচৈতন্য"। সেইরূপ অগ্নি 'অগ্রণী', অথবা প্রকাশার্থক অঞ্জ ধাতু হইতে—"অঞ্জনমভিব্যক্তং বস্তুপ্রকাশকত্বাৎ অক্তত্বেন বা নয়তীতাগ্নিঃ" (যাস্ক)। অগ্নি শব্দও বেদে দ্ব্যর্থক (১-১)। সেইরূপ 'বায়ু' "বাতি গচ্ছত্যন্তরিক্ষে" এবং 'আপঃ' "ব্যাপ্নোতি

sketched the history of Sanskrit, in one of my former lectures, it must suffice at present, to mark the different periods of that language, beginning about 1500 B. C. with the dialect of Vedas" (I-V). In other words—"The oldest hymns of the Rigveda, such as those to *Ushas*, may have been composed as early as 1500 B. C." i.e, 3431 years ago.

ন্তরিক্ষং সর্ব্বং জগৎ" [যাস্ক]। ইন্দ্র—"ইরাং মেঘং ধারাঘনা দৃণাতি বিদারয়তি," অথবা "ইরামন্নং ভদ্দধাতি"। 'শচী' অর্থ সৎকর্ম্ম—এজন্যই ইন্দ্র 'শচীপতি'। বরুণ "বৃঞ্ বরণে—অন্তরিক্ষে উদকমাবৃণোতি" (যাস্ক),—অথবা বিপদ হইতে সকলকে আবরণ করিয়া রক্ষা করেন। সেরূপ "অশূব্যাপ্তৌ—ভাষা সর্ব্বং জগদ্ ব্যাপ্নুতঃ—দ্যাবাপৃথিব্যাহোরাত্রে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বাশ্বিশব্দা-ভিধেয়ৌ" (যাস্ক—অথবা সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর অশ্বিন্ শব্দার্থ। (আমাদের ঋগ্বেদ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৪৭—১৫৫ দ্রষ্টব্য) এই সকলই ঋগ্বেদে দ্ব্যর্থক—এক অর্থ ভৌতিক, আর এক অর্থ উপমিতিবলে পরমেশ্বর। এই জন্যই স্বামী দয়ানন্দ ঋগ্বেদের দেবতা সকলের ভিতরে উপমিতি এবং শ্লেষালঙ্কারের খেলা দেখিয়া বলিতেছেন:—"অত্র শ্লেষালঙ্কারেণেশ্বরভৌতিকাবর্থৌ গৃহ্যেতে" ॥ ১-৩-১১-১২ ॥ ঋগ্বেদ স্বয়ংও অগ্নির এই দ্বিতা বা দ্ব্যর্থকত্ব ঘোষণা করিতেছে—"দ্বিতা যদীং কীস্তাসো অভিদ্যবো নমস্যন্ত উপবোচন্ত ভৃগবো মথ্নন্তো দাশা ভৃগবঃ ॥" ১—১২৭—৭—॥ 'ভৌতিক এবং ঐশ্বরিক এই উভয় অর্থের প্রকাশক অগ্নির গুণকীর্ত্তনকারী নমস্কারনিরত উজ্জ্বলকান্তি ভৃগুবংশীয়গণ হবিঃ-প্রদানার্থ অরণিদ্বয়ের মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া অগ্নির স্তব করিতেছেন।" (৩—২—১; ৩—১৭—৫; ৪—৪২—১; ৬—১৬—৪; ৬—৪৫—৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। ঋগ্বেদে এই "দ্বিতা" বা দ্ব্যর্থবত্তার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তৎপ্রতি মনোযোগ না করিয়া, ঋগ্বেদের একেশ্বরবাদ [Theism] সম্বন্ধে নানা প্রকার অলীক কল্পনা জল্পনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ যে একেশ্বরবাদী, প্রত্যেক মণ্ডল তাহার প্রমাণে পূর্ণ; সে সম্বন্ধে কোন সংশয়ের স্থান নাই। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কল্পনা জল্পনা সম্বন্ধে আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে।

"উপমিতি এবং শ্লেষালঙ্কার"—স্বামী দয়ানন্দ-প্রদত্ত এই চাবিদ্বারা বৈদিক দেবতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে বেদের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে।

তবে একথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একালেরই মতন বৈদিক কালেও অতীন্দ্রিয়দর্শী আত্মার রাজ্যে জাগ্রত ঋষি অতি কমই ছিল—সমুদ্র মধ্যে এক ফোটা জলের মতন ছিল। বৈদিক জনসাধারণেরও মন একালেরই মত স্থূলদর্শী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে আবদ্ধ, এবং অন্নবস্ত্রের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল "পরিচিন্মর্তো দ্রবিণং মমন্ত্যাৎ" ১০—৩৩—২। বরং এ কালে উন্নত দেশ সকলে সহযোগিতা এবং অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার বলে "কল্য যে রেলের কুলি ছিল, অদ্য সে সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী"—"The engine-cleaner of yesterday is the Prime Minister of to day"; কিন্তু ভারতের জনসাধারণ আজও যে তিমিরে, বৈদিককালেও সেই তিমিরেই ছিল। ঋষি বৃহস্পতি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন:—"ইমে যে নার্বাঙ্ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণা সো ন সুতে করাসঃ, ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সীরীস্তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ ॥" ১০-৭১-৯ ॥ "এই যে জনসাধারণ, ইহারা সংসারের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকল যেমন বুঝে না, সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্ব বিষয়েরও আলোচনা করে না; ইহারা স্তোত্র উচ্চারণ করে না, সোমাভিষেকও করে না। ইহারা দোষযুক্ত বিকৃত ভাষা ব্যবহার করে, এবং মূর্খতাবশতঃ কেবল লাঙ্গল অথবা তাঁত চালনাই অভ্যাস করে।" "ন ব্রাহ্মণা সো ন সুতে করাসঃ' বলাতেই কি সকল মানুষের ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার স্বীকার করা হইতেছে না? হায়, জাতিভেদের দানব, হায়, ব্রাহ্মণের বেদের উপরে একাধিপত্যের দানব, তুমি তখন কোথায় লুকাইয়া ছিলে? আবার ঋষি শিশু বলিতেছেন:—"নানানং বা উনো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাং। তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগ্ ব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছতি ॥ জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাং। কার্মারো অশ্মভির্দ্যুভি-র্হিরণ্যবন্তমিচ্ছতি ॥ কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা। নানাধিয়ো বসূয়বোঽনু গা ইব তস্থিম ॥" ৯—১১২—১, ২, ৩ ॥ "(হে সোম) আমাদের কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অন্যান্য লোকেরও কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। মিস্ত্রি কাঠের কর্ম্ম, বৈদ্য রোগীর, আর স্তোত্র-উচ্চারণকারী সোমযাগ-করণেচ্ছু লোক অনুসন্ধান করে। কর্ম্মকার পুরাণ কাষ্ঠখণ্ড, পাখীর পাখা এবং বাণ ধারাইবার জন্য উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ড লইয়া ধনবান্ লোকের অনুসন্ধান করে। আমি স্তোত্র-রচনাকারী—(বেদ অপৌরুষেয় কি অর্থে, আপনাদের এস্থলে তাহা বুঝিতে হইবে); আমার পুত্র বৈদ্য, আমার কন্যা প্রস্তর-নিক্ষেপ দ্বারা ছাতু প্রস্তুতকারিণী। আমাদের ব্যবসায় নানাপ্রকার। আমরা ধনলাভের প্রয়াসী; গরু যেমন ঘাসের জন্য বেড়ায়, আমরাও সেইরূপ।" বৈদিককালেও লোকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ধনীদেরই

* ঋগ্বেদ দ্রষ্টব্য:—১—১—৯; ১—৭—৮, ৯; ১—২৪—৮, ৯, ১০; ১—৩২—১৫; ১—৫২—১৪; ১—৫৯—১; ১—১৬৪—৪৬; ২—১—৩ হইতে ৯; ২—৩—৮; ২—১২—৫, ৮, ৯; ২—১৩—৬; ২—১৬—১, ২; ২—১৭—৫; ২—২৩—৫, ১১; ২—২৭—১০; ২—২৮—৬; ২—৩৫—২; ২—৩৮—৯; ২—৪১—১৬, ১৭; ৩—৪৬—২; ৩—৫১—৪; ৩—৫৩—৮; ৪—১৭—৫; ৪—৩২—৭; ৫—[illegible]—৯; ৫—৪০—৫; ৫—৮৫—৬; ৬—১৮—২; ৬—২২—১; ৬—৩০—১; ৬—৩৪—২; ৬—৩৬—৪; ৬—৪৫—২০; ৬—৪৭—১৮; ৭—২৩—৫; ৭—৯৮—৬; ৭—৯৯—২; ৮—২—৪; ৮—৬—৪১; ৮—১৩—৯; ৮—১৫—৩; ৮—১৪—১৯; ৮—৭৭—৩; ৮—৩৯—১০; ৮—৫৮—২; ৮—৭০—৫; ৯—৮৬—৫; ৯—৯৬—৫; ১০—৫—১; ১০—২২—৮; ১০—৩১—৭, ৮; ১০—৭৭—১৪; ১০—৪৩—৬; ১০—৮১—৩; ১০—৮২—৩; ১০—৯০—২, ৩, ৪; ১০—১১৪—৪; ১০—১২১—১, ২, ৩, ৮; ১০—১২৯—৭ ॥

পদ সেবা করিত। সেই সকল স্থূলদর্শী লাঙ্গল ও মাকু চালনাতে ব্যস্ত সাধারণ লোক উপমিতি এবং শ্লেষালঙ্কারের ভিতর দিয়া, অগ্নি, বায়ু, আপঃ, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদির বাহ্য প্রকাশের ভিতরে "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" ঋষির সাক্ষাৎ দৃষ্ট অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অথবা ধর্ম্মের তত্ত্ব দর্শনে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল। সেই "অপ্রজ্ঞঃ" বা অজ্ঞ জনসাধারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদের প্রতি জড়-পূজার [Physiolatry] যে দোষারোপ করেন, হয়ত একালের মত বৈদিক সময়েও অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে অনেকে সেই দোষে দোষীও ছিলেন। তবে মূর্খ খ্রীষ্টানকে দেখিয়া খৃষ্টধর্ম্মের বিচার করা, অথবা মূর্খ মুসলমানকে দেখিয়া ইসলামের বিচার করা যেরূপ অবিচার, সেইরূপ বৈদিককালের মূর্খদেরে দেখিয়া বৈদিকধর্ম্মের বিচার করা সেইরূপ অবিচার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

প্রাতঃস্মরণীয় গান।

প্রেরিত-স্মরণ।

জয় ঈশা, মুষা, মোহম্মদ, শাক্য, গৌর সুন্দর।
জয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নরামর-সঙ্কর।
রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন, প্রতাপ, বিজয়, অঘোর;
ত্রৈলোক্য, অমৃত, গিরিশ, দীননাথ, বঙ্গ, উমানাথ, গৌর।
কান্তিচন্দ্র, রাম, মহেন্দ্র, প্রসন্ন, প্যারী, কেদার;
প্রাণকৃষ্ণ, দীন, বৈকুণ্ঠ, ঈশান, দাস কালীশঙ্কর।
নন্দলাল, ব্রজগোপাল, কাশীরাম, কালী, ফকির;
আশু, বলদেব, শান্তশিব, প্রমথলাল প্রিয় সবার।
[নব] বিধান-প্রেরিত, প্রচারক যত, দেহে অদেহে ইহপর;
স্মরিয়া সকলে, ব্রহ্মকৃপাবলে, হই ব্রহ্মানন্দে একাকার।

সাধকসাধ্বীগণ-স্মরণ।

কৃষ্ণবিহারী, কুঞ্জবিহারী, দীন, রাজমোহন, রামেশ্বর;
অপূর্ব্ব, প্রকাশ, নগেন, শ্রীশ, বিনয়, মোহিত, হরসুন্দর।
মধু, যদু, গোপাল, নিত্য, নৃত্যগোপাল, হীরা, রমেশ, মুক্তেশ্বর, হর;
সত্য, সত্য, অমি, মনোমত, প্রেমেন্দ্র প্রমোদ সুন্দর।
দেবী মা সারদা, জগন্মোহিনী, সৌদামিনী, কামিনী অঘোর;
করুণা, নৃপেন্দ্র, প্রফুল্ল, রামচন্দ্র, নন্দলাল ভক্ত-পরিবার।
সাধ্বী সাধক, দল পরিবার যতেক, দেহে অদেহে ইহপর;
স্মরিয়া সকলে, ব্রহ্মানন্দে গলে, নমি নববিধানেশ্বর।

দীন সেবক।

প্রেরিত পত্র।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে সেবা-সাধন।

বিগত ২২শে অক্টোবর, কলিকাতা হইতে মুঙ্গের যাইবার পথে কুলটীতে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্র রায়ের প্রবাস-ভবনে অতিথি হইয়া, তাঁদের সহিত উপাসনা, আলোচনা এবং নববিধান-মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থা ও বিধানপরিবার বিষয়ে প্রসঙ্গ হয়। ২৩শে স্বর্গীয়া তপস্বিনী ক্ষীরোদমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা করিতে হয়। ২৫শে মুঙ্গের তীর্থে উপনীত হইয়া ঐ দিন রবিবাসরীয় উপাসনা এ দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। ২টী উকীল, একটী মুড়ী ব্যবসায়ী ও কুমারী শান্তিপ্রভা কন্যাসহ যোগদান করেন। ২৬শে স্বর্গীয় শশিভূষণ মল্লিকের ও তাঁর কন্যার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও সায়ংকালে কষ্টহারিণীর ঘাটে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। তারপর কয়েকদিন একাকীই সমাধিচত্বরে খুব ভাবের সহিত উপাসনা প্রার্থনা করিয়া, বিগত ১লা নবেম্বর, রবিবার প্রাতে, ডাঃ শশি-ভূষণ দাস গুপ্তের প্রবাসভবনে ডাঃ প্রবোধচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় বিমলচন্দ্রের আত্মার কল্যাণার্থ এবং শোকার্ত্ত ভ্রাতাদের ও বিধবা বধূর সান্ত্বনা জন্য বিশেষ উপাসনা হয়। ঐদিন রবিবাসরীয় উপাসনাও মুঙ্গের মন্দিরে হইয়াছিল। পরদিন ২রা নবেম্বর, মুঙ্গের হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে, গঙ্গার পরপারে মুক্তিপুরে, বহুদিনের একটী ব্রাহ্মপরিবারে ষ্টীমার যোগে গমন করি। সে পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বংশীধর প্রায় ৭ মাস পূর্ব্বে ময়ূর-ভঞ্জের স্বর্গীয় সদাশিব মহারাণার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁদের দেখিতে তাঁদের সাদর আহ্বানে তথায় গমন করিয়া দুই রাত্রি তথায় স্থিতি করি ও তাঁদের লইয়া উপাসনা সঙ্গীতাদি করি; ঐ পরিবার ব্যতীত একটী ভক্তিমান্ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সপরিবারে উপাসনায় যোগদান করেন। মুক্তিপুর একটী প্রকাণ্ড পল্লি ও ব্যবসায়ের স্থান। ঐ স্থানে বাজার, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাইস্কুল, টেলিগ্রাফ অফিস, সবই আছে। ঐ পুরাতন ব্রাহ্ম পরিবারটী ঐ পল্লিতে নিজের বিশ্বাস ও ধর্ম্মরক্ষা করিয়া, চাষ আবাদ ও ব্যবসায় দ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করেন। বংশীধর যেমন ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী, তেমনি মাতৃভক্ত ও গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্; নববধূ কুঞ্জেশ্বরীও সুশ্রীহৃদয়া, ভক্তিমতী ও সেবাপরায়ণা। ঐ পরি-বারের জামাতা ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ চক্রবর্ত্তী কিছুদিন হইতে জামালপুরের হাইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য লইয়া এখানে আছেন। প্রবোধানন্দ শিক্ষিত যুবক, তাঁর উপাসনায় ও সেবায় অনুরাগ দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতার্থ হইয়াছি। বিগত ১৯শে কার্ত্তিক মুঙ্গেরেই ডাক্তার শশিভূষণ দাসগুপ্তের ভবনে, আমাদের ভক্তিভাজন উপাচার্য্য স্বর্গীয়

ভাই ফকির দাস রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

প্রায় কুড়িদিন মুঙ্গের তীর্থে বাস করিয়া, ঐ তীর্থের ব্রহ্মমন্দির ও সমাধিগুলির মেরামত ইত্যাদি অনেকটা করাইয়া, বিগত ১২ই নভেম্বর, ভাগলপুরে ৩৪টী পরিবারের সংবাদ লইয়া ও ঐ দিন সায়ংকালে কুমারী মলিকা চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থের সাম্বৎসরিক উৎসব আগত প্রায়। তাই এখন হইতে নবভক্তিসাধনার্থী ভাই ভগিনীদিগকে উৎসবানন্দসম্ভোগের জন্ম প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করি এবং স্বর্গীয় ভাই নালুদার আরামের ও সাধনের মুঙ্গের এবং ভক্ত ব্রহ্মানন্দের প্রাণের মুঙ্গেরকে সকলেরই অন্তরের ও আরামের মুঙ্গের করিতে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করি।

শান্তিকুটীর, নববিধানাশ্রম, ১৪।১১।৩১। — বিধান-মণ্ডলীর অযোগ্য ভৃত্য শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৫শে নবেম্বর, Patna Girls' High School এর Principal কুমারী বনলতা দেবীর শুভ জন্ম-প্রভাতে ধূপ দীপ পুষ্প চন্দন শঙ্খ ঘণ্টা ইত্যাদি মার চরণে অর্ঘ্য সংকারে সুন্দর উপাসনা হইয়াছে। আজ নবদিবস হইতে মার আশীর্ব্বাদে নূতন পুণ্য সুখের প্রসাদ লাভ করুন। এই শুভ দিনে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে একটাকা দেওয়া হইয়াছে।

গত ৩০শে নভেম্বর, কলুটোলায় কৃষ্ণভবনে, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের অনুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। রামের ভাই লক্ষণের অনুরূপ কেশবের অনুসরণে কৃষ্ণবিহারী নববিধান জীবনে সাধন করেন। এই অনুসরণব্রত পরিবারের ও মণ্ডলীর প্রার্থনীয়।

বিগত ১লা ডিসেম্বর, পাটনার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদারের জন্মদিন উপলক্ষে, রাঁচি—নামকুমে পিতার আবাসস্থলে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার উপাসনা করেন। পাটনার বাড়ীতে সেদিন বিশেষ ভাবে ভৃত্য-সেবা হয়।

গত ৭ই ডিসেম্বর, গুয়াবাগান লেনে, ডাক্তার আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব—গত ১৯শে নবেম্বর, রাঁচির নামকুমে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে, পারিবারিক উপাসনায় বিশেষ ভাবে উপাসনাদি হইয়াছে।

ঐ দিন সন্ধ্যায়, দেরাদুনে, ২৪নং লিটন রোডে, "জীবনবেদ" পঠিত হয়। ২২শে নবেম্বর, রবিবার, স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদের লইয়া জন্মোৎসব করা হয়। জীবনবেদের "প্রার্থনা" এবং "কেশব-চরিতের" পরিশিষ্ট হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করা হয়। শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের একৈক ভক্ত সন্ন্যাসী কতকগুলি ভজন করেন।

আনন্দ-মিলন—গত ২৮শে নবেম্বর, অপরাহ্নে, ১নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে, স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের একমাত্র পুত্র, আমাদের অতি প্রীতিভাজন, অস্থায়ী এডিশনাল ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনের গৃহে, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে বিশেষ বৃত্তিলাভ করিয়া তাঁহার সস্ত্রীক আমেরিকা যাত্রা উপলক্ষে এবং নবদম্পতি ডাঃ সত্যানন্দ রায় ও শ্রীমতী সুনীতি রায়ের সাদর অভ্যর্থনা উপলক্ষে, মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীগণের আনন্দ-মিলন হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন, শ্রীমতী সরলা সেন আমেরিকা-যাত্রী পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য এবং সোদরপ্রতিম পিসতুতো ভ্রাতা ডাঃ সত্যানন্দ রায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জন্ম কল্যাণ কামনা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন; শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসও আমেরিকা-যাত্রীদিগের জন্ম বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনার পর মধুর আলাপ প্রসঙ্গ ও প্রীতিসম্ভাষণাদি হইয়া, জলযোগান্তে এই আনন্দমিলন আনন্দের সহিত সম্পন্ন হয়। গত ৩রা ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন সস্ত্রীক আমেরিকা যাত্রা করেন। ষ্টেসনে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণ উপস্থিত হইয়া শুভাকাঙ্ক্ষার সহিত বিদায় দান করেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁদের যাত্রা শুভ হউক।

আমাদের সঙ্ঘ—গত ২৭শে নবেম্বর, সন্ধ্যায়, শান্তিকুটীরে, "আমাদের সঙ্ঘের" ভাই ভগ্নীগণ, সঙ্ঘের বিশিষ্ট সভ্য নববিবাহিত দম্পতি ডাঃ সত্যানন্দ রায় ও শ্রীমতী সুনীতি রায়ের সাদর অভ্যর্থনা করেন। শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নব দম্পতির জন্ম বিধাতার বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। ব্যাণ্ডবাদ্য ও বাজির আলো সহকারে সঙ্ঘের ভাই ভগ্নীগণ প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁদের সাদর সম্ভাষণ করেন। জলযোগান্তে আনন্দোৎসব সমাপ্ত হয়।

সেবা—টাঙ্গাইল যাওয়া উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ গত ১৫ই এবং ২২শে নবেম্বর, দুই রবিবার, টাঙ্গাইল ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। গত ১৯শে শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে টাঙ্গাইল ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় তথায় ব্রহ্মানন্দের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ করেন। দুইদিন স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শশিভূষণ তালুকদারের আশাকুটিরে পারিবারিক উপাসনা করেন।

নববিধানট্রাষ্ট—আমরা নববিধানট্রাষ্টের ১৯২৯ সনের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। সুযোগ্য সম্পাদক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন কায়মনঃপ্রাণে ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে ও ট্রাষ্টকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দানপ্রাপ্তি--আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মৈত্র ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদ্যশ্রাদ্ধে নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা ও ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ডে ১৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ভগ্নী শ্রীমতী সুহাসিনী বসুও প্রচার ভাণ্ডারে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পরলোক-গমন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত পরলোক-গমনসংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

নববিধানপ্রেরিত, শান্ত সাধক, ঋষি-প্রতিম স্বর্গীয় ভাই কেদারনাথ দের চতুর্থ পুত্র, শিশুপ্রকৃতি, সরলবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত মনোগতধন দে বহুমূত্র-রোগের উপর কার্ব্বাঙ্কল হইয়া, গত ১০ই ডিসেম্বর, কলিকাতায় ৬।৪নং ওয়ার্ড্‌স্ ইন্‌ষ্টিটিউসন ষ্ট্রীটে, শান্তভাবে, ৫৩বৎসর বয়সে, অমৃতলোকে পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর, কলিকাতায় ৩৭নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের সহধর্ম্মিণী অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

পরমা জননী তাঁহার পরলোকগত পুত্র ও কন্যাকে অনন্ত শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্ত পরিবারে ও বন্ধুবান্ধবদের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা অগ্রহায়ণ, ৮২।১ হ্যারিশন রোডে, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার শ্বশ্রূমাতার সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১০ই অগ্রহায়ণ, কলিকাতা অনাথ আশ্রমে, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

ভগ্নী শ্রীমতী কুন্দ গুপ্তার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে, গত ২৪শে নবেম্বর, পুরী "বিশ্রামকুটীরে" ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ, ৮৩।১।১ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জামাতা শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৯শে নভেম্বর, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় করুণাচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে, ব্রহ্মানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন।

গত ২৯শে নবেম্বর, দিনাজপুরে, স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া দিনমণি বসুর সাম্বৎসরিক দিনে, পুত্র শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুর কর্ম্মস্থলে, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন উপাসনা করেন। ইঁহার অপার ক্ষমা, অসীম ধৈর্য্য, বিধানে দৃঢ় বিশ্বাস ও অতুলনীয় নিষ্ঠা সকলেরই অনুকরণীয়। এই উপলক্ষে বিধুবাবু প্রচার ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা ও কলিকাতা অনাথ আশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৫ই ডিসেম্বর, ৭৮।১নং হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের গৃহে, তাঁহার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৬ই ডিসেম্বর, রেঙ্গুনে, ৪৯নং ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত হরিদাস তালুকদারের প্রবাসভবনে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদারের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কুলদাচন্দ্র নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করেন। হরিদাস বাবু সঙ্গীত ও ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন। তিনি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরীতে তাঁহার পিতৃদেবের লিখিত "নবতত্ত্বামৃতম্" নামক একখানা পুস্তক দিয়াছেন ও ঐ সমাজে ২৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর, ২৪নং তারক চাটার্জির লেনে, স্বর্গগত ভাই কান্তিনাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাবে ভোলা, প্রেমিক ভক্ত কান্তিনাথের নিত্য নূতন সঙ্গীতের সুধালহরীতে প্রমত্ত সুন্দর জীবনখানি সকলের প্রাণে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই দিনে ব্রহ্মনন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৯ই ডিসেম্বর, স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে, সন্ধ্যায় তাঁহার সমাধি-প্রাঙ্গণে, মঙ্গলপাড়ার মহিলাগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন এবং "সেবকের নিবেদন" হইতে স্বর্গগত সাধুর জীবন-সম্পর্কে শ্রীমদাচার্য্যদেবের উক্তি পাঠ করেন ও তৎপর সময়োপযোগী প্রার্থনা করেন। মহিলাগণ মিলিতভাবে সঙ্গীত করেন।

ঐ দিন সন্ধ্যায়, বালীগঞ্জে ৬।২নং একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের পুত্রগণের গৃহেও কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত প্রচার ভাণ্ডারে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনাদি হয়।

১০ই ডিসেম্বর, আলিপুরে ২৮নং নিউরোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব, নববিধানে নিষ্ঠাবান্ মধুরজীবন স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

পুস্তক-পরিচয়

১। The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen by P. C. Mazumdar, 3rd Edition, Navavidhan Trust, 28 New Road, Alipore, Calcutta, 1931. Price Rs 3.

নববিধান ট্রাষ্টের সুযোগ্য সম্পাদক ভ্রাতা ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন এই পুস্তকখানি পুনর্ম্মুদ্রণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি সাধ্বী সতী সৌদামিনী দেবীর নিকট হইতে পুনর্ম্মুদ্রণের ভার প্রাপ্ত হইয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যে এমন সুন্দররূপে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, ইহা তাঁহার যথার্থই উচ্চ কর্ম্ম-দক্ষতার পরিচায়ক। ইহাতে এবার আটখানি সুন্দর ছবি দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণে এরূপ ছবি ছিল না, এবং কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিতও করা হইয়াছে। বইখানিকে বিদ্যালয়ের পারিতোষিক পুস্তকের ন্যায় সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা বহুলরূপে বিক্রয় হইলে আমরা যথার্থই সুখী হইব। নববিধান ট্রাষ্টের সম্পাদকের নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় এবং নববিধান প্রচারকার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

২। ব্রহ্মগীতোপনিষৎ—শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক কুটীরে যোগভক্তি-বিষয়ক উপদেশ, ৪র্থ সংস্করণ। কলিকাতা, ১৮৫৩ শক। মূল্য ৸৹ আনা।

এই অমূল্য পুস্তকখানি অনেক দিন হইতে নিঃশেষিত হইয়াছিল। এলাহাবাদ-প্রবাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় ইহার চতুর্থ সংস্করণ সুন্দররূপে পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ বিশেষ যত্ন সহকারে ইহার মুদ্রণকার্য্য পরিদর্শন ও ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য ইঁহারা উভয়ে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সাধক মাত্রেরই এই পুস্তকখানিকে নিত্য সঙ্গী করিয়া রাখা উচিত। আমরা বিশ্বাস করি, সমগ্র বিশ্বের ধর্ম্মাত্মা মাত্রেই একদিন আদর করিয়া এই পুস্তক অধ্যয়ন করিবেন। সহজ বাঙ্গালা ভাষায় এত উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব আর কোথাও আছে কিনা, জানিনা। অন্য ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই একদিন ইহা অধ্যয়নের জন্য বাঙ্গালা ভাষা আদর করিয়া শিক্ষা করিবেন। পুস্তকখানি বঙ্গের ঘরে ঘরে আদৃত ও পঠিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

কেশবচরিত—শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ. কলিকাতা ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

নববিধান পাব্লিকেশন কমিটীর উদ্যোগে, আমাদের স্নেহভাজন শ্রীমান্ সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সিংহের প্রাণগত চেষ্টায়, সুবিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ কর্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানিও অনেকদিন হইতে নিঃশেষিত হইয়াছিল। এবার সুন্দর আকারে, যথাযথ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন সহকারে ইহা পুনঃ মুদ্রিত করিয়া ইঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এই বইখানিরও আগাগোড়া প্রুফ আদি ভাই অক্ষয়কুমার লধ দেখিয়া দিয়াছেন পুস্তকখানি ছাত্রদিগের পারিতোষিক দিবার মত করিয়া ছাপা ও ভাল বাঁধান হইয়াছে। ভাইস্ চান্সেলার রোনাল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের মত চরিত্র-সম্পন্ন মহাপুরুষ গঠন করাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সুতরাং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই "কেশবচরিত" ও প্রতাপচন্দ্রের প্রণীত "Life and Teachings of Keshub Chunder Sen" পাঠ করিয়া, সে মহজ্জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ সাধন করিতে পারিবেন, ইহাই আমাদের আশা হয়।

নূতন পুস্তক।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অসীম যত্ন ও পরিশ্রমে "Keshub Chunder and Ram Krishna" নামক নূতন ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিলে কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ সম্পর্কে সকলের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হইবে। ভাল বাঁধাই মূল্য ২৷৹, সাধারণ বাঁধাই মূল্য ২৲। "Gyankutir", Katra, Allahabad এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকটে এবং কলিকাতায় ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচারকার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে উৎসব।

মা বিধানজননী নবভক্তিসাধনের জন্য উৎসবের দ্বার খুলিয়া তাঁর পুত্রকন্যাদিগকে ডাকিতেছেন। মার ডাকে মুঙ্গের নববিধানসমাজের সেবকদল ও তীর্থানুরাগী ভাই ভগিনীগণ আগামী ২০শে ডিসেম্বর রবিবার হইতে ২৭শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত ৮ দিবসব্যাপী উৎসবের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন। আগামী ২৬শে ডিসেম্বর, শনিবার সায়ংকালে, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে ভক্তিতীর্থরক্ষা ও তাহার উন্নতি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইবে। মার আহ্বানে দলে দলে ভক্তিপিপাসু ভাই ভগিনীগণ এই তীর্থভূমিতে সমবেত হইলে, তাঁদের সর্ব্ববিধ সেবায় আমরা কৃতার্থ হইব। ইতি

মুঙ্গের, নববিধান ব্রহ্মমন্দির;
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩১।

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।
সহঃ সম্পাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্তৃক ৩রা পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৬ ভাগ।
২৪শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।
1st January, 1932.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

হে রাজাধিরাজ বিশ্বপতি, তোমার স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, এই কথা তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিত সুসন্তানেরা ঘোষণা করিয়া গেলেন। বর্ত্তমান যুগে সেই স্বর্গরাজ্য ধরাধামে স্থাপন করিবার জন্য, তুমি স্বয়ং তোমার প্রেরিত সুসন্তানদিগকে লইয়া অবতীর্ণ একথা কি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছিনা? অতীতের শ্রীঈশা, শ্রীচৈতন্য, শ্রীমহম্মদ, শ্রীনানক প্রভৃতি মহাজনগণ এবং বর্ত্তমান যুগের মহাত্মা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভক্ত কেশবচন্দ্র সদল, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য, শান্তি ও মিলনের রাজ্য স্থাপন জন্য তোমার শ্রীহস্তের যন্ত্ররূপে কেমন ব্যবহৃত হইতেছেন; কেমন নবভাবে পৃথিবীতে শান্তি ও মিলনের রাজ্য স্থাপন জন্য তুমি স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমার প্রেরণাধীন ও শিক্ষাধীন হইতে প্রস্তুত, তাঁহাকেই তুমি স্বর্গের শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়া স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছ, স্বর্গের আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ করিতেছ, যদি ইহা আমাদের জীবনগত প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া থাকে, তবে, হে জগতের প্রতিপালক, রক্ষক ও ধর্ম্মরাজ্যের সংস্থাপক, ভারতের এই অশান্তির সময়ে, ইংরেজ, হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে পার্থিব ব্যাপার লই দ্বন্দ্ব, অমিলন, হিংসা ও বিদ্বেষের সময়ে, তোমার শরণাপন্ন না হইয়া আর আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব? তোমার সম্পর্কের ভিতর দিয়া আমরা সকলেই পরস্পর ভাই, প্রাণের ভাই, আদরের ভাই, এবং তোমার যোগে পরস্পর পরস্পরের কর্ম্মপথে ধর্ম্মপথে অপরিহার্য্য সহায়, ইহা কি আমাদের প্রত্যক্ষ করিবার বাকি আছে? অতএব, হে বিশ্বরাজ, বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা, বিশ্বের একমাত্র পরিত্রাতা, গতিদাতা, তোমার নিকট এই সঙ্কট সময়ে কাতর প্রার্থনা, তুমি কৃপা করিয়া সকলের মধ্যে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, শুভ পথ, মিলন ও শান্তির যথার্থ পথ প্রদর্শন কর। তোমার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। যাহা বাহ্যতঃ অসম্ভব বোধ হইতেছে, তাহা তোমার অযাচিত কৃপাগুণে সম্ভব কর। এই তিনটী মহাজাতির মধ্যে স্বর্গের মিলন সংস্থাপন করিয়া, ভারতের এবং সকল পৃথিবীর শান্তি বিধান কর, সকল ভয় ভাবনা নিরাকৃত কর, এই তব চরণে বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নব গোলটেবিলের বৈঠক।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমাগত গোলটেবিলের পর গোলটেবিল বসিতেছে; উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন, ইংরেজ জাতির সঙ্গে ভারতের বৈষয়িক স্বার্থের একটা শান্তিপ্রদ মীমাংসা। আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লোক নই, রাজনৈতিকব্যাপারে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই হয়; সে বিষয়ের চর্চ্চা ও আলোচনা আমাদের ব্যবসায় নহে, চিন্তার বিষয় নহে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের যথার্থ শান্তিসম্মিলন, স্থায়ী আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও পারিবারিক সম্মিলন আমাদের চিন্তার বিষয়, আলোচনার বিষয়, সাধনের বিষয়। বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ও বৈঠকের শেষ ফল এদেশের এবং অন্যদেশের অনেকেই পুস্তিকা ও পত্রিকা যোগে অবগত হইয়াছেন ও হইতেছেন। ঈশ্বরের পরিচালনা ভিন্ন মানবীয় চেষ্টায় ও কার্য্যপরিচালনায় মানবমণ্ডলীর যথার্থ মিলনব্যাপারে স্থায়ী ও উচ্চ মীমাংসা সম্ভব হয় না; তাই স্বর্গের দেবতা বিশ্ববিধাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন যোগে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে স্থায়ী মিলন সম্পাদন জন্য একশত বৎসরের অধিক হইয়া গেল, স্বর্গীয় নূতন গোলটেবিলের সূত্রপাত করিলেন। যখন ভারতের রাজনৈতিকক্ষেত্রে ইংরেজ জাতির সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের এরূপ কোন সংঘর্ষণের সম্ভবনা হয় নাই, সেই ইংরেজ রাজত্বের উষাকালে, সকল জাতির ভাগ্যবিধাতা, সকল জাতির জাতীয় সম্মিলন এবং বিশেষ ভাবে ভারতে ইংরেজ ও হিন্দু মুসলমানের স্থায়ী ও শান্তিপ্রদ সম্মিলনের উচ্চ সমাধান জন্য; এই পুণ্য ভূমি ভারতবক্ষে ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী স্বর্গীয় গোলটেবিল স্থাপন করিলেন। সে গোলটেবিলের সভাপতি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ বিশ্বরাজ, যিনি সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধীশ্বর এবং গোলটেবিলে বসিবার অধিকারী জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক। সর্ব্বভুবনপতি এক ঈশ্বরের উপাসনা-যোগে সকল জাতির প্রীতি-সম্মিলন এই গোলটেবিলের উদ্দেশ্য।

"A place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction for the worship and adoration of the Author and Preserver of the univers ...and that no sermon or preaching, discourse, prayer or hymn be delivered, made or used in such worship, but such as have a tendency to the promotion of...... and strengthening the bonds of union between men of all religions, persuasions and creeds".

ঈশ্বরের পূজার জন্য যে কোন ব্যক্তি একস্থানে মিলিত হইতে পারিবে; কেন না, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই বলে, মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু ঈশ্বরের পূজা বন্দনাযোগে, ঈশ্বরের শিক্ষা ও পরিচালনে মানুষ কি পার্থিব সকল ব্যাপারে মিলন ও শান্তির ভূমিতে উপস্থিত হইতে পারে? ইংরেজ, হিন্দু এবং মুসলমান, এই তিনটী প্রধান জাতির মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা, ঈশ্বরের শিক্ষা ও পরিচালনা-যোগে সকল পার্থিব ব্যাপারের মীমাংসা ও সকলের মধ্যে মিলন ও শান্তি-সংস্থাপন কি সম্ভব? ইঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র এ বিষয়ে কি বলেন, আমাদের দেখা প্রয়োজন। ঈশ্বরের পূজা বন্দনার যোগে সকল জাতির উচ্চ মিলন বিষয়ে নবযুগের নব ধর্ম্মসমাজের যে বিধি ব্যবস্থার বিষয় আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম এবং ঈশ্বরের শিক্ষা দীক্ষা ও পরিচালনার ভিতর দিয়া রামমোহনের পর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী সাধকগণ সেই মিলন-পথে যেরূপ সাধন করিলেন ও সিদ্ধির পথে যেরূপ অগ্রসর হইলেন, সে বিষয়ে খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্র, মুসলমানধর্ম্মশাস্ত্র এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র কি বলেন, একবার আলোচনা করিয়া দেখি।

আমরা শ্রীঈশার উক্তিতে পাই, "First seek the Kingdom of God and his righteousness and all the things necessary shall be added unto you." প্রথমে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, ধর্ম্ম অন্বেষণ কর, তোমরা পৃথিবীর সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীই ঈশ্বর হইতে পাইবে; কেননা তিনি তোমাদের অভাব জানেন। শ্রীঈশার বাণীতে আরও পাই, "Pray to God and He will give you the Holy spirit. The Holy spirit will explain to you, lead you to all truths." "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা

কর, প্রার্থনা যোগে তোমরা অন্তরে পবিত্রাত্মাকে পাইবে, পবিত্রাত্মা তোমাদিগকে সকল সত্য, সকলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন এবং সকল সত্যে ও সকল তত্ত্বের উচ্চভূমিতে তোমাদিগকে পরিচালন করিয়া লইয়া যাইবেন।” পবিত্রাত্মার পরিচালন ও পবিত্রাত্মা হইতে শিক্ষা ভিন্ন কোন বিষয়ের উচ্চ ও সত্য মীমাংসায় মানুষের উপস্থিত হইবার উপায় নাই, খৃষ্টধর্ম্মের এইটাই বিশেষ শিক্ষা। মুসলমান ধর্ম্মেও এই এক মহান্ ঈশ্বর, যিনি সকলের প্রভু, তাঁহার পূজা বন্দনা করা ও পূজা বন্দনা যোগে দেবালোকের ভিতর দিয়া সকল কার্য্য করিবার ব্যবস্থা। প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ দেবালোকে সকল কার্য্য করিতেন। মানবমণ্ডলীর এই পৃথিবীতেই শান্তিপূর্ণ মিলনে স্থিতি করিবার উদ্দেশ্যে মিলিত উপাসনার প্রশস্ত ব্যবস্থা ও উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সকল দিক হইতে সকল অবস্থার লোককে মিলিত উপাসনায় উপস্থিত হইবার জন্য এমন ব্যাকুল আহ্বান মুসলমান ধর্ম্মে যেরূপ, এরূপ আর কোথায়? “সত্যই প্রকৃত বিশ্বাসিগণ পরস্পর ভ্রাতৃ-স্বরূপ, অতএব ভ্রাতৃগণের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন কর।” কে কোন দেশের লোক, কে কোন বংশে, কোন কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা গণনায় আনিবার প্রয়োজন নাই। এক মহান্ ঈশ্বরে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, তাঁহারাই পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতৃস্বরূপ, তাঁহারা ইহ পরকালে পরমাত্মীয়। কোরাণে এ ভাবের কথাও আছে, ঈশ্বর প্রকৃত বিশ্বাসিগণের হৃদয়ে এরূপ নিঃশঙ্ক শান্তি প্রদান করেন, যে তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসে বর্দ্ধিত হইতে পারে। অতএব আমরা দেখিতে পাই, মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র পরস্পরের মধ্যে মিলন ও শান্তি-সংস্থাপনের পক্ষে ঈশ্বরের আশ্রয়গ্রহণই একমাত্র প[illegible] ঘোষণা করেন। এখন দেখি, হিন্দুশাস্ত্র কি [illegible]। একটী শ্লোকমাত্র আমরা হিন্দু শাস্ত্রের উল্লেখ করিব। উপনিষদ্ বলেন—“মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥” মহান্ ঈশ্বর সকলের প্রভু, তিনি জগতে সুনির্ম্মলা শান্তি সংস্থাপন জন্য স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ঈশ্বর স্বয়ংই যে শুভবুদ্ধিদাতা, শিক্ষাদাতা, সত্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও শান্তিমিলন-বিধায়ক, ইহার প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রে যথেষ্ট আছে।

অতএব আমরা দেখিলাম, কি হিন্দুধর্ম্ম, কি খ্রীস্টধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মই এবং সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলেন, ঈশ্বরের প্রেরণা ও আলোকের সহায়তায় পরস্পর মধ্যে মিলন ও শান্তির সংস্থাপন করিতে হইবে। নূতন গোলটেবিলে নবযুগধর্ম্মের সাধনক্ষেত্রে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল মহাপুরুষদিগকেই মান্যরূপে, গ্রহণীয় রূপে, এমন কি অপরিহার্য্য সহায়রূপে স্বীকার করা হইয়াছে, গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা, বিশ্বপ্রভু পরমেশ্বর নবযুগে এই নববিধানে সকল জাতির মিলন ও সকলের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন জন্য, মিলিত উপাসনার ক্ষেত্ররূপে, মিলিত ধর্ম্ম চর্চ্চা, পাঠ, প্রসঙ্গ ও মিলিত সাধনের ক্ষেত্ররূপে এই নব ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে বিশ্বাসী মাত্রেই এখানে মিলিত হইয়া একেশ্বরের পূজা বন্দনা যোগে মহামিলন সংস্থাপন করিতে পারেন। সকল ধর্ম্মের, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের মিলন ও সেই মিলনের ভিতর দিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলন। বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে, বিভিন্ন মহাপুরুষদিগের মধ্যে যেমন ঐক্যের ভূমি আছে, বিচিত্রতা কি নাই? হাঁ, বিচিত্রতাও আছে। ঈশ্বর হইতে শিক্ষা ও আলোক লাভ করিয়া সেই স্বর্গীয় শিক্ষা ও আলোক-যোগে আমরা সকল বিচিত্রতা জীবনে সাধন ও গ্রহণ করিব, বিচিত্র ভাবে, বিচিত্র রঙ্গে জীবন-পুষ্পকে ক্রমে বিকশিত করিব, সকল হইতে সকল বিচিত্রতা লাভ করিয়া ক্রমে পূর্ণতা সাধন করিতে করিতে অনন্তের পথে অগ্রসর হইব, ইহাই প্রতি মানবের শ্রেষ্ঠ নিয়তি বলিয়া, এই গোলটেবিলের সভাপতি বিশ্বপতি যিনি, তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং সেই পূর্ণতার পথে প্রবর্ত্তনা দিয়া লইয়া যাইতেছেন। দেশের এবং পৃথিবীর অমিলন ও অশান্তির দিনে আমরা এই নব গোলটেবিলের সুসমাচার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলের নিকট ঘোষণা করিতেছি। এবং স্বর্গের সত্য মিলন ও শান্তি সাধন জন্য সকলকে করযোড়ে বিনীত ভাবে আহ্বান করিতেছি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বেদান্ত হইতে পুরাণের অভিব্যক্তি।

শূন্যাকার বায়ু চক্ষুর্গোচর নয়, কিন্তু যখন সেই বায়ু ঘনীভূত মেঘের আকার ধারণ করে, তখন তাহা চক্ষে দেখা যায়;

এবং তখনই তাহা বৃষ্টিতে পরিণত হইয়া বারিধারারূপে পতিত হয় ও বিশ্বপ্রকৃতিকে সিক্ত করে। এইরূপ নিরাকার ঈশ্বর যখন প্রেমঘন ব্যক্তিরূপ ধারণ করেন, তখনই তিনি ভক্তের প্রত্যক্ষী-ভূত হন এবং তখনই তিনি তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তি বর্ষণ করিয়া সিক্ত করেন। বৈদান্তিক বিধানের পর পৌরাণিক বিধানেরও অভিব্যক্তি এইরূপে হইয়াছে।

বিশ্বাসে বাণীশ্রবণ।

গল্প আছে, দুইজন বন্ধু ছিলেন। একজন কালীসাধক, একজন কৃষ্ণসাধক। কালীসাধক নাকি শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করিয়া কালীর সহিত কথোপকথন করিতে সক্ষম হন। কৃষ্ণ-সাধক তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি তাকের উপর তুলিয়া রাখিলেন ও সেই আসনে কালী বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। করিতে করিতে একদিন মনে হইল, কৃষ্ণমূর্ত্তি যে ফাঁকিদিয়া ধূপ-ধূনার গন্ধ শুঁকিয়া লইবে, তাহা দেওয়া হইবে না। এই ভাবিয়া জোরে তাহার নাক টিপিয়া ধরিলেন। যাই ধরিলেন, অমনি কৃষ্ণমূর্ত্তি কথা কহিয়া কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ছাড় ছাড়, বড় লাগে।" তখন ভক্ত সাধক বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, এখন 'ছাড় ছাড়'; ফাঁকি দিয়া আমার ধূপ ধূনার গন্ধ শুঁকে নেবে? এত দিন যদি এমন করে কথা কইতে, তা হলে ত তোমার বুকের উপর কালী বসিয়ে পূজা করিতাম না।" উত্তরে কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিলেন, "ওরে, এতদিন যদি বিশ্বাস করিস যে, আমি ধূপ ধূনার গন্ধ শুঁকতে পারি, তা হলে কথা কহতাম। যাই তা বিশ্বাস কল্লি, অমনি কথা কইলাম।" সত্যই ঈশ্বর জীবন্ত এবং কথা কন। যদি ইহা আমরা প্রকৃত বিশ্বাস করি, নিশ্চয়ই তিনি কথা কন ও প্রার্থনার উত্তর দান করেন।

কেন অপরাধ?

এ দেহ ঈশ্বরের স্ব-ইচ্ছা-জাত পদার্থ। তাঁহারই সেবার কার্য্যে ব্যবহারার্থ যন্ত্র মাত্র। সুতরাং তাঁহার বিনা হুকুমে, বিনা অনুমতিতে যদি ইহাকে খাটাই বা তাঁর অনিচ্ছায় ইহার অপ ব্যবহার করি, অপরাধী হই, দণ্ডনীয় হই। তাহাতে কেবল শরীর যে দণ্ডভোগ করিবে তাহা নয়, মনকেও দণ্ডভোগ, কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। রুগ্ন শরীর অকর্ম্মণ্য হয়, কেবল তাহা নয়, মনকে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অতএব শরীরকে আত্মাদেবের মন্দির জানিয়া যেন ইহার সেবা করি এবং দেহ-পতি পরমাত্মার হুকুম লইয়া তাহা দ্বারা কাজ করাইয়া লই।

প্রত্যাদেশে বিশ্বাস।

সকলেই বলেন, ঈশ্বর-বিশ্বাস থাকিলেই সব হইবে। তাই ঈশ্বর-বিশ্বাস লাভের জন্যই ধর্ম্মসাধকগণের অধিক আগ্রহ। অবশ্য যদিও ঈশ্বর-বিশ্বাস হইলে আর আর সকল প্রকার বিশ্বাসই তাঁহাদিগের লাভ হয়; কিন্তু ঈশ্বর আছেন, মাত্র ইহা বিশ্বাস হইলেই হয় না। তিনি যেমন আছেন, নিশ্চয় সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণ তেমনি কথা কন এবং সর্ব্ববিষয়ে সকলকেই প্রত্যাদেশ দান করেন। ইহা বিশ্বাস না করিলে তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাসও সপ্রমাণ হয় না। বায়ুর বর্ত্তমানতা তখনই উপলব্ধ হয়, যখন বায়ু বহমান হয়। সূর্য্যেরও বর্ত্তমানতা তখনই সপ্রমাণ হয়, যখন সূর্য্যালোক প্রকাশ পায়। তেমনি জীবন্ত ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা সপ্রমাণ হয় তাঁহার প্রত্যাদেশে। তাই, ঈশ্বর আছেন, কেবল তাহা মানিলে হইবে না, তিনি আছেন, তাঁহার সকল স্বরূপও আছে, ইহা যেমন মানিতে ও উপলব্ধি করিতে হইবে, তেমনি তিনি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কথা কহিয়া সকল বিষয়ে প্রত্যাদেশ দেন, ইহাতেও পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে হইবে।

—•—

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

২৫শ সংখ্যা—৯ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

২রা কার্ত্তিক—১৭৯৪ শক।

প্র—আমাদিগের আত্মগরিমা (Self-Sufficience) আছে, কিসে জানা যায়?

উত্তর—আমাদিগের পরস্পরের একতা নাই, ইহা আত্ম-গরিমার একটী প্রধান লক্ষণ। যেখানে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ভাব (Spirit) রাজত্ব করে, সেখানে কখনও অমিল থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভাব, চিন্তা, কার্য্য ভিন্ন সত্য বটে, কিন্তু এক ঈশ্বরের ভাব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিলে বৈষম্য সত্ত্বেও ঐক্য হয়। যাহারা এক পিতার সন্তান, তাহারা পিতৃভাবে যেমন এক হয়। সত্যানুরাগ ও বিনয় সম্মিলিত হইলে অমিল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একতা দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঁচজন একত্র হইলেই কার্য্যকালে গোলযোগ বিরোধ উপস্থিত হয়। স্ব স্ব প্রধান হইয়া পরস্পর পরস্পরকে শাসন করিতে উদ্যত হন। আমাদের পরস্পরকে বুঝিবার এইজন্য এত অনৈক্য হয়। যদি আমরা সকলে এক রাজার প্রজা হইতাম, আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। তিনি আমাদের রাজা নন, স্ব স্ব বুদ্ধি আমাদিগের নেতা। বস্তুতঃ আমাদিগের জীবনে

বুদ্ধির প্রাধান্ত। আত্মনিহিত আলোকে আমরা সত্য দর্শন করি না, বুদ্ধি দ্বারা দেখি। আমি মনে করি, আমি খুব বুঝি, উনি বুঝেন না; ইহাই সর্ব্বনাশের কারণ।

প্র—আত্মনির্ভর (Self-reliance) কি মন্দ ?

উ—আত্মনির্ভর অতি উচ্চ কথা। আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের আলোক দর্শন করিয়া, অনন্তগতি হইয়া সেই আলোকের শরণাপন্ন হওয়াই প্রকৃত আত্মনির্ভর। কিন্তু আপনার বল বুদ্ধিতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি, ইহা আত্মগরিমা। ইহা অশেষ অনিষ্টের মূল।

প্র—আমাদিগের আত্মগরিমা কি প্রকারে দূরীভূত হইতে পারে ?

উ—ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া ঈশ্বর আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, ব্রাহ্মগণের যদি এরূপ বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আত্মগরিমা চলিয়া যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে সকল উদার সত্য প্রকাশ হইতেছে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অতীত ; সুতরাং আমাদিগের স্ব স্ব বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, যিনি সত্যের প্রেরয়িতা, তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত। এরূপ হইলে আমরা কোন পুস্তক বা ব্যক্তি বিশেষের উপর যেরূপ অশ্রদ্ধাও করিতে পারি না, তেমনি আবার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাও করিতে পারি না। সত্য সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের উপরে গৌরব চলিয়া গিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর ও সমুদায় মনুষ্যের উপর শ্রদ্ধা হয় ; সুতরাং আমাদিগের আত্মগরিমাও চলিয়া যায়।

প্র—এরূপ করিলে কি সত্যের স্থলে ভ্রম আসিতে পারে না ?

উ—যদি ভ্রমও আইসে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সমুদায় ভ্রম চলিয়া যায়। স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপু দ্বারা মন বিকৃত হইলে, সত্যের প্রকৃত প্রভা আমাদিগের নিকট প্রকাশ পায় না। ঈশ্বরের সত্যজ্যোতি পাইলে ভ্রম অন্ধকার থাকিতে পারে না।

প্র—সত্য এক হইলেও তাহার প্রয়োগ-রীতিতে কি অনৈক্য হইতে পারে না ?

উ—রীতি প্রণালী লইয়া কোন দিন অমিল হয় না, অমিল মূলে হয়। মনে কর, আমাদিগের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া অমিল হইল। এস্থলে যদি উভয় পক্ষ ঈশ্বরের অধীন হওয়াকে স্বাধীনতা বলিতেন, কোন অমিল থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। 'প্রথমতঃ স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, তোমরা সকলই প্রাপ্ত হইবে,' এই নিয়ম অনুসারে স্ত্রীগণের হৃদয়ে প্রকৃতভাব উদ্দীপিত হইলে, তাঁহারা আপনাদের অবস্থা আপনারা বাহির করিয়া লইতেন। এখন আমরা তাঁহারা কিরূপে সুরক্ষিতা হইবেন বলিয়া চিন্তা করি, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ভাব প্রবেশ করিলে আপনারাই সুরক্ষিতা হইতেন। এখন আমাদিগের দেশের প্রথা কি ? না চোরকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া চুরি হইতে নিবৃত্ত করা ; কিন্তু তাহাতে চুরির নিবৃত্তি না হইয়া অনেক স্থলে বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীগণকে বাহিরেই লইয়া যাও, আর গৃহেই বদ্ধ রাখ, মূল যে পর্য্যন্ত বিশোধিত না হইতেছে, সকলই বিফল। কিন্তু অমিল আমাদিগের এই মূলে।

প্র—সত্য কি প্রকারে লাভ করা যায় ?

উ—বিনম্র না হইলে কখনও সত্য মিলে না। সত্য পাইলে নিঃসংশয় হওয়া যায়। যদি কোন একটী সত্যের বিষয় শুনিলাম, অথচ বুঝিতে পারিলাম না, তাহা হইলে বিনম্রভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিলে তাহা অবশ্য বুঝিতে পারা যায়।

প্র—সত্য লাভ করিলাম, কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় ?

উ—সত্যের একটী আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি আছে। তাহাকে লাভ করিলে যদি তজ্জন্য সমুদায়ও পরিত্যাগ করিতে হয়, মনুষ্য তাহাই করিতে প্রস্তুত হয়। লোকে স্বার্থপরতার সহিত যোগ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে যায়, সুতরাং মহা ভ্রমে পতিত হয়।

প্র—সরলতা কাহাকে বলে এবং ইহার সাধনের উপায় কি ?

উ—ঈশ্বরের উপরে সর্ব্বথা নির্ভরের বিষয় যে উল্লিখিত হইল, তাহাই প্রকৃত সরলতা। শিশু তাহার মাতার উপরে সমস্ত বিশ্বাস স্থাপন করে, কখন সংশয় করে না, উহাই শিশুর সরলতা। সকল বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখিবার জন্য যত্নই উহার সাধন।

প্র—ঈশ্বর আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য, তাহাতে সর্ব্বদা কেন মন স্থির রাখিতে পারা যায় না ?

উ—পাপ আমাদিগের হৃদয়কে লক্ষ্য হইতে দূরে লইয়া যায়।

প্র—কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যে ষড়রিপুর কথা শুনা যায়, উহারা সকলই কি ঈশ্বর-প্রদত্ত ?

উ—কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি প্রবৃত্তি ছয়টী, কি দশটী, কি পনেরটী, ইহার কোন নির্দ্ধারণ নাই। তবে এই কথা বলা যায় যে, উহারা স্বভাব-সিদ্ধ ; সুতরাং ঈশ্বরপ্রদত্ত। নিজে উহারা কেহই মন্দ নহে। ঐ সকলকে আমরা যথোচিতরূপে ব্যবহার করিতে পারি না, এই জন্যই উহারা মন্দরূপে পরিণত হয়।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়।

ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ—অর্থাৎ সঙ্গীতাকারে যাহা ব্রাহ্মসমাজে অভিব্যক্ত। ৩৫নং বিধানপল্লী হইতে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা দাসমণ্ডলীর পক্ষে শ্রীদিগিন্দ্রলাল সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৮ সাল। মূল্য ৸৹ আনা।

পুস্তক খানিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। তাই তাহা প্রকাশ করিবার অধিকারও আমাদের নাই। যাহা হউক, আমরা ইহা অতি মনোনিবেশপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের গভীর অধ্যাত্ম সাধনা ও গবেষণার পরিচয় পুস্তকের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পাইয়া যথার্থই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। নববিধান-প্রেরিত পূর্ব্ববঙ্গের বিধান-দাসমণ্ডলীর আচার্য্য ও নেতা ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্রের অধ্যাত্ম জীবনে ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুগত মণ্ডলীতে কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করা এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং আমাদের অগ্রজ নেতা ও আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের জীবনেও কিভাবে ব্রহ্মস্বরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাও দিঙ্মাত্রে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ-কেন্দ্রে বিধানজ্যোতির বিকাশ কিরূপে হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করাই পুস্তকের লক্ষ্য; সুতরাং তাহা করিতে স্বীয় নেতার প্রতি যেরূপ ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা সমুচিত, গ্রন্থকার তাহা বিলক্ষণ প্রদান করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্রের জীবনের বিশেষত্বের উল্লেখে নববিধানাচার্য্য "অনুসরণ" ও "পূর্ব্ববঙ্গে নববিধানের ভাব-সঞ্চার" বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যানে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, ভাবগ্রহণ অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ নয়। তাই তিনি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন নাই, ভাবগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ সকলকেই সেই ভাবে তাঁহার সহিত "ভাবে ঐক্য" হইতেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই "অক্ষর" বর্জ্জন এবং "ভাব" গ্রহণও আমাদের ভাবে করিলে চলিবে না। পবিত্রাত্মার আলোকে তাহা করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার নির্দ্দেশ। ভাই বঙ্গচন্দ্র তাই পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশের উপরই এত নির্ভর করিতেন। যদিও ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন বঙ্গচন্দ্র নিজে কিন্তু আপনাকে "উপাচার্য্য" বলিয়াই পরিচয় দিতেন। কিম্বা তাঁহার দল যে সমগ্র নববিধানমণ্ডলী হইতে কোনরূপ স্বতন্ত্র মণ্ডলী, তাহাও তিনি মনে করিতেন না। নববিধানাচার্য্যের "অনুসরণকারী" দল গঠন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহাতে তিনি যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মানন্দও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য-দেবের ভাব গ্রহণ না করিয়া যাঁহারা অক্ষর-গ্রহণে ব্যস্ত, তাঁহাদিগের প্রতি গ্রন্থকার যে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে। তবে আমরা না জানিয়া কাহাকেও যেন সে অপরাধে অপরাধী সন্দেহ না করি। প্রত্যেকের সাধনের বিচিত্রতায় যেন আমরা সম্মান রক্ষা করিতে ত্রুটী না করি। আচার্য্যদেব আপনাকে যে "পাপীর সর্দ্দার" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন ও আপনাকে জুতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা একই কথা। বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতা তাঁহার জীবনের বিশিষ্টতা। তাই তিনি আপনাকে Prophet বা প্রবক্তা বলিয়া পরিচয় দেন নাই। কারণ তাঁহারা নিষ্কলঙ্ক নয়। পাপী নরের সহিত সহানুভূতি-যোগে একত্ব সমাধান করিতেই ব্রহ্মানন্দ বিশেষভাবে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের বাহকরূপে প্রেরিত। তাই তিনি আপনাকে পাপীর সর্দ্দার বা জুতা বলিলেন। তাহা না হইলে নববিধানে সর্ব্বজনের স্থান কেমনে হইবে এবং কেশবচন্দ্র কেমনে সবার আশার চন্দ্র হইবেন? যাহা-হউক, এই "ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ" পুস্তকখানি আমাদের নববিধান-সাহিত্যের কলেবর আরো পরিপুষ্ট করিল। ইহা বহুলরূপে পঠিত ও আদৃত হয়, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ইহাতে প্রত্যেক স্বরূপ-সম্বন্ধে যে শাস্ত্রোক্তি সকল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

Keshab Chandra and Ram Krishna—G. C. Banerjee. (Retired District and Sessions Judge, Behar and Orisa) 1831। মূল্য ভাল বাঁধাই ২।০, সাধারণ বাঁধাই ২৲ টাকা।

ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে ও সমগ্র নববিধানমণ্ডলীকে যে কি কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ আপনাদের গুরুকে সপ্তম স্বর্গে তুলিবার জন্য অমানুষিক অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহ সহকারে, দেশে বিদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কতই কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়া কতই পুস্তক প্রচার করিতেছেন। এতদিন তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদসূচক তেমন কোন পুস্তকই প্রচার করা হয় নাই। আমরা যদিও মাঝে মাঝে একটু আধটুকু এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছি, তাহা কয়জনই বা পাঠ করিয়াছেন। ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বহু পরিশ্রম ও গবেষণা সহকারে যেখানে যাহা এসম্বন্ধে বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় সংকলন পূর্ব্বক নিজের মন্তব্যসহ এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। এমন পুস্তক এপর্য্যন্ত আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। "সত্যের জয় নিশ্চয় নিশ্চয়।" ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র নানা স্থান হইতে সত্য তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া, প্রত্যেক মিথ্যা আজগুবী কথার প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া, প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছেন। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিলে প্রকৃত সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন। এক্ষণে সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ বইখানি অধ্যয়ন করিয়া, সরল বিশ্বাসীদিগের মনে যে সকল মিথ্যা ধারণা হইয়াছে, তাহা অপনোদন করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ। পুস্তকখানি যাহাতে বহুল রূপে পঠিত ও প্রচারিত হয়, তাহারই চেষ্টা হওয়া উচিত। পুস্তকের শেষে নববিধানের পুস্তকাদির তালিকা ও প্রাপ্তিস্থানের সংবাদ দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

ঢাকার সংবাদ।

(ভাই মহিমচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত)।

বিগত ১৯শে নবেম্বর আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মদিনে পূর্ব্বাহ্নে বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে ৮॥০ ঘটিকাতে উপাসনা হয়। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং ভাই মহিমচন্দ্র সেন এবং ভ্রাতা মতিলাল দাস প্রার্থনা করেন। শ্রীমদাচার্য্য-দেবের দুইটী প্রার্থনা ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ এবং ভাই মহিমচন্দ্র কর্ত্তৃক পঠিত হয়। সায়ংকালে ৬ ঘটিকাতে আর্ম্মাণি টোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে সভা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অতি সংক্ষেপে একটীমাত্র কথা বলেন। য়িহুদি ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাতন বাইবেলে একটী অতি সুন্দর কথা আছে এবং সেই কথাটী সাধু পল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন। কথাটী এই :—

"যাহারা শান্তির সমাচার প্রচার করে, এবং মঙ্গলকর বিষয়ের আনন্দবার্ত্তা বহন করে, তাহাদিগের চরণদ্বয় কেমন সুন্দর।" রোম, ১০।১৫

আমরা অদ্য এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে যাঁহার জন্মোৎসব করিতে মিলিত হইয়াছি, সেই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্বদেশে এবং বিদেশে শান্তির সমাচার প্রচার করিলেন এবং মানবের চির মঙ্গলকর বিষয়ের আনন্দবার্ত্তা বহন করিলেন। আমার এই কথাটীর প্রমাণ স্বরূপ, প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপিতার একটী উক্তি, উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীর নিকট, প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর, আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের সহিত আমরা কয়েকটী বন্ধু মহর্ষিকে দেখিতে যাই। তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "তোমরা ব্রহ্মানন্দের ঋণ কি দিয়া পরিশোধ করিবে? জীবন দিয়াও বলিবে, কিছুই দেওয়া হইল না। কেন না, তোমরা অরণ্যে বসিয়া রোদন করিতেছিলে—বাড়ী নাই, ঘর নাই, মা বাপ নাই। এমন সময় একজন আসিয়া তোমাদিগকে সংবাদ দিলেন,—ভাই, কেঁদ না, আমাদের বাড়ী আছে, ঘর আছে, মা বাপ আছেন। এমন ব্যক্তির ঋণ তোমরা কি দিয়া পরিশোধ করিবে?"

প্রকৃত পক্ষে আমরা শান্তির সমাচার এবং মঙ্গলকর বিষয়ের আনন্দবার্ত্তা কেশবচন্দ্র হইতেই পাইয়াছি। ১৮৬৬ সালে ব্রহ্মানন্দ যখন ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহ গমন করেন এবং উপাসনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তৎকালে আমি গ্রাম্য বিদ্যালয়ের ছাত্র। নসিরাবাদের সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তাঁহার প্রচারকার্য্যের বিবরণ একটু শুনিতে পাইয়া আমি তৎকালে একটী বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, "ধর্ম্ম যাহা খাঁটি তাহাই নিব; কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে সতর্ক থাকিব।" সুতরাং অদ্যকার এই শুভদিনে আমরা কেশবচন্দ্রকে স্মরণ এবং ঈশ্বরকে তাঁহার প্রেরয়িতা বলিয়া ধন্যবাদ না দিয়া পারি না।

অতঃপর রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় এম,এ, তাঁহার সুললিতকণ্ঠে ওজস্বিনী এবং প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় স্বরচিত মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবন পাঠ করেন; এবং বাবু মতিলাল দাস বি, এ, "কেশবকাহিনী" দ্বিতীয়ভাগের পাণ্ডুলিপি হইতে কিছু কিছু পাঠ করেন। ইহাতে অনেক সময় চলিয়া যায়। সুতরাং বক্তাদের মধ্যে কে কে বক্তৃতা করিবেন, এই প্রশ্ন তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত হয়। তখন ঢাকার সুবক্তা অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটী কলেক্টর বাবু গিরিশচন্দ্র নাগ দাঁড়াইয়া, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ বক্তা ভ্রাতা মনোমোহন চক্রবর্ত্তীকে বক্তৃতা করিতে নিবন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করেন। তখন মনোমোহন বাবু তাঁহার সুমিষ্ট এবং সুগম্ভীর ভাষায় প্রথমতঃ জন্মদিনের উৎসব এবং তিরোধানের স্মৃতিসভা এ দুয়ের তারতম্য প্রদর্শন করেন। তৎপর কেশবচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং যোগী সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের মত মহীয়সী মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যোগ ভক্তির শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, কেশবচন্দ্র কোন গ্রন্থ বা মহাত্মার উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিছু করেন নাই বা বলেন নাই। সদা অন্তরালোকে চালিত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, এরূপ সভা এমন একটী সুপ্রশস্ত স্থানে হওয়া আবশ্যক, যেখানে বহুসংখ্যক ব্যক্তি মিলিত হইয়া এমন মহোৎসবে যোগদান করিতে পারেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইতে রাত্রি অধিক হইলেও শ্রোতৃবর্গ শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

ভাই দুর্গানাথ রায়।

শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় কিছুদিন পূর্ব্বে, রক্তাধিক্যবশতঃ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি চিকিৎসকগণও তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলেন। বিধাতার কৃপায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শ্রদ্ধেয় ভাই ৮১ বৎসর পূর্ণ হইয়া ৮২ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ভাইএর গৃহে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন এবং ভাই দুর্গানাথ জন্মসাধু এবং আশৈশব ভক্তি-প্রবণ-হৃদয়, এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দও এই ভাইকে বিশেষ আদর ও স্নেহ করিতেন। এক সময় তিনি স্থানীয় উপাচার্য্য মহাশয় বঙ্গচন্দ্র রায়কে লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গচন্দ্র, তোমার দল, আমার দল; তোমার দুর্গানাথ, আমার দুর্গানাথ।" অন্য এক সময় লিখিয়াছিলেন "ভাই বঙ্গ, মার দুধ উথলিয়া পড়িতেছে, খুব খাও, খুব খাও।" এ সকল কথা স্মরণ করিলে কেবলই মনে হয়, "যাহারা শান্তির সমাচার প্রচার করে,

এবং মঙ্গলকর বিষয়ের আনন্দবার্ত্তা বহন করে, তাহাদের চরণদ্বয় কেমন সুন্দর।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়াশ্রম।

শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় কুমিল্লায় সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়াশ্রম স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া, আমাদের বন্ধুপ্রবর খড়্গসিংহ ঘোষ দত্ত মহাশয়কে নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়াছেন :—

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়-শ্রীচরণেষু

প্রণিপাত-পূর্ব্বক নিবেদন,

অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, আশা করি, কুশলে আছেন। এ বয়সে আপনার জ্ঞান-পিপাসা ও অদম্য উৎসাহ দেখিয়া আমাদের লজ্জা হয়। আপনি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়াশ্রম স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া একটী কথা মনে আসিয়াছে, তাই আপনাকে লিখিতেছি। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ দেশবাসী এখনও বুঝিতেছে না। দেশবাসী এখন Communalism এ হাবুডুবু খাইতেছে—Pan historic universalism এর তত্ত্ব কবে বুঝিবে, কে জানে?

সম্প্রতি এই চিন্তাটী আমার মনে আসিয়াছে। ভারতধর্ম্মের অভিব্যক্তির এক বিচিত্র সময়ে যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শ্রীহরির বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন—এ তত্ত্ব অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ-দর্শনের তত্ত্ব। তারপর সেমেটিক ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের এক বিশেষ সময়ে শ্রীঈশার অনুপ্রেরণায় St. Paul বিশ্বমানবের এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করেন। "In Christ there is no distinction between Jews or gentiles, Greek or Barbarian, bondman or free" এই মর্ম্মে St. Paul এর উক্তির কথা মনে পড়ে। ইহা অখণ্ড বিশ্বমানবের তত্ত্ব।

ভারতীয় ব্রহ্মবাদের সঙ্গে বিশ্বমানবধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এ যুগে পবিত্রাত্মার অনুপ্রেরণায় কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্ম্মবিধান-গুলির এক অখণ্ডরূপ দর্শন করেন। অখণ্ড ব্রহ্মদর্শন, অখণ্ড মণ্ডলী, অখণ্ড শাস্ত্র, অখণ্ড সাধনা ও অখণ্ড সিদ্ধি, এই পঞ্চতত্ত্বকে আমি বিধানের পঞ্চামৃত বলিয়া থাকি। এই পঞ্চতত্ত্বের উপর সমাজপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মানন্দের দল ধন্য হইয়াছেন। আপনিও এই দলের কার্য্যে আমাদের অগ্রণী—অতএব আপনাকে প্রণাম করি। ইতি

প্রণত—শ্রীখড়্গসিংহ ঘোষ।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং নববিধান পত্রিকার গ্রাহকগণ অবগত আছেন যে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত গাড়াডোব গ্রামে (পোঃ গাড়াডোব) ইসলামধর্ম্ম-প্রচারক মৌলবী আমরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বর্গগত প্রেরিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে "গিরিশ লাইব্রেরী" নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। মৌলানা গিরিশচন্দ্র সেন তাঁহার পরম সুহৃদ ছিলেন। তিনি স্বীয় জীবনে মৌলবী সাহেবকে এগার শত চিঠি লিখিয়াছিলেন; এবং বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মৌলবী সাহেব এখনও ঐ চিঠিগুলি যত্নের সহিত রাখিয়াছেন। এই সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, স্বর্গগত আত্মার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের কি প্রকার গভীর শ্রদ্ধা। তিনি প্রত্যেক বৎসরই ৩০শে শ্রাবণ গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে স্মৃতিসভা করিয়া থাকেন। গত ৩০শে শ্রাবণ যে স্মৃতিসভা হইয়াছিল, ঐ সভার প্রস্তাব অনুসারে পূর্ব্বোক্ত গাড়াডোব গ্রামে "গিরিশ লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রায় ৬০০টাকা দ্বারা একটী দালান খরিদ করিয়া তাহাতে ঐ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি নিজে অনেক পুস্তক দিয়াছেন, এবং লাইব্রেরীর জন্য বেঞ্চ ও টেবিলাদি প্রদান করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করেন, ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি উক্ত লাইব্রেরীতে দান করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। স্বর্গগত পুণ্যাত্মা মহাশয়ের দেহের প্রত্যেকটী রক্ত-বিন্দু নববিধানে ইসলামধর্ম্ম-প্রচারে ব্যয়িত হইয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজের সকলেই যদি এই কার্য্যে একটু সহায়তা করেন, তাহা হইলে একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইবে। তিনি এই কার্য্যের জন্য একটী আপিল ছাপাইয়া সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট উপস্থিত করিবেন। "গিরিশলাইব্রেরী" যাহাতে স্থায়িভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে, তিনি এই বিষয়ে আমার নিকট অনেক চিঠি লিখিয়াছেন, আমার সামান্য শক্তি দ্বারা যাহা হইতে পারে, তাহা আমি করিব। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৭০ বছরের অধিক। জীবনের এই সায়াহ্নকালে যাহাতে "গিরিশ লাইব্রেরীর" কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন, এই আশীর্ব্বাদ তিনি সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

শিলচর। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

ব্রহ্মোৎসব।

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের উপাসকগণ আর একটী ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিলেন। ১৮৪৬খৃষ্টাব্দে, ২২শে অগ্রহায়ণ, পূর্ব্ববঙ্গের ধর্ম্মপিতা ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় অল্পসংখ্যক বন্ধু লইয়া এই ঢাকা নগরীতে প্রথম ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ স্মরণীয় দিন উপলক্ষে গত ১৯শে অগ্রহায়ণ, শনিবার সায়ংকালে, আর্ম্মাণিটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে "ব্রজসুন্দর-স্মৃতিসভা" হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অল্প কথায় ব্যক্ত করেন যে, "ব্রজসুন্দর যেমন নিষ্ঠাবান্ উপাসনাশীল ছিলেন, তেমনি স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, ব্রহ্মজ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যাহাতে বিদ্যালোক বিকীর্ণ হইতে পারে এবং নারীজাতির উন্নতি হইতে পারে, তজ্জন্য একান্ত যত্ন করিয়াছিলেন।" অতঃপর অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী কলেক্টর ও ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু গিরিশচন্দ্র নাগ একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের ধর্ম্মানুরাগ, বদান্যতা, বিদ্যালোক-বিস্তারে একান্ত স্পৃহা এবং নারীজাতির উন্নতিকল্পে যত্ন, শ্রোতৃবর্গের নিকট তাঁহার প্রাঞ্জল এবং সুললিত ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান সময়ে গিরিশবাবু ঢাকার সর্ব্বপ্রধান বক্তা এবং গভীর গবেষণাশীল পণ্ডিত। ২০শে অগ্রহায়ণ, রবিবার সায়ংকালে, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় মন্দিরে উপাসনা করেন এবং "ব্রহ্মোৎসব" বিষয়ে সুমিষ্ট উপদেশ প্রদান করেন। ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার সায়ংকালে করোনেশন পার্কে সঙ্গীত ও বক্তৃতা হয়। আচার্য্য শঙ্করের উক্তি "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ" ধরিয়া ভাই মহিমচন্দ্র ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর দিগ্‌বাজারে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে বাবু রাজকুমার দাস এম, এ, উপাসনা করেন এবং একটী সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। ২২শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার ভাই মহিমচন্দ্র অসুস্থ হইয়া পড়াতে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা করেন। ২৩শে অগ্রহায়ণ, বুধবার সায়ংকালে, মন্দিরে রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, "ধর্ম্মসাধনের প্রথম সোপান" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপর প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া উৎসবের শান্তিবাচন হয়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৭ই ডিসেম্বর, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, "আমাদের সঙ্ঘের" উদ্যোগে আমাদের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়তম দাদার (ভাই প্রমথলাল সেনের) জন্মদিনে বিশেষ উপাসনা হয়। ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। এই জন্মদিনে পৃথিবীতে আসিয়া তিনি যে সুন্দর প্রেমভক্তি ও বিশ্বাসের জীবন রাখিয়া গিয়াছেন, সে জীবনে আমরা নবজন্ম লাভ করিলে, তাঁহার জন্মদিন-স্মরণ আমাদের মধ্যে সার্থক হইবে। বিধাতার আশীর্ব্বাদে তাহাই হউক।

নামকরণ—গত ২৭শে ডিসেম্বর, ৫৪।১নং হাজরা রোড ভবনে ডাঃ ডি, এন, মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অজিতনাথ মল্লিকের পঞ্চমকন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং শিশুকে "সুরভি" নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১২ই ডিসেম্বর, বাঁকিপুরে, ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার পৌত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুষমার সহিত, নবদ্বীপ-নিবাসী স্বর্গীয় নন্দলাল সান্যালের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্রের শুভবিবাহ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এই শুভবিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর, কলিকাতায়, ৪৭।১নং থিয়েটার রোডে, পাটনার শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী চিরপ্রভার সহিত, ঢাকানিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেনের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বিনয়রঞ্জন সেনের শুভবিবাহ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এই শুভবিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন।

ভগবান্ এই দুইটী নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

শ্রীঈশার জন্মোৎসব—গত ২৫শে ডিসেম্বর, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, শ্রীঈশার জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়; ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

সেবা—গত ৬ই ডিসেম্বর, রবিবার, ভাই প্রিয়নাথ বালেশ্বরে গিয়া প্রাতে তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ীতে উষাকীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন; এবং বৃদ্ধভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাসের বাড়ীতে প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। কয়েকটী বাড়ীতে প্রার্থনাদি করিয়া সন্ধ্যায় মন্দিরে সামাজিক উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন।

বিশেষ উপাসনা—"আমাদের সঙ্ঘের" সভ্য স্বর্গীয় মনোগতধন দের আত্মার কল্যাণার্থ গত ১৪ই ডিসেম্বর, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, "আমাদের সঙ্ঘে" বিশেষ উপাসনা হয়। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন।

প্রস্তুতির উদ্বোধন—৩১শে ডিসেম্বর, বর্ষশেষে, নববিধানের মহোৎসবের প্রস্তুতির উদ্বোধনসূচক, "আমাদের সঙ্ঘের" উদ্যোগে, ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, ভাই ভগ্নীদের বিশেষ সম্মিলন হয়। অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নববিধানের

তত্ত্ব, নববিধানের জীবন ও নববিধানের মহোৎসবের প্রস্তুতি বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ সাধনার কথা বিবৃত করেন।

কোচবিহার-সংবাদ—গত ৭ই নবেম্বর, মহারাজকুমার হিতেন্দ্র নারায়ণের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে তাঁহার সমাধিপার্শ্বে ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় দরিদ্র-সেবা হয়। গত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতা কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নীর জন্মদিন স্মরণে করুণাকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। ছেলেমেয়েদের লইয়া ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানও হয়। ১৯শে নবেম্বর, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে কেশবাশ্রমে প্রাতে বিশেষ উপাসনা ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সম্পাদন করেন। অপরাহ্নে ভৃত্যসেবা শিশুসেবাদি হয়। রাত্রে পল্লীর সমুদয় গৃহ আলোকিত করা হয়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী—কবীন্দ্র শ্রীরবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতায় ও অন্যান্যস্থানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব হইয়াছে। পুরী শ্রীক্ষেত্রেও সাধারণের উদ্যোগে গত মঙ্গলবার ৩০শে ডিসেম্বর, ভিক্টোরিয়া ক্লাবে উৎসব হয়। সর্ব্বজনপ্রিয় কালেক্টর মিঃ এন, পি, থডানি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রার্থনা করেন। বিশ্ব কবির গৌরবে ভারতমাতা গৌরবান্বিত। তিনি আরো দীর্ঘজীবী হইয়া, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে সর্ব্বত্র চিরবন্দনীয় করুন, ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৮শে অগ্রহায়ণ, হাওড়ায় ২১নং জয়দেব কুণ্ডু লেনে, ধুবড়ির স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ সরকারের সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত আশুতোষচন্দ্র রায় ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদিপাঠে সাহায্য করেন। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনাও করেন। বড় জামাতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস, পুত্র ডাঃ উপেন্দ্রনাথ সরকার ও এক পৌত্রী (শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকারের কন্যা) পরলোকগত আত্মার সুন্দর জীবনী পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। গম্ভীরভাবে অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হয়।

গত ২৬শে ডিসেম্বর, ৩৭নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া অন্নদায়িনী সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। ডাঃ সত্যানন্দ রায় ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদিপাঠে সাহায্য করেন। শ্রীমতী সাবিত্রী সরকার মাতৃজীবনী পাঠ করেন এবং পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর, ৮৪নং আপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, স্বর্গীয় মনোগঞ্জন দের আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদিপাঠে সহায়তা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনাও করেন। কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বনলতা দে ভাইয়ের সুন্দর সরল বিশ্বাসের জীবনী পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ আশীষকুমার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৫৲, নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১০৲, কলিকাতা ভগ্নীসমিতিতে ৫৲, গিরিধি নববিধানসমাজে ৫৲, কলিকাতা অনাথাশ্রমে ৫৲, রামকৃষ্ণমিশনে ৫৲, কলিকাতা আতুর আশ্রমে ৫৲, বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, Flood Relief ফণ্ডে ৫৲, মোট ৫০৲টাকা দান করা হইয়াছে।

অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১০নং রাজা রাজানারায়ণ ষ্ট্রীটে, ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্নেহলতা রায় রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। গত ২৯শে ডিসেম্বর, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক ঐ গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ শ্লোকাদি পাঠে সাহায্য করেন। মধ্যমপুত্র শ্রীমান সুবোধচন্দ্র রায় প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে ঢাকায় নববিধান সমাজে ১০৲ ও অনাথ আশ্রমে ৫৲, কলিকাতায় নববিধান সমাজে ৫৲, নববিধান প্রচার আশ্রমে ৫৲, কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲, ভগ্নিসমিতিতে ৫৲ ও পুত্রাশ্রমে ৫৲, মোট ৪০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে স্বর্গধামে তাঁহার অনন্ত স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্ত পরিবারে এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৭ই নবেম্বর, মহারাজকুমার হিতেন্দ্র নারায়ণের, ৯ই নবেম্বর ভাই প্রসন্নকুমার সেনের, ১লা ডিসেম্বর ভাই উমানাথের, ৫ই ডিসেম্বর গৃহস্থসাধক স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর, ১৪ই ডিসেম্বর মা সারদাদেবীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে পুরী গলষ্টন আশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। ৫ই সন্ধ্যায়, কটকে, মধুভবনেও সাধক রাজমোহনের সাম্বৎসরিক দিনে বিশেষ উপাসনা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর করেন, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনান্তে বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৯শে নবেম্বর নববিধানে অটল-বিশ্বাসী, গৃহস্থ প্রচারক স্বর্গীয় কালীকুমার বসুর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া দিনমণি বসুর সাম্বৎসরিক দিনে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসুর উদ্‌যোগ ও আহ্বানে, রাজা দিনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটে শ্রীমান্ অবনীমোহন গুহের গৃহে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। আত্মীয় আত্মীয়া, সহোদরা ভগ্নী ও পুত্র কন্যা অনেকটীতে পরিবেষ্টিত হইয়া বিনয়বাবু এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তিনি মাতৃদেবীর ধর্ম্ম-

নিষ্ঠা, কষ্টসহিষ্ণুতা, বিশ্বাস ও আত্মনির্ভর প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন।

গত ১লা ডিসেম্বর, স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই উমানাথ গুপ্তের সাম্বৎসরিক দিনে, মঙ্গলপাড়ায় গৃহে, তাঁহার পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রীসহ মিলিত হইয়া ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১৪ই ডিসেম্বর, কলুটোলার কৃষ্ণভবনে, ব্রহ্মানন্দের জননী মা সারদাদেবীর স্বর্গারোহণ দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

২০শে ডিসেম্বর, মঙ্গলপাড়ায় শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহের গৃহে, স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কমলেকামিনী বসুর আহ্বানে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ২১শে ডিসেম্বর, ৫ই অগ্রহায়ণ, হাওড়ায়, দক্ষিণ ব্যাঁটরায় ১৭নং বদন রায় লেনে, স্বর্গগত ভাই আশুতোষ রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সন্তোষিণী রায় আকুল প্রার্থনা করেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর, ৬৫।১নং হ্যারিসন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মাতৃদেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৩০শে ডিসেম্বর, কলুটোলার কৃষ্ণভবনে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীরের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

মাঘোৎসব।

"মাঘোৎসব" বইখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মাঘোৎসব উপলক্ষে, আচার্য্যদেব যে যে প্রার্থনা যে যে স্থানে যে যে উপলক্ষে করিয়াছিলেন, এবং যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তৎসমস্তই এই সংস্করণে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কয়েকটী প্রার্থনাও মাঘোৎসবের ভিন্ন ভিন্ন দিনের উপযোগী বলিয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণের চারিটী উপদেশ এবার বাদ দেওয়া হইয়াছে। মাঘোৎসবে প্রদত্ত সমস্ত উপদেশগুলি দ্বিতীয়খণ্ডরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বইয়ের আকার এবার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। উৎসবার্থীদিগের প্রস্তুতি ও উৎসব-সম্ভোগে বিশেষ সহায়তা করিলে পরিশ্রম সার্থক হইবে। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র ধার্য্য হইয়াছে। ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচারকার্য্যালয় এবং ৮৪নং অপার সার্কুলার রোডে, শান্তিকুটীরে বইখানি পাওয়া যাইবে। মাঘোৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়াছে। এখনই বইখানি ক্রয় করিলে প্রস্তুতি বিষয়ে সকলের বিশেষ সাহায্য হইবে।

প্রকাশক।

দ্ব্যধিকশততম মাঘোৎসব।

প্রস্তুতি।

কার্য্যপ্রণালী।

[আবশ্যক হইলে এই কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইবে]

১লা জানুয়ারী, ১৯৩২, ১৬ই পৌষ, ১৩৩৮, শুক্রবার—প্রাতে ৬৷৹টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা পাঠ। পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে উপাসনা। "রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।"

২রা জানুয়ারী, ১৭ই পৌষ, শনিবার—"নববিধান, শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ"।

৩রা জানুয়ারী, ১৮ই পৌষ, রবিবার—"মাতৃভূমি"। সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৪ঠা জানুয়ারী, ১৯শে পৌষ, সোমবার—"গৃহ"।

৫ই জানুয়ারী, ২০শে পৌষ, মঙ্গলবার—"শিশুগণ"।

৬ই জানুয়ারী, ২১শে পৌষ, বুধবার—"ভৃত্যগণ"।

৭ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—"দীনগণ"।

৮ই জানুয়ারী, ২৩শে পৌষ, শুক্রবার—শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। কমলকুটীরে নবদেবালয়ে প্রাতে ৬টায় নাম-পাঠ ও ৯টায় উপাসনা। সন্ধ্যা ৬টায় আলবার্ট হলে স্মৃতিসভা।

৯ই জানুয়ারী, ২৪শে পৌষ, শনিবার—"মহাজনগণ"।

১০ই জানুয়ারী, ২৫শে পৌষ, রবিবার—"জনহিতৈষিগণ"। সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১১ই জানুয়ারী, ২৬শে পৌষ, সোমবার—"উপকারিগণ"।

১২ই জানুয়ারী, ২৭শে পৌষ, মঙ্গলবার—"বিরোধিগণ"।

১৩ই জানুয়ারী, ২৮শে পৌষ, বুধবার—"বৈজ্ঞানিকগণ"।

১৪ই জানুয়ারী, ২৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬টায় কেবলমাত্র মহিলাদিগের উপাসনা ও রাত্রি ১২টায় "জাগরণ"।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩১।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

কমলকুটীরে নবদেবালয়ে (৭৮বি, আপার সার্কুলার রোড) ১লা ও ৮ই জানুয়ারী ব্যতীত প্রতিদিন প্রাতে ৮টায় উপাসনা এবং ব্রহ্মমন্দিরে ৩রা, ৮ই, ১০ই ও ১৪ই জানুয়ারী ব্যতীত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায় পাঠ ও প্রসঙ্গাদি হইবে। প্রতিদিনের বিশেষ বিশেষ ভাব সাধন নিজ নিজ পরিবারে বাঞ্ছনীয়।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১৮ই পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দ্ব্যধিকশততম মাঘোৎসব।

আহ্বান।

"নববিধানের দেবতা, আনন্দময়ী মাতা,
ডাকিছেন সবে স্নেহ আদরে।
তোরা আয়রে আয় ভাই, মায়ের কাছে যাই,
গিয়ে প্রাণ জুড়াই ;
গাই আনন্দে মা নাম সমস্বরে।"

কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক হইলে এই কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১লা মাঘ, ১৩৩৮, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩২, শুক্রবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬।০টায় আরতি।

২রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যা ৬।০টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিশান-বরণ।

৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় ও সন্ধ্যা ৬।০টায় উপাসনা।

৪ঠা মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬।০টায় শান্তিকুটীরে "আমাদের সঙ্ঘের" উৎসব।

৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীদরবারের উৎসব।

৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, বুধবার—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক ; ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭।০টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬।০টায় স্মৃতিসভা।

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় শান্তি-কুটীরে ব্রাহ্মিকা-উৎসব।

৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, শুক্রবার—প্রাতে মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ; সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা।

৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, শনিবার—বালক বালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা ; অপরাহ্ণ ৪।০টায় পুরস্কার-বিতরণ ও বালকবালিকা-সম্মিলন। (প্রবেশের জন্য নিমন্ত্রণপত্র প্রদর্শন আবশ্যক হইবে)

১০ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭।০টায় কীর্ত্তন, ৮।০টায় উপাসনা ; মধ্যাহ্ণ ৩টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ ও আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা ; ৫।০টায় কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬।০টায় উপাসনা।

১১ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, সোমবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭।০টায় ও সন্ধ্যা ৬।০টায় উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—নববিধান-ঘোষণার দিন। প্রাতে ৭।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ; সন্ধ্যা ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইবে।

১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব। সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। প্রাতে ৮।০টায় কেশব একাডেমী বিদ্যালয়ে উৎসব।

১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে অপরাহ্ণ ৫টায় প্রচারকার্য্যালয়ের উৎসব।

১৫ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, শুক্রবার—প্রাতে ৯টায় ১২১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কলিকাতা হিন্দু অনাথ আশ্রমে উৎসব।

১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্ম-মন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা।

১৭ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণে উদ্যান-সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬।০টায় কমল-কুটীরে নবদেবালয়ে শান্তিবাচন।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

ভক্তির অঞ্জলি।

সবিনয় নিবেদন,

মায়ের আহ্বানে তাঁহার পুত্রকন্যাগণের সমাগমে যে মহোৎসব হয়, তাহাই ভক্তির পরম তীর্থ ও পবিত্র সেবার ক্ষেত্র। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সকলের সেবা করার মত সৌভাগ্য আর কি আছে? ভক্তি ও সেবার ভাবে যথাসাধ্য শক্তি ও অর্থদান এখানেই সম্যক সার্থক হয় এবং অনন্ত স্নেহময়ী জননীর প্রচুর আশীর্ব্বাদও লাভ হয়। ভক্তির অঞ্জলীরূপে এই মহোৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, ওনং ক্রীক রো ঠিকানায় সম্পাদকের নামে অথবা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার দত্তের নামে যিনি যাহা পাঠাইবেন, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ১লা, ১০ই, ১১ই ও ১২ই মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে ঝুলি ধরা হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;

বিনীত
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

Reg. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

বিশালো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬৭ ভাগ। ২য় ও ৩য় সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৩৩৮ সাল, ১৮৫৩ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ। 30th Jan. & 14th Feb. 1932 | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲

প্রার্থনা।

মহামহোৎসব-প্রদায়িনী দিব্যরূপা অনন্ত-লীলাময়ী জননি! তুমি সকল স্বরূপে অনন্ত, অনন্ত বিভূতি তোমার, অনন্ত রূপ তোমার, অনন্ত গুণ তোমার, উৎসবেও তুমি অনন্ত, স্বয়ং অনন্ত উৎসব-স্বরূপা তুমি। আদিকাল হইতে তুমি তোমার পৃথিবীর পুত্রকন্যাদের জীবনে নানা আকারে প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে স্বর্গের জীবন দান করিতেছ। সেই আদিকাল হইতেই পুত্রকন্যাদিগের জীবনে স্বর্গের নব নব আনন্দের উৎসব বিধান করিয়াও এই পৃথিবীতে তোমার স্বর্গের মহিমা গৌরব বিস্তার করিতেছ। দুঃখ-ভারাক্রান্ত সন্তানদিগের প্রাণে সেই উৎসবের ভিতর দিয়া স্বর্গের বিমলানন্দধারা ঢালিয়া দিয়া, তাহাদিগকে স্বর্গের সুখ শান্তিতে পূর্ণ করিতেছ, এবং তোমার অপার করুণার সাক্ষ্য দান করিতেছ। এ উৎসব কখন ফুরায় না, কখন ফুরাইবে না; কেননা, তুমি স্বয়ং অনন্ত উৎসব-স্বরূপা। স্বর্গের উৎসব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, স্বর্গের উৎসবানন্দে পৃথিবীর নরনারীর প্রাণকে পূর্ণ করে, এবং পৃথিবীর ক্লান্ত, শ্রান্ত, নানা পরীক্ষায় ভারাক্রান্ত নরনারীকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলে, তোমরা তো এই পৃথিবীর জন্য নও, তোমরা স্বর্গের জন্য। পৃথিবীর দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা তো দুদিনের জন্য; ইহাতে তোমরা ক্লান্ত হইওনা, শ্রান্ত হইওনা, নিরাশ হইওনা। স্বর্গ তোমাদের চির-বাসস্থান, সুধাময়, শান্তিময়, আনন্দময় পরম মাতার বক্ষ তোমাদের চিরদিনের আলয়, স্বর্গের পুণ্য শান্তি আনন্দ তোমাদের চিরদিনের সম্ভোগের বস্তু। মা, তোমার পৃথিবীর সাধু ভক্ত সন্তানগণ বিশেষ বিশেষ মহা মহোৎসবে তোমার এই দিব্য পরিচয় লাভ করিয়া, তোমার পদাশ্রয় ভাল করিয়া গ্রহণ করেন, তোমার শ্রীপদ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল তোমার পূজা বন্দনায় নিমগ্ন থাকেন এবং সেই পূজা বন্দনা যোগে নিত্য উৎসবানন্দ সম্ভোগ করেন। মা, আমরা তোমার সেরূপ সাধু ভক্ত পুত্র কন্যা নই, আমরা এখনও তেমন করিয়া তোমার পূজা বন্দনায় নিমগ্ন হইতে শিখি নাই, তেমন করিয়া নিত্য তোমার পূজা বন্দনায় সজনে নির্জ্জনে উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে পারিতেছি না। যতদিন পৃথিবীতে আছি, দুঃখ, দৈন্য, রোগ, শোক, বিপদ, পরীক্ষা তো আসিবেই। দুঃখহারিণী বিপদনাশিনী জননি! আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার সাধু ভক্ত সন্তানদিগের পদানুসরণ করিয়া, নিত্য তোমার পূজা বন্দনায় সজনে নির্জ্জনে বিমল উৎসবানন্দ ভোগ করিয়া, সকল দুঃখ,

বিপদ ভুলিয়া যাই, দুঃখ বিপদকে অতিক্রম করিয়া তোমার বক্ষে উদ্ধলোকে দিব্যধামে বাস করিতে শিখি, এবং উৎসবানন্দে পূর্ণ থাকি। আমাদের জীবনে উৎসব যেন ফুরায় না, ফুরায় না। তব চরণে এই কাতর প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘোৎসব।

পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য প্রদর্শন জন্য, পৃথিবীর অগণ্য অংসখ্য মানব মানবীদিগকে স্বর্গের মহিমা গৌরবে মণ্ডিত করিবার জন্য, স্বর্গের পরম দেবতা লীলাময় শ্রীহরি, লীলাময়ী জননী স্বর্গের উৎসব পৃথিবীতে স্বয়ং বিধান করেন। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত অবতরণে এ উৎসব সম্পন্ন হয়। পৃথিবীর লোক আমরা, আমরা তো সংসার লইয়া, ইহলোকের সর্ব্বস্ব লইয়াই ব্যস্ত থাকি। সংসার লইয়া, ইহলোকের সর্ব্বস্ব লইয়া ব্যস্ত থাকি, আপনার রুচি, আপনার ভাব ও বুদ্ধির ভাবে। যদি আপনার ভাবে, আপনার রুচি বুদ্ধির ভাবে সংসারের সকল না দেখিয়া, ঈশ্বরের ভাবে সে সকল দেখিতাম এবং গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে সংসারে তো আমরা স্বর্গই দেখিতে পাইতাম, সংসারের সকল বস্তুর মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের পরিচয় পাইতাম, ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতাম; কিন্তু সে রূপ শিক্ষা তো আমাদের নাই, আমরা তো প্রথমে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বরের যোগে সংসারে প্রবেশ করি নাই, ঈশ্বরের যোগে সংসার গ্রহণ করি নাই। আমরা ঈশ্বর-নিরপেক্ষ ভাবে, ঈশ্বর-শূন্য ভাবে সংসারে প্রবেশ করিয়াছি, সংসারের সকল নিতান্ত সাংসারিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছি, তাই সংসারে আসিয়া আমরা হীন হইয়া পড়িয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার পৃথিবীর পুত্রকন্যাদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া যেমন তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যুগধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, নবযুগে আমাদের দুরবস্থা দর্শন করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, এবার স্বয়ং স্বর্গের সাধু ভক্ত মহাজনদিগকে লইয়া জীবন্ত যুগধর্ম্ম সহকারে অবতীর্ণ। তাঁহারই কৃপাতে আমরা তাঁহার পূজা বন্দনা সজনে নির্জ্জনে সত্য ভাবে সম্পন্ন করিয়া, তাঁহার সত্য দর্শন লাভের, সত্যবাণী শ্রবণের অধিকারী হইয়াছি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের কত অল্পতা ভক্তি অনুরাগ বিষয়ে আমাদের কত হীনাবস্থা, পূজা, বন্দনা, সাধন, ভজনে আমাদের কত জড়তা, কত শিথিলতা। তাঁহার পবিত্র নববিধান-ক্ষেত্রে কত সাধু, ভক্ত, যোগী ঋষিদিগের জীবনের সুসংবাদ আমরা লাভ করিয়াছি, সময় সময় ব্রহ্মকৃপাতে আমরা তাঁহাদের জীবনের স্পর্শও অল্পাধিক পাইয়া থাকি, তথাপি আমাদের জীবনের অভাব অপ্রস্তুতির যেন সীমা নাই। জীবনে কত নিরাশা, কত বিষাদ, কত দুঃখ, কত বেদনা। তিনি সকল বাধা, বিঘ্ন, দুঃখ, বিপদ অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত স্বর্গের পথে, অনন্তের পথে আমাদিগকে অগ্রসর করিবেন, এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাই তিনি সময় সময় স্বর্গকে মূর্ত্তিমান করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। স্বর্গ কি? স্বয়ং তিনিই স্বর্গ। তাঁহার চিন্ময় বক্ষস্থ সাধু ভক্তদিগকে লইয়া যে তাঁহার জীবন্ত উজ্জ্বল প্রকাশ, তাহাই তো স্বর্গের মনোহর দৃশ্য, এই মনোহর দৃশ্যই পৃথিবীতে স্বর্গের উৎসব। এই স্বর্গের দৃশ্য দেখিবার জন্য, এই উৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য, আমাদের প্রেমময় পরম পিতা, প্রেমময়ী পরম জননী, পৃথিবীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল দিক হইতে তাঁহার তৃষিত, ক্ষুধিত, দীন, দুঃখী, দরিদ্র, কাঙ্গাল পুত্র কন্যাদিগকে স্বয়ং ডাকেন, এস, সকলে আসিয়া পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য দর্শন কর, স্বর্গের উৎসব সম্ভোগ কর; এখানে আসিয়া নব জীবন লাভ কর, আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হও। তাঁহার গূঢ় আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া যখন তাঁহার ক্ষুধিত, তৃষিত পুত্র কন্যাগণ উৎসব-ক্ষেত্রে মিলিত হন, তখন জননীরূপিণী দুর্গতি-নাশিনী মায়ের কত আনন্দ। তখন সেই আনন্দময়ী মায়ের মূর্ত্তিতে, আনন্দময় প্রকাশে, সমাগত তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের জীবন পূর্ণ হইয়া যায়। মায়ের যেমন আনন্দময় মূর্ত্তি, পুত্রকন্যাদিগেরও তেমনই আনন্দময় মূর্ত্তি। আনন্দময় মূর্ত্তিতে উৎসব-ক্ষেত্র পূর্ণ। তাই স্বর্গের উৎসব আনন্দের উৎসব। মাঘোৎসব এই আনন্দময়ী জননী এবং স্বর্গস্থ ও ইহলোকস্থ তাঁহার আনন্দময় পুত্র কন্যাদিগের মিলনের মহা আনন্দোৎসব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

শ্রীঈশার জন্মোৎসব।

বড় দিন বড় আনন্দের দিন, মহামহোৎসবের দিন; কেননা, এদিন পরম পিতা পরম মাতার বড় ছেলে শ্রীঈশার জন্মোৎসবের দিন বলিয়া আদৃত হয়। কিন্তু এদিন ব্রহ্মপুত্রের ঠিক জন্মদিন বলিতে পারি না। কারণ তাঁর শুভজন্মদিনের নিরূপণ ইতিহাসে নাই। তবে এই বড়দিনে মরুসজাতীর পৌত্তলিক উপাসকগণ এক প্রকার বৃক্ষপূজার উৎসব করিতেন। পুরীর জগন্নাথের সেবকগণ যেমন আপনাদের দেবতাকে "দারুব্রহ্ম" নামে অভিহিত করিয়া পূজা করেন, উৎসবানন্দ করেন, তাঁহারাও কতকটা সেই ভাবে সম্ভব উৎসব করিতেন। বর্ত্তমান "খৃষ্টমাস তরু" প্রদর্শন তাঁহাদিগের সেই তরুপূজার অনুকরণে গ্রহণ করিয়া, সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়কে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার উদ্দেশ্যে, এই দিনে প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণ খৃষ্টজন্মোৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। তখন হইতেই এই বড়দিনে ব্রহ্মপুত্র শ্রীযিশুর জন্মোৎসব হইয়া আসিতেছে। কিন্তু শ্রীঈশার জন্মেরও যেমন ঠিক নাই, তাঁহার জন্মদিনেরও ঠিক নাই। কিন্তু এই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির জন্ম প্রচ্ছন্ন হইলেও, তাঁহার প্রভাব এই বিশ্বময় কি মহান্। কত সম্রাটের মুকুট তাঁর পদতলে লুণ্ঠিত। কেন না, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাপনগর বৈথিলিহামের অশ্বশালায় তাঁর জন্ম হইলেও, তিনি আত্মজ্ঞানে আপনাকে ব্রহ্মনন্দন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিলেন, অশ্বের ন্যায় চঞ্চলমতি পাপাসক্ত মানবও ব্রহ্মপুত্রত্ব লাভ করিতে অধিকারী। এই জন্মোৎসবে সত্যই আমাদের পাপ-বিধ্বস্ত অশান্ত জীবনেও যেন ব্রহ্মপুত্রের নবজন্ম লাভ হয়।

উপাসনায় ঐক্যবন্ধন।

সঙ্গীতের যেমন বিজ্ঞান-সঙ্গত সুর তাল লয় আছে, ব্রহ্মোপাসনা-সাধনেরও তেমনি আছে। বেসুরে বেতালে গান গাহিলে যেমন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির কাণে লাগে, মন বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ উপাসনারও নির্দ্দিষ্ট বিধি ভঙ্গ করিয়া, যাঁর যেমন ইচ্ছা, তেমনি প্রণালী অনুসরণ করিলে, সাধকদিগের সাধনেরও যথেষ্ট ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব যখন যিনি সামাজিক উপাসনার কার্য্য করেন, তাঁহার যেন এই বিষয়টী মনে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সমতা রক্ষার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। পাছে তাহা মুখস্থ মন্ত্রের ন্যায় হইয়া যায়, তাই নববিধানাচার্য্য ব্যক্তিগত ভাবানুসারে উপাসনা-সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন; কিন্তু তাহার ভিতরও নির্দ্দিষ্ট বিধি অবলম্বিত। বিধি বিনা সামাজিক সাধন সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ নববিধান বিধির বিধান। সঙ্গীত সংকীর্ত্তনে ঐকতান যেমন, নববিধানের একাত্মতা-সাধনের জন্য তেমনি এক ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত। উপাসনার একতা বিনা সাধকগণের পূর্ণ ঐক্যবন্ধন সম্ভবপর নয়।

নববিধানাচার্য্যের বাণী।

"আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলি না। বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার বাসগৃহকে এমন পরিষ্কার এবং সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন করিয়া রাখিবেন, যে কেহ ইহা দেখিবে, বলিবে, সত্য সত্যই ইহা ঈশ্বরের নিকেতন, তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ এখানে বর্ত্তমান। বিশ্বাসী বাসগৃহ এবং তদন্তর্গত সামগ্রী সমস্ত ঈশ্বর হইতে সমাগত এবং তাহা পবিত্র দানস্বরূপ জানিয়া শ্রদ্ধা করিবেন; এমন কি, পরমেশ্বরের পবিত্র নামকে এবং তাঁহার পরিবারের ঐহিক ও পারমার্থিক সুখকে মহিমান্বিত করিবার জন্য তৎসমুদয় ব্যবহার করিবেন। যে ঈশ্বরের সামগ্রী অপহরণ করে এবং তাহাদিগকে নিজস্ব বলিয়া মনে করে, কিম্বা ইন্দ্রিয়-সুখ এবং অবিশুদ্ধ অভিপ্রায়ে ব্যবহার করে, তাহাকে ধিক্!"

সংসার করা।

সংসার করা কতই কষ্ট-সাধ্য। কত রোগ, কত শোক, কত বিপদ, কত পরীক্ষা সংসারী ব্যক্তিকে সহ্য করিতে হয়। তাই কতজন তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে, নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে, সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আবার কতজন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, আপন ভাগ্যকে অভিসম্পাত করিতে করিতে, সংসারের কার্য্য সম্পাদন করেন। এই দুই প্রকার ভাবই প্রকৃত ধর্ম্মানুমোদিত নহে। সংসার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা ও বিরক্ত হইয়া সংসার করা এই উভয়ই অবিশ্বাসের লক্ষণ। ঈশ্বর এই সংসারের স্রষ্টা পাতা পালনকর্ত্তা হইয়া, স্বয়ং কি কখনও সংসারের পাপ কলুষ অনাচার অত্যাচার ধর্ম্মদ্রোহিতা অবিশ্বাস দেখিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান? না, তিনি অবিচলিত চিত্তে সকলই বহন করেন? প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিও ঈশ্বরের আদর্শে সমুদয় সহ্য করিবেন এবং আনন্দের সহিত সমুদয় বহন করিবেন। কারণ, সংসার মানবাত্মার শিক্ষালয়, সকল ঘটনাই মানবাত্মাকে সুগঠিত ও সমুন্নত করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত। বিধান-বিশ্বাসী সংসারের সুখে দুঃখে সমভাবে বিধাতার হস্ত দর্শন করেন ও আনন্দমনে প্রত্যেক খুটীনাটীটি পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রীতি-কামনায় সম্পাদন করেন। স্বামী স্ত্রীর বৈবাহিক মিলন এবং কর্ত্তব্য-সাধনও বিশ্বাসী ঈশ্বর-প্রেরণায় যোগযুক্ত হইয়া সাধন করেন।

"ধর্ম্ম-সাধন"।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের মতের আলোচনা)

২৭শ সংখ্যা—২৫শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

১৬ই কার্ত্তিক—১৭৯৪ শক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রশ্ন—বকল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারেরা ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করিতে বলেন কেন?

উত্তর—তাঁহারা বলেন, "Religion বা ধর্ম্মের অর্থ, যাহা দ্বারা জনসমাজকে একসূত্রে বন্ধন করা যায়; কিন্তু ধর্ম্ম মনুষ্যদিগকে পরস্পরের সহিত না বাঁধিয়া বিচ্ছিন্ন করিতেছে। আর ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ, নরহত্যা ও নানাবিধ অত্যাচার সংঘটিত হইতেছে; অতএব ধর্ম্মদ্বারা জগতের অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই। কিন্তু জ্ঞান দ্বারাই পৃথিবীর উন্নতি। প্রথমে লোকে অসভ্য ছিল, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারি বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ (Knowledge is power) জ্ঞানেরই ক্ষমতা, জ্ঞান বলে কি না সম্পন্ন করা যায়? অতএব বৃথা ধর্ম্মের গোলযোগ ছাড়, ক্ষেত্রতত্ত্ব রসায়নবিদ্যা পড়, যত পার জ্ঞানের চর্চ্চা কর।"

প্র—ধর্ম্মদ্বারা কি জগতের যথার্থ ই অনিষ্ট হইতেছে?

উ—মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রবল। যে বস্তুর যত বল, তাহার ভাল অথবা মন্দকার্য্য করিবার ক্ষমতা তত অধিক। ইহা প্রকৃতিস্থ থাকিয়া ঠিক পথে চলিলে অসীম মঙ্গল, বিকৃত ও বিপথগামী হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপাদন করে। কিন্তু ধর্ম্মদ্বারা মঙ্গল না হইয়া যে অমঙ্গল হয়, সে মনুষ্যের দোষে, তাহা বলিয়া ইহাকে দূরীভূত করা যায় না। মনুষ্য-সমাজে যত অত্যাচার ও অমঙ্গল ঘটিতেছে, সকলি স্বাধীনতার অপব্যবহারে; তা বলিয়া কোন ব্যক্তি এমন নির্ব্বোধ যে, সকল অনিষ্টের কারণ বলিয়া স্বাধীনতাকে লোপ করিবে? বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি যাহারা জগতের প্রাণ, সময় সময় তাহাদের দ্বারা সর্ব্বনাশ হইতে দেখিয়াও, কে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে? অতএব মানবসমাজের সর্ব্বমঙ্গলনিদান ধর্ম্ম হইতে আমাদের দোষে সময় সময় দুর্ঘটনা হয় বলিয়া, তাহা কখন পরিত্যাজ্য হইতে পারে না।

প্র—জ্ঞান দ্বারা কি পৃথিবীর সকল অভাব দূর ও সকল উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে?

উ—জ্ঞানদ্বারা যে জগতের অশেষ উপকার হয়, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু জ্ঞানদ্বারা মনুষ্যের সকল অভাব দূর এবং সকল উন্নতি সিদ্ধ হয়, এ অজ্ঞানের কথা বকলের অপেক্ষা উচ্চমত প্রকাশ হইতেছে এবং ইউরোপের জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন, Intellectualism) কেবল জ্ঞানদ্বারা জগতের উন্নতি হয় না; হৃদয়ের কর্ষণ দ্বারা হৃদয়ের ভাল ভাব সকল যাহাতে সঞ্চিত হয়, তৎপ্রতি যত্ন করা আবশ্যক। 'কমট' যে সকল কথা অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার অনুরক্ত শিষ্য 'লুইস' প্রভৃতি তাহা স্বীকার করিয়া জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের যোগ সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

প্র—কম্‌ট কি ধর্ম্ম এককালে অগ্রাহ্য করেন?

উ—কম্‌ট প্রথমে জ্ঞানগর্ব্বিত ছিলেন এবং জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জগতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। কিন্তু আমরা তাঁহার বিষয়ক আখ্যায়িকাতে পাঠ করিয়াছি, পরে কোন ঘটনা বিশেষ দ্বারা তাঁহার মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তিনি পরে জ্ঞানের অসারতা স্বীকার করেন এবং হৃদয়ের উন্নতিই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কারণে মাতা, স্ত্রী এবং কন্যা এই ত্রিমূর্ত্তির পূজার বিধি দেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাব যত খুলিতে লাগিল, তত তিনি ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। তিনি যে সকল উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ্য বলিয়া স্থির করেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের নাম ও ধর্ম্মভাব পূর্ণ একখানি গ্রন্থ তাঁহার সর্ব্বাধিক আদরণীয় ছিল। তিনি জীবনের শেষ অবস্থায় ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ সকল লিখিয়া যান। এ সকল দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ অসীম খ্যাতি লোপ হইবার আশঙ্কায় তাঁহার পত্নী এ সকল প্রচার করিতে দেন নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নাস্তিক ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া তাঁহার যে অপবাদ আছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্র—লুইস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা কি বলেন?

উ—তাঁহারা বলেন, মনুষ্যের হৃদয়ের উন্নতি সাধন প্রধান কার্য্য এবং মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ না পাইলে তাহা সম্পন্ন হয় না। এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্র—জ্ঞানশিক্ষার সহিত ধর্ম্মভাবের উন্নতি, কিরূপে লাভ করা যায়?

উ—জ্ঞানের নানা শাখা আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ ভাবে, কতকগুলি পরোক্ষভাবে মনের উপর কার্য্য করে। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মভাব সংগ্রহ করা যায়, অন্যান্য শাস্ত্র উপায় বিশেষ দ্বারা ধর্ম্মোন্নতির সহায়তা করে। অঙ্কবিদ্যা অনুশীলন দ্বারা ধৈর্য্য, সত্যানুরাগ, সুপ্রণালী অনুসারে পরিষ্কাররূপে বুঝিবার শক্তি লাভ হয়; তাহাতে মন যে পরিমাণে উন্নত হয়, ধর্ম্মানুসন্ধানে সেই পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞানশাস্ত্রের কৌশল ও অখণ্ড নিয়ম সকল শিক্ষা করিয়া ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান ও মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য অধ্যয়ন দ্বারা কবিত্বের আস্বাদন পাইয়া, ব্রহ্মাণ্ড

ঈশ্বরের ছবিতে পরিপূর্ণ দেখা যায়। এইরূপে জ্ঞানের যে বিভাগে প্রবেশ করি, তাহার সকল সত্যে তাঁহার সত্যস্বরূপ উপলব্ধ হয় এবং ধর্ম্মানুরাগীর হৃদয়কে প্রেম ভক্তিতে উন্নত করিয়া তোলে। বস্তুতঃ প্রত্যেক সত্যে ঈশ্বরের Communion সহবাস লাভ করা যায়, এ কথা অতি যথার্থ।

প্র—এখনকার অনেক বিজ্ঞানবেত্তা ঈশ্বর না মানিয়া, স্বভাব ও স্বভাবের নিয়ম মানেন, সে কিরূপ?

উ—যাঁহারা গভীররূপে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা এই জগতে জগতের সকল ঘটনার নিয়ামক জগতের অতীত এক শক্তি স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই শক্তির অপার জ্ঞান ও অসীম মঙ্গল ভাব বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। অনন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন প্রেমসম্পন্ন এক শক্তি যদি স্বীকার করা হইল, তবে ঈশ্বর-স্বীকারের আর কি অবশিষ্ট রহিল? বিজ্ঞানবিদেরা Law নিয়ম, Vita ity জীবনীশক্তি, Method প্রণালী, Active Principle জীবন্ত কারণ ইত্যাদিকে জগৎ কার্য্যের কারণ বলেন। সূক্ষ্মরূপে দেখিলে ইহা ঈশ্বর-শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। আশ্চর্য্য! লোকে একই পদার্থকে ভিন্ন কথায় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মনে করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও তাহা গ্রহণ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রের শব্দকে যাঁহারা কুসংস্কার-সূচক বলেন, বৈজ্ঞানিক ভাষায় সেই শব্দ বুঝাইয়া দিলে গ্রহণ করিতে আর কোন আপত্তি করেন না। অতএব বিজ্ঞানবিদ্‌দিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা বুঝাইতে হইলে, তাঁহাদিগের ভাষায় তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বভাবে ঈশ্বরকে প্রকাশিত দেখিয়া তাঁহার পূজা করিবেন এবং স্বভাবের নিয়মেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান হইবেন।

প্র—অঙ্কশাস্ত্র যেমন সহজে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র তেমন বুঝা যায় না কেন?

উ—যে শাস্ত্র যত উচ্চ, তাহা তত জটিল, সুতরাং বুঝিতে তত কঠিন। অঙ্কশাস্ত্র অপেক্ষা জড়বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান অপেক্ষা শারীর বিজ্ঞান, তদপেক্ষা মনোবিজ্ঞান, এবং তদপেক্ষা আত্মতত্ত্ব বুঝা কঠিন। কিন্তু অঙ্কের নিয়ম সকল অপরিবর্ত্তনীয় এবং শারীরিক নিয়মের পরিবর্ত্তন দেখা যায়, একারণ অঙ্ক অপেক্ষা শারীর বিজ্ঞানকে অসত্য বলা যায় না, দুরূহ বলা যায়; ইহাতে অবস্থাভেদে এক নিয়মের অন্তর্ভূত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম আসিয়া তাহার কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া দেয়। উচ্চতর শাস্ত্রে এরূপ আরো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম কার্য্য করিয়া থাকে।

প্র—ইতিহাস পাঠ করিলে কত শত যুদ্ধ, হত্যায় মনুষ্যরক্তে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে দেখা যায়; ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত কিরূপে অনুভব করা যাইতে পারে?

উ—যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর শিক্ষা দেন যে, মনুষ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে অথবা জাতি সকল পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ করিলে এত অকল্যাণ হয়। তিনি আমাদের পাপে লিপ্ত নন, অথচ পাপের মধ্য হইতে শিক্ষা দান ও যেরূপ হউক শুভফল বিধান করেন। রোমের পতন কখন হইল? যখন তাহাদের মধ্যে Epicurian নামে চার্ব্বাক মত প্রচলিত হইল এবং লোক সকল অলস ও ভোগবিলাসী হইয়া পড়িল। ঈশ্বর এক বৃহৎ ঘটনার দ্বারা সমুদয় জগৎকে চিরকালের জন্য সতর্ক করিয়া দেন।

প্র—ধর্ম্মজীবনের বর্ত্তমান প্রণালীর ফল ঠিক ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, তাহা কি বলা যায়?

উ—জীবনের পথে এমন স্থান আছে, যেখানে উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব ঘটনা সকলের সহিত বর্ত্তমান জীবনের স্পষ্ট যোগ উপলব্ধি হয় এবং বর্ত্তমান জীবন পূর্ব্ব জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া প্রতীত হয়। ইহা হইলে বর্ত্তমানের সহিত ভাবী জীবনের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে, তাহার সন্দেহ কি? তবে আমাদিগের জীবনের মধ্যে পদে পদে স্বাধীনতা ব্যতিক্রম ঘটাইতেছে, এজন্য কারণ কিরূপে কতদিনে কার্য্যে পরিণত হইবে, বলা সুকঠিন।

প্র—অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা জ্ঞানানুশীলন বিষয়ে ব্রাহ্মের প্রাধান্য কি?

উ—ব্রাহ্ম জানেন, আমার মূল বিশ্বাস সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে ভীত বা সঙ্কুচিত নহি। নাস্তিকতা, প্রকৃতিবাদ, মায়াবাদ, সকলকে অধীন করিয়া, সকলের অভ্যন্তর হইতে সত্য বাহির করিয়া, তাহাদের কেহ যাহা দিতে পারে নাই, এমন উচ্চতর সত্য জগৎকে দিতে পারিব। The whole world is our Revelation— সমুদায় জগৎই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। সকল সত্যই গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আশা সর্ব্বোচ্চ, ইহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, হৃদয়ের উন্নতির পরাকাষ্ঠা; কিন্তু ব্রাহ্মকে যে যাহা বলে, তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। ঈশ্বরের আলোক যাহা আপনার মধ্যে পাইয়াছেন, তদ্দ্বারা সত্য নির্ব্বাচন করিয়া লন।

(ক্রমশঃ)

ঠাকু'মা।

(২৭শে অগ্রহায়ণ, ধুবড়ীর স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ সরকারের সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধবাসরে পৌত্রী কর্ত্তৃক পঠিত)

গেছ চলি বহুদূর,
তব স্মৃতিখানি রাখিয়া হৃদয়ে
হব ভরপুর।

আজ আপনার শ্রাদ্ধবাসরে আপনার স্নেহের, আপনার শ্রদ্ধার, আপনার অতি নিকটতম সবাই উপস্থিত হয়েছেন।

আপনি নেই, আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। জানিনা, আপনি যেখানে আছেন, সেখান থেকে আমাদের ঠিক তেমনি ভাবে দেখছেন কিনা, যেমন করে দেখতেন কয়েকদিন আগে, যখন আপনি রক্তমাংসে গঠিত দেহে আমাদের মধ্যে ছিলেন। যখন প্রিয়জনের সামান্য একটী কাঁটার আঘাতে ব্যথিত হয়ে ছুটে যেতেন, ব্যথিত প্রিয়জনের ব্যথার উপশমের জন্য। আজও আপনি নিশ্চয় এসেছেন—এসে নিশ্চয়ই আমাদের অলক্ষ্যে আমাদের ব্যথিত বক্ষে আসন রচে নিয়েছেন।

আজ আপনি নেই, কিন্তু আপনার ভেতর অর্থাৎ রক্ত মাংসে গঠিত দেহে "আত্মা" বলে যে অপর একটা অদৃশ্য বস্তু ছিল, তা এখনও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে, এবং চিরদিন থাকবেও; কেন না মানুষের শরীর যায়, কিন্তু যা বেঁচে থাকে, সেটা হচ্ছে তার "মনুষ্যত্ব", আর এইটাই মানুষের প্রাণে আঁকা থাকে। কাজেই আপনার শরীর নেই, কিন্তু আপনার আত্মা আজ বেঁচে থেকে সবাইকে ঠিক তেমনি ভাবে স্নেহ যত্ন করচে, তেমনি আদর যত্ন করে সবার খোঁজ খবর নিচ্ছে।

ঠাকু'মা, আপনার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করব, কি আনন্দ জানাব, তা ভেবে পাই না। আমরা সাধারণ মানুষ, তাই মৃত্যুকে আমাদের কাছে অত্যন্ত ভীষণ বলে মনে হয়, কাজেই আপনাকে সেই ভীষণের কাছে যেতে দেখে আমরা কেঁদে আকুল হই। আর এদিকে যে সব যুক্তি আছে তা হচ্ছে, মৃত্যু কল্পনায় ভীষণ এবং ভীষণের সাথে সুন্দর ভাবে চলাফেরা করে, এই মত যদি সত্য হয়, তবে মৃত্যুতে দুঃখ করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। তবুও আমরা কাঁদি—কাঁদি! কারণ, ভগবান্ যখন তৈরী করে পাঠান, তখন তার সাথে মৃত্যু আশীর্ব্বাদ আমাদের শিরে বর্ষণ করেন তার হিসাব নিকাশ করি না। কাজেই মানুষের বাঁচাটাকেই সত্য মনে করি ও মৃত্যুকে নিতান্ত দুঃখের সহিত অভিনন্দন জানাই। যাক্, যুক্তি তর্ক বাদ দিয়ে সাধারণ ভাবে দেখলেও দেখা যায় যে, এখানে যেমন আপনি আপনার অত্যন্ত প্রিয়জন ও নিকটতমদের ছেড়ে গিয়াছেন, ঠিক তেমনি আপনার অন্যান্য নিকটতম ও প্রিয়তমেরা যে দিকে গিয়েছেন, আপনি তাঁদের সাথে আপনার পরিপূর্ণ যোগাযোগ সৃষ্টি করতে চলেছেন। কাজেই আপনার স্বাধীন চলাফেরার কোন প্রকার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে চাই না। তবুও কাঁদি, কারণ সবাই আছে, শুধু নেই আপনি।

আপনার সন্তান সন্ততি, যাদের আপনার স্নেহ-সুধায় সঞ্জীবিত করে রাখতেন, যে গৃহকুঞ্জ-কোণে আপনার নিপুণ হস্তের অদ্ভুত কারুকার্য্যে আজ পরিপূর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে, তাই সব সময় আপনাকে নিবিড় করে পেতে চায়। কত স্মৃতি, কত ব্যথা, কত আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে আপনার জীবন-প্রবাহ উচ্ছল তরঙ্গ-ভঙ্গীতে বয়ে গিয়েছিল, আজ যে মৃত প্রবাহ প্রাণে শুধু ব্যথা বইয়ে আনে। প্রত্যেক অণু পরমাণুতে আপনার পায়ের ছাপ ব্যথাকে আরও জমাট করে তোলে; তাতে তারা কাঁদে, তাদের ক্রন্দনে আমরাও আরও কাঁদি। আজ সকল কথা ছাপিয়ে ওঠে আপনি নেই, কিন্তু পড়ে আছে আপনার অতিথি-সৎকার, আপনার আদর্শ, আপনার বাৎসল্য ও নিপুণ গৃহস্থলীর সুদক্ষ হস্ত।

মানুষকে কি আপন ভাবতেন! কোন দিন কোন ব্যথিত মানব আপনার কাছে আঁচল পেতে ব্যর্থ হয়নি, তার ব্যথা যেন আপনার বুকে শেলের মতন বিঁধতো; তাই তাদের সহস্র আশীর্ব্বাদ আপনি জীবনে অর্জ্জন করেছিলেন। এ শুধু আমার কাছে গর্ব্বের বিষয় নয়, আপনার কাছে শিখবার অনেক কিছু......।

ঠাকু'মা! আপনার বংশ-গৌরবের দীপ্ত অহঙ্কার, যাকে আপনি কিছুতেই অপ্রকাশ রাখতে পারতেন না, যা আপনার সকল কাজের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করত, তা আমাদের কত গৌরবান্বিত করেছে। আপনার মৃত্যু এ গৌরব অপহরণ করতে পারে নি; তাই আমাদের উচিত, যাতে আমাদের অশ্রু-জলে আপনার স্বাধীন গতিকে প্রতিরোধ না করি।

তবুও অবুঝ আমরা—তাই কাঁদি। মনে হয়, আমার শৈশবের কথা, যখন অযথা অকারণে আপনাকে জ্বালাতন করতাম আর আপনি তার বিনিময়ে আপনার স্নেহ দিয়ে, আপনার ভালবাসা দিয়ে সহস্র বিপদ থেকে আমাদের আড়াল দিয়ে রাখতেন। মনে পড়ে, আপনার সেই অপরিসীম পরিশ্রম, যা দিয়ে আপনি সংসারের সমস্ত ছোট বড় কাজ আপন হাতে সুসম্পন্ন করেছিলেন। অতিথিসৎকার, দীনের প্রতি সহানুভূতি, আপনার ধৈর্য্য, আপনার সহ্য করবার ক্ষমতা, সমস্তই একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠে। ঠাকু'মা, আপনার সরলতার কথা মনে হচ্ছে। কোন কথাই আপনি গোপন করতে জানতেন না, এই সরলতার জন্য আপনি কত সময়, কত কষ্ট ভোগ করেছেন; কিন্তু তথাপি প্রকৃতিগত সরলতা ত্যাগ করতে পারেন নি। আপনি সেকেলে মেয়েদের মতন সরল হলেও, সব সময় সব কথা গুছিয়ে বলতে না পারলেও, আপনার আত্মনির্ভরতার কথা ভাবলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যাই। পরের উপর নির্ভর করা আপনার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। এই বৃদ্ধ বয়সেও আপনার পুত্রবধূ ও পুত্রগণের এবং চাকর চাকরাণীর উপর বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র কোন কাজের জন্য নির্ভর করতেন না। পরের অধীনস্থ হয়ে নিজের স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বাস করা আপনার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তাই সাংসারিক কোন কাজে পুত্রগণের সহিত মনের মিল না হলে, আপনার স্বাধীনতাকে বজায় রাখবার জন্য আপনার স্বামীর বাস্তুভিটায় ধুবড়ী চলে যেতে চাইতেন। আপনার আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতার আদর্শ আজ চোখের সামনে ফুটে উঠছে, আর তার

সঙ্গে অনন্ত হয়ে ফুটে উঠে আপনি নেই—আপনার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ, তাই কাঁদি।

এ কাঁদার সার্থকতা সেই দিনই, যে দিন বুঝব, আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও আমাদের জীবনের ধারা গড়ে তুলেছি। শারীরিক অশান্তি শোক দুঃখ জ্বালা কিছুই আপনাকে কোনদিন অবনত করতে পারে নি; যতই কঠিন ও যতই যন্ত্রণাদায়ক হউক না কেন, কোন রোগে আপনি অধীরা হননি। এমন কি, এই বৃদ্ধ বয়সেও অসুখের জ্বালায় আপনার মুখে যন্ত্রণা মাখা কোন শব্দ শ্রুত হওয়া যায় নি। শুনেছি, পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুও অকাতরে সহ্য করেছেন। আপনি ছিলেন মহিয়সী, আপনি ছিলেন চির হাস্যময়ী, তাই মর্ত্তের মানুষ হয়েও এ সব জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আর আপনার এ সব সহ্য করতে হবে না। জগতের কোলাহল, অশান্তি যন্ত্রণা জয় করে, লোভ আশা ও সুখ সম্পদের আকর্ষণ অবহেলা করে, আজ আপনি ধ্রুবলোকে অমৃতলোকে নতুন জগতের নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছেন। প্রার্থনা করি, আপনার মহাপ্রস্থান যেন সার্থক হয়।

খুকী (কৃপাকণা সরকার)

—•—

"আনন্দবাজার"।

(ব্রহ্মানন্দের সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবীর রচিত)

আনন্দবাজার বসে কমলকুটীরে।
আমরা সকলে ভাসি সুখসিন্ধুনীরে ॥
বৎসরে বৎসরে খুলিয়া বাজার।
আহ্বান সকলে করে ভক্ত-পরিবার ॥
বিচিত্র ভাবের লীলা, রঙ্গ কত আর।
দোকান খুলছে সবে, দ্রব্য যার যার ॥
কে নিবি আয় প্রেমের ছবি ত্বরা করে।
যাস্ না গো তোরা ফিরে, শূন্য হাতে ঘরে ॥
কেহ লয়ে মুড়ি, চালভাজা সাজায়ে ডালায়।
নারিকেলকুচি, লঙ্কা গুঁজি তাহার মাথায় ॥
আনন্দনাড়ু আর পাঁচসাত ভাজা ॥
ফুলুরী, বেগুনি, গজা, মতিচুর খাজা ॥
পাকা ফল নানাবিধ, ডাব নারিকেল।
কমলালেবু ও শশা, কলা আর বেল ॥
মহারাণীর দোকান হেরিয়ে সবায়।
বহুলোক জড় হয় যাইয়া তথায় ॥
মহারাণী দেখিবারে আসিয়া আশায়।
রাজপুত্র, কন্যা কেবা তাহারা সুধায় ॥
নানাবিধ দ্রব্য বস্তু কিনিতে না চায়।
কত আর দিব মোরা তাদের পরিচয় ॥
ছেলেদের সঙ্গে ল'য়ে উমানাথ দোলে।
নব-বিধি জয় ব'লে শিশু ল'য়ে কোলে ॥
ময়রা সাজি সে এক বাজী তাহে খেলা করে।
নববিধি নব-সুরা পানে মত্ত করে ॥
কমল-সরসী-ধারে সবে ঘুরে ফিরে।
কেহ কেহ জলপান করে তার নীরে ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, আনন্দে বেড়ায়।
ধনী ও নির্ধনী দুয়ে এক হয়ে যায় ॥
বিধান দোকানে লোকে ঘুরিয়ে বেড়ায়।
নানাবিধ দ্রব্যবস্তু সাজায় তথায় ॥
গৃহকার্য্য নারীগণে তাড়াতাড়ি করে।
কার্য্যে নাহি মন যায় দোকানে কি করে ॥
সংসার ভুলিয়া গিয়া সদানন্দ মন।
আনন্দ-বাজার সবে করে দরশন ॥
ভাবুক ভক্তের লীলা কে পারে বুঝিতে।
মুগ্ধ হয়ে মন থাকে হাসিতে হাসিতে ॥
ভক্ত-ছবি, ভক্ত-গ্রন্থ, ভক্তের দোকান।
ভক্ত-পরিবার লয়ে খেলে ভগবান্ ॥
বালক বালিকা যত সবে নাচে গায়।
যুবা, বৃদ্ধ, ভক্তবৃন্দ, সকলে তথায় ॥
নর, নারী ভিন্ন ভিন্ন বাজারের দিন।
সবে আসি জড় হয় প্রবীণ, নবীন ॥
দাসদাসী সবে খুসি বাজার মেলায়।
আনন্দময়ী বসে ভক্ত-দেবালয় ॥
হরির কীর্ত্তন হয় দিবস রজনী।
খোল করতাল বাজে, নহবৎ ধ্বনি ॥
মা হাসে, ছেলে হাসে, হাসির বাজার বসেছে
কমলকুটীরে।
ভক্ত হাসে, ভক্ত-পরিবার হাসে, হরির সংসারে ॥
নাকর খেলনা খেলে বাজার ভিতরে।
মোরা উঠে ঘুরে মরি, গা কেমন করে ॥
ব্রহ্মানন্দ ভক্তবৃন্দ-লীলা যুগে যুগে।
মানব-সম্ভোগ লাগি, রবে তারা সুখে ॥

জন্মোৎসবে ভক্তি-অর্ঘ্য।

(ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মদিন, ১৯শে নবেম্বর)

আজ আমাদের আদরের আর্য্যনারীসমাজের এই বিশেষ আনন্দের দিনে, আর্য্যনারীসমাজ যিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁর জন্মদিনের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করি। তাঁর শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে সেই ভক্তের জন্মদাতা করুণাময় বিশ্বদেবতার মঙ্গলচরণে প্রাণের আনন্দপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাই। আজ কত

বৎসর হইয়া গিয়াছে, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এই ভক্তরত্ন আচার্য্যদেব এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর কোন শুভক্ষণে আমাদের নারীজাতির কল্যাণ, উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য এই আর্য্যনারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি এবং প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত সেই সর্ব্বসুখদায়িনী ভক্ত-জননীর চরণে প্রণাম করি। বিশ্বজননীর অপার করুণায় আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও যে এমন অতুল সম্পদ, অমূল্য আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি, সেজন্য আমরা তাঁর চরণে চির কৃতজ্ঞ ও পরম কৃতার্থ। আমরা যেন এই অসীম করুণার একটুও উপযুক্ত হইতে পারি, এই বিনীত ভিক্ষা। আর যাঁহারা নিয়মিতভাবে ইহার উপাসনা সঙ্গীতাদি কার্য্য-সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, এবং যাঁহারা নিত্য নিয়মিত যোগদান পূর্ব্বক উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের অসংখ্য ধন্যবাদ ও বিনীত প্রণাম জানাইতেছি। আর যাঁহার প্রাণের গভীর ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা এবং সহানুভূতি ও সাহায্যে ইহা পুনর্জীবিত হইয়া, এখনও আমাদের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ, উন্নতি এবং মঙ্গল সাধন করিতে সঞ্জীবিত আছে, সেই সুদূর-প্রবাসিনী স্নেহময়ী ভগিনীর কথা আজ বড়ই মনে হইতেছে। এই সাগরপার হইতে তাঁহার চরণে আজ বিনীত প্রণাম পাঠাইতেছি। তাঁর সেই স্নেহাশীর্ব্বাদে ভরা চিঠিতে এক দিন লিখেছিলেন—"তুমি যে আর্য্যনারীসমাজের কার্য্যভারটি নিয়েছ, ইহাতে যে আমার কত আনন্দ হয়েছে, কি বলিব। জানি, তুমি ইহা বেশ সুন্দররূপে চালাইতে পারিবে।" জানিনা, এ নিতান্ত অযোগ্য [illegible] তাঁহার এ ইচ্ছা কতদূর পূর্ণ করিতে ও সাধন করিতে পারিয়াছি। একমাত্র অন্তর্যামী ভগবানই তাহা জানেন। আরও লিখিয়াছিলেন যে, স্নেহের [illegible] আসিলে আশ্রম আরম্ভ করিও। তাঁহার অনেকদিনের সাধ, এই ইচ্ছা, অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া গত [illegible] মাস হইতে আশ্রম আরম্ভ করিয়াছি। স্নেহের [illegible] উপাসনা প্রার্থনা করিয়া ইহার কার্য্য আরম্ভ করেন। বহুদূর সমুদ্রপার হইতে তাঁহার সাহায্য ও আশীর্ব্বাদ, এবং আপনাদের সকলের সহানুভূতি, সাহায্য ও আশীর্ব্বাদ পাইয়া এই কাজটি বেশ সুন্দররূপে চলিতে পারিবে, ইহাই প্রাণের একমাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সকলের সাহায্য ও আশীর্ব্বাদ না পাইলে, একজনের মাথায় সব বোঝা পড়লে, এত বড় কাজ চালান বড়ই কঠিন, নিতান্ত অসম্ভব। জানি, কোনও একটা কাজ করিতে হইলে, অনেক অপমান, নির্য্যাতন, দুঃখ, কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অনেক বাধা বিঘ্ন অন্তরায় আছে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে ভিখারিণীকে অনেক দরজায় নিরাশ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু করুণার সাগর ভগবানের কৃপায় সকল অসম্ভব সম্ভব হবে। এই আশা প্রাণে লইয়া, এই প্রার্থনা হৃদয়ে ধরিয়া, দয়াময় ঈশ্বরের অসীম করুণা ও অনন্ত আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া, এবং সকলের স্নেহ ভালবাসা দয়া সম্বল করিয়া, যেন এই সেবাব্রতপালনে জীবনের কর্ত্তব্য কাজ শেষ করে, এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারি, সেই ভিখারিণীর বিনীত অন্তরের এই একান্ত ভিক্ষা।

শ্রীসরলা দাস।

বেদের সার্ব্বজনীনতা এবং অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬। লিপির সাহায্য ভিন্ন শুধু শ্রুতির সাহায্যে বেদ প্রচার।

শুধু তাহা নয়। সেই সুদূর অতীতকালে লিপির প্রচলন ছিল না; ঋগ্বেদ রচনার সময় লিখিত অক্ষর আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে। "শ্রুতি" শব্দই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। একালে চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট লিখিত অক্ষরের সাহায্যে দূরবর্ত্তী এবং পরবর্ত্তীদের নিকটে আমরা আমাদের মনের ভাব প্রচার করি। আদিম বৈদিক ঋষিদের সে সুবিধা ছিল না। শ্রুতি বা কর্ণ দ্বারা শ্রুত, মুখ দ্বারা উচ্চারিত শব্দ ভিন্ন, দূরবর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তীদের নিকটে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য, আমাদের লিখিত অক্ষরের মত তাঁহাদের কোন উপায় ছিল না। বস্তুতঃ শ্রুতি বা মুখ দ্বারা উচ্চারিত কর্ণ দ্বারা শ্রুত শব্দ দ্বারা প্রচার কেবল নিকটে বর্ত্তমান লোকের নিকটেই সম্ভব। তাহা ভিন্ন সেই আদিম বৈদিক ঋষির বেদমন্ত্র রক্ষা করিবার অথবা প্রচার করিবার উপায়ান্তর ছিল না। তাই ঋষি বলিতেছেন:—"মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জ্জন্য ইব ততনঃ" ॥ ১—৩৮—১৪ ॥ "মুখে মুখে শ্লোক রচনা কর, এবং মেঘ যেমন সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করে, সেইরূপে তাহা সর্ব্বত্র প্রচার কর;" "হংসা ইব কৃণুথ শ্লোকং" ॥ ১—৫৩—১০ ॥ "শ্লোক বা স্তোত্র রচনা করিয়া হাঁসের মত কীর্ত্তন কর।" হায় বেদে শূদ্রের অনধিকারবাদীরা তখন কোথায় ছিল! তাই, লিপির সাহায্য ভিন্ন শুধু হাঁসকে আদর্শ করিয়া শ্রুতিদ্বারা বেদ প্রচার করা কি ব্যাপার, একবার কল্পনা কর। লিপিপ্রচলন নাই; মুদ্রাঙ্কনের ত কথাই উঠিতে পারে না। হংসের মত চিৎকার করিয়া বা শ্রুতির পথে সাক্ষাৎভাবে কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় উপস্থিত নিকটস্থ লোকের নিকটেই বেদ-প্রচার সম্ভব ছিল; এবং তাহারাও স্থূলদর্শী মূর্খ "অসাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মাণঃ" সাধারণ লোক হওয়ারই কথা। দূরস্থ অথবা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের নিকটে কেবল মাত্র শ্রুতির পথে বেদপ্রচার-অসম্ভব। অথচ অন্ততঃ ৪০০০ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে প্রকাশিত এই ঋগ্বেদ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অলৌকিক ব্যাপার কি হইতে পারে? সেই আদিম ঋষিদের

লক্ষ্যই ছিল ভবিষ্যদ্বংশীয়দের নিকটে তাঁহাদের দৃষ্ট অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করা:—"দেবানাং নু বয়ং জানা প্রবোচাম বিপন্যয়া। উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে॥" ১০—৭২—১॥ ঋষি বৃহস্পতি বলিতেছেন:—"আমরা স্পষ্ট-বাক্যে দেবতাদিগের জন্মের কথা প্রকাশ করিব, যদ্দ্বারা পরবর্ত্তীকালের লোকেও উচ্চারিত স্তোত্রের মধ্যে দেবতাদের সেই জন্মের কথা দেখিতে পাইবেন।" সে কথা কি? "ব্রহ্মণ-স্পতিরেতা সং কর্ম্মার ইবাধমৎ। দেবানাং পূর্ব্বে যুগেঽসতঃ সদজায়ত॥" ১০—৭২—২॥ "স্তোত্রপতি পরমেশ্বর, কর্ম্মকার যেমন ভস্ত্রা (bellows) দ্বারা বাতাস করিয়া (ধাতুময়) রূপ নির্ম্মাণ করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ পূর্ব্বকালে এ সকল দেবতা নির্ম্মাণ করিলেন। নিরাকার পরমেশ্বর হইতে সাকার বস্তু সকল উৎপন্ন হইল।" কেমন প্রহেলিকার মত ঋষি বলিতেছেন:—"অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি॥" ১০—৭২—৪॥ "অখণ্ড বা অনন্ত (অদিতি) হইতে শক্তি (দক্ষ) উৎপন্ন হইল, শক্তি হইতে সেই অখণ্ড বা অনন্ত উৎপন্ন হইল"।—সায়ন বলিতেছেন যে, যাস্কাচার্য্য এই বলিয়া এই প্রহেলিকার উত্তর দিতেছেন, "সমানজন্মানৌ স্যাতামিতি"—অনন্ত এবং অনন্তের শক্তি যুগপৎই প্রকাশ হইয়াছিল। মুদ্রাঙ্কণ, এমন কি লিপি-প্রচলন পর্য্যন্ত নাই—"যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে"—"পরবর্ত্তীকালেও তাহা দেখিবে", ঋষিদের এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে, এবং অন্ততঃ চারি হাজার বৎসরের পুরাতন ঋগ্বেদ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতেই ঋষিদের বা "সাক্ষাৎ-কৃতধর্ম্মদের" সার্থকতা—"অসাক্ষাৎকৃতধর্ম্ম" অজ্ঞানী জন-সাধারণকে উপদেশরূপে সেই সাক্ষাৎ দৃষ্ট মন্ত্র সকল সম্প্রদান করিলেন—"উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ।" কিরূপে এই অসম্ভব সম্ভব হইল, চিন্তা করিয়া দেখুন। আমরা যদি তখন থাকিতাম, এবং "যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে" যদি আমাদেরও লক্ষ্য হইত, তবে অক্ষর আবিষ্কার এবং লিপি-প্রচলনের পূর্ব্বে আমরাও সেই লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য কি করিতাম?

৭। বৈদিক কিণ্ডারগার্টেন।

আমরা আমাদের ঋগ্বেদ প্রথম ভাগের শেষে, এবং দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভে, "বেদমাতা আদিম ধর্ম্মমাতা," 'বেদমাতার সেবা' প্রবন্ধে,—এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এ স্থলে আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সেই আদিম ঋষিগণ লিখিত অক্ষরের পরিবর্ত্তে দৃষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকলের মধ্যে যাহা কিছু অত্যুজ্জ্বল এবং অতীব চিত্তাকর্ষণকারী, সে সকল বাছিয়া, সেই অদৃষ্ট, অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের দৃশ্য সঙ্কেতরূপে ব্যবহার করিয়া, যথাসম্ভব তাঁহাদের লক্ষ্য সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহারই আধুনিক বৈদান্তিক নাম "অধ্যাস," বা "অতস্মিংস্তৎবুদ্ধিঃ"—"যে বস্তু যাহা নয়, ধর্ম্মসাধনার জন্য জানিয়া শুনিয়া সেই বস্তুকে তাহা মনে করা।" (Compare Bain: on "the Association of Ideas" Mental and Moral Science, P. 85 to 126)। বিচার করিয়া দেখিলে একালের প্রচলিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ইহার সহিত মূলতঃ এক। আদিম ঋষিগণ, যে কালে পারসিক আর্য্যগণ এবং ভারতীয় আর্য্যগণ পৃথক হয় নাই, জরথুষ্ট্রেরও পূর্ব্বে, আদিম ঋষিগণ শুষ্ককাষ্ঠখণ্ডদ্বয় (অরণি) ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া, সেই কাষ্ঠস্থিত অদৃশ্য অগ্নিকে (Latent Leat) দৃশ্য অগ্নির (Sensible heat) কারণ জানিয়া, তাহাকেই নিরাকার ঈশ্বর হইতে সাকার জগতের প্রকাশের সঙ্কেতরূপে পরমেশ্বরের স্থানে বসাইলেন এবং উপমিতি বলে অগ্নি শব্দকে দুই অর্থে—এক ঐশ্বরিক এবং আর এক ভৌতিক অর্থে গ্রহণ করিয়া, অধ্যাস দ্বারা একই বস্তুতে উভয় অর্থ যোগ করিলেন। তাই ঋগ্বেদের ঋষি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—"ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত" ॥ ৬—১৬—১৩॥ "তমু ত্বা দধ্যঙ্ ঋষিঃ পুত্র ইধে অথর্বণঃ॥" ৬—১৭—১৪॥ "হে অগ্নে অথর্ব্বা তোমাকে মন্থন দ্বারা অরণিচ্ছিদ্র হইতে বাহির করিয়া-ছিলেন।" "অথর্ব্বার পুত্র ঋষি দধ্যক্ ও (দধীচি) তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন।" ঋষি মেধাতিথি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—"ত্বং হোতা মনুর্হিতোঽগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি" ॥ ১—১৪—১১॥ "হে অগ্নে, যজ্ঞে মনু তোমাকে দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা রূপে স্থাপন করিয়াছিলেন।" "যো নঃ পিতা জনিতা" ইত্যাদি মন্ত্রের (১০—৮২—৩) "যো দেবানাং নামধা এক এব"—"যিনি এক হইয়াও সকল দেবের নাম ধারণ করেন," কোন বেদাধ্যায়ী বিস্মৃত হইবেন না। যাঁহারা মনে করেন যে, সুধু জড় দৃশ্য অগ্নির প্রতি এই সকল ঋষিবাক্য প্রযুক্ত, তাঁহারা সেই সকল আদিম ঋষির প্রতি কিরূপ অবিচার করিতেছেন, তাহা আর বলিবার নয়। ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এই যজ্ঞাগ্নি উৎপন্ন করা হইত (সামিধেনী ঋক্)—এবং "অর্থাদর্থাদগ্নিং প্রণয়েদ্ প্রবৃত্তে কর্ম্মণি লৌকিকঃ সম্পদ্যতে"—(আপস্তম্বকৃত যজ্ঞপরিভাষা, ১৬০) "প্রত্যেক ব্যাপারে পৃথক ভাবে অগ্নি উৎপন্ন করিবে, কারণ সেই ব্যাপার শেষ হইলেই অগ্নি লৌকিক হইয়া যায়"। এই লৌকিক এবং অলৌকিক অগ্নির ভেদের প্রতি লক্ষ্য করুন। মন্থন দ্বারা সদ্য উৎপন্ন অগ্নিকে পরমেশ্বরের দৃশ্য সঙ্কেতরূপে গ্রহণ করিয়া, সেই অগ্নিতে গৃহস্থের প্রিয় খাদ্য বস্তু সকল আহুতি দিয়া, নিরাকার হইতে প্রাপ্ত প্রিয় বস্তু সকল আবার নিরাকারে সমর্পণ করা, কিণ্ডারগার্টেন আকারে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের দৃশ্য সঙ্কেত হইয়াছিল। এ জন্যই ঋষি বলিতেছেন, "শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ" ॥ ১০—১৫১—১॥ কিণ্ডারগার্টেনের দৃশ্য প্রতীক (object lesson) এবং অভিনয়-সঙ্গীতের (action song) মত, আদিম বৈদিক ঋষিগণ রূপকের (Allegory) বেশে অগ্নি, বায়ু, জল,

আকাশ, অহোরাত্র, উভয় সন্ধ্যা, সূর্য্য এবং উষাদিকে, অদৃশ্য পরমেশ্বরের এই সকল দৃশ্য মহিমাকে—"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ" ॥ ১০—৯০—৩॥ পুরুষের বেশে সাজাইয়া (Personification)—"পৌরুষ-বিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তুয়ন্তে, অথাপি পৌরুষবিধিকৈর্দ্রব্যসংযোগৈঃ॥" নিরুক্ত, ৭—২—২॥ দৃশ্য এই সকল ভৌতিকবস্তুকে নানা প্রকার দেবতা রূপে এক বিশ্ব-নাটক রচনা করিয়া, তাহা অজ্ঞানী জনসমাজের হৃদয়পটে মুদ্রিত করিলেন; অথচ কখনো ভুলিলেন না যে, এই সকল দেবতা "আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুনীথা দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী অন্তরিক্ষং"॥ ৩—৮—৮॥ "সুনেতা আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, দ্যাবা পৃথিবী, ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ" এক পরমেশ্বরের প্রীতিসূত্রে একতাবদ্ধ "বিশ্বে সজোষসঃ" ১—৪৩—৩; ১—১৩১—১; ২—১১—১৪; ৩—৮—৮; ৪—৩৪—৮; ৫—২১—৩॥ মুদ্রাঙ্কণ এবং লিপি-প্রচলনের পূর্ব্বে অজ্ঞানী জনসাধারণের চিত্তপটে বৈদিক ঋষিদের দূরবর্ত্তী এবং পরবর্ত্তীদিগের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য একমাত্র মুদ্রাযন্ত্র ছিল। আমাদের অধুনা প্রবর্ত্তিত কিণ্ডার-গার্টেণ প্রণালী এবং তৎসহ পুরুষবিধয় এবং রূপকের যোগেই আদিম ঋষিগণ অজ্ঞানী লোকের চিত্তপটে তাঁহাদের দৃঢ় অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরতত্ত্ব-বোধক বেদমন্ত্র সকল মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে আজ আমরা ঋগ্বেদ পাঠ করিতে পারিতেছি। বৈদিক যজ্ঞে আহুতির আকারে নানা প্রকার বাহ্যাড়ম্বরের ইহাই সার মর্ম্ম। এই জন্যই বৈদিককালে যজ্ঞের এত গৌরব ছিল। এজন্যই বৈদিককালে "শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি" (মুণ্ডক ১—১—৫) বেদের এই ষড়ঙ্গের এত সমাদর ছিল। আমরা আমাদের কৃত ঋগ্বেদের ১ম ভাগের শেষে এবং দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভে বৈদিক যজ্ঞের যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, পাঠক ইচ্ছা করিলে তাহা দেখিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

মুঙ্গের নবভক্তি-সাধন-তীর্থে উৎসব।

যে মুঙ্গের তীর্থে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, নবভক্তির প্লাবন হয়, এবার কয়েকটী দীন দুঃখী মিলিয়া, অতি সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় উৎসব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। উৎসবসমিতির কার্য্যপ্রণালী মতে ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ সহ, ১৭ই ডিসেম্বর, মুঙ্গেরে পৌঁছিয়া উৎসবের আয়োজন ও স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারস্থ হইয়া নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া আসি। ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৭শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্যপ্রণালী মতে উৎসব হইলেও, উৎসবের জের ১লা জানুয়ারী, শুক্রবার পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ২০শে ডিসেম্বর, ৪ঠা পৌষ, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা এদাসকেই করিতে হয়; শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ "হিন্দি ভজন" করেন। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের, ৪ঠা পৌষ, শ্রীমদাচার্য্যদেব যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ভক্তিভাবে পঠিত হইয়াছিল, এবং ঐ ভাবেই প্রার্থনা করা হয়। ৫ই ও ৬ই পৌষ সায়ংকালে ভজন, কীর্ত্তন, সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়; ৫ই জীবনবেদ হইতে "ভক্তিসঞ্চার," ৬ই "যোগের সঞ্চার" বিষয় পাঠ হয়। ৭ই পৌষ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে ১০টায় ও সন্ধ্যায় ভজন, কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়; এদাসকেই উপাসনার কার্য্য করিতে হয়।

২৪শে ডিসেম্বর, ৮ই পৌষ, প্রাতে উপাসনা, সায়ংকালে Christmas Eve উপলক্ষে সমাধিচত্বরে আলোকদান, ভজন কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। ছাপরা হইতে শ্রদ্ধেয় হাজারীলাল অদ্য ১টার সময় এখানে আগমন করিয়াছিলেন, সায়ংকালে তিনি একটি সময়োচিত প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রচারব্রত-গ্রহণের পর এইবার প্রথম প্রচারার্থে বাহির হইয়া যায় কত নব নব করুণা পাচ্ছেন, প্রার্থনায় তাহাই প্রকাশ করেন। শেষে কীর্ত্তন হয়।

২৫শে ডিসেম্বর, ৯ই পৌষ, শুক্রবার, দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে প্রায় ৯॥টায় শ্রদ্ধেয় হাজারিলাল বেদীর কার্য্য করেন। তিনি হিন্দিতে উপাসনা করিয়া, শ্রীরাম-ভক্ত হনুমানের নিকট লক্ষ্মণের নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া, গভীর ও ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করেন। এই উপাসনায় কোন কোন রাজকর্ম্মচারী আগ্রহের সহিত যোগ দেন। এখান-কার দীন দরিদ্র বিধবাসিগণ একত্র হ'য়ে মধ্যাহ্নে প্রীতি-ভোজন করেন। পুনরায় সন্ধ্যায় উপাসনার কার্য্যারম্ভ হয়, প্রথমে বাঙ্গালা ও হিন্দিভজন হয়, পরে এদাসকেই উপাসনার কাজ করিতে হইয়াছিল। "জীবে ব্রহ্মদর্শন" বিষয়ের প্রার্থনাটী পাঠ করিয়া, "নববিধানে বিশ্বপতি মাতৃরূপে কেমন সহজে সকল নর নারীর নিকট প্রকাশিত" এ বিষয় কিছু বলা হয়, এবং সকাতরে প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনে কার্য্য শেষ হয়।

২৬শে ডিসেম্বর, ১০ই পৌষ, প্রাতে ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসু ভক্তিভাবে উপাসনা করেন ও কাতর প্রার্থনা হয়; এদাসকেও প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। বিশেষ আহ্বানে অদ্য অপরাহ্ণ ৪॥টার সময় এই মন্দিরেই আলোচনা-সভা হয়; ভ্রাতা হাজারীলাল হিন্দিতে, সকল ধর্ম্মই যে সত্য এবং এই সত্যের কেমন অপূর্ব্ব মিলন, এই বিষয়ে আলোচনা করেন, এবং ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসুও সরল বাঙ্গালা ভাষায় নববিধানের উদারতা বিষয়ে কিছু বলেন। তৎপরে সন্ধ্যা ৬টায় এই মন্দিরেই, কার্য্যপ্রণালী অনুসারে মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সাধারণ সভায়, এই সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা পুনঃ গঠনের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হয়। ঐ পুনঃ গঠনের প্রস্তাবটী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মঞ্জুর করিলে নূতন সভা কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। এই মন্দির প্রাঙ্গণে যে প্রমথ-লাল-আশ্রম (যাত্রি-নিবাস-গৃহ) গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব অনেক

দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঐ আশ্রমকমিটীর পক্ষ হইতে আশ্রমগৃহ-নির্ম্মাণ ফণ্ডে ১৩৯৲ টাকা মজুত আছে এবং পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহনির্ম্মাণের প্ল্যান মঞ্জুর হইলেই কার্য্যারম্ভ করা হইবে।

২৭শে ডিসেম্বর, ১১ই পৌষ, প্রাতে মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থ সমাধি-চত্বরে বিশেষ উপাসনা হয়। অদ্যই ভ্রাতা হাজারীলাল ছাপরা প্রত্যাগমন জন্য যাত্রা করেন। মধ্যাহ্নে ডাক্তার শশিভূষণ দাস গুপ্তের প্রবাসভবনে প্রীতিভোজন হয়। সায়ংকালে সুহৃদ্-সম্মিলন, সংগীত সংকীর্ত্তন ও উপাসনান্তে শান্তিবাচন হয়।

২৮শে ডিসেম্বর, ১২ই পৌষ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৪ই পৌষ পর্য্যন্ত প্রতিদিনই প্রাতে উপাসনা ও সায়ংকালে সংগীত, সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা যোগে বেশ দিন কাটিয়াছে।

শুভ ১লা জানুয়ারী, শুক্রবার, খুব প্রাতে ডাক্তার শশিভূষণ দাসগুপ্তের প্রবাসভবনে বিশেষ উপাসনা হয়, ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসু উপাসনার কার্য্য করেন; এদাসকে প্রার্থনা করিতে হয়। কুমারী শ্রীমতী শান্তিপ্রভা মল্লিক লেডী ডাক্তারের সাহায্যে মধ্যাহ্নে মন্দির-প্রাঙ্গণে দরিদ্রনারায়ণদিগকে খেচরান্নে প্রীতি-ভোজন করান হয়, এ সেবকগণও প্রসাদ পাইয়া ছিল। মা শান্তি-প্রভা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শান্তিবাচনের রাত্রিতে ভক্ত-বিশ্বাসীদের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবারের উৎসবের বিশেষত্ব এই যে, বিশিষ্ট বক্তা ও গায়ক বন্ধুগণ এই তীর্থের উৎসবে না আসিলেও, মা তাঁর অমরবৃন্দ লইয়া মাঝে মাঝে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করত, দীনহীনদিগকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। মায়েই জয় হউক, তাঁর ভক্তের "প্রাণের মুঙ্গেরকে" নববিধানের মহাতীর্থরূপে পরিণত করুন।

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

দ্ব্যধিকশততম মাঘোৎসব।

প্রস্তুতির বিভিন্ন দিনের কার্য্যবিবরণ।

নববর্ষাভিবাদন—"জয় মা আনন্দময়ীর জয়", শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি সহকারে, ঠিক রাত্রি ১২টার সময় তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নবদেবালয় ও কমলকুটীরের শিরোদেশে নববিধানের সমন্বয়পতাকা উত্তোলন করা হয়; এবং নবদেবালয়ে সংক্ষেপে উপাসনা পূর্ব্বক নববর্ষকে শুভ আহ্বান ও অভিবাদন করা হয়। নববর্ষে সর্ব্বভুবনময় নববিধানের জয়, নববিশ্বমানবের জয়, মা আনন্দময়ীর জয় ভিক্ষা করা হয়।

১লা জানুয়ারী—শুক্রবার, প্রাতে ৬টায়, কমলকুটীরে নবদেবালয়ের সম্মুখ ভাগের রোয়াকে দাঁড়াইয়া দুইটী কীর্ত্তন গীত হইলে, উপস্থিত সকলে নবদেবালয়ে প্রবেশ করেন। শ্রীমদাচার্য্য-দেবের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন নববিধানের বিজয়-নিশান সহ বেদীর পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, শ্রীমদ্ আচার্য্য-দেবের নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা পাঠ করেন। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ও প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন।

এ দিন পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯টায়, নবদেবালয়ে নবদেবালয়প্রতিষ্ঠার দিনের উপাসনা মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী দিনের উপযোগী ভাবের সহিত সুমিষ্ট ভাষায় সম্পন্ন করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সেদিনের উপযোগী প্রার্থনা করেন। প্রার্থনায় ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সাধের এই নবদেবালয় তাঁহার অনুবর্ত্তী বিধান-মণ্ডলীর প্রচারক ও সাধকসাধিকাদিগের উপাসনা-যোগে জীবন-গঠনের পক্ষে কি শ্রেষ্ঠদান, তাহা উল্লেখ করেন। প্রার্থনার শেষ ভাগে ভক্তকন্যা মাননীয়া মহারাণী, দীর্ঘকাল বিদেশবাসের পর নিরাপদে মঙ্গলময় দেশে ফিরিলেন, এবং এ দিনের বিশেষ উপাসনা সকলের সঙ্গে সম্ভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন, এজন্য লীলাময়ী পরম জননীর চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন এবং পরম জননীর অপার কৃপা স্মরণ ও স্বীকার করিয়া পরম জননীর চরণে প্রণাম করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক এদিনের প্রস্তুতির প্রার্থনাদি পাঠ করেন।

সন্ধ্যার পর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রথমে একটী সঙ্গীত হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ সঙ্গীতের নেতৃত্ব করেন। সঙ্গীতের পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ শ্রীমদাচার্য্যদেবের এ দিনের প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহজ্জীবন উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন:—চরিত্রের বিশালতা, ক্ষমতার বিশালতা, সদ্গুণের বিশালতা প্রত্যেক মহাপুরুষের লক্ষণ। মহাত্মা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহজ্জীবন ও বিশালতার কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, এসকল জীবন কত উচ্চ, কত গভীর, কত মহৎ; এ সকল জীবনের পরিমাণ কি করিবে? এ সকল জীবনের বিশালতার মধ্যে ডুবলে আমরা আর কূল কিনারা পাই না। মহাত্মা রামমোহনের সেই শৈশবে ১৬ বৎসর বয়সেই কি সত্য-পিপাসা, ধর্ম্মপিপাসা! কোন বাধাকে বাধা গণ্য না করিয়া, সত্য-ধর্ম্মের সন্ধান পাইবার জন্য কি প্রচেষ্টা, কি অদম্য উৎসাহ! তাই তিনি গৃহে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের সন্ধান জন্য কত স্থান ভ্রমণ করিলেন, সুদূর তিব্বত দেশ পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মের সন্ধান লইতে গমন করিলেন। সত্যের সন্ধান জন্য, ধর্ম্মের সন্ধান জন্য যখন পাঠ আরম্ভ করিলেন, তখন স্বদেশের বিদেশের কত ধর্ম্মশাস্ত্রই মন্থন করিয়া সত্য ঈশ্বরের সত্য সংবাদ উদ্ধার করিলেন। তিনি সত্যধর্ম্মের সন্ধান-ব্যাপারে, জীবনের মহৎ কর্ত্তব্যসাধন-ব্যাপারে যেমন হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু জাতীর জীবনের সহায়তা লাভ করিলেন, তেমনই সে বিষয়ে তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও মুসলমান জাতির জাতীয় জীবন হইতে এবং খৃষ্টধর্ম্ম-

শাস্ত্র ও ইংরেজ জাতির জাতীয় জীবন হইতে সত্যতা প্রাপ্ত হইলেন। এই সূত্রে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহার আপনার অন্তরঙ্গ হইলেন। তাই এক সত্য ঈশ্বরের সত্য পূজা ভারতে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা যেমন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্খার বিষয় হইল, সেই সত্য ঈশ্বরের উপাসনা-যোগে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সত্য সম্মিলনও তাঁহার প্রাণের গূঢ় আকাঙ্খা হইল। সেই স্বর্গীয় আকাঙ্খা এবং অনুপ্রাণনা লইয়া, ভারতে তাঁহা কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল।

তাঁহার সময়ে ভারতে যাহা কিছু সংস্কারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি সমাজসংস্কারে, কি রাজনৈতিক ব্যাপারে, সকল ক্ষেত্রে, সকল কল্যাণপ্রদ কর্ম্মে তাঁহার বিপুল উদ্যমপূর্ণ কর্ম্মচেষ্টা ও কর্ম্মের উৎসাহ ছিল। তাঁহার জীবনে সকল মহৎ কর্ম্মের জন্য, বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মোপাসনা তাঁহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করি। তিনি আমাদের ধর্ম্ম-পিতামহ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের ধর্ম্মপিতা। তিনি যৌবনে ধনীর সন্তান হইয়া ফকির সাজিলেন। জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম-ধ্যান, ব্রহ্মরসপানের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, তিনি ঋষি-ধর্ম্ম, ঋষি-জীবনের সাধনার পুনরুদ্ধার করিলেন। তিনি শুধু ঋষি আত্মা নন, তিনি ভক্তাত্মাও বটেন। গভীর ব্রহ্মযোগপ্রধান, ধ্যান-প্রধান তাঁহার জীবন; কিন্তু সময় সময় তিনি সঙ্গীত ও কীর্ত্তনে ভক্তিতে প্রমত্ত হইতেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি ব্রহ্মভক্তিরসে ডুবিয়া থাকিতেন। আমাদের উপাসনামন্ত্রের "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" প্রভৃতি ব্রহ্মস্বরূপাত্মক উপনিষদ্ বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া, তিনি ভবিষ্যৎ বংশের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন নিত্য উপাসনায় তাঁহার নিকট এই অমূল্য দানের জন্য আমাদের ঋণ স্বীকার করিতে হয়। স্বর্গের আশীর্ব্বাদ আমাদের নিকট তাঁহার জীবন। তাঁহার জীবন আজ স্মরণ করিয়া, কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ স্বীকার করিয়া, তাঁহার চরণে বারবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে প্রণাম করি।

তৎপর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এম্ এ, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের জীবন অবলম্বনে তাঁহার স্বাভাবিক সুললিত ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। দুই মহাত্মার গূঢ় আধ্যাত্মিক জীবনের সাধনা তাঁহার বক্তৃতায় সুন্দররূপে বিবৃত হয়। মহাত্মা রামমোহনের জীবনে তুরীয় ব্রহ্মের সাধনা ও তটস্থ ব্রহ্মের ধারণা ও সাধনার বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনের ভক্তিপূর্ণ ব্রহ্মসাধনা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। এই দুইটী জীবন যেমন প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের, প্রাচীন ঋষিধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন, তেমনই প্রাচীন ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সময়ের নূতনভাব মিশাইয়া, ভারতকে, প্রাচীন ভারতকে নূতন ভারতে পরিণত করিলেন। এই সকল বিষয় বেণীবাবু অতি সুন্দর ও সুমিষ্ট ভাবে বর্ণনা করেন।

২রা জানুয়ারী, শনিবার, "নববিধান, শ্রীমদাচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ"। পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷০টার পর ব্রহ্মমন্দিরে "নববিধানের জয়রে জয় ঘোষণা" এই সঙ্গীত গীত হইলে পর, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এ দিনের আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন, তৎপর অন্তকার বক্তা তিনি এই ভাবে ব্যক্ত করেন:—আমাদের বাল্য জীবনে হিন্দু সমাজে শাক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কত দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি, কত দ্বন্দ্বের কথা শুনিয়াছি। আমাদের জীবনে কৃষ্ণ-উপাসকদিগের সঙ্গে রাম-উপাসকদিগের কত অমিলনের কথা শুনিয়াছি। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের, খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কত দ্বন্দ্ব, হিংসা বিদ্বেষের কত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কত দুঃখকাহিনী শুনিয়াছি। তাই বুঝি, স্বর্গের দেবতা পৃথিবীর, বিশেষভাবে ভারতের দুঃখ, দুর্দ্দশা-দর্শনে ব্যথিত হইয়া, নবযুগে মহামিলনের ধর্ম্ম "নববিধান" লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হইলেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলন, অতীতের সকল ধর্ম্মবিধানের মিলন, ঈশা, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি বিভিন্ন মহাজনদিগের মিলন নববিধানে সম্ভব হইল। এই মহামিলন ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবের জীবনে মূর্ত্তিমান নববিধান। কেশবচন্দ্রের সহ-প্রেরিতদিগের জীবনেও এই মিলন সাধন ও সিদ্ধির বিষয় হইল। কল্যাণের পথে, উন্নতির পথে একটী জীবনে যাহা সম্ভব হয়, সকল জীবনে তাহা সম্ভব হয়। কথিত আছে, আমেরিকায় যখন স্বাধীনতার ঘোষধ্বনি হইল, সমস্ত পৃথিবীতে তাহার প্রতিধ্বনি হইল, সমস্ত পৃথিবী স্বাধীনতার মুকুট পরিবে, তাহার সম্ভাবনা হইল। তেমনই আমরা বলিতে পারি, একটী জীবনে যে মহা সম্মিলন সম্ভব হইল, সত্য হইল, মূর্ত্তিমান হইল, তাহা সমস্ত মানবজীবনে একদিন সম্ভব হইবে, মূর্ত্তিমান হইবেই হইবে। আজ তাই আমরা আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া ঘোষণা করি, পৃথিবীতে শান্তিসম্মিলন, প্রেমসম্মিলন নিঃসংশয়ে হইবেই হইবে। তাই আমরা আনন্দে নববিধানের জয়গান করি, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ-জীবনের জয়গান করি, তাঁহার সহপ্রেরিত সহকর্ম্মীদিগের জীবনের জয়গান করি। সর্ব্বাগ্রে নববিধানের দেবতা পরব্রহ্ম লীলাময় শ্রীহরি, লীলাময়ী জননীর চরণে "নববিধান" ধর্ম্মরূপ মহা আশীর্ব্বাদের জন্য বারবার প্রণাম করি; তৎপর ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার সহপ্রেরিতবর্গের নিকট "নববিধান" মহা সম্মিলনের ধর্ম্মরূপ মহাদানের জন্য কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বারবার প্রণাম করি।

৩রা জানুয়ারী,—রবিবার, "মাতৃভূমি"। পূর্ব্বাহ্নে, নবদেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। উপাসনায়

আমাদের ভারত. মাতৃভূমি স্রষ্টার কি গৌরবময় সৃষ্টি, তাহা সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়। এদিনের আচার্য্যকৃত প্রার্থনা পঠিত হয়। সন্ধ্যার ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনায় ভারতমাতার শোভা-সৌন্দর্য্যময় গঠন ক্রিয়াটী সুমিষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়। "জাতীয় বিধান, নববিধান।" আচার্য্যদেবের এই উপদেশ ও "মাতৃভূমি" বিষয়ে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হয়।

৪ঠা জানুয়ারী—সোমবার "গৃহ"। পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। গৃহ, পরিবার সাক্ষাৎ জীবন্ত ঈশ্বরের শ্রীহস্তের রচনা। গৃহে আমরা পিতা পাইলাম, মাতা পাইলাম, কত আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইলাম, কত যত্নে বাল্যে প্রতিপালিত হইলাম। গৃহে যথাসময়ে স্বামীর সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণীরূপে স্ত্রীর আগমন হয়। বিধাতা যে গৃহকে যেরূপ ভাবে সাজাইবার, সেইরূপ ভাবে কত পুত্র কন্যা, দাস দাসী দ্বারা সজ্জিত করেন। নববিধানে যাঁহারা বাহ্যতঃ সন্ন্যাসের জীবন যাপন করেন, তাঁহাদিগকেও ঈশ্বর কেমন নবভাবে গৃহী রূপে গৃহবাসী করেন। পার্থিব সম্পর্কে পরিবার যাঁহারা, তাঁহাদিগকে লইয়াই নববিধানের গৃহ সজ্জিত হয় না। অতীত ও বর্ত্তমানের, স্বদেশের ও বিদেশের সাধু মহাজন, যোগী ভক্ত, দেব দেবীদের দ্বারা আমাদের নববিধানের গৃহ সজ্জিত হয়। গৃহ যেমন পার্থিব সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তেমনই আমাদের গৃহ পূজা বন্দনা ও তপস্যার স্থান, উচ্চ সাধন-ক্ষেত্র। আমাদের গৃহ সমস্ত সাধু ভক্ত প্রেরিতদল লইয়া পরম জননীর বক্ষে স্বর্গবাস—এই ভাবটী উপাসনায় বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক "গৃহ" বিষয়ে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ "গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন" সঙ্গীতটী সর্ব্ব শেষে গান করেন। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অক্ষয়কুমার লধ সঙ্গীতান্তে "গৃহ" বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর কথাবার্ত্তা হয়।

৫ই জানুয়ারী,—মঙ্গলবার, "শিশুগণ"। পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অক্ষয়কুমার লধ "শিশুগণ" বিষয়ে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন।

৬ই জানুয়ারী—বুধবার, "ভৃত্যগণ"। আজ স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন। পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক এদিনের দুইটী ভাব লইয়াই উপাসনার কার্য্য করেন। "ভৃত্যগণ" বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পাঠ করেন; সুসমাচার-লেখক দ্বারা জগতের কি মহৎ উপকার সাধিত হয়, সে বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠ করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীমতী অশোকলতা দাস বিশেষ প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচারকার্য্যালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধের তত্ত্বাবধানে ভৃত্যসেবার অনুষ্ঠান পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সম্পন্ন হয়।

৭ই জানুয়ারী—বৃহস্পতিবার, "দীনসেবা"। পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

৮ই জানুয়ারী,—শুক্রবার, "শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক"। প্রাতে ৬টায় কমলকুটীরে আচার্য্যদেবের শয্যাপার্শ্বে নামপাঠ হয়। পূর্ব্বাহ্নে ৯টায় নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ও শ্রীমতী অশোকলতা দাস প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যা ৬টায় আলবার্ট হলে স্মৃতিসভা হয়। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৯ই জানুয়ারী হইতে ১৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে উপাসনা হয়; অধিকাংশ দিন ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনার কার্য্য করেন। ৯ই জানুয়ারী, "মহাজনগণ" দিনে সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ঐ দিনের শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা-পাঠান্তে আপনার মন্তব্য অল্প কথায় ব্যক্ত করেন।

১০ই জানুয়ারী—রবিবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনার কার্য্য করেন। ঐদিন দেশহিতৈষিগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের দিন ছিল। বেদী হইতে সে দিন সে বিষয়ে বিশেষ পাঠ ও প্রসঙ্গ হয়।

১১ই জানুয়ারী হইতে ১৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর মন্দিরে আর পাঠ প্রসঙ্গ হইতে পারে নাই।

১৩ই জানুয়ারী—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬টায় মহিলাদিগের প্রস্তুতির দিন ছিল। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন। মধ্যরাত্রে জাগরণের অনুষ্ঠান ছিল। আশা করি, মণ্ডলী প্রস্তুতি-সাধনের ভিতর দিয়া মহোৎসবের জন্য উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত হইয়াছেন।

নববিধান-নিশান-বরণ।

(ব্রহ্মানন্দের সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবী কর্ত্তৃক রচিত)

কমলকুটীরে হয় নিশান-বরণ।
ভক্ত-পরিবার সবে আনন্দে মগন॥
আনন্দময়ীর হাসি প্রকাশি তথায়।
মোহিত করিছে নববিধানলীলায়॥
কিবা শোভা মনোলোভা প্রিয়দরশন।
দয়াময় নাম গান মধুর শ্রবণ॥
ভক্ত-কন্যাগণ আর ব্রাহ্মিকা সকলে।
হাত ধরাধরি করি হরি হরি বলে॥

ঘুরিছে সকলে তথা বোয়ম্মা নিশান।
আনন্দে ভাসিছে প্রাণ প্রসন্ন বয়ান॥
রঞ্জিত বসন অঙ্গে বিচিত্র ভূষণ।
বক্ষ মাঝে লাল ফিতা নয়নরঞ্জন॥
বালিকা যুবতী আর প্রাচীনা বিধবা।
দুঃখী ধনী কুলবধূ কুমারী সধবা॥
স্বর্গের সমান হেরি শোভা ধরাতলে।
কমল হাসিছে যেন সরসীর জলে॥
ঠাকুর মোদের চিদানন্দ নিরাকার।
কিন্তু অপরূপ লীলা বাহিরে তাঁহার॥
বরণীয় পূজনীয় হরি গুণধাম।
কণ্ঠাগ্রে গায় তাঁর মধুমাখা নাম॥
শঙ্খ ঘণ্টা একতারা খোল করতাল।
হারমণি তার সাথে তানিতে রসাল॥
ধূপ ধূনা পুষ্পগন্ধে মন মুগ্ধ করে।
উজ্জ্বল গ্যাসের আলো তাহার উপরে॥
আহা কি সুন্দর শোভা সব মধুময়।
আনন্দ ধরে না প্রাণে উথলে হৃদয়॥
মৃদুস্বরে গান করে যত কুলবালা।
মাথায় বরণ ডালা তাহে দীপমালা॥
সুনীতি ভক্তের কন্যা রজত থালায়।
সারি সারি বাতি জ্বালি হরিগুণ গায়।
হাতে ধরাধরি করে' ঘুরিছে সকলে।
'নববিধানের জয়' সবে মিলে বলে॥
করিয়া ঘোষণা ভবে নূতন বিধান।
উড়াইলা ব্রহ্মানন্দ বিজয়নিশান॥
ধরিয়া আছেন ইহা স্বয়ং শ্রীহরি।
এস সবে তাঁর পদে প্রণিপাত করি॥

একাত্মতা।

(১০ই মাঘ, প্রাতের উপাসনায়, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ আচার্য্য-দেবের প্রার্থনা 'বিধানশরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ' পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে তাঁর নিবেদন বিবৃত করেন)

সে দিন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ভ্রাতা স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী এই মন্দিরে এসে আমাদের আহ্বান করিলেন ও বল্লেন, প্রাচীন ভারতের সাধনা তোমরা গ্রহণ কর। সেই প্রাচীন সাধনাকে ভুলে গিয়ে আজ আমাদের ভারতের দুরবস্থা। দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে আধ্যাত্মিক জীবনের অভাব। ধর্ম্মসাধনে কেবলি পাশ্চাত্যের অনুকরণ। ভারতের সাধনা ছিল ব্যক্তিগত ভাবে ধর্ম্মজীবন লাভ ও সেই সাধনে অন্য কোন ব্যবস্থানের organisation প্রয়োজন ছিল না। কেবল গুরুর কাছে দীক্ষা ও শিক্ষা নিয়ে সাধনের পথ ঠিক করে নেওয়া। ধর্ম্মপ্রচার ছিল না। দলবদ্ধ organisation ছিল না। constitution ছিল না। এ সকল পাশ্চাত্য দেশ হতে নেওয়া হয়েছে। আজকাল প্রচারের নামে Propaganda চলেছে। নিজেদের মত অন্যের কাছে জাহির করা, উপস্থিত করা। সত্যকে অর্গানাইজ (organise) করা যায় না। দলযন্ত্রে সত্যকে ফেলা যায় না, আটকে রাখা যায় না। ভারতের নিয়ম ছিল নিভৃতে আধ্যাত্মিক জীবন সাধন, আর গুরুর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে সেই সাধনার সাহায্য গ্রহণ।"

সেই সুন্দর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হল নববিধানের কথা, নববিধানের সাধনার কথা। মনে হ'ল দলের সাধনার কথা। মনে হ'ল বিধান একা আসেন না; একজনের কাছে আসেন না। সদল সাধনা না হ'লে নববিধানের সর্ব্বোচ্চ সাধনা একাত্মতা সাধন হতে পারে না। এই তিনটি কথা তিনি যাহা বলেছিলেন, এর কোনটিও কিন্তু আমরা ছাড়তে পারি না। অথচ প্রাচীন ভারতের সঙ্গে নবীন ভারতের, নবীন জগতের সাধনা মিলিয়ে নিতে হবে। সেই মিলন নববিধান করেছেন। প্রচার ও দলগঠন এবং গুরুর শরণাপন্ন হওয়া এই তিনেরই দুই দিক আছে। একটা Negativeএর দিক, "না" এর দিক, বর্জ্জনের দিক, আর একটা Positive দিক, "হাঁ" এর দিক, গ্রহণের দিক। যদি প্রচার করতে গিয়ে নিজের মতই চালাই, অন্যের মতকে বর্জ্জন করি, তবে সেটা "না" এর দিক হইল। নববিধান বলছেন যে, তুমি অপরের মত ও বিশ্বাস আগে গ্রহণ কর, তবে তোমার অন্যের কাছে নিজ মত প্রচার করবার অধিকার হবে। নববিধান বলছেন, আগে গ্রহণ, পরে দান। গ্রহণ না করলে দান করবার অধিকার নাই। এখানে প্রাচীন ভারতের ও নবীন জগতের দুই রীতির সামঞ্জস্য হ'ল। গ্রহণ করতে হলে আধ্যাত্মিক জীবন সাধন করতে হবে। নচেৎ গ্রহণ করবার ক্ষমতা আসে না। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে নববিধানের সঙ্গে কোন বিচ্ছেদ হ'ল না।

তারপর যদি organisationএর কথা মনে কর, যদি যন্ত্র নির্ম্মাণ করে তার নিয়ম কানুন নিয়ে মত্ত থাক, constitution নিয়ে মত্ত থাক, যদি যন্ত্রই তোমার মনের সবটা অধিকার করে থাকে, তবে সেটা হল 'না' এর দিক। যে সংস্থানের ভিতর প্রাণ নেই, যে constitutionএর ভিতর থেকে প্রাণ বের করে নেওয়া হয়েছে, সেখানে সত্যের স্থান থাকে না। যে যন্ত্রের ভিতর প্রাণ আছে ও কাজ করে, সেটা যন্ত্র মাত্র নয়, জীবন্ত প্রাণবান্ যন্ত্র। সেই জীবন্ত যন্ত্র আশ্রয় করে সাধনার পথে চলে, সাধন সহজ হয়। মত প্রচারের চেয়েও ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মসাধন বড় কথা, আর গোড়ার কথা। আবার সদলে সাধন করিলে সাধনও অগ্রসর হয় ভাল, আর প্রচারও করা যায় ভাল।

নববিধানে সব চেয়ে বড় সাধন একাত্মতা-সাধন। ভক্তগণের সঙ্গে একাত্মতা, সকল নরনারীর সঙ্গে একাত্মতা সাধন করতে হলে একাকী সাধনও চলে না। দলের সঙ্গে সাধন আরম্ভ করে, দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তবে সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। এই একাত্মতার লক্ষ্য না রাখিলে organisationটা mechanisation হয়ে যায়। সংস্থানটি প্রাণহীন কল হয়ে যায়। এইটা হল দলসাধনে বর্জ্জনের দিক।

(একাত্ম হওয়াকে চোখের সামনে সব সময় ধরে রাখলে প্রকৃত সাধন হয়। নইলে দল পাকানোতে দাঁড়ায়) একাত্মতা-সাধনে খুব মতভেদ থাকিলেও ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করা যায়। বিভিন্নতা থাকিলেও সকলের সঙ্গে এক হওয়া, সকল জীবের সঙ্গে এক হওয়া, ইহলোকস্থ পরলোকস্থ সকলের সঙ্গে এক হওয়া একাত্মতার লক্ষ্য। পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এইরূপ সাধনের উপায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে team-woik.

ক্রিকেট কিম্বা ফুটবল খেলায় দলের দরকার হয়; সেই দলকে team টীম বলা হয়। টীমের ঠিক বাঙ্গলা প্রতিশব্দ জানা নাই, 'যূথ' কথাটা মনে আসে, 'যূথ' মানে herd—পাল। যূথের ভাব হচ্ছে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকা। যৌথ কারবার কথাটাতেও ঐ স্বার্থেরই ইঙ্গিত রয়েছে। সেখানে লাভ আর সুদের ব্যাপারই মনে আসে। টীম বলে যে যৌথ ব্যাপার আছে, তাহাতে আপনাকে হারাতে হয়, আপনাকে পাছে ফেলতে হয়। আপনাকে হারান, আপনাকে ছোট করা প্রাচীন ভারতের উপদেশ ছিল এবং তাহা team-workএ পাওয়া যায়। আবার teamএর ভিতর একজন Captain নেতা কিম্বা দলপতি থাকেন। তাঁহার Personalityতে (ব্যক্তিত্বে) দলটি জমাট থাকে। প্রাচীন ভারতের গুরুর কাজ সেই Captain দ্বারা কতকটা সংসিদ্ধ হয়। টীমের কাজ এত সফল হয় বলে, এখন খেলা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও টীমের দল তৈয়ারী করে কাজে লাগান হয়। আজকাল হাসপাতালের এক একটি ওয়ার্ডের কাজ এই টীমের হাতে থাকে। একজন চিকিৎসক Physician থাকেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একজন Surgeon (শল্যবিৎ), একজন Pathologist [ক্লেদপরীক্ষক], একজন Radiologist [রশ্মিপরীক্ষক] ইত্যাদি থাকেন। ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এই প্রথাতে রোগের নিদান ও চিকিৎসা আরও ভাল করে চলে। এই টীমে নিজের প্রভুত্ব কিম্বা ব্যক্তিত্ব চালাতে গেলে তেমন কাজ হয় না। বিজ্ঞান-মন্দিরে Research বা গবেষণা কাজেতেও এই টীম প্রথা চলেছে। আর সেই জন্যই বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার এত শীঘ্র শীঘ্র ঘটছে।

আমাদের সমাজের ইতিহাসেও এই টীমের ভাবে কাজ পূর্ব্বে হয়েছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র যখন বিলাত হতে ফিরে এসে Indian Reform Association স্থাপন করেন, তখন কত কাজ যে হয়েছিল, তাহা মনে করলে আশ্চর্য্য হতে হয়। সেই কাজ হতে পেরেছিল, কেননা টীমের ভাবেতেই তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা কাজ করে গিয়ে ছিলেন। যাঁহার যাহা বিশেষত্ব ছিল, তিনি সেই ক্ষমতা নিয়েই কাজে লাগিয়েছিলেন। টীম work খেলাতে, রোগ-নিবারণে, সমাজসংস্কারে, মণ্ডলীগঠনে, ধর্ম্মসাধনাতে যতই প্রয়োগ হবে, ততই কার্য্যসিদ্ধি হ'বে। অবশ্য এই টীম workকে অবস্থা-ভেদে ও লক্ষ্য-ভেদে, যে রকম দরকার, পরিবর্ত্তিত করে নিতে হবে। কিন্তু টীমের ভাব, পরস্পরের সহযোগিতা, একজন নেতার আনুগত্য ও আত্ম-বিলোপ, এগুলি থাকা চাই। আধ্যাত্মিক জগতে একাত্মতা-সাধনের একটা সরল ছবি এই টীম work। আধ্যাত্মিক জীবনে একাকী সাধন হয় না। সে কথা নববিধানে খুব পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। নববিধানের নূতন মানুষ, নূতন সাধক বলেন, "সক্রেটিশ আমার মস্তক, ঈশা আমার হৃদয়, মহম্মদ আমার দক্ষিণ হস্ত, পরোপকারী হাওয়ার্ড আমার বাম হস্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার রসনা"। তিনি একজন মানুষ নন, তিনি একখানা মানুষ। Composite Person lity। আধ্যাত্মিক জগতের এই Solidarity জমাটভাব, পরস্পরের মধ্যে গূঢ় যোগ সংসারে নানা প্রকারে প্রকাশিত আছে। সংসারে Economic S lidarity অর্থ-নৈতিক সহযোগিতা এবং পরস্পরের উপর নির্ভর কত গভীর ভাবে বিস্তৃত রয়েছে, তাহা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। সামান্য একটী পিন গড়তে কত শত সহস্র জীবিত ও মৃত লোকের পরিশ্রম লেগেছে, একবার মনে করুন। [illegible] ও পরিশ্রম ব্যবহার করিয়া তবে [illegible]

আমরা চাই [illegible] পরস্পরের উপর নির্ভর করতেই হয়। [illegible] Solidarity, এটা জগতের গূঢ় যোগের আংশিক প্রকাশ (Projection) [illegible] তেমনি টীমএর সহযোগিতায় যে দলের জমাট ভাব প্রকাশিত হয়, তাহা আধ্যাত্মিক জগতের একাত্মতা-সাধনার প্রকাশ এবং তাহার ভিতরে শ্রীহরির সঙ্গে এক হওয়া, ব্রহ্মের সঙ্গে এক হওয়াই যে মূল কথা। সেই যোগের সঙ্গে সঙ্গে সকলের সঙ্গে এক হওয়া, সব সাধু সাধ্বীর সঙ্গে এক হওয়া, সব ভাই ভগ্নীর সঙ্গে এক হওয়া আপনি ঘটে উঠে। সেই সাধনার গভীরে যেতে হলে পৃথিবীর আয়োজন যদি কিছু নিতে হয়, তবে তাহা এই টীম work। এই টীমের আয়োজনে পরস্পরকে Unique (স্বলক্ষণ) বলে মানতে হবে। প্রত্যেকেরই দলের ভিতর স্থান আছে, বিশেষ কাজ আছে, একথা মানতে হবে। অথচ আদর্শ এক, লক্ষ্য এক থাকাতে সকলে মিলে "একখানা মানুষ"। "সেই একখানা মানুষের শত শত হস্ত, শত শত চক্ষু, শত শত কর্ণ, তিনি নবদুর্গার নব সন্তান"।

আচার্য্যের জীবনে এই টীমের ভাব বেশ বিকাশ লাভ করেছিল, একাত্মতা-সাধন পরিস্ফুট হয়েছিল; তাই তিনি

বল্লেন, "আমাকে ছাড়ুক শুকাবে"। তাই তিনি প্রেরিতদের বল্লেন, "আমাকে এঁরা মিশ্রির দানা ক'রে সঙ্গে নিন।" টীম workএ যেমন ক্যাপ্তেনের প্রয়োজন, অধ্যাত্ম জীবনের একাত্মতা-সাধনে তেমনি একটী লোকের প্রয়োজন। তাঁহাকে নায়ক বলুন, তাঁহাকে নেতা বলুন, বলতে পারেন। প্রাচীন ভারতের গুরুসাধনার প্রয়োজন নাই, মূল্য নাই, একথাও কি কখনও বলা যায়? নববিধানে গুরুভীতি বা বিভীষিকার স্থান নাই। নেতা যদি কোন কাজ নির্দ্দেশ করেন, আর আমার অন্তরস্থ পবিত্রাত্মা যদি সায় না দেন, আমি নির্দেশ গ্রহণ করিতে পারি না। আর নেতার ভিতর দিয়া যে নির্দ্দেশ আসে, তাও পবিত্রাত্মার প্রেরিত। পবিত্রাত্মাই প্রকৃত গুরু। একাত্মতা-সাধনে নেতাকে গুরু বলেও গ্রহণ করতে হয় না, অবতার বলেও গ্রহণ করতে হয় না, মধ্যবর্ত্তী বলেও গ্রহণ করতে হয় না; কিন্তু তাঁহাকে সহযোগিতার কেন্দ্র, সহসাধনের মধ্যবিন্দু করে অগ্রসর হতে পারা যায়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেই কথাই উপলব্ধি করে বার বার (শেষ কয়েক বৎসরে) বলে গেছেন ও অনুযোগ করে গেছেন।

দলপতিকে এই প্রকারে গ্রহণ করলে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয় না; প্রাচীন ভারতের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় না। নববিধানে সহসাধনের আদর্শ প্রাচীন ও নবীনকে মিলিত করেছে, পূর্ণ করেছে।

নিবেদনান্তে প্রার্থনার পর স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের রচিত নিম্নোক্ত সঙ্গীতটী গীত হয়।

দল-সঙ্গীত।

("হে মাতঃ জননী" গানের সুর)

একা একা আর রব না এবার,
প্রেমে একাকার হইয়া র'ব।
(আমরা) তোমায় ভালবেসে, ভাইকে ভালবেসে,
(প্রাণে) স্বর্গরাজ্য রচিব নব।
(আমরা) এক হব প্রেমে তব।
একাকী এ ভবে কে নহে দুর্ব্বল?
কে পারে বাঁচিতে বিনা দলের বল?
(ঐ) প্রেমেতেই দল, প্রেমেতেই বল,
প্রেমে অসম্ভব হয় সম্ভব।
(আমরা) এক হব প্রেমে তব।
যে গুণে ভূষিত যাহার চরিত,
এক কাজে তাহা ক'রে নিয়োজিত,
এক নববলে জাগিয়া সকলে,
এক সেবায় সবে ধন্য হব।
(আমরা) এক হব প্রেমে তব।
দিবে যা বহিতে এক প্রাণে ব'ব,
দিবে যা সহিতে এক প্রাণে স'ব,
এক লক্ষ্য লয়ে এক প্রাণ হয়ে,
তোমার প্রসাদ বাঁটিয়া লব।
(আমরা) এক হব প্রেমে তব॥

আনন্দোৎসব।

(১০ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে, দিনব্যাপী উৎসবে মধ্যাহ্নে পঠিত)

অভূতপূর্ব্ব সে কাহিনী আজও মনে আসে। যেদিন আভিজাত্য-গর্ব্বিতের দাম্ভিকতায় দেশের একদল মানুষ নিতান্ত অসহায় হ'য়ে উৎসন্নের পথে এগিয়ে চলছিল—দিশা খুঁজে পায়নি—অন্যদিকে সেই তাদেরই আপনার করে নিতে প্রতীচীর মিশনারীরা উৎসাহের সঙ্গে তাদের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে আমার দেশের শক্তিকে পঙ্গু করবার জন্য বদ্ধপরিকর—ঠিক তখুনি এসেছিলেন এক মহাপুরুষ—অন্তরের সমস্ত দরদটুকু দিয়ে এই মৃত্যুর দুয়ারে এগিয়ে চলা জাতিকে বাঁচাতে—তাঁর নাম রাজা রামমোহন রায়।

জাতির জীবনের সে নব অভ্যুদয়ের ইতিহাস কেউ ভুলবেনা। যারা দূরে ছিল, তারা পেলো তাঁর কোল; যারা অত্যাচারের জ্বালা—অপমানের গ্লানি—পরাজয়ের দুঃখ সইতে না পেরে কোণে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল—তাঁর অভয় আহ্বানে তারা এলো বেরিয়ে। এসে দেখলে কি শান্তি—কি তৃপ্তি! ভুলে গেলো সব একটা নতুনত্ব নিয়ে। যে জীবন কাটাতে হতো যেন কত ভয়ে ভয়ে—কত যেন নিজেকে লজ্জিত বোধ ক'রে—সে জীবনে এলো নতুন প্রেরণা—নতুন উৎসাহ—নতুন উদ্যম—নতুন আশা—নতুন আলো। কত জাতি, কত ভাষা, কত পরিধানের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা জাতি এক নূতন মন্ত্রে দীক্ষা নিলে—মিলনের রাখী পরিয়ে দিলে সবার হাতে হাতে—জাতির জীবনের যাত্রাপথে জয়ডঙ্কা বেজে উঠলো। সেই দিনের সেই শুভলগ্নে জাতি পেলো বরাভয়। অফুরন্ত হাসি—অনন্ত আশীষ নিয়ে সসীমের মধ্যে অসীমের পূর্ণ প্রকাশের সত্তা উপলব্ধি করতে নিজেকে ডুবিয়ে ফেললো—ভেসে উঠলো আনন্দ!

মানুষ জগতে এসেচে পূর্ণ ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে কাজ করে যেতে। সেই কাজের মধ্যে যখন নানা দিক দিয়ে, নানা ব্যবধানের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে—তখন অন্তরের আকাশকে ফরসা করবার জন্য দরকার হয়ে পড়ে একটু শান্তি, একটু তৃপ্তি। মনের মিল যেখানে নেই—ছোট বড়র যেখানে ভেদ—ধর্ম্মের নামে যেখানে শঠতা—স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ যেখানে দূরে—পায়ের চাপায় দলে রাখা—সেখানে অন্য দেশের শক্তি এসে সব একবারে নিয়ে আধিপত্য করবে—অন্য ধর্ম্মে দীক্ষা দেবে—মহামানবের প্রাণে তা সয়নি। অধ্যাত্মবাদ যে দেশের ধর্ম্ম—আনন্দ যে দেশের কর্ম্মস্রোত—ক্ষণিকের মোহে

কয়েকজনের চক্রে সে দেশের অবস্থা যে জগতের চোখে হীন হয়ে যাবে—এ জ্বালা বুকে বেজেছিল—আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ডাক দিয়েছিলেন তাই—ওগো তোমরা সবাই এস—পুরুষনারী, তোমরা সকলে এক সঙ্গে এক আশায় হাত ধরাধরি করে এস এই মিলনের পুণ্যবেদীতে। তোমার সকল কিছু সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে জানাবে। তোমার কোন দুঃখ রইবেনা—তোমার কোন কষ্ট থাকবেনা। তোমাদের ভয় নাই—ব্রহ্মের সাধনায় জোর হও—সব পাবে, তোমরা সব পাবে।

এত বড় আশায় বাণী নিয়ে জাতি নিজেকে ধন্য বোধ করলো—জগতের কাছে তার জীবনের নূতন ইতিহাসে নূতন অধ্যায় লেখা হলো। সনাতন-ধর্ম্মী দেখলো, নূতন ধর্ম্মেই বুঝি যুগ-ধর্ম্মের সৃষ্টি। পূর্ণ ব্রহ্মের সন্তান যদি সকলে, তবে ভেদ কেন রইবে—সব এক। এই হল ধর্ম্মের মূল সূত্র। সকলকে সকল কাজের ভেতর দিয়ে, সব সময়ে, সেই আদরের ধন, আনন্দের মাণিক, সেই সকল সুখের নিলয়, সেই অন্তরাত্মাকে ভালবাসাই হলো মূল মন্ত্র। মুগ্ধ জাতি অবাক বিস্ময়ে সেদিন দেখলো তাঁকে, সশ্রদ্ধ ভক্তিতে লুটিয়ে পড়লো মাথা তাঁর পায়ে।

সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের ভেতর দিয়ে যখন আনন্দ ও শান্তির সুধ-স্রোত বয়ে চললো—তখন জাতির জীবনীশক্তিকে আরও দৃঢ় করবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গড়ে উঠলো। দলাদলি, ভেদাভেদ, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, শুচি অশুচির সকল গণ্ডী দূরে রেখে ভাবের আদান প্রদান চললো। এমনি করে জাতি যখন তার সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প কলার ভেতর দিয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে চললো—তখন অর্থ-বৈষম্যের ঘাত প্রতিঘাত অনেকের মধ্যে অসহ্য হয়ে পড়লো—বাহির হতে নানা জল্পনা কল্পনা হলো—কিন্তু যে জাতি জগতের কাছে আপনার আসন সবার আগে পেতে রেখেছে—তার বিঘ্ন তো কোন মতে হতে পারে না—তাই সকল বাধা, সকল বিপত্তির মধ্যে থেকে ব্রহ্মানন্দ কেশবের আবির্ভাব হলো—নূতন সমাজের নূতন শৃঙ্খলা নিয়ে নতুন রূপ দিয়ে নববিধানের সূচনা তাঁর হাতে মূর্ত্ত হয়ে উঠলো—সেদিন জাতির জীবনে নব জাগরণ।

আকাশে বাতাসে, পত্রের মর্ম্মরে, পাখীর কাকলিতে, শিশুর কল হাস্যে, পুরুষনারীর সুবিমল প্রেমে, ভাই ভগ্নীর অন্তরের স্নেহে, সকল দিক দিয়ে নববিধানের দুন্দুভি বেজে উঠলো,—অন্তরে বাহিরে অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবের নববিধানের জয়গান যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিলে—অমৃতের পুত্র কন্যা সেদিন নববিধানের আনন্দ-উৎসে স্নাত হয়ে মুক্তির দীক্ষা নিলে। আধি ব্যাধি জ্বর জ্বালা মৃত্যু-পাগল বুভুক্ষু মানব সকল বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে প্রয়াসী হলো, নববিধানের শুভ শঙ্খধ্বনি তাদের অমিত তেজ দিলে—অসীম আনন্দে উদ্বেল হয়ে তারা চললো মুক্তির গান গেয়ে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত জাতির জীবনের নিত্য নতুন আনন্দের প্রাচুর্য্যের মধ্যে নববিধানের মুক্তিগাথা গীত হচ্ছে।

ওগো, তোমরা ভুল বুঝ না। ধর্ম্মের নামে কপটতা এনো না—আভিজাত্যের দাম্ভিকতা নিয়ে ব্রহ্মের সাধনাকে জগতের কাছে হীন করো না। তোমার ধর্ম্ম সত্য—তাকে কলুষিত করোনা। শাশ্বত সুন্দর ব্রহ্মের কাছে তোমার সকল কিছু উজাড় করে দাও, বৃহত্তর জীবনের মহত্তর আশা নিয়ে তুমি বল—নববিধানের নামে জয় ঘোষণা করে বল—আমি তোমায় প্রণাম করি। হে চির সুন্দর—হে নিখিল বিশ্বের অধিনায়ক, আমায় তুমি নিয়ে চল—ঘোর বন তমসাচ্ছন্ন এই মরধরণীর ভোগ-কূপ হতে আমাদের তুলে নিয়ে চল তোমার চির রমণীয় পুণ্য-ধামে! হে ভুবন ভুলানো, আমাদের প্রাণে শান্তি দাও—তৃপ্তি দাও—যারা ভুল বুঝে, তোমার নামে দোষারোপ করে, তাদের ক্ষমা কর। যারা মিথ্যা ধনমদমত্ত তোমায় ভুলে যায়—তাদের সুবুদ্ধি দাও। সকল দুঃখ, সকল বিপদ, সকল জ্বালা তোমার আশীষে দূরে যাক। সবাই সমস্বরে তোমার জয়গান ঘোষণা করুক। ওগো সকল দেশের, সকল যুগের, সকল জাতির সুন্দর দেবতা, তোমায় নমস্কার।

মানুষ চায় আনন্দ। তার সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মের অবসরে দরকার হয়ে পড়ে একটু আনন্দ। এই আনন্দের স্ফুরণ নানাদিক দিয়ে। যারা ভুল না বোঝে—জীবনের যাত্রা-পথে কাঁটা না মাড়িয়ে চলতে চায়—তারাই নিছক আনন্দ পায়। এই যে নিছক সত্যিকার আনন্দ, একে পাওয়া যায় একমাত্র ধর্ম্মে। উদার মহান্ প্রেমিক যে জন—সে চায় ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে মিলনের চির মধুর পরশ।

আমাদের দেশ ধর্ম্মের দেশ। সত্য আমাদের সম্বল। নিষ্কলুষ প্রেম আমাদের পাথেয়। প্রকৃতির আনন্দ-সম্ভারের পরম বৈচিত্র্যে ষড়ৈশ্বর্য্যে ভরপুর এই যে আমার দেশ—এর সবখানে দেখে যায়—রূপ ফুঠে উঠেছে। তোমার গীতা, তোমার উপনিষদ, তোমার বেদ, তোমার পুরাণ, তোমার শাস্ত্র তোমায় দেখিয়ে দেবে—তোমায় বলে দেবে একমাত্র সেজনই তোমার সব—জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সেই অরূপেরই রূপ প্রতিফলিত র'য়েছে। তোমার সাধনা, তোমার চিন্তা, তোমার উপাসনা, তোমার গবেষণা সব কিছুই সেই পূর্ণ ব্রহ্মে। ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে কি দেখতে চাও? কুতর্কে মীমাংসা তো মিলবে না। গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে শির উন্নত রেখে বল—মাভৈঃ—তোমার সহজ সরল সত্য সাধনাতে তোমার ধর্ম্মের জয় বিঘোষিত হোক।

উৎসবের পথে তোমার দেশ যখন এগিয়ে চলছিল—তোমার নিরন্ন ক্লিষ্ট ভাই বোনেরা যখন ধর্ম্ম হারাতে বসেছিল—সেই আভিজাত্যের স্পর্দ্ধা যখন তাদের দুমড়ে মুসড়ে পায়ের তলায় থেঁতলে চাপছিল—তখন যে অন্তরের সুপ্ত আত্মা বিদ্রোহী হয়ে গর্জ্জে উঠে অমৃতবারি ঢেলে দিয়েছিল—সেই মহাপুরুষের হাতে গড়া বিধানের এই বিজয়-উৎসবে কি দেবে ভাই? এস তোমা-

দের অকপট ভালবাসা দিয়ে পুণ্য স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে—আর তোমরা এস বোন, তোমাদের মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে সকল অশান্তি দূর করে চির আনন্দে বিভোর হয়ে যেতে। আত্মবিস্মৃত পরাধীন জাতির দুঃখ যাবে তখন—যখন পূর্ণ ব্রহ্মের সাধনায় সবটুকু অশান্তির বাধা জানাবে।

দিনের পর রাত যেমন আসে, ধ্রুব সত্য—তেমনি এই আত্মভোলা জাতির সকল দুঃখ, সকল বাধা উপশম হবার দিন আগত। এস ভাই, এস বোন—যে যেখানে আছ—আজ সবাই মিলে মহামিলনের এই পুণ্যতীর্থে সমস্বরে বল—হে অনন্ত বিশ্বের স্রষ্টা! আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। হে পরম পুরুষ, অন্তরের বেদনা, বাহিরের অপমানে আমরা যে মৃতপ্রায়—তোমার অভয় আশীষে জগতের কাছে আমাদের সকল কষ্ট দূর করে মানুষ বলে পরিচয় দিতে দাও! হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার আলোকের খরস্রোতে জাতির মনের ময়লা ভেসে যাক। সবাই এক হোক্। হে অন্তরতম, তোমার প্রেমে জাতি যে মুগ্ধ—এ আনন্দোৎসবে জাতির জীবনের এ শুভলগ্নে তোমায় নমস্কার।

শ্রীশিবচন্দ্র হাৎ।

দ্ব্যধিকশততম মাঘোৎসব।

১লা মাঘ—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যায় আরতি। "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে চল ভাই যাই সকলে" এই কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে সকলে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তৎপর "জয় মাতঃ! জয় মাতঃ! আরতির কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদাচার্য্যদেবকৃত আরতির প্রার্থনা ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পাঠ করেন। তৎপর আরতি বিষয়ে শেষ সঙ্গীত হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনের নেতৃত্ব করেন।

২রা মাঘ—সন্ধ্যা ৬া০টায় কমলকুটীরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিশানবরণ। সংগীতান্তে মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী নিশানবরণ কার্য্যে নেতৃত্ব করেন ও স্বয়ং নিশান বরণ করেন। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী নিশানবরণ বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর সংগীত হয়। অদ্যকার অনুষ্ঠানে আচার্য্যদেবের সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবী কর্ত্তৃক রচিত "নববিধান-নিশানবরণ" কবিতাটী মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। কবিতাটী স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে।

৩রা মাঘ—প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যা ৬া০টায় ব্রহ্মমন্দিরে, ডাঃ জগন্মোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠান্তে, সেবকের নিবেদন হইতে ও জীবনবেদ হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করিয়া উপদেশ দেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ হস্তগত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

৪ঠা মাঘ—সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী "উপনিষদের ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথমে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রাচীন ভারতের ঋষিজীবনে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মের বিচিত্র ও গভীর উপলব্ধি ও ব্রহ্মরসপান, এক কথায় ঋষিজীবনে উপনিষদ্ বর্ণিত ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, ভারত এ গৌরবের জন্য স্বদেশে, বিদেশে মহিমান্বিত, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন। তৎপর বক্তা সহজ ও সুললিত হিন্দিভাষায়, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাকে সহায়তা করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতায় আপনার বক্তব্য বর্ণনা করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিশেষ একটী বিষয় এখানে মাত্র উল্লেখ করা গেল। তিনি বলিলেন, প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের সাধনা, ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা; তাঁহারা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আপন আপন জীবনে সাধন করিয়া, তাঁহাদের সাধনলব্ধ জ্ঞান উপনিষদে বিশদ বর্ণনায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে সাধন করিতেন। দলগত ভাবে নয়, Constitution করিয়া নয়। তাঁহাদের পরে এদেশে এবং অন্য দেশে ধর্ম্মের নামে Constitution করিয়া দল বাঁধিয়া সাধন করা, ধর্ম্ম করার চেষ্টা হইয়াছে, এখনও হইতেছে। দলে খাঁটি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সাধন হয় না, দলের মধ্যে ময়লা উপস্থিত হয়, ধর্ম্মে গলদ হয়। এ সব কথা তিনি অনেক কথায়, বিশদ বর্ণনায় বলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় ধর্ম্মসমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্মের বিমুখতা, ধর্ম্মের প্রতিকূল ভাব, ভোগ বিলাসিতার অতিশয্য দুঃখের সহিত বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, শরীরসর্ব্বস্ব ও বাহ্যসংসার-সর্ব্বস্ব ভাবে মানুষের জীবন পশুত্বেই পরিণত হইয়া থাকে। তাহাতে মানবজীবনের মহত্ত্ব ও গৌরবের বিকাশ হয় না। মানবজীবনের যথার্থ মহিমা ও গৌরবময় বিকাশ ভোগে নয়, ত্যাগে ও আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ-সমাধানে।

৫ই মাঘ—শ্রীদরবারের উৎসবে পূর্ব্বাহ্নে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক "প্রেরিতদলের প্রতি সেবকের নিবেদন" পাঠ করেন ও "শ্রীদরবারের গৌরব" আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীমান্ হেমচন্দ্র দাস সংগীত করেন। অপরাহ্নে নবদেবালয়ে আলোচনাদি হয়। সম্পাদক গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠ করিলে আলোচনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয়কুমার লধ ও গোপালচন্দ্র গুহ আলোচনায় বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। সন্ধ্যার পর শান্তিকুটীরে "আমাদের সঙ্গের" উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যানন্দ রায় সুমিষ্ট উপাসনা করেন। ইংরাজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতে পাঠ করেন। আচার্য্যদেবের একটী প্রার্থনাও পাঠ করেন। ছেলে মেয়েরা বিশেষ ভাবে সংগীত করেন। উপাসনার পর

মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া সুমিষ্ট কথকতা করেন। তৎপর প্রীতিভোজন হয়।

৬ই মাঘ,—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭॥০টার পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নব যুগে ঋষিধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, তাঁহার জীবনে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানের সঙ্গে ভক্তির যোগ হওয়াতে তিনি নবযুগে নবধর্ম্মবিধানে নবীন ভক্ত ঋষি আত্মা, এইটী বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করিলে, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় মাঘোৎসব গ্রন্থ হইতে মহর্ষিদেব সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উক্তি পাঠ করেন। তৎপর একটী সংগীত হয়। সংগীতান্তে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার বৈদ্যনাথ রায় ও বাহিরের একটী যুবক বক্তৃতা করেন।

৭ই মাঘ,—শান্তিকুটীরে ব্রাহ্মিকা উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়।

৮ই মাঘ,—পূর্ব্বাহ্নে মঙ্গলবাড়ীর উৎসব হয়। সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের সমাধি-প্রাঙ্গণে উপাসনার স্থান হয়। অনেক বৎসরের পর মঙ্গলবাড়ীর উৎসবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী মধুর উপাসনা করেন। তাঁহার ভাবপূর্ণ উপাসনায় মঙ্গলবাড়ীর পূর্ব্ব স্মৃতি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কত প্রিয় ও আদরের স্থান মঙ্গলপাড়া, এবং প্রেরিতদিগের মহজ্জীবনের পুণ্যস্মৃতি বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মঙ্গলপাড়ার সকল পুরুষ মহিলাদিগের সহিত প্রাণে প্রাণে, হৃদয় আত্মায় মিলিত হইয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। নববিধানের ধর্ম্মে প্রাচীন সকল বিধানের পুনরুত্থান, সকল সাধু ভক্তদিগের পুনরুত্থান সাধন হইতেছে; সকলই হইতেছে লীলাময়ী পরম জননীর কৃপায় ও প্রবর্ত্তনায়। এবার তাঁহারই বিশেষ কৃপায় ও প্রবর্ত্তনায় মঙ্গলপাড়ার উৎসবের পুনরুত্থান হইল। মণ্ডলীর গুণী জ্ঞানী, ধনী মানী, ঈশ্বরের সকল সন্তান উৎসব সম্ভোগ করিবেন, মঙ্গলপাড়ার দীন দরিদ্র ও নানা ভাবে হীন, ক্ষুদ্র তাঁহার সন্তানগণ স্বর্গের উৎসবের বিমলানন্দ সম্ভোগ করিবেন না, ইহা তাঁহার স্নেহমাখা মাতৃস্বভাবে তিনি সইতে পারিলেন না। তাই মঙ্গলপাড়ায় উৎসবের পুনরুত্থান করিয়া ইঁহাদের প্রাণে তাঁহার আনন্দহাস্যময় প্রকাশে উৎসবের বিমলানন্দ ঢালিয়া দিলেন; এবং তিনিই আমাদের মাতৃস্থানীয়া ভক্তকন্যা দ্বারা এই সুমিষ্ট উপাসনায় অমৃতসুধা পান করিতে দিয়া সকলকে ধন্য করিলেন, প্রার্থনায় এইটী প্রকাশিত হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শ্লোকসংগ্রহ হইতে শ্লোক ও মঙ্গলবাড়ী বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। মহিলাগণ সংগীত করেন। সর্ব্বশেষে একটী কীর্ত্তন হয়। তৎপর প্রীতিভোজন হয়। মঙ্গলপাড়ার ছোট বড় পুরুষ মহিলা সকলে মিলিতভাবে সযত্নে উৎসাহের সহিত উৎসবের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিলেন; তাই উৎসবটী আশাতীত ভাবে সুসম্পন্ন হইল। এজন্য করুণাময়ী জননীকে ধন্যবাদ।

৯ই মাঘ,—বালকবালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে বালকবালিকাদিগকে লইয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৪॥টায় ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে পুরস্কার-বিতরণ ও বালকবালিকাদের সম্মিলন হয়। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী সভানেতৃত্বের কার্য্য করেন ও পুরস্কার-বিতরণ করেন। বালকবালিকা-সম্মিলনে বালকবালিকাদিগের সংগীত, আবৃত্তি, ব্যায়াম ও খণ্ডাভিনয় প্রভৃতি উৎসাহ সহকারে সম্পন্ন হয়।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ৩১শে জানুয়ারী, রবিবার, ২২নং নিউ পার্ক ষ্ট্রীটে, ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায়ের চতুর্থ সন্তান, নবজাত প্রথম শিশুপুত্রের জাতকর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। গত ১লা জানুয়ারী শিশুটী জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ২ টাকা দান করা হইয়াছে।

নামকরণ—গত ১৭ই জানুয়ারী, ২৮নং চক্রবেড়ে লেনে, কুচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের পৌত্রী, কুমার বিকাশেন্দ্রনারায়ণের শিশুকন্যার শুভ নামকরণ উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শিশুকে "দেবকী" নাম প্রদান করেন। পিতামহী শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী শিশুর জন্য শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে এবং তাহার পিতামাতা ও ভাই ভগ্নীদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—বাঁকিপুরে, গত ২রা মাঘ, পাটনা-নিবাসী স্বর্গীয় ষষ্ঠীদাস মল্লিকের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ অকিঞ্চনপ্রাণ মল্লিকের সহিত হুগলী-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভার শুভবিবাহ এবং ৩রা মাঘ, দানাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কুণ্ডুর অষ্টম পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ নোগীকুমারের সহিত স্বর্গীয় ষষ্ঠীদাস মল্লিকের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৫ই মাঘ, ৩৮নং থিয়েটার রোডে, অমরাগড়ীনিবাসী কলিকাতা মাড়োয়ারী হিন্দু হাসপাতালের ডাক্তার রায় সাহেব প্রবোধচন্দ্র রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সাধনার শুভবিবাহ, হাওড়া জেলার কলুটীগ্রামনিবাসী স্বর্গীয় ম[illegible]চন্দ্র নন্দীর কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ ডাঃ শরচ্চন্দ্র নন্দীর সহিত নবসংহিতানুসারে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

উপরি উক্ত তিনটী বিবাহেই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। ভগবান্ নবদম্পতিত্রয়কে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

প্রচারকব্রত-গ্রহণ—গত ১২ই মাঘ, নববিধানঘোষণার দিনে, প্রাতঃকালীন উপাসনা মধ্যে, অমরাগড়ী-নিবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় এবং বরিশালপ্রবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবসংহিতার বিধি অনুসারে প্রচারকব্রত গ্রহণ করিয়া শ্রীদরবারের অন্তর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নববিধানের সেবায় প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। নববিধানের দেবতা তাঁহার নূতন সেবকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। সে দিনকার উপাসনায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উদ্বোধন, ভাই অক্ষয় কুমার লধ আরাধনা ও ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রচারকব্রতার্থীদিগকে ব্রতদান করেন। খুব গম্ভীরভাবে অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হয়।

দেবালয়প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক—১লা মাঘ, শুক্রবার, পূর্ব্বাহ্নে, ১২৯নং খুরুট রোডে, হাবড়ায়, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু পালের গৃহে গৃহদেবালয়-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে সেই পরিবার মধ্যে নিরাকার চিন্ময় ব্রহ্মকে জীবনে গ্রহণ বিষয়ে প্রসঙ্গ করা হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১০ই মাঘ, রবিবার, প্রাতে ভাগলপুরে স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র দের গৃহে তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে তাঁহার শেষ ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ তারাপদ দে প্রধান শোককারীর প্রার্থনা নবসংহিতা হইতে কাতর অন্তরে পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু গম্ভীর ভাবপূর্ণ উপাসনা করেন, মহিলাগণ সঙ্গীত করেন; স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এবং কয়েকটি হিন্দু মহিলা এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

দান—স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ নন্দনের ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া ভবতারিণী দেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহাদের কন্যা, কালনার শ্রীযুক্ত রাধিকাপদ পালের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুশীলা দেবী নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—বিগত ৬ই মাঘ, ভাগলপুরে, লীলালজে, সাহিত্যের অধিবেশনে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতিতে বিশেষ উপাসনা হয়; শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার আত্মজীবনী হইতে প্রার্থনা পাঠ হয়। স্থানীয় সকল মহিলা শ্রদ্ধাসহকারে যোগদান করেন।

শোক-সংবাদ—নববিধানের শ্রীদরবারের আর একটি স্তম্ভ খসিয়া পড়িল। শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, শিলচরে তাঁহার প্রিয় পুত্র সিভিল সার্জ্জন লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেনের (আই, এম, এস,) কর্ম্মস্থলে নশ্বরদেহ রক্ষা করিয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ নীতিজ্ঞান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, উপাসনাশীলতা, সত্যরক্ষা এবং সেবানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণ-সমন্বিত জীবন দীর্ঘকাল নববিধানের সেবায় দান করিয়া মার ক্রোড়স্থ প্রেরিতদলে গমন করিলেন। তাঁহার দিব্য আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-সাধন জন্য শ্রীদরবারের সভ্যগণ সপ্তাহব্যাপী শোকব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি ও আত্মীয়দিগকে আমরা অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা গভীর-শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজনীয়া ভগ্নী, গাজীপুরের ধর্ম্মাত্মা নববিধানের গৃহস্থ সাধক শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায়ের সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী তিনকড়ি দেবী মাঘোৎসবের মধ্যে তাঁহার পতিদেবের স্বর্গগমনের সমসাময়িক দিনে অমরধামে গিয়া দেবপতির সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়াছেন। ভ্রাতা নিত্যগোপাল নববিধান-সেবার জন্য তাঁহার গৃহসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই রক্ষকরূপে দেবী তিনকড়ি সে বিশ্বাসে কর্ত্তব্য সাধন করিতেছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, পতিপরায়ণতা, পরসেবা, আত্মজনসেবা প্রভৃতি অতুলনীয় ছিল। তাঁহার দিব্য আত্মা পতি সঙ্গে অমরলোকে শান্তি সম্ভোগ করুন।

পারলৌকিক—আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ডিসেম্বর মাসে, কলিকাতায়, স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর পুত্রবধূ, স্বর্গীয় প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কুন্দনলিনী রায় চৌধুরী, গত ২১শে জানুয়ারী, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা, শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের ভগ্নী ডাঃ মিস যামিনী সেন এবং ২২শে জানুয়ারী, হাজারিবাগে ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনতম স্বনামধন্য ডাঃ পি, কে, রায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। গত ৩১শে জানুয়ারী, হাজারিবাগে, ডাঃ পি, কে, রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী উপাসনা করেন, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ পাঠাদি করেন। খড়্গবাবু ডাঃ রায়ের যে জীবনী পাঠ করেন, তাহা আগামীবারে দেবার ইচ্ছা রহিল। ভগবান্ পরলোকে আত্মাদের ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের কল্যাণ বিধান করুন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক ১লা ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।